জার্নি আন্ডার দ্য মিডনাইট সান
কেইগো হিগাশিনো
অনুবাদঃ বি.এম.পারভেজ রানা

জাপানের পশ্চিম দিকের শহর ওসাকার পরিত্যক্ত এক বিল্ডিংয়ে খুঁজে পাওয়া যায় একটি লাশ। তদন্তে নামে স্থানীয় পুলিশ এবং ডিটেকটিভ সাসাগাকি। প্রত্যেকটা সন্দেহভাজনকে খতিয়ে দেখা হয়, পরখ করা হয় ভিক্টিমের সাথে পরিচিত সবাইকে। কিন্তু কোনোভাবেই কেসের সমাধান পাওয়া যায় না।

এরমধ্যে কেসটার প্রধান সন্দেহভাজন মারা গেলে কেসও ঝিমিয়ে পড়ে। কিন্তু খটকা থেকে যায় সাসাগাকির মনে।
সময় গড়িয়ে যেতে থাকে, একে একে কেটে যায় বিশটি বছর। এই পুরো সময় ধরে ডিটেকটিভ সাসাগাকি একটা উত্তরই খুঁজে যায়– সেদিন আসলে কী ঘটেছিলো?

গল্প চলে আসে টোকিওতে। তদন্ত থামায় না সাসাগাকিও। চলতে থাকে ইঁদুর-বিড়াল খেলা। শেষমেশ কি উত্তর পেয়েছিলো এই ডিটেকটিভ? জানতে পেরেছিলো যে সেদিন কী হয়েছিলো আসলে?
সব প্রশ্নের উত্তর রয়েছে বইয়ের শেষ পাতা পর্যন্ত। রয়েছে প্রত্যেকটা অধ্যায়ে, প্রত্যেকটা সংলাপে।
মধ্যরাতে উদিত হওয়া সূর্যের নিচে চলুন হাঁটা যাক কয়েক কদম।

জাপানের অন্যতম জনপ্রিয় এবং বেস্ট সেলিং লেখক হলেন কেইগো হিগাশিনো।

জাপানের ওসাকায় জন্ম নেওয়া এই লেখক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে চাকরিরত অবস্থায় থেকেই উপন্যাস লিখা শুরু করেন। ১৯৮৫ সালে বয়স সাতাশের সময়ে হোকাগো নামের উপন্যাস লিখে এদোগাওয়া র‍্যাম্পো পুরস্কার লাভ করেন তিনি। এরপরই মূলত চাকরি ছেড়ে দিয়ে পুরো সময় লেখার পেছনে ব্যয় করতে শুরু করেন।

লেখকের জন্ম ১৯৫৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের চার তারিখ। ছোটোবেলা থেকে দুরন্তপনা এই লেখক ১৯৯৯ সালে হিমিতসু (দ্য সিক্রেট) বইটির জন্য মিস্ট্রি রাইটারস অব ইনক জাপান খ্যাত অ্যাওয়ার্ড পান। বইটি নাওকো নামে কেরিম ইয়াসারের অনুবাদে ইংরেজিতে অনুবাদ হয় পরবর্তীতে।

তার বিক্রি হওয়া দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বই হলো দ্য ডিভোশন অব সাসপেক্ট এক্স। বইটি সারা বিশ্বে প্রায় আট লক্ষেরও অধিক কপি বিক্রি হয়েছে। এমনকি বাংলাদেশেও কেইগো হিগাশিনোর জনপ্রিয়তা তুমুল আকার ধারণ করেছে ইদানিং।

কেইগো হিগাশিনো

অনুবাদঃ বি. এম. পারভেজ রানা

সম্পাদনাঃ আশরাফুল সুমন

বেনজিন প্রকাশন

৩৮/এ, এন আলী টাওয়ার,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০
০১৯১৯৫২৫১৪৩

৭৮/১১, সাউথ বাউন্ডারি রোড,
সদর, ময়মনসিংহ
০১৬১১৩৩২৮৯৪

২৪

জার্নি আন্ডার দ্য মিডনাইট সান

মূল: কেইগো হিগাশিনো | অনুবাদ: বি. এম. পারভেজ রানা

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ: সেপ্টেম্বর , ২০২৩
দ্বিতীয় মুদ্রণ: সেপ্টেম্বর , ২০২৩

প্রকাশক

বেনজিন প্রকাশন
৩৮/এ, এন আলী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০
৭৮/১১, সাউথ বাউন্ডারি রোড, সদর, ময়মনসিংহ

প্রচ্ছদ: বি. এম. পারভেজ রানা
সম্পাদনা: আশরাফুল সুমন
মূল্য: ৮০০ টাকা মাত্র

Journey Under The Midnight Sun
by Keigo Higashino
Translated by B. M. parvez Rana
ISBN: 978-984-97791-1-7

ভারতীয় পরিবেশক:
বইবাংলা
স্টল-১৭, ব্লক-২, সূর্য সেন স্ট্রিট,
কলেজ স্কোয়ার দক্ষিণ, কলকাতা ৭০০০১২
ফোন: +৯১ ৭৯০৮০৭১৭৬৫

উৎসর্গ

একটি কেন্দ্রকে আবর্তন করে যেমন 'বৃত্ত' হয়, তেমনি আমাকে কেন্দ্র করে যে সকল মানুষ আছেন, তাদের প্রত্যেককে আমার এই বইটি উৎসর্গ করলাম।
আর এদের মধ্যে আছেন মা, বাবা, ভাইয়া এবং আমার পরিচিত-অপরিচিত বন্ধুরা।

সম্পাদকের কথা

তদন্ত-নির্ভর একটা গল্পে আমি কী আশা করি? সংক্ষেপে বললে, একজন সত্যিকার ইনভেস্টিগেটর যা যা করে, ঠিক তাই তাই আশা করি।

আর তারা কী করে?

একবার এক এফবিআই এজেন্ট একটা খুনের তদন্তের জন্য এক লোককে কিছু প্রশ্ন করছিলো। ওর বেশ শক্ত অ্যালিবাই ছিলো, আবার কথাবার্তা শুনেও মনে হচ্ছিলো সত্যই বলছে। কিন্তু তারপরেও কিছু একটা যেন খোঁচাচ্ছিলো এজেন্টের মনের ভেতর। সে তাকে এরপর সুনির্দিষ্ট কয়েকটা প্রশ্ন করলো। সবগুলোই মার্ডার ওয়েপন নিয়ে।

'আপনি যদি এই খুনটা করতেন, তো কী দিয়ে করতেন? পিস্তল? আচ্ছা...ছুরি? ও...আইস পিক? হাতুড়ি?'

ঐ খুনের মার্ডার ওয়েপন সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে তখনো জানানো হয়নি। এটা একমাত্র জানার কথা ছিলো খুনিরই। আর এই চারটা অস্ত্রের ভেতর আইস পিকই হলো মার্ডার ওয়েপন।

লোকটা সবগুলো প্রশ্নেরই উত্তর দিলো। কিন্তু যেই *আইস পিক* শব্দ দুটো কানে গেল, সপাটে চোখের পাতা বন্ধ হয়ে গেল তার। পরবর্তী প্রশ্নে যাওয়ার আগ পর্যন্ত ওভাবেই ছিলো তার চোখ।

আর তারপর মাইনর সাসপেক্ট হয়ে গেল ঐ কেসের প্রধান সাসপেক্ট। পরবর্তীতে এই লোক তার অপরাধের কথা স্বীকার করে নেয়।

তো যা বলছিলাম, এ জাতীয় গল্পে ইনভেস্টিগেটরদের কাছ থেকে আমি ঠিক এমন দক্ষতা আর দূরদর্শিতাই আশা করি। আমি দেখতে চাই তারা মানুষকে বিভিন্ন প্রশ্ন করে তাদের শরীরের ভাষা পড়ার চেষ্টা করছে। খেয়াল করছে যে সুনির্দিষ্ট কোনো প্রশ্নের পরপরই সাসপেক্ট আচমকা গোড়ালি দুটোকে একত্র করে ফেললো কি না। কোনো একটা সেন্সিটিভ প্রশ্ন করার সাথে সাথে হাত দিয়ে অ্যাডামস অ্যাপলের নিচে থাকা খাঁজ, মানে সুপ্রাস্টার্নাল নচ ঢেকে ফেলছে কি না। মুখে 'তারপর বাম দিকে গেছিলাম' বলে হাত দিয়ে ডান দিক দেখাচ্ছে কি না (হ্যাঁ, অপরাধটাও ওদিকেই হয়েছিলো)...

আর তারপর বইয়ের গোয়েন্দা কিংবা এজেন্টরা এই নন ভার্বালগুলো রিড করেই ঠিক করবে যে কাকে সন্দেহের তালিকায় রাখবে, কাকে বাদ দেবে, কার উপর তদন্ত আরো জোরদার করবে। আর এই জাতীয় গল্পে আমি ঠিক এটাই আশা করি।

জার্নি আন্ডার দ্য মিডনাইট সান হলো নন ভার্বালের এক সমুদ্র। এখানে কেউই অযথা নিজের কাঁধ বা হাঁটু মালিশ করে না (প্যাসিফায়ার), অযথা কারোই চোখ সরু হয়ে আসে না, বিনা কারণে কেউই নিজের জামার কলার ধরে টানাটানি করে না। প্রতিটা একশন ট্যাগেরই গভীর অর্থ আছে এখানে। আর এই ট্যাগগুলো চরিত্রগুলোর

মনে কী চলছে তার সম্পর্কে আমাদের ধারণা দেয়, মুখের কথা আর মনের কথায় আদৌ মিলছে কি না তা জানিয়ে দেয়। সর্বোপরি বইটা আমাদেরকে সুযোগ করে দেয় একজন ইনভেস্টিগেটরের চোখ দিয়ে দুনিয়াকে দেখার।

আর ঠিক এইজন্যই আমি এই বইটাকে আর দশটা থ্রিলার থেকে আলাদা ধরবো একটা গল্পের বইতে যে নন ভার্বালের এত চমৎকার প্রয়োগ করা যায় তা হিগাশিনোর বইটা না পড়লে আমার জানা হতো না। মন থেকেই বলছি, হিগাশিনো আসলেই একজন বস।

এর বাইরে একটা ভালো থ্রিলারে আমি যা যা আশা করি–চমৎকার প্লট, বিশ্বাসযোগ্য এবং জটিল কিছু চরিত্র, তাদের বিশ্বাসযোগ্য মোটিভ, শক্তিশালী ডায়ালগ, গল্পের গতি এবং সর্বোপরি মানবিক আবেগ–একদম সবই আছে এই বইতে এতটাই যে আমি এখন হিগাশিনোর অনেক বড় ফ্যান হয়ে গেছি।

এই বইটির অনুবাদক বি. এম. পারভেজ রানাকে লেখালেখির জগতে স্বাগত জানাই। তার ক্যারিয়ারের জন্য রইলো শুভকামনা। আশা করি বইটি পাঠকপ্রিয়তা পাবে।

সম্পাদক

আশরাফুল সুমন

অনুবাদকের কথা

সাল ২০২১। বইটা তখনই প্রথমবারের মতো পড়ি আমি। আর তখনই মাথায় চলতে থাকে, এই বইটার পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ আসা প্রয়োজন। কিন্তু তত দিনে বাজারে একটা অ্যাডাপ্টেশন চলছিলো, যার কারণে কোনো প্রকাশনীই ঝুঁকি নিতে চায়নি। কিন্তু তবুও আমি কিছুটা অনুবাদ করে গেছি–মনের খোরাক থেকেই বলতে গেলে। তেইশের মেলার পরপর বেনজিন প্রকাশনীর কর্ণধার নিঝুম ভাই আমাকে বইয়ের কাজ ধরতে বলেন। সাহস আর উদ্যম মিলিয়ে কাজ শেষ করেছি দু' মাসেরও কম সময়ে। এরমধ্যে পার হয়েছে দুটো ঈদ। তবুও কাজ থামাইনি। পাঠকদের হাতে সুন্দর কিছু তুলে দেওয়ার প্রেক্ষিতেই করেছি এ কাজ। চেয়েছি খুব ভালো একটা অভিজ্ঞতা হোক পাঠকের।

একটা দারুণ অভিজ্ঞতা হয়েছে এই বইয়ের সাথে। বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে সুনিপুণ ধারণা পেয়েছি। আশা করি পাঠকের মনেও অনুবাদটা জায়গা করে নেবে। অনুবাদ যথেষ্ট সাবলীল রাখার চেষ্টা করেছি যাতে পাঠকের বুঝতে কোনো প্রকার সমস্যা না হয়। আরো সাবলীল রাখতে সাহায্য করেছেন আশরাফুল সুমন ভাই। সম্পাদক আশরাফুল সুমন ভাইকে এজন্য অন্তরের অন্তস্তল হতে ধন্যবাদ।

এছাড়াও আরো কিছু মানুষ এই বইটি সম্পর্কে জানতো, যারা আমাকে সব সময় উৎসাহ দিয়েছেন বইটি শেষ করতে। পিয়েল রায় পার্থ দাদা, জাহেদুল ইসলাম ভাই, ফারহান লাবিব, অয়ন দাদা, অনিতা, তুর্য আর আমার ব্যক্তিগত সমালোচক, সম্পাদক, ভুল ধরিয়ে দেওয়ার ব্যক্তি এবং শ্রদ্ধেয় আপন ভাইকে বিশেষ ধন্যবাদ জানাই।

আরেকজন মানুষ রয়েছেন যাকে আমার সবকিছু বলতে পেরেছি সব সময়। মিথ্যু, তোমাকেও ধন্যবাদ জানাই। শেষমেশ বেনজিনের কর্ণধার নিঝুম ভাইকে ধন্যবাদ এত বড় একটা ঝুঁকি নিয়ে এত বড় কলেবরের বই প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়ার জন্য। ভাই উদ্যোগ না নিলে হয়তো আমার লেখক হওয়ার পেছনে অনেক ঘাটতি থেকে যেত।

বি. এম. পারভেজ রানা,
অনুবাদক ও প্রচ্ছদশিল্পী,
ঢাকা।

অধ্যায় এক

স্টেশন থেকে বেরিয়ে সোজা পশ্চিম দিকে হাঁটতে শুরু করলো সাসাগাকি। যদিও এখন অক্টোবর মাস, তবুও চারপাশটা ভয়ংকর রকমের কুয়াশা দিয়ে ঢাকা। অথচ রাস্তাঘাট এতটাই শুকনো যে একটা ট্রাক পাশ দিয়ে চলে যেতেই ধুলো উড়তে শুরু করে দিলো। ফুটপাতে থাকা সাসাগাকি থমকে দাঁড়ালো সাথে সাথে। চোখ কচলাতে কচলাতে ভ্রু কুঁচকে দেখার চেষ্টা করছে। আজকের এই ছুটির দিনটা বাড়িতে বসে বই পড়ে কাটানোর কথা ছিলো ওর। আর ঠিক এ ধরনের উপলক্ষ্যের জন্যই নতুন একটা থ্রিলার বই পড়া স্থগিতও রেখেছিলো।

হাঁটতে হাঁটতে হাতের ডান পাশে একটা পার্ক দেখতে পেল সে–মাসুমি পার্ক। পাশাপাশি দুটো সফটবল খেলার মতোই বিস্তৃত জায়গা রয়েছে এখানে। আরো আছে একটা জাঙ্গল জিম[১], দোলনা, স্লাইড–পার্কে সাধারণত যা যা থাকে আর কি। এই এলাকার মধ্যে সবচেয়ে বড় পার্ক এটাই। এর অপর পাশটায় একটা সাত-তলা বাড়ি রয়েছে। বাইরে থেকে দেখলে বাড়িটাকে স্বাভাবিকই মনে হবে, কিন্তু সাসাগাকি জানে বাড়ির ভেতরটা ঠিক কতটা ফাঁপা হয়ে আছে। মেট্রোপলিটন পুলিশে জয়েন করার আগে লোকাল ফোর্সের সাথে এখানে, মানে পূর্ব ওসাকাতেই ছিলো সে। তখনকার কিছু স্মৃতি এখনো ওর মাথায় আছে।

এই মুহূর্তে কিছু উৎসুক লোকের জটলা দেখা যাচ্ছে সেই বাড়িটার সামনে, যাদেরকে ঘিরে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটা পুলিশের গাড়ি।

সাসাগাকি সরাসরি বাড়িটার দিকে না গিয়ে পার্কের একটু আগেই ডানে মোড় নেওয়া একটা গলিতে ঢুকে গেল। কর্নার থেকে পাঁচ নাম্বার বিল্ডিংটা হলো ছোট্ট একটা দোকান, যার সামনে সর্বসাকুল্যে দুই মিটারের মতো খালি জায়গা রয়েছে। একটা সাইনবোর্ডে বড় করে লেখা: গ্রিলড স্কুইড। দোকানের সামনে থাকা স্ট্যান্ড সেটে একটা স্কুইড গ্রিল করা হচ্ছে, আর তার পেছনে আনুমানিক পঞ্চাশ বছরের মোটাসোটা এক মহিলা চেয়ারে বসে নিউজপেপার পড়ছে। পেছনেই শেলফে থাকা সারি সারি মিষ্টির দিকে তাকালো সাসাগাকি। এই জায়গাটা স্কুলের বাচ্চাদের কাছে বেশ বিখ্যাত; ছুটির পর এখানেই এসে আড্ডা দেয় ওরা। কিন্তু আজ কোনো বাচ্চাকেই দেখতে পাচ্ছে না সে।

'একটা গ্রিল, প্লিজ,' বলে উঠলো সাসাগাকি।

মহিলাটা এক ঝটকায় পত্রিকাটা বন্ধ করে বললো, 'এক্ষুনি নিয়ে আসছি।'

সাসাগাকি পিস ব্র্যান্ডের সিগারেট খায়। প্যাকেট থেকে একটা বের করে দুই ঠোঁটের মাঝখানে রেখে আগুন ধরালো ওতে। তারপর সেই পত্রিকাটায় দূর থেকে একবার চোখ বোলালো যেটা সেই মহিলা চেয়ারে রেখে গেছে। একটা হেডলাইনে

লেখা আছে: *সামুদ্রিক খাবারে পারদের মাত্রা সংক্রান্ত ফলাফল প্রকাশ করেছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়।* ইনসেটে ছোট করে লেখা: *'এমনকি বিপুল পরিমাণ সামুদ্রিক খাদ্যেও পারদের পরিমাণ ক্ষতিকর মাত্রার বেশ নিচেই অবস্থান করছে।'*

গেল মার্চ মাসে কুমামোতো জেলার একজন বিচারক *মিনামাতা ডিজিজ ট্রায়াল-*এর রায় ঘোষণা করেন। যার ফলে এক ধাক্কায় আরো তিনটা বড়সড়ো পাবলিক হেলথ ট্রায়ালের রায়ের পথ খুলে যায়। এগুলো হলো: নিগাতার মিনামাতা রোগ নিয়ে চলা মামলা, ইওতসুকাইচিতে চলা পরিবেশ দূষণের একটা মামলা আর ইতাই-ইতাই নামক রোগের মামলা। সবগুলো মামলার রায়ই বাদীর পক্ষে যায়। আর তারপর থেকেই সি-ফুডের উপর অনেক বেশি নির্ভরশীল এই জাতির মাথায় দূষণের ভয় ঢুকে গেছে। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে পারদ আর পিসিবি আবার খাবারের মধ্যে না ছড়িয়ে পড়ে—এই দুশ্চিন্তা বাড়তে শুরু করেছে সবার মধ্যে।

আশা করি স্কুইড অন্তত নিরাপদ হবে, মনে মনে ভাবলো সাসাগাকি।

একটা বিশেষ তাওয়ায় ভাজা হচ্ছে স্কুইডটাকে। ওটাকে দুটো স্টিলের প্লেট দিয়ে চাপ দিচ্ছে মহিলা। ময়দা আর ডিম দিয়ে ভাজা স্কুইডটার ঘ্রাণ সাসাগাকির পেটে মোচড় ধরিয়ে দিলো।

ভাজা শেষে মহিলা তাওয়া থেকে ওটাকে বের করে হালকা করে সস মাখালো। তারপর চ্যাপটা, আয়তাকার স্কুইডটাকে দুই ভাগ করে কেটে বাদামি রঙের একটা ওয়েক্স পেপারে মুড়িয়ে ধরিয়ে দিলো সাসাগাকির হাতে।

সাসাগাকি আড়চোখে একবার পাশে থাকা সাইনবোর্ডটার দিকে তাকালো যেখানে লেখা আছে 'স্কুইড: প্রতি পিস চল্লিশ ইয়েন', এরপর পকেট হাতড়ে কিছু কয়েন বের করে মহিলার হাতে দিলো।

'ধন্যবাদ।' প্রফুল্লভাবে কথাটা বলে আবার চেয়ারে রাখা নিউজপেপারের দিকে ফিরে গেল মহিলাটা।

সাসাগাকি অন্য দিকে চলে যাচ্ছিলো, এমন সময় শুনতে পেল আরেকটা মহিলা সেই স্কুইড বিক্রেতার সাথে কী যেন বলছে। পেছন ফিরে একটু তাকাতেই বুঝতে পারলো এই মহিলা আশেপাশেই থাকে। সাসাগাকি থামলো একটু। মহিলার এক হাতে একটা শপিং করার ঝুড়ি রয়েছে।

'কী হতে পারে বলে মনে হয়? আমার তো মনে হয় অনেক বড় কিছু,' সেই বাড়িটার দিকে তাকিয়ে বললো গৃহিণী।

'এর আগে কখনোই এতগুলো পুলিশের গাড়ি ওখানে দেখিনি আমি। মনে হয় কোনো বাচ্চা বড়সড়ো আঘাত পেয়েছে,' সেদিকে তাকিয়ে জবাব দিলো স্কুইড বিক্রেতা মহিলা।

সাসাগাকি এতক্ষণ বাড়িটার দিকেই তাকিয়ে ছিলো। বাচ্চার নাম শুনতেই পেছন ফিরে জিজ্ঞেস করলো, 'দুঃখিত, আপনি কি মাত্র কোনো বাচ্চার কথা বললেন?'

'আরে, ওরা সব সময়ই ওখানে দৌড়াদৌড়ি করে। আমি অনেকবার বলেছি, আজ নয়তো কাল কেউ একজন ঠিকই ব্যথা পাবে। এখন মনে হচ্ছে আমি ঠিকই বলেছিলাম। আপনি কি অন্য কিছু শুনেছেন নাকি?'

প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল সাসাগাকি। তারপর জিজ্ঞেস করলো, 'এরকম একটা জায়গায় বাচ্চারা খেলবে কেন?'

'বাচ্চারা আর দশটা জায়গায় যে কারণে খেলে সে কারণে। আমি অনেককেই বলেছি এই ব্যাপারে কিছু একটা করতে। জায়গাটা খেলার জন্য নিরাপদ না,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো স্কুইড বিক্রেতা।

হাতে থাকা স্কুইডটা খেয়ে নিয়ে বাড়িটার দিকে হাঁটতে শুরু করলো সাসাগাকি। আরেকজন দর্শক ভিড় জমাতে যাচ্ছে ওখানে।

নিরাপত্তা বেষ্টনীর নিচ দিয়ে ভেতরে ঢোকার সময় খেয়াল করলো ঐ বাড়ির সামনে কয়েকজন পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। ওদের মধ্যেই একজন অফিসার ওর দিকে রাগী চোখে তাকিয়ে পর মুহূর্তেই দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলো। কারণ সাসাগাকি ওর জ্যাকেটের পকেটে থাকা ব্যাজের উপর চাপড় মারছে। ওখানেই নিজেদের ব্যাজ রাখে গোয়েন্দারা।

প্লাইউড আর কাঠের টুকরো-টাকরা দিয়ে তৈরি একটা অস্থায়ী দরজার ফাঁক গলে হলরুমের ভেতর ঢুকলো সাসাগাকি। ভেবেছিলো ভেতরটা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে থাকবে, আর হলোও তাই। ভেতরের বাতাসটা বেশ ভারী এবং ধুলো দিয়ে ভরা। একটু থামলো সে, কয়েকবার চোখ পিটপিট করে কোথাও থেকে আসা গলার আওয়াজ শুনতে লাগলো। একটু পরেই বুঝতে পারলো ও যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, সেই জায়গাটা লিফট বানানোর জন্য ঠিক করা হয়েছিলো। একপাশের দেয়ালে হেলান দিয়ে রাখা আছে দুটো লিফটের দরজা। ওখানে স্তূপ হয়ে আছে নির্মাণ সামগ্রী আর ইলেকট্রিকের তার।

একদম সামনে একটা চারকোনা দেয়াল দেখা যাচ্ছে। ওখানে দরজা বানানোর জন্য কিছুটা গর্তের মতো করে ভাঙা হয়েছে। আর তার ওপাশে এতটাই তীব্র অন্ধকার যে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। যদিও সাসাগাকি ধরে নিয়েছে সে যেদিকে তাকিয়ে আছে সেটা গাড়ি পার্ক করার জন্য ঠিক করা হয়েছিলো। বাম দিকে একটা রুম খালি আছে; ওখানেও প্লাইউডে তৈরি আরেকটা অস্থায়ী দরজা লাগানো। দরজার উপরে চক দিয়ে বড় বড় করে লেখা: 'অনুমতি ছাড়া প্রবেশ নিষিদ্ধ'। দরজাটা একটু খুলতেই দুটো মুখ ভেসে উঠলো তার সামনে। দুজনেই সাসাগাকির ইউনিটের গোয়েন্দা।

'আরে তুমি...তা ছুটির দিনটা কেমন উপভোগ করছো?' কোবায়াশি নামের বয়স্ক গোয়েন্দাটা জিজ্ঞেস করলো। এই লোক তার দুই বছরের সিনিয়র। পাশেই আরেকজন তরুণ গোয়েন্দা দাঁড়িয়ে আছে। ওর নাম কোগা, হোমিসাইডে জয়েন করেছে বছরখানেক হলো।

'সেই সকালে ঘুম থেকে উঠার পর থেকেই মনে হচ্ছিলো আজ খারাপ কিছু একটা হবে। এখন এখানে বড় কিছু না হলেই বাঁচি,' সাসাগাকি বললো। তারপর একটু গলা নামিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'তা বুড়োটার মন-মেজাজ আজ কেমন?'

ভ্রুকুটি করে মাথা ঝাঁকালো কোবায়াশি। কোগা কিছুটা বাঁকা হাসি হাসলো তা দেখে।

'হ্যাঁ, আমিও তা ধরতে পেরেছি। যাক গে, আমাদের মতো লোকদের আবার কীসের বিশ্রাম? তা কী নিয়ে পড়ে আছে বুড়োটা এখানে?'

'ডা. মাতসুনো মাত্রই এলেন।'

'হুম, বুঝলাম।'

কোবায়াশি গলাটা একটু পরিষ্কার করে বললো, 'আমরা একটু বাইরেটা ঘুরে দেখবো, কেমন?'

'দেখে আসুন।'

ওকে পাশ কাটিয়ে দুজনকে চলে যেতে দেখলো সাসাগাকি। *ওদের পাঠানোই হয়েছে মানুষকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য।*

হাতে গ্লাভস পরে নিয়ে ধীরে ধীরে দরজাটা খুললো সে। রুমটা বিশ বর্গমিটারের কিছুটা বেশি হবে। সূর্যের আলো ঘরের ভেতর পড়াতে ততটা অন্ধকার নেই এখানে।

জানালার সামনেই ছায়াতে গোয়েন্দা পুলিশগুলো গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এদের মধ্যে অনেককেই সাসাগাকি চেনে না। হয়তো লোকাল থানার লোক এরা। বাকিদেরকে ভালো করেই চেনে। সত্যি বলতে, এদের অনেককে দেখতে দেখতে কিছুটা ক্লান্ত সে। প্রথমই যে তাকে অভিবাদন জানালো সে আর কেউ না, ক্যাপ্টেন নাকাতসুকা। চুলে বাজ কাট মেরেছে, চোখে একটা ধাতব ফ্রেমের চশমা–কাচের অর্ধেকটা আবার হালকা বেগুনি রঙে রাঙানো। তার দুই ভ্রুয়ের মাঝখানে থাকা ভাঁজটা কখনোই সরে না, এমনকি হাসলেও না।

কোনো অভিবাদনের ধার দিয়ে গেল না ক্যাপ্টেন, এমনকি দেরি করে আসার জন্য মশকরাও করলো না। ওকে দেখামাত্র শুধু চোয়ালটা নাড়িয়ে ঘরের একপাশে ইঙ্গিত করলো। দেয়ালের সাথে ঠেস দিয়ে রাখা আছে একটা মোটা চামড়ার কালো রঙের সোফা। সোফায় যতটুকু জায়গা আছে তাতে তিনজন মানুষ স্বচ্ছন্দে বসতে পারবে–যদি তারা একটু গাদাগাদি করে বসে আর কি। সেই সোফার উপরেই পড়ে আছে লাশটা। ওটা যে কোনো পুরুষের তা দেখেই বোঝা যাচ্ছে।

কিনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডা. হিদেওমি মাতসুনোর দায়িত্বে এই মৃতদেহ পরীক্ষা করার ভার পড়েছে। বিশ বছরেরও অধিক সময় ধরে তিনি এই ওসাকা শহরে মেডিক্যাল এক্সামিনার হিসেবে আছেন।

সাসাগাকি একটু গলাটা বাড়িয়ে দিলো মৃতদেহটা দেখার জন্য। কত হবে লোকটার বয়স? ভাবলো সাসাগাকি। চল্লিশের মাঝামাঝি কিংবা পঞ্চাশ হবে হয়তো। উচ্চতা সম্ভবত ১৭০ সেন্টিমিটারের কাছাকাছি। আর উচ্চতা অনুযায়ী ওজন একটু বেশি। একটা বাদামি রঙের জ্যাকেট পরনে, কিন্তু গলায় কোনো টাই বাঁধা নেই। সুসজ্জিত পোশাকের উপরে ঠিক বুকের দিকটায় বিশাল একটা ক্ষত, যেটার ব্যাস কমপক্ষে দশ সেন্টিমিটার হবে। এছাড়াও আরো কিছু ক্ষত রয়েছে, কিন্তু তা থেকে ঠিক ততটা রক্ত বের হচ্ছে না। দেখে মনে হচ্ছে না যে আততায়ীর সাথে খুব একটা ধস্তাধস্তি হয়েছে। ওর জ্যাকেট ঠিকঠাকই আছে, গোছানো চুলও পরিপাটি করে পেছনে বাঁধা।

ছোটখাটো গড়নের ডা. মাতসুনো দাঁড়িয়ে গিয়ে গোয়েন্দাদের দিকে ফিরে তাকালেন। তারপর বললেন, 'দেখে মনে হচ্ছে হোমিসাইড। পাঁচ জায়গায় ছুরির আঘাত। দুটো বুক বরাবর, আর বাকি তিনটা কাঁধের দিকে। সবচেয়ে বড় ক্ষতটা হলো বুকের বাম পাশে, খানিকটা নিচের দিকে, স্টার্নামের কয়েক সেন্টিমিটার বামে।' বক্ষাস্থি থেকে কিছুটা বামে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন ডা. মাতসুনো। 'ছুরিটা পাঁজরের মধ্যে দিয়ে ঢুকে সোজা গিয়ে হৃৎপিণ্ডে আঘাত করেছে। একটা আঘাতই যথেষ্ট ছিলো।'

'সাথে সাথেই মারা গেছিলো নাকি?' জিজ্ঞেস করলো নাকাতসুকা।

'সর্বোচ্চ এক মিনিটের মাথাতেই। করোনারি আর্টারির তীব্র রক্তক্ষরণের ফলে হৃৎপিণ্ডে চাপ পড়ে। আমার ধারণা কার্ডিয়াক টেম্পোনেডের শিকার হয়েছে ভিক্টিম।'

'খুনির শরীরে রক্ত লেগে থাকার সম্ভাবনা আছে নাকি?'

'সম্ভাবনা কম।'

'কীরকম অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে বলে ধারণা করছেন?'

ঠোঁট উলটে একবার কাঁধ ঝাঁকালেন ডাক্তার। তারপর বললেন, 'সম্ভবত খুবই ধারালো কোনো ছুরি হবে। ফল কাটার ছুরি থেকে কিছুটা চিকন প্রকৃতির। তবে এটা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে এটা চাপাতি বা স্বাভাবিক কাজে ব্যবহার করার মতো কোনো ছুরি না।'

'আর মৃত্যুর সময়?' জিজ্ঞেস করলো সাসাগাকি।

'পেশিগুলো শক্ত হয়ে আছে, সেই সাথে ফ্যাকাশে নীল হয়ে গেছে পুরো শরীর। চোখের কর্ণিয়াও অস্বচ্ছ। আমার মতে সতেরো থেকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে

মৃত্যু হয়েছে। এর থেকে পরিষ্কার কিছু জানতে হলে ময়নাতদন্তের পরেই জানানো যাবে।'

ঘড়ির দিকে তাকালো সাসাগাকি। দুটো চল্লিশ বাজে। এর মানে দাঁড়ায় ভিক্টিম গতকাল দুপুর তিনটা থেকে রাত দশটার ভেতর খুন হয়েছে।

'ঠিক আছে, ময়নাতদন্ত শুরু করে দিন,' বললো নাকাতসুকা।

'সেটাই কাজে দেবে,' বললেন ডা. মাতসুনো।

এরমধ্যে কোগা এসে বললো, 'ভিক্টিমের স্ত্রী এসেছে।'

'যথেষ্ট সময় লাগিয়েছে। ওকে দিয়ে লাশটা শনাক্ত করো আগে,' ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বললো নাকাতসুকা। তার কথা শুনে মাথা ঝাঁকিয়ে বেরিয়ে গেল কোগা। সাসাগাকি একটু সামনে এগিয়ে গিয়ে জড়ো হয়ে থাকা গোয়েন্দাদের মাঝ থেকে একজনের কানে কানে বললো, 'এই লোকের পরিচয় কীভাবে জানা গেল?'

'ওর কাছে ড্রাইভিং লাইসেন্স আর বিজনেস কার্ড ছিলো। স্থানীয় এলাকায় একটা পনশপ চালাতো সে।'

'পনশপ? মানে জিনিসপত্র বন্ধক রেখে টাকা ধার দিতো? তা ভিক্টিমের কাছ থেকে কিছু খোয়া গেছে নাকি?'

'বলতে পারছি না। তবে ওরা কোনো ওয়ালেট খুঁজে পায়নি তার কাছে।'

দরজার দিকে কিছুটা শব্দ হতেই দেখা গেল কোগা সদ্য বিধবা হওয়া মহিলাটাকে নিয়ে ভেতরে ঢুকছে। গোয়েন্দারা সোফার পাশ থেকে সরে দাঁড়ালো কিছুটা। সদ্য বিধবার পরনের কালো আর গাঢ় কমলা রঙের পোশাকটা রুমের ভেতরে থাকা অন্ধকারকে আরো কিছুটা বাড়িয়ে দিলো যেন। তার পায়ের হিলটা নিঃসন্দেহে দশ সেন্টিমিটার উঁচু হবে। আর চুলের ঢেউটা একদম নিখুঁতভাবে গড়া। যেন এই কিছুক্ষণ আগেই বিউটি সেলুন থেকে বেরিয়ে এসেছে সে।

গাঢ় আইশ্যাডো দেওয়া বড় বড় চোখদুটো সোফার দিকে ঘুরে গেল। সাথে সাথে দুই হাত দিয়ে মুখ ঢেকে হেঁচকির মতো শব্দ করে উঠলো মহিলা। কয়েক সেকেন্ডের জন্য একদম নিঃসাড় হয়ে গেল। অবশেষে আড়ষ্টতা ভেঙে এগিয়ে যেতে থাকলো নিথর দেহটার দিকে। একদম সোফার কাছে গিয়ে মরদেহের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। সাসাগাকি স্পষ্ট দেখতে পেল যে মহিলার চিবুক খানিকটা কেঁপে উঠেছে।

'এটা কি আপনার স্বামী, ম্যাম?' জিজ্ঞেস করলো নাকাতসুকা।

মুখে কোনো জবাব দিলো না সে, শুধু হাত দিয়ে ঢেকে রাখা চিবুকটা দোলালো। এক মুহূর্ত বাদেই হাত দিয়ে পুরো মুখটা ঢেকে হাঁটু ভেঙে মেঝেতে বসে পড়লো সে। সাসাগাকির কাছে বিষয়টা কিছুটা মেকি মনে হলো। এরপরেই আঙুলের ফাঁক দিয়ে ভেসে এলো চাপা কান্না আর ফোঁপানোর আওয়াজ।

ভিক্টিমের নাম ইওসুকে কিরিহারা। কিরিহারা পনশপের মালিক। দোকানটাকে তার বাড়ি হিসেবেও ব্যবহার করা হতো। এই বিল্ডিং থেকে এক কিলোমিটারের মতো দূরত্ব।

বিধবা ইয়েকো তার স্বামীর মৃতদেহ শনাক্ত করার পরে ওরা সবাই মিলে বাইরে বের করে আনলো লাশটা। সাসাগাকিও ওদেরকে সাহায্য করছিলো, এমন সময় একটা জিনিসে চোখ আটকে গেল তার। 'ভিক্টিম কি বাইরে খাওয়াদাওয়া করেছিলো নাকি?' জিজ্ঞেস করে বসলো সে।

ভ্রু তুললো কোগা। 'এমনটা ভাবার কারণ?'

ভিক্টিমের বেল্টের দিকে ইশারা করলো সাসাগাকি। 'ওর বেল্ট সচরাচর যেখানে বাঁধা থাকে, সেখান থেকে দুটো ফুটো বাড়িয়ে বাঁধা আছে। দেখো।'

'আসলেই তো!'

মি. কিরিহারা অনেক দিন ধরেই বাদামি রঙের ভ্যালান্টিনো বেল্টটা শেষ থেকে পাঁচ নম্বর ফুটোতে পরে আসছিলো বলে মনে হলো। তার বেল্টের উপর পড়ে যাওয়া দাগ দেখেই বোঝা যাচ্ছিলো সেটা। সেই ফুটোতেই বেল্ট পরার কথা ছিলো তার, কিন্তু আজকে শেষ থেকে তিন নাম্বার ফুটোতে ঢোলা করে বেল্টটা পরেছে সে। সাসাগাকি এক তরুণ গোয়েন্দাকে দিয়ে বেল্টটার ছবি তুলিয়ে রাখলো। এরপর এখানকার কাজ শেষ হলে সাসাগাকি আর নাকাতসুকাকে ঘটনাস্থলে রেখেই আশেপাশের প্রতিবেশীদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে বেরিয়ে পড়লো সবাই।

ঘরের একদম মাঝখানে দাঁড়িয়ে চারপাশটা ভালো করে দেখতে লাগলো নাকাতসুকা। তার চিরন্তন চিন্তা করার ভঙ্গিমায়, মানে বাম হাত কোমরে আর ডান হাত কপালে নিয়ে বললো, 'সাসাগাকি, কী বুঝলে তুমি? আমরা কীরকম ক্রিমিনালের পেছনে ছুটছি মনে হচ্ছে?'

'ন্যূনতম ধারণাও নেই। তবে এতটুকু বুঝতে পারছি যে অপরাধী ভিক্টিমের পরিচিতই ছিলো।'

ভিক্টিমের পরিপাটি হয়ে থাকা, গোছানো চুল, কোনো রকম ধস্তাধস্তি ছাড়া একদম বুকের ভেতর ছুরিভেদ করা–সবকিছুই ঐ দিকেই ইঙ্গিত করছে।

'তবে প্রশ্নটা হলো, ওরা এরকম একটা জায়গায় কী করছিলো?'

সাসাগাকি আবার রুমে গিয়ে ঘোরাঘুরি করতে লাগলো। এবার ভালো করে দেয়াল আর মেঝে দেখছে। ওর কাছে মনে হলো বাড়িটা নির্মাণের সময় থেকেই এখানে একটা অফিস ছিলো। কালো সোফাটা হয়তো সেই অফিসেরই অবশিষ্টাংশ। এছাড়াও একটা স্টিলের ডেস্ক, দুটো ফোল্ডিং চেয়ার আর একটা মিটিং টেবিল–যার পায়া ভাঁজ করা যায়–দেয়ালের সাথে হেলান দিয়ে রাখা আছে। মেয়াদোত্তীর্ণ লোহা থেকে মরিচা ঝরছে, আর ধুলোর এক সূক্ষ্ম আস্তরণের প্রলেপ পড়েছে পুরো

জায়গাটায়। এই বাড়ির নির্মাণ কাজ আড়াই বছর আগেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিলো যদিও।

সাসাগাকির চোখ একটা জায়গায় গিয়ে থেমে গেল কিছুটা। সোফা যে দেয়ালটার সাথে রাখা, সেই দেয়ালের উপরের দিকে সিলিংয়ের একটু নিচে একটা চারকোনা নালির মতো গর্ত। সাধারণত এরকম গর্ত লোহার এক প্রকার ঝাপরি দিয়ে ঢাকা থাকে, কিন্তু এখানে সেটা সরিয়ে ফেলা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। অবশ্য, ওটা আদৌ কখনো লাগানো ছিলো কি না সন্দেহ।

তবে এই নালি না থাকলে হয়তো এত দ্রুত তারা লাশের খবর জানতে পারতো না। স্থানীয় গোয়েন্দাদের ভাষ্যমতে, যে বাচ্চাটা লাশ খুঁজে পায় সে পাশের এক ইলিমেন্টারি স্কুলের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র। দুপুরের পরে শনিবারের ক্লাস শেষে সেই বাচ্চা তার আরো চার-পাঁচজন সহপাঠীকে নিয়ে এখানে চলে আসে। কোনো রকম ডজবল বা লুকোচুরি খেলতে আসেনি তারা, এসেছিলো এই বাড়ির রহস্যজনক ভেন্টিলেশন ডাক্ট তথা বায়ু চলাচলের নালিতে কী আছে সেটা উদ্ধার করতে। নালির সেই ছোট রাস্তাটা ধরে হামাগুড়ি দিয়ে এদিক-সেদিক ঘুরে দেখাটা একটা বাচ্চা ছেলের জন্য কতটুকু রোমাঞ্চকর হতে পারে, তাও আবার সাথে চারজন সঙ্গী নিয়ে, সাসাগাকি তা ভালোই বুঝতে পারছে।

একটা সময় পরে ওদের মধ্য থেকে একজন ভুল দিকে চলে যায়। অন্য সবার থেকে একদম আলাদা হয়ে যায় সে। বাচ্চাটা নালির মধ্যে অন্ধের মতো হামাগুড়ি দিয়ে চলতে থাকে। একটা সময় এই পরিত্যক্ত অফিস পর্যন্ত এসে পৌঁছায়। প্রথমে ভেবেছিলো লোকটা সোফার উপরে ঘুমিয়ে আছে। নালির মধ্যে থেকে খুব সতর্কতার সাথে বেরিয়ে আসে ও যাতে লোকটা কোনো রকম শব্দ শুনে উঠে না যায়। কিন্তু লোকটা কোনো রকমের নড়াচড়া না করায় সে আরেকটু কাছে এসে দেখার চেষ্টা করে, আর তখনই রক্ত দেখতে পায়।

এরপরেই সেখান থেকে দৌড়ে বাড়িতে চলে যায় ছেলেটা। দুপুর একটা নাগাদ পরিবারের কাছে বিষয়টা জানায়। তার মা তাকে বিশ্বাস করতে করতে আরো বিশ মিনিটের মতো সময় নষ্ট হয়। রেকর্ড বলছে মহিলার ফোন যখন লোকাল থানায় আসে, তখন সময় দুপুর একটা বেজে তেত্রিশ মিনিট ছিলো।

'একজন পনব্রোকার, তাই না? তোমার কী মনে হয়, কাজের প্রয়োজনে ওকে সত্যিই এমন একটা জায়গায় এসে কথা বলতে হয়?' হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো নাকাতসুকা।

'হতে পারে...হয়তো সে চায়নি কেউ তাকে দেখুক। অথবা সে এমন কারো সাথে দেখা করতে এসেছিলো যার সাথে কেউ তাকে দেখে ফেলুক তা চায়নি।'

'হুম...তা হতে পারে। কিন্তু এখানেই কেন? তার যদি কারো সাথে গোপনে দেখা করতেই হতো, তবে অনেক জায়গাই তো ছিলো যেখানে সে অনায়াসে যেতে

পারতো। আর যদি কারো দেখে ফেলার ভয় থাকতো, তবে বাড়ি থেকে অনেক দূরে কোথাও গেল না কেন?'

'তাও ঠিক,' চিবুকে হাত বোলাতে বোলাতে বললো সাসাগাকি। হাতে খোঁচা খোঁচা ভাব অনুভব করলো কিছুটা। সকালবেলা শেভ ছাড়াই বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলো সে।

'তার স্ত্রীর বিষয়টাও কেমন যেন,' নাকাতসুকা কথা ঘুরিয়ে নিলো। 'এই লোকের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, আর তার স্ত্রী...কত হবে? ত্রিশের একটু উপরে? লোকটার সাথে যখন তার প্রথম পরিচয় হয়, তখন সে বাচ্চা মেয়েই ছিলো বলা যায়।'

'বাজারি মেয়ে,' বিড়বিড় করে বললো সাসাগাকি।

নাকাতসুকা মাথা নাড়লো একবার। তারপর বললো, 'ওর মেকআপ দেখেও তেমনই লাগে। পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে মনে হচ্ছিলো একদম ওসব কাজের জন্য প্রস্তুত হয়েই বেরিয়েছে। আবার তার আসতে এতটা সময় লাগারও কথা না; কারণ তার বাসা থেকে এখানের দূরত্ব খুব একটা বেশি না। তার চেয়েও বড় কথা, অভিনয়টা কেমন ছিলো লক্ষ করেছ?'

'আপনি বলছেন তার চোখের পানি তার চোখে থাকা আইল্যাশের মতোই মেকি ছিলো?'

'সে তো তোমার কথা। আমি কিছুই বলিনি এ ব্যাপারে।' হেসে উঠলো নাকাতসুকা। তারপর কঠিন মুখ করে বললো, 'ওদের তদন্ত হয়তো শেষ হয়ে গেছে। সাসাগাকি, তুমি কি ওর বাড়িটা একবার দেখে আসতে পারবে?'

'অবশ্যই।' মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মান জানিয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল সাসাগাকি।

বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা দর্শকদের অনেকেই চলে গেছে ততক্ষণে। তাদের বদলে এসেছে পত্রিকার রিপোর্টাররা। দেখে মনে হচ্ছে আশেপাশেই হয়তো কোনো টেলিভিশনের স্টেশনও আছে।

সাসাগাকি সেসবের উপর দিয়ে পুলিশের গাড়ি যেখানে পার্ক করা আছে সেদিকে তাকালো। সামনে থেকে দুই নাম্বার গাড়ির পেছনের সিটে বসে আছে ইয়েকো কিরিহারা। তার পাশেই বসে আছে কোবায়াশি। কোগা বসেছে প্যাসেঞ্জার সিটে। হেঁটে গাড়ির কাছে গিয়ে জানালায় দুটো টোকা দিলো সাসাগাকি। কোবায়াশি দরজা খুলে বেরিয়ে পড়লো সাথে সাথে।

'কেমন যাচ্ছে প্রশ্নপর্ব?'

'আমরা প্রায় সবকিছু নিয়েই প্রশ্ন করেছি। সত্যি বলতে, মহিলাকে এখনো কিছুটা এলোমেলো লাগছে,' মুখ ঢেকে বললো কোবায়াশি।

'ভিক্টিমের সাথে থাকা জিনিসপত্র দেখিয়ে চেক করিয়েছেন?'

'হ্যাঁ, করেছি। বলেছে ওয়ালেট আর লাইটার নেই তার সাথে।'

'সামান্য লাইটারের কথাও মনে আছে মহিলার?'

'হ্যাঁ, ডানহিল ব্র্যান্ডের। অনেক দামি লাইটার।'

সাসাগাকি ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বললো, 'ও তাকে শেষ কবে দেখেছিলো?'

'ভিক্টিম গতকাল দুপুর দুটো কিংবা তিনটা নাগাদ বাসা থেকে বের হয়। কোথায় যাচ্ছে তার কিছুই বলেনি। সে খুব চিন্তিত হয়ে পড়ে যখন দেখে যে ভিক্টিম পরদিন সকালের মধ্যেও বাসায় পৌঁছাচ্ছে না। থানায় ফোন করতে যাবে, এমন সময় তার কাছে লাশ খুঁজে পাওয়ার ফোন যায়।'

'লোকটাকে কেউ ডেকে নিয়েছিলো কি না সে ব্যাপারে খোঁজ নিয়েছেন?'

'মহিলা এ বিষয়ে কিছুই জানে না বলেছে। এমনকি ভিক্টিমের কাছে বাসা থেকে বের হওয়ার আগে কোনো ফোন এসেছিলো কি না তাও বলতে পারছে না।'

'ভিক্টিম বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় অস্বাভাবিক কোনো কিছু লক্ষ করেছিলো নাকি?'

'তেমন কিছুই না।'

চিবুকটা একবার চুলকে নিলো সাসাগাকি। এগুলো দিয়ে কেস আগানো যাবে না। একেবারেই না। 'তার কারো উপর সন্দেহও হয় না, তাই না?'

ভ্রু কুঁচকালো কোবায়াশি, এরপর মাথা ঝাঁকালো।

'এই বিল্ডিং সম্পর্কে কিছু জানে সে?'

'জিজ্ঞেস করেছি বটে। বলেছে ও জানতো এই বিল্ডিংটা এখানে আছে, কিন্তু এই জায়গা কেমন বা বিল্ডিংটা কীরকম সেটা জানতো না। এটাই নাকি তার এখানে প্রথম আসা। এমনকি তার স্বামীকে এই বাড়ি সম্পর্কে কখনো বলতেও শোনেনি সে।'

সাসাগাকি একটা বাঁকা হাসি দিলো। 'বুঝলাম। এদিকে আমরা মনে মনে অনেক কিছুই ভেবে রেখেছি যার কিছুই ঘটেনি দেখছি।'

'দুঃখিত।'

'আরে, মাফ চাওয়ার মতো কিছুই হয়নি।' এরপরেই গোয়েন্দার বুকে হাতের উলটো পিঠ দিয়ে আলতো করে দুটো ঘুসি দিলো সাসাগাকি। 'আমি মহিলাকে তার বাড়িতে ছেড়ে দিয়ে আসছি। আশা করি কোগাকে আমার সাথে ড্রাইভ করতে নিয়ে গেলে রাগ করবেন না?'

'কোনো সমস্যা নেই।'

পেছনের সিটে বসে কোগাকে কিরিহারার বাসার দিকে যেতে আদেশ করলো সাসাগাকি। 'প্রথমে একটু এদিক-সেদিক ঘুরিয়ে নিয়ে যাও, যেন কোথায় যাচ্ছি তার হদিস প্রেসের কাছে চলে না যায়।'

একবার মাথা দুলিয়েই ইগনিশনে চাপ দিলো কোগা।

ইয়েকোর দিকে মুখ ফিরিয়ে নিজের পরিচয় দিলো সাসাগাকি। মহিলা শুধু মাথা নাড়লো। স্পষ্টতই একজন গোয়েন্দার নাম জানার ব্যাপারে কোনো আগ্রহ নেই তার।

'তো আপনার বাড়িতে এখন কেউই নেই?'

'দোকানের দেখাশোনা করার জন্য একটা লোক আছে। আর এতক্ষণে আমার ছেলেও হয়তো স্কুল থেকে ফিরেছে,' গাড়ির মেঝের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে জবাব দিলো ইয়েকো।

'আপনার ছেলেও আছে? বয়স কত?'

'পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ে।'

এর মানে ছেলের বয়স হয়তো দশ কিংবা এগারো হবে। সাসাগাকি আবার ফিরে তাকালো মহিলার দিকে। পুরো দেহটাই মেকআপে ঢাকা। তবুও বোঝা যাচ্ছে যে তার চামড়া বেশ রুক্ষ। কয়েক জায়গায় কোঁচকানো চামড়ার দাগ এখনো ফুটে আছে। তার মতো কারো এই বয়সি বাচ্চা থাকাটা বেমানান না।

'শুনলাম আপনার স্বামী নাকি কিছু না বলেই কালকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছিলেন? এরকম কি প্রায়ই হতো?'

'হ্যাঁ, তবে বেশিরভাগ সময়ই মদ খাওয়ার জন্য এমন করতো সে। গতকালের বিষয়েও আমি তাই ধরে নিয়েছিলাম। সে কারণেই অতটা মাথা ঘামাইনি।'

'আর রাতে বাইরে থাকার বিষয়টা? সেটাও কি হতো নাকি?'

'খুবই অল্প।'

'বাইরে থাকার সময় ফোন করতেন না?'

'খুবই কম। আমি ওকে অনেকবার বলেছি ফোন করতে, কিন্তু সে জবাবে "হ্যাঁ, করবো, করবো" বলেই ভুলে যেত। আমিও সেটার সাথে মানিয়ে চলতে অভ্যস্ত হয়ে গেলাম। কিন্তু তবুও আমি কখনোই...কখনোই কল্পনা করতে পারিনি যে...' হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরলো ইয়েকো।

কিছুক্ষণ চারদিকে ঘোরাঘুরি করার পর ওদের গাড়িটা একটা টেলিফোন পোলের সামনে এসে থামলো। ওখানে একটা সাইনবোর্ডে গলির নাম দেখা যাচ্ছে: ওয়ে-৩। একটা সরু রাস্তা চলে গেছে সামনে। দুপাশে গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে আছে অনেকগুলো বাসাবাড়ি।

'ঐ যে ওটাই।' গাড়ির সামনের গ্লাসের ভেতর দিয়ে ইশারা করে দেখালো কোগা। গাড়ি থেকে প্রায় বিশ মিটার দূরে থাকা কিরিহারা পনশপটা দেখতে পেল সাসাগাকি। রাস্তাটা পুরো খালি। মিডিয়া হয়তো ভিক্টিমের পরিচয় এখনো টের পায়নি।

'আমি মহিলাকে নিয়ে একটু ভেতরে যাবো। তুমি ফিরে যেতে পারো,' গাড়ি থেকে নামার সময় বললো সাসাগাকি।

ঢেউ-খেলানো শাটারটা সাসাগাকির থুতনি পর্যন্ত নামানো। ইয়েকোর পর মাথা নিচু করে ভেতরে ঢুকলো সে। ভেতরে ঢোকার রাস্তার দুই পাশে অনেক কিছুই সাজিয়ে রাখা আছে। মূল ফটকে সোনালি রঙে 'কিরিহারা' নামটি দেখতে পেল সে।

দরজাটায় ধাক্কা দিয়ে ভেতরে ঢুকলো ইয়েকো, আর তার পেছন পেছন সাসাগাকিও।

'হেই, কী খবর?' সামনের কাউন্টারে বসে থাকা লোকটা তাদের দুজনকে ঢুকতে দেখে বলে উঠলো। চল্লিশের আশেপাশে হবে লোকটা। তীক্ষ্ণ চিবুক আর ঘন কালো চুল। চুলগুলো বেশ সুন্দর করে একপাশে ফেলে রেখেছে।

ইয়েকো ছোট্ট করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে একটা চেয়ারে বসে পড়লো। ওটাকে কাস্টমারদের বসার চেয়ার হিসেবে ধরে নিলো সাসাগাকি।

'তারপর?' একবার সাসাগাকি, আরেকবার ইয়েকোর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো লোকটা।

ইয়েকো তার কপালে হাত রেখে বললো, 'ওরই লাশ ছিলো ওটা।'

'কীহ? ওকে আসলেই খুন করা হয়েছে?' লোকটার মুখ কালো হয়ে গেল নিমিষেই। মৃদু স্বরে হ্যাঁ বলে দুবার মাথা দোলালো ইয়েকো।

'আরে বাপরে!' বিস্ময়ে কয়েকবার মাথা ঝাঁকালো লোকটা। এরপর অন্য দিকে তাকিয়ে কয়েকবার চোখ পিটপিট করলো, যেন নিজের চিন্তাগুলো গুছিয়ে নিচ্ছে।

'আমি সাসাগাকি, ওসাকা পুলিশের গোয়েন্দা। আপনার ক্ষতির জন্য দুঃখিত।' সাসাগাকি তার ব্যাজটা দেখালো। 'আপনি এখানেই কাজ করেন?'

'জি, অ্যা...হ্যাঁ, আমি এখানেই কাজ করি।' ড্রয়ার থেকে একটা বিজনেস কার্ড বের করে সাসাগাকির দিকে এগিয়ে দিলো সে।

মাথা ঝুঁকিয়ে কার্ডটা হাতে নিলো সাসাগাকি। লক্ষ করলো লোকটার ডান হাতের কড়ে আঙুলে একটা প্লাটিনামের আংটি রয়েছে। একজন পুরুষের জন্য একটু বেশিই চটকদার হয়ে যায় ব্যাপারটা। কার্ডে লোকটার নাম দেওয়া আছে ইসামু মাতসুরা, কোম্পানির ম্যানেজার।

'আপনি কি এখানে অনেক দিন ধরেই আছেন?' জিজ্ঞেস করলো সাসাগাকি।

'হ্যাঁ, প্রায় পাঁচ বছর ধরে আছি এখানে।'

সাসাগাকির কাছে কেন যেন একে অতটাও লম্বা সময় বলে মনে হলো না। ও আসলে চেয়েছিলো লোকটাকে আগে কোথায় কাজ করতো বা কীভাবে এই চাকরিটা পেয়েছে এগুলো জিজ্ঞেস করতে। কিন্তু পরবর্তী কোনো এক সময়ে এসব প্রশ্ন করা যাবে বলে আর কিছুই বললো না। ওর হয়তো এখানে আবারো আসতে হবে। না...হয়তো একবার না, বেশ কয়েকবার।

'আমি শুনলাম মি. কিরিহারা নাকি গতকাল দুপুরের পরপর বেরিয়ে গেছিলেন?'

'হ্যাঁ, দুইটা ত্রিশ নাগাদ বেরিয়েছিলেন বলেই তো মনে পড়ে।'

'আর উনি কোথায় যাচ্ছেন এ বিষয়ে কিছুই বলে যাননি?'

'নাহ। তিনি আসলে তার নিজের কাজ নিজে করতেই বেশি পছন্দ করতেন। কাজের বিষয়ে আমাদের সাথে খুব কমই আলাপ করতেন।'

'আপনি তার বেরিয়ে যাওয়ার সময় কোনো অস্বাভাবিক কিছু দেখেননি? মানে অন্য রকম কোনো পোশাক পরা, বা এমন কিছু হাতে বহন করা যা কখনো করেন না।'

'না, তা আসলে খেয়াল করিনি তেমন,' মাতসুরা কাঁধ ঝাঁকিয়ে ঘাড়ের দিকে চুলকাতে চুলকাতে বললো। 'তবে এটুকু বুঝেছিলাম যে উনি সময় নিয়ে বেশ চিন্তিত ছিলেন।'

'কীভাবে বুঝলেন?'

'আমার মনে হচ্ছে আমি তাকে কয়েকবার ঘড়ির দিকে তাকাতে দেখেছিলাম। আবার না-ও হতে পারে, হয়তো আমি এখন সেসব কল্পনা করে বলছি।'

সাসাগাকি চারদিকে তাকিয়ে একপলকে দেখে নিলো অফিসটা। যে পাশে মাতসুরা দাঁড়িয়ে আছে, তার পেছনে একটা স্লাইডিং দরজা দেখা যাচ্ছে। খুব শক্ত করে লাগিয়ে রাখা হয়েছে ওটা। মনে হচ্ছে ওটাই বসার ঘর। কাউন্টারের বাম পাশে জুতো রাখার জন্য একটা জায়গা রয়েছে। বাড়ির যে পাশটায় মানুষ থাকে, সেদিকে যাওয়ার রাস্তাতেই পড়ে সেটা। হলওয়ের ভেতরের দিকে যেতেই বাম দিকে একটা দরজা। সম্ভবত কাপড় রাখার জায়গা–যদিও সাসাগাকির কাছে কিছুটা অস্বাভাবিক লাগলো ব্যাপারটা।

'গতকাল কত রাত অবধি খোলা ছিলো অফিস?

'উমমম...' মাতসুরা একবার বড় ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে তারপর বললো, 'সচরাচর আমরা ছয়টা বাজেই বন্ধ করি, কিন্তু গতকাল সাতটা কিংবা তার আশেপাশের মধ্যে আমাদের নির্ধারিত কাজ শেষ করতে উঠতে পারিনি।'

'আপনিই কি একমাত্র ব্যক্তি যে এ সকল কাজ দেখাশোনা করেন?'

'হ্যাঁ, বলতে গেলে বস বাইরে থাকলে অনেকটা আমাকেই দেখতে হয়।'

'তো কাল অফিস বন্ধ করার পরে কী করেছিলেন?'

'বাসায় চলে গেছিলাম।

'বাসা কোথায় আপনার?'

'টেরাডাকোর কাছে।'

'বেশ দূরে এখান থেকে। তো আপনি কি গাড়িতে আসেন?'

'না, আমি ট্রেনে যাতায়াত করি।' ট্রেনের সময় পরিবর্তন করার হিসাব করলে কমপক্ষে আধা ঘণ্টা সময় লাগবে। *এই লোক যদি সাতটা বাজে রওয়ানা দেয়, তবে অন্তত রাত আটটার মধ্যেই তার বাড়ি পৌঁছে যাওয়ার কথা*, ভাবলো সাসাগাকি।

'পরিবারে কেউ আছে আপনার, মি. মাতসুরা?'

'না। ছয় বছর আগে আমার ডিভোর্স হয়েছে। আমি একাই থাকি এরপর থেকে। একটা অ্যাপার্টমেন্ট আছে আমার।'

'গতকালও বাসায় যাওয়ার পরে আপনি একা ছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

কোনো অ্যালিবাই[২] নেই তার, সাসাগাকি মনে মনে টুকে রাখলো বিষয়টা। কিন্তু চেহারায় কোনো ছাপ পড়তে দিলো না।

'তো আপনি তেমন একটা দেখাশোনা করেন না এসব?' ইয়েকোর দিকে ফিরে প্রশ্নটা করলো সাসাগাকি। ইয়েকো তখনো সোফায় বসে কপালে হাত দিয়ে রেখেছে।

'এই ব্যবসা সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণাও নেই আমার,' খুব চিকন স্বরে জবাব দিলো সে।

'আপনি গতকাল বাইরে ছিলেন?'

'না, আমি সারা দিন বাড়িতেই ছিলাম।'

'কোনো কিছুর জন্যই বাইরে বের হননি? কিছু কেনাকাটা করতেও না?'

মাথা ঝাঁকালো সে। একটু কষ্ট করে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'আপনি কিছু মনে না করলে আমি একটু ঘুমাতে চাই। বসে থাকতেও বেশ কষ্ট হচ্ছে আমার।'

'অবশ্যই, আপনি যেতে পারেন।'

বলার সাথে সাথে কিছুটা হুমড়ি খেয়ে জুতোটা খুলে ফেললো ইয়েকো। তারপর বাম দিকের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলো। সাসাগাকি একটা সিঁড়ি দেখতে পেল সেই দরজার ওপাশে। *একটা রহস্য উন্মোচিত হলো*, ভাবলো সে।

ওপাশে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিলো ইয়েকো। সিঁড়িতে ইয়েকোর প্রত্যেকটা পদধ্বনি পাচ্ছে সাসাগাকি। যখন আর কোনো শব্দ পেল না, তখন মাতসুরার দিকে কিছুটা এগিয়ে গেল সে। জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি কখন শুনতে পেলেন যে মি. কিরিহারা রাতে বাসায় ফেরেননি? সকালেই শুনেছেন?'

'হ্যাঁ, আমি আর তার স্ত্রী চিন্তিত ছিলাম। আর তখনই ফোনটা এলো।'

'বেশ বড়সড়ো একটা ধাক্কা খেয়েছিলেন নিশ্চয়ই?'

'অবশ্যই! সত্যটা তো বলেছিই আপনাকে। আমার তো এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না। মানে বসকে কে খুন করবে? কেউ কি ভুল করে করলো?'

'কাউকে সন্দেহ হয় না?'

'কাউকেই না।'

'এ সকল ব্যবসায় আপনাদের অনেক রকমের কাস্টমার হয়ে থাকে। আপনি নিশ্চিত যে তাদের মধ্য থেকে কেউ করেনি এটা? মানে টাকা-পয়সার জন্য অন্তত?'

'হ্যাঁ, আমাদের কিছু অস্বাভাবিক কাস্টমার রয়েছে—এটা সত্য। দিনশেষে মানুষ আমাদের ঘাড়েই দোষ চাপায়, অথচ আমরাই ওদের টাকা ধার দিয়ে সাহায্য করি। কিন্তু ওদের মাঝে কেউ খুন করবে বলে মনে হয় না।' মাতসুরা তার মাথাটা খানিকক্ষণ ঝাঁকালো, তারপর আবার বলতে শুরু করলো, 'আমি আসলে বুঝতেই পারছি না যে কেউ কেন এমনটা করবে।'

'আমি বুঝতে পারছি আপনি আপনার কাস্টমারদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেই এসব বলছেন। কিন্তু তদন্তের জন্য ছোটখাটো যেকোনো সম্ভাবনাও আমাদের কাছে বেশ গুরুত্বপূর্ণ। তা আপনার সাম্প্রতিক কাস্টমারদের লিস্টটা আমাকে একটু দেখাবেন?'

হালকা করে ভ্রু কুঁচকালো মাতসুরা। 'লিস্ট?'

'নিশ্চয়ই আপনারা কোথাও লিখে রেখেছেন, নয়তো ঋণ কীভাবে দেবেন? যিনি ধার নেবেন, তার ডিটেইলস তো অবশ্যই টুকে রেখেছেন কোথাও না কোথাও।'

'হ্যাঁ, সে তো আমাদের খতিয়ান বইতেই লেখা আছে।'

'আমাকে একপলক দেখতে দেওয়া যাবে? আমি এটা থানায় নিয়ে গিয়ে একটা কপি করে রাখবো। তারপর আবার ফেরত দিয়ে যাবো। কথা দিচ্ছি, কেউ এ বিষয়ে জানতেও পারবে না। আমাদের মাঝেই থাকবে বিষয়টা।'

'আমি আসলে বুঝতে পারছি না যে আমি এটা দিতে পারবো কি না...'

'আমার অপেক্ষা করতে সমস্যা নেই। আপনি মিসেস কিরিহারার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে আসতে পারেন।'

মাতসুরা একটু থমকে গেল যেন। তারপর মাথা দুলিয়ে বললো, 'আচ্ছা, ঠিক আছে। আমি আপনাকে এটা দিচ্ছি, কিন্তু সাবধান, কেউ যেন জানতে না পারে। ঠিক আছে?'

'ধন্যবাদ। আর আপনি নিশ্চিত যে তার অনুমতি লাগবে না এর জন্য?'

'সমস্যা নেই। আমি তাকে পরে জানিয়ে দেবো। এর জন্য বসের কাছে ঝামেলায় পড়তে হবে বলে মনে হয় না।' মাতসুরা তার চেয়ারটাকে নব্বই ডিগ্রি এঙ্গেলে ঘুরিয়ে হাঁটুর পাশে থাকা একটা ড্রয়ার খুললো। সাসাগাকি দেখলো কিছু মোটা ফাইল ড্রয়ারের একদম শেষ দিকে রাখা। একটু এগিয়ে এসে উঁকি দিয়ে দেখতে যাবে, এমন সময় চোখের কোনা দিয়ে দেখলো সিঁড়িতে যাওয়ার দরজাটা হঠাৎ খুলে গেছে। জমে গেল সাসাগাকি।

একটা দশ বছরের ছেলে দাঁড়িয়ে আছে দরজার ওপাশে। হ্যাংলা-পাতলা গড়নের। পরনে সোয়েটশার্ট আর জিন্স। সাসাগাকি ছেলেটার আসার কোনো শব্দ পায়নি, এমনকি সিঁড়িতে নামার ফলে যে শব্দ হয় তাও না। যখন ওদের দুজনের

চোখে চোখ পড়লো, ছেলেটার গভীর দৃষ্টি সাসাগাকিকে একবার ঢোক গিলতে বাধ্য করলো।

'তুমিই মি. কিরিহারার ছেলে?' জিজ্ঞেস করলো সে।

ছেলেটা কোনো জবাব দিলো না। মাতসুরা ওদিকে তাকিয়ে বললো, 'হ্যাঁ, উনারই ছেলে।'

কোনো সাড়াশব্দ ছাড়াই বাইরে কোথাও যাওয়ার জন্য জুতো পরছে ছেলেটা। তার চেহারায় কোনো কিছুরই ছাপ নেই।

'কোথায় যাচ্ছো, রিও?' জিজ্ঞেস করলো মাতসুরা। 'এই সময়ে বাড়িতে থাকা উচিত তোমার।'

কোনো রকম জবাব না দিয়ে সোজা বাড়ির বাইরে বেরিয়ে গেল ছেলেটা।

'বেচারা, ভাবতে পারছি না কতটা ভয়াবহ অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে,' বললো সাসাগাকি।

'হুঁ,' মাতসুরা বলে উঠলো। 'এমনকি এরকম বাচ্চাদের জন্যও ব্যাপারটা খুবই কষ্টদায়ক।'

'এরকম বাচ্চা বলতে?

'আসলে ব্যাখ্যা দেওয়াটা বেশ কঠিন,' ড্রয়ার থেকে একটা ফাইল বের করে সাসাগাকির সামনে রাখতে রাখতে বললো মাতসুরা। 'এই যে নিন, সর্বশেষ এটাই আছে।'

'ধন্যবাদ।' সাসাগাকি মোটা পৃষ্ঠাগুলো উলটিয়ে বিভিন্ন নারী-পুরুষের নাম দেখতে পেলেও তার মাথায় বসত গেড়েছে ছেলেটার সেই গভীর দুটো চোখ।

***

দুপুরের কিছু পরেই হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টে চলে এলো ময়নাতদন্তের রিপোর্ট। মৃত্যুর সময় এবং কারণ–দুটোই ডাক্তার মাতসুনোর বলা কথার সাথে মিলে গেছে। তবে পেটের ভেতর যা যা পাওয়া গেছে, সেগুলোর বিবরণ দেখে সাসাগাকি একটু থমকে গেল। লোকটার পেটের ভেতর হজম না হওয়া কিছু বাজরা, পেঁয়াজ আর হেরিং-জাতীয় মাছের তরকারি পাওয়া গেছে, যা মৃত্যুর দুই থেকে আড়াই ঘণ্টা আগে খেয়েছিলো সে।

'কথাটা সত্যি হলে বেল্টের বিষয়ে কী ধরে নেবো?' নাকাতসুকার উদ্দেশে বললো সাসাগাকি। ওর পাশেই বসে আছে সে।

'বেল্ট?'

'ঐ লোক তার বেল্ট সাধারণত যেখানে পরে, তার চেয়ে দুটো ফুটো পিছিয়ে ঢোলা করে পরেছিলো। যেমনটা আপনি খাওয়ার সময় করে থাকেন। কিন্তু তখন তো খাওয়ার দুই ঘণ্টা পার হয়ে গেছিলো। তার কি আবার ওটা টাইট করার কথা না?'

কাঁধ ঝাঁকালো নাকাতসুকা। তারপর বললো, 'আমার মনে হয় না এটা অতটা গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয়। হয়তো ভুলে গেছিলো।'

'এটাই তো সমস্যা। তার মতো একটা মানুষ যদি বেল্ট ওরকম ঢিলা রেখে হাঁটে, তবে প্যান্ট খুলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে,' বলে উঠলো সাসাগাকি।

ময়নাতদন্তের রিপোর্টটার দিকে তাকিয়ে নাকাতসুকার ভ্রূদুটো কুঁচকে গেল। তারপর একটু থেমে জিজ্ঞেস করলো, 'তো তুমি কী ভাবছো? লোকটা বেল্ট ঢিলা করেছিলো কেন?'

সাসাগাকি রুমের চারপাশটা একবার দেখে নিয়ে নাকাতসুকার কাছাকাছি এসে বললো, 'কারণ ভিক্টিমের কোনো একটা কারবার ছিলো ওখানে, যার কারণে প্যান্ট ঢোলা করতে হয়েছিলো ওকে। কাজ শেষে সচরাচর যে ফুটোটায় হুকটা লাগায়, সেটায় লাগাতে ব্যর্থ হয়। তবে আমি এটা জানি না যে এই কাজটা সে করেছিলো নাকি হত্যাকারী নিজে।'

নাকাতসুকা বোকার মতো উপরে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কোন কারবারের জন্য প্যান্ট ঢিলা করবে?'

'আহহা...ভাবুন একবার। লোকটা তার প্যান্ট খুলেছিলো,' দাঁতালো হাসি দিয়ে বললো সাসাগাকি।

নাকাতসুকা বসে থেকে চেয়ারে হেলান দিয়ে ছিলো এতক্ষণ। কথাটা শুনেই সামনে ঝুঁকে এসে বললো, 'তুমি বলতে চাইছো এরকম একটা লোক ওরকম নোংরা পরিবেশে যাবে শুধু কোনো মেয়ের ওসব চাপতে?'

'আমি অবশ্য বলিনি এটাই একমাত্র ব্যাখ্যা,' চটজলদি জবাব দিলো সাসাগাকি।

নাকাতসুকা এমনভাবে হাতটা নাড়ালো যেন সে মাছি তাড়াচ্ছে। তারপর তাচ্ছিল্যের সুরে বললো, 'খুবই চমৎকার গল্প। তবে আমার মনে হয় তুমি তোমার প্রমাণের থেকে বেশি ধারণা করে ফেলছো। ভিক্টিম হত্যার পূর্বে কোথায় ছিলো এটা বের করা উচিত আমাদের। তার পেটের মধ্যে বাজরা পাওয়া গেছে, তাই না? সোবা নুডলসে ঐটা থাকে। তাহলে যাও, সোবা নুডলস বিক্রি করে এমন স্থানীয় কিছু খাবারের দোকানে খুঁজে দেখো।'

'ইয়েস, স্যার।' বলেই রুম থেকে বেরিয়ে গেল সাসাগাকি।

***

ইওসুকে কিরিহারা কোন দোকানে খেয়েছিলো এটা বের করতে খুব বেশি একটা সময় লাগেনি। ট্রেন স্টেশনের কাছেই থাকা শপিং স্ট্রিটে সাগানয়া নামক একটা জায়গা আছে। ইয়েকোর মতে, ওখানে বেশ যাতায়াত করতো সে। তারপর একজন গোয়েন্দা ঐ দোকানে গিয়ে একজন সাক্ষী খুঁজে পায়। ঐ সাক্ষী মি. কিরিহারাকে বিকাল চারটা নাগাদ ওখানে হেরিং সোবা খেতে দেখেছিলো। খাওয়ার

সময়কে বিবেচনা করে ধরা যায় যে ভিক্টিম সন্ধ্যা ছয়টা কিংবা সাতটার দিকে খুন হয়েছে। তার মানে ওদের কাজ হলো বিকাল পাঁচটা থেকে রাত আটটার মধ্যের সময়টাতে কে কী করছিলো তা খুঁজে বের করা।

এছাড়াও ইয়েকো আর মাতসুরা বলেছিলো যে ভিক্টিম আড়াইটা নাগাদ পনশপ থেকে বেরিয়ে গেছিলো। কিন্তু দেখা যাচ্ছে পনশপ থেকে সাগানয়া আসতে ভিক্টিমের লেগেছিলো ঘন্টাখানেকের মতো সময়, অথচ খুব ধীরে হাঁটলেও সর্বোচ্চ দশ মিনিট লাগবে সেখানে যেতে।

এই প্রশ্নের উত্তরটা অবশ্য সোমবার দিন পাওয়া গেল। সেদিন স্থানীয় স্যানকিও ব্যাংকের শাখা থেকে একজন নারী কর্মকর্তা ফোন করে পুলিশের কাছে। জানায় যে মি. কিরিহারা ব্যাংক বন্ধ হওয়ার খানিকটা আগে ব্যাংকে গেছিলো সেদিন।

খবরটা শুনে স্টেশনের দক্ষিণ দিকের রাস্তা ধরে ব্যাংকের উদ্দেশে চলে গেল সাসাগাকি আর কোগা। যে ফোন করেছিলো সে ওখানকার ক্যাশিয়ার। গোলগাল চেহারার একটা মেয়ে। একধরনের উৎফুল্লতা আছে ওর মধ্যে। ব্যাংকের একটা মিটিং টেবিলে গোয়েন্দাদের সাথে বসলো মেয়েটা। ওখানে মূলত ব্যাংকের গ্রাহকদের সাথে আলোচনা করা হয়। পুরো ব্যাংকের থেকে কিছুটা আলাদা করে তৈরি করা হয়েছে রুমটা।

'আমি যখন পত্রিকায় নামটা দেখলাম, তখন বেশ আশ্চর্য হয়েছিলাম। ভাবছিলাম, আমি যে কিরিহারাকে চিনি এটা সেই কিরিহারা কি না। ফলে আমি আরেকবার চেক করি। এরপরেই আমার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার থেকে অনুমতি নিয়ে আপনাদেরকে ফোন করি,' টানটান হয়ে চেয়ারে বসে কথাগুলো বললো মেয়েটা।

'মি. কিরিহারা ঠিক কটা নাগাদ এসেছিলেন?' জিজ্ঞেস করলো সাসাগাকি।

'তিনটার কিছু আগে।'

'কী করতে এসেছিলেন মূলত?'

এখানে কিছুটা থেমে গেল মেয়েটা। কাস্টমারের তথ্য প্রকাশ করা উচিত হবে কি না ভেবে পাচ্ছে না বোধহয়। তারপর থেমে বললো, 'উনি আসলে একটা চলতি একাউন্ট বন্ধ করতে এবং সেখানে থাকা সব টাকা উঠাতে এসেছিলেন।'

'কত টাকা?'

মেয়েটা আবার একটু থতমত খেলো। জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিলো এবার। পাশেই বসে আছে তার বস। তার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বললো, 'এক মিলিয়ন ইয়েন।'

ছানাবড়া হয়ে গেল সাসাগাকির চোখ। সাথে নিয়ে ঘোরার মতো সামান্য টাকা না এটা।

'উনি কি টাকাগুলো কোথায় ব্যবহার করবেন তার কিছু বলেছেন?'

'জি না। দুঃখিত, এসবের কিছুই বলেননি।'

'উনি টাকাগুলো নেওয়ার পর কী করলেন? মানে কীসের ভেতর নিয়েছিলেন?'

'আমি এতটুকুই জানি যে আমি তাকে ব্যাংকের একটা খামে করে পুরো টাকাটা দিয়ে দিয়েছিলাম। এছাড়া...' থেমে গেল সে। কিছু একটা মনে করতে লাগলো যেন।

'মি. কিরিহারা কি প্রায়ই এরকমটা করতেন, টাকা উঠিয়ে নিয়ে একাউন্ট বন্ধ করে দিতেন?'

'না, আমার জানামতে অন্তত না। গত বছরের শেষ সময় থেকে আমি তার একাউন্ট পরিচালনা করছি।'

'টাকা উঠিয়ে নেওয়ার পর তার অবস্থা কেমন ছিলো? উনি কি কোনো বিষয়ে দুশ্চিন্তা করছিলেন, অথবা উত্তেজিত থাকার কোনো নমুনা দেখেছিলেন তার মধ্যে?'

আবারো থেমে গেল মেয়েটা। ভ্রুকুটি করে বললো, 'তাকে অতটা বিক্ষিপ্ত দেখায়নি। বরং আমার মনে আছে উনি বলেছিলেন যে আরেকটা ডিপোজিট খোলার জন্য আসবেন পরে।'

***

হেডকোয়ার্টারে রিপোর্ট করার পর কোগা আর সাসাগাকি আরেকবার পনশপে যাওয়ার জন্য রওয়ানা দিলো। টাকার বিষয়টা ইয়েকো আর মাতসুরা আসলেই জানে কি না সে বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে হবে। কিন্তু ওদেরকে অনেক দূরেই থেমে যেতে হলো; শোকার্ত মানুষের ভিড়ে দোকানের দেখা পাওয়াই কষ্ট হয়ে গেছে।

'আহ...মনেই ছিলো না। আজ তো অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দিন,' একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো সাসাগাকি।

দূর থেকেই দোকানটা দেখতে লাগলো তারা দুজন। দরজার ঠিক সামনেই দাঁড়িয়ে আছে ইয়েকো। আর তার পেছনেই রয়েছে পুরো শবযাত্রার দলটি। তার চেহারায় যে ছাপটা এখন রয়েছে সেটা সাসাগাকির প্রথম দেখার মতো একদমই নয়। মহিলাকে আগের চেয়ে ছোটখাটো দেখাচ্ছে, সেই সাথে কেন যেন আরো মোহনীয় লাগছে। *শোকার্ত বিধবার ভেতর থেকে বিচ্ছুরিত হওয়া অদ্ভুত এক মোহ*, ভাবলো সাসাগাকি।

ইয়েকোকে দেখে মনে হচ্ছে কিমোনো[৩] পরতে সে অভ্যস্ত। এমনকি প্রত্যেকটা পা-ও হিসাব করেই ফেলছে যাতে তাকে আরেকটু ভালো দেখায়। *যদি এই মহিলা সুন্দরী বিধবার চরিত্রে অভিনয় করার চেষ্টা করে থাকে, তবে সত্যিই দারুণ করছে।* ওদের তদন্ত অবশ্য ইতোমধ্যেই পরিষ্কার করে দিয়েছে যে এর আগে কিতাশিনচি শহরের একটা নাইটক্লাবে কাজ করতো ইয়েকো।

মহিলার পেছনে তার ছেলেকে দেখা গেল, তার বাবার একটা ফ্রেম করা ছবি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ছেলেটার নাম মনে পড়লো সাসাগাকির: রিও। ছেলেটার সাথে ওর এখনো কথা বলা বাকি আছে। রিওর চেহারায় এখনো সেই

শূন্যতা কাজ করছে যেটা সাসাগাকি সেদিন দেখেছিলো। দুই চোখের কোটরে কোনো রকম আবেগ কাজ করছে না। মনে হচ্ছে চোখগুলো কাচের তৈরি। আর এই কাচের চোখদুটো এই মুহূর্তে একটাই কাজ করছে; তার মায়ের পাদুটোকে একদম মেপে মেপে অনুসরণ করছে।

দুই গোয়েন্দা সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করলো পুনরায় পনশপে যাওয়ার জন্য। ওরা যতক্ষণে পৌঁছালো, ততক্ষণে দোকানের শাটার অর্ধেকটা নেমে এসেছে। ভেতরে ঢুকতেই দেখলো গেট বন্ধ। কলিং বেল বাজালো সাসাগাকি। বাইরে থেকেই শুনতে পেল ভেতরে কলিংবেলটা মৃদু শব্দে বাজছে।

'ওরা কি বের হয়ে গেছে?' জিজ্ঞেস করলো কোগা। 'যদি তাই হতো, তবে কি পুরো শাটারটা বন্ধ করে যেত না?' অবশেষে দরজা খোলার শব্দ শুনতে পেল ওরা। দরজাটা ধীরে ধীরে অল্প একটু খুলে যেতেই মাতসুরার মাথাটা দেখতে পেল সাসাগাকি।

লোকটা মাথা বের করে বললো, 'ওহ, আপনারা!'

'আমাদের কিছু ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করার ছিলো। এখন এলে কি কোনো সমস্যা আছে?' জিজ্ঞেস করলো সাসাগাকি।

'দাঁড়ান, মিসেস কিরিহারাকে জিজ্ঞেস করে আসি। এখনই আসছি।' বলেই দরজাটা লাগিয়ে দিলো সে।

সাসাগাকি আর কোগা দুজন দুজনের দিকে একবার দৃষ্টি ফিরিয়ে আবার অপেক্ষা করতে লাগলো।

দরজাটা আরো কিছুক্ষণ বন্ধ থাকার পরে মাতসুরা ফিরে এসে দরজা খুলে দিয়ে ওদেরকে ভেতরে আসার জন্য অনুরোধ করলো। সাসাগাকিই প্রথমে ঢুকলো ঘরে। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ফলে যে একটা কটু গন্ধ বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছিলো তা টের পেতে সময় লাগলো না ওর।

'অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ঠিকঠাক হয়েছিলো?' জিজ্ঞেস করলো সাসাগাকি। সে সময় মাতসুরাকে ভিড়ের মাঝখানে লাশের পাশে দেখেছিলো সে।

'হ্যাঁ, কোনোরকমে হয়ে গেছে আর কি। যদিও কিছুটা ক্লান্ত আমি এখন,' মাথার পেছনের চুল ঠিক করতে করতে বললো সে। তার পরনে এখনো কালো স্যুটটা রয়ে গেছে। যদিও টাই খুলে ফেলেছে এরমধ্যে। শার্টের উপরের দিকের দুটো বোতাম খোলা আছে এখন।

কাউন্টারের পেছনের দরজাটা হালকা খুলতেই ইয়েকো প্রবেশ করলো ঘরে। শোকসভায় পরা পোশাক পালটে আকাশি রঙের একটা পোশাক পরেছে সে। চুলগুলোও ছেড়ে দিয়েছে।

'দুঃখিত এমন একটা দিনে আপনাকে বিরক্ত করার জন্য,' বললো সাসাগাকি।

মাথা দোলালো মহিলা। বললো, 'কিছু পেয়েছেন?'

'আমরা এখনো তথ্য একত্র করছি। আসলে সে কারণেই আপনার কাছে কিছু বিষয়ে একটু জিজ্ঞেস করতে এসেছি আমরা। যদি আপনি কিছু মনে না করেন–' সাসাগাকি সামনের দরজাটার দিকে ইশারা করে দেখালো–'তবে আমিও একটু ধূপ জ্বালিয়ে দিতে চাচ্ছি। বুদ্ধদেবকে তার পাওনা বুঝিয়ে দেওয়ার সুযোগটা কাজে লাগাতে চাচ্ছি আর কি।'

ইয়েকো প্রথমে কিছুটা চমকে উঠে মাতসুরার দিকে তাকালো একপলক। এরপরে বললো, 'অবশ্যই, আমি কিছু মনে করবো না।'

'ধন্যবাদ, আমি এই যাবো আর আসবো।' সাসাগাকি তার জুতোটা খুলে কাউন্টারের পেছন দিয়ে পাশের ঘরে যাওয়ার জন্য রওয়ানা দিলো। যাওয়ার পথে সেই দরজার দিকে চোখ বুলিয়ে নিলো একবার যেটার পেছনে উপরে যাওয়ার সিঁড়িটা রয়েছে। দরজাটায় বাইরে থেকে ছোট একটা খিল দিয়ে লক করার মতো সিস্টেম রয়েছে যাতে অপর পাশ থেকে কেউ খুলতে না পারে।

'প্রশ্নটা অস্বাভাবিক লাগতে পারে,' সাসাগাকি বলে উঠলো। 'কিন্তু জিজ্ঞেস করতেই হচ্ছে। দরজাটায় এরকম লক রাখার কোনো বিশেষ কারণ আছে নাকি?'

'ওহ, এটা,' ইয়েকো বললো। 'এটা আসলে ছাদ থেকে কোনো চোর বা ডাকাত রাতের বেলা যেন নিচে নেমে আসতে না পারে তার জন্য দেওয়া।'

'ছাদ থেকে মানে?'

'আসলে এই এলাকার বাড়িগুলো বেশ ছোট ছোট আর একটার সাথে আরেকটা লাগানো। যার কারণে এক ছাদ থেকে আরেক ছাদে যেতে খুব বেশি একটা সমস্যা হয় না কারো। কাছাকাছি একটা ঘড়ির দোকানে এরকম হওয়ায় আমার স্বামী এই লক সিস্টেম করিয়ে রেখেছিলো।'

'তাহলে ধরে নেওয়া যায় যে উপরের তলায় তেমন কোনো দামি জিনিসপাতি নেই, তাই তো?'

'আসলে নিচ তলাটাই মূলত আমাদের জন্য নিরাপদ,' পেছন থেকে মাতসুরা বলে উঠলো। 'আর আমাদের কাস্টমারদের সবকিছু আমরা এখানেই রাখি।'

'তার মানে উপরের তলায় রাতে কেউ থাকে না?'

'জি না, আমরা রাতে নিচ তলাতেই থাকি,' মহিলা জবাব দিলো।

'বুঝলাম,' চিবুকে হালকা হাত বোলাতে বোলাতে বললো সাসাগাকি। 'আর এটা সব সময় সন্ধ্যার দিকেই আপনি লক করে রাখেন?'

'ওহ, দুঃখিত,' ইয়েকো তার পেছন থেকে এসে পাশ থেকে লক খুলতে খুলতে বললো, 'আমি অভ্যাসবশত আগেই লক করে ফেলেছিলাম।'

এর মানে এখন কেউ উপরের তলায় নেই, ভাবলো সাসাগাকি। এরপর কাউন্টারের পেছনে থাকা স্লাইডিং ডোরটা খুলে ফেললো। খুলতেই একটা রুম চোখে পড়লো, মেঝেতে তাতামি মাদুর বিছানো। ওপাশে আরেকটা স্লাইডিং ডোর

দেখা যাচ্ছে, যার অর্থ সেই রুমের পেছনে আরেকটা রুম আছে। *নিচ তলার বেডরুম*, ভাবলো সাসাগাকি। ওর মনে হয় ওটা কেবল ঘুমানোর জন্যই রেখেছে ওরা। কারণ রিও নামের বাচ্চাটাও ঐ রুমেই থাকে মনে হচ্ছে।

পূজা করার বেদিটা ঘরের পশ্চিম দিকে বানানো হয়েছে। ইওসুকে কিরিহারার অল্প বয়সের একটা ছবি রাখা আছে সেখানে। একটা ধূপকাঠি উঠিয়ে ছবিটার সামনে থাকা ট্রে-তে রেখে দিলো সাসাগাকি। দুহাত একত্র করে ছবিটার সামনে বসে চোখ বন্ধ করে রাখলো পুরো দশ মিনিটের মতো। ইয়েকো চা নিয়ে এলে সাসাগাকি বসে থাকা অবস্থাতেই একটু সামনের দিকে ঝুঁকলো চা নেওয়ার জন্য। পাশ থেকে কোগাও তার চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে নিলো। চায়ে চুমুক দিতে দিতে সাসাগাকি ইয়েকোকে জিজ্ঞেস করলো যে তার স্বামীর মৃত্যুর পর থেকে আজ পর্যন্ত এই কেসের সাথে সম্পর্কিত কিছু ঘটেছে কি না। জবাবে দ্রুত মাথা ঝাঁকালো সে। মাতসুরাও চুপচাপ বসে রইলো নিজের জায়গায়।

এরপরেই কিরিহারা যে ব্যাংক থেকে এক মিলিয়ন ইয়েন উঠিয়েছিলো সেই ব্যাপারটা বললো সাসাগাকি। কথাটা শুনে দুজনেই যথেষ্ট চমকে উঠলো।

'ও তো আমাকে এতগুলো টাকার বিষয়ে কিছুই বলেনি!' বলে উঠলো ইয়েকো।

'আমিও এ বিষয়ে তেমন কিছুই শুনিনি,' মাতসুরাও বলে উঠলো একই সাথে। 'বস নিজেই এসব জিনিস সামলাতেন। তবে এত বড় একটা এমাউন্টের বিষয়ে আমাদেরকে কিছু না কিছু তো বলার কথা।'

'আপনার স্বামী কি কোনো রকম বিনোদনের পেছনে টাকা-পয়সা উড়াতেন? এই ধরুন খুব দামি কিছু, মানে জুয়া-টুয়া আর কি।'

'নাহ,' ইয়েকো তৎক্ষণাৎ আত্মবিশ্বাসের সাথে বলে উঠলো। 'ও কখনোই জুয়া খেলেনি। এমনকি তার কোনো শখের কথাও সে কখনো মুখ ফুটে বলেনি।'

'কাজই তার একমাত্র শখ ছিলো,' মাতসুরা আরেকটু যোগ করলো তার সাথে।

'আচ্ছা, তাহলে...' পরের প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করার আগে একটু থামলো সাসাগাকি। এরপর থেমে থেমে বললো, 'অন্য কোনো রকমের...বিনোদনে জড়িয়েছিলেন নাকি?'

'কী বলতে চাচ্ছেন?' সাসাগাকির দিকে চোখ উলটে তাকালো ইয়েকো।

'মানে বলতে চাইছি নারীঘটিত কোনো বিষয় আছে কি না এর মধ্যে। উনি কি কোনো ক্লাব বা এরকম জায়গায় যেতেন?'

হালকা মাথা দোলালো ইয়েকো; বুঝতে পেরেছে প্রশ্নটা কীসের ব্যাপারে করেছে গোয়েন্দা। এদিকে সাসাগাকি ভেবেছিলো মহিলা হয়তো ক্ষেপে যাবে, কিন্তু তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া এলো না।

'আমার মনে হয় না নারীঘটিত কোনো বিষয়ে জড়িত ছিলো সে। আপনি যদি এটাই বুঝিয়ে থাকেন, তবে বলে রাখা ভালো যে এরকম করার মতো মানুষ ছিলো না সে,' শীতল স্বরে বললো ইয়েকো। তার বলার ভঙ্গিতে মনে হচ্ছিলো সে এ বিষয়ে শতভাগ নিশ্চিত।

'তার মানে আপনি তাকে বিশ্বাস করতেন। ঘুরিয়ে বলতে গেলে এটাই তো মানে দাঁড়াচ্ছে, তাই না?'

'আমি তা বলিনি...' মেঝের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে কথাটা বললো মহিলা। তার স্বরটা নিচু হচ্ছে ধীরে ধীরে।

সাসাগাকি যাওয়ার আগে আরো কিছু প্রশ্ন করে তারপর উঠলো। খালি হাতে ফিরে যাওয়াটা পছন্দ হচ্ছে না ওর, কিন্তু এখানে এমন কিছুই নেই যা তার কাজে আসতে পারে।

জুতো পরতে পরতে খেয়াল করলো সিঁড়িঘরের দরজার একপাশে এক জোড়া স্নিকার্স রাখা। *নির্ঘাত রিওর জুতো। তার মানে সে বাড়িতে এসেছে...*

দরজাটার দিকে একপলক তাকালো সাসাগাকি। ভাবছে ছেলেটা একা একা উপরে বসে কী করছে এখন।

***

ধীরে ধীরে তদন্তের মাধ্যমে প্রকাশ পেতে থাকে যে মি. কিরিহারা তার হত্যার দিন দুপুরবেলা কোন পথ দিয়ে গেছিলো। এটা নিশ্চিত যে দুপুর আড়াইটা নাগাদ বাড়ি থেকে ব্যাংকের উদ্দেশে রওয়ানা দিয়েছিলো ভদ্রলোক। ব্যাংক থেকে এক মিলিয়ন ইয়েন উঠিয়ে নিয়ে সাগানয়ার সেই রাস্তায় গিয়ে হেরিং সোবা নুডলস খায়। আর চারটার পরপর বেরিয়ে যায় সাগানয়া থেকে।

এরপর কী ঘটেছিলো সেটাই এখন অজানা। সেই দোকানের এক কর্মী অবশ্য বলেছে যে সে কিরিহারাকে স্টেশন থেকে দূরে সরে যেতে দেখেছে। যদি সে ট্রেনে উঠার জন্য স্টেশনে না গিয়ে থাকে, তবে তার সেখানে যাওয়ার বড় একটা কারণ হতে পারে সেই টাকা।

ইনভেস্টিগেশন টিম দুটো এলাকায় আলাদা আলাদা করে তদন্ত প্রক্রিয়া চালাতে শুরু করে। সেই স্টেশনের কাছে একটা, আর যেই বিল্ডিংয়ে কিরিহারা মারা গেছিলো সেখানে আরেকটা। স্টেশনের টিমটাই প্রথমে বিষয়টা উদ্ধার করতে পারলো। কিরিহারার মতো দেখতে এক কাস্টমারকে নাকি সেদিন ওখানকার হারমোনি নামের এক কেকের দোকানে দেখা গেছে। সেই দোকানদারকে নাকি কিরিহারা জিজ্ঞেস করেছে 'অনেক বেশি ফল মেশানো ঐ পুডিংটা' আছে কি না। দোকানির ভাষায় যেটাকে আ লা মোড পুডিং বলা হয়ে থাকে। দুর্ভাগ্যবশত, সেদিন সেই দোকানে আ লা মোড শেষ হয়ে গেছিলো। এরপর কিরিহারা জানতে চায় ওখানে এমন আর কোনো দোকান আছে কি না যেখানে এরকম পুডিং পাওয়া যায়।

সেই দোকানি তাকে লোকেশন ম্যাপে একই নামের আরেকটা শাখার ঠিকানা দেখিয়ে দেয় এরপর।

'ঠিক আছে, তবে আমি এদিকটাতেই যাবো,' কিরিহারাকে বলতে শুনেছিলো দোকানি। 'আমার আরো আগে জিজ্ঞেস করা উচিত ছিলো। ধন্যবাদ।'

অন্য হারমোনি দোকানটা পশ্চিম ওয়ে এলাকার ছয় নাম্বার রাস্তায় ছিলো। সেখানে গিয়ে জানা যায় যে কিরিহারার মতো দেখতে একটা লোক সেদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্বে সেখানে গেছিলো। তিনটা আ লা মোড পুডিং কিনেছিলো সে। তবে সেই দোকানি আসলে জানতো না লোকটা কেন ওগুলো কিনেছে, এমনকি সে এরপরে কোথায় চলে গেছিলো তাও সে বলতে পারেনি।

পুডিং কেনার বিষয়টা দুটো জিনিস পরিষ্কার করে দিয়েছে গোয়েন্দাদের কাছে। এক, কিরিহারা কারো সাথে দেখা করতে যাচ্ছিলো। দুই, আর সেই কেউ একজনের নারী হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। শেষমেশ একটা নাম উঠে আসে প্রকাশ্যেঃ ফুমিও নিশিমোতো। পনশপের খতিয়ান বইতে যাদের নাম ছিলো, তাদের মাঝে একমাত্র তারই বাসা সেই কেকের দোকানের পাশে অবস্থিত।

তৎক্ষণাৎ ফুমিওর সাথে দেখা করতে গেল সাসাগাকি আর কোগা।

ফুমিও নিশিমোতোর অ্যাপার্টমেন্ট একটা জড়সড়ো দোতলা বিল্ডিং, যার সামনে সাইনবোর্ডে লেখা রয়েছেঃ ইওশিদা হাইটস। বিল্ডিংটা অনেকগুলো টিনশেডের বাড়ির মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। ঐ বাড়িগুলোকে দেখে মনে হচ্ছে নির্মাণের সময় ঢেউটিন আর হাতের কাছে যে কাঠই পেয়েছে তাই দিয়েই কোনোমতে বানিয়ে নিয়েছে।

ধূসর রঙের বিল্ডিংটার গায়ে কালো কালো ছোপ ছোপ দাগ পড়ে আছে, সাথে ফাটলগুলোর উপরে প্লাস্টার করার চিহ্নও দেখা যাচ্ছে বেশ। ফুমিওর ইউনিটটা খতিয়ান বইতে ১০৩ নাম্বার ইউনিট হিসেবে লেখা ছিলো। অ্যাপার্টমেন্টটার নিচ তলা দিয়ে যাওয়ার পথটা বেশ অন্ধকার এবং স্যাঁতস্যাঁতে। একপাশে কিছুটা খোলামেলা হলেও পাশে থাকা অন্য বাড়িগুলোর কারণে আলো আসতে পারে না এদিকটায়। বিল্ডিংয়ের এককোনায় রাখা আছে একটা জং্ধরা সাইকেল, যা কিনা ঢোকার অর্ধেকটা পথই আটকে দিয়েছে।

প্রত্যেকটা ঘরের সামনে পড়ে থাকা ওয়াশিং মেশিনগুলো টপকে ফুমিওর ইউনিট খুঁজতে লাগলো সাসাগাকি। ১০৩ নাম্বার রুমটায় দরজার পাশের দেয়ালে একটা পেরেক দিয়ে গাঁথা এক টুকরো কাগজ দেখতে পেল সে। ওখানে 'নিশিমোতো' নামটা একটা পার্মানেন্ট মার্কার দিয়ে লেখা আছে। সাসাগাকি দরজায় কড়া নাড়লো এবার।

'কে?' একটা অল্পবয়সি মেয়ের গলা শোনা গেল ভেতর থেকে। 'কে আপনি?'

'তোমার মা আছেন বাড়িতে?' জিজ্ঞেস করলো সাসাগাকি।

কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না কিছুক্ষণের জন্য। এরপর আবার স্বরটা বলে উঠলো, 'কে আপনি?'

কোগার দিকে তাকিয়ে একটা শুকনো হাসি দিলো সাসাগাকি। বোঝাই যাচ্ছে মেয়েটাকে পরিচয় ছাড়া দরজা খুলতে নিষেধ করা হয়েছে। অন্য যেকোনো সময় হলে এই আচরণের প্রশংসাই করতো সাসাগাকি, কিন্তু এখন তদন্তের বিষয়ে ব্যাঘাত ঘটায় করতে পারছে না।

সাসাগাকি তার গলা সাবধানে আরো একটু বাড়িয়ে দিলো যাতে তার কথা পাশের বাড়ির মানুষরা না শুনলেও মেয়েটা শুনতে পায়। 'আমরা পুলিশের লোক। তোমার মায়ের ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করার ছিলো।'

আবার পিনপতন নীরবতা।

গলার স্বরে সাসাগাকি মেয়েটাকে কিশোরী হিসেবেই ধরে নিয়েছে। হতে পারে হাই স্কুলে পড়ছে, নয়তো ইলিমেন্টারির পর্ব শেষ করার পর্যায়ে আছে। অতএব, *পুলিশ* নামটা শোনার পরে মেয়েটার হকচকিয়ে যাওয়াটা খুবই স্বাভাবিক।

আর তারপরেই দরজা খোলার শব্দ শুনলো ওরা। দরজা খুলে গেছে, তবে শেকল এখনো লাগানো আছে। ছোট্ট ফাঁক দিয়ে মেয়েটার বড় বড় চোখসহ মুখ নজরে এলো। মেয়েটার গায়ের রং যথেষ্ট ফর্সা এবং ত্বক বেশ মসৃণ।

'মা এখনো বাড়িতে ফেরেনি,' দরজার ফাঁক দিয়ে বললো সে। তার গলার স্বর এতটাই মোলায়েম যে তা সাসাগাকিকে পর্যন্ত কিছুটা স্থির হতে বাধ্য করলো।

'শপিং করতে গেছে নিশ্চয়ই?'

'না, কাজে গেছে।'

'উনি কাজ থেকে বাড়ি ফেরেন কখন?' ঘড়ি দেখতে দেখতে জিজ্ঞেস করলো সাসাগাকি। পাঁচটার উপরে বাজে এখন।

'এখনই হয়তো চলে আসতে পারে,' বললো মেয়েটা।

'আচ্ছা, তাহলে আমরা বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকি কিছুক্ষণ,' সাসাগাকি পালটা উত্তর দিলো।

মাথা দুলিয়ে দরজাটা লাগিয়ে দিলো মেয়েটা। পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা সিগারেট বের করলো সাসাগাকি। 'মেয়েটার ঘাড়ে থাকা মাথাটায় বুদ্ধি আছে বলতে হবে,' হালকা গলায় বললো কথাটা।

'অস্বীকার করবো না,' কোগা বললো। 'আর–' কোগা কিছু বলতে যাচ্ছিলো, ঠিক এমন সময় দরজাটা আবার খুলে গেল। এবার আর শেকল নেই। একদম হাপাটে খুলে দেওয়া হয়েছে।

'আপনি কি আপনার ঐ পুলিশের জিনিসটা দেখাতে পারবেন?' জিজ্ঞেস করলো মেয়েটা।

সাসাগাকি পলক ফেলে বললো, 'হাঁহ? আমার কী?'

'আপনার ব্যাজ।'

'ওহ, আচ্ছা, আচ্ছা।' হেসে দিলো সাসাগাকি। 'এই যে দেখো।' সাসাগাকি তার ওয়ালেট খুলে ব্যাজটা দেখালো, যার পাশে তার আইডিও রয়েছে।

মেয়েটা ছবিটার দিকে একবার আর সাসাগাকির দিকে একবার তাকিয়ে শেষমেশ বললো, 'আপনারা ভেতরে আসতে পারেন।'

'না, তার আর দরকার নেই,' একটু অবাক হয়ে বললো সাসাগাকি। 'আমরা বাইরেই ঠিক আছি।'

মেয়েটা মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, 'আমাদের প্রতিবেশীরা সন্দেহ করবে।' সাসাগাকি কোগার দিকে তাকাতেই দেখলো কোগা বিদ্রুপের হাসি আটকানোর চেষ্টা করছে। ভেতরে ঢুকলো ওরা দুজন। সাসাগাকি যেরকমটা ভেবেছিলো ভেতরের দৃশ্য সেরকমই। একটা ছোট্ট পরিবারের জন্য ছোট্ট একটা ঘর। দরজার পাশে একটা রান্নাঘর, যেখানে ছোট্ট একটা বেসিন আর কাঠের টেবিল রয়েছে। আর তার পেছনে রয়েছে আরেকটা ঘর। প্রথম ঘরটা থেকে কিছুটা বড়। মেঝেটা তাতামি মাদুর দিয়ে ঢাকা। মেয়েটা ওদেরকে সামনের ঘরের একটা টেবিলের পাশে বসতে বললো, যেখানে দুটোই চেয়ার ছিলো। গোলাপি আর সাদা রং মেশানো প্লাস্টিকের টেবিলক্লথটার একপাশে সিগারেটের আগুন লেগে কিছুটা পুড়ে গেছে।

সাসাগাকি আর কোগা বসে পড়তেই ভেতরের ঘরে চলে গেল মেয়েটা। ওখানে গিয়ে ক্লজেটের সাথে হেলান দিয়ে একটা বই খুলে বসলো। মলাটে থাকা সাদা প্রচ্ছদই বলে দিচ্ছে বইটা কোনো লাইব্রেরি থেকে আনা হয়েছে।

'কী পড়ছো তুমি?' জিজ্ঞেস করলো কোগা। মেয়েটা প্রত্যুত্তরে বইটা এমনভাবে তুলে ধরলো যেন কোগা সেখান থেকেই দেখতে পায়। দেখে হাসলো গোয়েন্দা। 'তোমার বয়সি কারো জন্য বইটা একটু বেশিই হয়ে যায় আসলে।'

'কী বই?' জিজ্ঞেস করলো সাসাগাকি।

'*গন উইদ দ্য উইন্ড।*'

সাসাগাকি মাথা নাড়লো একবার। বিস্মিত হয়ে গেছে একদম। 'আমি মুভিটা দেখেছি।'

'আমিও,' বলে উঠলো কোগা। 'বেশ ভালো একটা মুভি ছিলো। আমাকে আর বইটা পড়তে হয়নি কষ্ট করে।'

'আমারও তেমন একটা বই পড়া হচ্ছে না ইদানীং।'

'আপনার আর আমার অবস্থা একই। আমি তো এমনকি মাঙ্গাও পড়ছি না, সেই কবে *আশিতা নো জো* শেষ করেছি, এরপর থেকে তো আর কিছু ধরাই হচ্ছে না।'

'বলছো কী! জো মাঙ্গা শেষ করে ফেলেছ?'

'হ্যাঁ, মে মাসের দিকেই তো শেষ করে ফেললাম। এখন তো *স্টার অব দ্য জায়ান্টস*-ও শেষ হয়ে গেছে। আমার হাতে কিছুই নেই আর পড়ার মতো।'

'ভালোই হয়েছে। বড়দের এমনিতেও মাঙ্গা পড়া উচিত না।'

'হয়তো।' কাঁধ ঝাঁকালো কোগা।

মেয়েটা একবারের জন্যও ওদের দিকে ফিরে তাকায়নি। যেন মেয়েটা বুঝে ফেলেছে যে নীরবতা দূর করার জন্যই ওরা যা মাথায় আসছে তাই বলে যাচ্ছে।

কোগাও বোধহয় ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে। যার কারণে এরপরে আর কথা বাড়ায়নি সে। বর্তমানে টেবিলের উপর আঙুল দিয়ে খটখট শব্দ করছে সে। কিন্তু মেয়েটার বিধ্বংসী একটা চাহনিতে তা থামিয়ে দিতে বাধ্য হলো।

অন্যদিকে, সাসাগাকি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে সব। ঘরের ভেতর আসবাবপত্র খুবই অল্প। ঘরে এমন কিছুই নেই যেটাকে দামি কিছু বলে ধরা যাবে। ঘরের ভেতর এমনকি পড়ার জন্য কোনো ডেস্ক বা বুকশেলফও নেই। জানালার পাশে একটা ছোট এন্টেনাযুক্ত টেলিভিশন রয়েছে, কিন্তু ওটার অবিশ্বাস্য রকমের বয়স হয়েছে বলেই মনে হচ্ছে। *সাদা-কালো রঙের টেলিভিশন হবে হয়তো*, ভাবলো সে। যেগুলোর একেকটা অন করে আজন্ম অপেক্ষা করতে হয় ছবি আসার জন্য। আর যখনই বা কিছু আসে, তখন সেটা আবার ঝিরঝির করে।

কেবল জিনিসপত্রের অভাবটাই যে সবচেয়ে বড় সমস্যা তাই না। এই অলংকারহীন ঘরটা কোনোভাবেই একটা বাচ্চা মেয়ের বেড়ে ওঠার উপযোগী নয়। দেয়ালে থাকা লাইটগুলোও বেশ পুরোনো, কিন্তু তবুও কেন যেন সেই আলোটাও ঘরের ভেতর থাকা বিষণ্নতাকে পুরোপুরি ফুটিয়ে তুলতে পারছে না।

সাসাগাকি যেখানে বসেছে, সেখানে গাদাগাদি করে পড়ে আছে কার্ডবোর্ডের দুটো বাক্স। ও আঙুলের ডগা দিয়ে সবচেয়ে উপরে থাকা বাক্সটার ভেতরে কী আছে তা দেখার চেষ্টা করলো। পুরো বাক্সটা রাবারের ব্যাঙ দিয়ে বোঝাই করা। এই ব্যাঙগুলোর লেজে একটু চাপ দিলে পাগুলো ছড়িয়ে দিয়ে সামনে লাফিয়ে পড়ে। ও এগুলোকে রাস্তার পাশে বিভিন্ন মেলার সময় বিক্রি করতে দেখেছিলো।

'তোমার নাম কী, মিস?' মেয়েটাকে যেচে পড়ে জিজ্ঞেস করলো সাসাগাকি। সাধারণত ও কখনো স্কুল ছাত্রীদের 'মিস' বলে সম্বোধন করে না, কিন্তু এর সাথে না করতেই কেমন কেন লাগছে।

'ইউকিহো নিশিমোতো,' বই থেকে চোখ না সরিয়েই বলে উঠলো মেয়েটা।

'ইউকিহো? কীভাবে লেখো তুমি এই নাম?'

'*শীত* আর *কান*-এর জন্য যে অক্ষর দুটো আছে, ওগুলো দিয়ে। *কান*-এর ক্ষেত্রে আবার ইয়ার অব রাইস, মানে ধানের শীষের জন্য যে অক্ষরটা আছে সেটা ব্যবহার করি।'

'বাহ,' বললো সাসাগাকি। 'খুব ভালো একটা নাম, না?' কোগার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো সে। কোগা মৃদু মাথা দোলাতেই আবার পড়ায় মনোযোগ ফিরিয়ে নিলো মেয়েটা।

'তুমি কি কিরিহারা শপ নামে কোনো দোকানের নাম শুনেছ?' সাসাগাকি হুট করে জিজ্ঞেস করলো কথাটা। 'ওটা একটা পনশপ।'

ইউকিহো চটপট জবাব দিলো না। জিভ দিয়ে ঠোঁটটা একটু ভিজিয়ে নিয়ে বললো, 'আমার মা মাঝে মাঝে ওখানে যায়।'

'তুমি কি শপ যে চালায় তাকে কখনো দেখেছ?'

'হ্যাঁ।'

'উনি কি এখানে কখনো এসেছিলেন?'

ইউকিহো ভ্রু তুলে বললো, 'মনে হয় এসেছিলেন।'

'কিন্তু যখন তুমি ঘরে থাকতে না সে সময় আসতেন, তাই তো?'

'হয়তো। আমি ঠিক মনে করতে পারছি না।'

'তোমার মায়ের কাছে লোকটা কেন আসতো কিছু জানো?'

'উঁহু।'

মেয়েটাকে এখন আর কোনো প্রশ্ন করা উচিত হবে কি না সে ব্যাপারে আরেকবার ভেবে নিলো সাসাগাকি। ওর কাছে কেন যেন মনে হচ্ছে এটাই হয়তো মেয়েটার সাথে কথা বলার ভালো একটা সুযোগ। আবার ঘরের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলো সে। নির্দিষ্ট করে কোনো কিছু দেখছিলো না, কিন্তু রেফ্রিজারেটরের কাছে থাকা একটা ময়লার ঝুড়ির উপর চোখ পড়তেই চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল তার।

এটাও কানায় কানায় ভরতি। আর একদম উপরে সেই হারমোনি শপের লোগো দেওয়া প্যাকেট। সেই কেকের দোকান, যেখান থেকে কিরিহারা পুডিং কিনেছিলো।

সাসাগাকি মেয়েটার দিকে ফিরে তাকালো আবার। চোখাচোখি হতেই দ্রুত বইয়ের দিকে চোখ ফিরিয়ে নিলো মেয়েটা। ও বুঝলো যে মেয়েটাও ময়লার ঝুড়িটার দিকেই তাকিয়ে ছিলো এতক্ষণ।

এর কিছুক্ষণ পর আবারো মুখ তুললো মেয়েটা। তারপর বইটা বন্ধ করে ওদেরকে পেছনে রেখে দরজার দিকে এগিয়ে যেতে থাকলো।

কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করছে সাসাগাকি। পায়ের শব্দ আসছে বাইরে থেকে, মাটির সাথে স্যান্ডেলের ঘষা লেগে যেরকম শব্দ হয় সেরকম। চোয়াল কিছুটা ঝুলে গেছে কোগারও। পায়ের শব্দটা দরজার কাছে এসে থেমে গেল একদম। দরজা খোলার শব্দ শোনা গেল ঠিক তার পর মুহূর্তেই।

'খোলাই আছে,' বলে উঠলো ইউকিহো।

'লাগিয়ে রাখোনি কেন? ব্যাপারটা মোটেও নিরাপদ না,' দরজা খোলার সাথে সাথে একটা গলার স্বর ভেসে এলো বাইরে থেকে। ফিরোজা রঙের ব্লাউজ পরা এক নারী ঢুকলো ঘরের ভেতর। ত্রিশ-চল্লিশের মাঝামাঝি বয়স তার। চুলগুলো মাথার পেছন দিকে খোঁপা করে বাঁধা।

ফুমিও নিশিমোতো পরক্ষণেই বুঝতে পারলো ঘরে অন্য লোক রয়েছে। সে চমকে গিয়ে একবার তাকালো তার মেয়ের দিকে, আরেকবার তাকালো অপরিচিত লোক দুজনের দিকে।

'সমস্যা নেই। উনারা পুলিশের লোক,' বলে উঠলো ইউকিহো।

'পুলিশ?' একটা অজানা ভয় হঠাৎ করে ফুটে উঠলো ফুমিওর চেহারায়।

'সাসাগাকি, ওসাকা পুলিশ,' দাঁড়িয়ে নিজের পরিচয় দিলো সাসাগাকি। 'আর এ হচ্ছে আমার সহকর্মী কোগা।'

লক্ষণীয়ভাবে খানিকটা পেছনে সরে গেল ফুমিও। তার চেহারা একেবারেই ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। সে বুঝতে পারছে না তার কী করা উচিত এখন। একটা কাগজের ব্যাগ হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো মহিলা, পেছনে তখনো দরজাটা খোলা।

'আমরা একটা কেসের তদন্ত করছি। আর সে বিষয়ে আপনাকে কিছু কথা জিজ্ঞেস করার ছিলো, মিসেস নিশিমোতো। আমরা আপনার অবর্তমানে চলে আসার জন্য দুঃখিত।'

'কীরকম কেস?'

'সেই পনশপের লোকটার ব্যাপারে,' বলে উঠলো ইউকিহো।

ফুমিও অনেকক্ষণ ধরে শ্বাস আটকে রাখলো। মা-মেয়ের চেহারার দিকে তাকিয়ে সাসাগাকি স্পষ্ট বুঝে ফেললো যে ওরা কিরিহারার মৃত্যুর ব্যাপারে জানে, এমনকি এর থেকেও বেশি কিছু জানে। আর দুজনে এ নিয়ে আলোচনাও করেছে হয়তো।

'দয়া করে আপনি এখানে বসুন,' কোগা তার চেয়ার ছেড়ে উঠে গিয়ে বললো কথাটা। হাত মোচড়াতে মোচড়াতে সাসাগাকির পাশে থাকা চেয়ারটায় ধপ করে বসে পড়লো ফুমিও।

সুন্দরী নারী, ভাবলো সাসাগাকি। চোখের নিচে যদিও কিছুটা কালশিটে দাগ আছে, কিন্তু মেকআপ করলে নিশ্চিত যে-কেউ তার দিকে ঘুরে তাকাবে। তার এই সৌন্দর্যকে বলা চলে শীতল সৌন্দর্য; চমৎকার চেহারার সাথে আত্মবিশ্বাস আর শীতল অভিব্যক্তির অনন্য এক মিশ্রণ। মেয়ের সাথে তার চেহারার মিলটাও চোখে পড়ার মতো। মধ্যবয়সি এক পুরুষের জন্য তার প্রেমে পড়াটা কতটা সহজ হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। বায়ান্ন বছরের কিরিহারার সাথে এই মহিলার কিছু একটা থাকা অসম্ভব না।

'অনধিকারচর্চা করার জন্য মাফ করবেন। আপনি কি বিবাহিত?'

'আমার স্বামী সাত বছর আগে মারা গেছে। একটা কনস্ট্রাকশন সাইটে কাজ করতো সে। সেখানে ঘটা দুর্ঘটনায়...'

'বুঝতে পেরেছি। যা হয়েছে তার জন্য দুঃখিত। আপনি কোথায় কাজ করছেন এখন?'

'ইমাজাতোর একটা উদন[৪] শপে।' মূলত শপটার নাম আসলে কিকুয়া। জানা গেল মহিলা সেখানে সোম থেকে শনিবার পর্যন্ত কাজ করে। সকাল এগারোটা থেকে বিকাল চারটা পর্যন্ত।

'ওখানকার উদন কি ভালো হয়?' কোগা মুখে হাসি নিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কিন্তু ফুমিওর চেহারা ঠিক একই রকম হয়ে আছে।

'মনে তো হচ্ছে,' এতটুকুই বললো সে।

'আপনি নিশ্চয়ই মি. ইওসুকে কিরিহারার মৃত্যুর সংবাদটা শুনেছেন?' সাসাগাকি মূল বিষয়ে আলোকপাত করার জন্যই প্রশ্নটা করলো এবার।

'হ্যাঁ,' খুবই ক্ষীণ কণ্ঠে জবাব দিলো মহিলা। 'আকস্মিক এক দুর্ঘটনা ছিলো।'

ইউকিহো তার মায়ের পেছন দিয়ে পাশের রুমে চলে গেল। ওখানেই কিছুক্ষণ আগে বই নিয়ে বসে ছিলো সে। সাসাগাকি ফুমিওর দিকে ঘুরে তাকানোর আগে আরেকবার দেখে নিলো যে কী করছে মেয়েটা।

'বিষয়টা হচ্ছে, মি. কিরিহারা কিছু একটার সাথে জড়িয়ে গেছিলেন। আমরা আসলে গত শুক্রবার বিকাল থেকে তিনি কোথায় কোথায় ছিলেন তা দেখে নিচ্ছিলাম। এরপরই আমাদের কাছে খবর আসে যে উনি হয়তো এখানেও এসেছিলেন সেদিন।'

'কী? আমার বাসায়? না তো–'

ফুমিও থেমে থেমে বলতে শুরু করেছিলো, কিন্তু মাঝখানে তার মেয়ে সুর করে বলে উঠলো, 'ঐ লোকটা নাকি যে সেদিন পুডিং এনেছিলো?'

ফুমিওর বিব্রতকর অবস্থা এতটা নগণ্য আকারে প্রকাশ পেল যে দেখাটাও কঠিন হয়ে পড়লো। সে তার চিকন ঠোঁটটা একবার নেড়ে কিছুক্ষণ থেমে বললো, 'হ্যাঁ, সত্য। মি. কিরিহারা শুক্রবারে এখানে এসেছিলেন।'

'ঠিক কোন সময়ে?'

'সম্ভবত তখন...' সাসাগাকির কাঁধের উপর দিয়ে দুই দরজাওয়ালা ফ্রিজটার উপরে থাকা ঘড়ির দিকে তাকালো ফুমিও। 'পাঁচটার কিছু আগে বোধহয়। আমার আসার কিছুক্ষণ পরেই এসেছিলেন।'

'আর এই আসার উপলক্ষ্যটা আসলে কী ছিলো?'

'নির্দিষ্ট কোনো কারণ ছিলো না। বলেছিলেন যে এখান দিয়েই যাচ্ছিলেন, তাই ভাবলেন দেখা করে যাবেন। উনি জানতেন আমি একজন বিধবা, আমার একটা সন্তান আছে, আর আমাদের সময় তেমন ভালো যাচ্ছে না। তাই প্রায়ই এখান দিয়ে কোথাও গেলে দেখা করতে আসতেন আর এটা-সেটা উপদেশ দিতেন।'

'উনি বলেছিলেন যে এই এলাকায় এসেছিলেন? এটা কিছুটা উদ্ভট শোনাচ্ছে।' বলেই সাসাগাকি ময়লার ঝুড়িটার দিকে ইশারা করলো। ওখানে হারমোনির র‍্যাপিং

পেপারটা দেখা যাচ্ছে। 'উনিই এনেছেন ওটা, না? সম্ভবত ওগুলো কিনতেই সেই স্টেশনে গেছিলেন। আর স্টেশনটা এই এলাকায় না।'

'তা ঠিক আছে। কিন্তু উনি আমাকে যা বলেছেন, তাই আপনাকে বললাম। আমাকে কেবল এটাই বলেছেন যে এখান দিয়েই যাচ্ছিলেন, তাই দেখা করতে এসেছেন,' মাথা নিচু করে বললো ফুমিও।

'আচ্ছা, ঠিক আছে। এটা নিয়ে তাহলে আর কথা বাড়াচ্ছি না,' বললো সাসাগাকি। 'উনি ঠিক কতক্ষণ এখানে ছিলেন?'

'বোধহয় ছয়টার কিছু আগে এখান থেকে বেরিয়ে গেছিলেন।'

'একদম ছয়টার আগে? আপনি নিশ্চিত?'

'হ্যাঁ, অনেকটাই নিশ্চিত।'

'এর মানে এখানে প্রায় ঘণ্টাখানেকের মতো ছিলেন। তা কী নিয়ে আলোচনা করেছিলেন আপনারা?'

'নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ে না। জীবন নিয়েই আলোচনা করেছিলাম।'

'এটা একাই আলোচনার জন্য বিশাল বড় একটা টপিক। আবহাওয়া, জলবায়ু, টাকা-পয়সা ইত্যাদি কোনো নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা করেননি?'

'যুদ্ধের বিষয়ে কিছু একটা বলছিলেন...'

'প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধের বিষয়ে?' সাসাগাকি ফাইলে পড়েছে যে কিরিহারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলো। কিন্তু ফুমিও মাথা নেড়ে না করে দিলো।

'না, সেরকম কিছু না। বর্তমানের কোনো যুদ্ধের কথা বলছিলেন, বিদেশের হয়তো। বলছিলেন যে সেই যুদ্ধের কারণে তেলের দাম আবার বেড়ে যাবে।'

'ওহ আচ্ছা, ধরতে পেরেছি। মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ।' ইওম কিপ্পুর যুদ্ধের কথা বলছে, যেটা এ মাসের প্রথম দিকে শুরু হয়েছে।

'বলছিলেন যে এটা নাকি অর্থনীতিতে বেশ প্রভাব ফেলবে। আর এর জন্য আমরা তেল কিনতে সক্ষম না-ও হতে পারি। পুরো বিশ্ব নাকি বিভিন্ন ভাগে ভাগ হয়ে যুদ্ধ করবে–কে বেশি ক্ষমতাসীন এবং ধনী এই ভিত্তিতে। এসবই বলছিলেন আর কি।'

সাসাগাকি মাথা দোলালো একবার। ফুমিওর মনমরা ভাবটা খেয়াল করেছে সে। এর মানে মহিলা সত্যিটাই বলছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এরকম একটা বিষয় নিয়ে কেন কিরিহারা তার সাথে কথা বলতে গেল। সে কি কোনো কারণে এটা বোঝাতে চাচ্ছিলো যে তার কাছে টাকা বা ক্ষমতা দুটোই আছে, আর ফুমিও যেন তার সাথে থেকে যায়? পনশপের খতিয়ান অনুযায়ী দেখা গেছে যে ফুমিও নিশিমোতো কখনোই কিস্তি পরিশোধ করতে পারেনি। মহিলা নিঃস্ব, আর সে এরকম হতদরিদ্র থাকলেই পনশপের লাভ। আর এর মধ্য দিয়ে কিরিহারাও হয়তো কোনো সুবিধা গ্রহণ করতো।

সাসাগাকি ইউকিহোর দিকে তাকালো একপলক। তারপর জিজ্ঞেস করলো, 'আপনার মেয়ে কোথায় ছিলো তখন?'

'ও তখন লাইব্রেরিতে ছিলো। তাই না, সোনা?'

'হ্যাঁ,' জবাবে বললো ইউকিহো।

'এই বইটা কি সেই সময়েই এনেছ?' সাসাগাকি সোজা ইউকিহোর দিকে ঘুরে দাঁড়ালো এবার। 'তুমি কি প্রায়ই যাওয়া-আসা করো লাইব্রেরিতে?'

'সপ্তাহে দুয়েকবার যাওয়া হয়।'

'স্কুল থেকে ফেরার পথে যাও, না?'

'হ্যাঁ।'

'কোনো নির্দিষ্ট দিনেই কি যাওয়া-আসা করো? এই ধরো, বুধবার বা শুক্রবার?'

'না তো।' মাথা ঝাঁকালো সে। 'আমি কেবল তখনই যাই, যখন দেখি যে আমার কিছুই পড়ার নেই।'

'ব্যাপারটা আপনাকে দুশ্চিন্তায় ফেলে না?' ফুমিওর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলো সাসাগাকি। 'মানে স্কুল থেকে ফেরার পথে ও কোথায় যায়, কী করে–এগুলো আপনি জানতে চান না?'

'কিন্তু ও তো ছয়টার কিছু পরপরই বাসায় চলে আসে,' বলে উঠলো ফুমিও।

'সেদিন শুক্রবারেও কি তুমি এই সময়ে এসেছিলে?' ইউকিহোর দিকে আবার ঘুরে জিজ্ঞেস করলো সাসাগাকি।

হালকা করে মাথা দোলালো মেয়েটা। এবার সাসাগাকি মেয়ের মায়ের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'মি. কিরিহারা চলে যাওয়ার পর কি আপনি ঘরেই ছিলেন?'

'না, আমি মারুকানায়াতে শপিং করতে বেরিয়ে গেছিলাম।'

মারুকানায়া একটা সুপারমার্কেটের নাম, যা এখান থেকে পায়ে হেঁটে গেলে কয়েক মিনিট লাগে।

'ওখানে পরিচিত কারো সাথে দেখা হয়েছিলো আপনার?'

কিছু বলার আগে একটু থামলো ফুমিও, তারপর মুখ ফুটে বললো, 'হ্যাঁ, মিস কিনোশিতা। ইউকিহোর এক সহপাঠীর মা সে।'

'আপনার কাছে কি তার কোনো নাম্বার আছে?'

'মনে তো হয় আছে।' ফুমিও ফোনের পাশ থেকে ঠিকানার নোটটা নিয়ে টেবিলের উপর রাখলো। তার আঙুল চলে গেল কিনোশিতা নামে মার্ক করা জায়গাটায়। 'এটা তার নাম্বার।' সাসাগাকি দেখলো কোগা তার নোটবুকে নাম্বারটা টুকে নিলো কিছু বলার আগেই।

'আপনি সুপারমার্কেটের উদ্দেশে বেরিয়ে যাওয়ার আগেই কি আপনার মেয়ে বাসায় চলে এসেছিলো?'

'না, ও তখনো ফেরেনি বাসায়।'

'আচ্ছা, তো শপিং থেকে বাসায় ফিরেছিলেন কখন?'

'সাড়ে সাতটা নাগাদ মনে হয়।'

'সে সময়ে আপনার মেয়ে বাসায় চলে এসেছিলো, তাই তো?'

'হ্যাঁ, ততক্ষণে ও চলে এসেছিলো।'

'এরপর কি আপনি আর বাইরে বের হননি?'

'না।' মাথা ঝাঁকিয়ে অস্বীকার করলো ফুমিও।

সাসাগাকি কোগার দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করলো সেও কোনো প্রশ্ন করতে চায় কি না। কোগা মাথা ঝাঁকিয়ে না করে দিলো তাকে।

'বুঝতে পেরেছি। দুঃখিত, আপনাদের অনেকটা সময় আমরা নষ্ট করলাম। পরবর্তীতে আমাদের আরো প্রশ্ন করার থাকলে আবারো আসতে হতে পারে, সেজন্য আগেই দুঃখপ্রকাশ করে রাখছি,' দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললো সাসাগাকি।

দুই গোয়েন্দার যাওয়ার পথে চেয়ে রইলো ফুমিও। তার পেছনে ইউকিহোকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ফুমিওকে আরেকটা প্রশ্ন করার জন্য থামলো সাসাগাকি। 'মিসেস নিশিমোতো, একটু অন্য রকম একটা প্রশ্ন করতে চাই—যদি কিছু মনে না করেন।'

'জি?' বলে উঠলো সে। মুখের উপর আগের সেই অস্বস্তির ছাপটা ফুটে উঠলো আবারো।

'মি. কিরিহারা কি আপনাকে কখনো ডিনারে ইনভাইট করেছিলেন? অথবা বাড়ির বাইরে কোথাও কি আপনাদের দেখা হয়েছিলো কখনো?'

ফুমিওর চোখদুটো বড় বড় হয়ে গেলেও খুব দ্রুত মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, 'না, না, কোনো সময়েই না।'

'ওহ, আসলে আমি অবাক হচ্ছিলাম যে কেন মি. কিরিহারা আপনার এবং আপনার পরিবারের প্রতি এতটা আগ্রহ দেখাতেন। তার জন্যই প্রশ্নটা করা আর কি।'

'আমার মনে হয় তার ভেতর সহমর্মিতা কাজ করতো। ডিটেকটিভ, আমি কি সাসপেক্টদের মধ্যে কেউ?'

'আমরা শুধু সেদিন উনি কোথায় গেছিলেন, কী করেছিলেন তার খোঁজ করছি। কাউকেই সন্দেহ করছি না।'

আবারো তাকে ধন্যবাদ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো সাসাগাকি। হাঁটতে হাঁটতে দৃষ্টিসীমানা থেকে বাড়িটা চলে যাওয়ার পরে কোগার দিকে তাকিয়ে বললো, 'কিছু একটা ঘাপলা আছে এখানে।'

'আমারও তাই মনে হচ্ছে,' পালটা জবাব দিলো তরুণ গোয়েন্দা।

'কিরিহারার যে ঐ বাসায় যাওয়া-আসা ছিলো তা সে প্রথমে অস্বীকার করলো কেন? আর ইউকিহোই বা কেন সাহায্য করলো না তাতে? তোমার কী মনে হয়, আমরা পুডিংয়ের প্যাকেট দেখে ফেলায় মেয়েটা আর মিথ্যা বলতে চায়নি?'

'আমি মেয়েটার উপরে দোষ চাপাতে রাজি না।'

'মহিলা যেন কী বলেছিলো? উদন শপে সে তার কাজ শেষ করে পাঁচটা নাগাদ বাড়ি ফিরে আসে। আর সেই সময়েই এসে উপস্থিত হয় কিরিহারা, তাই তো? ইউকিহো আবার তখন লাইব্রেরিতে ছিলো। আর সে বাসায় আসে কিরিহারা চলে যাওয়ার পরপরই। প্রত্যেকটা বিষয়ের টাইমিং একটু বেশিই ভালো।'

'আপনি মনে করছেন ফুমিও তার প্রেমিকা ছিলো? ওদের কাজ শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত মেয়েটাকে বাড়ির বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছিলো তবে?'

'হতে পারে। কিন্তু যদি ফুমিও তার প্রেমিকা হয়ে থাকে, তাহলে আমার মনে হয় কোনো না কোনো দিক দিয়ে কিরিহারা তাকে সাহায্য করতো। আবার এটা মনে কোরো না যে মহিলা তার অবসর সময়ে রাবারের ব্যাঙ তৈরি করে টাকা পরিশোধ করছে।'

'লোকটা হয়তো ফুমিওর ভালোবাসা পাওয়ার চেষ্টা করছিলো।'

'হতে পারে।'

তারপর দুজনেই থানার উদ্দেশে দ্রুত হাঁটতে শুরু করলো।

***

'আমার কাছে ব্যাপারটাকে আবেগতাড়িত মনে হচ্ছে, স্যার,' সাসাগাকি কেসের রিপোর্ট দেওয়া শেষ করেই নাকাতসুকার উদ্দেশে বললো। 'মনে হচ্ছে ব্যাংক থেকে তোলা টাকাটা ফুমিওকে দেখানোর জন্যই গেছিলো কিরিহারা।'

'আর মেয়েটার টাকাটা দরকার ছিলো বলেই হত্যা করেছে তাকে? কিন্তু মহিলা যদি তা করেই থাকে, তবে আমরা যেখানে মৃতদেহ পেয়েছিলাম সেখানে কীভাবে গেল? মহিলার পক্ষে ওরকম একটা দেহ ওখানে নিয়ে যাওয়া সম্ভব না,' মাথা তুলে বললো নাকাতসুকা।

'ঠিক, আর সেজন্যই হয়তো মহিলা তাকে ওখানে নিয়ে যায়। হয়তো হাঁটতে হাঁটতেই সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলো ওরা।'

'আর ফরেনসিকের মতে, খুনি একজন মহিলা হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।'

'হ্যাঁ, তার উপর কিরিহারার পক্ষে আগেভাগে বোঝা সম্ভব ছিলো না যে ফুমিও তাকে আক্রমণ করতে পারে।'

'আমাদের তাহলে ফুমিওর অ্যালিবাইগুলো আরেকটু যাচাই করে দেখা দরকার,' রাশভারী কণ্ঠে বলে উঠলো নাকাতসুকা।

এতক্ষণ পর্যন্ত সাসাগাকির কাছে ফুমিওকেই অপরাধী বলে মনে হচ্ছিলো। মহিলার ভাবভঙ্গি অনেকটাই সন্দেহজনক। আর হত্যার সময়টাতে, অর্থাৎ বিকাল পাঁচটা থেকে রাত আটটার মধ্যে কাজটা করার জন্য যথেষ্ট সময় পেয়েছে সে। কিন্তু ফুমিওর নিজস্ব অ্যালিবাই আছে–এই তথ্যটা হজম করতে কষ্ট হচ্ছে তার।

***

মারুকানায়া শপের সামনে যে পার্কটা রয়েছে, সেখানে একটা দোলনার সেট, একটা স্লাইড আর একটা স্যান্ডবক্স রয়েছে। যদিও সেটা বল দিয়ে খেলার জন্য ততটা বড় না, কিন্তু বাচ্চাদেরকে সেখানে খেলতে দিয়ে মায়েদের শপিং করার জন্য যথেষ্ট। এর ফলে পার্কটার অন্য কিছু সুবিধাও তৈরি হয়েছিলো, যেমন প্রতিবেশীরা মিলে গালগল্প করা, একসাথে বসে আড্ডা দেওয়া এবং বাচ্চাদের ঘোরানো ইত্যাদি। যেদিন কিরিহারা খুন হলো, সেদিন সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা নাগাদ এই সুপারমার্কেটের ভেতরে ফুমিও নিশিমোতোর সাথে মিস ইউমি কিনোশিতার দেখা হয়েছিলো। ফুমিওর ততক্ষণে কেনাকাটা শেষ হয়ে গেছিলো এবং ক্যাশ রেজিস্টারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলো টাকা দিতে। সেই সময় ইউমি কিনোশিতা মার্কেটের ভেতরে ঢোকে–তার মালামাল রাখার ঝুড়িটা তখনো খালি। তারা কিছু কথাবার্তা বলে যে যার রাস্তায় হাঁটা ধরে। ইউমি চলে যায় শপিং করতে, আর ফুমিও চলে যায় দোকানের বাইরে।

ইউমি কিনোশিতা কেনাকাটা শেষ করে যখন দোকান থেকে বের হচ্ছিলো, তখন সাতটার কিছু বেশি বাজে ঘড়িতে। দোকানের সামনে তার সাইকেলটা যেখানে রেখে গেছিলো, সেখানে ফিরে আসে বাড়ি যাওয়ার জন্য। সাইকেলে উঠার সময় লক্ষ করে, ফুমিও তখনো পার্কে ভেতরে একটা দোলনায় বসে দোল খাচ্ছে। হালকা দুলছিলো দোলনাটা, আর ফুমিও মগ্ন হয়ে ছিলো গভীর কোনো চিন্তায়।

সে কি আসলেই ফুমিও নিশিমোতোকে দেখেছিলো কি না–এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে মহিলা প্রবল আত্মবিশ্বাসের সাথে জবাব দেয় যে ওটা আসলেই ফুমিও ছিলো।

সেই সন্ধ্যায় আরো একজন ব্যক্তি ফুমিওকে দোলনায় দোল খেতে দেখেছিলো। একজন বৃদ্ধ। সুপারমার্কেটের সামনে তাকোয়াকি নামের দোকানটা চালায় সে। বৃদ্ধ বললো সে ফুমিওকে ওখানে দোল খেতে দেখেছে। আটটা বাজে দোকানপাট বন্ধ হওয়ার আগ পর্যন্ত ওখানেই নাকি দোল খাচ্ছিলো মহিলা। তার বর্ণনা পুরোটাই ফুমিওর সাথে মিলে যায়। এদিকে, নতুন একটা তথ্য সামনে চলে আসে। আর এই তথ্যটা ফুমিওর বাসা থেকে বের হয়ে যাওয়ার পরে কিরিহারা কোথায় ছিলো সে ব্যাপারে।

একজন ফার্মেসির মালিক, যে কিনা কিরিহারাকে আগে থেকে চিনতো, সে কিরিহারাকে ছয়টা নাগাদ একা একা হাঁটতে দেখেছে। ভেবেছিলো তাকে একবার

ডাকবে, কিন্তু কিরিহারাকে কোনো কারণে ব্যস্ত দেখে আর ডাকেনি। লোকটা কিরিহারাকে যেখানে দেখতে পেয়েছিলো সেটা ফুমিওর অ্যাপার্টমেন্ট এবং যে বিল্ডিংয়ে কিরিহারার মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া গেছে তার মাঝামাঝি একটা জায়গায়।

হত্যার সময়কে বিবেচনা করলে বলা যায় যে ফুমিওর দোলনা থেকে উঠে আসা, এরপর সরাসরি সেই বিল্ডিংয়ে এসে খুন করাটা আক্ষরিক অর্থেই সম্ভব।

তবে অনেক গোয়েন্দার কাছেই বিষয়টা অসম্ভব ঠেকেছে। কারণ রাত আটটা এমনিতেই কিরিহারার মৃত্যুর সময় থেকে ঘণ্টাদুয়েক বেশি। কিরিহারার হত্যা সন্ধ্যা ছয়টা থেকে সাতটার মধ্যে হয়েছে বলেই ফরেনসিক বলেছে। অতএব, আটটা বাজে মৃত্যু ঘটেছে–এটা ভাবা অসম্ভব।

অবশ্য, কিরিহারার হত্যাকাণ্ড যে সাড়ে সাতটার পরে ঘটেনি তা ভাবার আরেকটা শক্ত কারণও ছিলো। আর তা হলো ক্রাইম সিনে থাকা আলোর উপস্থিতি। যখন মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া গেছিলো, তখন সেখানে কোনো আলো ছিলো না। দিনের বেলায় জায়গাটায় আলো থাকলেও রাতে একদম ঘন অন্ধকার হয়ে থাকে সেখানে। যদি সেদিন বিল্ডিংয়ের পাশের রাস্তার আলোগুলো জ্বলতো, তবে হয়তো কিছুটা আলো থাকতো। অন্তত একজনের চেহারা দেখার জন্য যথেষ্ট। আর সেদিন রাস্তার আলোগুলো সাড়ে সাতটার মধ্যে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিলো। তারপরেও ফুমিওর জন্য এরকম অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে হত্যা করাটা সম্ভব ছিলো যদি ওর সাথে টর্চ থাকতো। কিন্তু এটা ভাবাটাই তো বোকামি যে কিরিহারা তার নিজস্ব নিরাপত্তা নিশ্চিত না করেই ওরকম একটা জায়গায় গেছে।

যদিও ফুমিও গোয়েন্দাদের কাছে একটা সময় মূল সাসপেক্ট হিসেবেই ছিলো, কিন্তু সবাইকেই পরবর্তীতে মেনে নিতে হলো যে ফুমিওর কিরিহারাকে হত্যা করার সম্ভাবনা অনেকটাই ক্ষীণ। তদন্তের পুরো প্রক্রিয়া যখন ফুমিওকে কেন্দ্র করে চলছিলো, তখন কিরিহারা পনশপ সম্পর্কে চমকপ্রদ একটা তথ্য উদ্ধার করলো এক গোয়েন্দা। তার টিম কিরিহারার সেই খতিয়ানে থাকা সব কাস্টমারের সাথে যোগাযোগ করে। তারপর অবশেষে এমন কাউকে খুঁজে পায় যে কিরিহারার খুন হওয়ার দিনে সন্ধ্যা নাগাদ সেই দোকানে গেছিলো।

মাঝবয়সি ঐ নারী ওয়ে প্রদেশের দক্ষিণে থাকা তাতসুমিতে একা একা জীবনযাপন করতো। দুই বছর আগে স্বামী মারা যাওয়ার পর গত কয়েক মাসে এখানে আসা-যাওয়া করতো বিধবা মহিলাটা। এত দূরের পনশপ খোঁজার কারণ হলো যাতে তার বন্ধু বা পরিচিতরা জানতে না পারে। সেদিন কিরিহারা পনশপে কিছু ঘড়ি বন্ধক রাখতে বিকাল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ এসেছিলো সে। তার বর্ণনা অনুযায়ী, দোকানটা যদিও বাইরে থেকে খোলা ছিলো, কিন্তু ভেতর থেকে লাগানো ছিলো দরজাটা। সে দরজার বেলও বাজিয়েছিলো, কিন্তু কোনো উত্তর পাওয়া যায়নি। পরবর্তীতে ডিনারের জন্য কিছু জিনিস কিনতে কাছের একটা মার্কেটে চলে

যায় সে। এরপর বাড়িতে চলে যাওয়ার আগে আরেকবার সাড়ে ছয়টা নাগাদ পনশপের সামনে আসে। সেবারও দরজাটা বন্ধ অবস্থায় পায়। তখন আর বেল বাজায়নি, সোজা বাড়ির দিকে চলে যায়। এর তিন দিন পরে অন্য একটা দোকানে ঘড়িগুলো বন্ধক রেখে টাকা নেয়। যেহেতু পত্রিকা পড়ার অভ্যাস তার ছিলো না, তাই কিরিহারার হত্যার সংবাদটা গোয়েন্দাদের কাছ থেকেই জানতে পারে সে।

সন্দেহের পুরো পাল ইয়েকো আর মাতসুরার দিকে ঘুরে গেল এবার। কারণ এর আগে তারা বলেছিলো যে পনশপ সাতটা অবধি খোলা ছিলো। আবারো সাসাগাকি আর কোগা পনশপে ঘুরে আসার প্রস্তুতি নিলো–এবার অবশ্য অতিরিক্ত দুজন গোয়েন্দাও ছিলো তাদের সাথে।

***

দরজার সামনে ভিড় নজরে আসতেই মাতসুরার চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। 'হঠাৎ এসব কীসের জন্য?'

'মিসেস কিরিহারা কি ভেতরে আছেন?' জিজ্ঞেস করলো সাসাগাকি।

'হ্যাঁ। তবে–'

'আপনি কি তাকে একটু ডেকে দিতে পারবেন?'

মাতসুরা ভ্রু তুলে একবার তাকালো, এরপর পেছনে থাকা স্লাইডিং দরজাটা একটু ফাঁক করে ভেতরের উদ্দেশে বললো, 'কয়েকজন গোয়েন্দা এসেছে আপনার সাথে দেখা করতে।'

এবার ভেতর থেকে কারো উঠে আসার শব্দ শোনা গেল, আর পরক্ষণেই পুরো দরজাটা খুলে গেল একেবারে। একটা জিনস আর হাতে বোনা টপ পরে দাঁড়িয়ে আছে ইয়েকো। গোয়েন্দাদের দেখতেই তার ভ্রূদুটো কুঁচকে গেল। 'জি, বলুন?'

'আপনাকে অসময়ে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত। কিন্তু আমাদের কিছু প্রশ্ন ছিলো,' বলে উঠলো সাসাগাকি।

'বিরক্তির কিছু নেই। তবে আমি জানি না আমি আর কীভাবে আপনাদের সাহায্য করতে পারি।'

'আমাদের সাথে একটু সময় দিলেই পারবেন,' সাসাগাকির পেছনে থাকা একজন গোয়েন্দা বলে উঠলো। 'ঐ ওপাশের ক্যাফেটাতে অল্প কিছুক্ষণের জন্য আমাদের সাথে বসলেই হবে। আমরা আপনার বেশি সময় নষ্ট করবো না।'

ইয়েকো থমকে গেল কিছুটা, কিন্তু তবুও জুতো হাতে নিয়ে পরা শুরু করে দিলো। ইয়েকো যে অন্য দুজন গোয়েন্দার সাথে চলে যাওয়ার সময় মাতসুরার দিকে তাকিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত একটা দৃষ্টি ছুঁড়ে দিয়েছে তা সাসাগাকির নজর এড়ায়নি।

ওরা যখন ইয়েকোকে নিয়ে চলে গেল, তখন সাসাগাকি কাউন্টারের উপরে উঠে বললো, 'আমার কিছু প্রশ্ন রয়েছে আপনার জন্য, মি. মাতসুরা।'

'অবশ্যই। বলুন,' হালকা হাসি দিয়ে বললো সে। যদিও তার পেছনটা শক্ত হয়ে আছে।

'আসলে বিষয়টা হত্যাকাণ্ডের দিনের ব্যাপারে। আমাদের তদন্তকার্যে আপনাদের বলা কথার সাথে সাংঘর্ষিক কিছু বক্তব্য খুঁজে পেয়েছি,' সাসাগাকি মেপে মেপে বললো কথাগুলো।

'কীরকম সাংঘর্ষিক?' হাসিটা খুব কষ্ট করে মুখে ধরে রেখে জিজ্ঞেস করলো মাতসুরা।

সাসাগাকি তাতসুমির সেই মহিলার সম্পূর্ণ ঘটনা খুলে বলার পর মাতসুরার মুখে থাকা হাসিটা হাওয়ায় মিলিয়ে গেল নিমিষেই।

'আমরা এর কী অর্থ ধরে নেবো? আপনি বলেছিলেন সেদিন দোকান সাতটা অবধি খোলা ছিলো। আর এখন আমরা দেখলাম যে সেদিন দোকান অন্তত সাড়ে পাঁচটা থেকে সাড়ে ছয়টা অবধি বন্ধ ছিলো। আপনার কাছে কি বিষয়টা অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে না?' সাসাগাকি মাতসুরার চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করলো।

মাতসুরা অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে সিলিংয়ের দিকে তাকালো একবার। 'আচ্ছা, তাই নাকি...' সে তার হাতদুটোকে একত্র করে কিছু একটা ভেবেই হঠাৎ তালি দিয়ে বললো, 'আহা, বুঝতে পেরেছি। আমি তখন আমাদের সিন্দুকের ওখানে ছিলাম।'

'সিন্দুক?'

'হ্যাঁ, একদম পেছনের দিকে সেটা। কাস্টমারদের থেকে আমরা যা যা বন্ধক নেই সব সেখানে জমা থাকে। দামি দামি জিনিসপাতিও। আপনি চাইলে একবার দেখে নিতে পারেন। বেশ খানিকটা বড় জায়গাটা। অনেকটা ব্যাংকের লকারের মতো। সে যাক গে, আমার কিছু একটা দেখার ছিলো বলে সেখানে গেছিলাম। আর আপনি তো জানেনই যে এখান থেকেই কলিংবেলের শব্দ শোনা যায় না, আর সেই পেছন থেকে শোনা...'

'তো আপনি যখন পেছনে ছিলেন, তখন আর কেউ কি ছিলো না দোকানে?'

'বেশিরভাগ সময় বসই থাকে এখানে, কিন্তু সেদিন যেহেতু ছিলেন না, সেহেতু আমি দরজা লক করেই গেছিলাম।'

'আর আপনার বসের স্ত্রী আর ছেলের কী হয়েছিলো?'

'দুজনেই বসার ঘরে ছিলো।'

'তারাও কি বেলের শব্দ পায়নি?'

'তাই তো! আচ্ছা, দাঁড়ান।' মাতসুরা তার মুখটা কিছুক্ষণের জন্য খোলা রেখে কিছু একটা ভাবতে লাগলো। 'ওহ, হ্যাঁ, ওরা বোধহয় তখন টেলিভিশন দেখছিলো, যার কারণে শুনতে পায়নি।'

সাসাগাকি মাতসুরার হাড্ডিসার চিবুকের দিকে এক মুহূর্তের জন্য তাকিয়ে কোগাকে উদ্দেশ করে বললো, 'যাও তো, গিয়ে দরজার কলিংবেলটা বাজাও একবার।'

'এক্ষুনি যাচ্ছি।' বলেই কোগা বেরিয়ে গেল।

মুহূর্ত পরেই কলিংবেলের শব্দে মাথার ভেতরটা ঝনঝন করে উঠলো সাসাগাকির। যথেষ্ট যন্ত্রণাদায়ক এক শব্দ।

'যথেষ্ট আওয়াজ হয় দেখছি,' বললো সাসাগাকি। 'এরকম শব্দ না শোনার জন্যে তো টেলিভিশনে একটু বাড়াবাড়ি ধরনের মনোযোগই প্রয়োজন, কী বলেন?'

মাতসুরার মুখটা খানিকটা বেঁকে গেল, তারপর শুষ্ক হাসি দেখা গেল ঠোঁটে। 'আসলে মিসেস কিরিহারা ব্যবসার ক্ষেত্রে ততটা আগ্রহ দেখাতেন না কখনো। উনি এমনকি কোনো কাস্টমারকে অভিবাদনও জানান না। রিওর ক্ষেত্রেও একই সমস্যা। ওরা হয়তো কলিংবেলের শব্দ শুনেছে, কিন্তু আসা দরকার বলে মনে করেনি।'

'অর্থাৎ, এড়িয়ে গেছে,' বললো সাসাগাকি। যদিও মাতসুরা যা বলছে তার অনেকটাই সত্য। ইয়েকো কিংবা তার ছেলে-কারোই ব্যবসার প্রতি তেমন কোনো গরজ নেই।

'আমি কি সাসপেক্টদের মধ্যে কেউ, ডিটেকটিভ? মানে আপনি কি ভাবছেন আমিই খুন করেছি বসকে?'

'আমাদের ভাবার আগেই ভেবে বসবেন না,' হাত নেড়ে জবাব দিলো সাসাগাকি। 'আমরা আমাদের তদন্তে পরস্পর সাংঘর্ষিক বক্তব্য খুঁজে পেয়েছিলাম। এর জন্যই আসা। এটা কার্যকর একটা কৌশল মাত্র।'

'ওহ আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি। না, আসলে...সাসপেক্টদের মধ্যে থাকলেও যে সমস্যা হতো তা না,' হলুদ দাঁত বের করে একটা হাসি দিয়ে বললো সে। 'আমার তো আসলে লুকানোর কিছুই নেই।'

'আমরাও আপনাকে সাসপেক্টের কাতারে রাখছি না। তবে অ্যালিবাইটা যেন শক্ত হয় তাই নিশ্চিত করার চেষ্টা করি আর কি। যাই হোক, আপনার কাছে এমন কোনো কিছু আছে যেটার মাধ্যমে আপনি প্রমাণ করতে পারবেন যে এখানে সেদিন সন্ধ্যা ছয়টা থেকে সাতটা পর্যন্ত ছিলেন?'

'আপনি চাইলেই বাচ্চাটাকে কিংবা মিসেস কিরিহারাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন...তবে সেটাও হয়তো যথেষ্ট হবে না, তাই তো?'

'এমন কোনো সাক্ষীকে বিশ্বাস করা হবে যার এই কেসের সাথে কোনো লেনাদেনা নেই।'

'তার মানে আমরা সবাই ষড়যন্ত্রকারী, এটাই বলতে চাচ্ছেন?' চোখদুটোকে ছোট করে বললো মাতসুরা।

'আমরা সব ধরনের সম্ভাব্যতাকে বিবেচনা করে দেখছি,' কাঁধদুটো হালকা ঝাঁকি দিয়ে বললো সাসাগাকি।

'সবকিছু তবে গুলিয়ে ফেলছেন আপনারা। বসকে খুন করে আমি কী পাবো? উনি হয়তো খুব ধনী ধনী ভাব নিয়ে কথা বলতেন, কিন্তু আমি তো জানি যে এখানে তেমন টাকা-পয়সা ছিলো না।'

সাসাগাকি কিছুই বললো না। মাতসুরা রেগে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। আর গোয়েন্দাও এটাই চাইছিলো। আরো চাইছিলো যাতে রাগের মাথায় কিছু একটা বলে বসে লোকটা–এমন কিছু যেটা বলা তার উচিত না।

কিন্তু ততক্ষণে মাতসুরার রাগ নেমে গেছে। 'ছয়টা থেকে সাতটার মধ্যে, না?' মৃদু স্বরে বললো সে। 'ফোনে কথা বলার প্রমাণ দিলেও কি হবে না?'

'আপনি তখন কারো সাথে ফোনে কথা বলছিলেন? কার সাথে?'

'আমাদের ইউনিয়নের একজনের সাথে, সামনের মাসে একটা মিটিং হওয়ার ব্যাপারে।'

'আপনিই ফোন করেছিলেন তাকে?'

'না, সে করেছিলো।'

'কোন সময়ে?'

'প্রথমবার ছয়টার সময়, এরপরে তার আধা ঘণ্টা পরে।'

'সে দুবার ফোন করেছিলো?'

'জি, দুইবারই করেছিলো।'

সাসাগাকি সময়গুলো মাথার মধ্যে গুছিয়ে নিলো একবার। যদি মাতসুরার ছয়টা থেকে সাড়ে ছয়টার কথা সত্য হয়ে থাকে, তবে ঐ সময়ের জন্য তার অ্যালিবাইটা পাওয়া গেল। আর ওর অ্যালিবাই যদি সত্য হয়, তবে ও খুনি হতেই পারে না।

সাসাগাকি সেই ইউনিয়ন সদস্যের নাম আর নাম্বার চাইলো তার কাছে। মাতসুরা বিজনেস কার্ডের একটা বাক্স বের করে খুঁজতে শুরু করে দিয়েছে, এমন সময় সিঁড়িতে যাওয়ার দরজাটা খুলে গেল। একটা বাচ্চা ছেলের মুখ দেখা যাচ্ছে। তার চোখদুটো সাসাগাকির চোখে পড়তেই সজোরে দরজাটা বন্ধ করে দিলো ছেলেটা। সাসাগাকি আর কোগা দুজনেই ওপাশের সিঁড়িতে তার দ্রুত উঠার ফলে ধপধপ আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে।

'মনে হচ্ছে ছেলেটা আজকে বাড়িতে আছে।'

'কী? ওহ, হ্যাঁ, স্কুল থেকে ফিরেছে কিছুক্ষণ আগে।'

'আমি যদি একটু ভেতরটা দেখে আসি, কিছু মনে করবেন?' সাসাগাকি সিঁড়িঘরের দিকে আঙুল তুলে দেখালো।

'আপনি উপর তলায় যেতে চান?'

'যদি কিছু মনে না করেন আর কি।'

'আরে না, কী মনে করবো? কোনো সমস্যা নেই।'

কোগাকে নাম আর নাম্বার টুকে নেওয়ার পরে সেই সিন্দুকের জায়গাটায় একবার দেখে আসার জন্য বললো সাসাগাকি। এরপর জুতোদুটো হাতে করে শেলফে রেখে পেছনের দরজাটার দিকে যেতে লাগলো। দরজাটা খোলার পর সিঁড়ির দিকে একবার তাকালো সে। বছরের পর বছর ধরে পায়ের মোজার সাথে ঘষা খেয়ে খেয়ে কাঠের সিঁড়িগুলো চকচকে কালো হয়ে গেছে। ভারসাম্য ঠিক রাখতে দেয়ালে এক হাত দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগলো সাসাগাকি।

উপরে উঠার পরে দুই রুমের মাঝখানে ছোট্ট একটা হলওয়ে দেখতে পেল সে। যার একপাশটা স্লাইডিং দরজা দিয়ে লাগানো আর অন্য পাশটা শোজি স্ক্রিন[৫] দিয়ে ঢাকা। হলওয়ের শেষ দিকে ছোট একটা দরজা দেখা যাচ্ছে। হতে পারে পোশাক রাখার মতো কোনো জায়গা নয়তো টয়লেট।

'রিও? আমি গোয়েন্দা সাসাগাকি বলছি। তোমার সাথে একটু কথা বলতে এসেছি,' হলওয়েতে ঢোকার সময় বলে উঠলো সে।

কয়েক মুহূর্ত কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। সাসাগাকি একটু দম নিয়ে আবার ডাক দিতে যাবে, এমন সময় ভেতর থেকে হুড়মুড়িয়ে ওঠার শব্দ শুনতে পেল। দ্রুত এগিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলে ফেললো সে। রিও তার ডেস্কেই বসে আছে, পিঠটা সাসাগাকির দিকে।

'ভেতরে আসবো?' সাসাগাকি ধীরপায়ে ছোট্ট ঘরটার ভেতরে ঢুকলো। দক্ষিণ-পশ্চিম পাশের এই ঘরটা জানালা দিয়ে আসা সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে।

যেভাবে বসেছিলো সেভাবে থেকেই রিও বলে উঠলো, 'আমি এ ব্যাপারে কিছুই জানি না, বুঝতে পেরেছেন?'

'খুবই ভালো কথা। এটাও কাজে লাগবে আমাদের। আমি কি একটু বসতে পারি?' একটা গদির দিকে ইশারা করে জিজ্ঞেস করলো সাসাগাকি। রিও তার কাঁধের পাশ দিয়ে একবার পেছনে তাকিয়ে মৃদুভাবে মাথা দোলালো কেবল।

সাসাগাকি বসে পড়লো, তারপর ছেলেটার দিকে তাকিয়ে বললো, 'তোমার বাবার সাথে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনার জন্য দুঃখিত।' রিও কিছুই বললো না। এমনকি পেছনে ঘুরেও বসলো না। ঘরটার দিকে একবার দেখলো সাসাগাকি। একটু বেশিই পরিষ্কার হয়ে আছে ঘরটা, যা সাধারণত একটা বাচ্চার ঘরে থাকার কথা না। দেয়ালে স্নানের পোশাক পরা কোনো মেয়ের পোস্টার নেই, নেই কোনো গাড়ির ছবি। বুকশেলফের উপরে কোনো মাঙ্গাও নেই, শুধু একটা এনসাইক্লোপিডিয়ার বই আর বাচ্চাদের বিজ্ঞানবিষয়ক দুটো বই পড়ে আছে: *কীভাবে গাড়ি চলে* আর *কীভাবে টেলিভিশন কাজ করে*।

সাসাগাকির চোখ দেয়ালের একটা ফ্রেমে গিয়ে আটকে গেল হুট করে। একটা সাদা কাগজ কেটে পালতোলা নৌকার মতো বানানো হয়েছে সেখানে। কাগজটা এতটা নিখুঁতভাবে কাটা হয়েছে যে জাহাজের পালের দড়িটা পর্যন্ত স্পষ্ট ফুটে আছে। সাসাগাকি এর আগে একটা অনুষ্ঠানে কাগজ কেটে ছবি বানানোর দৃশ্য দেখেছিলো, কিন্তু এটাকে সেগুলোর থেকেও বেশি জটিল মনে হচ্ছে।

'বেশ সুন্দর তো ওটা। তুমি বানিয়েছ নাকি?'

রিও ফ্রেমটার দিকে একপলক তাকিয়ে মাথাটা শুধু দোলালো একবার।

'ওয়াও!' সাসাগাকি বিস্ময়ের সাথে বলে উঠলো। তার অবাক হওয়ার বিষয়টা আসলেই সত্যি। 'বেশ দক্ষতার সাথে করেছ দেখছি। তুমি জানো তুমি চাইলে ওগুলো বিক্রিও করতে পারো।'

'আপনি কী জিজ্ঞেস করতে এসেছেন আমাকে?' বোঝাই যাচ্ছে রিও এরকম একটা মাঝবয়সি লোকের সাথে কথা বলতে পছন্দ করে না।

'ওহ, হ্যাঁ।' সাসাগাকি তার গদিটা ছেলেটার আরেকটু কাছে নিয়ে এলো। 'সেদিন কি তুমি বাড়িতে ছিলে?'

'সেদিন মানে কোন দিন?'

'যেদিন তোমার বাবা মারা যান।'

'ওহ আচ্ছা। হ্যাঁ, সেদিন বাড়িতেই ছিলাম।'

'ছয়টা থেকে সাতটা পর্যন্ত কী করছিলে?'

'সন্ধ্যায়?'

'হ্যাঁ, মনে করতে পারছো কিছু?'

বাচ্চাটা একটু থেমে ঘাড়টা চুলকে নিয়ে বললো, 'নিচ তলায় বসে টিভি দেখছিলাম।'

'একাই?'

'না, মায়ের সাথে বসে দেখছিলাম।'

সাসাগাকি মাথা নাড়লো একবার। ছেলেটার স্বরে কোনো রকম দ্বিধা আছে কি না তা ধরতে ব্যর্থ হলো। বললো, 'যদি কিছু মনে না করো, তবে এদিকে একটু ঘুরে বসো যাতে আমি একটু কথা বলতে পারি।'

রিও ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চেয়ারটা ঘুরিয়ে বসলো। সাসাগাকি ভেবেছিলো বাচ্চাটার চেহারায় অবাধ্যতার ছাপ দেখা যাবে, কিন্তু না, তার চেহারায় এরকম কোনো চিহ্ন নেই। ওর দৃষ্টি শূন্য, একদম প্রাণহীন–যেমনটা বিজ্ঞানীদের মাঝে থাকে। সাসাগাকির নিজের কাছেই কেন যেন মনে হচ্ছে ওকেই বুঝি পরখ করা হচ্ছে এখানে।

'তোমার কি মনে আছে কোন শো-টা দেখছিলে তোমরা?' জিজ্ঞেস করলো সাসাগাকি। যতটা স্বাভাবিক থাকা যায়, ততটা স্বাভাবিক থেকেই প্রশ্নটা করলো সে।

রিও তাকে কিছু টিভি সিরিজের নাম বললো এরপর। সাসাগাকি সেদিনের এপিসোড কী বিষয় নিয়ে হয়েছিলো তা জিজ্ঞেস করলো। রিও কিছুক্ষণ চুপ থেকে পরে সেদিন টিভিতে কী কী দেখেছে তার একটা চমৎকার সারসংক্ষেপ বলে দিলো। সাসাগাকি এর আগে সেই সিরিজটা কখনো দেখেনি, কিন্তু ছেলেটার দেওয়া বর্ণনায় সে অনায়াসে কল্পনা করতে পারছে সিরিজটা আসলে কেমন হতে পারে।

'কতক্ষণ টিভি দেখেছ সেদিন?'

'সাড়ে সাতটা নাগাদ।'

'তারপর কী করলে?'

'মায়ের সাথে রাতের খাবার খাই।'

'বুঝলাম। তোমার বাবার তখনো বাড়িতে না ফেরায় নিশ্চয়ই দুশ্চিন্তা করছিলে?'

'হ্যাঁ,' মৃদু স্বরে বললো রিও। হালকা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো এরপর। সাসাগাকিও বাইরে তাকালো। বাইরে সূর্য ডুবছে। পুরো আকাশটা গোধূলির রঙে ছেয়ে গেছে ততক্ষণে।

'ওকে,' বলে উঠলো সাসাগাকি। 'হোমওয়ার্ক করার সময়ে তোমাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত। তুমি এখন তোমার কাজে ফিরে যেতে পারো।' বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ছেলেটার কাঁধে আলতো করে হাত রাখলো সে।

***

সাসাগাকি আর কোগা এরপরে হেডকোয়ার্টারে ফিরে গিয়ে বাকি যে দুজন গোয়েন্দা ইয়েকোকে প্রশ্ন করেছিলো, তাদের তথ্যের সাথে মেলাতে লাগলো সবকিছু। এমন কোনো তথ্য পায়নি যেটা মাতসুরার কথার সাথে সাংঘর্ষিক হতে পারে। মহিলাও স্বীকার করেছে যে ঐ কাস্টমারটা যখন এসেছিলো, ও আর রিও তখন একসাথে বসে টিভি দেখছিলো। এও বলেছে যে হয়তো বেলের শব্দ পেয়েছে, কিন্তু তার মনে নেই কারণ সে কখনোই এসবে নাক গলায়নি। আরো বলেছে যে ও যখন টিভি দেখছিলো, তখন মাতসুরা কী করছিলো তা সে জানে না। টিভিতে দেখা প্রোগ্রামের বর্ণনাও মিলে গেছে। হয়তো ইয়েকো আর মাতসুরা দুজনে মিলে আগে থেকে সব ঠিক করে রেখেছে যাতে নিজেদের অ্যালিবাই আরো শক্ত করা যায়, কিন্তু রিওর উপস্থিতি পুরো দৃশ্যপট পালটে দিয়েছে। কেউ কিছু মুখ ফুটে না বললেও ডিপার্টমেন্টের সবার মধ্যে এই ভাবনা তৈরি হয়ে গেছে যে তারা তিনজনই সত্য বলছে।

প্রমাণ এলো এর কিছু পরে। মাতসুরা যে ফোনকলের কথা বলেছিলো সেটার রেকর্ড অনুযায়ী, কল করার সময় ছিলো সন্ধ্যা ছয়টা থেকে সাড়ে ছয়টার মধ্যে। ইউনিয়নের সেই সদস্যও নিশ্চিত করেছে যে সে মাতসুরার সাথে ফোনে কথা বলেছিলো।

এরপর চক্রাকারে তদন্তের কাজ চলতে থাকে। পনশপ, সেই বিল্ডিং ইত্যাদি জায়গায় কিছু প্রশ্ন করা ছাড়া আর কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। শুধু ক্যালেন্ডারের দিনই পালটেছে এরপর, তার বাইরে তেমন কোনো অগ্রগতি হয়নি এই কেসে। ওদিকে তত দিনে বেসবল খেলায় একটানা নয়টা ম্যাচ জিতেছে *ইওমিউরি জায়ান্টস*, আর লিও ইসাকি পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল জিতেছে। এছাড়া, ইওম কিপ্পুর যুদ্ধের কারণে তেলের দামও বেশ বেড়ে গেছে, ফলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছে কিছু একটা ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে সামনে।

তারপর যখনই তদন্ত কর্মকর্তারা অধৈর্য হয়ে উঠছিলো কেসটা নিয়ে, ঠিক তখনই নতুন কিছু তথ্য নিয়ে এলো কিছু গোয়েন্দা কর্মকর্তা। ফুমিও নিশিমোতোর উপর নজর রাখা হয়েছিলো সেই ঘটনার পর থেকে। আর সেখান থেকেই উঠে এসেছে এই তথ্যগুলো।

***

কিকুয়া উদন শপটা বেশ সুন্দরই বলা যায়। কাঠের তৈরি দরজাটায় একটা নেভি ব্লু রঙের নোরেনে[^] দোকানটার নাম সুন্দর করে সাদা হরফে লেখা হয়েছে। যথেষ্ট খ্যাতি আছে বলতে হবে দোকানটার। বেলা একটা বাজেও অনেক ভিড়, সাথে কোনো রকম অব্যবসায়ী কর্মকাণ্ডের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না।

দেড়টার সময় দোকানটার পাশের রাস্তায় একটা ভ্যান এসে থামলো। ভ্যানটার সাইডে বড় করে লেখা নামটা বলে দিচ্ছিলো এটা সোয়ালোটেল ইনক কোম্পানির গাড়ি। একটা লোক বেরিয়ে এলো গাড়ির ড্রাইভিং সিট থেকে। গাট্টাগোট্টা ধরনের লোকটাকে দেখতে বয়স চল্লিশের আশেপাশে মনে হচ্ছে। একটা সাদা শার্টের উপরে ধূসর রঙের জ্যাকেট পরেছে। দ্রুত হেঁটে লোকটা দোকানের ভেতরে ঢুকে পড়লো।

'একদম সময়মতো, হাঁহ!' সাসাগাকি তার ঘড়িটার দিকে একবার তাকিয়ে বললো। 'কাঁটায় কাঁটায় একটা ত্রিশ।' সাসাগাকি কিকুয়া উদন শপটার পাশের একটা ক্যাফেতে বসে এতক্ষণ জানালা দিয়ে ওদিকেই তাকিয়ে ছিলো।

পাশ থেকে গোয়েন্দা কানেমুরা বলে উঠলো, 'আমি এটাও বলতে পারি এখন সে কী অর্ডার করবে: টেম্পুরা উদন।'

'আচ্ছা, তাই নাকি?'

'চাইলে বাজিও ধরতে পারি। ওকে অনেক দিন ধরেই অনুসরণ করছি আমি। টেরাসাকি সব সময় একই জিনিস খেতে পছন্দ করে।'

'তার তো এতে বিরক্তি এসে যাওয়ার কথা।' সাসাগাকি একবার পেছনে ফিরে দোকানটার দিকে দেখলো। উদন নিয়ে এই সব কথাবার্তা শুনে ওর পেটও গুড়গুড় করে সায় দিচ্ছে।

যদিও ফুমিওর অ্যালিবাই অনেকটা কাজে দিয়েছে, কিন্তু তবুও সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের তালিকা থেকে তাকে এখনো বের করে দেওয়া হয়নি। পুরো টিমের কাছে এটাই মনে হয়েছে যে সে-ই একমাত্র ব্যক্তি যার সাথে কিরিহারা জীবিত অবস্থায় দেখা করেছিলো। যদি সে এই হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত থাকে, তবে অবশ্যই তার একজন সহযোগী থাকার কথা। এর পরিপ্রেক্ষিতেই গোয়েন্দারা একটা ফাঁদ পাতে। খোঁজ নেওয়া শুরু করে যে এই যুবতী নারীর কোনো প্রেমিক আছে কি না। আর তখনই তারা তাদাও টেরাসাকিকে খুঁজে পায়।

টেরাসাকি বিভিন্ন কসমেটিকস, প্রসাধনী, শ্যাম্পু, ডিটারজেন্ট ইত্যাদি পণ্য পাইকারিতে বিক্রি করে জীবনযাপন করে। খুচরা বিক্রেতাদের কাছে বিক্রি করা সহ সরাসরি ক্রেতাদের কাছ থেকে অর্ডার নিয়ে ব্যক্তিগতভাবে তাদের বাসায় গিয়ে ডেলিভারিও করে আসে সে। তার পোশাকটাতেও সোয়ালোটেল ইনক-এর নাম রয়েছে। টেরাসাকি নিজেই কোম্পানিটার মালিক এবং একমাত্র কর্মী।

টেরাসাকির নামটা গোয়েন্দাদের কাছে আসে ফুমিও নিশিমোতোর প্রতিবেশীদের কাছে তার ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করার সময়ে। একজন গৃহিণী বলে যে সে নাকি একটা সাদা ভ্যানে করে একজন লোককে প্রায়ই ফুমিওর অ্যাপার্টমেন্টে আসা-যাওয়া করতে দেখেছে। মহিলা কোম্পানির নাম বলার চেষ্টা করেছিলো, কিন্তু মনে না পড়ায় শুধু লোগোর কথা বলেছে। একটা প্রজাপতি আঁকা ছিলো সেই ভ্যানে।

এরপর গোয়েন্দারা ইওশিদা হাইটসের আশেপাশে লুকিয়ে থাকে, কিন্তু সেই ভ্যান আর আসে না। কিন্তু একই রঙের একটা গাড়ি তারা খুঁজে পায় কিকুয়া উদন শপের এখানে-যেখানে ফুমিও কাজ করে। ওরা জানতে পারে একটা সাদা ভ্যান সেখানে রোজ আসা-যাওয়া করে। আর কোম্পানির নাম থাকার কারণে কোম্পানির মালিককে বের করাটা গোয়েন্দাদের পক্ষে ততটা কষ্টসাধ্য ছিলো না।

'বেরিয়ে গেছে সে,' বলে উঠলো কোগা। দরজার দিকে নজর রাখাটা তার দায়িত্বের মধ্যে ছিলো। তিন গোয়েন্দাই ঘুরে তাকালো রাস্তার দিকে। টেরাসাকি দোকান থেকে বেরিয়েছে ঠিকই, কিন্তু ভ্যানের দিকে যাচ্ছে না। সে ওখানেই দাঁড়িয়ে আছে। এই যে দাঁড়িয়ে থাকা, এটাও তারা কানেমুরার রিপোর্টের পরে ঘটবে বলে ধরে নিয়েছিলো।

এর কিছুক্ষণ বাদে একটা সাদা অ্যাপ্রোন পরা অবস্থায় দোকান থেকে বেরিয়ে এলো ফুমিও। টেরাসাকির সাথে অল্প একটু কথা বলে তাকে গাড়ির পাশে রেখে

আবার দোকানের ভেতরে ঢুকলো। ওদেরকে যে কেউ দেখে ফেলতে পারে তা নিয়ে দুজনের কারো ভেতরেই দুশ্চিন্তা দেখা গেল না।

'চলো, যাওয়া যাক,' হাতের সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে ডলা দিয়ে উঠে দাঁড়ালো সাসাগাকি।

টেরাসাকি ভ্যানগাড়ির দরজাটা খুলতে যাচ্ছিলো, এমন সময় পেছন থেকে কোগা ডাক দিলো তাঁকে। ডাক শুনে পেছনে ফিরলো টেরাসাকি, চোখেমুখে চমকে যাওয়ার ছাপ স্পষ্ট। যখন সাসাগাকি আর কানেমুরাকেও আসতে দেখলো, তখন তার মুখটা হঠাৎ শক্ত হয়ে গেল একদম।

টেরাসাকি তাদের সাথে কথা বলতে রাজি হলে তারা ক্যাফেতে যেতে চেয়েছিলো, কিন্তু টেরাসাকি গাড়িতে বসেই কথা বলবে বলে ঠিক করলো। তাই তারা চারজনই গাড়িতে উঠে বসলো। ড্রাইভিং সিটে টেরাসাকি, তার পাশে সাসাগাকি আর পেছনের দুই সিটে কোগা আর কানেমুরা।

ওয়ে এলাকায় ঘটে যাওয়া কিরিহারা হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে কোনো কিছু জানে কি না সে বিষয়ে ওকে জিজ্ঞেস করলো সাসাগাকি।

'আমি খবরের কাগজে নইলে টেলিভিশনে খবরটা দেখেছি,' বললো টেরাসাকি। চোখদুটো রাস্তার উপরে নিবদ্ধ। 'সেই কেসের সাথে আমার কী সম্পর্ক?'

'মি. কিরিহারা খুন হওয়ার আগে যে জায়গায় শেষবার গেছিলো সেটা ছিলো ফুমিও নিশিমোতোর বাসা। আর আপনি নিশিমোতোকে চেনেন বলে মনে হচ্ছে, তাই না?'

টেরাসাকি স্পষ্টভাবে একটা ঢোক গিললো, যেটা গাড়িতে বসে থাকা কারোই নজর এড়ায়নি। 'নিশিমোতো, মানে নুডলস শপে কাজ করে যে মহিলাটা? হ্যাঁ, চিনি আমি।'

'সেটাই। আমাদের মনে হয় তিনি এই বিষয়টার সাথে কোনো না কোনোভাবে জড়িত।'

'হাস্যকর,' ফিক করে হেসে বললো টেরাসাকি। এরপরই ঠোঁটদুটো বেশ চওড়া হাসিতে পরিণত হলো।

'তাই নাকি?' জিজ্ঞেস করলো সাসাগাকি।

'তা নয়তো কী? এর সাথে তার আবার কীসের সম্পর্ক থাকবে?'

'মি. টেরাসাকি, আপনি বলেছেন আপনি কেবল তাকে চেনেন, অথচ এরমধ্যেই তাকে বাঁচানোর জন্য লড়াই শুরু করে দিয়েছেন?'

'আমি কাউকেই বাঁচাচ্ছি না।'

'ইওশিদা হাইটসের আশেপাশে একটা সাদা ভ্যান ঘুরতে দেখা গেছে, আর সেই গাড়ির ড্রাইভারকে নিশিমোতোর অ্যাপার্টমেন্টেও আসা-যাওয়া করতে দেখা গেছে। সেই মানুষটা আপনিই? তাই তো, মি. টেরাসাকি?'

টেরাসাকির চেহারায় একধরনের ক্ষোভ ফুটে উঠেছে ততক্ষণে। ঠোঁটদুটো জিভ দিয়ে ভিজিয়ে বললো, 'সে আমার একজন কাস্টমার। তাই আমি যেতেই পারি।'

'একজন কাস্টমার?'

'ঐ কসমেটিক, ডিটারজেন্ট ইত্যাদির আর কি। আমি সেসব তার দেওয়া অর্ডার অনুযায়ী দিয়ে আসি। এই-ই যা।'

'জেনে রাখুন, মি. টেরাসাকি, আপনি যদি আমাদের কাছে মিথ্যা বলে থাকেন, তবে খুব অল্প সময়ের মধ্যে আমরা সেটা বের করে ফেলবো। আমাদের কাছে এমন সাক্ষী আছে যে আপনাকে সেই অ্যাপার্টমেন্টে যাতায়াত করতে দেখেছে। আর আমার এমনিতেও মনে হয় না ফুমিওর এত বেশি কসমেটিকের প্রয়োজন আছে।'

হাতদুটো ভাঁজ করে চোখ বন্ধ করে ফেললো টেরাসাকি।

'আপনি মিথ্যা বলতে থাকুন, সমস্যা নেই। একটা পর একটা মিথ্যা বলতে বলতে হাঁফিয়ে ওঠার আগ পর্যন্ত বলতে থাকুন। আমরা শুধু আপনার উপর নজর রাখবো। আপনি আবারো নিশিমোতোর সাথে দেখা করার আগ পর্যন্ত আমরা আপনার পিছু ছাড়বো না। এখন ভাবুন কী করবেন। তার সাথে আর কখনোই দেখা করবেন না? আমার মনে হয় সেটা আপনাদের দুজনের জন্যই বেশ কঠিন হয়ে যাবে। দেখুন, এর চেয়ে ভালো হয় আপনি আমাদের সত্যটা বলে দিন যে আপনি আর নিশিমোতো প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়েছেন। জড়াননি, মি. টেরাসাকি?' সাসাগাকি ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে লাগলো টেরাসাকি তার পরের পদক্ষেপটা কী নেয় তা দেখার জন্য।

অনেকক্ষণ বাদে সে একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে চোখ খুললো। 'আপনার কাছে এছাড়া আর কিইবা মনে হতে পারে? আমি সিঙ্গেল, আর সে বিধবা।'

'তার মানে সম্পর্কের ব্যাপারটাই ঠিক, তাই তো?'

'জি। আমরা দুজন দুজনের সাথে কথা বলছি আজ অনেক দিন ধরে। আর সম্পর্কটা ঠুনকো না, আমরা দুজনেই এ ব্যাপারে নিশ্চিত,' বলে উঠলো টেরাসাকি।

'কখন থেকে সম্পর্কে জড়িয়েছেন আপনারা?'

'এসব কিছু বলতে হবে আপনাকে?'

'কৌতুক মনে করে বলতে পারেন,' হেসেই জবাব দিলো সাসাগাকি।

'এই ছয় মাস আগে থেকে,' বললো টেরাসাকি। তার চোখেমুখে অনিচ্ছার ছাপ স্পষ্ট।

'হঠাৎ কী থেকে শুরু হলো সম্পর্কটা?'

'তেমন আহামরি কিছু না। আমরা দুজন দুজনকে কিকুয়া শপে দেখেছিলাম প্রথম, এরপর ভালো বন্ধু হয়ে যাই। বাকিটা তো আপনি বুঝতেই পারছেন।'

'সে কি আপনার সাথে মি. কিরিহারার ব্যাপারে কখনো কোনো কথা বলেছে?'

'যতটুকু আমি জানি তা হলো সে একটা পনশপ চালাতো, আর ফুমিও সেখানে মাঝে মাঝে যেত।'

'আপনি এটা জানতেন যে মি. কিরিহারা প্রায়ই ফুমিওর অ্যাপার্টমেন্টে যাওয়া-আসা করতেন?'

'হ্যাঁ, শুনেছি।'

'শোনার পরে আপনার কাছে বিষয়টা কেমন লেগেছিলো?'

টেরাসাকির ভ্রুদুটো হঠাৎ একসাথে নেচে উঠলো। চেহারায় ফুটে উঠেছে অসন্তুষ্টির ছাপ। 'এর দ্বারা কী বোঝাতে চাচ্ছেন?'

'আপনার কখনো মনে হয়নি যে মি. কিরিহারার অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছিলো?'

'এরকম ভাবার জন্য কোনো নির্দিষ্ট কারণ না থাকলে কেন ভাববো? একটা বিষয়ে বলে রাখি: ফুমিও সেরকম কোনো মেয়ে না।'

'সে মি. কিরিহারার কাছে যথেষ্ট ঋণী ছিলো বলে জেনেছি আমরা। লোকটা হয়তো আর্থিকভাবেও তাকে সাহায্য করতো। আপনার কাছে কী মনে হয়? যদি মি. কিরিহারা সেরকম কোনো বিষয়ে চাপ দিয়ে থাকে তো সেটা ফিরিয়ে দেওয়া ফুমিওর জন্য কঠিন ছিলো?'

'যদি সে চাপ দিয়েও থাকে অমন কিছুর জন্য, আমি এ ব্যাপারে তেমন কিছুই শুনিনি। আপনারা কী বের করতে চাচ্ছেন মূলত, বলবেন?'

'তেমন কিছুই না। আমি শুধু একটা বিষয়ে ভাবছি। একটা দৃশ্যপট কল্পনা করছি বলা যায়। একজন পুরুষ রোজ একটা মেয়ের বাসায় যায়, যাকে আপনি পছন্দ করেন। মেয়েটার দুরবস্থার কারণে মেয়েটা চাইলেও তাকে দূরে সরিয়ে দিতে পারছে না। লোকটা তাকে সাহায্য করতে চায়, কিন্তু এর বিনিময়ে কিছু একটা চায় যা সে মেয়েটাকে জানায়ও। কিন্তু সেই বিষয়টা তার প্রেমিক হয়েও আপনার ভালো লাগবে, আমি আসলে এটাই মানতে পারছি না।'

'তো কী বলতে চাচ্ছেন? আমি আমার রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে তাকে খুন করেছি? আমাকে দেখে কি এতটাই বোকা মনে হচ্ছে?' টেরাসাকির গলার স্বর ভ্যানের মধ্যে গমগম করে উঠলো।

সাসাগাকি একটা হাত হাওয়ায় ভাসিয়ে বললো, 'আমি শুধু একটা দৃশ্য কল্পনা করছিলাম, এই-ই যা। আমার প্রশ্ন শুনে বিরক্ত হলে দুঃখিত। প্রসঙ্গক্রমে জিজ্ঞেস করছি, আপনি এ মাসের বারো তারিখ শুক্রবারে সন্ধ্যা ছয়টা থেকে সাতটার মধ্যে কোথায় ছিলেন বলতে পারবেন?'

'কী! আপনি কি এখন অ্যালিবাই চাচ্ছেন আমার?' চোখ পিটপিট করে বললো টেরাসাকি।

'সেরকমই কিছু একটা,' হেসে জবাব দিলো সাসাগাকি। মানুষ এখন খুব তাড়াতাড়ি অ্যালিবাইয়ের বিষয়ে প্রশ্ন করে বসে। এর পুরো কৃতিত্ব হলো একটা জনপ্রিয় গোয়েন্দা শোয়ের।

টেরাসাকি ছোট একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট বই বের করলো পকেট থেকে। কয়েকটা পৃষ্ঠা উলটাতে লাগলো ধীরে ধীরে। 'এই যে দেখুন, বারো তারিখ সন্ধ্যায় আমি তোয়োনাকায় ডেলিভারি করছিলাম।'

'কোন সময় ছিলো এটা?'

'কাস্টমারের বাড়িতে আমি ছটা নাগাদ পৌঁছেছিলাম।'

যেটা তার জন্য চমৎকার একটা অ্যালিবাই, মনে মনে ভাবলো সাসাগাকি। *এইটাও তবে হাতছাড়া হয়ে গেল।*

'ডেলিভারিটা কি তখনই শেষ হয়ে গেছিলো?'

'না। ওখানে একটু যোগাযোগের ঘাটতি হয়েছিলো,' বিড়বিড় করে বললো টেরাসাকি। 'আমি গিয়ে দেখি কাস্টমার তখন বাইরে। তাই আমি সেখানে আমার বিজনেস কার্ড রেখে বাড়ি চলে আসি।'

'ওরা আপনার আসার কথা জানতো না?'

'আমার মনে আছে আমি তাকে যাওয়ার পথে ফোনে বলেছিলাম। হয়তো শোনেনি আমার কথা।'

'তার মানে আপনি বাড়ি ফিরে গেছিলেন কাউকে না পেয়েই?'

'হ্যাঁ, কিন্তু আমি আমার কার্ড ফেলে এসেছিলাম।'

মাথা দোলালো সাসাগাকি। ভাবছে, এই কার্ড সে অনেক উপায়েই ঐ বাসার দুয়ারে রেখে আসতে পারে। এরপর তোয়োনাকার সেই বাড়িটার ঠিকানা এবং কন্টাক্ট নাম্বার নিয়ে টেরাসাকিকে ছেড়ে দিলো।

থানায় ফেরার পরে নাকাতসুকা জানতে চাইলো সাসাগাকি আসলেই টেরাসাকিকে অপরাধী ভেবেছিলো কি না।

'ফিফটি-ফিফটি,' সাসাগাকির নিরেট জবাব। 'তার কাছে কোনো অ্যালিবাই ছিলো না, আর খুন করার মতো যথেষ্ট শক্ত কারণ ছিলো। আমার মনে হয় যদি সে ফুমিও নিশিমোতোর সাথে মিলে কাজটা করার উদ্যোগ নিয়ে থাকে, তবে বেশ ভালোভাবেই সেটা করা সম্ভব ছিলো। কিন্তু যে জিনিসটা আমাকে ভাবাচ্ছে তা হলো, ওরা যদি খুনি হয়েই থাকে, তবে খুনের পরে এতটা উদাসীন থাকার কথা না ওদের। খুনি হলে কেসটা ধামাচাপা পড়ার আগ পর্যন্ত দেখাদেখি বন্ধ রাখতো ওরা। কিন্তু এই দুজন এসবের কিছুই করেনি। টেরাসাকি এখনো সেই নুডলসের দোকানে গিয়ে দেখাসাক্ষাৎ করছে। আসলে ধরা যাচ্ছে না বিষয়টা।'

নাকাতসুকা চুপচাপ প্রত্যেকটা কথা শুনলো। ভ্রুকুটি দেখে বোঝার বাকি রইলো না যে তার প্রত্যেকটা কথার সাথে একমত সে।

এবার তদন্তকারী অফিসাররা তাদের মনোযোগ পুরোপুরিভাবে সোয়ালোটেল ইনক কোম্পানির দিকে নিবদ্ধ করলো।

***

টেরাসাকি একা যে অ্যাপার্টমেন্টটাতে থাকে, সেই অ্যাপার্টমেন্টে যেতে হলে শহর থেকে পনেরো মিনিটের মতো দক্ষিণ দিকে যেতে হয়। এর আগে একবার বিয়ে হয়েছিলো তার। দুই পক্ষের সম্মতিতে তা ডিভোর্স পর্যন্ত গড়ায় পাঁচ বছর আগে। কাস্টমারদের কাছে তার সুনাম রয়েছে বেশ। সে দ্রুত কাজ করা সহ বেশ শ্রমের কাজ অল্প দামে করে দিতো। বিভিন্ন খুচরা দোকানদারদের মধ্যে যাদের সাথে সে কাজ করতো, তারা সবাই তাকে পছন্দ করতো। অবশ্য, এতে করে হত্যাকাণ্ডের ঘটনা থেকে তার নাম মুছে যায় না। বলা যায় এসবের কারণে গোয়েন্দারা আরো বেশি করে আগ্রহী হচ্ছিলো এটা জানতে যে এত খেটেও কেন আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হচ্ছিলো না টেরাসাকি।

টিম মিটিংয়ের সময় টেরাসাকির আর্থিক অবস্থার হিসাব রাখা এক গোয়েন্দা একদিন বললো, 'হয়তো এটা সত্য যে ফুমিওর দিকে হাত দেওয়ার কারণেই টেরাসাকি কিরিহারাকে হত্যা করেছে। কিন্তু আরো একটা ব্যাপার আছে এখানে। খুব সম্ভবত তার মনে ঐ এক মিলিয়ন ইয়েনের প্রতি লোভ জেগেছিলো।' বাকি সবাই একমত হয়েছিলো এতে।

ওরা তত দিনে টেরাসাকির অ্যালিবাইয়ের ঘাটতি সম্পর্কে অবগত হয়ে গেছিলো। টেরাসাকির দেওয়া ঠিকানায় গিয়ে তারা জানতে পারে যে সেদিন সেই মহিলা তার এক আত্মীয়ের বাসায় গেছিলো, এবং রাত এগারোটা নাগাদ বাসায় ফিরেছিলো। সে টেরাসাকির ফেলে যাওয়া কার্ডটা পেয়েছিলো ঠিকই, কিন্তু সেটা কখন ফেলে গেছে তা বলা মুশকিল। যখন তাকে জিজ্ঞেস করা হলো যে টেরাসাকির আসার জন্য অপেক্ষা করেছিলো কি না, তখন জবাবে বললো, 'বলেছিলো যে সে আসবে, কিন্তু নির্দিষ্ট কোনো তারিখের কথা বলেনি।' এরপর মহিলা আরো একটু যোগ করলো, 'বরং আমার মনে আছে আমি টেরাসাকিকে বলেছিলাম বারো তারিখ আমি ব্যস্ত থাকবো।' শেষের অংশটা এখানে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যদি টেরাসাকি আগে থেকে জানতো যে মহিলা বাড়ির বাইরে থাকবে, তবে চমৎকার একটা অ্যালিবাই তৈরি করার সুযোগ ওখানেই পেয়ে গেছিলো সে।

মহিলার এই মতামত পুরো তদন্ত টিমকে টেরাসাকিকেই সন্দেহ করার সুযোগ করে দেয়।

তবে ওদের কাছে বাস্তব প্রমাণের অভাব ছিলো। ঘটনাস্থলে পাওয়া চুলের সাথে টেরাসাকির চুলের কোনো মিল পাওয়া যায়নি, এমনকি আঙুলের ছাপের সাথেও না। কোনো সাক্ষী নেই। যদি ফুমিও আর টেরাসাকি ষড়যন্ত্রকারী হয়ে থাকে, তবে তাদের মধ্যে অবশ্যই সেদিন কোনো না কোনো মাধ্যমে কথা হয়ে থাকবে, কিন্তু সেটারও কোনো চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কিছু বয়স্ক গোয়েন্দা অবশ্য ভেবেছিলো তাকে থানায় এনে জিজ্ঞাসাবাদ করে সত্য বলতে বাধ্য করবে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, ওকে আটক করার জন্য যতটুকু প্রমাণ থাকা দরকার, ততটুকুও তাদের কাছে নেই।

এক মাস কেটে গেছে তত দিনে। কেসের কোনো অগ্রগতি নেই। এত দিন তবু গোয়েন্দারা কাজের চাপের কারণে যেখানে জায়গা পেত সেখানেই ঘুমিয়ে পড়তো, কিন্তু এখন তারা বাড়িতে যাওয়া শুরু করেছে। সাসাগাকিও এই ফাঁকে গরম পানি দিয়ে আরাম করে গোসল করতে বাড়িতে চলে আসে।

সাসাগাকি বিবাহিত। ইয়াও সিটি স্টেশনে থাকে সে। জায়গাটা তার বর্তমান হেডকোয়ার্টার থেকে ঘণ্টাখানেক দূরে। স্ত্রী কাতসুকো ওর থেকে তিন বছরের বড়, আর কোনো সন্তান নেই তাদের।

***

স্ত্রীর দ্রুত কাপড় বদলানোর শব্দ শুনে জেগে উঠলো সাসাগাকি। ঘড়ির দিকে তাকালো সে। সাতটার একটু বেশি বাজে।

'কোথাও যাচ্ছো নাকি?' ফুটনে' শুয়ে থেকেই জিজ্ঞেস করলো সাসাগাকি।

'ওহ, সরি, তোমাকে জাগাতে চাইনি আসলে। আমি একটু সুপারমার্কেটে যাবো।'

'তুমি শপিংয়ে যাচ্ছো? এই সময়ে?'

'এখনই গিয়ে লাইন না ধরলে কিছুই পাওয়া যাবে না।'

'কী পাওয়া যাবে না? কী কিনতে যাচ্ছো তুমি?'

'টয়লেট পেপার।'

'হাঁহ? টয়লেট পেপার?'

'গতকালও গেছিলাম, বুঝলে? কিন্তু পাইনি। ওরা একজনকে মাত্র একটা করে দিচ্ছে, জানো তো। তুমি অনেক ভাগ্য নিয়ে জন্মেছ যে আমি তোমাকে সাথে করে নিচ্ছি না।'

'এত টয়লেট পেপার দিয়ে করবেটা কী শুনি?'

'তুমি যদি তেলের দাম বাড়ার ব্যাপারটা জেনে না থাকো, তবে এখন আমার হাতে সময় নেই তা ব্যাখ্যা করার। পরে বলবো এসব।' বলেই কাতসুকো দ্রুত ব্যাগের চেইন লাগিয়ে বেরিয়ে গেল। কিছুটা দ্বিধার মধ্যে পড়ে গেল সাসাগাকি। তদন্তের ভেতর এতটাই ডুবে ছিলো যে বিশ্বে কী হচ্ছে না হচ্ছে তার কোনো খবর

ওর কাছে ছিলো না। সে তেলের দামের বিষয়টা জানতো, কিন্তু এতে টয়লেটের পেপারের কী ভূমিকা থাকতে পারে তা বুঝতে পারলো না। আর তার চেয়েও বড় কথা, এত ভোরবেলা মানুষই বা কেন সেটা পেতে লম্বা লাইন লাগাবে? সে এ বিষয়ে কাতসুকোকে পরে জিজ্ঞেস করার সিদ্ধান্ত নিয়ে আবার চোখ বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়লো।

এর কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ ফোন বেজে উঠলো পাশ থেকে। বালিশের তলা থেকে ফোনটা ধরার জন্য হাত বাড়ালো সে। মাথাটা ঝিম ধরে আছে তার, আর তাই চোখটাও পুরো খুললো না।

'হ্যালো, সাসাগাকি বলছি।'

বিছানা ছেড়ে উঠে বসতে দশ সেকেন্ডের মতো সময় লাগলো তার। চোখ থেকে ঘুম কোথায় হারিয়ে গেছে তার আর হদিস পাওয়া গেল না। তাদাও টেরাসাকি মারা গেছে। ফোনের ওপাশ থেকে এটাই বলা হয়েছে তাকে।

ওসাকার মূল এক্সপ্রেসওয়েতে মারা গেছে টেরাসাকি। একটা গোল চত্বরে ঠিকভাবে গাড়ি না ঘোরাতে পারার কারণে ডিভাইডারের সাথে গিয়ে ধাক্কা লাগে। গাড়ি চালাতে চালাতে ঘুমিয়ে যাওয়া চালকদের জন্য এটা খুবই স্বাভাবিক একটা ঘটনা।

তার গাড়িটা যথেষ্ট পরিমাণে সাবান এবং ডিটারজেন্ট দিয়ে ভরা ছিলো। মানুষ কিনে কিনে জমিয়ে রাখার জন্য চাহিদা বেড়ে যাচ্ছিলো, ফলে টেরাসাকি সবার চাহিদা মেটানোর জন্য যতটুকু সম্ভব ততটুকু নিতে চেয়েছিলো।

এরপর সাসাগাকি এবং আরো কিছু গোয়েন্দা মিলে টেরাসাকির বাসায় খোঁজ লাগায় এটা দেখতে যে ইওসুকে কিরিহারার হত্যার সাথে সম্পর্কিত কোনো ক্লু সেখানে পাওয়া যায় কি না। কিন্তু এই অপারেশন ইতোমধ্যেই ব্যর্থতার খাতায় চলে গেছে। কারণ যদি তারা কিছু খুঁজেও পায় এখন, তবুও কোনো লাভ নেই। তাদের মূল আসামি ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গেছে।

শেষমেশ একজন গোয়েন্দা ভ্যানে দস্তানা রাখার জায়গায় একটা ডানহিল লাইটার খুঁজে পায়। এই মডেলটা আকারে লম্বা, কোনার দিকগুলো সুচালো। গোয়েন্দারা সবাই-ই জানতো যে একই ব্র্যান্ডের একটা লাইটার হত্যার সময় কিরিহারার সাথে ছিলো। কিন্তু মৃতদেহের সন্ধান পাওয়ার পর লাইটারটা আর খুঁজে পাওয়া যায়নি।

অবশ্য, ভ্যানে পাওয়া এই লাইটারে কারো ফিংগারপ্রিন্ট খুঁজে পাওয়া যায়নি। এমনকি কিরিহারারও না। বোঝাই যাচ্ছিলো মুছে দেওয়া হয়েছে ইতোমধ্যেই।

ওরা লাইটারটা ইয়েকোকে একবার দেখালো। কিন্তু ওটা দেখে মাথা ঝাঁকালো মহিলা। বললো যে এটা দেখতে তার স্বামীরটার মতোই, কিন্তু সে পুরোপুরি নিশ্চিত না।

গোয়েন্দা কর্মকর্তারা ফুমিও নিশিমোতোকে থানায় নিয়ে এলো জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। গোয়েন্দারা বেশ ধৈর্য সহকারে তার স্বীকারোক্তি নেওয়ার জন্য সব ধরনের চেষ্টা চালাতে লাগলো। ওরা এমনভাবে প্রশ্ন করতে শুরু করলো যেন সেই লাইটারটা কিরিহারার নিজের ছিলো।

'তো বলুন?' চোখের সামনে লাইটারটা ভাসাতে ভাসাতে বললো একজন গোয়েন্দা। 'আপনি কি ভিক্টিমের পকেট থেকে এটা বের করে টেরাসাকিকে দিয়েছেন? নাকি টেরাসাকি নিজেই বের করেছিলো? কোনটা হবে? জবাব দিচ্ছেন না কেন, হ্যাঁ?'

এত কিছুর পরও ফুমিও তার জড়িত থাকার ব্যাপারে অস্বীকার করে যাচ্ছিলো। আঁতকে ওঠা বা ভেঙে পড়ার কোনো চিহ্নই তার মুখে নেই। টেরাসাকির অকস্মাৎ মৃত্যুতে তার কিছুটা হলেও কষ্ট পাওয়াটা খুবই স্বাভাবিক হতো, কিন্তু তার আচরণে তেমন কোনো বিহ্বলতার চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়নি।

নিশ্চয়ই আমাদের কোথাও একটা ভুল হয়েছে, সাসাগাকি ভাবলো। ইন্টারোগেশন রুমের পাশের কক্ষে বসে এখানকার সব কথা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে সে। *কোনো একটা জায়গায় আমরা রাস্তা হারিয়েছি, আর তার কারণে আমরা মূল গন্তব্যে যেতে পারছি না।*

অধ্যায় দুই

খেলার পাতাটার দিকে একবার তাকালো তোশিও তাগাওয়া। গতকালকের খেলাটার কথা মাথায় আসতেই রাতের খিটখিটে মেজাজটা আবারো ফিরে এলো।

ইওমিউরি জায়ান্টস হেরে গেছে। অবশ্য, এ ব্যাপারে তার কিছুই করার নেই। কিন্তু যেটা নিয়ে তার মেজাজ খিঁচড়ে আছে তা হলো হারার ধরনটা।

একদম সংকটজনক একটা অবস্থায় নাগাশিমা আউট হয়ে গেল। নাগাশিমা হলো সেই হিটার যে এত দিন *জায়ান্টস*-কে বিজয় এনে দিচ্ছিলো। কিন্তু এখন তার ব্যাটিং এতটাই বাজে হয়ে গেছে যে দেখতেও কষ্ট লাগে। অথচ সে-ই দলকে সব সময় বিপদের মুখ থেকে টেনে তুলতো, ফ্যানদেরকে আশার আলো দেখাতো–এমনকি সে যখন স্ট্রাক আউট হতো তখনো। আর তাই ফ্যানরাও তাকে ডাকতো 'মিস্টার জায়ান্টস' বলেই।

কিন্তু কিছু একটা তো হয়েছেই তার। সত্যি বলতে, সতর্কবার্তাটা দুই-তিন বছর ধরেই পাওয়া যাচ্ছিলো। কিন্তু তাগাওয়া ছোটবেলা থেকেই নাগাশিমার ভক্ত বলেই চরম সত্যটাকে এড়িয়ে গেছে অনায়াসে। চোখের সামনে যা দেখছে তা মানতে চায়নি। *সবারই বয়স বাড়ে। একটা সময় সবচেয়ে ভালো খেলোয়াড়কেও অবসরে যেতে হয়।*

তাগাওয়া আবারো পত্রিকার দিকে তাকালো। ওখানে নাগাশিমার একটা ছবি–স্ট্রাক আউট হয়েছে এইমাত্রই। লোকটা সম্ভবত তার ক্যারিয়ারের সন্ধিক্ষণে চলে এসেছে। নতুন মৌসুমের খেলা শুরু হলো মাত্র, কিন্তু গ্রীষ্ম আসতে আসতে নাগাশিমার অবসর নিয়ে গুজব রটে যাবে। হ্যাঁ, *জায়ান্টস* যদি হারতে শুরু করে দেয়, ঠিক এটাই হবে। তাগাওয়া অবশ্য এবার *জায়ান্টস*-কে নিয়ে অতটা আশাবাদীও না। ওরা সেন্ট্রাল লীগের টপে ছিলো প্রায় নয় বছর ধরে, কিন্তু টিমে ইতোমধ্যেই ফাটল ধরতে শুরু করেছে। আর এই ফাটলের সূচনা হয়েছে নাগাশিমার হাত ধরেই।

পত্রিকার এককোনায় *চুনিচি ড্রাগন*-এর সর্বশেষ জয় নিয়ে লেখা রিপোর্টটা দেখামাত্রই পত্রিকাটা বন্ধ করে দিলো সে। ঘড়িতে চারটা বাজে। আজ আর কেউ আসবে কি না সন্দেহ আছে ওর। এমনিতেও ভাড়া প্রদানের দিন ছাড়া অন্য কোনো দিন তেমন একটা কেউ আসে না।

তাগাওয়া হাই তোলার মাঝপথে খেয়াল করলো অফিসের বাইরে কেউ দাঁড়িয়ে আছে। জানালায় বাঁধা প্রচারপত্রের ফাঁক দিয়ে একঝলক দেখতে পেল সে। মুখ অবশ্য দেখেনি, তবে পায়ের জুতো দেখেছে...স্নিকার-পরা কেউ। একটা বাচ্চা।

কে জানে, হয়তো কোনো ইলিমেন্টারি স্কুলের ছাত্র ক্লাসের সময় নষ্ট করার জন্য অ্যাপার্টমেন্টের লিস্ট পড়ছে।

কিছুক্ষণ বাদে দরজাটা খুলে গেল। ব্লাউজের উপর হাতাওয়ালা গেঞ্জি পরা একটা মেয়ে ঢুকলো ভেতরে, চেহারায় ভয়ের ছাপ স্পষ্ট। চোখগুলো বেশ বড় বড় মেয়েটার, একদম বিড়ালের চোখের মতো। *হয়তো ইলিমেন্টারি স্কুলের শেষ বর্ষের ছাত্রী মেয়েটা*, ভাবলো তাগাওয়া।

'কোনো সাহায্য করতে পারি?' জিজ্ঞেস করলো সে। নিজের কানেই তার গলার স্বর বেশ নরম শোনালো। অথচ এখানে যদি এর জায়গায় এই এলাকার অন্য কোনো বদমাশ ছেলেপেলে হতো, তবে এর থেকে অর্ধেক ভালো শব্দও তার গলা থেকে বেরোতো কি না সন্দেহ।

'আমার নাম নিশিমোতো,' বললো মেয়েটা।

'নিশিমোতো? কোথা থেকে এসেছ তুমি?'

'ইওশিদা হাইটস।' মেয়েটার চঞ্চলতা আর স্পষ্ট ভাষা তাগাওয়ার কানটাকে পরিষ্কার করে দিলো যেন। ও যতগুলো বাচ্চাকে চেনে, তাদের থেকে বাজে ব্যবহার আর বোকামি ছাড়া কিছুই আশা করে না তাগাওয়া।

'ইওশিদা হাইটস...' শেলফ থেকে একটা ফাইল বের করে আনলো তাগাওয়া।

মোটে আটটা পরিবার বাস করে ইওশিদা হাইটসে। তাদের মধ্যে নিশিমোতো ইউনিট একদম নিচ তলার মাঝামাঝিতে, ১০৩ নাম্বার অ্যাপার্টমেন্টে। তাগাওয়া দেখলো তাদের দুই মাসের বাড়ি ভাড়া বকেয়া আছে। ওরই উলটো তাদেরকে ফোন করার মতো সময় হয়ে গেছিলো।

'তো উম...' মেয়েটার দিকে ফিরলো সে। 'তুমি মিসেস নিশিমোতোর মেয়ে তবে?'

'হ্যাঁ,' বললো মেয়েটা। আরেকবার ফাইলটার দিকে তাকালো তাগাওয়া। নিশিমোতো ইউনিটে দুজন বাসিন্দার বিবরণ দেওয়া। একজন মিসেস নিশিমোতো, আরেকজন তার মেয়ে ইউকিহো। দশ বছর আগে যখন তারা বাড়িটায় উঠেছিলো, তখন অবশ্য নিশিমোতোর স্বামী হিদেওর নামও ছিলো। কিন্তু এর কিছু দিন পরে একটা দুর্ঘটনায় সে মারা গেলে তার নাম কেটে দেওয়া হয়েছে।

'তুমি কি বাড়ি ভাড়া দিতে এসেছ?' জিজ্ঞেস করলো তাগাওয়া। মাথাটা ঝাঁকানোর আগে একবার মেঝের দিকে তাকালো ইওকিহো। *আমিও তা ভাবিনি*, মনে মনে বললো তাগাওয়া। মুখে বললো, 'তো কেন এসেছ তুমি?'

'আমি ভাবছিলাম আপনি যদি আমার জন্য দরজাটা খুলে দেন।'

'কোনটা? তোমাদের অ্যাপার্টমেন্টের দরজা?'

'আমি কোনো চাবি আনিনি সাথে করে, তাই ভেতরেও ঢুকতে পারছি না।'

'ওহ।' অবশেষে তাগাওয়া বুঝতে পারলো কেন মেয়েটা এখানে এসেছে। 'তোমার মা দরজা লাগিয়ে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেছে?' মাথা দোলালো ইওকিহো। যখন সে তাগাওয়ার দিকে ফিরে তাকালো, তখন এক মুহূর্তের জন্য ইওকিহোর চেহারার মোহ দেখে তাগাওয়া যেন ভুলতে বসেছিলো যে মেয়েটা কেবল ইলিমেন্টারিতে পড়ে। ঢোক গিললো সে। 'আর তুমিও জানো না সে কোথায় গেছে?'

'মা আমাকে বলেনি যে সে বাইরে যাবে...এর জন্যই আমি সাথে করে চাবি নিয়ে যাইনি।'

'ওহ, আচ্ছা, আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি।' ঘড়ির দিকে ফিরে তাকালো তাগাওয়া। দোকান বন্ধ করার জন্য এখনো বেশ কিছু সময় বাকি আছে। তার বাবা, যে কিনা এই স্টেট এজেন্সির মালিক, গতকাল এক আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে গেছে। আসবে আজকে অনেক রাত করে। আবার ও মেয়েটার হাতে মূলচাবির গোছাটা দিয়ে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতেও পারবে না। চুক্তিপত্রে এটা উল্লেখ করা আছে যে যখনই কেউ মূল চাবি ব্যবহার করবে, তখন মালিকপক্ষের কাউকে না কাউকে উপস্থিত থাকতে হবে। অন্য কোনো সময় হলে সে মেয়েটাকে তার মা ফিরে আসার আগ পর্যন্ত বাইরে অপেক্ষা করতে বলতো, কিন্তু তার চোখের হতাশার ছাপ দেখে সেটা আর করতে পারলো না।

'আচ্ছা, দাঁড়াও, আমি তোমার সাথে আসছি।' বলেই যেখানে প্রোপার্টির সবকিছু থাকে, সেই নিরাপত্তা ঘর থেকে মূলচাবিটা নিয়ে বেরিয়ে এলো সে।

দুবলা-পাতলা ইওকিহোকে অনুসরণ করে ভাঙাচোরা ফুটপাথ বরাবর হেঁটে যাচ্ছে তাগাওয়া। ইওশিদা হাইটস এখান থেকে দশ মিনিটের পথ। হাঁটতে হাঁটতে ও লক্ষ করেছে যে মেয়েটা স্বাভাবিক স্কুল ব্যাকপ্যাক ব্যবহার করেনি। উলটো তার হাতে বিশেষ এক ধরনের প্লাস্টিক হ্যান্ডব্যাগ রয়েছে।

মেয়েটা হাঁটার সময় ওর কাছ থেকে একটা ছোট্ট বেল বাজার শব্দ আসছে। শব্দটা কোথা থেকে আসছে কে জানে, পেছনে থাকার কারণে স্পষ্ট বুঝতে পারছে না তাগাওয়া। ওর দিকে এরকম করে তাকিয়ে থাকার কারণে তাগাওয়া লক্ষ করেছে যে মেয়েটার অবস্থা তেমন একটা ভালো না। পায়ের জুতোর তলাটা বেশ চিকন হয়ে গেছে, গেঞ্জিটার উপরে গুটি গুটি দাগ, সাথে এখানে-সেখানে ছোট ছোট ফুটো হয়ে আছে। এমনকি ওর চেক স্কার্টটাও বেশ পুরোনো। এরপরও তার কাছ থেকে এমন একটা দ্যুতি বের হচ্ছে যেটা সে এর আগে কখনো দেখেনি, বিশেষ করে এরকম কোনো জায়গার বাসিন্দাদের ভেতর।

এই দ্যুতি কোথা থেকে এলো কে জানে? ও ইওকিহোর মাকে চেনে। বেশ অন্তর্মুখী আর বিশেষত্বহীন এক মহিলা। এখানে যারা বাস করে, ওদের সবার মতো

তার ভেতরেও বেপরোয়া মনোভাব বিদ্যমান। এরকম একটা মায়ের ঘরে এমন একটা মেয়ে বেড়ে উঠছে–অবাক করার মতো বিষয় বটে।

'তোমার স্কুল কোথায়?' পেছন থেকেই জিজ্ঞেস করলো তাগাওয়া।

'ওয়ে ইলিমেন্টারি স্কুল।' কথাটুকু বলার জন্য একটু পেছনে ফিরে আবার হাঁটতে লাগলো মেয়েটা।

'মজা করছো, তাই না?'

ওয়ে ইলিমেন্টারি স্কুল একটা সরকারি স্কুল যেখানে আশেপাশের প্রায় সবার ছেলেমেয়েই পড়াশোনা করে। প্রত্যেক বছরই এখানকার কিছু ছেলেমেয়ের নামে দোকানপাটে চুরি করার অভিযোগ আসে, অথবা বাবা-মায়েরা ঋণ দিতে না পারার কারণে অন্য জায়গায় চলে গেলে তাদের আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায় না। যখন কেউ দুপুরবেলা ঐ রাস্তা দিয়ে হেঁটে যায়, তারা সেখান থেকে ভেসে আসা দুর্গন্ধযুক্ত, পচা খাবারের গন্ধ পায়। এছাড়া, স্থানীয় কিছু যৌনকর্মী সাইকেলে করে বাচ্চাদের খেলনা বিক্রি করার নাম করে বাচ্চাদেরকে ধরে পতিতালয় নিয়ে যায়। অবশ্য, সব বাচ্চাকেই যে নিয়ে যায় তা না।

তবে এই মেয়েটা ওরকম একটা স্কুলে পড়তে যায়, এটা আসলেই হতবাক হওয়ার মতো ব্যাপার। অবশ্য, ও এটাও জানতো যে তাদের আর্থিক অবস্থার কারণে তাকে প্রাইভেট কোনো স্কুলে পড়ানোর ক্ষমতা তার মায়ের নেই। কিন্তু সেটা আলাদা বিষয়। ওর মনে হচ্ছে মেয়েটা তার স্কুলে বেশ আলোচিত।

দেখতে দেখতে ঐ বাড়ির সামনে চলে এলো তারা।

তাগাওয়া দরজায় দাঁড়িয়ে একবার নক করে মিসেস নিশিমোতো বলে ডাক দিলো। কোন উত্তর এলো না ভেতর থেকে। 'মনে হচ্ছে এখনো বাড়ি ফেরেনি সে,' ইওকিহোর দিকে তাকিয়ে বললো।

মাথা দোলালো মেয়েটা। আবারো সেই ছোট্ট বেলের আওয়াজ শুনতে পেল সে। মূলচাবিটা দরজায় ঢুকিয়ে ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘুরিয়ে দিলো তাগাওয়া। দরজাটা আনলক হওয়ার সময় একটা ক্লিক-জাতীয় শব্দ শোনা গেল। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই ওর মনে এলো, কিছু একটা সমস্যা আছে এখানে। অনুভূতিটার উৎপত্তি হলো ওর পেটে, তারপর সেখান থেকে সোজা চলে গেল বুকে। তবুও সে নবটা ঘুরিয়ে দরজাটা পুরোপুরি টেনে খুলে ফেললো। কেবল ভেতরে ঢোকার জন্য এক পা দিয়েছে, অমনি দেখলো দূরে একজন মহিলা পড়ে রয়েছে। তার পরনে একটা হলুদ সোয়েটার আর জিনস। তাতামি মাদুরটার উপর মরার মতো পড়ে আছে সে। তাগাওয়া মুখটা দেখেনি, কিন্তু বুঝতে পারলো এটা ফুমিও নিশিমোতো ছাড়া আর কেউ না। *তার মানে মহিলা ঘরেই ছিলো*, ভাবলো সে। একটা অস্বাভাবিক গন্ধ এসে লাগলো তার নাকে।

'গ্যাস।'

এক হাত দিয়ে ইউকিহোর ভেতরে ঢোকা থামালো সে, আরেক হাত দিয়ে তার নিজের নাকমুখ চেপে ধরলো। চোখ চলে গেল রান্নাঘরের দিকে। একটা পাত্র চুলার উপরে রাখা, আর চুলার গ্যাস অন করা। কোনো আগুন নেই সেখানে। তাগাওয়া শ্বাস চেপে রেখে প্রথমেই গ্যাস বন্ধ করলো, এরপর জানালা খুলে দিলো। লম্বা একটা শ্বাস নেওয়ার আগে মেঝেতে পড়ে থাকা ফুমিওর দিকে একবার তাকালো সে। তার মেরুদণ্ড বেয়ে একটা ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেল সাথে সাথে। ফুমিও নিশিমোতোর চেহারার দিকে তাকালো এবার সে। তার চেহারাটা নীল হয়ে আছে, আর কোনো রকমের উষ্ণতা নেই সেখানে। *খুব দেরি করে ফেলেছি আমরা।* এটাই ছিলো ওর প্রথম চিন্তা। রুমের এককোনায় একটা ফোন দেখতে পেয়ে ছুটে গেল। রিসিভার তুলে নিয়ে এক মিনিটের জন্য বিপাকে পড়ে গেল কাকে ফোন করবে তা ভেবে। ১১৯-এ ফোন করে অ্যাম্বুলেন্স ডাকবে, নাকি ১১০-এ ফোন করে পুলিশ ডাকবে মৃতদেহ তুলে নেওয়ার জন্য তা ভেবে পেল না। কী করবে তা বুঝতে না পেরে কিছুক্ষণের জন্য ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো সেখানে। এর আগে ও তার জীবনে একজনেরই মৃতদেহ দেখেছিলো, আর তা ছিলো তার দাদার। দুইবার ১-এ চাপ দিয়ে আঙুলটা রাখলো ০-এর ঘরে।

ঠিক তখনই দরজার কাছ থেকে ইউকিহোর গলা শোনা গেল, 'মা কি মারা গেছে?'

ঘুরে ওর দিকে তাকালো তাগাওয়া। দরজার কাছে বাতি জ্বলে থাকার কারণে মেয়েটার চেহারায় কী ফুটে উঠেছে তা বুঝতে পারলো না সে।

'আমার মা কি মারা গেছে?' আবার জিজ্ঞেস করলো মেয়েটা। তার গলার স্বর কান্নায় ভেঙে পড়ছে।

'আমি বলতে পারছি না,' বললো তাগাওয়া। ওর আঙুল ০ থেকে ৯-এর ঘরে ঘুরে গেল সাথে সাথে।

***

ঘন্টা বাজার কয়েক মিনিট পর মেয়েদের কথাবার্তা, হাসিঠাট্টা আর দৌড়ানোর শব্দ শোনা গেল।

ডান হাতে ক্যামেরাটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে দেখছে ইউইচি আকিওশি। সেইকা গার্লস স্কুলের গেট থেকে দলে দলে মেয়েরা বের হতে শুরু করেছে। ইউইচি তার ক্যামেরাটা বুকের কাছে ধরে প্রত্যেকের দিকে তাকাচ্ছে। গেট থেকে প্রায় পঞ্চাশ মিটার দূরে রাস্তার পাশে রাখা একটা পিকাপ ট্রাকের উপরে লুকিয়ে আছে সে। লুকানোর জন্য চমৎকার একটা জায়গা ওটা। অধিকাংশ ছাত্রীই ওর পাশ দিয়ে চলে যাবে, কিন্তু ট্রাকটার উপরে থাকা তেরপালের কারণে ওকে দেখতে পাবে না কেউ। তার উদ্দেশ্য সফল করার জন্য সুবিধাজনক একটা

অবস্থানের সন্ধান পেয়েছে সে। যেরকম ছবি সে চাচ্ছে সেরকমটা যদি আজ তুলতে পারে, তবে ছয় নাম্বার ক্লাস ফাঁকি দেওয়াটা সার্থক হবে তার জন্য।

সেইকা গার্লস মিডল স্কুলের মেয়েরা নাবিকদের মতো পোশাক পরে। গ্রীষ্মকালে পরে হালকা নীল রঙের কলারওয়ালা সাদা টপের সাথে হালকা নীল রঙের স্কার্ট। মেয়েদের হাঁটার কারণে পায়ের সাথে স্কার্টগুলোর ওঠানামাটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে ইউইচি। কিছু কিছু মেয়েকে দেখে মনে হচ্ছে ওরা বুঝি এখনো ইলিমেন্টারিতেই পড়ে, কিন্তু অধিকাংশকেই দেখে মনে হচ্ছে ওরা নারী হওয়ার প্রথম ধাপ অতিক্রম করে ফেলেছে।

এদিকে, যখনই ট্রাকটার পাশ দিয়ে কোনো ছাত্রী যাচ্ছে, ওর ইচ্ছা হচ্ছে ছবি তুলতে, কিন্তু তবুও নিজেকে সংবরণ করছে। ও আসলে চাচ্ছে না মূল কাজটার আগেই তার রিল শেষ হয়ে যাক। পরবর্তী পনেরো মিনিট ধরে মেয়েদের যাওয়ার দৃশ্য দেখার পর অবশেষে এলো ওর মূল আকর্ষণ ইউকিহো কারাশাওয়া। দ্রুত ক্যামেরাটা হাতে তুলে নিয়ে মেয়েটাকে লেন্সের আওতায় নিয়ে আসার চেষ্টা করতে লাগলো সে।

সব সময়ের মতোই ইউকিহো তার বান্ধবীর সাথেই হাঁটছে। ঐ মেয়েটা লিকলিকে, চোখে পুরু চশমা। আরো আছে সুচালো চোয়াল, ব্রণ-ওঠা কপাল আর সারা গায়ে এখানে-সেখানে উঠে থাকা গোটা।

অন্য দিকে ইউকিহো কারাশাওয়া সুন্দর, ছিমছাম গড়নের। বাদামি রঙের চুলগুলো কাঁধের পেছনে ছড়িয়ে আছে। সেগুলোকে একবার অভ্যাসবশত আঙুলের ডগা দিয়ে নাড়লো সে। ওর চোখগুলো বড়লোকের বিড়ালের চোখের মতো। বাঁকা ঠোঁটের উপর মনোহর হাসিটা যেন ঢেউ হয়ে খেলে গেল। সেও লিকলিকে, শুধু বুকের আর পেছনের নারীসুলভ বাঁক দুটো বাদে। তার এই ভাঁজ দুটোই তাকে তার অজস্র ফলোয়ারের কাছে অনেক বেশি আকর্ষণীয় করে তুলেছে। অবশ্য, ইউইচির কাছে ইউকিহোর নাকটা বেশি সুন্দর লাগে। এরকম ক্লোজ-আপ শটে নাকটা অবশ্যই ভালোভাবে আসতে হবে। ও ক্যামেরাটা শক্ত করে ধরে মৃদু হাসলো একবার।

***

একসারিতে থাকা পাকা বিল্ডিংগুলোর একদম শেষ দিকে ইউইচির বাড়ি। জায়গাটা গত ত্রিশ বছর ধরে এমনই আছে। মিসো স্যুপ আর তরকারি ছাড়াও যত ধরনের মশলা আছে তার গন্ধ লেগে আছে বাড়িগুলোর দেয়াল আর ছাদে। ইউইচি সব সময় একে শ্রমিক শ্রেণির লোকদের বাসাবাড়িতে থাকা গন্ধ হিসেবেই ভেবে আসছে।

'ফুমিহিকো এসেছে। উপর তলায় আছে,' রান্নাঘর থেকে বলে উঠলো তার মা। ইউইচি তার মায়ের চপিং বোর্ডে থাকা কাটা সবজির দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস

ছাড়লো। আবারো পটেটো টেম্পুরা[৮]। যখন থেকে কোনো এক আত্মীয় ওদের বাসায় আলু পাঠিয়েছে, তখন থেকেই সব রকম তরকারিতেই আলু দেখছে সে।

উপর তলায় বিছানার মাঝখানে তার বন্ধু ফুমিহিকো কিকুচিকে বসে থাকতে দেখলো সে। একটা পুস্তিকা উলটাচ্ছে ও, যেটা কিছু দিন আগে ইউইচিই বানিয়েছিলো। সম্প্রতি যে মুভিটা দেখেছে, সে সময়ে তোলা অনেকগুলো ছবি আছে ওখানে।

'তুমি *রকি* সিনেমাটা দেখেছ, হাঁহ? কেমন দেখলে?' ইউইচির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো কিকুচি। পুস্তিকাটায় তখন হলিউড তারকা সিলভেস্টার স্ট্যালোনের ছবি দেখা যাচ্ছে।

'হ্যাঁ, ভালোই ছিলো।'

'শুধু ভালো? সবাই ওটার ভূয়সী প্রশংসা করছে শুনলাম।' আবার পুস্তিকাটা দেখতে শুরু করে দিলো কিকুচি। ইউইচির মনে হলো সে হয়তো এটা নিতে চায়, কিন্তু মুখে কিছু বললো না। কারণ সে এটা কাউকে দিতে চায় না। যদি কিকুচির এরকম পুস্তিকা লাগে তো নিজে গিয়েই মুভিটা দেখে বানিয়ে নিক।

'ইশ, মুভি দেখা যদি এতটা ব্যয়বহুল না হতো,' বিড়বিড় করে বললো তার বন্ধু।

'আসলেই।' মোটা চামড়ার ব্যাগ থেকে ক্যামেরাটা বের করে আনলো ইউইচি। এরপরে চেয়ারটাকে অনেকটা বুকে জড়িয়ে ধরার মতো করে তাতে বসে পড়লো। কিকুচি তার ভালো বন্ধু, কিন্তু টাকা-পয়সা নিয়ে ওর সাথে কথা বলতে ভালো লাগে না তার। কিকুচি তার মায়ের সাথে একা থাকে। ওকে দেখলেই বোঝা যায় তাদের অবস্থা ততটা ভালো না। ইউইচি নিজেকে কিছুটা ভাগ্যবান মনে করে এই দিক দিয়ে যে তার বাবা এখনো বেঁচে আছে আর রেলরোড কোম্পানিতে কাজ করছে।

'তুমি আবারো ছবি তোলা শুরু করেছ?' ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো কিকুচি। তার বাঁকা হাসিতেই স্পষ্ট হয়ে গেল যে সে জানে ইউইচি আসলে কীসের ছবি তোলে।

'হ্যাঁ,' ইউইচিও পালটা বাঁকা হাসি দিয়ে জবাব দিলো।

'ভালো কিছু তুলেছ নাকি?'

'হওয়ার কথা। আমি নিশ্চিত যে আজ যা তুলেছি ভালোই এসেছে।'

'তবে তো কেল্লাফতে,' ভ্রুদুটো নাচিয়ে বললো কিকুচি।

'জানি না। এখন আর তেমন দাম দেয় না ওরা। আর তার উপর এগুলোকে প্রিন্ট করতে খরচ হয় অনেক। খানিকটা লাভ করতে পারলেই নিজেকে ভাগ্যবান মনে করবো।'

'ধুর, কী যে বলো না! টাকা মানেই টাকা। ভালো দক্ষতা আছে তোমার এ বিষয়ে। আমার তো ঈর্ষা হচ্ছে তোমাকে দেখে।'

'আমি অবশ্য এটাকে দক্ষতা বলি না। সত্যিই। আমি ক্যামেরাই ঠিকমতো চালাতে জানি না, মানে কীরকম করে চালালে ভালো ছবি আসবে তা জানি না আর কি। এই ক্যামেরা, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সবকিছু একদম হঠাৎ করেই আমার কোলের উপর এসে পড়েছে বলতে পারো।' যে রুমটা এখন ইউইচি ব্যবহার করছে সেটা একসময় তার চাচার রুম ছিলো। তার বাবার এই ছোট ভাইটা একজন ফটোগ্রাফার, তাই অনেক ধরনের ক্যামেরা তার সংগ্রহে ছিলো। সাদা-কালো ছবি প্রিন্ট করার মতো মেশিনও রয়েছে তার কাছে। চাচার বিয়ে হয়ে গেলে সে নিজের কিছু জিনিসপত্র দিয়ে গেছিলো ইউইচিকে।

'বাহ দারুণ! অন্তত এরকম জিনিস দেওয়ার মতো মানুষ আছে তোমার।'

কিকুচির স্বরে ঈর্ষা টের পেতেই ইউইচির মেজাজ কিছুটা খারাপ হয়ে গেল। ও জানে না কেন প্রত্যেকবার কিকুচি সব কথায় টাকার ব্যাপারটা নিয়ে আসে। তবে এবারের কথা ভিন্ন; কারণ কিকুচি নিজে থেকেই টপিক পালটে দিলো।

'তোমার মনে আছে ঐদিন তোমার চাচার তোলা ছবিগুলো যে আমাকে দেখিয়েছিলে?'

'শহরের ছবিগুলোর কথা বলছো?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওগুলো কি এখনো তোমার কাছে আছে?'

'অবশ্যই, থাকবে না কেন!' বুকশেলফে থাকা অ্যালবামের দিকে হাত বাড়ালো ইউইচি। তার চাচার ফেলে যাওয়া জিনিসের মধ্যে এটাও একটা। পুরো অ্যালবামটা তার চাচার তোলা কিছু ছবি দিয়ে ভরা। ওটা কিকুচির দিকে এগিয়ে দিলো সে। কিকুচি চরম আগ্রহ নিয়ে সেটা দেখতে বসে গেল মেঝেতে।

'এত আগ্রহ কেন তোমার এই ছবিগুলো নিয়ে?' মেঝেতে বসা বন্ধুর দিকে তাকিয়ে বললো ইউইচি।

'তেমন কোনো কারণ নেই,' বললো সে। এরপর সেখান থেকে একটা ছবি বের করলো। 'আচ্ছা, এই ছবিটা কি আমি নিতে পারি?'

'কোনটা এটা?' কিকুচির হাতে থাকা ছবিটার দিকে তাকালো ইউইচি। চিকন একটা রাস্তা দিয়ে কোনো এক কাপল হেঁটে যাচ্ছে। বাতাসের বেগে দুলছে বৈদ্যুতিক খুঁটিতে লাগানো একটা আধছেঁড়া পোস্টার, আর মাটিতে থাকা ঝুড়ির উপর গুটিশুটি মেরে বসে আছে একটা বিড়াল।

'কী জন্য চাচ্ছো ওটা?' জিজ্ঞেস করলো ইউইচি।

'আমার এক বন্ধুকে দেখাবো ওটা।'

'কাকে?'

'ওকে দেখানোর পরেই তোমাকে বলবো।'

'সে কী! কেন?'

'আরে দাও না! তুমি তো এমনিতেও কিছু করবেও না এটা দিয়ে, তাই না?'

'না, তা না। কিন্তু কেন যেন অদ্ভুত লাগছে,' ছবিটা কিকুচির হাতে দিতে দিতে বললো ইউইচি।

***

রাতের খাবারের পর নিজের রুমে গিয়ে দুপুরের তোলা ছবিগুলো নিয়ে কাজে বসে পড়লো ইউইচি। নিজের ক্লজেটকে অন্ধকার ঘর হিসেবে ধরে নিলো যাতে সে বিশেষ একটা ডালির ভেতর ফিল্মটাকে রেখে পরে আলোতে এনে কাজ করতে পারে। ছবিগুলো প্রস্তুত হয়ে যাওয়ার পরে ডালি থেকে ফিল্মটা বের করে নিচ তলায় নিয়ে গিয়ে বেসিনে ধুয়ে নিলো সে। ধোয়ার পরে ফ্লুরোসেন্ট আলোতে ধরতেই নেগেটিভগুলো দেখতে পেল। হাসি ফুটে উঠলো ওর মুখে; নেগেটিভগুলো ভালোই এসেছে। ইউকিহোর চুলের দীপ্তি বেশ ভালোভাবেই ফুটে উঠেছে ওগুলোতে। *চমৎকার*, ও ভাবলো। *কাস্টমাররা রীতিমতো খুশি হয়ে যাবে।*

***

ঘুমাতে যাওয়ার আগে প্রতি রাতে ডায়েরি লেখাটা অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে এরিকো কাওয়াশিমার। পঞ্চম শ্রেণিতে থাকার সময় এই অভ্যাস তৈরি করেছিলো সে. এর মানে প্রায় পাঁচ বছর হতে চললো তার এই অভ্যাসের। একটা ডায়েরি লেখার জন্য খুব বেশি একটা চাপ নেওয়ার প্রয়োজন নেই। সহজ করে লিখলেও হয়। এমনকি 'আজকে তেমন কিছুই ঘটেনি' লেখাটাও ভালো একটা দিক।

কিন্তু আজকের কথা ভিন্ন। আজ তার অনেক কিছুই লেখার আছে। আজই সে প্রথমবারের মতো স্কুল শেষে ইউকিহোর বাড়িতে গেছে।

মিডল স্কুলের প্রথম দিন থেকেই ইউকিহোকে চিনতো এরিকো। মেয়েটার চেহারায় বুদ্ধিমত্তার একটা ছাপ আছে, সাথে আছে তার আকর্ষণীয় ফিগার। এরিকো তার মধ্যে এমন কিছু দেখতে পেয়েছে যেটা সে অন্য কারো মাঝে দেখতে পায়নি, এমনকি নিজের ভেতরও না। যখন প্রথম দিকে ইউকিহো তার দিকে তাকাতো, তীব্র আকাঙ্ক্ষার মতো অনুভূতি হতো ওর। মাঝেমধ্যেই ভাবতো যে তারা যদি বন্ধু হতে পারতো।

যখন ওদের দুজনকে মিডল স্কুলের তৃতীয় বছরে একই ক্লাসে রাখা হলো, তখন এরিকো আনন্দে প্রায় লাফই দিচ্ছিলো একটু হলে। নিজের সাহসটুকুতে আরেকটু জোর দিয়ে সে নবীন বরণ অনুষ্ঠানের দিনে ইউকিহোর সাথে পরিচিত হয়।

ভেবেছিলো নিকৃষ্ট দৃষ্টি ছুঁড়ে দেবে ইউকিহো, অথবা একদম পাত্তাই দেবে না। কিন্তু মেয়েটা কিছুই করলো না এসবের। এরিকোকে চমকে দিয়ে হেসে বললো, 'আমি ইউকিহো কারাশাওয়া।' কাছ থেকে দেখলে আরো বেশি নারীসুলভ মনে হয়

ইউকিহোকে। ওর সাথে থাকতে থাকতে এরিকোর চোখ খুলে যাচ্ছিলো। এমন কিছু জিনিস উপলব্ধি করছিলো যেটা নিয়ে সে এর আগে কখনো ভাবেওনি। কথাবার্তাকে মজার করে তোলার দারুণ এক ক্ষমতা আছে ইউকিহোর। যেটা এরিকোকেও ওর প্রতি আরো বেশি করে আগ্রহী করে তুলতো। যদিও এরিকো নিজেকে এখনো 'কিশোরী' বলেই ভাবতো, ডায়েরির বিভিন্ন জায়গায়ও তাই লিখে রেখেছিলো, কিন্তু ইউকিহোর বেলায় শব্দটা ছিলো 'নারী'।

ইউকিহোর মতো এত জনপ্রিয় কারো সাথে বন্ধুত্ব করার জন্য অবশ্য প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিলো এরিকোকে। সেই সময়ে তার কিছুটা ঈর্ষা কাজ করতো ইউকিহোকে নিয়ে। এই যেমন তার কাছ থেকে কেউ বুঝি ইউকিহোকে দূরে নিয়ে যাবে ইত্যাদি ধরনের।

তবে এসবের মধ্যে সবচেয়ে বাজে ব্যাপার ছিলো যখন অন্যান্য স্কুলের ছেলেরা ইউকিহোর পেছনে ঘুরতো, যেন সে কোনো মডেল বা সেরকম কিছু।

সেদিন তো জিম ক্লাসের সময় ছেলেপুলেরা পাঁচিলের উপর উঠে পড়েছিলো ওকে দেখার জন্য। ইউকিহোকে দেখার পরে সমস্বরে উল্লাস আর চিৎকার করছিলো ওরা। এরপর তো টিচার এসে ওদেরকে নামিয়ে দেয়।

আর আজকে তো একটা ছেলে ট্রাকের উপর লুকিয়ে লুকিয়ে ক্যামেরা দিয়ে ওর ছবি তুলছিলো। ছেলেটাকে একপলক দেখতে পেয়েছিলো এরিকো। মুখে ব্রণ আর হ্যাংলা-পাতলা গড়নের একটা ছেলে। এদের মাথা সব সময় কুরুচিপূর্ণ কল্পনা দিয়ে ঠাসা থাকে। এরিকো যখন বুঝতে পারলো যে ছেলেটার সেই কুরুচিপূর্ণ কল্পনার খোরাক জোগাচ্ছে ইউকিহোর ছবিগুলো, তখন সে তাকে থামাতে চেয়েছিলো। কিন্তু ইউকিহোর এতে কোনো আগ্রহ ছিলো না বলে দমে যায় সে।

'আমি এদের এড়িয়ে চলি একদম। আস্তে আস্তে নিজেরাই ভিন্ন কিছু খুঁজে নেবে।' এরপর সে এমনভাবে তার চুলে আঙুল চালিয়ে দিলো যেন ইচ্ছাকৃতভাবেই করছে।

'কিন্তু ব্যাপারটা কি জঘন্য লাগে না তোমার? মানে এরা তোমাকে জিজ্ঞেস না করেই তোমার ছবি তুলছে।'

'হ্যাঁ, খানিকটা জঘন্য লাগে বটে, তবে এদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করার থেকে চুপ করে থাকাই ভালো। কারণ এদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করলে কথা বলতে হবে। আর কথা বললেই এরপর থেকে এমন ভান করবে যেন আমি এদেরকে চিনি।'

'হয়তো।'

'এর চেয়ে এদের এড়িয়ে চলাটাই ভালো।'

ইউকিহো ট্রাকের পাশ দিয়ে যেতে নিলে এরিকো যতটা সম্ভব ওর কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করছিলো, যাতে দুই-চারটা ছবি ওর কারণেই নষ্ট হয়ে যায়।

এর কিছুক্ষণ পরেই ইউকিহো ওকে তার বাসায় যাওয়ার জন্য বলে বসে। ইউকিহো ওর কাছ থেকে একটা বই ধার নিয়েছিলো। তাই ফেরত দেওয়ার জন্য ওকে ডেকেছে। এরিকোর অবশ্য বইয়ের ব্যাপারে কোনো মাথাব্যথা ছিলো না, কিন্তু ইউকিহোর বাড়িতে যাওয়ার সুযোগ সে মিস করতে চায় না।

আর সেজন্যই আজ পাঁচটা স্টপের পরে বাস থেকে নেমে দুই মিনিটের মতো হাঁটতে হয়েছিলো। ইউকিহোর বাসাটা কোনো এক আবাসিক এলাকার মধ্যে। যথেষ্ট বড় নয় বাড়িটা, কিন্তু বাড়ির সামনে একটা সুন্দর বাগান আছে। ইউকিহো তার মায়ের সাথেই থাকে। এরিকোকে দেখার পর অভিবাদন জানালো ইউকিহোর মা। ভদ্রমহিলাকে দেখতে ইউকিহোর দাদির বয়সি লাগছে, আর এজন্যেই চট করে একটা গুজবের কথা মনে পড়ে গেল তার।

'একে নিজের বাড়ির মতোই মনে কোরো, কেমন?' ভদ্রমহিলা ওদেরকে বসার ঘরে রেখে ভেতরে চলে গেল।

'তোমার মা তো বেশ ভালো,' ওরা একা হয়ে পড়লে বলে উঠলো এরিকো।

'হুম।'

'আচ্ছা, দরজার সামনে একটা সাইনবোর্ড ঝুলতে দেখলাম। তোমার মা কি *চা পানের রীতি*' সম্পর্কে শেখায়?'

'হ্যাঁ, সাথে *ফুল সাজানোর রীতি*-ও। এমনকি কোতো[১০] বাজানোও শেখায়।'

'ওয়াও,' বললো এরিকো। 'উনি তো দেখছি সুপারউম্যান। এগুলো তোমাকে শিখিয়েছেন তাহলে?'

'শুধু চা আর ফুলের বিষয়টা শিখেছি আমি।'

'আরে বেশ তো! তোমার আর এটার জন্য আলাদা খরচ করতে হয়নি।'

'তা জানি না। তবে কি, উনাকে দেখে হয়তো মনে হয় না, কিন্তু আসলে খুবই কড়া একজন শিক্ষক,' তার মা যে দুধ আর চা দিয়ে গেছিলো তা থেকে চা ঢালতে ঢালতে বললো সে। একটা কাপ এরিকোর হাতে দিয়ে নিজে এক কাপ নিয়ে চুমুক দিলো। তাকে অনুসরণ করে এরিকোও চুমুক দিলো। কালো রঙের একটা সুগন্ধি চা-পাতা ব্যবহার করা হয়েছে, যেগুলো সাধারণত আশেপাশের দোকানে পাওয়া যায় না।

'তারপর বলো, এরিকো,' ওর দিকে বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে বলে উঠলো ইউকিহো, 'আমার ব্যাপারে তুমি কি ইদানীং কিছু শুনেছ? মানে আমার ইলিমেন্টারি স্কুল সম্পর্কে কোনো কথা আর কি।'

এরিকো পলক ফেললো একবার। 'উম, আসলে...'

একটা মৃদু হাসি দেখা গেল ইউকিহোর মুখে। 'তার মানে তুমিও শুনেছ, তাই তো?'

'না...মানে, এই আর কি...অল্প কিছু শুনেছি, কিন্তু–'

'সমস্যা নেই। লুকাতে হবে না তোমার। আমার মনে হয় এখন সব জায়গাতেই এই গল্প ঘুরে বেড়াচ্ছে,' ইউকিহো বললো।

'আরে না, না। খুবই অল্প কিছু মানুষ জানে। আমি যার কাছ থেকে শুনেছি, সেও এটাই বলেছে।'

'আচ্ছা, কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, যেহেতু তুমিও শুনেছ ঘটনাটা, তার মানে বিষয়টা আর লুকানো নেই কারো কাছে,' এরিকোর হাঁটুর উপর হাত রেখে বললো ইউকিহো। 'তুমি কি আমাকে খুলে বলবে যে আসলে কী শুনেছ?'

'তেমন কিছুই না, সত্যি বলছি। আসলে বলার মতো কিছুই নেই।'

'আমি নিশ্চিত ওরা বলেছে যে আমি ওয়ে শহরের একটা দুর্গন্ধময় অ্যাপার্টমেন্টে থাকতাম আর খুব গরিব ছিলাম, তাই না?'

এরিকো ওর কথা শুনে একবার ঢোক গিললো।

ইউকিহো না থেমে বলতে লাগলো, 'আর আমার মা রহস্যজনকভাবে মারা গেছে, তাই তো?'

এরিকো মাথা তুলে একবার দেখলো ইউকিহোকে। তারপর বললো, 'আমি এসব কিছুই বিশ্বাস করিনি, নিশ্চিত থাকতে পারো।' ওর গলায় আন্তরিকতার ছোঁয়া পাওয়া যাচ্ছে।

হাসলো ইউকিহো। 'সমস্যা নেই। তোমাকে ভান করতে হবে না। আর এসব কিছুই মিথ্যা না। আমাকে অ্যাডাপ্ট করা হয়েছে। আমি মিডল স্কুলে উঠার কিছু দিন আগে এখানে এসেছি। এইমাত্র যাকে তুমি আমার মা মনে করলে, উনি আমার আসল মা না।' ইউকিহো খুব সহজ ভঙ্গিতে বলে যাচ্ছে কথাগুলো, যেন এসব তেমন কোনো ব্যাপার না। 'এটাও সত্য যে আমি ওয়ে শহরে থাকতাম একসময়। আর আমার বাবা অনেক আগে মারা যাওয়ার কারণে আমি যথেষ্ট গরিব ছিলাম। আর আমার মা যখন মারা যায়, তখন আমি ক্লাস সিক্সে পড়ি।'

'বলো কী!' বললো এরিকো। 'কীভাবে?'

'গ্যাসের কারণে,' বললো ইউকিহো। 'ওটা একটা দুর্ঘটনা ছিলো। কিন্তু অনেকে বলাবলি করে যে উনি নাকি আত্মহত্যা করেছেন। ধরতে পারছো কীরকম গরিব ছিলাম আমরা?'

'ওহ।' এরিকো বুঝতে পারছে না ওর কী বলা উচিত। ইউকিহোকে দেখে মনে হচ্ছে না কোনো দুঃখের ঘটনা বলে যাচ্ছে। *হয়তো আমি যেন দুঃখ না পাই সেজন্য স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলছে সে*, মনে মনে ভাবলো এরিকো।

'আমার এখনকার মা আসলে আমার বাবার এক আত্মীয়। অনেক আগে আমি এখানে প্রায়ই খেলাধুলা করতে আসতাম। আর যখন আমি এতিম হয়ে গেলাম, তখন উনি আমাকে একেবারের জন্য নিয়ে এলেন। আমার মনে হয় উনি ৭। একাকিত্বে ভুগতেন।'

'ইশ, বেশ কঠিন পরিস্থিতি ছিলো তবে।'

'কিছুটা তো ছিলোই। কিন্তু আমি এক্ষেত্রে ভাগ্যবান। কারণ এরকম পরিস্থিতিতে বেশিরভাগ মানুষকে কোনো না কোনো প্রতিষ্ঠানের আয়ত্তে থাকতে হয়, কিন্তু আমি একটা বাড়ি পেয়ে গেলাম।'

'ভেবে দেখলে তাই। এক্ষেত্রে আসলেই তুমি ভাগ্যবানদের মধ্যে একজন।' ও প্রথমে ভেবেছিলো সহমর্মিতা দেখাবে, কিন্তু কেন যেন মনে হলো এতে ইউকিহো শুধু বিরক্ত ছাড়া আর কিছুই হবে না। কীভাবে সে স্বাভাবিক একটা জীবনযাপন করে তার বন্ধুর এরকম পরিস্থিতি সম্পর্কে বুঝবে? এরিকো তাকে এই এত যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে এই পর্যায়ে আসতে দেখে কিছুটা বিস্মিতই হয়েছে বলা যায়। অবশ্য, হয়তো এসব যন্ত্রণা আর দুঃখের কারণেই আজ সে এতটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে আছে সবার কাছে।

'ওরা আর কী বলাবলি করছিলো বললে না?' জিজ্ঞেস করলো ইউকিহো।

'আমি জানি না। আমি আর এসব শুনতেও চাই না কখনো।'

'যাই বলুক, তাতে কিছু সত্য অবশ্যই ছিলো। আবার কিছুটা তারা বানিয়ে বলেছে হয়তো...'

'তোমার সেসব নিয়ে চিন্তা করা উচিত না, ইউকিহো,' এরিকো বললো। 'যারা এসব বলে বেড়াচ্ছে, তারা তোমাকে হিংসা করে বলছে।'

'আমি আসলে চিন্তিত নই। আসলে আমি ভাবছিলাম কে এই গুজবটা প্রথমে ছড়িয়েছে।'

'কী আসে যায় তাতে?' এরিকো আসলে এ বিষয়ে আর কথা বলতে চাচ্ছে না। আসলে এরিকো আরো একটা বিষয়ে শুনেছে: ইউকিহোর আসল মা নাকি কোনো এক বিবাহিত লোকের প্রেমিকা ছিলো। আর সেই লোকটা খুন হয়ে যাওয়ার পরে তার মা সন্দেহভাজনের কাতারে পড়ে যায়। এরপরই সে ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে আত্মহত্যা করে ফেলে। এই অংশটুকু সে ইউকিহোকে কিছুতেই বলবে না।

ইউকিহো এরপরে ওকে তার সেলাই করা জিনিস দেখানো শুরু করে। একটা বালিশের কভার আর থলির উজ্জ্বল রং দেখে বোঝা যায় ইউকিহোর রুচি বেশ ভালো। আরেকটা অসম্পূর্ণ কাজ দেখালো সে; কালো আর গাঢ় নীল রঙের ব্যাগ নইলে পার্স। ওটা দেখতে আরো চমৎকার লাগছিলো। 'মাঝে মাঝে গাঢ় রঙগুলোও অনেক সুন্দর লাগে,' বললো এরিকো। কথাটা একদম মন থেকে বলেছে সে।

***

সংগীত আয়োজন ক্লাসের শিক্ষিকা ক্লাসে থাকাকালীন হয় বইয়ের দিকে, নয়তো ব্ল্যাকবোর্ডের দিকে তার চোখদুটো স্থির রাখে, কখনোই শিক্ষার্থীদের দিকে ফিরেও তাকায় না। যান্ত্রিকভাবে ক্লাসটা শেষ করে সে। দেখে মনে হয় যেন যেকোনোভাবে

ক্লাসের পঁয়তাল্লিশ মিনিট পার হলেই বাঁচে। কোনো ছাত্রকেই ডায়াসে উঠিয়ে পড়তে দেওয়া হয় না বা ক্লাসে কেউ প্রশ্নও করে না কখনো।

ওয়ে মিডল স্কুলের অষ্টম শ্রেণির তৃতীয় বর্ষের ক্লাসটা দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। যারা পড়াশোনার উপর অন্তত একটুখানি হলেও আগ্রহী, তারা সামনের দিকে বসে। আর যাদের এ ব্যাপারে কোনো আগ্রহ নেই, তারা পেছনের দিকে বসে যা ইচ্ছা তাই করে। কেউ কেউ কার্ড খেলে, নয়তো জোরে জোরে কথা বলে। আবার কেউ কেউ ঘুমিয়েও থাকে।

কিছু কিছু শিক্ষক এরকম আচরণের জন্য কিছু ছাত্রকে শাস্তিও দিয়েছে। কিন্তু দুই মাসেরও কম সময়ের মধ্যে তা বন্ধ করে দিতে হয়েছে। কারণ এর যে ফল ভোগ করতে হতো তা অনেক বেশিই। একদিন ইংরেজির এক শিক্ষক এক ছেলেকে ক্লাসে বসে মাঙ্গা পড়ার কারণে বকাঝকা করেন, তারপর ছেলেটার থেকে মাঙ্গা বইটা নিয়ে তার মাথায় টোকা দেন। তার কিছু দিন বাদে একটা গলিতে মাস্ক-পরা এক দুর্বৃত্ত এসে তার উপর আক্রমণ করে বসে। পাঁজরের দুটো হাড় ভেঙে দেওয়া হয় সেই শিক্ষকের। স্পষ্ট বোঝা গেছিলো এটা সেই ছেলেরই কাজ, কিন্তু সেই ছেলেটার কাছে অ্যালিবাই ছিলো।

আরেক দিন গণিত ক্লাসে হঠাৎ এক তরুণী শিক্ষিকা চিৎকার করে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। পরে জানা গেছে, সে যখন চক ট্রে থেকে চক আনতে যায়, তখন দেখে সেখানে চকের পরিবর্তে কনডম সাজিয়ে রাখা আছে। সবগুলো কনডমই ব্যবহার করা। কয়েকটায় তখনো বীর্য বিদ্যমান। মহিলা প্রেগন্যান্ট ছিলো এবং জ্ঞান হারানোর ফলে আরেকটু হলে তার গর্ভপাতই হয়ে গেছিলো। পরের দিনই সিক লিভ নেয় সে। এই তৃতীয় বর্ষের ছাত্ররা পাশ করার আগে যে সে আর ফিরে আসবে না এটা সবাই জানতো।

এই মুহূর্তে ইউইচি আকিওশি ক্লাসের একদম মাঝখানে বসে আছে যাতে ইচ্ছা করলে পড়ায় মনোযোগ দিতে পারে, আবার ইচ্ছা না করলে পেছনে ফিরে হৈ-হুল্লোড় করতে পারে।

তোশিওকি মুতা দরজায় জোরে একটা ধাক্কা দিয়ে ক্লাসের ভেতরে ঢুকলো। সবাই যে তার দিকে তাকিয়ে আছে সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে একদম শেষে জানালার পাশের সিটটায় গিয়ে বসে পড়লো সে। মুতা বসার সাথে সাথে সবাই যে যার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লো যেন কিছুই ঘটেনি। মুতা তার পাদুটো টেবিলের উপরে দিয়ে একটা ম্যাগাজিন খুলে বসলো—পর্নো ম্যাগাজিন অবশ্যই।

'হেই মুতা, ক্লাসে কিন্তু হস্তমৈথুন চলবে না,' তার বন্ধুদের মধ্য থেকে একজন বলে উঠলো। সাথে সাথে ভূতুড়ে একটা হাসি দেখা গেল মুতার মুখে।

ক্লাস শেষে ইউইচি ব্যাগ থেকে বড় একটা খাম বের করে সেদিকে গেল যেখানে মুতা দুই পা ক্রস আকারে রেখে বসে আছে। ইউইচির দিকে পেছন ফিরে

বসেছে সে যাতে তার মুখটা দেখা না যায়। কিন্তু তার আশেপাশে থাকা ছেলেদের শব্দ শুনে মনে হচ্ছে সে ভালো মুডেই আছে। এটাই গুরুত্বপূর্ণ ছিলো ইউইচির কাছে। ওরা নতুন বের হওয়া একটা ভিডিওগেম নিয়ে কথা বলছিলো, যার নাম *ব্রিকআউট*। ইউইচি বুঝে গেল ওরা আবার স্কুল থেকে পালিয়ে দিন শেষ হওয়ার আগেই স্থানীয় দোকানগুলোতে গিয়ে গেম খেলবে। ওদের মধ্য থেকে একটা ছেলে ইউইচিকে আসতে দেখে তার মাথাটা বের করে আনলো ভিড় থেকে। মুতাও ফিরে তাকালো। সে তার ভ্রু শেভ করে ফেলেছে। কপালের উপর দুটো বড় বড় কালো দাগ রেখে দিয়ে অবশ্যই। আর তার নিচে থাকা চোখদুটো দেখে মনে হচ্ছে কোনো অগ্নিগর্ভ থেকে উজ্জ্বল আলোর শিখা বেরোচ্ছে।

'এটা দেখো,' খামটা ওর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো ইউইচি।

'কী এটা?' মৃদু শব্দে জিজ্ঞেস করলো মুতা। মুখ থেকে সিগারেটের গন্ধ বের হচ্ছে।

'সেইকা স্কুলে গেছিলাম গতকাল।'

সাথে সাথে ওর হাত থেকে খামটা ছিনিয়ে নিলো মুতা। খামটার ভেতর ইউকিহো কারাশাওয়ার তিনটা ছবি রয়েছে। একদম ভোরবেলা যখন চারদিকে ততটা আলো ফোটেনি, তখন উঠে গিয়ে প্রিন্ট করেছিলো ইউইচি। তার কাজ নিয়ে গর্ব করে সে। যদিও সাদা-কালো প্রিন্ট, কিন্তু এতে ইউকিহোর চুল আর তার গায়ের রং সম্পর্কে ভালোই ধারণা পাওয়া যাচ্ছে।

ঠোঁটদুটো চাটতে চাটতে মুতা তাকালো ইউইচির দিকে। মুখটা অর্ধেক উপরে উঠিয়ে হেসে বললো, 'খারাপ না।'

'খুব ভালো, তাই না? কাজটা সহজ ছিলো না মোটেই।' তার কাস্টমার পছন্দ করেছে এটা ভেবে একটু স্বস্তি পেল ইউইচি।

'মাত্র তিনটা কেন?'

'ভাবলাম সেগুলোই নিই যেগুলো দেখলে তোমার ভালো লাগবে।'

'কতগুলো আছে মোট?'

'ভালো ভালো পাঁচ থেকে ছয়টা তো আছেই।'

'কালকে সবগুলো নিয়ে আসবে,' তার স্কুলের জ্যাকেটের ভেতর খামটা ভরতে ভরতে বললো মুতা। স্পষ্টতই সেগুলো ফেরত দেওয়ার কোনো চিহ্ন দেখা গেল না তার চোখেমুখে।

'প্রত্যেকটা ছবির জন্য তিনশো ইয়েন দিতে হবে। সুতরাং, ওখানে নয়শো ইয়েন হয়েছে,' খামটার দিকে নির্দেশ করে বললো ইউইচি।

মুতার শেইভ করা দুই ভ্রুর মাঝখানে একটা ভাঁজ পড়লো। একপাশ থেকে রাগী চোখে তাকালো সে। পাশ থেকে তাকানোর কারণে ডান চোখের নিচে থাকা

দাগটা আরো সুন্দর দেখাচ্ছে। 'আমি বাকি ছবিগুলো দেওয়ার পরে সবটা একসাথে দিয়ে দেবো। তাতে অবশ্য কোনো সমস্যা হবে না তোমার, কী বলো?'

এর অর্থ সুস্পষ্ট। যদি ইউইচির কোনো অভিযোগ থাকে, তবে ছবিগুলো মুতার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে হবে। তাই হালকা মাথা নেড়ে চলে গেল ইউইচি।

'একটু দাঁড়াও,' পেছন থেকে ডাক দিলো মুতা। 'তুমি মিয়াকো ফুজিমুরাকে চেনো?'

'ফুজিমুরা?' ইউইচি তার মাথা ঝাঁকালো। 'না।'

'সেও সেইকাতে পড়ে। তৃতীয় বর্ষে। কারাশাওয়ার ক্লাসে না, অন্য একটায়।'

'কখনো শুনিনি,' ইউইচি আবারো মাথা দোলাতে দোলাতে বললো কথাটা।

'আমি চাই ওর ছবিও তুমি তুলে আমাকে দেবে। একই টাকা পাবে প্রত্যেকটা ছবির জন্য।'

'কিন্তু সে কীরকম দেখতে তাই তো জানি না আমি।'

'ও ভায়োলিন বাজায়। মিউজিক রুমে পাবে তুমি তাকে। ওখানে গেলে ওকে দেখবেই।'

'ঐ মিউজিক রুমের ভেতর আদৌ ঢোকা যায় নাকি?'

'এটাও খুঁজে বের করার দায়িত্ব তোমার নিজের,' তার বন্ধুদের দিকে ফিরতে ফিরতে বললো মুতা। এটা পরিষ্কার যে ইউইচির সাথে এ যাত্রায় কথা বলা শেষ তার। ও জানে এর বেশি প্রশ্ন করলে মুতা ভয়ানক রেগে যাবে।

মুতাই প্রথমে এই জনপ্রিয় সেইকা গার্লস স্কুলের মেয়েদের পেছনে লেগেছিলো। মেয়েদের পেছনে পেছনে ঘোরাঘুরি করাটা ছিলো তার গ্যাংয়ের অবসর কাটানোর সবচেয়ে প্রিয় একটা মাধ্যম। যদিও এদের মধ্যে আসলেই কেউ প্রেমিকা পেয়েছিলো কি না সন্দেহ আছে।

এই ছবি তোলার বিষয়টা পুরোপুরি ইউইচির আইডিয়া ছিলো। আর এই আইডিয়া পেয়েছে মুতা আর তার বন্ধুদের কথাবার্তা থেকে; ওরা মেয়েদের ছবি কীভাবে পাওয়া যায় তা নিয়ে কথা বলছিলো একদিন। নিজের শখ পূরণ করার জন্য ইউইচির টাকার প্রয়োজন, তাই পুরো আইডিয়াটা এখানে বেশ কাজে দেয় তার ক্ষেত্রে। মুতার প্রথম চাহিদা ছিলো ইউকিহোর ছবি, আর সেটা থেকেই ইউইচি বুঝে গেছিলো মুতার একটা দুর্বলতা আছে ইউকিহোর উপর। মুতা একটা ছবিও ফেরত দেয়নি, এমনকি একটা ছবি কিছুটা ঘোলা হওয়ার পরেও।

কিন্তু নতুন আরেকটা মেয়ের নাম শুনে কিছুটা অবাক হলো ইউইচি। হয়তো তার পছন্দ পরিবর্তিত হয়েছে; ধরেই নিয়েছে ইউকিহো ওর জন্য ঠিক হবে না। সবথেকে বড় বিষয় হলো, এসব আসলে ইউইচির কাছে কোনো বিষয় ছিলো না। তার কাছে কাজ মানে কাজ–তা সেটা যাই হোক।

***

লাঞ্চ সেরে লাঞ্চবক্সটা ব্যাগের মধ্যে ভরছিলো, এমন সময় কিকুচি এসে ইউইচির সামনে দাঁড়ালো। বড় একটা খাম তার হাতে।

'একটু ছাদে আসবে আমার সাথে?' জিজ্ঞেস করলো কিকুচি।

'কীসের জন্য?'

'যা নিয়ে সেদিন কথা বলেছিলাম,' খামটা খুলতে খুলতে বললো ছেলেটা। খামটা এমনভাবে খুললো যাতে ইউইচিও দেখতে পায় তার ভেতরে কী আছে। খামের ভেতর সেই ছবিটা যেটা ইউইচি নিজেই তাকে দিয়েছিলো।

'আচ্ছা,' বললো ইউইচি। আগ্রহ বেড়ে গেছে তার। 'চলো, যাওয়া যাক।'

ছাদটা খালি পড়ে আছে। এই কয়েক দিন আগেও খারাপ ছেলেপিলের একটা আড্ডাখানা তৈরি হয়ে গেছিলো এখানে। কিন্তু প্রচুর পরিমাণে সিগারেটের খোসা দেখার পরে কর্তৃপক্ষ টহল বাড়িয়ে দেয় ছাদে। এরপর আর তেমন কেউ ওঠে না এখানে।

ওরা ছাদে উঠার কিছুক্ষণ পরে একটা ছেলে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলো। ছেলেটা ইউইচির ক্লাসেই পড়ে, কিন্তু কোনোদিন খুব বেশি একটা কথা বলেনি এর সাথে। এর নাম রিও কিরিহারা। আর ইউইচি বহু আগেই একে ঐসব মনমরা বাচ্চাদের কাতারে ফেলে রেখে এড়িয়ে চলছিলো। এর কোনো বন্ধু নেই, ক্লাসে কখনো দাঁড়ায়নি, এমনকি কোনোদিন কিছু বলেছে বলেও মনে পড়ে না ইউইচির। ছুটি বা লাঞ্চের সময় হলে সে চুপচাপ গিয়ে পড়তে বসতো।

রিও তাদের কাছে পৌঁছানোর পর একটা দূরত্ব বজায় রেখে দাঁড়ালো। ছেলেটার চোখে একটা ধারালো চাহনি রয়েছে, যেটা এর আগে কখনোই খেয়াল করেনি ইউইচি। কয়েক মুহূর্তের জন্য মনে হলো ওর হৃৎপিণ্ড দ্রুত চলছে।

'কী জন্য ডেকেছ বলো?' স্পষ্টভাবে বললো রিও।

ইউইচি বুঝলো ছেলেটাকেও কিছু বলার জন্য উপরে ডেকেছে কিকুচি।

'আমি কিছু একটা দেখাতে চাই তোমাকে,' বললো কিকুচি।

'কী?'

'এই যে এটা,' ছবিটা দেখিয়ে বললো সে।

সতর্ক ভাব ফুটে উঠলো ছেলেটার মুখে, এগিয়ে এসে ছবিটা নিলো। সাদাকালো ছবিটা হাতে নিয়ে ভালো করে দেখার পরে চোখদুটো হালকা বড় করে বললো, 'কী এটা?'

'আমার মনে হলো এটা হয়তো কাজে দেবে তোমার। মানে এভিডেন্স হিসেবে আর কি।'

পাশ থেকে একবার আড়চোখে তাকালো ইউইচি। *এভিডেন্স?*

'তুমি কীসের কথা বলছো বুঝতে পারছি না।' কিকুচির দিকে ফিরতি একটা চাহনি দিলো রিও।

'আরে দেখো আগে। এটা তোমার মায়ের ছবি, না?'

'কী?' চোয়াল ঝুলে পড়লো ইউইচির।

রিও তার ধারালো চোখ দিয়ে একবার ইউইচির দিকে তাকিয়ে তারপর কিকুচির দিকে ফিরলো। 'হতেই পারে না। এটা উনি না।'

'আরেকবার দেখো ভালো করে। উনিই। আর তার পাশে যে লোকটাকে দেখা যাচ্ছে, সে তোমাদের দোকানেই কাজ করে, তাই না?'

আরো একটু কাছে নিয়ে ছবিটা দেখলো রিও, এরপর মাথা ঝাঁকালো। 'সত্যি বলতে, তুমি কী বলছো কিছুই বুঝতে পারছি না আমি। আর এটা আমার মা না। আমার সময় নষ্ট কোরো না তো।' ছবিটা কিকুচির দিকে এগিয়ে দিয়ে ফিরতি পথ ধরলো সে।

'এটা স্টেশনের কাছ থেকে তোলা হয়েছিলো!' পেছন থেকে বললো কিকুচি। 'তোমার বাসার কাছে! চার বছর আগের ছবি–আমি টেলিফোনের খুঁটিতে থাকা মুভির পোস্টার দেখেই বলে দিতে পারি। এই যে দেখো, এটা *জনি গট হিজ গান*-এর পোস্টার।'

থেমে গেল রিও। 'ফেলে দাও ওটা,' কাঁধের পাশ দিয়ে পেছনে তাকিয়ে বললো। 'এটায় তোমার নাক গলানোর মতো কিছুই নেই।'

'আমি শুধু সাহায্য করতে চেয়েছিলাম তোমাকে, এই-ই যা,' বললো কিকুচি। কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে যাওয়ার আগে ওদের দুজনের দিকে কেবল তীক্ষ্ণ একটা দৃষ্টি দিলো রিও।

'ভেবেছিলাম দারুণ একটা প্রমাণ এটা,' রিও চলে যাওয়ার পরে মুখ ফুটে বললো কিকুচি।

'কীসের প্রমাণ?' জিজ্ঞেস করলো ইউইচি।

এক মুহূর্তের জন্য অবাক হয়ে বন্ধুর দিকে ফিরে তাকালো কিকুচি। 'ও, হ্যাঁ, তুমি তো আর ইলিমেন্টারিতে ওর সাথে একই স্কুলে পড়োনি। তুমি তাহলে এ বিষয়ে জানো না।'

'জানি না বলতে?' একটু বিরক্তি নিয়েই জিজ্ঞেস করলো ইউইচি।

বলার আগে এদিক-সেদিক একবার ভালো করে দেখে নিলো কিকুচি। 'স্টেশনের কাছের সেই বড় পার্কটা আছে না? সেখানে একটা বিল্ডিংয়ের কথা মনে আছে তোমার? ঐ যে অর্ধেক কাজ করা হয়েছিলো যেটার?'

'কী হয়েছে সেটার?'

'চার বছর আগে রিওর বাবার লাশ খুঁজে পাওয়া যায় সেখানে। হত্যা করা হয়েছিলো।'

চোয়াল ঝুলে পড়লো ইউইচির।

'তার সাথে থাকা টাকাও উধাও হয়ে গেছিলো। অনেকে বলেছিলো সম্ভবত ডাকাতির কোনো মামলা। তুমি যদি ওখানে থাকতে...সারা দিন পুলিশ দিয়ে ভরা ছিলো এলাকাটা।'

'পুলিশ কি খুনিকে ধরতে পেরেছিলো?'

'একজনকে খুঁজে পেয়েছিলো অবশ্য, যাকে অপরাধী হিসেবে ভেবেছিলো ওরা। কিন্তু প্রমাণ করার আগেই সে মারা যায়।'

'কী! তাকেও মেরে ফেলা হয়েছিলো নাকি?'

মাথা ঝাঁকালো কিকুচি। 'গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা যায় সে। কিন্তু যখন পুলিশ গাড়ি খুঁজে দেখলো, তখন তারা রিওর বাবার কাছে থাকা লাইটারের মতো অবিকল দেখতে একটা লাইটার খুঁজে পায় সেখানে।'

'বেশ শক্ত একটা প্রমাণ বলেই তো মনে হচ্ছে আমার কাছে।'

'হতে পারে, আবার না-ও হতে পারে। পুলিশ প্রমাণ করতে পারেনি যে রিওর বাবার কাছে থাকা লাইটারটাই ওটা। আর এখানেই মূলত জট বাঁধতে শুরু করে। মানুষ বলাবলি করতে থাকে যে ওর স্ত্রীই হয়তো কাজটা করেছে।'

'কার স্ত্রী?'

'আরে গাধা, রিওর মায়ের কথা বলছি। মানুষ আরো বলতো যে রিওর মা সেই লোকটার সাথে কিছু একটা করার সময় রিওর বাবার সামনে পড়ে যায়।'

গল্পটা এমন যে মি. কিরিহারা তার বাড়িতে পনশপ চালায়, আর 'অপর লোকটা' সেই দোকানের একজন কর্মী মাত্র। পুরো বিষয়টা অবাস্তব মনে হচ্ছে ইউইচির কাছে। মানে টিভি সিরিয়ালের মতো লাগছে আর কি। তাছাড়া, 'কিছু একটা করা' দিয়ে কিকুচি কী বোঝাতে চাচ্ছে তা ধরতে পারছে না সে।

'তো পরে কী হলো এটার?' জিজ্ঞেস করলো ইউইচি।

'আর কী হবে, গুজব ছড়াতে লাগলো এদিক-সেদিক। কিন্তু কোনো প্রমাণ না থাকার কারণে মানুষ ভুলে যায় সে বিষয়ে। আমি নিজেই তো কত কষ্ট করে মনে করেছি, তাও এটা দেখার পরে,' ছবিটা উঁচু করে ধরলো কিকুচি। 'ছবিটার দিকে তাকাও একবার। কাপলটার পেছনের জায়গাটা দেখতে পাচ্ছো না? এই জাতীয় হোটেলে মানুষজন ওসব করতে যায়। দেখে মনে হচ্ছে না ওরা মাত্রই সেখান থেকে বের হয়েছে?'

'এটার সাথে চার বছর আগে কী হয়েছিলো তার কী সম্পর্ক আছে?'

'সবকিছুর, বোকা, সবকিছুর! এটা মিসেস কিরিহারা যে সেই লোকটার সাথে প্রেম করছিলো তার প্রমাণ। এর মানে তার কাছে মি. কিরিহারাকে খুন করার মতো কারণ ছিলো। আর এই জন্যই আমি রিওকে দেখাতে চেয়েছি ওটা।'

মাথা ঝাঁকালো ইউইচি। কিকুচি বইপত্র পড়ে সময় নষ্ট করছে বলে মনে হচ্ছে। 'বুঝলাম, কিন্তু মনে হচ্ছে না রিও তার মাকে দোষী হিসেবে ভাববে।'

'তা আমিও বুঝতে পারছি। কিন্তু মাঝে মাঝে কিছু কিছু বিষয়ের একদম শেষটা দেখে ছাড়তে হয়, যদি তা চরম কষ্টের হয়ে থাকে তবুও,' উত্তেজিত গলায় বললো কিকুচি। মনে হচ্ছে ওর পড়া কোনো বই থেকে ডায়ালগটা মেরে দিয়েছে। 'যাক গে, আমিও প্রমাণ করে ছাড়বো যে এটাই রিওর মা। এরপরে আর সে নাকচ করতে পারবে না। বাজি ধরতে পারি যে পুলিশের কাছে এই ছবিটা নিয়ে গেলে ওরা আবার তদন্ত করা শুরু করে দেবে। আমি অবশ্য সেই গোয়েন্দাদের মধ্যে একজনকে চিনি। তাকে একবার দেখাবো এটা।'

'তুমি কেন এটার পেছনে পড়লে হঠাৎ?' জিজ্ঞেস করলো ইউইচি।

'কারণ সেই বিল্ডিংয়ে মি. কিরিহারার মৃতদেহটা আমার ছোট ভাই-ই প্রথম দেখেছিলো।

'তোমার ভাই? আসলেই?'

মাথা দোলালো কিকুচি। 'ও এসে আমাকে বলার পরে আমি গেছিলাম দেখতে। সেখানেই পড়ে ছিলো দেহটা। এরপর আমি মাকে বললে মা পুলিশকে ফোন দেয়।'

'বলছো কী!'

'হ্যাঁ। তো আমরা যেহেতু মৃতদেহটা প্রথম দেখেছিলাম, আমাদেরকে পুলিশ অনেকবার জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলো। আর আমরা লাশটা কীভাবে খুঁজে পেয়েছিলাম শুধু এটুকু দিয়েই সেই জিজ্ঞাসাবাদ শেষ হয়নি।'

'মানে কী? কী বলতে চাচ্ছো?'

'খুন হওয়া লোকটার কাছে টাকা ছিলো, মনে আছে? সব সময় এটাই হয় যে, যে খুন করে সে-ই টাকাগুলো মেরে দেয়, কিন্তু মাঝে মাঝে অন্য কেউও তা সরিয়ে থাকে।'

'তার মানে তুমি বলতে চাচ্ছো...'

'হ্যাঁ, ওটাই। অর্থাৎ, যে লাশটা আগে খুঁজে পেয়েছে, সে হয়তো টাকাটা মেরে দিয়ে পুলিশকে খবর দিয়েছে!' ছোট্ট একটা হাসির শব্দ বেরিয়ে এলো কিকুচির মুখ থেকে। 'পুলিশ ওখানেই থেমে যায়নি। এই হত্যার পেছনে আমার বাবার হাত আছে—এই জাতীয় সন্দেহও করেছে তারা। মানে ওরা বলতে চায় বাবা নাকি খুন করে টাকা লুটে নেওয়ার পর আমাদেরকে দিয়ে দেহটা সবার নজরে এনেছে। বুঝতেই পারছো যে কেন আমি এটার পেছনে এতটা লেগে আছি।'

'আরে, এ তো পুরো মাথা নষ্ট করে দেওয়ার মতো কারবার!'

'জানি আমি। আমরা গরিব বলে এরকমটা করেছিলো ওরা। আমার মা-ও রিওর বাবার দোকানে যাওয়া-আসা করতো। কারণ আমাদেরও আর্থিক সমস্যা ছিলো। আর এখানেই মূলত পুলিশ বেশি আগ্রহ খুঁজে পেয়েছিলো।'

'কিন্তু ওরা তোমাদের আর জ্বালায়নি, তাই না? মানে তোমার বাবাকে তো আর আটক করেনি?'

'না, তবে সন্দেহ করেছিলো ঠিকই,' চুকচুক-জাতীয় একটা শব্দ করে বললো সে। আর কথা না বাড়িয়ে নিচে নেমে গেল তারা।

***

ক্লাস শেষ করে সেইকা স্কুলের দিকে চলে গেল ইউইচি। স্কুলের পাশ দিয়ে বেষ্টনী-বাঁধা রাস্তাটা ধরে হাঁটছে। হঠাৎ যে শব্দটা শোনার জন্য কান পেতে ছিলো সেটা শুনতে পেয়ে থেমে গেল সে-ভায়োলিন। চারপাশটা আরেকবার দেখে নিলো যাতে নিশ্চিত হওয়া যায় যে জায়গাটা একদম খালি। এরপর বেষ্টনীর উপরে লাফ দিয়ে উঠে ততক্ষণ পর্যন্ত ঝুলে রইলো যতক্ষণ না ভায়োলিনের শব্দ কোথা থেকে আসছে তা দেখতে পায়। একটা মেয়েকে কালো রঙের একটা পিয়ানোর সামনে দেখতে পেল সে। মেয়েটা তার উলটো দিকে ঘুরে বসে আছে।

পেয়ে গেছি! ভাবলো ইউইচি। গলাটা কচ্ছপের মতো আরেকটু উঁচু করে বসে থাকা মেয়েটার খানিকটা সামনে তাকালো সে। নাবিকদের ইউনিফর্ম পরা আরেকটা মেয়ে দাঁড়িয়ে ভায়োলিন বাজাচ্ছে।

মিয়াকো ফুজিমুরা।

ওকে ইউকিহোর থেকে খাটো লাগছে দেখতে। চুলও বেশ ছোট। ভালো করে মুখটা দেখার জন্য আরেকটু গলা উঁচু করতে যাবে, অমনি খেয়াল করলো ভেতর থেকে ভায়োলিন বাজানো বন্ধ হয়ে গেছে। তীব্র আতঙ্কের সাথে খেয়াল করলো মেয়েটা দৌড়ে জানালার কাছে চলে আসছে।

কিছু বুঝে ওঠার আগেই জানালাটা ইউইচির একদম মুখের সামনে খুলে গেল। সরাসরি ওর দিকে তাকালো মেয়েটা, মুখে বিজয়ের একটা হাসি। সেখানেই জমে গেল ইউইচি, এমনকি বেষ্টনী থেকে লাফও দিতে পারলো না। এরপরেই ওর মুখের উপর গগনবিদারী চিৎকার ছুঁড়ে দিলো ফুজিমুরা। মেয়েটার গলা যেন কয়েকশো টন ভারী মনে হলো তার কাছে। যেটা আঁকড়ে ধরে ঝুলছিলো এতক্ষণ, ওটা ছেড়ে দিলো ইউইচি। গড়াগড়ি খেতে খেতে মাটিতে আছড়ে পড়লো। সৌভাগ্যবশত, পা আগে মাটিতে পড়েছিলো তার। মেয়েটা তখনো চিৎকার করছে ক্লাসের ভেতর থেকে। জান বাঁচানোর জন্য পড়িমরি করে দৌড়াতে লাগলো ইউইচি। এর কিছুক্ষণ বাদে শ্বাস নেওয়ার জন্য থামলে তার মনে পড়লো মেয়েটা তাকে দেখে কী বলে চেঁচাচ্ছিলো।

তেলাপোকা!

***

মঙ্গল আর শুক্রবার সন্ধ্যা সাতটা থেকে সাড়ে আটটা অবধি ইংরেজি পড়ার জন্য যায় এরিকো আর ইউকিহো। এটাও ইউকিহোরই আইডিয়া ছিলো।

স্কুল থেকে প্রাইভেটে যেতে হেঁটে দশ মিনিটের মতো সময় লাগে। কিন্তু এরিকো স্কুল থেকে প্রথমে বাসায় গিয়ে ডিনার করে তারপর সেখানে যায়। সে

সময়টা ইউকিহো স্কুলের থিয়েটার ক্লাবে বসে এটা-সেটা নিয়ে চর্চা করে। এরিকো সব সময় ইউকিহোর পেছনে ছায়ার মতো লেগে থাকলেও থিয়েটার ক্লাবে তেমন একটা ঢোকে না।

সেরকমই এক মঙ্গলবারের রাতে প্রাইভেট শেষে দুজনেই প্রতিদিনের মতো বাড়িতে যাচ্ছিলো। স্কুলের প্রায় কাছাকাছি চলে এলে হঠাৎ ইউকিহো বলে উঠলো যে তাকে বাসায় একটা ফোন করতে হবে। এটা বলেই সে ফোন বুথের দিকে চলে যায়। ঘড়ি দেখলো এরিকো; প্রায় নয়টা বাজে তখন। ওরা কথা বলতে বলতে বেশ রাত করে ফেলেছে।

ইউকিহো বুথ থেকে বেরিয়ে এরিকোর উদ্দেশে বললো, 'অপেক্ষা করার জন্য ধন্যবাদ। মা তাড়াতাড়ি বাসায় যেতে বলেছে। আচ্ছা, তাড়াতাড়ি যাওয়ার জন্য অন্য একটা রাস্তা দিয়ে গেলে কেমন হয়?'

'ভালোই হয়।'

সাধারণত ওরা দুজন যে রাস্তা দিয়ে বাস বা গাড়ি চলাচল করে, সে রাস্তা দিয়েই বাড়ি ফেরে, কিন্তু আজ তারা পেছনের একটা রাস্তা দিয়ে বাড়ি যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ রাস্তাটায় কোনো আলো না থাকার কারণে সব সময় অন্ধকার হয়ে থাকে, ফলে দুজনেই এ রাস্তাটা সব সময় এড়িয়ে চলেছে। রাস্তাটায় তেমন একটা বাড়িঘরও নেই। শুধু গাড়ি পার্ক করার মতো কিছু জায়গা রয়েছে।

একটা কাঠের গুদামের সামনে এসে হঠাৎ থামলো ইউকিহো। 'এরিকো, সামনের জিনিসটা দেখতে পাচ্ছো? স্কুলের ইউনিফর্ম মনে হচ্ছে না?' কাঠের ফাঁক দিয়ে মাটিতে পড়ে থাকা সাদা কিছুর দিকে আঙুল তুলে দেখালো সে।

'বুঝতে পারছি না।' সারস পাখির মতো গলা তুলে দেখছে এরিকো। 'কোনো কাপড় পড়ে আছে হয়তো।'

হেঁটে গিয়ে জিনিসটা তুললো ইউকিহো। 'আরে না, ইউনিফর্মই। দেখেছ, বললাম না তোমাকে যে এটা ইউনিফর্ম?'

ঠিকই বলেছে ও। ছিন্নভিন্ন অবস্থায় পড়ে আছে ওটা, ওদেরই স্কুলের কারো ইউনিফর্ম। একটা ব্যাজ লাগানো আছে তাতে–মিয়াকো ফুজিমুরা।

এরিকোর মেরুদণ্ড বেয়ে অস্বাভাবিক একটা কাঁপুনি নেমে গেল–কেন তা জানে না। এরপরেও যত দ্রুত সম্ভব এখান থেকে চলে যেতে চাচ্ছে সে। কিন্তু ইউকিহো দাঁড়িয়ে রইলো সেখানে, এদিক-সেদিক ভালো করে দেখতে লাগলো। আর তখনই তার নজরে এলো গুদামের দরজাটা হালকা খোলা। সাহস করে ধীরপায়ে এগিয়ে গিয়ে ভেতরে উঁকি দিলো সে।

'চলো, বাড়ি ফিরে যাই,' পেছন থেকে বলে উঠলো এরিকো।

আর তখনই ইউকিহো একটা চিৎকার দিয়ে দরজার পাশ থেকে সরে দাঁড়ালো। দুহাত একসাথে করে মুখ ঢেকে ফেললো সাথে সাথে যাতে চিৎকারের আওয়াজ কেউ শুনতে না পায়।

'কী হলো?' জিজ্ঞেস করলো এরিকো। ওর গলা কাঁপছে।

'ভেতরে কেউ একজন আছে,' বলে উঠলো ইউকিহো। 'সম্ভবত মারা গেছে।'

ভেতরে আর কেউ না, মিয়াকো ফুজিমুরাই ছিলো। ওর হাত-পা-মুখ দড়ি দিয়ে বাঁধা, তবে মারা যায়নি। উদ্ধার করার সময় অচেতন অবস্থায় ছিলো সে, কিন্তু এর কিছুক্ষণ পরে জ্ঞান ফেরে তার।

এরিকো আর ইউকিহো ওকে ভেতরে দেখতে পেয়ে আবার মেইন রোডে ছুটে যায়। সেখানের বুথ থেকে পুলিশকে ফোন করে বলে যে তারা একটা লাশ দেখতে পেয়েছে। এরপর বুথের সামনে পুলিশ আসার আগ পর্যন্ত অপেক্ষা করে।

মিয়াকোর শরীরের কোমর পর্যন্ত কোনো কাপড় নেই। আর কোমরের নিচ থেকে একটা স্কার্ট বাদে সব পোশাক খুলে ফেলেছে কেউ। তার গায়ের সব পোশাক একটা কালো প্লাস্টিক ব্যাগের আশেপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। উদ্ধারকর্মীদের থেকে একজন এগিয়ে এসে ওকে অ্যাম্বুলেন্সে উঠালো, কিন্তু তখনো মুখ দিয়ে কিছুই বলেনি মেয়েটা। এমনকি এরিকো আর ইউকিহোকে দেখার পরেও কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি তার চেহারায়। চোখদুটো যেন ফাঁকা হয়ে আছে একদম ভেতর থেকে।

এরিকো আর ইউকিহোকে নিকটস্থ থানায় নিয়ে কিছু প্রশ্ন করা হয় এরপর পুলিশের গাড়িতে এটাই তাদের প্রথম ভ্রমণ—পরিস্থিতি এরকম না হলে এটা ওদের জন্য বেশ উত্তেজনাকর মুহূর্ত হতো। কিন্তু যা কিছু ঘটে যেতে দেখেছে, তাতে নিরাপদ যে আছে এতেই খুশি তারা।

যে গোয়েন্দাটা ওদেরকে প্রশ্ন করছে, সে মাঝবয়সি হবে। মাথার মাঝখানের কিছু চুল পেকে গেছে। এরকম লোকগুলোকে প্রায়ই বিভিন্ন সুশি বারের কাউন্টারের পেছনে দেখা যায়, কিন্তু যেভাবে সে কথা বলছিলো বা যে ভঙ্গিতে বসেছিলো, তা সম্পূর্ণ আলাদা। লোকটা যথেষ্ট ভদ্রভাবেই কথা বলেছে, কিন্তু তার চোখের তীক্ষ্ণতা দেখে এরিকো নিজের জায়গায় গুটিশুটি মেরে বসলো।

লোকটা ওদেরকে প্রায় সব ধরনের প্রশ্ন করলো: কীভাবে মেয়েটাকে ওরা খুঁজে পেয়েছে বা কেন সে রাস্তায় গেল, এমনকি তার সাথে এমন কিছু ঘটবে এটা জানতো কি না তাও জিজ্ঞেস করা হলো ওদেরকে। এরিকো আর ইউকিহো দুজনেই সবকিছু খুলে বললো, মাঝে মাঝে নিজেদের দিকে ফিরে একটু-আধটু নিশ্চিত হয়ে নিচ্ছিলো যে ওরা ঠিক কথাটা বলছে কি না। গোয়েন্দা আগ্রহ নিয়ে শুনলো, কিন্তু যখন প্রশ্ন করা হলো যে মেয়েটার সাথে এমন কিছু ঘটবে এটা ওরা আগে থেকে জানতো কি না, তখন দুজনের কারোই কিছু বলার ছিলো না।

'স্কুল থেকে ফেরার পথে অস্বাভাবিক কাউকে খেয়াল করেছিলে?' একজন মহিলা পুলিশ পাশ থেকে জিজ্ঞেস করলো। 'মানে এমন কাউকে আর কি, যাকে দেখে মনে হচ্ছিলো যে সে কারো জন্য অপেক্ষা করছে। বা এরকম কোনো কথা শুনেছিলে কি না স্কুলে?'

'নাহ, এমন কিছু তো শুনিনি,' বললো এরিকো।

'তবে,' বললো ইউকিহো, 'কিছু লোক ছিলো যারা স্কুলের ভেতরে উঁকিঝুঁকি মারতো, আর আমাদের যাওয়ার পথে ছবি তুলতো।' এরিকোর দিকে তাকালো সে। 'মনে আছে?'

মাথা দোলালো এরিকো।

'সব সময় কি একই ব্যক্তিই এটা করতো?' গোয়েন্দাটা জিজ্ঞেস করলো।

'না, অনেকজন ছিলো তারা। তবে তাদের মধ্যে সবাই-ই ছবি তুলতো কি না তা জানি না,' বললো ইউকিহো। 'তবে আমার মনে হয় তারা সবাই এক স্কুলেই পড়ে।'

'এক মিনিট। এতক্ষণ যাদের কথা বললে, তারাও কি শিক্ষার্থী নাকি?' মহিলার চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল যেন।

'হ্যাঁ, আমার মনে হয় ওরা সবাই ওয়ে মিডল স্কুলে পড়ে,' বললো ইউকিহো। ওর বলার ভঙ্গিটা এতটাই নিশ্চিত শোনালো যে এরিকোও অবাক না হয়ে পারলো না।

'ওয়ে? কীভাবে বলছো এ কথা তুমি?' জিজ্ঞেস করে বসলো মহিলা পুলিশটি।

'আমিও একসময় ওখানে পড়তাম। আর আমি একশো ভাগ নিশ্চিত যে ঐ ইউনিফর্মগুলো ওয়ে স্কুলেরই।'

মহিলা পুলিশটি একবার গোয়েন্দা কর্মকর্তার সাথে দৃষ্টিবিনিময় করলো।

'আর কিছু মনে আছে তোমার?' জিজ্ঞেস করলো গোয়েন্দা।

'আমি একজনের নাম জানি যে সেদিন বাড়ি যাওয়ার পথে আমার ছবি তুলেছিলো। শার্টের উপর নাম লেখা ছিলো তার।'

শিকার করার সময় পশুদের চোখদুটো যেভাবে ছোট হয়ে যায়, ঠিক তেমন করে গোয়েন্দার চোখদুটো ছোট হয়ে গেল। 'কী নাম দেখেছিলে?

'আকিওশি। পাক্কা এটাই ছিলো।'

পুরো বিষয়টা অস্বাভাবিক রকমের উদ্ভট লাগলো এরিকোর কাছে। সেদিনের আচরণ দেখে তার মনে হয়েছিলো ইউকিহো ছেলেগুলোকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে গেছে। অথচ সে এতটাই মনোযোগ দিয়ে দেখেছিলো যে ছেলেটার নাম পর্যন্ত তার মনে আছে! এরিকোর নিজেরই মনে নেই এরকম কিছু সে দেখেছিলো কি না।

'আকিওশি...তাই তো?' নোটবুকে নামটা লিখতে লিখতে আরেকবার মুখে জিজ্ঞেস করে নিলো গোয়েন্দাটা। মহিলা পুলিশটার কানে কানে কিছু একটা বলতেই সে উঠে বাইরে চলে গেল।

'ছেড়ে দেওয়ার আগে শেষ আরেকটা জিনিস দেখাবো তোমাদেরকে,' গোয়েন্দাটা উঠে গিয়ে একটা প্লাস্টিকের ব্যাগ রাখলো টেবিলের উপর। 'আমরা এই ব্যাগটা সেই গুদামে পেয়েছি। এটা কি এর আগে কখনো দেখেছিলে তোমরা?' ব্যাগটার ভেতরে একটা ক্ষুদ্র প্রস্তরমূর্তি। দেখে মনে হচ্ছে কোনো চাবির রিংয়ের অংশ ওটা, যদিও রিংয়ের অর্ধেকটা গায়েব।

'দুঃখিত, এটা আগে কখনো দেখিনি বলেই মনে হচ্ছে,' বললো এরিকো। ইউকিহোও একই উত্তর দিলো।

***

'এই, তোমার চাবির রিংটা তো ভেঙে গেছে দেখছি,' ইউইচি বললো।

লাঞ্চের সময়ে কিছু স্ন্যাকস কিনতে দোকানে গেছিলো ওরা। কিকুচির পেছনে দাঁড়িয়ে ছিলো ইউইচি। ঐ সময় পকেট থেকে ওয়ালেটটা বের করলো কিকুচি। ওয়ালেটের একপাশে চাবির রিংয়ের ভেতর একটা ক্ষুদ্র প্রস্তরমূর্তি রাখতো সে। কিন্তু এখন সেখানে শুধু রিংটাই আছে, মূর্তিটা উধাও হয়ে গেছে।

'হ্যাঁ, কাল রাতে খেয়াল করেছি আমি,' তেতো মুখ করে বললো কিকুচি 'শালার, কল্পনাও করতে পারিনি রিংটা এত সহজে ভেঙে যাবে।'

ইউইচির মুখ দিয়ে প্রায় বেরিয়েই যাচ্ছিলো যে *কারণ এটা কমদামি জিনিস*, কিন্তু তা বেরোতে না দিয়ে গিলে ফেললো সে। কিকুচির সাথে কথা বলার সময় 'কমদামি' শব্দটা উচ্চারণ করা যায় না।

'গতকালের কথা বলছি, শোনো,' স্বরটা একটু নামিয়ে নিয়ে বললো কিকুচি 'রকি সিনেমাটা দেখেছি আমি।'

'আরে বাহ!' বললো ইউইচি। যদিও ওর মাথার মধ্যে চলছিলো এই কথাটা: *কিন্তু তুমি তো বলেছিলে এর টিকেট অনেক দামি*।

'ফ্রি টিকেট পেয়েছিলাম আমরা,' আগের কথার সাথে যোগ করলো কিকুচি যেন ইউইচির মাথায় কী চলছে তা পড়ে ফেলেছে সে। 'মায়ের দোকানের এক কাস্টমার দিয়েছিলো তাকে।'

'আরে, ভাগ্য খুলে গেছে এ যাত্রায় তোমার।' ইউইচি জানে কিকুচির মা স্কুলের পাশেই একটা মার্কেটে কাজ করে।

'যাক গে, আমরা যখন টিকেটটা দেখলাম, তখন দেখি গতকালই ওটার লাস্ট ডেট ছিলো। আর এজন্যই মনে হয় দিয়েছিলো লোকটা। একদম শেষ শো-টা পেয়েছিলাম আমরা।'

'তো কেমন দেখলে?'

'দারুণ!'

এরপর কিছুক্ষণ দুজনে মিলে মুভিটা নিয়ে আলাপ করলো। ক্লাসে ফিরে এলে ইউইচির এক ক্লাসমেট বললো যে ওকে ক্লাস টিচার খুঁজেছেন। ওদের ক্লাস টিচার বিজ্ঞান ক্লাস নেয়, আর সবাই তাকে ভালুক বলে ডাকে। ইউইচি গিয়ে দেখে যে তার জন্য অপেক্ষা করছে ভালুকটা, মুখে কঠিন একটা ছাপ।

'কিছু গোয়েন্দা পুলিশ এসেছে টেনোজি থেকে। তোমার সাথে কথা বলতে চায়।'

ইউইচির চোয়াল ঝুলে গেল। 'আমার সাথে? কী নিয়ে?'

'ওরা বললো তুমি নাকি সেইকা গার্লস স্কুলে গিয়ে মেয়েদের ছবি তোলো?' ভালুকটা তার বড় বড় চোখ দিয়ে যেন গিলে খেতে চাইছে ইউইচিকে।

'আমি–না, আ-আ–' তোতলাতে লাগলো ইউইচি। আরেকটু হলেই হয়তো সব বলেই দিতো।

'আমি বিশ্বাস করতে পারছি না,' দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললো ভালুকটা। 'এরপর আর কী করতে চাও? পুরো স্কুলের মান-সম্মান নষ্ট করেছ তুমি।'

রুম থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় চোয়াল দিয়ে তাকে অনুসরণ করার জন্য একবার ইশারা করলো ইউইচিকে।

স্কুল অফিসে তিনজন লোক বসে আছে ওর জন্যে। তাদের মধ্যে স্কুলের গাইডেন্স কাউন্সিলরও আছেন। পুরু একটা চশমার ফাঁক দিয়ে ইউইচির দিকে তাকালেন তিনি।

এর আগে বাকি দুজনকে কখনো দেখেনি ইউইচি। একজন মধ্যবয়সি, আরেকজন তার থেকে কিছুটা তরুণ। একদম কালো রঙের স্যুট পরে আছে ওরা। *এরাই হয়তো গোয়েন্দা*, ভাবলো ইউইচি।

ভালুকটা ইউইচিকে পরিচয় করিয়ে দিলো গোয়েন্দাদের সাথে। লোক দুটো তখন ইউইচিকে আপাদমস্তক দেখছে।

'তো তুমিই তবে সেইকা স্কুলের মেয়েদের ছবি তুলতে?' মধ্যবয়স্ক লোকটা বলে উঠলো। তার স্বর বেশ শান্ত মনে হলেও তার ভেতর এমন ভয়ার্ত কিছু একটা লুকিয়ে আছে যেটা এর আগে কোনো শিক্ষকের মাঝে পায়নি ইউইচি। সিটের মধ্যে এতটাই গুটিশুটি মেরে বসলো যে মনে হলো এখান থেকে হাওয়া হয়ে যেতে পারলেই বেঁচে যায় সে।

'আ-আমি, আসলে–' কথা বলতে গিয়ে জিভ আটকে যাচ্ছে তার। মনে হচ্ছে কেউ একজন জিভটাকে বেঁধে রেখেছে।

'যাদের ছবি তুলেছ, তাদের মধ্য থেকে একজন তোমার নেমপ্লেট দেখে ফেলেছে,' ইউইচির শার্টের দিকে নির্দেশ করে বললো গোয়েন্দা। 'তোমার নামটা বেশ বিরল, আর এজন্যই হয়তো সে মনে রাখতে পেরেছিলো।'

অসম্ভব, ভাবলো ইউইচি।

'এবার বলো, তুমিই তুলতে ছবিগুলো? সত্যিটা বলো।' তরুণ গোয়েন্দাটা এবার দেখতে লাগলো ইউইচিকে। অন্য দিকে গাইডেন্স কাউন্সিলর চেয়ারে বসে ঝিমাচ্ছে।

'হ্যাঁ,' মৃদু আওয়াজ করে বললো ইউইচি। পাশ থেকে ভাল্লুকের দীর্ঘশ্বাস শুনলো সে।

'তোমার লজ্জা হওয়া উচিত,' পাশ থেকে মুখ খুললেন কাউন্সিলর।

'দেখুন, ব্যাপারটা আমাদেরকে সামলাতে দিন,' একটা হাত জাগিয়ে কাউন্সিলরকে উদ্দেশ করে বললো গোয়েন্দাটি। আবার ফিরে তাকালো ইউইচির দিকে। 'নির্দিষ্ট কোনো ছাত্রীর ছবিই কি তুলতে তুমি?'

'জি, স্যার।'

'তুমি তার নাম জানো?'

মাথা দোলালো ইউইচি। স্বর আটকে গেল তার গলায়।

'এখানে লিখে দিতে পারবে নামটা?' একটা কাগজের টুকরো আর কলম এগিয়ে দিলো গোয়েন্দা।

ইউইচি কাগজের উপরে ইউকিহো কারাশাওয়ার নামটা লিখলো। গোয়েন্দাটা ওদিকে একবার তাকিয়ে মাথা দোলালো শুধু।

'আর কারো?' জিজ্ঞেস করলো গোয়েন্দা। 'শুধু ওরই ছবি তুলতে তুমি?'

'শুধু ওরই, স্যার।'

'পছন্দ করো নাকি ওকে?' জিজ্ঞেস করলো গোয়েন্দা। একটা চওড়া হাসি দেখা গেল তার মুখে।

'আসলে আমার পছন্দ না। আমার বন্ধু পছন্দ করে ওকে। আমি তো শুধু ওর জন্যই ছবিগুলো তুলেছিলাম।'

'সে নিজে কেন তুললো না ছবিগুলো?'

মেঝের দিকে তাকিয়ে ঠোঁটে কামড় দিলো ইউইচি। গোয়েন্দা দুজন তীক্ষ্ণ চোখে দেখছিলো ওকে। একপর্যায়ে বলে উঠলো, 'ওর কাছে বিক্রি করতে সেগুলো, তাই না?'

চমকে উঠলো ইউইচি।

'আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না,' পাশ থেকে আবার কিড়মিড় করে উঠলো ভাল্লুকটা। 'সবগুলো স্টুপিডের দল একসাথে–'

'শুধু তুমিই ছবি তুলতে?' জিজ্ঞেস করলো গোয়েন্দা। 'অন্য আর কেউ এই কাজ করতো না?'

'আমার মনে হয় না আর কেউ করতো, স্যার।'

'খেলার মাঠের পাশে বেষ্টনীর উপরে লাফিয়ে ওঠা সেই ছেলেগুলো কারা? তুমিও কি ওদের মধ্যে একজন?'

ইউইচি মুখ তুলে তাকালো গোয়েন্দাটার দিকে। 'ওসব আমি করিনি। বিশ্বাস করুন, সত্যি বলছি, স্যার। আমি শুধু ছবিই তুলেছিলাম।'

'তাহলে বেষ্টনীর উপরে কে ছিলো বলতে পারো? কোনো ধারণা আছে?' ইউইচি নিশ্চিত জানতো এটা মুতা আর তার গ্যাংয়ের কাজ। কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বললো না। ওরা যদি জানে সে তাদের বিরুদ্ধে নালিশ করেছে, কে জানে আবার কী করে বসবে।

'আগেই বলে দিচ্ছি, বুঝে নাওঃ তুমি যদি কিছু লুকিয়ে থাকো, তবে তোমার জন্য বিষয়টা ভালো হবে না,' ওর সাথে একটা অর্থবহ নজর বিনিময় করলো গোয়েন্দা। 'কিন্তু এই মুহূর্তে তুমি আমায় এটা বলো যে গতকাল স্কুল ছুটির পরে তুমি কী করছিলে? যতটা বিস্তারিত সম্ভব বলে যাও।'

'হাঁহ?' পলক ফেললো ইউইচি। 'কিছু হয়েছে নাকি?'

'আকিওশি!' ভালুকটা চেঁচিয়ে উঠলো পাশ থেকে। 'যা জিজ্ঞেস করছে তার উত্তর দাও ঠিকমতো!'

'সমস্যা নেই, ইটস ওকে,' বললো গোয়েন্দা। মুখে একটা দুর্বল হাসি ফুটিয়ে পুনরায় ইউইচির দিকে ফিরলো সে। 'গতকাল স্কুলের পাশে সেইকা স্কুলের একজন ছাত্রীর খুবই বাজে অবস্থা করা হয়েছে।'

ইউইচির মুখের পেশিগুলো যে জমে যাচ্ছে তা টের পাচ্ছে ও। 'আমি কিছু করিনি।'

'আমরাও তো বলিনি যে তুমি কিছু করেছ। কিন্তু সেইকা স্কুলের মেয়েদের সাথে কথা বলতে গিয়ে তোমার নামটা উঠে এসেছে।' কোনো রকম হুমকি ছিলো না কথাটায়, কিন্তু তবুও পুরো কথাটার মানে একটাইঃ *তুমিই আমাদের প্রধান সন্দেহভাজন।*

'আমি আসলেই কিছু জানি না, স্যার।' মাথা ঝাঁকালো ইউইচি।

'তাহলে বলে দাও কাল স্কুল ছুটির পরে কী করছিলে আর কোথায় গেছিলে।'

'গতকাল...আমি স্কুল ছুটির পরে একটা বুকশপ আর একটা রেকর্ড শপে গেছিলাম,' মনে করতে করতে বললো ইউইচি। ছয়টা বাজার কিছু পরের কথা ওটা, আর তারপর সারা রাত সে বাড়িতেই ছিলো।

'তোমার পরিবারের কেউ বাড়িতে ছিলো সে সময়?'

'হ্যাঁ, মায়ের সাথে ছিলাম আমি। নয়টা নাগাদ বাবা বাড়িতে আসে।'

'তার মানে পরিবারের বাইরে আর কেউ ছিলো না বাড়িতে?'

'না, স্যার,' বললো ইউইচি। তার বাড়ির সদস্যদের কারো কথা হয়তো এরা বিশ্বাসই করবে না–এই ভেবে একটু দুশ্চিন্তা হচ্ছে ওর।

'তাহলে কী করা যায় বলো?' মধ্যবয়সি গোয়েন্দাটা তরুণ গোয়েন্দার দিকে ফিরে বললো। 'মি. আকিওশি বলছে সে তার নিজের জন্য ছবিগুলো তোলেনি, কিন্তু তাকে বিশ্বাস করার মতো কোনো কারণ খুঁজে পাচ্ছি না।'

'আমি আসলেই আমার বন্ধুর জন্য ছবিগুলো তুলেছিলাম।'

'যদি তাই হয়, তবে তোমাকে তো তোমার বন্ধুর নামটা বলতেই হবে।'

ইউইচি বুঝতে পারছে যে যদি সে নামটা না বলে, তবে তাকে প্রধান সন্দেহভাজন হিসেবেই ধরা হবে।

'চিন্তা কোরো না,' হঠাৎ বলে উঠলো গোয়েন্দা। 'নামটা যে তুমিই বলেছ এটা আমরা কাউকে বলবো না।'

একদম ঠিক সময়ে কথাটা বলায় কিছুটা অস্বাভাবিক লাগলো ইউইচির কাছে। মনে হচ্ছে যেন ওরা তার চিন্তাভাবনা পড়ে ফেলছে। দ্বিধা নিয়ে মুতার নামটা বলে দিলো সে। যেই না মুতার নামটা সবার সামনে বলে দিলো ইউইচি, অমনি গাইডেন্স কাউন্সিলরের চোয়ালটা ঝুলে পড়লো। সম্ভবত প্রত্যেকটা বাজে ঘটনায় মুতার নামটা চলে আসার জন্যই।

'ও কি শুধু মিস কারাশাওয়ার ছবিই তুলতে বলেছিলো তোমাকে? আর কারো ছবি তুলতে বলেনি?'

একটু দ্বিধার মধ্যে পড়ে গেল ইউইচি, এরপর কিছু লুকাবে না ভেবে সব বলতে লাগলো। ওর মনে হলো হারানোর মতো তেমন কিছু নেই তার। 'আসলে এই সেদিনও সে আরেকটা মেয়ের ছবি চেয়েছিলো। তার নাম মিয়াকো ফুজিমুরা আমি অবশ্য ওকে চিনি না।'

সাথে সাথে একটা আকস্মিক পরিবর্তন চলে এলো গোয়েন্দাদের মুখে।

'তুমি ছবি তুলেছিলে ওর?' মৃদু স্বরে জিজ্ঞেস করলো গোয়েন্দা।

'এখনো তুলতে পারিনি, স্যার,' বললো সে। এরপরই এরকম শব্দ ব্যবহার করার জন্য নিজের উপরই প্রচণ্ড রাগ হলো তার।

গোয়েন্দারা মাথা দোলালো একবার।

'আর যেন কখনো তোমার বিরুদ্ধে মেয়েদের ছবি তোলার কথা না শুনি, বুঝতে পেরেছ আমার কথা?' পাশ থেকে হুংকার ছেড়ে বললো ভাল্লুকটা। 'বাইরে বসে ওসব ফালতু জিনিস না করলে হয়তো এখানে তোমাকে বসতেই হতো না, বুঝেছ?'

চুপচাপ মাথা নাড়লো ইউইচি।

'আরেকটা বিষয় আছে যেটা তোমাকে দেখাতে চাই আমরা,' প্লাস্টিকের ব্যাগটা বের করতে করতে বললো গোয়েন্দাটা। 'এটা এর আগে কখনো কোথাও দেখেছ?'

ব্যাগের মধ্যে একটা ছোট্ট মূর্তি রয়েছে। দেখামাত্রই ইউইচির মুখ হাঁ হয়ে গেল। কোনো সন্দেহ নেই যে এটাই কিকুচির সেই চাবির রিংয়ে লাগানো মূর্তিটা।

'মনে তো হচ্ছে এর আগে দেখেছ।' ও যদি বলে দেয় যে এটা কিকুচির কাছে দেখেছে, তবে কি কিকুচি প্রধান সন্দেহভাজনের একজন হয়ে যাবে? আর যদি সে মিথ্যা বলে, তবে তো পরে ঝামেলা আরো বেড়ে যাবে। তাড়াতাড়ি ভাবতে হবে ওকে।

'তবে?' আঙুলগুলো টেবিলের উপর রেখে বাজাতে বাজাতে জিজ্ঞেস করলো গোয়েন্দা। ইউইচির কাছে আঙুলের শব্দগুলো শুনে মনে হলো কেউ যেন তার চামড়ার মধ্যে সুঁই ঢোকানোর চেষ্টা করছে।

ঢোক গিললো ইউইচি। এরপরে ধীরে ধীরে যা যা জানতো, তার সবটুকু বলে দিলো ওদেরকে।

***

এরপর বৃহস্পতিবার দিন সকালবেলা এই ঘোষণাটা ক্লাসে দিয়ে দেওয়া হয়: পাঁচটার পর কোনো ছাত্রীই স্কুলে থাকতে পারবে না, এমনকি অন্যান্য কাজ থাকলেও তা পাঁচটার আগেই করে ফেলতে হবে। গণরুমে আবারো একই ঘোষণা দিয়ে দেয় স্কুল কর্তৃপক্ষ।

এরিকোর কাছে বিষয়টা স্বাভাবিকই লাগলো। যা ঘটে গেছে সেদিন তা দেখার পরে পাঁচটাও তার কাছে অনেক দেরি মনে হচ্ছে। *এমনিতেও ক্লাস শেষ হওয়ার সাথে সাথে সবার উচিত বাসায় চলে যাওয়া*, ভাবলো সে। কিন্তু বাকি সব ছাত্রীই এর বিরোধিতা করলো। কর্তৃপক্ষ যে কত ভালোভাবে ঘটনাটা লুকাতে পেরেছে এটা তারই প্রমাণ। এটা দেখার পর নিশ্চিত হয়েই বলা যায় যে দুই রাত আগে স্কুলের এত কাছের ঐ গুদামে কী ঘটেছিলো তা ওরা বাদে আর কেউই জানে না।

অবশ্য, গুজব ছড়িয়ে পড়েছিলো তত দিনে। আর সেই গুজবের উপর সত্যের একটা ছায়াও পড়তে শুরু করেছে এরই মধ্যে। তার মধ্যে একটা তো বেশ কাছাকাছি। এক বখাটে নাকি সেদিন একজনকে মেরে ফেলে রেখেছিলো রাস্তায়। যদিও ঘোষণা শোনার পরপরই তারা সবাই এটাই ধরে নিয়েছিলো। তবে কোনো শিক্ষককেই এ বিষয়ে তেমন কিছু বলতে শোনেনি এরিকো, আর সে বা ইউকিহোও মুখ খোলেনি এখনো পর্যন্ত। ওরাই যে ভিক্টিমকে প্রথম দেখেছিলো এটাও কেউ জানে না। ইউকিহোই চুপ থাকতে বলেছে। সেদিন বাড়িতে যাওয়ার পরে ফোন করে বলেছে যা হয়েছে তা নিজেদের মধ্যেই রাখতে।

'মিয়াকো নিশ্চয়ই অনেক কিছুর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে এখন। আর এই মুহূর্তে যদি সবাই এরকম কথা বলে...মানে যদি সে কিছু করে বসে? আত্মহত্যা করে ফেলে যদি? তাই আমার মতে এখন চুপ থাকাটাই ভালো হবে। হয়তো এতে গুজব

ছড়ানোটা বন্ধ করতে পারবো আমরা,' বলেছিলো ইউকিহো। সেও এরকমই চিন্তা করছিলো বলে জানিয়েছিলো তার বান্ধবীকে।

দ্বিতীয় বর্ষে মিয়াকো ফুজিমুরা তার ক্লাসমেট ছিলো। বেশ চঞ্চল এবং ভালো ছাত্রী ছিলো সে, একজন স্বাভাবিক ক্লাস লিডার যেমন থাকে। যদিও এরিকোর প্রিয় কোনো ব্যক্তি সে ছিলো না। দম্ভে আঘাত লাগলে চেঁচামেচি করার একটা স্বভাব ছিলো তার, আর এমনটা প্রায় ঘন ঘনই করতো। কাউকে খারাপ কিছু বলতে বা গালি দিতে একবারও ভাবতো না সে। এরিকো নিশ্চিত ছিলো যে আরো কিছু মেয়ে আছে যারা ব্যাপারটাকে ওর মতো করে দেখেই। ওরা যদি কোনোমতে একবার বিষয়টা জানতে পারে, তবে এ নিয়ে তুমুল আলোচনা শুরু করে দেবে।

লাঞ্চের সময় জানালার পাশের ডেস্কটাতে বসে ইউকিহো আর এরিকো একসাথে লাঞ্চ করছিলো। আশেপাশে তখন কেউ ছিলো না।

'গল্পটা এমন যে ফুজিমুরা ক্লাসে আসছে না কারণ তার এক্সিডেন্ট হয়েছে,' খুব নিচু গলায় বললো ইউকিহো।

'সত্যি?'

'কেউই এখনো কোনো কিছু সন্দেহ করেনি। যদিও বলা যায় না কতক্ষণ সেটা থাকবে।' ইউকিহো লাঞ্চ শেষ করে তার প্যাচওয়ার্কটা বের করলো। এরপর জানালা দিয়ে বাইরে চোখ রেখে বললো, 'মনে হচ্ছে না আজকে আর সেই ছেলেগুলো আছে ওখানে।'

'কোন ছেলেরা?' সেদিকে তাকিয়েই জিজ্ঞেস করলো এরিকো।

'ঐ যে যারা সব সময় বেষ্টনীর উপরে উঠে বসে থাকতো।'

বাইরে তাকালো এরিকো। ঠিকই বলছে সে। লাঞ্চের সময় ছেলেগুলো সব সময় ওখানে ঘুরঘুর করে, বানরের মতো বেষ্টনীর উপর উঠে লাফায়। কিন্তু আজ একদম ফাঁকা। 'মনে হয় ওরাও জেনে গেছে কী হয়েছে এখানে। আর তাদের স্যাররাও হয়তো আসতে মানা করে দিয়েছে।'

'হতে পারে।'

'আমি ভাবছি ওদের মধ্যেই কেউ আবার এসব করেছে কি না,' ধীর কণ্ঠে বলে উঠলো এরিকো। 'ঐ স্কুল সম্পর্কে ভালো কিছু শুনিনি আমি। ভালোই হয়েছে আমি ওখানে পড়তে যাইনি।'

'কী জানি,' বললো ইউকিহো। 'আমি নিশ্চিত ওখানে ভালো ছাত্রছাত্রীও আছে, যাদের অন্য কোথাও যাওয়ার মতো সুযোগ নেই বলেই সেখানে গেছে। হয়তো ওদের পরিবার অন্য কোথাও যাওয়ার খরচ সামলাতে পারবে না বলেই সেখানেই পড়ে আছে।'

'হ্যাঁ, তাও হতে পারে, কিন্তু–' এরিকোর গলাটা নেমে এলো। এইমাত্র খেয়াল করেছে ইউকিহোর হাতে থাকা পার্সটার কাজ প্রায় শেষের পথে। ওটা সে তার বাড়িতে বসে দেখিয়েছিলো। 'আরে, এটা দেখি করে ফেলেছ প্রায়!'

'হ্যাঁ, অল্প কিছুটা বাকি আর কি।'

'কিন্তু এখানে প্রথম দুই অক্ষর RK কেন? এটা না ইউকিহোর YK হওয়ার কথা?'

'ও...এটা আমার মায়ের জন্য। তার নাম রেইকো।'

'ওহ, তবে তো বেশ হয়েছে,' ইউকিহোর হাত চালানো দেখতে দেখতে বললো এরিকো।

***

গোয়েন্দাদের কাছে কিকুচিকে সন্দেহ করাটা স্বাভাবিক ছিলো। বৃহস্পতিবার দিন সকালে ওকে স্কুলের অফিস রুমে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে তারা। যদিও কী জিজ্ঞেস করেছে আর ও কী বলেছে তার কিছুই কাউকে বলেনি সে। শুক্রবার দিন সকালে আবারো তাকে ডাকা হয়। কারো চোখের সাথে চোখ না মিলিয়ে বিভিন্ন ডেস্ক টপকে দরজার দিকে এগিয়ে যায় সে।

'আমি শুনেছি কেউ একজন সেইকা স্কুলের একটা মেয়েকে মেরেছে,' কিকুচি রুম থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরে একটা ছেলে বলে উঠলো। 'আর পুলিশ ভাবছে কাজটা ও-ই করেছে। তারা ঘটনার জায়গায় ওর কিছু একটা পেয়েছিলো।'

'এই ফালতু কথাটা কোত্থেকে শুনেছ?' জিজ্ঞেস করলো ইউইচি।

'কেউ একজন শিক্ষকদের কথা বলার সময় শুনে ফেলেছিলো। খুবই মারাত্মক আক্রমণ ছিলো নাকি।'

'আক্রমণ দিয়ে কী বোঝাচ্ছো তুমি? ধর্ষণ করেছে নাকি?' আরেকটা ছেলে জিজ্ঞেস করলো পেছন থেকে। চোখেমুখে কৌতূহলের ছাপ স্পষ্ট।

'হ্যাঁ, হতে পারে। টাকাও নিয়ে গেছে,' কথাটা এমনভাবে বললো যেন একদম সত্যি বলছে সে।

ইউইচি দেখলো পাশের ছেলেগুলো বেশ আগ্রহ নিয়ে শুনছে আর মাথা নাড়াচ্ছে। ওরা সবাই জানে কিকুচির পরিবার আর্থিকভাবে অসচ্ছল।

'কিন্তু কিকুচি তো বলেছে ও করেনি। তাহলে?' ইউইচি বলে উঠলো। 'ঘটনার সময় ও না মুভি দেখতে গেছিলো?'

ওরা কেউই তার কথায় পাত্তা দিলো না।

'ও-ই করেছে কাজটা,' পাশ থেকে বলে উঠলো আরেকজন। সবাই বেশ মেনে নিলো কথাটা। ততক্ষণে একটা বৃত্তের মতো তৈরি হয়ে গেছে ইউইচির সামনে, আর তাকে অবাক করে দিয়ে রিও-ও তাতে যোগ দিয়েছে। এসব জিনিস সব

সময়ই এড়িয়ে যেত ছেলেটা। যদিও সেই ছবিটার কারণেই রিওর আগ্রহ বাড়ছে কি না কে জানে।

ইউইচি বেশ কিছুক্ষণ শুনলো তাদের এই আলাপ, এরপরই রিওর চোখে চোখ পড়লো তার। রিও জটলা থেকে সরে গিয়ে তার ডেস্কে বসে পড়ার আগে দুই-একবারের জন্য পালটা দৃষ্টিবিনিময় করলো।

***

শনিবার, ঘটনা ঘটার চার দিন পর, এরিকো আর ইউকিহো মিয়াকোর বাড়িতে যায় তাকে দেখার জন্য। ইউকিহোই বলেছিলো যে দেখা করাটা উচিত ওদের।

বসার ঘরে বসে অপেক্ষা করতে লাগলো ওরা, কিন্তু মিয়াকোর দেখা পাওয়া গেল না। তার পরিবর্তে তার মা এসে বললো যে মিয়াকো কারো সাথেই দেখা করছে না এখন। খুবই ভারাক্রান্ত শোনালো তার কণ্ঠ।

'ও কি খুব বেশি আহত হয়েছে?' জিজ্ঞেস করলো এরিকো।

'না, না, ততটা না,' মৃদু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো মিয়াকোর মা।

'পুলিশ কি জানতে পেরেছে কে করেছে এমন?' এবার ইউকিহো মুখ খুললো। 'আমাদেরকে বেশ প্রশ্ন করছে তারা ইদানীং।'

মাথা ঝাঁকালো মিয়াকোর মা। 'না, এখনো ধরতে পারেনি কিছু, আমি খুবই দুঃখিত যে তোমাদের উপর দিয়ে অনেক কিছু বয়ে যাচ্ছে।'

'না, না, সমস্যা হচ্ছে না। এমনিই ভাবলাম যে মিয়াকো হয়তো দেখে থাকবে কারা এ হাল করেছে,' বললো ইউকিহো। তার গলার স্বর শুনে মনে হলো সে ফিসফিস করে বলছে কথাগুলো।

'না।' তার মা আবার মাথা ঝাঁকালো। 'যে-ই কাজটা করেছে সে মিয়াকোর পেছন থেকে মাথায় ব্যাগ পরিয়ে নিয়েছিলো যাতে সে কিছু দেখতে না পায়। এরপরই ওরা তাকে আঘাত করে, আর তারপর সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে।' মিয়াকোর মায়ের চোখ লাল হয়ে গেছে। মুখের উপর দুহাত দিয়ে চেপে ধরলো সে। 'আমি দুশ্চিন্তায় ছিলাম ওর দেরিতে বাসায় ফেরা নিয়ে। ক্লাস শেষে স্কুলের অনুষ্ঠানের জন্য তৈরি হতে গিয়ে ও প্রায়ই রাত করে বাসায় ফিরতো। ও খুব দায়িত্ব নিয়ে কাজ করছিলো; কারণ প্রোগ্রামটায় ও ছিলো ব্যান্ডটার প্রধান, যার কারণে অন্য বাচ্চাদের থেকে ও একটু বেশিই থাকতো স্কুলে।'

এরিকো মনে মনে ভাবছে মিয়াকোর মা আবার কেঁদে না দেয়। ও চাইছে এখান থেকে চলে যেতে। ইউকিহোও হয়তো একই বিষয়েই ভাবছে। কারণ ও তার দিকে তাকিয়ে বললো, 'মনে হয় আমাদের এখন বাড়ি চলে যাওয়া উচিত।'

'হ্যাঁ, সময় হয়ে গেছে,' ব্যাগ গোছাতে গোছাতে বললো এরিকো।

'আমি খুবই লজ্জিত যে ও তোমাদের সাথে দেখা করতে পারছে না,' মিয়াকোর মা বলে উঠলো। 'এত দূর থেকে এসেছ তোমরা।'

'সমস্যা নেই, আন্টি, আমরা চাই ও সুস্থ হয়ে উঠুক তাড়াতাড়ি,' বললো ইউকিহো।

'অনেক ধন্যবাদ তোমাদেরকে। ওহ, হ্যাঁ...' মিয়াকোর মা দুজনের দিকেই তাকালো এবার। 'আমি জানি তোমরা কী দেখেছ। ওকে উলঙ্গ অবস্থায় দেখেছ তোমরা। কিন্তু বিশ্বাস করো, ঐ বখাটেরা ওকে ছুঁয়েও দেখেনি। মানে আর কি...যা ভাবছো তার কিছুই করেনি।'

এরিকো বুঝে গেছে কী বলতে চাইছে মহিলা। ইউকিহোর দিকে হতবাক দৃষ্টিতে তাকালো সে। ওরা কেউই হয়তো শব্দটা ব্যবহার করেনি, কিন্তু দুজনেই ভেবে নিয়েছিলো মিয়াকোকে হয়তো ধর্ষণ করা হয়েছে।

'না, না, তেমন কিছুই ভাবিনি আমরা,' ইউকিহো এমনভাবে কথাটা বললো যেন এমনটা যে হতে পারে তা সে কখনোই ভাবেনি।

'এছাড়াও তোমরা বিষয়টাকে লুকিয়ে রেখে ভালো একটা কাজ করেছ। আমি চাইবো বিষয়টা যেন গোপনেই থাকে। আমার ভয় হয়, মানুষ যদি জেনে গিয়ে এটা-সেটা বলে ওর ব্যাপারে...ও খুব কষ্ট পাবে...ভবিষ্যতে আর কি।'

'আমরা বুঝতে পেরেছি,' নিঃসংশয়ে বললো ইউকিহো। 'আমরা কাউকে বলবো না। প্রতিজ্ঞা করছি। আর যদি আমরা কোনো রকম গুজব শুনতে পাই, তবে সেটাও উড়িয়ে দেবো। দয়া করে মিয়াকোকে জানাবেন যে ওর এই গোপন বিষয় আমাদের কাছে গোপনই আছে।'

'অনেক অনেক ধন্যবাদ, বাবুরা। আমি খুবই খুশি যে ওর এমন বন্ধু আছে। কোনোদিনই এটা ভুলবো না আমরা,' মিয়াকোর মা বললো। তার চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি পড়ছে।

***

সোমবার দিন স্কুলে আসার পরে ইউইচি জানতে পারে যে শনিবার দিনই কিকুইচিকে সন্দেহভাজনের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। সেদিন সকালে মুতাকেও গোয়েন্দারা ডেকে পাঠিয়েছিলো বলে শুনেছে সে।

ইউইচি তার বন্ধুর কাছে পুরো গল্পটা শুনতে গেলে কিকুচি তার সামনের আর ইউইচির পেছনের ব্ল্যাকবোর্ডটার দিকে তাকানোর আগে বললো, 'ফাঁদ থেকে মুক্তি পেয়েছি। ভাববার আর কিছু নেই। আমার সাথে কাহিনি শেষ।'

'আরে, তাহলে তো ভালোই হলো, কী বলো?' বললো ইউইচি। 'তো তোমার পেছন থেকে ওদের সরালে কেমন করে?'

'আমি প্রমাণ করেছি যে আমি সেদিন মুভি দেখতে গেছিলাম।'

'কীভাবে?'

হাতদুটো বুকের উপর গুঁজে দিলো কিকুচি। 'আমি বুঝতে পারছি না এতে তোমার এত আগ্রহ কেন। যদি-না আমাকে অ্যারেস্ট করাতে চাও আর কি।'

'কী বলছো এসব? আমি কোনোভাবেই চাই না ওরা তোমাকে অ্যারেস্ট করুক!'

'তাহলে প্লিজ, এই টপিকটা ঝেড়ে ফেলো। আমি এটা নিয়ে ভাবতেও চাচ্ছি না আর। ভাবলেও পেটের মধ্যে গুড়গুড় করে ওঠে।' কথা বলার পুরোটা সময় ব্ল্যাকবোর্ডের দিকে তাকিয়ে ছিলো সে। একবারও তাকায়নি ইউইচির দিকে। মনে হয় কোনো কারণে মনমরা হয়ে আছে। হয়তো বুঝে গেছে সেই চাবির রিংয়ের ব্যাপারে কে বলেছে পুলিশদের।

ওদের সম্পর্কটাকে ঠিক করার জন্য মাথা খাটাতে লাগলো ইউইচি। হঠাৎ একটা জিনিস মাথায় খেলে গেল তার। 'এই কিকুচি, ঐ ছবিটার কথা মনে আছে তোমার? যদি ওরকম আরো কিছু ছবি দেখতে চাও, আমি দেখাতে পারি।'

'কী বলছো এসব তুমি?'

'আরে ঐ যে...যেই ছবিটাতে রিওর মা আর সেই লোকটাকে দেখেছ। আমার কাছে পুরো বিষয়টা কেমন যেন নাটকীয় নাটকীয় লেগেছে।'

'ওহ, ওটা,' অনাগ্রহ নিয়ে বললো কিকুচি। 'ওটা নিয়ে আর ভাবছি না আমি। মানে ওটা নিয়ে ভেবে আর কী হবে? অনেক বছর হয়ে গেছে। তাছাড়া, কারোরই আর মনে নেই সেই কেস সম্পর্কে।'

'কিন্তু তুমি না সেদিন বললে–'

'তাছাড়া,' ওকে থামিয়ে দিয়ে বললো কিকুচি, 'ছবিটা হারিয়ে ফেলেছি আমি। হয়তো মনের অজান্তে ঝাড়ু দেওয়ার সময় রুম থেকে ফেলে দিয়েছিলাম।'

'কী বলছো এসব!'

কিকুচির দিকে তাকাতেই ভাষা হারিয়ে ফেললো ইউইচি। ঐ পাথুরে মুখে ছবি হারানোর ফলে কোনো রকম দুঃখবোধ দেখা যাচ্ছে না।

'তোমার তো এমনিতেও ওটার কোনো দরকার ছিলো না, তাই না?' একপলকের জন্য ইউইচির দিকে তাকালো কিকুচি।

'উম, না, দরকার ছিলো না।' কাঁধ ঝাঁকালো ইউইচি।

ডেস্কে চলে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালো কিকুচি। যা বলার ছিলো তা বলা হয়ে গেছে।

ইউইচি ওকে যেতে দেখলো। কয়েক রকমের অনুভূতি কাজ করছে তার মনে। এরপরেই মনে হলো ওর দিকে কেউ তাকিয়ে আছে। পেছনে ঘুরতেই দেখলো রিও তাকিয়ে আছে ওর দিকে। ছেলেটার শীতল আর মাপা দৃষ্টি একটা শিহরন বইয়ে দিলো ইউইচির বুকে। কিছুক্ষণ পরেই রিও আবার তার বইয়ের দিকে ফিরে তাকালো। তার বইয়ের পাশে একটা হাতেবোনা ব্যাগ দেখা যাচ্ছে। ওটার গায়ে অ্যামব্রয়ডারি করে একটা ইনিশিয়াল লেখা আছে, আর তা হলো: 'RK'।

***

বিকেলের দিকে স্কুল শেষে বাড়ি ফিরছিলো ইউইচি, এমন সময় কেউ একজন এসে কাঁধ ধরলো তার। তাকাতেই দেখলো মুতা তাকিয়ে আছে ওর দিকে। ক্রোধ ঠিকরে বের হচ্ছে চোখ থেকে। ওর পেছনে আরো দুজন ছেলে রয়েছে, যাদের চোখেও একই দৃষ্টি।

'আরে বন্ধু যে।' মুতা এমনভাবে কথাটা বললো যে ইউইচির মনে হলো ওর হৃৎপিণ্ডটাকে কেউ চেপে ধরেছে বাইরে থেকে। ওকে একটা চিপা গলিতে নিয়ে গেল তারা। মুতা একদম মুখোমুখি দাঁড়ালো তার। অপর দিকে দুই হাত দুপাশ থেকে ধরলো তার বন্ধুরা। ইউইচির কলারটা ধরে মাটি থেকে কিছুটা উপরে তুলে ফেললো মুতা।

'তুই-ই বলেছিস তবে আমার কথা, শুয়োরের বাচ্চা!' বললো মুতা।

ইউইচি দ্রুতবেগে মাথা ঝাঁকিয়ে নাকচ করে দিলো। ভয়ে শক্ত হয়ে আছে তার মুখ।

'তুই-ই নালিশ করেছিস,' দাঁত কটমট করে ইউইচির আরো কাছে মুখটা এনে বললো মুতা। 'তুই ছাড়া আর কেউ করতে পারে না এই কাজ।'

ইউইচি তখনো মাথা ঝাঁকিয়ে যাচ্ছে। 'আমি কিছুই বলিনি! সত্যিই আমি...আ–আমি কিছুই বলিনি!'

'মিথ্যুক!' বাম পাশে থাকা ছেলেটা বলে উঠলো। 'এখানেই চুদবো তোকে আজ মাদারচোত!'

'সত্যিটা বল বলছি!' মুতা কলার ধরে ঝাঁকুনি দিলো আরেকবার।

ইউইচি টের পেল ওর পিঠ দেয়ালের সাথে লেগে গেছে। শীতল দেয়ালের স্পর্শ টের পাচ্ছে সে।

'এটাই সত্যি। মিথ্যা বলছি না, বিশ্বাস করো। আমি কিছুই বলিনি।'

'আসলেই?'

'একদম সত্যি!' দয়া ভিক্ষার স্বরে বললো ইউইচি।

এর কিছুক্ষণ পরেই মুতা ছেড়ে দিলো ওকে। পাশে থাকা ছেলেটা মুখ খারাপ করলো একবার।

গলায় হাত দিয়ে ঢোক গিললো ইউইচি। *আরেকটু হলেই তো গেছিলাম।*

পর মুহূর্তেই মুতার মুখে শয়তানি হাসি খেলে গেল। কোনো রকম আগাম সতর্কতার রাস্তা না রেখে একটা ঘুসি বসিয়ে দিলো ইউইচির মুখে। নিচে পড়ে গেল ইউইচি।

ও টের পাচ্ছে যে ঘুসি খাওয়ার পরে মুখের একপাশে ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে, সেই সাথে যেন অন্ধকারের গভীরে হারিয়ে যাচ্ছে সে।

'ওটা তুই-ই ছিলি!' চিৎকার করে উঠলো মুতা। ইউইচি টের পেল তার মুখে কিছু একটা ঢুকছে। যতক্ষণে বুঝলো, ততক্ষণে সে চিত হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়েছে।

ওর মুখে মুতা নিজের জুতো ঢুকিয়ে দিয়েছে।

মুখ কেটে গেছে তার। রক্তের স্বাদ টের পাচ্ছে মুখে। *কয়েন মুখে দিলে যেমন স্বাদ পাওয়া যায়, ঠিক তেমন*, পুরো শরীরে ব্যথা ছড়িয়ে যেতেই ভাবলো ইউইচি। দুহাতে মুখ ঢেকে বলের মতো গুটিয়ে গেল সে। ছেলেগুলো একের পর এক লাথি মেরে যাচ্ছে ওর পাঁজরে।

অধ্যায় তিন

মাথার উপরে থাকা ঘণ্টাটায় বিকট একটা শব্দ তুলে দরজাটা খুললো তোমোহিকো সোনোমুরা। যে ক্যাফেটাতে ওকে আসতে বলা হয়েছে সেটা খুবই ছোট একটা জায়গা। একটা ছোট বার, সাথে দুটো ছিমছাম গড়নের টেবিল, যাদের একটায় মাত্র দুজন বসা যাবে।

চারপাশে তাকালো সে, ছোট টেবিলটায় বসবে কি বসবে না এ নিয়ে কিছুটা দ্বিধার মধ্যে থেকেও বসে পড়লো। অন্য টেবিলটা অবশ্য দখল হয়েই আছে। সেখানে যে বসে আছে তার সাথে কখনো কথা না বললেও তোমোহিকো তাকে চেনে–মুরাশিতা নাম তার। ওর সাথেই মিডল স্কুলের তৃতীয় বর্ষে পড়ে। শুকনো কাঠির মতো লাগছে তাকে, চোয়ালটা দেখতে অনেকটা বিদেশিদের মতো। মেয়েদের কাছে যে ধরনের চোয়াল আকর্ষণীয় মনে হয় ঠিক তেমন। চুলগুলো বেশ বড় এবং ঢেউ খেলছে মাথার উপরে। ব্যান্ডের দলে যোগ দিলে বেশ মানিয়ে যাবে। ধূসর রঙের শার্টের উপর কালো লেদারের একটা কোট আর একটা টাইট জিন্স পরেছে সে যাতে তার লম্বা লম্বা, চিকন পাদুটো স্পষ্ট দেখা যায়।

মুরাশিতা *শোনেন জাম্প* নামের একটা মাঙ্গা পড়ছে। তোমোহিকোকে ক্যাফেতে ঢুকতে দেখে একপলক তাকিয়ে আবার মাঙ্গায় চোখ ফিরিয়ে নিলো সে। কারো জন্য যে অপেক্ষা করছে তা দেখেই বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু সেটা যে তোমোহিকোর জন্য না এটা স্পষ্ট। টেবিলের উপরে একটা কফির কাপ আর অ্যাশট্রে দেখা যাচ্ছে। অ্যাশট্রে থেকে ধোঁয়া উঠছিলো তখনো। ওকে দেখে মনে হচ্ছে না গাইডেন্স কাউন্সিলর যে তাকে এখানেও খুঁজে পেতে পারে তা নিয়ে সে চিন্তিত। স্কুলের পাশের স্টেশন থেকে মাত্র দুটো স্টেশন বাদেই এই ক্যাফেটা।

কোনো ওয়েটার নেই অবশ্য এখানে, শুধু একটা কালো লোক এসে যে টেবিলে তোমোহিকো বসেছে সেখানে এক গ্লাস পানি রেখে গেল। লোকটা একবার হাসলো শুধু, কিন্তু কিছুই বললো না। তোমোহিকো মেনুর দিকে না তাকিয়েই একটা কফি অর্ডার দিলো। অর্ডার নিয়ে চলে গেল লোকটা।

গ্লাসে একটা চুমুক দিয়ে ফের মুরাশিতার দিকে তাকালো তোমোহিকো। ছেলেটা তখনো মাঙ্গা পড়ছে। যখন কাউন্টারে থাকা রেডিওতে অলিভিয়া নিউটন-জনের গান বদলে *গ্যালাক্সি এক্সপ্রেস* ৯৯৯ মুভিটার থিম সং চালু করে দিলো, তখন ভ্রুকুটি করলো সে। বোঝা গেল মুরাশিতা লোকাল মিউজিক থেকে ওয়েস্টার্ন মিউজিক বেশি পছন্দ করে।

তোমোহিকোর কাছে কেন যেন মনে হলো ও যার জন্য অপেক্ষা করছে, ঠিক একই ব্যক্তির জন্যে মুরাশিতাও অপেক্ষা করছে।

ক্যাফেটার দিকে ভালো করে তাকালো তোমোহিকো। এরকম জায়গাগুলোতে সাধারণত এককোনায় দুয়েকটা *স্পেস ইনভেডারস* গেম খেলার মতো জায়গা রাখা হয়, কিন্তু এখানে তেমন কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তাতে অবশ্য কিছু যায় আসে না। কারণ এমনিতেও *স্পেস ইনভেডারস* খেলতে খেলতে এখন ওর কাছে অসহ্য লাগে। গেমটার মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে কখন গুলি ছুঁড়তে হবে আর তা দিয়ে কীভাবে বড় একটা স্কোর করতে হবে, আর এই ব্যাপারটা যেন তোমোহিকোর আঙুলগুলো মুখস্থ করে নিয়েছে। যেকোনো আর্কেড গেমে সে লিস্টে সবার উপরের দিকে থাকবে বলেই ওর বিশ্বাস। *স্পেস ইনভেডারস*-এর থেকে জানার আর কিছুই বাকি নেই ওর—শুধু গেমটার কোড ছাড়া। ওটারও প্রায় অনেক কিছুই জানা হয়ে গেছে অবশ্য।

একঘেয়েমি কাটানোর জন্য মেনুটা হাতে তুলে নিলো তোমোহিকো। বুঝতে পারলো বিশেষ ধরনের কফি শপ এটা। এমন সব ব্র্যান্ডের কফির নাম দেখলো যেগুলো এর আগে ও শুনেছে কি না সন্দেহ। নিজেকে কিছুটা ভাগ্যবান মনে হচ্ছে এখন—ভাগ্যিস, অর্ডার দেওয়ার আগে মেনুটাতে চোখ বোলায়নি! নয়তো সে কেবল সাধারণ কফি অর্ডার করতো না। উলটো কলম্বিয়ান নয়তো মোচা কফি অর্ডার দিয়ে বসতো যাতে আরো পঞ্চাশ থেকে একশো ইয়েন খোয়া যেত। এই বাজারে এইটুকু অতিরিক্ত ব্যয়েই খবর হয়ে যায়।

ঐ জ্যাকেটের বিষয়টাতে চরম একটা ভুল হয়েছিলো, বলা যায় সবথেকে বাজে ভুল ওটাই ছিলো, ভাবলো তোমোহিকো। সে আর তার এক বন্ধু মিলে একটা বুটিক শপে গেছিলো চুরি করার উদ্দেশ্যে, আর তার ফলেই লোকটার কাছে ধরা খেয়েছিলো। ওর কৌশলটা সহজ ছিলো: কয়েকটা জিন্সের প্যান্ট ট্রায়াল দেওয়ার জন্য ট্রায়াল রুমে যাবে, এরপর জ্যাকেটটা তার নিয়ে আসা ব্যাগের মধ্যে ভরে চলে আসবে। কিন্তু যখন জিন্সগুলো পুনরায় শেলফে রাখার পরে বের হতে নেয়, তখনই পেছন থেকে ডাক দিয়ে ওঠে লোকটা। তার মনে পড়ে হৃৎপিণ্ড সাময়িক বন্ধ হয়ে গেছিলো সে সময়ে।

সৌভাগ্যবশত, লোকটা পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া থেকে বরং মাল বিক্রি করার দিকেই বেশি আগ্রহী ছিলো। লোকটা তোমোহিকোর সাথে এমন আচরণ করছিলো যেন সে এমন এক কাস্টমার যার 'ব্যাগের মধ্যে ভুলে দোকানের জিনিস ঢুকে গেছে'। কোনো পুলিশ তো না-ই, এমনকি তার বাবা-মা কিংবা স্কুলের কেউও এই বিষয়ে জানতে পারেনি।

অবশ্য, ওকে এটার জন্য ২৩ হাজার ইয়েন দিতে হয়েছে। অবশ্যই এত টাকা ওর কাছে থাকার কথা না, তাই সেই কর্মী তার স্টুডেন্ট আইডি কার্ড রেখে দিয়ে বাড়ি থেকে টাকা আনতে বলে। তোমোহিকো ওখান থেকে দ্রুত বাড়িতে গিয়ে তার কাছে থাকা সব টাকা গুছিয়ে পনেরো হাজারের মতো জোগাড় করে বাকিটা এক বন্ধুর থেকে ধার করে দিয়ে আসে জ্যাকেটটার জন্য।

যদিও পুরো ঘটনাটার শেষে ও একটা নতুন ট্রেন্ডি জ্যাকেট নিয়ে ফিরে আসতে পেরেছে। ফলে এটাকে ক্ষতি বলে মনে হয়নি তার কাছে। যদিও জ্যাকেটের জন্য এক কানা কড়িও খরচ করার ইচ্ছা ছিলো না ওর। ভেবেছিলো ওর দিকে যখন কেউ তাকিয়ে থাকবে না, তখন জ্যাকেটটা ব্যাগে ভরে নিয়ে আসবে। কিন্তু সেই কাজে সফল না হওয়ায় তাকে ২৩ হাজার ইয়েন খোয়াতে হয়েছে। অবশ্য, এ নিয়ে পরে তার বেশ মন খারাপ হয়েছিলো। ঐ টাকা ওর কাছে থাকলে প্রচুর শপিং করতে পারতো সে। মুভি দেখতে পারতো। আর এখন তার ব্যক্তিগত জমানো টাকার কিছুই নেই। আর তার থেকেও বাজে ব্যাপারটা হলো, বন্ধু ওর কাছে এখনো আট হাজার ইয়েন পায়।

ভাবতে ভাবতে সেই লোকটার দিয়ে যাওয়া দুইশো ইয়েন মূল্যের কফির কাপে একটা চুমুক দিলো তোমোহিকো। স্বাদটা চমৎকার।

সময়টা ফাও ফাও নষ্ট না হলেই হলো, ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ভাবলো সে। ও এখানে এসেছে একটা 'চাকরি'-র কথা শুনে। রিও কিরিহারা এভাবেই বলেছিলো কথাটা।

ঠিক কাঁটায় কাঁটায় পাঁচটার সময় রিওকে দেখা গেল।

ভেতরে ঢুকে প্রথমেই তোমোহিকোর দিকে চোখ পড়লো রিওর। এরপর মুরাশিতার দিকে তাকিয়ে বললো, 'তোমরা দুজন একসাথে বসোনি কেন?'

মুরাশিতা তার হাতে থাকা মাঙ্গাটা বন্ধ করে মাথা চুলকালো। 'আমিও ভেবেছিলাম এ বুঝি তোমার সাথেই দেখা করতে এসেছে। কিন্তু ভাবলাম বোকার মতো কিছু না করে মাঙ্গা পড়াটাই ভালো হবে। তাই কিছু আর বলিনি।'

'আমিও এজন্যই কিছু বলিনি,' বললো তোমোহিকো।

'আমার হয়তো তোমাদেরকে জানিয়ে দেওয়া উচিত ছিলো ব্যাপারটা,' মুরাশিতার পাশে বসতে বসতে বললো রিও। কাউন্টারের দিকে তাকিয়ে একটু চেঁচিয়ে বললো, 'আমাকে একটা ব্রাজিলিয়ান কফি দেবেন।' কাউন্টারে থাকা বৃদ্ধ লোকটা মাথা নাড়লো একবার। বোঝা গেল রিওর এখানে প্রায়ই আসা-যাওয়া করা হয়। তোমোহিকো তার কফিটা নিয়ে মুরাশিতার টেবিলের দিকে আসতে নিলে রিও তাকে মুরাশিতার পাশে বসতে নির্দেশ দিলো। দুজনকেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছে সে। সেই সাথে তর্জনী দিয়ে টোকা দিচ্ছে টেবিলে। তোমোহিকো অবশ্য তার এমন দৃষ্টিকে আমলে নিচ্ছে না; কারণ ও নিজেও দুজনকে মেপে নিচ্ছে।

'কোনো রসুন-টসুন খেয়েছ নাকি এরমধ্যে?' জিজ্ঞেস করলো রিও।

'রসুন?' তোমোহিকোর ভ্রু কুঁচকে এলো। 'না তো! কেন?'

'এই মুহূর্তে ব্যাখ্যা দেওয়াটা কঠিন। যেহেতু খাওনি, সেহেতু তোমার কোনো সমস্যা হবে না। তোমার কী অবস্থা, মুরাশিতা?'

'চার দিন আগে কিছু পুডিং খেয়েছিলাম।'

'এদিকে এসো একটু।'

রিওর দিকে মুখ তুলে টেবিলের উপর দিয়ে একটু ঝুঁকলো মুরাশিতা।

'দেখি, শ্বাস ছাড়ো এবার,' বললো রিও।

একটু কাশলো মুরাশিতা।

'আরো জোরে,' বলে উঠলো রিও। মুরাশিতা এবার জোরে কাশতেই রিও ভালো করে শুঁকলো। মাথাটা একবার দুলিয়ে মেন্থলের চুইংগাম বের করলো পকেট থেকে।

'যাওয়ার সময় এগুলো খেতে হবে তোমাদের।'

'সে নাহয় খাওয়া যাবে,' একটু বিরক্তি নিয়েই বলে উঠলো মুরাশিতা। 'কিন্তু আমরা যাচ্ছিটা কোথায়? বলে ফেলো, এরকম রহস্য করাটা আমার পছন্দ না।'

তোমোহিকোও কিছুটা স্বস্তি অনুভব করলো প্রশ্নটা করায়। আসলে সত্যি বলতে, ওর কাছেও এরকম অন্ধকারে থাকতে ভালো লাগছিলো না।

'তোমাদের তো আগেই বলেছি এ ব্যাপারে। তোমরা শুধু একটা জায়গায় যাবে, কিছু মেয়ের সাথে কথা বলবে। ব্যস, এটুকুই কাজ।'

'বুঝতে পারছি না বিষয়টা। আমি ভাবলাম–' রিওর কফি চলে আসায় মাঝপথে থামতে হলো মুরাশিতাকে।

রিও কাপটা হাতে নিয়ে একটা লম্বা ঘ্রাণ নিলো কফিটার। এরপর আলতো চুমুক দিয়ে বললো, 'চমৎকার! সব সময়ের মতোই।' বৃদ্ধ লোকটা একটু হেসে আবার কাউন্টারের পেছনে চলে গেল। ওদের দিকে ফিরে তাকালো রিও। 'দেখো, এটা রকেট সায়েন্স না। তোমরা দুজন ভালো করবে বলেই তোমাদের ডেকেছি আমি।'

'ভালো করবো, কিন্তু কীসে?' মুরাশিতা জিজ্ঞেস করে বসলো।

রিও তার বুক পকেট থেকে একটা লাল রঙের সিগারেটের প্যাকেট বের করে সেখান থেকে একটা মুখে পুরলো। জিপ্পো লাইটার দিয়ে আগুন ধরালো সেটায়। 'আমার কথাটার অর্থ হলো, ওরা তোমাদের পছন্দ করবে।' একটা চিকন হাসি খেলে গেল তার মুখে।

'ওরা বলতে...মেয়েগুলোর কথা বলছো?' মুরাশিতা ধীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো।

'হ্যাঁ, মেয়েগুলোর কথাই বলছি। চিন্তা করার কিছুই নেই। ওরা কুৎসিতও না আবার সস্তাও না। একদম স্বাভাবিক মেয়ে। কিছুটা বয়স্ক হতে পারে, তবে ওটাও ভালো একটা দিক।'

'আর আমাদের কাজ হচ্ছে ওদের সাথে কথা বলা?' তোমোহিকো মুখ খুললো।

ওর চেহারার উপরে ধোঁয়া ছাড়লো রিও। 'একদম। বলে রাখি, ওরা কিন্তু তিনজন।'

'তুমি কি আরেকটু স্পষ্ট করে বলবে? মানে মেয়েগুলো কারা বা কোথায় বসে ওদের সাথে কথা বলবো, আর কী বিষয়েই বা কথা বলবো?' জিজ্ঞেস করলো তোমোহিকো। ওর গলার স্বর কিছুটা জোরে শোনালো এবার।

'গেলেই বুঝতে পারবে। আর ওদের সাথে কী নিয়ে কথা বলবে সে ব্যাপারে বলতে গেলে বলবো–যা মনে আসে তাই বলবে। তোমাদের শখের ব্যাপারে বললেও ওরা আগ্রহ নিয়ে শুনবে,' মুখে হাসি রেখেই জবাব দিলো রিও।

মাথা ঝাঁকালো তোমোহিকো। ব্যাখ্যাটা শোনার পর মনে হচ্ছে আগে কাজের ব্যাপারে যাও বুঝেছিলো, এখন তার চেয়েও কম বুঝছে।

'আমি করবো না,' হঠাৎ বলে উঠলো মুরাশিতা।

'আচ্ছা?' বললো রিও। ততটা অবাক করেনি তাকে উত্তরটা।

'ভালো লাগেনি আমার কাছে বিষয়টা। কেন যেন ঠিক মনে হচ্ছে না,' দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললো মুরাশিতা।

'আমি প্রতি ঘণ্টার জন্য তিন হাজার তিনশো ইয়েন দেবো,' হাতে থাকা কফি কাপটা উঠিয়ে বললো রিও। 'একদম বরাবর হিসাব করলে তিন হাজার তিনশো তেত্রিশ। অর্থাৎ, তিন ঘণ্টায় দশ হাজার ইয়েন কামাবে। আমার মনে হয় না এর থেকে ভালো কোনো অফার তোমার কাছে আছে।'

'আচ্ছা, এখন বুঝতে পারছি এটা অবৈধ কিছু,' বললো মুরাশিতা। 'দেখো, আমি এসব থেকে দূরে থাকতে চাই।'

'অবৈধ বলে কিছুই নেই এখানে। আর যতক্ষণ পর্যন্ত বিষয়টা গোপন রাখবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো রকমের সমস্যা হবে না। এটা পাকা কথা। এছাড়াও আরেকটা বিষয়ে বলে রাখি, কাজটা শেষ করার পরে আমাকে ধন্যবাদই দেবে তোমরা। যে জায়গাতেই খোঁজো না কেন, এরকম কাজের অফার কোথাও পাবে না। যে-কেউ এটা করতে রাজি হবে, কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এই কাজ সবাই পারবে না। এক্ষেত্রে বলতেই হয় তোমরা ভাগ্যবান। কারণ আমি তোমাদের বেছে নিয়েছি।'

'বুঝতে পারছি না...' মুরাশিতার মুখে দ্বিধার ছাপ স্পষ্ট।

তিন হাজার ইয়েনের উপরে...তাও প্রতি ঘণ্টায়। তোমোহিকোর জন্যে এরকম সুযোগ হাতছাড়া করার মতো না। 'আমি রাজি,' বললো সে। 'কিন্তু একটা শর্ত আছে।'

'কী সেটা?'

'তুমি আমাকে আগে এটা বলবে যে আমরা কাদের সাথে কথা বলবো আর কোথায় দেখা করবো। যাতে আমি মানসিকভাবে তৈরি হতে পারি।'

'সেরকম কিছুরই প্রয়োজন নেই এক্ষেত্রে,' অ্যাশট্রে থেকে সিগারেটটা উঠাতে উঠাতে বললো রিও। 'কিন্তু তারপরেও আমি তোমাকে বলবো, তবে এখান থেকে

বের হওয়ার পরে। তবে আমি তোমাকে একা নিচ্ছি না, তোমোহিকো। যদি মুরাশিতা কাজটা না করে, তবে পুরো বিষয়টা এখানেই শেষ করে দেবো আমি।'

তোমোহিকো একবার তাকালো মুরাশিতার দিকে। যে কিনা একটু ভেংচি কেটে বললো, 'তুমি নিশ্চিত আমাদের কোনো রকম সমস্যা হবে না?'

'যদি তোমরা না চাও, তবে হবে না,' বললো রিও।

হয়তো তোমোহিকোর চেহারায় বিরক্তির ভাবটা দেখেই রাজি হয়ে গেল মুরাশিতা। মাথা দুলিয়ে বললো, 'আচ্ছা, আমি করছি তবে।'

'স্মার্ট বয়।' রিও দাঁড়িয়ে গেল। এক হাত ঢুকিয়ে দিলো ওয়ালেট বের করার উদ্দেশ্যে। 'বিল কত হয়েছে বলবেন?'

লোকটা একটা চোখ তুলে টেবিলের দিকে ইঙ্গিত করলো। তারপর আঙুল দিয়ে গোল করে একটা বৃত্ত আঁকলো ওখানে।

'হ্যাঁ, সবারটা সহই কত হয়েছে?' লোকটা একটা কাগজ এনে রিওর দিকে বাড়িয়ে দিলো।

তোমোহিকো দেখলো রিও হাজার ইয়েনের একটা নোট বের করে দিলো লোকটার দিকে। একটু মন খারাপ হলো তার; স্যান্ডউইচটা যে কেন অর্ডার দিলো না!

তোমোহিকো যে হাই স্কুলে পড়ে, ওখানকার শিক্ষার্থীরা কোনো ইউনিফর্ম পরে না। এজন্য কৃতজ্ঞতা জানাতে হয় তার পূর্বের ছাত্রছাত্রীদের। কারণ তাদের আন্দোলনের কারণেই এটা সম্ভব হয়েছে। ওরা ইউনিফর্ম কোডের বিপরীতে একটা প্রদর্শনী করেছিলো। আশ্চর্যজনকভাবে ওরা জিতেও গেছিলো সেটায়।

এরপরে স্কুল থেকে একটা নির্দিষ্ট ইউনিফর্ম নির্ধারণ করা হলেও সেটা আবশ্যক ছিলো না। তাছাড়া, স্কুলের গড়ে পাঁচজন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে মাত্র একজন ইউনিফর্ম আবশ্যক না হওয়ার ব্যাপারটা মেনে নিতে পারেনি। এর এক বছর পর সবাই-ই যার যেটা পছন্দ সেটাই পরা শুরু করলো। পার্ম ড্রেস[১১] পরাও নিষিদ্ধ ছিলো, কিন্তু এরপর খুব কম মানুষই সেটার কদর করতো। মেকআপও নিষিদ্ধ ছিলো, কিন্তু ঐ ঘটনার পর মেয়েগুলো এমনভাবে মেকআপ করে আসা শুরু করলো যে মনে হচ্ছিলো কোনো ফ্যাশন ম্যাগাজিন থেকে সরাসরি উঠে এসেছে স্কুলে। যখন ওরা তাদের সিটে বসতো, একটা চমৎকার পারফিউমের ঘ্রাণ ছড়িয়ে যেত আশেপাশে। ক্লাসে কোনো সমস্যা না হওয়া পর্যন্ত শিক্ষকরাও এসব দেখেও না দেখার ভান করে গেল।

ইউনিফর্ম না থাকার কারণে শিক্ষার্থীরা শহরে ঢোকার ক্ষেত্রেও বেশ সুবিধা পাচ্ছে। যদি কোনো শপ এসিস্ট্যান্ট সমস্যা করে, তবে তারা নিজেদের কলেজ পড়ুয়া দাবি করে সহজেই ছাড়া পেয়ে যায়। যার কারণে আজ এই শুক্রবারের দিনেও খুব কমসংখ্যক শিক্ষার্থীই স্কুল ছুটির পরে সোজা বাড়িতে গেছে।

তোমোহিকোরও শহরে যাওয়ার কথা ছিলো, কিন্তু সেই জ্যাকেট চুরির কাহিনির কারণে ও এখন দেউলিয়া। আর সেজন্যই রিও তাকে ফাঁকা ক্লাস রুমের ভেতর প্লেবয় মাঙ্গা পড়ার সময় খুঁজে পায়। কেউ আসছে বুঝতে পেরে মুখ তুলে তাকিয়েছিলো তোমোহিকো।

ও আর রিও একই ক্লাসে পড়াশোনা করলেও খুবই কম কথা হয়েছে তাদের মধ্যে। তোমোহিকো একাকী ছিলো না কখনোই, বলতে গেলে ক্লাসের অর্ধেক শিক্ষার্থীর সাথেই তার ভাব আছে। রিওর ক্ষেত্রে অবশ্য বলতে হয় যে ও নিজেই একটা দেয়াল তুলে দিয়েছিলো তার আর পুরো ক্লাসের সবার মাঝে।

'ফ্রি আছো আজ?' রিওই বললো প্রথমে।

'হ্যাঁ, কেন?' আর সে সময়ই রিও তাকে কী করতে হবে সেটা বললো। তার কাজ সম্পর্কে ধীরে সুস্থে বুঝিয়ে দিলো সে।

'তোমাকে কেবল একটু কথা বলতে হবে, এই-ই যা। বিনিময়ে দশ হাজার ইয়েন পাবে।'

'কী! শুধু কথা বলার জন্যই এত?'

রিও একটা কাগজ বের করে ওর হাতে দিয়ে বললো, 'যদি ইচ্ছা হয়, তবে এই জায়গায় চলে এসো। পাঁচটার সময়।'

***

'মেয়েগুলো এতক্ষণে চলে এসেছে,' বললো রিও।

এই মুহূর্তে ক্যাফে থেকে বেরিয়ে ওরা সাবওয়ে স্টেশনের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ট্রেনের বেশিরভাগ কামরাই খালি পড়ে আছে। চাইলেই যেকোনো সিটে বসে যাওয়া যাবে। কিন্তু রিও দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইলো। সম্ভবত কেউ যেন তার কথা শুনতে না পায় সেজন্য দাঁড়িয়ে আছে অমন করে।

'তো এরা কারা?' জিজ্ঞেস করলো তোমোহিকো।

'ধরে নাও তাদের নাম...র‍্যান, সু আর মিকি,' মুখ টিপে হাসতে হাসতে বললো রিও।

'আরে ধুরো! আমাদেরকে কথা দিয়েছিলে যে কাজের সময় এগুলো বলবে তুমি।'

'আমি নাম বলবো তা তো বলিনি। আর তাছাড়া, নাম না জানাটাই তোমাদের জন্য ভালো হবে। ওদেরকেও আমি তোমাদের ব্যাপারে কিছু বলিনি, এমনকি আমরা কোন স্কুলে পড়ি তাও না। তাই ওরকম ভেবে নিয়েই কাজ করতে হবে।'

হঠাৎ রিওর চোখে একধরনের কঠিন দ্যুতি দেখে কিছুটা ঘাবড়ে গেল তোমোহিকো।

'কিন্তু ওরা জিজ্ঞেস করলে আমরা কী করবো?' জানতে চাইলো মুরাশিতা।

'আমার মনে হয় না ওরা এটা করবে। আর যদি করেও বসে, সোজা বলে দেবে যে এটা সিক্রেট। অবশ্য, চাইলে নকল নাম ব্যবহার করতে পারো।'

'কেমন ধরনের মেয়ে এরা?' কথা ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করলো তোমোহিকো।

অপ্রত্যাশিতভাবে একটু বাঁকা হাসি হেসে রিও বললো, 'গৃহিণী।'

'কীহ!'

'*বিষণ্ন* গৃহিণী। কোনো কাজ নেই, কোনো শখ নেই, কারো সাথে কথা বলার মতো রাস্তাও নেই। তাই বিষণ্ন হয়ে পড়ে তারা। আর ওদের স্বামীরাও তাদের সাথে কথা বলে না। যার কারণে ওরা তরুণদের সাথে কথা বলতে চায়। কোনো সমস্যা নেই তাতে, নাকি?'

তোমোহিকোর একটা অশ্লীল ছবির কথা মনে পড়লো, যার শিরোনাম ছিলো: *ঘরকুনো গৃহিণীর দল*। যদিও মুভিটা দেখেনি সে।

'আর ওরা এর জন্য দশ হাজার ইয়েন দিচ্ছে, প্রত্যেকে...তাও শুধু কথা বলার জন্য? বুঝে আসছে না আমার–'

'বেশি ভেবো না। ওরা টাকা দিচ্ছে, এটাই মনে রাখো,' রিও থামিয়ে দিয়ে বললো।

'তো মুরাশিতা আর আমাকেই কেন বললে এসব?'

'কারণ তোমাদের দেখার মতো চেহারা আছে। আছে তো, নাকি?' রিওর স্পষ্ট কথা বলার ধরন দেখে তোমোহিকোও চুপ মেরে রইলো। অবশ্য, তোমোহিকো নিজেও জানতো ওর চেহারা সিনেমার নায়কের মতোই। যার কারণে আজকে দেনা থাকা সত্ত্বেও খুব সুন্দর করে সেজে এসেছে সে।

'আর এজন্যই সে সময় বলেছিলাম সবার দ্বারা এই কাজ হবে না,' বললো রিও। নিজের কথাটার মাঝে লুকিয়ে থাকা সত্যকে নিশ্চিত করতেই হয়তো মাথাটা নাড়লো সে।

'ওরা কি বয়স্ক না?' জিজ্ঞেস করলো মুরাশিতা।

হাসলো রিও। 'ততটাও না। সম্ভবত ত্রিশ বা চল্লিশের মতো হবে।'

'এটাও তো কম না, ভাই! আচ্ছা, ওদের সাথে কী নিয়েই বা কথা বলবো আমরা?' তোমোহিকো কিছুটা দ্বিধা নিয়ে জিজ্ঞেস করলো।

'সে বিষয়ে এত ভেবো না। শুধু খেয়াল রেখো যাতে কথোপকথন বাজে দিকে মোড় না নেয়, তাহলেই হবে। ওহ, আরেকটা কথা, ট্রেন থেকে নামার সময় চুল আঁচড়ে নিও। পারলে একটু স্প্রেও করে নিও। ভালো হবে।'

'আমার কাছে সেরকম কিছুই নেই,' বললো তোমোহিকো।

রিও তার ব্যাগটা খুলে একটা স্প্রে আর চিরুনি বের করলো। ড্রায়ারও দেখা গেল তার ব্যাগের মধ্যে। 'ভাবলাম যাচ্ছিই যখন, নিজেদের সর্বোচ্চটা নিয়েই যাই। তোমাদেরকে একদম খাসা পুরুষে পরিণত করে দিই, কী বলো?'

নানবা স্টেশনে মিডোসুজি লাইন থেকে সেনিচিমে লাইনে চলে গেল ওরা। নিশিনাগাহোরি স্টেশনের দিকে রওয়ানা দিয়েছে এখন। জায়গাগুলো তোমোহিকোর পরিচিত। এই জায়গাটাতেই কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিটা রয়েছে। গ্রীষ্মকালে কলেজ এডমিশনের জন্য ছেলেপেলে এখানে লম্বা লাইন ধরে দাঁড়িয়ে থাকে পড়ার জন্য।

***

কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিটা মাত্রই পেরিয়ে গেল ওরা। তারপর আরো কয়েক মিনিট হাঁটার পর একটা ছোট চারতলা বাড়ির সামনে এসে থামলো রিও। 'চলে এসেছি।'

তোমোহিকো উপরের দিকে তাকিয়ে একবার ঢোক গিললো।

'ওরকম চেহারা করে আছো কেন? স্বাভাবিক হও,' মুখ টিপে বললো রিও।

ওর কথা শুনে হাতের আঙুল দিয়ে গালটা একটু ডলে নিলো তোমোহিকো। কোনো লিফট নেই বাড়িটায়। সিঁড়ি দিয়ে তিন তলায় উঠলো ওরা। ৩০৪ নাম্বার রুমটায় কড়া নাড়লো রিও।

'কে?' ইন্টারকম থেকে একটা মহিলার শব্দ ভেসে এলো।

'আমি,' বলে উঠলো রিও। এরপর বেশ দ্রুতই খুলে গেল দরজাটা। নব ধরে দাঁড়িয়ে আছে একটা মহিলা। পরনে স্কার্ট আর কালো রঙের শার্ট। স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি বোতাম খোলা শার্টটার। মহিলা খাটো গড়নের, মুখটাও বেশ ছোট, সাথে চুলও।

'হাই।' হাসলো রিও।

'হ্যালো,' জবাবে বললো মহিলাটা। তার চোখদুটো বেশ কালো। চোখেমুখে প্রসাধনীর ছাপ স্পষ্ট। কানে লাল রঙের দুটো দুল ঝুলছে। পোশাকগুলো অল্পবয়সিদের মতো হলেও তাকে বিশ বছরের যুবতী ভাবার মতো ভুল কেউই করবে না। চোখের নিচে ভাঁজ দেখা যাচ্ছে ওর।

'তোমার বন্ধু এরা?' রিওকে জিজ্ঞেস করলো সে।

'আমি আপনাকে বলেছিলাম কিন্তু যে বেশ পাকাপোক্ত এরা।'

মহিলাটা হাসলো এ কথায়। দরজাটা পুরোপুরি খুলে দিয়ে ওদেরকে ভেতরে ঢোকার জন্য বললো সে। রিওকে অনুসরণ করে তোমোহিকো ভেতরে ঢুকলো। ঢোকার সাথে সাথে বসার ঘর আর রান্নাঘর একসাথে চোখে পড়লো। একটা টেবিলের সামনে কিছু চেয়ার দেখা গেলেও এছাড়া আর কিছুই তেমন চোখে পড়ার মতো নেই ঘরে। শুধু দেয়ালের সাথে লাগানো কয়েকটা শেলফ দেখা গেল। একটা ছোট্ট রেফ্রিজারেটর আর ওভেন দেখা গেল তার উপর। এটা পরিষ্কার যে এখানে আসলে কেউ থাকে না। এই কাজের জন্যই এখানে এসব রাখা হয়েছে।

ছোট চুলের একটা মহিলা পেছন থেকে রুমের দরজাটা খুলে দিলো। বড় একটা রুমকে দুভাগ করে মাঝখানে স্লাইডিং দরজা দিয়ে দুটো রুম করা হয়েছে। রুমের এককোনায় ইস্পাতের ছোট একটা খাট দেখা যাচ্ছে।

রুমের মাঝখানে একটা টেলিভিশন রয়েছে, আর তার সামনে বসে আছে দুজন মহিলা। একজনের মাথায় দেখা যাচ্ছে বেণি করা বাদামি রঙের চুল। মহিলাটা ছিমছাম গড়নের। কিন্তু তোমোহিকোর চোখ গিয়ে পড়লো তার স্তনের নিচে ফুলে ওঠা জায়গাটায়।

অন্যজন ছোট একটা স্কার্টের সাথে জিন্স পরেছে। গোলগাল চেহারার সাথে কাঁধ পর্যন্ত ছাঁটা চুল। ঐ চুলে বেশ সুন্দর একটা ঢেউ খেলা করছে। ওকেই এই তিনজনের ভেতর সবচেয়ে সাধারণ লাগছে। অবশ্য, বাকি দুজনকে সেরকম না লাগার কারণ হয়তো তারা অতিরিক্ত মেকআপ করেছে তাই।

'আমরা আরো ভাবছিলাম তুমি আসতে পারবে কি না এ জনমে,' রিওকে একটা খোঁচা দিয়ে বললো সেই বিনুনি-করা মহিলাটা। যদিও গলার স্বরে রাগ প্রকাশ পাচ্ছে না।

'দুঃখিত, সবাইকে তৈরি করতে গিয়ে একটু দেরি হয়ে গেল,' হেসে বললো রিও।

'মানে যে বয়স্ক মহিলাদের সাথে দেখা হবে ওদের, তাদের ব্যাপারেই বানিয়ে বানিয়ে বলতে এত সময় লাগলো?'

'আরে না, না!' রুমের ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বললো রিও। মেঝেতে হাঁটু মুড়ে বসে তোমোহিকো আর মুরাশিতার দিকে তাকিয়ে ওদেরকেও বসতে ইশারা করলো সে।

রিওর পাশে গিয়ে বসলো তারা। বসার সাথে সাথেই বিদ্যুদ্গতিতে রিও উঠে পড়লো, আর তার জায়গাটা দখল করে নিলো সেই ছোট চুলওয়ালা মহিলাটা।

'বিয়ার চলবে?' মহিলাটাকে জিজ্ঞেস করলো রিও। তিনজন মহিলাই মাথা নাড়লো। এমন সময়ে বিয়ার যথেষ্ট ভালো হবে।

'সবার জন্যই তবে বিয়ার আনছি।' বলেই বেরিয়ে গেল রিও। মুরাশিতা আর তোমোহিকোকে কোনো প্রকার জবাব দেওয়ারই রাস্তা রাখলো না সে। রান্নাঘর থেকে তার বিয়ার আনার শব্দ শোনা যাচ্ছিলো স্পষ্ট।

'প্রায়ই মদ-টদ খাও নাকি তোমরা?' বিনুনি-করা মহিলাটা জিজ্ঞেস করলো।

'মাঝে মাঝে।'

'দেখে তো মনে হচ্ছে মদের বোতলে ডুবে থাকো একদম,' বলে উঠলো সে।

'তেমনটাও না।' একটা শুষ্ক হাসি দিলো তোমোহিকো। ও লক্ষ করলো মহিলাগুলো নিজেদের মধ্যে দৃষ্টিবিনিময় করছে। কী বিষয়ে করছে তা নিশ্চিত না হলেও রিওর ছেলে বাছাইকরণে যে তারা সন্তুষ্ট তা বোঝা যাচ্ছে। মনে মনে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লো সে।

কিছুটা অন্ধকার হয়ে আছে রুমটা। তোমোহিকো জানালার দিকে তাকিয়ে দেখলো বাইরে থেকে ওটার পর্দা নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঘরের ভেতর একমাত্র

আলোর উৎস হলো মাথার উপরে থাকা সিলিংয়ের ছোট্ট একটা লাইট। ওর কাছে মনে হচ্ছে এটা হয়তো মহিলাগুলোর বয়স লুকানোর জন্য করা হয়েছে। কিন্তু এই অল্প আলোর মধ্যেও সে স্পষ্ট বুঝতে পারছে যে তার ক্লাসে থাকা মেয়েদের চামড়া এই মহিলাদের চামড়া থেকে অনেকটাই আলাদা। কাছাকাছির থেকেও অনেক বেশি আলাদা।

তিনটা বড় বোতল, পাঁচটা গ্লাস আর একটা ট্রে-তে করে কিছু বাদাম আর স্ন্যাকস নিয়ে ঢুকলো রিও। রুমের মাঝখানে সেগুলোকে রেখে আবার রান্নাঘরের দিকে চলে গেল সে। একটা বড় পিৎজা নিয়ে ফিরলো।

'তোমাদের দুজনেরও তো ক্ষুধা লেগেছে, তাই না?' তোমোহিকোর দিকে তাকিয়ে বললো সে।

মহিলাগুলো নিজেদের এবং তাদের গ্লাসে বিয়ার ঢেলে দিলো। এরপর গ্লাসে গ্লাস লাগিয়ে একটা শব্দ করলো, যা অপ্রয়োজনীয় ঠেকলো তোমোহিকোর কাছে।

ওদিকে রান্নাঘরে রিও তার ডাফেল ব্যাগটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। ওকে দেখে মনে হচ্ছে না সে এদের সাথে যোগ দেবে।

'তোমার কি গার্লফ্রেন্ড আছে?' বিনুনি-করা মহিলাটা জিজ্ঞেস করলো তোমোহিকোকে।

'আপাতত না।'

'সত্যি? কেন নেই?'

'কারণ...ঠিক জানা নেই। আমার কখনো হয়নি, তাই কারণও জানি না।'

'কিন্তু আমি তো জানি ঐ স্কুলে অনেক কিউট কিউট মেয়ে আছে।'

'হয়তো,' বললো তোমোহিকো।

'আমি জানি এর কারণ কী। তুমি অনেক খুঁতখুঁতে। বাজি ধরে বলতে পারি যে চাইলেই যেকোনো মেয়েকেই গার্লফ্রেন্ড বানাতে পারো তুমি। তোমার শুধু ওদেরকে ডেটে যাওয়ার জন্য প্রস্তাব দিতে হবে।'

'বরং উলটো। ওদের কাউকেই আমার অতটা সুবিধার লাগে না।'

'আসলেই? এহ হে, তবে তো বিষয়টা বাজে হলো,' তোমোহিকোর উরুর উপরে আলতো করে হাত রেখে বললো মহিলাটা। রিও যেমনটা ভেবেছিলো, তেমনটাই হচ্ছে ওদের সাথে। একেবারেই নিরীহ ধরনের আড্ডা চলছে এখানে। অর্থহীন কথাবার্তা বলছে ওরা, যার কোনো মানে খুঁজে পাচ্ছে না তোমোহিকো। আর এর জন্য ওকে টাকা দেবে এরা, ভাবতেই অবাক লাগছে। তার মনে হচ্ছিলো এমন কাজ সে আগে কেন করেনি। বিনুনি-বাঁধা মহিলা আর ছোট চুলওয়ালা মহিলাটাই বেশি বকবক করছে। আর ডেনিম-পরা মহিলাটা তেমন কিছুই বলছে না। শুধু তার বিয়ারের গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে আর তারা কী বলছে তা শুনছে। কেমন যেন একধরনের কাঠিন্য রয়েছে তার হাসিতে, ভাবলো তোমোহিকো। গ্লাস শেষ

হওয়ামাত্রই মহিলাগুলো আবার ভরে দিচ্ছিলো সেগুলো। যাই ঢালছে, তাই খাচ্ছে তোমোহিকো। কারণ আসার সময় রিও মাঝপথে বলেছিলো যে অ্যালকোহল বা সিগারেট, যা কিছুই তারা অফার করুক না কেন, সে যেন তা গ্রহণ করে।

ঠিক আধা ঘণ্টা বাদে রিও ভেতরে ঢুকলো। বললো, 'এত সুন্দর আলাপের মাঝে বিরক্ত করতে চাচ্ছি না, কিন্তু একটা মুভি দেখলে কেমন হয়?'

তোমোহিকো দাঁত বের করে একটা হাসি দিলো। কিছুটা ঢুলছে সে।

'ওওও...নতুন কিছু নাকি?' ছোট চুলওয়ালা মহিলাটা বলে উঠলো। ওর চোখদুটো একবার ঝিলিক দিয়ে উঠলো।

'একদম নতুন। দেখে মজা পাবে।'

তোমোহিকো দেখলো রিও বসার ঘরে প্রজেক্টর সেট করছে। সে সময়ে জিজ্ঞেস করার মতো সুযোগ পেয়ে কীসের মুভি তা জিজ্ঞেস করলো সে।

'কী মুভি?' জিজ্ঞেস করলো তোমোহিকো।

'দেখলেই বুঝতে পারবে,' একটু বাঁকা হেসে জবাব দিলো রিও। প্রজেক্টরের সুইচ টিপ দিলো সাথে সাথে। একটা আলো ওরা যেখানে বসেছে সে পাশের দেয়ালে গিয়ে পড়লো। সাদা দেয়ালটাতে আলো পড়াতে সুন্দর একটা স্ক্রিন তৈরি হয়েছে। 'লাইটটা একটু বন্ধ করতে পারবে?'

তোমোহিকো গিয়ে মাথার উপরে জ্বলতে থাকা লাইটটা বন্ধ করে দেওয়ার সাথে সাথে ফিল্ম চালু করলো রিও। একটা আট মিলিমিটারের রঙিন মুভি। কোনো রকম শব্দ নেই, কিন্তু প্রথম সিনেই বোঝা গেল কীরকমের মুভি এটা। একটা নগ্ন পুরুষ আর মহিলা দাঁড়িয়ে আছে পর্দায়। তোমোহিকোর চোয়াল ঝুলে পড়লো। ওখানে এমন সব অঙ্গভঙ্গি দেখাচ্ছে যা সাধারণত স্বাভাবিক মুভিতে দেখানো হয় না। হৃৎপিণ্ডের ধুকপুক বেড়ে গেল তার। সে এরকম ছবি দেখেছে আগে, কিন্তু মুভি এই প্রথম দেখছে।

'ওয়াও, কী সুন্দর!'

'এটা যে এভাবেও করা যায় তাই তো জানতাম না!' মহিলাগুলো কথা বলছে আর দেখছে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে তারা নিজেদের মধ্যে কথা বলছে না। মুরাশিতা আর তোমোহিকোকে শোনানোর জন্য বলছে।

বিনুনি-বাঁধা মহিলাটা তোমোহিকোর কানে ফিসফিস করে বললো, 'এরকম কখনো করেছ তুমি?'

'না,' বললো সে। নিজের কণ্ঠের কাঁপুনি নিজেই টের পাচ্ছে।

প্রথম মুভিটা দশ মিনিটের মতো চললো। তারপর প্রজেক্টরে আরেকটা রিল ভরতে লাগলো রিও। এমন সময় ছোট চুলওয়ালা মহিলাটা বললো, 'আরেহ...এখানে প্রচুর গরম।' বলেই তার গায়ে থাকা জামাটা খুলে ফেললো। তার

পরনে এখন কেবল ব্রা রয়েছে। প্রজেক্টরের আলোতে অনেকটা ফর্সা দেখাচ্ছে তাকে।

ডেনিম-পরা মহিলাটা হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লো। 'উম, সরি–' এইটুকু বলেই থমকে গেল সে।

প্রজেক্টরের পাশ থেকে রিও বলে উঠলো, 'তোমার কি যেতে হবে?'

মাথা নাড়লো সে।

'বুঝতে পেরেছি। খুবই বাজে অবস্থা।'

সবাইকে মুভি দেখা অবস্থায় রেখে ডেনিম-পরা মহিলাটা বসার ঘরে চলে গেল। কারো চোখে যেন চোখ না পড়ে সেজন্য বেশ সতর্ক ছিলো সে। মহিলা চলে যাওয়ার পরে রিও তার পেছনে থাকা দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ভেতরে ঢুকলো। ওর ঢোকার পরে ছোট চুলওয়ালা মহিলাটা একটু চাপা হাসি দিয়ে বললো, 'মনে হচ্ছে মুভিটা ওর জন্য একটু বেশিই হয়ে গেছে।'

'মনে হয় তুমি পাত্তা না দেওয়ার কারণে উঠে চলে গেছে সে, কী বলো, রিও?' বিনুনি-বাঁধা মহিলাটা বলে উঠলো।

'আমি পাত্তা দিচ্ছিলাম তো,' বললো সে। 'মনে হয় না সে এখনো এর জন্য প্রস্তুত।'

'লজ্জার বিষয়। এত কিছু করে ইনভাইট করলাম, তারপর এরকম করাটা...' বললো ছোট চুলওয়ালা মহিলাটা।

'তাতে আমাদের কী?' বিনুনি-বাঁধা মহিলাটা বললো। 'চলো পরেরটা দেখি।'

'এক্ষুনি দিচ্ছি।' বলেই প্রজেক্টর চালু করলো রিও।

মুভির মাঝখানে জামা খুলে ফেললো বিনুনি-বাঁধা মহিলাটা। তোমোহিকোর গায়ে গা লাগিয়ে বসলো। তারপর নরম সুরে বললো, 'তুমি কিন্তু চাইলেই ধরতে পারো।'

তোমোহিকো টের পেল তার সব রক্ত দুই উরুর মাঝখানে বইছে। এর কারণ আসলে পাশে থাকা উলঙ্গ মহিলা নাকি মুভিটা, তা জানে না সে। যেটা জানে তা হলো, শুধু অল্পস্বল্প কথা বলার জন্য ওকে টাকা দেওয়া হচ্ছে না।

মুখ শুকিয়ে গেছে তার। তবুও ঢোক গিললো একবার। সে যে এখান থেকে চলে যেতে চাইছে তাও না। ও আসলে পারবে কি না এটাই বুঝতে পারছে না।

কারণ তোমোহিকো এখনো পর্যন্ত ভার্জিন।

***

বিশোয়েন স্টেশনের কাছে হানওয়া লাইনে তোমোহিকোর বাসা। শপিং স্ট্রিট থেকে দুই মিনিটের রাস্তা। কাঠের তৈরি দুইতলা একটা বাড়ি।

'দেরি করে এসেছ দেখছি। ডিনার করবে?' দশটা বাজার কিছু আগে বাড়িতে ঢোকার সময় জিজ্ঞেস করলো তার মা। আগে সাতটার পরে বাসায় ঢুকলে কানের

বারোটা বাজিয়ে দিতো, কিন্তু হাই স্কুলে উঠার পর থেকে তেমন কিছুই বলে না। তার মা খুব অল্পই কথা বলে তার সাথে এখন।

'খেয়ে এসেছি আমি,' ঘরে ঢুকে দরজা লাগিয়ে দেওয়ার আগে বললো সে। নিচ তলার একটা ছোট ঘরে থাকে তোমোহিকো। মূলত এটা একটা স্টোরেজ রুম ছিলো। তোমোহিকো হাই স্কুলে উঠার পর তার বাবা-মা রুমটাকে ঝেড়ে-মুছে রং করে দেয় তার জন্য।

ঘরে ঢুকে দ্রুত একটা চেয়ারে বসে টেবিলের উপর থাকা অদ্ভুত জিনিসটাকে চালু করলো সে। অদ্ভুত জিনিসটা আর কিছুই না–একটা পার্সোনাল কম্পিউটার। বাইরের যেকোনো দোকানে এটা কিনতে গেলে এক মিলিয়ন ইয়েন লাগবে। অবশ্য এটা তার কেনা না। তার বাবা একটা ইলেকট্রনিকস কোম্পানিতে কাজ করার সময় একে-ওকে ধরে তার নিজের জন্য কম খরচে এনেছিলো। ভেবেছিলো কীভাবে চালাতে হয় তা শিখবে। কিন্তু দুই-তিনবার চেষ্টা করার পরে ব্যর্থ হয়ে আর ধরেনি। তোমোহিকোর আগ্রহের কারণে ওকে দিয়ে দেয় সেটা। এরপর অজস্র বই-টই পড়ে এখন সে অল্পস্বল্প প্রোগ্রাম লিখতে পারে।

তোমোহিকো কম্পিউটারের পাশে থাকা টেপ রেকর্ডারটা চালু করলো। ধীরে ধীরে চলে উঠলো রেকর্ডারটা। স্পিকারের ভেতর থেকে বেজে বেজে আসছে *শব্দ।* টেপ রেকর্ডারটা মেমোরি স্টোরেজের জন্য রাখা হয়েছে। কাজের সময় বড় কোনো প্রোগ্রাম ম্যাগনেটিক সিগন্যালে রূপান্তরিত হয়ে ক্যাসেটের টেপের ভেতর সংরক্ষিত থাকে যাতে পরবর্তীতে কম্পিউটারে এক্সেস করার সময় র‍্যাম তা চালু করতে পারে। ক্যাসেট টেপ আগেকার সময়ের পাঞ্চ কার্ড থেকে বেশ উন্নত হলেও এখনো মাঝেমধ্যে বেশ সময় নেয় এক্সেস হতে।

ডেস্ক থেকে উঠে গেল তোমোহিকো। বিশ মিনিট পরে ফিরে এসে বসতেই তার মুখে হাসি দেখা গেল। চৌদ্দ ইঞ্চির মনিটরে ভেসে উঠেছে একটা শব্দ:

WESTWORLD

তার নিচে লেখা:

PLAY? YES=1 NO=0

তোমোহিকো ১ লেখা বাটনে চাপ দিলো।

ওয়েস্টওয়ার্ল্ড তোমোহিকোর প্রথম কোনো সৃষ্টি। একটা সহজ কম্পিউটার গেম যা ইউল ব্রাইনার ফিল্ম থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে বানিয়েছে সে। গেমের ভেতর মূল কাজ হচ্ছে প্লেয়ারকে শত্রুপক্ষ ধাওয়া করবে আর প্লেয়ার প্রত্যেকটা করিডরের ধাঁধা সলভ করে এক্সিট খুঁজবে। তোমোহিকো এটাকে আরো রোমাঞ্চকর একটা গেম বানানোর জন্য নিজেই খেলে। যখনই কোনো বিষয় তার মাথায় চট করে এসে পড়ে, সে গেমটাকে থামিয়ে দিয়ে প্রোগ্রামটা পুনরায় লিখতে বসে যায়। একেবারেই

সাধারণ একটা গেম হিসেবে যাত্রা করে আস্তে আস্তে জটিল হতে শুরু করেছে ওটা। অনুভূতিটা এমন যেন কোনো জীবিত জিনিসকে ধীরে ধীরে বড় হতে দেখছে সে।

কিছুক্ষণের জন্য তার আঙুল কিবোর্ডের এদিক-সেদিক চলতে লাগলো, স্ক্রিনে থাকা ক্যারেক্টারটাকে নড়ানোর জন্য। কিন্তু তার আঙুল যত দ্রুতই চলুক না কেন, গেমে মন বসছে না তার। বিরক্ত হয়ে উঠছে সে। এমনকি গেমে ভুল করে ধরা খাওয়ার পরেও পাত্তা দিতে ইচ্ছা করছিলো না।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ডেস্ক থেকে দূরে সরে গেল তোমোহিকো। চেয়ারের সাথে হেলান দিয়ে উপরে সিলিংয়ের দিকে তাকালো সে। ওখানে এর আগে একটা সুইমস্যুট-পরা পোস্টার লাগিয়েছিলো। পোশাকে ঢাকা স্তন আর উরুর মাঝখানের নরম অংশটুকু তার চোখের মাঝে সেঁটে আছে। সেগুলো ছোঁয়ার কল্পনা করতেই কুঁচকির গোড়ায় একধরনের পুলক অনুভব করলো সে। এমনকি ঘণ্টাখানেক আগের সেই দুনিয়া উলটে যাওয়া অভিজ্ঞতা পাওয়া সত্ত্বেও।

অবশ্যই ওটা তার জন্য দুনিয়া উলটে যাওয়ার মতো ঘটনা, তাজা স্মৃতির মাঝে বিচরণ করতে করতে ভাবছে সে। এখনো সেই রেশ কোথাও না কোথাও রয়ে গেছে। এই রেশ প্রমাণ করে দিচ্ছে যে ওটা কোনো স্বপ্ন বা কল্পনা ছিলো না।

সেক্স শুরু হয়েছিলো আট মিলিমিটারের তিন নাম্বার রিল চলাকালীন। মুরাশিতা সেই ছোট চুলওয়ালা মহিলার সাথে নিচে আর তোমোহিকো বিনুনি-বাঁধা মহিলার সাথে বিছানায়। হাই স্কুল পড়ুয়া ছেলে দুটো তাই করছিলো যা তাদের পার্টনাররা তাদেরকে করতে বলছিলো। একদম স্টেপ বাই স্টেপ। মহিলা দুটো ওদেরকে জীবনের প্রথম যৌন অভিজ্ঞতা উপহার দেয় (অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পথে মুরাশিতাও বলেছে যে এর আগে ভার্জিন ছিলো সে)।

বিনুনি-বাঁধা মহিলাটার সাথে দুইবার বীর্য ফেলেছিলো তোমোহিকো। প্রথমবার তো সে বুঝতেই পারেনি কী ঘটে গেল। কিন্তু দ্বিতীয়বার সে বেশ সময় নিয়েই করেছে, মজাটাও পুরোপুরিই পেয়েছে। সে সময় যে পরিমাণ শক্তি তার শরীর থেকে বেরিয়ে গেছে তা সে কোনোদিনও হস্তমৈথুন করার সময় অনুভব করেনি। পুরো শরীর ছেড়ে দিয়েছিলো তার। মাঝপথে মহিলা দুটো পার্টনার চেঞ্জ করবে কি না তা নিয়ে কথা বলছিলো, কিন্তু বিনুনি-বাঁধা মহিলাটার মধ্যে সেরকম কোনো আগ্রহ না থাকায় আর সেদিকে যাওয়া হয়নি।

পরে রিও এসে বলে, যাওয়ার সময় হয়েছে। তোমোহিকো তখন ঘড়িতে তাকিয়ে দেখে যে তিন ঘণ্টার উপরে হয়ে গেছে তারা এই অ্যাপার্টমেন্টে এসেছে। রিও নিজে কিছুই করেনি। কোনো মহিলাও তাকে ডাকেনি। যা থেকে বোঝা যায়, এগুলো সবই আগে থেকে পরিকল্পিত ছিলো। যদিও সে অ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে যায়নি কোথাও। তোমোহিকো আর মুরাশিতা যখন স্তন, যোনি আর পাছা চোষায় মত্ত ছিলো, তখন বসার ঘরেই বসে ছিলো রিও। তোমোহিকো যখন বেরিয়ে এলো,

ঘোরলাগা অনুভূতির সাথে দেখলো যে রান্নাঘরে অল্প আলোর ভেতরে শূন্য দেয়ালের দিকে তাকিয়ে সিগারেট ফুঁকছে রিও।

ওখান থেকে চলে আসার পর রিও ওদেরকে একটা ক্যাফেতে নিয়ে আট হাজার পাঁচশো ইয়েন ধরিয়ে দেয়। ওরা দুজনেই দশ হাজার দেওয়ার কথা ছিলো বললে রিও বলে, 'খরচ কেটে নেওয়া হয়েছে। তোমরা পিৎজা আর বিয়ার খেয়েছ, তাই না? সেগুলোর দাম কেটে নিয়েছি।' মুরাশিতা মেনে নেওয়ার পরে তোমোহিকো আর কিছু বলেনি। কারণ তখনো সেই নারীর স্পর্শের মোহ কাটেনি তার মন এবং শরীর থেকে।

'তো বলো,' বলেছিলো রিও, তার চোখে মৃদু আভা খেলা করছে, 'ভালো সময় কাটিয়েছ তো তোমরা? যদি উপভোগ করে থাকো, তবে এটা রোজ করতে পারবে। ঐ মহিলাদের কাছ থেকে খুব তাড়াতাড়িই হয়তো ডাক পাবো আবার।' তার চেহারাটা খুশিতে চকচক করে ওঠার সাথে সাথেই আবার কঠিন মুখে বললো, 'শুধু একটা কথা মাথায় রাখবে: আমি চাই না তোমরা নিজেরা নিজেরা ওদের সাথে দেখা করো, বুঝেছ? আমাদের এটাকে ব্যবসায়িকভাবে এগিয়ে নিতে হবে যাতে কোনো রকম অঘটন না ঘটে। কোনো রকম বাজে চিন্তা মাথায় এলো আর একা একা করে ফেললে, তবে বলে রাখি কাজটা তোমাদের জন্য বাজে হয়ে যাবে। একা একা ওদের সাথে যোগাযোগ করবে না, কথা দাও?'

আবারো মুরাশিতা তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেল, যার কারণে তোমোহিকোর দ্বিধা রাখারও কোনো সুযোগ রইলো না। 'ঠিক আছে। একা একা দেখা করবো না,' বলেছিলো সে।

তোমোহিকোর এখনো স্পষ্ট মনে আছে কথাটা শোনার সাথে সাথে রিওর মুখে একটা বাঁকা হাসি দেখা গেছিলো। সে তার পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা কাগজ বের করে ডেস্কের উপর রাখলো। একটা টেলিফোন নাম্বার আর তার নিচে নাম লেখা: ইউকো। ফিরে আসার সময় বিনুনি-বাঁধা মহিলাটা ওর হাতে গুঁজে দিয়েছে এটা।

***

এখনো কিছুটা মাতাল অবস্থায় আছে নামি নিশিগুচি। কত বছর পরে একা একা বাইরে মদ খেতে গেছে তাই ভাবছে, কিন্তু মনে করতে পারছে না মোটেও।

আসলেই অনেক দিন হয়ে গেছে।

কারোরই তার প্রতি কোনো আগ্রহ ছিলো না।

অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে আলো জ্বালাতেই বারান্দার স্লাইডিং দরজার কাচের প্রতিবিম্বে নিজের অবয়ব লক্ষ করলো সে। মনে পড়লো সেগুলো খোলা রেখেই চলে গেছিলো সে। নিজের অবয়বটার দিকে তাকিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলো দরজাটার কাছে। লাল শার্টের নিচে ডেনিম জ্যাকেট। কিছুই তার সাথে মানাচ্ছে না, আর খুবই বাজে দেখাচ্ছে তাকে ওসবে। সে চাইলেই পোশাকগুলো খুলে তার অন্য

পোশাক পরতে পারতো আরেকটু বয়স কমানোর জন্য, কিন্তু তার ফলাফল খুবই বাজে হতো। ঐ হাই স্কুলের ছেলেগুলোও সেভাবেই দেখতো ওকে।

দরজাটা বন্ধ করে দিলো সে। এরপর সব পোশাক খুলে ফেললো। কেবল আন্ডারওয়্যার পরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো নিজেকে। বয়সের ভারে নুয়ে পড়া একটা মহিলার চেহারা দেখছে সে। নিস্প্রভ চামড়া আর চোখের ভেতর শূন্যতা। কোনো এক মহিলার চেহারা দেখা যাচ্ছে যে কিনা সারা জীবন কোনো উদ্দেশ্য ছাড়াই বেঁচে ছিলো, যার বয়সই বেড়েছে কেবল।

হ্যান্ড ব্যাগটার দিকে হাত বাড়ালো সে। একটা সিগারেট বের করে তা ঠোঁটে নিয়ে আগুন ধরালো। আয়না বরাবর ধোঁয়া ছেড়ে তাকিয়ে রইলো সেখানে। ধোঁয়াটা আয়নায় থাকা চেহারার উপর পড়াতে ঘোলাটে করে দিলো কিছু মুহূর্তের জন্য। নিজেকে এরকম ঘোলাটে আবরণের মাঝে লুকিয়ে ফেলতে পারলে বেঁচে যেত সে। এতে করে অন্তত চেহারার এই অবস্থা লুকিয়ে রাখা যেত।

সেই অ্যাপার্টমেন্টে অর্ধেক দেখে আসা মুভিটার কথা হঠাৎ মাথায় এলো তার।

'আরে, অন্তত একবারের জন্য হলেও তোমার করা উচিত! একবার করলে কী এমন হবে!' দুদিন আগে তার সহকর্মী কাজুকো কাওয়াডা বলেছিলো ওকে। 'এ নিয়ে কোনো অনুতাপ থাকবে না তোমার, দেখে নিও। সত্যিই বলছি কিন্তু। গতানুগতিক জীবনের থেকে অন্য যেকোনো কিছুই ভালো, ঠিক কি না? বলেছি তো, ভালো লাগবে তোমার। আমাদের মতো বয়সি মহিলাদের মাঝেমধ্যেই ছেলেদের আশেপাশে থাকতে হয়, নয়তো একটা জায়গাতেই আটকে থাকবো সব সময়।'

অন্য কোনো সময় হলে ঐ সময়েই না করে দিতো, কিন্তু কেন যেন এক অদ্ভুত রকমের তাড়না অনুভব করলো নামি। এই তাড়না পরিবর্তনের। ওকে পালটে যেতে হবে, নয়তো সারা জীবনের জন্য অনুতাপ বয়ে বেড়াতে হবে। অনেক দিন ধরেই বেড়ে উঠছিলো ধারণাটা। তাই দ্বিধা থাকা সত্ত্বেও প্রস্তাবটা গ্রহণ করে নেয়। যদিও কাজুকোর অতিরিক্ত পীড়াপীড়িতেই রাজি হয়েছিলো সে। কিন্তু তারপরও শেষমেশ সে তেমন কিছুই করতে পারলো না। উদ্ভট লাগছিলো বিষয়টা তার কাছে, যদিও কাজুকো আর অপর মহিলাটা ঠিকই তাদের কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছিলো। কিন্তু ওর বমি পাচ্ছিলো ভীষণ। ও অবশ্য এটা ভাবেনি যে মহিলাগুলো যা করছে তা আসলে খারাপ। বস্তুত সে এখন বুঝতে পারছে যে ওসব করার কারণেই কিছু মহিলার মাথা থেকে অবসাদ দূর হচ্ছে। কিন্তু সে আসলে ওসব মহিলার মতোই না।

দেয়ালে থাকা ক্যালেন্ডারের দিকে চোখ পড়লো তার। ছুটির দিনটা মাটি হয়ে গেছে। তার অফিসের বস অথবা অন্য মহিলারা যখন তার ডেটের বিষয় নিয়ে উত্ত্যক্ত করবে, তখন কী হবে ভেবেই পেটের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠলো তার।

সময় হওয়ার আগেই অফিসে পৌঁছে যাবো। তারপর একমনে নিজের কাজ করতে থাকবো যাতে কেউ আসার পরে আমার সাথে কথা না বলে। স্বাভাবিক সময়ের থেকে একটু আগে এলার্মটা সেট করে দেবো যাতে আরো সকালে উঠতে পারি...

নামি তার চুলে আরো দুয়েকবার আঁচড় দিতেই হঠাৎ থামলো। *আমার ঘড়ি!* ব্যাগ খুলে ভালো করে খুঁজে দেখলো ঘড়িটা সেখানে নেই।

'চমৎকার!' নিজের ঠোঁটটায় কামড় দিলো একটু। ঐ অ্যাপার্টমেন্টেই ও শেষবারের মতো তার ঘড়ি খুলে রেখেছিলো। অনেক দামি কোনো ঘড়ি ছিলো না ওটা। তাই হারিয়ে গেলেও তেমন একটা সমস্যা ছিলো না তার। কিন্তু বছরখানেক ধরে পরার ফলে একটা সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেছিলো ওটার সাথে। বাথরুমে যাওয়ার আগে ঘড়িটা খুলেছিলো বলে মনে পড়লো তার। বেসিনে হাত ধোয়ার সময় অভ্যাসবশত খুলেছিলো।

পাশ থেকে মোবাইলটা হাতে নিয়ে কাজুকোকে ফোন লাগালো। যদি কাজুকো ঘড়ির ব্যাপারে কিছু না জানে, তবে সেই রিও নামের বাচ্চা ছেলেটাকে ফোন করবে সে।

ও জানে কাজুকো কিছুটা রেগে আছে বিকেলের ঘটনাটা নিয়ে, কিন্তু তাকে কিছু একটা করতেই হবে। নাম্বারটা চেক করেই ডায়াল করলো।

সৌভাগ্যবশত, ঘরেই ছিলো কাজুকো। 'আরে আরে...কে ফোন করেছে!' বললো সে। অবাক হওয়ার পরিবর্তে একধরনের তিরস্কার শোনা যাচ্ছে তার গলায়।

'আজকের ঘটনার জন্য লজ্জিত আমি,' বললো নামি। 'আমি...কেন যেন মন টানেনি আমার।'

'আরেহ, ঠিক আছে,' বললো কাজুকো। 'তোমার জন্য একটু বেশিই হয়ে গেছিলো, বুঝতে পেরেছি আমি।'

এর মানে হলো তুমি আমাকে ভীতু ভাবো, মনে মনে বললো নামি। এরপর তিরস্কারের ব্যাপারটা গিলে নিয়ে ঘড়ির ব্যাপারে বললো তাকে।

'না তো, এমন কিছু তো সেখানে খুঁজে পাইনি আমরা,' জবাবে বললো কাজুকো। 'অন্যরা কেউ পেয়ে থাকলেও তো আমাকে বলতো।'

নামি ফোনের উপরেই দীর্ঘশ্বাস ফেললো একটা।

'তুমি নিশ্চিত ওখানেই ফেলে এসেছ ওটা? আমি কি কাউকে দেখতে বলবো?'

'না, থাক। সমস্যা নেই। আমার মনে হয় অন্য কোথাও ফেলে এসেছি আমি।'

'আচ্ছা। আর যদি খুঁজে না পাও, তবে আমাকে জানিও।'

'আচ্ছা, জানাবো। এত রাতে ফোন করার জন্য সরি।' নামি কেটে দিলো ফোনটা। লম্বা একটা শ্বাস বেরিয়ে এলো বুক থেকে। *এখন কী করবো আমি?* ঘড়িটার ব্যাপারে না ভাবলেও পারে সে। ও কি ঘড়িটা অন্য কোথাও ফেলে এসেছে? হয়তো তাই হয়েছে। অ্যাপার্টমেন্ট বাদে অন্য কোথাও হয়তো। আর

তাকে ঐ ঘড়িটাই কেন পরতে হয়েছিলো? আরো অনেক ঘড়িই তো ছিলো তার কাছে।

আরো কয়েকটা সিগারেট খাওয়ার পরে অসীমের পানে তাকিয়ে রইলো সে। এসব থেকে বাইরে বের হওয়ার একটা রাস্তা আছে অবশ্য। অনেকবার এ নিয়ে ভেবেছে নামি। পাগলামি মনে হচ্ছে, আবার মনে হচ্ছে না। আবার ততটাও কঠিন না। অন্ততপক্ষে কোনো বিপজ্জনক কিছু তো না-ই।

দেয়ালে থাকা ঘড়িটায় সাড়ে দশটার ঘণ্টা বেজে উঠলো হঠাৎ। এগারোটার কিছু পরপরই নিজের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বের হলো নামি। দেরি করার কারণ হলো যাতে কারো নজরে না পড়ে যায়। আবার বেশি দেরি করলো না যাতে শেষ ট্রেনটাও ছুটে যায়।

***

সাবওয়েটা প্রায় নির্জীব হয়ে আছে। ট্রেনে বসে পড়লো সে। গাড়ির কাচে নিজের অবয়ব দেখলো আবার। একটা কালো ফ্রেমের চশমা, সাথে সুইটশার্ট আর জিন্স পরেছে। তেমন আহামরি কিছু না, আবার ত্রিশোর্ধ্ব ছাপটা ঢাকার মতোও কিছু না। তবে এভাবেই ভালো লাগছে ওর।

নিশিনাগাহোরি স্টেশনে নেমে সেই পথটা ধরে হাঁটতে লাগলো যেটাতে দিনের বেলায় কাজুকোর সাথে হেঁটেছিলো। কাজুকো, যে কিনা পুরো দিনটা কেমন ছেলে আসবে, কীরকম দেখতে হবে ইত্যাদি বলে বলে মাথা খাচ্ছিলো তার। নামি নিজেও অবশ্য যোগ দিয়েছিলো তার সাথে।

কোনো রকম সমস্যা ছাড়াই অ্যাপার্টমেন্টটা খুঁজে পেল নামি। ৩০৪ নাম্বার ঘরটার দিকে উঠতে লাগলো সিঁড়ি দিয়ে। দরজায় থাকা বেলটা বাজালো একবার। খাঁচা থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে তার হৃৎপিণ্ড। কোনো রকম জবাব এলো না ভেতর থেকে।

আবারো একবার বাজালো। এবারও কোনো উত্তর নেই।

একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়েই আবার চিন্তিত হয়ে এদিক-সেদিক দেখতে লাগলো। যখন দেখলো আশেপাশে কেউ নেই, তখন দরজার পাশে থাকা পানির মিটারের বাক্সটা খুললো সে।

'একবার তোমাকে চিনে গেলে তারা তোমাকে বলে দেবে ঘরের চাবি কোথায় থাকে,' বিকালবেলা এটাই বলেছিলো কাজুকো তাকে।

হাতটা ঢুকিয়ে দিয়ে লোহার স্পর্শ পেতেই আরেকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লো নামি।

দরজাটা ধীরে সুস্থে খুললো সে। ভেতরে আলোটা জ্বলে আছে, কিন্তু দরজার কাছে কোনো জুতো নেই। এর মানে ঘরে কেউ নেই। তারপরও কোনো রকম শব্দ ছাড়াই ভেতরে ঢুকলো। বসার ঘরের টেবিলটার উপরে কিছু জিনিসপাতি পড়ে

আছে। অথচ ওটাকে বিকালবেলা পরিষ্কারই দেখেছিলো। ইলেকট্রনিক ডিভাইস ওগুলো, কিন্তু কীসের তা জানে না সে। হয়তো কিছু একটা ঠিক করছে কেউ। মনোযোগ দিয়ে কাজ করছিলো নিশ্চয়ই। সে ঢোক গিললো একবার। প্রথমে বাথরুম এবং পরে বেসিনে গিয়েও ঘড়িটা পেল না। যদি কেউ পেয়ে থাকে, তবে কেন সেটা কাজুকোর কাছে দিয়ে দিলো না তা ভাবছে এখন।

দুশ্চিন্তা মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। হয়তো হাই স্কুলের বাচ্চাগুলো পেয়ে আর বলেনি কাউকে। নিজেদের কাছেই রেখে দেবে ভেবেছে। অথবা কোনো পনশপে জমা রেখে টাকা নেবে।

চামড়া কুঁচকে গেল নামির। তার রাগ উঠছে এখন। কিন্তু ও জানে না তাকে কী করতে হবে।

কয়েকটা লম্বা শ্বাস নেওয়ার পরে ভুল ভাবছে ভেবে মাথা ঠান্ডা করলো। হয়তো বেসিনের পাশে ফেলেনি ঘড়িটা। হাতে করে নিয়ে গিয়ে রুমের ভেতর কোনো এক জায়গায় রেখেছিলো। বাথরুম থেকে বেরিয়ে তাতামি মাদুর বিছানো সেই রুমটার দিকে গেল সে। একদম পরিষ্কার করা হয়েছে রুমটাকে। হয়তো সেই রিও নামক ছেলেটা এসব করেছে। ছেলেটাকে রহস্যময় লেগেছে তার কাছে। অবশ্যই অল্পবয়সি, কিন্তু মনের ভেতরটা বাইরের বয়সের তুলনায় অনেক *বেশি* পাকা মনে হয়েছে।

যে ডিভাইডারটা দিনের বেলায় সরিয়ে ফেলা হয়েছিলো সেটা আবার জায়গামতো রাখা হয়েছে। যার কারণে সে বাইরে থেকে বিছানাটা দেখতে পেল না। সাবধানে দরজাটা খুললো নামি।

প্রথমে যেটা দেখলো তা হলো একটা টেলিভিশন স্ক্রিন ভাসছে তার সামনে। রুমের ঠিক মাঝখানে রাখা হয়েছে জিনিসটা। যেরকমটা স্বাভাবিক কোনো টেলিভিশনে থাকে, তেমন কোনো ডিসপ্লে না ওটা। সামনে এগিয়ে গেল সে।

অনেকগুলো বহুভুজ নড়াচড়া করছে সেখানে। প্রথমে ভেবেছিলো হয়তো কোনো *টেস্ট প্যাটার্ন*, যেগুলো স্টেশনের বোর্ডে সারা দিন চলতে থাকে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই বুঝতে পারলো এগুলো আসলে তেমন কিছু না। কোনো একটা রকেটের মতো বস্তু এদিক-সেদিক নড়াচড়া করছে।

একটা ভিডিওগেম। ও নিজেও কয়েকবার *স্পেস ইনভেডারস* খেলেছে। কিন্তু ঐ গেমে জিনিসগুলো যতটা সাবলীলভাবে নড়াচড়া করে, ততটা সাবলীলভাবে এখানে নড়াচড়া করছে না। কিন্তু তারপরেও রকেটটার নড়াচড়ার মাঝে তাকিয়ে থাকার মতো কিছু একটা আছে। বিষয়টা এতটাই কৌতূহলোদ্দীপক যে পেছন থেকে ভেসে আসা পায়ের শব্দও টের পেল না সে।

'আপনি যে ভিডিওগেমের ফ্যান তা জানতাম না,' একটা স্বর বলে উঠলো পেছন থেকে।

নামি অবাক হয়ে প্রায় কেঁদে দিচ্ছিলো। দ্রুত ঘুরে রিওকে দেখলো সে। 'আ..আমি দুঃখিত,' বললো সে। 'আসলে আমি একটা জিনিস ফেলে গেছি। মিসেস কাওয়াডা বলেছিলো চাবিটা কোথায় থাকে, তো...'

ছেলেটাকে দেখে মনে হলো না তার কথা শুনতে সে আগ্রহী। ওকে একপাশে ঠেলে দিয়ে স্ক্রিনের সামনে বসে পড়লো সে। এরপর কিবোর্ডটা টেবিল থেকে তুলে নিয়ে নিজের হাঁটুর উপর রেখে দুহাত দিয়ে চাপতে লাগলো।

কিছু সময় পরেই স্ক্রিনের ছবি বদলে গেল। অবয়বগুলো আরো দ্রুত নড়ছে, পরিণত হচ্ছে বিভিন্ন আকারে। রিও কিবোর্ডের বাটনটা চাপতেই থাকলো, যার ফলে একটার পর একটা অবয়ব পরিবর্তিত হতে লাগলো স্ক্রিনের ভেতর।

নামির বুঝতে কিছুটা সময় লাগলো যে স্ক্রিনের ভেতরে থাকা রকেটটা আসলে অটোমেটেড না। রিওই চালাচ্ছিলো ওটা–কিবোর্ড দিয়ে সামনে, পেছনে বা দুই পাশে। শেষমেশ রকেটটা একটা গোলাকার বস্তুকে আঘাত করতেই উধাও হয়ে গেল ওটা। আর তার জায়গায় বড় করে একটা লেখা উঠলোঃ

GAME OVER

নিজের সাথেই কথা বলে উঠলো রিও। 'হচ্ছে না, হচ্ছে না, দ্রুত হচ্ছে না,' বললো সে। 'এমনকি কাছাকাছিও যাচ্ছে না।'

কী নিয়ে বলছে তার কিছুই বুঝতে পারলো না নামি। ও ভাবলো তাকে যত দ্রুত সম্ভব অ্যাপার্টমেন্টটা ত্যাগ করতে হবে। 'আমার যাওয়া উচিত এখন,' বললো সে।

এদিকে না তাকিয়েই রিও বললো, 'যা খুঁজতে এসেছিলেন তা পেয়েছেন?'

'আমার মনে হয় আমি ওটা অন্য কোথাও ফেলে এসেছি। সরি।'

নাক দিয়ে শব্দ করলো রিও।

'গুড নাইট,' বললো নামি। 'আমি চলে যাচ্ছি।' দরজার দিকে চলে যেতে নিচ্ছিলো, এমন সময় পেছন থেকে ডাক শুনলো সে।

'দশ বছর ধরে ঐ ব্যাংকটায় চাকরি করছেন আপনি? আমি কখনোই আপনাকে ব্যাংকার হিসেবে ভাবিনি।'

থেমে গেল নামি। পেছনে ফিরে ছেলেটাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলো। ডান হাতটা দোলাচ্ছে সে, হাতে নামির ঘড়ি। ব্যাংকের মালিকের গিফট ছিলো ওটা। আর তার নাম আর ব্যাংকের নাম, দুটোই লেখা আছে ওতে।

'এটা আপনার, না?'

এক মুহূর্তের জন্য সে না করে দেবে ভেবেছিলো, কিন্তু পরক্ষণেই সিদ্ধান্ত বদলে নিয়ে বললো, 'ধন্যবাদ।'

চুপচাপ বসার ঘরের টেবিলের কাছে চলে গেল রিও। ইলেকট্রনিক্স জঞ্জালের মাঝখানে একটা ব্যাগ রাখা আছে। টেবিলের পাশে বসে পড়লো সে। ব্যাগের দিকে হাত বাড়িয়ে দুটো বিয়ার ক্যান আর একটা খাবারভরতি প্যাকেট বের করে নিলো।

'ডিনার করবে?' জিজ্ঞেস করলো নামি।

কোনো জবাব এলো না। তার পরিবর্তে ছেলেটা একটা ক্যানের বোতল এগিয়ে দিলো নামির দিকে। 'বিয়ার?'

'নাহ। ধন্যবাদ সাধার জন্য।'

'ঠিক আছে।' বলেই ক্যানটা খুললো সে। কিছুটা ছিটকে এদিক-সেদিক পড়তেই চুমুক দিয়ে খেয়ে নিলো। কো'নো রকম মনোযোগ নেই নামির দিকে।

সাহস নিয়ে নামি জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কি আমার উপর রাগ করোনি? এই যে আমি এখানে এসেছি, এর জন্য আর কি।'

ধীরে ধীরে ওর দিকে চোখ তুলে তাকালো রিও। 'না তো।' বলেই ডিনারের প্যাকেটটা খুলতে লাগলো সে।

নামি চাইলেই চলে যেতে পারে, কিন্তু কিছু একটা তাকে যেতে দিচ্ছে না। ছেলেটা সে কোথায় কাজ করে তা জানে, কিন্তু সে ছেলেটার বিষয়ে কিছুই জানে না। এছাড়া, সে যদি কিছু না বলে চলেও যায়, তবে সেই দুপুর থেকে শুরু হওয়া পেটের ভেতর মোচড় দেওয়া অনুভূতিটা থেকে যাবে।

'বিকেলের ঘটনাটার জন্যও রাগ করোনি?'

'যখন আমাদের রেখে চলে গেছিলেন?' মাথা ঝাঁকালো সে। 'নাহ, এরকমটা হয়।'

'আসলে আমি ভয় পেয়েছিলাম...তার জন্য করিনি,' বললো নামি। 'প্রথম থেকেই আমার মন বসছিলো না ওতে। শুধু প্রস্তাবটা রক্ষা করার জন্যই এসেছিলাম...'

হাতে থাকা চপস্টিক দুটো নেড়ে রিও বললো, 'দেখুন, এসব আমি কেয়ার করি না তেমন।'

নামির মুখের কথা মুখেই থেকে গেল। ছেলেটার দিকে তাকালো সে। সে তাকে পুরোপুরি উপেক্ষা করে খাবার খেতে শুরু করেছে। শূকরের মাংসের সাথে ভাতের দলা মুখে পুরছে সে।

'আচ্ছা, একটা বিয়ার দাও আমাকে,' বললো নামি।

ছেলেটা মাথা দুলিয়ে আরেকটা ক্যানের দিকে ইশারা করে বোঝালো এটা নামির জন্যই ছিলো সেখানে। ওর পাশে বসে ক্যানটা খুলে পান করতে লাগলো নামি।

'এখানেই থাকো তুমি?'

চুপচাপ খেতে লাগলো রিও। কোনো জবাব নেই।

'তোমার মা-বাবার সাথে থাকো না তুমি?' আবার জিজ্ঞেস করলো নামি।

'হচ্ছেটা কী? কোনো জবাবদিহি চলছে নাকি?' একটু চিঁচিঁ করে বললো ছেলেটা।

'তুমি যা করছো তা কেন করছো? টাকার জন্য?'

'আরো কিছু আছে জিজ্ঞেস করার?'

'তুমি সেক্স করো না কখনো?'

'যখন প্রয়োজন মনে হয় তখন করি। যদি আপনি বাড়িতে না যেতেন, তবে আপনার সাথে আজকে করতাম।'

'তাহলে তো না করতে পেরে বোধহয় ভালোই লাগছে তোমার।'

'টাকা খোয়ানোর ভেতর আনন্দের কিছু নেই।'

'বিশাল ব্যবসায়ী বনে গেছ দেখছি! হাঁহ, এসব তোমার কাছে শুধু খেলনা মাত্র, তাই না? ছোট্ট বাচ্চা তুমি এখনো।'

'কী বললেন আপনি?' চোখ তুলে তাকালো রিও। 'আরেকবার বলুন পারলে।'

ঢোক গিললো নামি। এরকম তাকানোর ভঙ্গি আশা করেনি সে। কিছুটা উদ্ভট লাগছে ব্যাপারটা।

'আমি বললাম একটা বাচ্চা ছেলে তুমি। এই মহিলাগুলোকে কী মনে করো তুমি? তোমার খেলনা? তুমি যে তাদের সাথে সেক্স করো না তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। এও বলতে পারি যে ওদের ভালো করে উঠার আগেই তোমারটা শেষ হয়ে যায়।'

রিও আরেকবার চুমুক দিলো বিয়ারে। ক্যানটা টেবিলে রেখেই চট করে দাঁড়িয়ে গেল। শ্বাপদের মতো গতিতে এগিয়ে আসছে নামির দিকে।

'থামো, করছো কী...' বলতে নেওয়ার আগেই রিওর ধাক্কায় চেয়ারসহ মাটিতে লুটিয়ে পড়লো সে। মাটিতে এতটা জোরে আছড়ে পড়লো যে মুখ থেকে কোঁত করে একটা শব্দও বেরিয়ে এলো। উঠে বসার চেষ্টা করতেই রিও তার উপর উঠে বসলো। ততক্ষণে ছেলেটা তার প্যান্টের চেইন খুলে ফেলেছে।

'এটাই চেয়েছিলি না তুই? নে! যেভাবে চোষার চুষে নে। আমার কিচ্ছু যায় আসে না,' নামির মুখটা তার পুরুষাঙ্গের দিকে চেপে ধরে বলছে সে। 'কী হলো? নিচ্ছিস না যে? আমার উত্তেজনা তাড়াতাড়িই শেষ হয়ে যায়, না? নে, এবার দেখি তুই কী করতে পারিস।' তার পুরুষাঙ্গ ধীরে ধীরে বড় আর শক্ত হচ্ছে। নামি স্পষ্ট দেখলো একটা রগ ক্রমেই বেড়ে উঠছে। ছেলেটার উরুতে হাত রেখে যতটা সম্ভব মুখ সরানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে সে।

'এখন কী হলো, হ্যাঁ?' গর্জে উঠলো রিও। 'আমার মতো ছোট বাচ্চার ঐটা দেখে ভয় পেয়ে গেছিস?'

নামি তার চোখ বন্ধ করে ককিয়ে উঠলো, 'থামো...প্লিজ, ভুল হয়ে গেছে আমার।'

কিছুক্ষণ বাদেই ওকে ছেড়ে দিলো রিও। টেবিলের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো সে। দুলতে থাকা পুরুষাঙ্গটা চেইনের ভেতর আটকে চলে গেল খাবার খেতে। মনে হলো যেন কিছুই হয়নি। শুধু তার চপস্টিকে ধরা খাবারটা দেখে বিরক্তির ছাপ বোঝা যাচ্ছে।

নামি উঠে বসে নিজেকে ঠিকঠাক করে নিলো। হৃৎপিণ্ড এখনো দৌড়াচ্ছে। পাশের রুমে থাকা সেই স্ক্রিনে গিয়ে পড়লো তার চোখ। এখনো সেই দুটো শব্দ উঠে আছে স্ক্রিনেঃ

GAME OVER

'কেন?' জিজ্ঞেস করলো সে। 'অন্য যেকোনো কাজই তুমি করতে পারতে। কিন্তু এটাই কেন?'

'আমি শুধু তাই বিক্রি করছি যা মানুষ চায়। এতে সমস্যার কী আছে?'

'ওহ, বিক্রি করছো...তাই তো।' উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে হাঁটতে লাগলো সে। 'আমার মনে হয় এসব বোঝার জন্য আমার বয়সটা একটু বেশিই হয়ে গেছে।'

টেবিলের পাশ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে দরজার পাশে রাখা জুতো পরছিলো, এমন সময় পেছন থেকে ডাক দিলো রিও, 'আচ্ছা, শুনুন।'

এক পা উপরে রেখেই তাকালো নামি।

'চাকরি করবেন?'

'কীরকম চাকরি?'

'তেমন উদ্ভট কিছু না,' বললো সে। 'আমার কাছে কিছু জিনিস আছে, যা বিক্রি করতে হবে।'

***

জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মঙ্গলবার আজ। বাতাসের আর্দ্রতার গন্ধেই তোমোহিকোর মনে হচ্ছে গ্রীষ্মকাল এই এলো বলে।

ক্লাসের সামনে থেকে তার নাম উচ্চারিত হলে সে উঠে গিয়ে তার ইংরেজি পরীক্ষার খাতাটা নিয়ে এলো। কিন্তু খাতাটা হাতে পাওয়ার পর তার কাছে মনে হলো না আসাটাই হয়তো ভালো ছিলো। ও জানতো পরীক্ষা খারাপ হবে, কিন্তু এতটা খারাপ হবে এটাও ভাবেনি। প্রত্যেকটা সাবজেক্টেই একই অবস্থা। এর কারণ খুঁজতে অবশ্য তাকে বেশি একটা বেগ পেতে হয়নি; কারণ পরীক্ষার জন্য ন্যূনতম পড়াশোনাও সে করেনি।

ওর জন্য এমনটা অস্বাভাবিক। হতে পারে ওর সময়টা খারাপ যাচ্ছে, আর দোকানে চুরি করার ব্যাপারটা তো আছেই, কিন্তু স্কুলের ব্যাপারে সব সময়ই সিরিয়াস ছিলো সে। এমনটাও না যে সে পরীক্ষায় পাশ করার জন্য কোনো রকম

চেষ্টা করেনি। যতটুকু পড়লে পাশ করা যাবে, ডেস্কে বসে ঠিক ততটুকুই পড়ার চেষ্টা চালিয়েছে। কিন্তু তার চিন্তাগুলো এতটাই বিক্ষিপ্ত ছিলো যে যতবারই পড়ায় মন দেওয়ার চেষ্টা করতো, ততবারই এদিক-সেদিক চলে যেত। আর এই সবকিছুর ফলাফল এখন তার হাতে।

মা না দেখলেই ভালো হবে। খাতাগুলো ব্যাগে ভরতে ভরতে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো সে।

ক্লাস শেষে শিনসাইবাশির নিউ জাপান এয়ার হোটেলের লাউঞ্জে থাকা ক্যাফেটায় চলে গেল তোমোহিকো। রৌদ্রোজ্জ্বল একটা দিন, ক্যাফের বড় বড় কাচের জানালা ভেদ করে বাইরেটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

প্রতিবারের মতোই ইউকো হানাওকা সেখানে উপস্থিত আছে। কর্নারে থাকা একটা টেবিলে বসে বই পড়ছে। একটা সাদা টুপি পরে আছে সে, যেটার ফাঁক দিয়ে তার পুরু চশমাটা দেখা যাচ্ছে শুধু।

'চেহারা ঢেকে রেখেছ কেন? কোনো সমস্যা?' পাশে বসতে বসতে বললো তোমোহিকো।

তার কথা বলার আগেই ওয়েটার চলে আসায় থেমে গেল সে। তোমোহিকো তাকে ফিরিয়ে দিচ্ছিলো, এমন সময় ইউকো বলে উঠলো, 'কিছু একটা অর্ডার করো। কথা আছে তোমার সাথে।'

ভ্রু তুলে তাকালো তোমোহিকো। তার গলার স্বরে দুশ্চিন্তা মিশে রয়েছে। একটা ঠান্ডা কফি অর্ডার দিলো সে।

ক্যাম্পারি সোডার জন্য হাত বাড়িয়ে দিলো ইউকো। প্রায় অর্ধেকের বেশি খাওয়া হয়ে গেছে এরমধ্যে। একটা নিঃশ্বাস ছাড়লো সে। 'কত দিনের জন্য স্কুল ছুটি দিয়েছে?'

'এই সপ্তাহের শেষ পর্যন্ত।'

'গ্রীষ্মের ছুটিতেও কাজ করতে চাচ্ছো তুমি?'

'মানে আমার প্রতিদিনের কাজের কথা বলছো?'

একটু হাসলো সে। 'হ্যাঁ, সেটাই। এছাড়া, আর কী নিয়ে বলবো?'

'না, করার মতো কোনো পরিকল্পনা তো করিনি। সময় লাগে অনেক, সেই তুলনায় টাকা কম। করে কী লাভ?'

মাইল্ড সেভেন ব্র্যান্ডের সিগারেট বের করে একটা মুখে ভরলো সে। বিরক্তির ছাপ স্পষ্ট ফুটে উঠছে তার চেহারায়।

এরমধ্যে তোমোহিকোর ঠান্ডা কফি চলে এলো। এক চুমুকেই অর্ধেকটা শেষ করে দিলো সে। অনেকটা তেষ্টা পেয়েছিলো অবশ্য তার।

'আচ্ছা, আমরা সব সময়ের মতো এখন আর রুমে যাচ্ছি না কেন?' ধীর গলায় জিজ্ঞেস করলো তোমোহিকো।

ইউকো তার সিগারেটে একটা টান দিয়ে বেশ খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে দিলো বাইরে। এরপর অ্যাশট্রেটা হাতে নিয়ে ছাই ফেলতে লাগলো, যদিও সিগারেটের ডগায় খুব সামান্যই ছাই ছিলো।

'একটা সমস্যা হয়েছে।' ক্যাফেটার দিকে একপলক দেখে নিয়ে সরাসরি ওর দিকে তাকালো সে। 'আমার মনে হয় বুড়ো ভামটা টের পেয়ে গেছে।'

'কোন বুড়োটা?'

'আমার স্বামী, ইডিয়ট।' কাঁধ ঝাঁকালো সে।

'মানে আমাদের ব্যাপারে জেনে গেছে তা বলছো?'

'সবকিছুই জেনে যায়নি। তবে সবটা জানা এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র।'

'বলছো কী...' তোমোহিকোর চেহারা রক্তবর্ণ হয়ে গেল সাথে সাথে।

'আমারই ভুল হয়েছে,' বললো ইউকো। 'আমার আরো সতর্ক থাকা উচিত ছিলো।'

'কীভাবে জানলো সে?'

'আমার স্বামীর এক বন্ধু আমাকে নাকি অল্পবয়সি এক ছেলের সাথে একটু বেশি ঢলাঢলি করতে দেখে ফেলেছে। বুঝতেই পারছো।'

চারপাশে তাকালো তোমোহিকো, হঠাৎ করে ক্যাফের ভেতরের সবাইকে সতর্কতার সাথে দেখছে সে।

মুখ টিপে হাসলো ইউকো। 'তার মতে, তার বন্ধুর বলার আগে থেকেই নাকি সে সন্দেহ করছিলো আমাকে। অন্য রকম আচরণ করছিলাম নাকি আমি। অবশ্য, ও ঠিকই বলেছে। কারণ তোমার সাথে দেখা হওয়ার পর থেকে আমি আসলেই অন্য রকম হয়ে গেছি। হয়তো এর জন্যই সতর্ক থাকতে ভুলে গেছিলাম,' টুপির উপর দিয়েই মাথা চুলকাতে চুলকাতে বললো সে।

'তো সে কি জিজ্ঞেস করেছে নাকি এ বিষয়ে?'

'ও শুধু জানতে চেয়েছে কে ঐ ছেলে। নাম জানতে চেয়েছিলো আর কি।'

'তুমি বলে দিয়েছ তাকে?'

'কী বলছো এসব? এতটাও বোকা নই আমি।'

'তা বলছি না আসলে।' বাকি কফিটুকুও খেয়ে ফেললো তোমোহিকো। তৃষ্ণা মেটেনি তখনো। এক গ্লাস পানি সামনে রাখা ছিলো, সেটাও গিলে নিলো ঢকঢক করে।

'আমি অভিনয় করে যাচ্ছিলাম শুধু। কারণ ওর কাছে কোনো প্রমাণ ছিলো না। মানে এখন পর্যন্ত না। যদিও খুব তাড়াতাড়ি হয়তো সে জেনে যাবে। ওকে তো চিনি...হয়তো এবার প্রাইভেট ডিটেকটিভ নিয়োগ দেবে।'

'এ তো খুবই বাজে অবস্থা।'

'একদম। আরেকটা জিনিসও আমি খেয়াল করেছি।'

'আবার কী?'

'আমার ঠিকানার বইটা। আমার মনে হয় লুকিয়ে লুকিয়ে সে ওটা দেখেছে। আমার ড্রেসারের ভেতর লুকিয়ে রেখেছিলাম ওটা। মনে হচ্ছে ও-ই এই কাজ করেছে।'

'এখন এটা বোলো না যে সেখানে আমার নামও তুমি লিখে রেখেছিলে।'

'না, না, কোনো নাম লিখিনি। তবে ফোন নাম্বার লেখা ছিলো। যদিও ওটা দিয়েই সে হয়তো উদ্ধার করে ফেলেছে সবকিছু।'

'কারো নাম্বার থেকে কি তার নাম-ঠিকানা জানা সম্ভব নাকি?'

'জানি না তো। কোনো কিছুর পেছনে লেগে থাকলে সবকিছুই বের করা সম্ভব। আর আমার স্বামী এসবে বেশ পটু।'

তোমোহিকো তার মাথায় ইউকোর স্বামীর একটা ছবি ভাবতে গিয়ে ভয়ে কিছুটা নেতিয়ে গেল। ও কখনোই ভাবেনি একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের রাগের মূল কারণ হলে কেমন লাগে। এখন সে জানতে পেরেছে, কিন্তু বিষয়টা তার মোটেও পছন্দ হচ্ছে না।

'তো কী করবো এখন?' জিজ্ঞেস করলো তোমোহিকো। তার গলা আবার শুকিয়ে গেছে।

'আমার মনে হয় আমাদের কিছু দিনের জন্য দেখা না করাই ভালো। অন্তত কয়েকটা দিন দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ করা দরকার।'

হালকা মাথা নাড়লো তোমোহিকো। হাই স্কুলে পড়েও তার কথার মর্মার্থ বুঝতে কষ্ট হলো না তোমোহিকোর। 'তবে আজ যেহেতু এখানে এসেই পড়েছি,' ক্যাম্পারি সোডার শেষটুকু পান করে বললো ইউকো, 'তাহলে কেননা আরেকবার হয়ে যাক?'

ওদের মধ্যে সম্পর্কটার স্থায়ীত্ব এক মাসেরও বেশি। এর শুরু অবশ্য সেই অ্যাপার্টমেন্ট থেকেই হয়েছিলো। ঐ বিনুনি-বাঁধা মহিলাটাই ইউকো হানাওকা। এমন না যে ও তার প্রেমে পড়ে গেছে, নিজেকেই বুঝিয়েছে তোমোহিকো। ও শুধু সেই প্রথম দিনের পাওয়া আনন্দটা ভুলতে পারছে না। যখনই হস্তমৈথুন করতো, তখনই মাথার ভেতর ইউকোর চেহারা ভাসতো। সেই যৌনকর্মের স্পষ্ট ছবি তার মাথা থেকে অন্য সব কল্পনাকে উড়িয়ে দিয়েছিলো। প্রথম দিনের সেই কর্মের পর তিন দিনের দিন সে ফোন করেছিলো তাকে। ইউকোও দেখা করার জন্য আগ্রহী হয়ে ছিলো।

তোমোহিকো কোনো একটা হোটেলের শিট থেকে তার পুরো নাম জেনেছিলো। মহিলার বয়স বত্রিশ বছর। তোমোহিকো তার নিজের ব্যাপারেও সব খুলে বলেছে। কী নাম, কোথায় পড়ে, ফোন নাম্বার ইত্যাদি। রিওকে দেওয়া সেই প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে থাকার চেষ্টা করতো সে। আসলে বাস্তবতা হলো বিছানায়

ইউকোর দক্ষতা দেখে সবকিছু গুলিয়ে যেত তার। সহজভাবে চিন্তাই করতে পারতো না।

'আমার বন্ধুই আমাকে সেদিন সেই পার্টিতে নিয়ে গেছিলো,' ইউকো বলেছিলো তাকে। 'ঐ যে ছোট চুলের সেই মেয়েটা, চিনেছ? যাক গে, মনে হচ্ছে সে এর আগেও কয়েকবার করেছে এসব। কিন্তু ওটাই আমার প্রথম ছিলো। খুবই ভয় পাচ্ছিলাম। কিন্তু পরে খুবই উত্তেজিত হয়েছিলাম তোমাকে পেয়ে।' মহিলা ভালোই জানতো কী করে তোমোহিকোর মন গলে যায়।

তোমাহিকো বেশ অবাক হয়েছিলো এটা শুনে যে সেই পার্টির জন্য ইউকোকে বিশ হাজার ইয়েন খোয়াতে হয়েছিলো। এর মানে হলো রিও অর্ধেকেরও বেশি মেরে দিয়েছে। অবশ্য, রিওকে দেখলে বোঝা যায় সে ব্যবসায়ীদের মতোই চিন্তাভাবনা করে।

সপ্তাহে দুই-তিনবার দেখা করতো তারা। মহিলার স্বামী সব সময়ই এটা-ওটা নিয়ে ব্যস্ত থাকতো। যার কারণে কোনো রকম সন্দেহজনক কিছু করা ছাড়াই চলে আসতে পারতো সে। আর যাওয়ার পথে মহিলা পাঁচ হাজার করে দিয়ে বলতো, এটা তার 'ভাতা'।

যদিও তোমোহিকো জানতো যে অন্যের স্ত্রীর সাথে এক বিছানায় শোয়া অন্যায়, কিন্তু তবুও একজন নারীর কাছ থেকে পাওয়া এই মনোযোগ আর সেক্সের নেশায় ডুবে ছিলো সে। তাদের এই দৈনন্দিন কাজ চলতেই থাকলো, এমনকি তার পরীক্ষা চলে আসার পরও। যা তার এখনকার খারাপ ফলাফলের অন্যতম কারণ।

***

'বুঝতে পারছি না তোমাকে না দেখে থাকতে পারবো কি না,' বললো তোমোহিকো। বিছানায় শুয়ে আছে তারা।

'তুমি ভাবছো আমি পারবো বুঝি?' তার নিচে শুয়ে থাকা অবস্থায় বললো ইউকো।

'আচ্ছা, আর ঐ ব্যাপারে কিছুই কি করার নেই?'

'জানি না। মনে হয় কোনো কিছু করার মতো উপযুক্ত সময় এখনো আসেনি।'

'তো কখন হবে সেই উপযুক্ত সময়?'

'তাও জানি না। যত তাড়াতাড়ি হবে ততই ভালো। আমার বয়স কমছে না তো।'

তোমোহিকো ইউকোর শরীরটাকে আবার জড়িয়ে ধরে কাজে লেগে পড়লো এই ভেবে যে এটাই হয়তো তাদের শেষ সেক্স। কোনো কিছু বাকি রাখতে চাচ্ছিলো না এবার সে। শরীরের সমস্ত শক্তি ঢেলে দিচ্ছিলো তাতে। বারবার শীৎকার দিচ্ছে ইউকো। পিঠটাকে ধনুকের মতো বাঁকিয়ে নিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে দিচ্ছে প্রতি ধাক্কায়।

তৃতীয়বারের মতো করা শেষে ইউকো তার স্বাভাবিক গলায় বললো যে ওকে প্রস্রাব করতে যেতে হবে।

'আচ্ছা,' আরেক পাশে সরে বললো তোমোহিকো।

উঠে বসলো ইউকো। উলঙ্গ হয়ে আছে সে। আচমকা একটু খাবি খেয়ে আবার শুয়ে পড়লো। তোমোহিকো ভাবলো হয়তো নিস্তেজ হয়ে পড়েছে সে। কারণ এর আগেও এমনটা অনেকবার হয়েছে। কিন্তু এবার কোনো রকম নড়াচড়া করছে না। ঘুমিয়ে পড়লো কি না ভেবে কাঁধে আলতো করে ধাক্কা দিলো। কোনো সাড়া নেই।

তোমোহিকোর মাথায় ভয়ানক একটা চিন্তা জেগে উঠলো হঠাৎ। বিছানা ছেড়ে উঠে সে তার চোখের পাতায় ডলতে লাগলো যাতে হুঁশ ফেরে। কোনো লাভ হলো না।

কাঁপুনি শুরু হয়ে গেছে তোমোহিকোর শরীরে।

না, না, না। এ হতে পারে না!

কাঁপতে থাকা হাতটা ধীরে ধীরে ইউকোর বুকের উপর রাখলো সে। না, কোনো রকম হৃৎস্পন্দনের শব্দ নেই।

***

তোমোহিকো প্রায় বাড়ি পৌঁছে যাওয়ার পরে খেয়াল করলো, তার পকেটে সেই হোটেলের চাবি রয়ে গেছে। দাঁত কিড়মিড় করে উঠলো সে। যদি চাবিটা হোটেলে না থাকে, তবে হোটেল কর্তৃপক্ষ নিঃসন্দেহে কিছু না কিছু নিয়ে সন্দেহ করবে। মাথা নাড়লো সে।

ওরা অবশ্যই সন্দেহ করবে, যখন দেখবে একটা মহিলার মৃতদেহ বিছানায় পড়ে আছে। তোমোহিকো ভেবেছিলো হোটেলে বসেই হাসপাতালে একটা ফোন করবে। কিন্তু এতে করে সে যে তার সাথেই ছিলো এটা স্বীকার করতে হবে। যার কারণে করেনি সে। যদিও ডাক্তার ডেকেই বা কী হবে, ইউকো এরমধ্যেই চলে গেছে।

নিজের যা কিছু ওখানে ছিলো তা গুছিয়ে নিয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে যায় তোমোহিকো। যাওয়ার পথে কারো সাথেই দেখা করেনি।

প্রায় সাবওয়ে লাইনের কাছাকাছি এসে তার মনে হয়েছিলো পালিয়ে যাওয়াটা কোনো সমাধান এনে দেবে না। কারণ একজন ইতোমধ্যে তার সম্পর্কে জেনে গেছে। আর সে ওর জন্য সবার থেকে খারাপ: ইউকোর স্বামী। দুইয়ে দুইয়ে চার মিলিয়ে সে ঠিকই বুঝে যাবে যে তার স্ত্রীর সাথে একটা হাই স্কুলের বাচ্চা ছিলো, যার নাম তোমোহিকো সোনোমুরা। এরপর পুলিশে ফোন দিতে আর সময় নষ্ট করবে না। আর পুলিশ নেমে পড়লে সত্যিটা বের করতে বেশি একটা সময় খরচ করতে হবে না।

সবকিছু শেষ হয়ে গেছে, ভাবলো সে। *একবার এসব কথা ছড়িয়ে পড়লে আমার জীবন সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যাবে।*

বাড়িতে পৌঁছানোর পর দেখলো তার মা আর ছোট বোন রাতের খাবার খাচ্ছে। খেয়ে এসেছে বলে নিজের রুমে চলে গেল সে। ডেস্কে বসতে বসতে রিওর কথা ভাবলো একবার।

পুলিশ যদি ইউকোর ব্যাপারটা জেনে যায়, তবে কোনো না কোনোভাবে সেই অ্যাপার্টমেন্টের কথাও জেনে যাবে। যেটা রিওর জন্যেও একটা খারাপ খবর। সে খোদ অপ্রাপ্তবয়স্কদের দিয়ে পতিতাবৃত্তি চালাচ্ছে। দালাল হিসেবে কাজ করেছে সে। যদিও এখানে অল্পবয়সি ছেলে আর মধ্যবয়সি নারী জড়িয়ে আছে, তবুও এটা তার ঘাড়ে গিয়েও পড়বে।

ওর সাথে কথা বলা উচিত। ঘর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে হলরুমে থাকা ফোনটার দিকে যেতে লাগলো সে। বসার ঘর থেকে টেলিভিশনের শব্দ আসছে। সে নিজেও মনে মনে চাচ্ছিলো যেন প্রোগ্রামটা আরেকটুখানি আনন্দদায়ক হয় যাতে তার মা অথবা বোন পাঁচ মিনিটের জন্য সেখানে মেতে থাকে।

ওপাশ থেকে বেশ দ্রুতই ফোনটা ধরলো রিও। 'কীসের জন্য ফোন করেছ তুমি?' তার স্বর শুনেই মনে হচ্ছিলো সে কিছু একটা আঁচ করতে পেরেছে।

'খুব খারাপ কিছু একটা হয়ে গেছে,' জিহ্বা শুকিয়ে যাওয়ার আগে এতটুকুই বলতে পারলো তোমোহিকো।

'কেমন খারাপ?'

'ফোনে বলা যাবে না। অনেক বড় কাহিনি।'

চুপ করে রইলো রিও। শেষমেশ মুখ খুলে বললো, 'সেই মহিলাদের সাথে কিছু নয়তো আবার?'

মাথা কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছে তোমোহিকোর। ওপাশ থেকে শুধু রিওর দীর্ঘশ্বাসটা শুনতে পেল সে।

'আচ্ছা, আমাকে বলতে দাও। ঐ বিনুনি-বাঁধা মহিলাটা, না?'

'হ্যাঁ।' আবার নিঃশ্বাস ছাড়লো রিও।

'এর জন্যই ভাবছিলাম কেন আসছে না সে আর। যাক গে, কী সমস্যা হয়েছে? তোমার সাথে আলাদা চুক্তি করে নিয়েছে নাকি?'

'না, সেরকম কিছু না।'

'তাহলে কী?'

চিবুকটা চুলকালো তোমোহিকো। বুঝতে পারছে না বলা উচিত হবে কি না।

'আচ্ছা, যাই হোক, তুমি ঠিকই বলেছ। এটা ফোনে বলার মতো বিষয় না। কোথায় আছো এখন?'

'বাড়িতে।'

'বিশ মিনিটের মধ্যে আসছি।'

কোনো রকম জবাবের অপেক্ষা না করেই কেটে দিলো রিও। নিজের ঘরে গিয়ে বিষয়টা নিয়ে আরেকবার ভাবলো তোমোহিকো। কিন্তু তার মাথা শূন্য হয়ে আছে, আর সময়ও চলে যাচ্ছে।

একদম কাঁটায় কাঁটায় বিশ মিনিট পরে এলো রিও। দরজার কাছে গিয়ে খুলে দিলো তোমোহিকো। 'বাইকও চালাও তুমি?' মাথা দুলিয়ে রিওর বাইকের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো সে।

'এই মুহূর্তে এতে কিছু যায় আসে না। ভেতরে চলো।' তোমোহিকোকে সরিয়ে ভেতরে ঢুকলো রিও।

দুজনে রুমে যাওয়ার পর নিজের ডেস্কে বসে পড়লো তোমোহিকো। মেঝেতে রাখা ছোট একটা কভারের পাশে হাঁটু গেড়ে বসলো রিও। কভারটা আসলে তোমোহিকোর কম্পিউটার ঢেকে রাখার কভার। যে-কেউ তার বাসায় এলে ওটাই প্রথমে দেখাতো সে।

'বলো এবার,' বললো রিও।

'বুঝতে পারছি না কোথা থেকে শুরু করবো।'

'সেখান থেকে শুরু করো, যেখান থেকে তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছ।'

তোমোহিকো গলাটা একটু ঝেড়ে নিয়ে পুরো ঘটনাটা বললো রিওকে। রিও কোনো রকম অভিব্যক্তি প্রকাশ না করে শুনতে লাগলো সব। কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিলো যে তার রাগ উঠছে। যখন আজকের ঘটনাটা খুলে বললো তোমোহিকো, তখন তার চোয়াল ঝুলে পড়লো একেবারে।

'মরে গেছে? মানে আসলেই মরে গেছে নাকি?'

'হ্যাঁ, আমি নিজে যাচাই করেছি। তাও কয়েকবার। আমি নিশ্চিত মারা গেছে সে।'

রিও থুতু ফেললো একবার। 'মাতাল মাগি একটা।'

'কী?'

'শুনেছ কী বলেছি আমি। হয়তো অতিরিক্ত উত্তেজিত হয়ে গেছিলো সে, যার কারণে হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেছিলো। চল্লিশ বছর বয়সে কলেজ পড়ুয়াদের মতো মদ খেলে এমনই হয়।'

'কিন্তু তার বয়স তো সবে বত্রিশ!' বললো তোমোহিকো।

বিরক্তির একটা চাহনি দিলো রিও। 'গাধা! আমি যা বলছি ঠিকই বলছি। ঐ বুড়ি এমনই করে ছেলেদেরকে পেলে। তোমার আগে ওর সাথে আরো পাঁচজনের দেখা করিয়েছি আমি।'

'কিন্তু আমি তো–ও কখনো বলেনি–'

'আচ্ছা, তাই নাকি?' রিও হতাশার একটা চাহনি দিলো তোমোহিকোর দিকে। তারপর দ্রুতই সেই চাহনি হতাশা থেকে ক্রোধে রূপ নিলো। 'কোথায় আছে সে এখন?'

তোমোহিকো সবটুকু বর্ণনা করলো–কীভাবে কী হয়েছে সব। পুলিশের হাত থেকে বাঁচা যাবে না কোনোমতেই, এটাও বলে দিচ্ছিলো বারবার।

গুঙিয়ে উঠলো রিও। 'আচ্ছা, আমার মনে হয় পরিস্থিতি বুঝতে পেরেছি আমি। যদি তার স্বামী তোমার পেছনে লেগে থাকে, তো পুলিশ এসে তোমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেই। আর তোমারও তখন ওদেরকে প্রশ্ন করার সুযোগ দিতে হবে।' রিও এমনভাবে কথাটা বললো যে মনে হচ্ছিলো একধরনের আদেশ দিচ্ছে।

'জানি ওটা,' মুখ খুললো তোমোহিকো। 'কিন্তু আমাকে যদি বলতেই হয়, তবে সবটা বলে দেবো আমি, এমনকি অ্যাপার্টমেন্টের বিষয়েও।'

মাথাটা একবার চুলকালো রিও। 'ওটা কোনো কাজে দেবে না। বরং বিষয়টাকে আরো ঘোলাটে করে দেবে।'

'কিন্তু ওটার কথা না বললে কীভাবে ওদেরকে বলবো যে আমাদের কোথায় দেখা হয়েছিলো?'

'সহজ বিষয়। তাদেরকে বলবে যে তুমি শিনসাইবাশি স্টেশনে ঘুরছিলে, এমন সময় মহিলাটা এসে তোমাকে নিয়ে গেছে।'

'এত সুন্দর করে সাজিয়ে মিথ্যা বলতে পারবো না আমি। মানে যদি ওরা আমাকে রিমান্ডে নিয়ে সবকিছু বের করে ফেলে তো?'

'আচ্ছা, যদি এমনই হয়, তবে,' হাত দিয়ে হাঁটুতে হালকা থাপ্পড় দিয়ে বললো রিও, 'আমার পেছনে থাকা লোকগুলোকে দিয়ে কিছু একটা করাতে হবে।'

'মানে?'

'তুমি ভাবছো আমি এই ব্যবসা একা চালাই?'

'গ্যাং?'

'ওরকমই কিছু একটা।' ঘাড়টা দুপাশে ঘুরিয়ে ফোটালো রিও। এরপরই তড়িদ্‌গতিতে দুহাতে তোমোহিকোর কলারটা চেপে ধরে বললো, 'শোন, মাদারচোত, তোকে যতটুকু বলতে বলবো, ঠিক ততটুকুই বলবি। নইলে পুলিশ আর কতটা খারাপ, তার থেকেও খারাপ লোকের সাথে, মানে একদম যমের সাথে দেখা করিয়ে ছাড়বো।'

ঢোক গিললো তোমোহিকো।

কলার ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো রিও। তার কাজ শেষ।

'রিও...'

'কী?'

'আমি, মানে–কিছু না।' মেঝের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো তোমোহিকো।

ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে এগিয়ে যেতে নিলো রিও। তোমোহিকোর কম্পিউটারের সেই কভারের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললো, 'শোন, এটা তোর?'

'হ্যাঁ।'

'খারাপ না,' ভালোভাবে খেয়াল করতে করতে বললো সে। 'প্রোগ্রামিং করিস তুই?'

'মূলত বেসিক ল্যাঙ্গুয়েজ জানি।'

'এসেম্বলি ভাষা কতটুকু পারিস?

'কিছুটা,' বললো সে। রিওকে কম্পিউটার সম্পর্কে জানতে দেখে অবাক হচ্ছে সে।

'বড় কিছু লিখেছিস এখনো?'

'দুয়েকটা গেম শুধু, এছাড়া তেমন কিছু না।'

'দেখি, দেখা তো।'

'কীহ! এখন, এই সময়ে?'

'দেখা বলছি,' আবারো তোমোহিকোর কলার চেপে ধরে বললো রিও। এবার অবশ্য এক হাত দিয়ে ধরেছে।

সাদা হয়ে গেছে তোমোহিকোর মুখ। বুকশেলফ থেকে একটা বই বের করে রিওর হাতে দিলো সে। বইটার ভেতর ফ্লো চার্ট এবং কোড দিয়ে ভরা, যা সে এত দিন যাবৎ লিখে এসেছিলো। অনেকক্ষণ যাবৎ রিও পড়তে লাগলো বইটা। এরপর আস্তে করে বইটা বন্ধ করে দিয়ে নিজের চোখটাও বন্ধ করলো। কোনো রকমের নড়াচড়া না করে চুপচাপ বসে পড়লো সে। সে ঠিক আছে কি না জিজ্ঞেস করবে ভেবেছিলো তোমোহিকো, কিন্তু সেই সময়েই খেয়াল করলো রিওর ঠোঁট নড়ছে। মনে হচ্ছে বিড়বিড় করে নিজের সাথেই কথা বলছে সে।

'তোমোহিকো,' হঠাৎ বলে উঠলো রিও। 'আমার তোমার সাহায্য লাগবে।'

'হ্যাঁহ?'

একদম মুখ বরাবর তাকিয়ে রিও বললো, 'শোনো, আমি তোমাকে যেমনটা বলবো, ঠিক তেমনটা করলেই এসব ঝামেলা থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে তুমি। পুলিশের সাথে কোনো কথাই বলতে হবে না তোমাকে। ঐ মহিলার মৃত্যুর সাথে তোমার কোনো যোগাযোগই থাকবে না।'

'কীভাবে?'

'আমার কথামতো চলতে পারবে?'

'হ্যাঁ, তাতে সমস্যা হবে না,' বললো তোমোহিকো। 'তোমার রক্তের গ্রুপ কী?'

'কীহ?'

'বললাম, তোমার রক্তের গ্রুপ কী? কানে কম শোনো নাকি?'

'ও।'

'চমৎকার। ঢেকে নিয়েছিলে না করার সময়?'

'কনডম? হ্যাঁ, তা তো নিয়েছিই।'

'বেশ।' উঠে দাঁড়ালো রিও। হাতটা তোমোহিকোর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললো, 'চাবিটা দাও।'

***

এর দুই দিন পরে গোয়েন্দারা তোমোহিকোর বাসায় এলো। ওদের মধ্যে চল্লিশোর্ধ্ব একজনের পরনে বুকখোলা, সাদা কলারওয়ালা শার্ট, আরেকজনের পরনে পোলো।

'আপনার ছেলে তোমোহিকোর সাথে একটু কথা বলতে চাই আমরা,' কলারওয়ালা লোকটা তার মাকে বললো। অবশ্য, কী বিষয়ে কথা বলতে চায় তা বলেনি। তোমোহিকোর মা আতঙ্কে জবুথবু হয়ে গেল পুলিশ দেখে।

তোমোহিকোকে পাশের একটা পার্কে নিয়ে গেল তারা। সূর্য ততক্ষণে ডুবে গেছে, কিন্তু সারা দিনের তাপের কারণে বেঞ্চটা তখনো গরম। কলারওয়ালার পাশে বসলো তোমোহিকো। পোলো শার্ট পরা লোকটা দাঁড়িয়ে রইলো তাদের দিকে মুখ করে। আসার সময় ওদেরকে বেশি কিছু বলা থেকে বিরত থেকেছে তোমোহিকো। ওদের সামনে ঠিক ততটাই নার্ভাসনেস প্রকাশ করছে, যতটা সে নিজে এখন আছে। 'হাই স্কুলের কোনো ছাত্রের জন্য গোয়েন্দাদের সাথে কথা বলা কোনো ব্যাপারই না–এরকম আচরণ করলে ওদের সন্দেহ বেড়ে যাবে।' রিও তাকে কী করতে হবে এটা যখন বলছিলো, তখন এই কথাটাও বলেছিলো।

কলারওয়ালা গোয়েন্দাটা একটা ছবি বের করে তাকে দেখিয়ে বললো, 'তুমি চেনো এই মহিলাকে?'

ছবিটা ইউকোর। কোনো এক ছুটিতে ঘুরতে গিয়ে তোলা হয়েছিলো সম্ভবত। সমুদ্রকে পেছনে রেখে তোলা হয়েছে। ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে হাসছিলো সে। জীবিত অবস্থায় ইউকোর চুল যেমন দেখেছে, ছবিটাতে তার থেকে একটু বেশিই ছোট লাগছে।

'এটা তো মিসেস হানাওকা,' বললো তোমোহিকো।

'কিন্তু তুমি তো তার প্রথম নামটাও ভালো করেই জানো, তাই না?'

'মনে হচ্ছে ইউকো ছিলো।'

'একদম, তার নাম ইউকো হানাওকা।' ছবিটা সরিয়ে নিলো সে। 'কীভাবে চেনো তুমি তাকে?'

'মানে কী?' একটু বিড়বিড় করলো সে। 'তাকে এমনিতেই চিনি, এই-ই যা।'

'এজন্যই জিজ্ঞেস করছি কীভাবে চেনো তুমি তাকে,' কলারওয়ালা লোকটা নরম গলায় বললেও বিরক্তির ছাপ স্পষ্ট পাওয়া গেল তার কথায়।

'শোনো, একটা উপদেশ দেই,' পোলো শার্ট পরা লোকটা বলে উঠলো। 'সত্যিটাই বোলো, কেমন?' একটা জঘন্য হাসি দেখা গেল তার মুখে।

'শিনসাইবাশির দিকে মাসখানেক আগে গেছিলাম। সেখানেই কথা বলেছিলো সে আমার সাথে।'

'কী বলেছিলো?'

'যে আমি একটু চা খাওয়ার জন্য ফ্রি আছি কি না।'

নিজেদের মধ্যে একবার দৃষ্টিবিনিময় করলো গোয়েন্দারা। 'গেছিলে তুমি?' কলারওয়ালা জিজ্ঞেস করলো।

'হ্যাঁ, বলেছিলো তার পক্ষ থেকে খাওয়াচ্ছে সে।'

পোলো শার্ট পরা লোকটা নাক দিয়ে শব্দ করলো।

'বুঝলাম চা খেলে, তারপর?'

'আর কিছু না। আমরা ক্যাফেতে বসে চা খাই কিছুক্ষণের জন্য, এরপর আমি বাসায় চলে আসি।'

'আচ্ছা। মনে হচ্ছে না ঐ একবারই তোমার সাথে দেখা হয়েছে তার, নাকি?'

'না...ওটার পরে আরো দুবার তার সাথে আমার দেখা হয়েছে।'

'সেটা কীরকম করে হয়েছে?'

'একদিন ফোন করে বললো সে মিনামি এসেছে। আমার হাতে সময় আছে কি না–একটু চা-টা খাওয়ার জন্য আর কি।'

'তোমার মা-ই ফোনটা তুলেছিলো?'

'না, দুবারই আমি তুলেছিলাম।'

উত্তরগুলো গোয়েন্দার যে পছন্দ হচ্ছে না তা বোঝা যাচ্ছে। সে তার নিচের ঠোঁটটায় কামড় দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'তো পরে গেছিলে তুমি?'

'হ্যাঁ।'

'কী হয়েছিলো তারপর? এবারও বোলো না যে শুধু চা-ই খেয়েছ তোমরা।'

'আসলে,' তার দিকে তাকিয়ে বললো তোমোহিকো, 'আমি ঠান্ডা কফি খেয়েছিলাম সেদিন। একটু-আধটু কথাও বলেছিলাম। এরপর আমি বাড়িতে চলে আসি।'

'আর কিছুই করোনি?'

'না তো! আচ্ছা, আমার কি আরো কিছু করা দরকার ছিলো তখন?'

কলারওয়ালা গোয়েন্দাটা তার মাথা চুলকাতে চুলকাতে তোমোহিকোর দিকে তাকালো একবার। চেহারার ভাষা বোঝার চেষ্টা করছে সে। 'আমার জানামতে তোমার স্কুলে ছেলেমেয়ে একসাথে পড়ে। দুচারটা গার্লফ্রেন্ড তোমার থাকতেই পারে। কিন্তু ওরকম বয়স্ক মহিলাদের সাথে মিশতে কেন?'

'ফ্রি সময় ছিলো তখন। আমার এছাড়া তো আর কোনো কাজ ছিলো না।'

ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠলো অফিসারটা। 'আর নগদ টাকার ব্যাপারে? এরকম কিছু দিয়েছিলো সে তোমাকে?'

‘আমি কিছুই নিইনি, স্যার।’

‘মানে সে তোমাকে দিতে চেয়েছিলো, কিন্তু তুমি নাওনি?’

‘হ্যাঁ। দ্বিতীয়বার যখন দেখা করলাম, তখন মহিলা পাঁচ হাজার ইয়েন দিতে চেয়েছিলো, কিন্তু আমি নিইনি।’

‘কেন নাওনি?’

‘আসলে অতগুলো টাকা পাওয়ার মতো কোনো কাজ করিনি বলেই নিইনি।’

মাথাটা হালকা নাড়িয়ে পোলো শার্ট পরা লোকটার দিকে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকালো অফিসারটা।

‘যে ক্যাফেতে দেখা করেছিলে সেটা কোথায়?’ পোলো শার্টওয়ালা জিজ্ঞেস করলো।

‘নিউ জাপান এয়ার হোটেলের নিচ তলায়।’ এখানে আর মিথ্যা বললো না সে। কারণ তার বিশ্বাস ইউকোর স্বামীর কোনো না কোনো বন্ধু তাদেরকে সেখানে দেখেছিলো সেদিন।

‘তার মানে তুমি বলতে চাচ্ছো একটা হোটেলে তোমরা দুজন গেছিলে শুধু চা খেতে? এরপরে কোনো রুমে উলটা-পালটা কিছু করতে যাওনি?’ এবার বেশ রুক্ষ স্বরেই জিজ্ঞেস করলো পোলো শার্টওয়ালা। যে হাই স্কুল পড়ুয়া ছেলে গৃহিণীদের সময় দেয় তাদের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে, তার সাথে অত ভালো ব্যবহার করার দরকার দেখছে না সে।

‘না, আমরা শুধু চা খেয়েছি আর কথা বলেছি। যেমনটা আগেই বলেছি আমি।’

পোলো শার্টওয়ালা চুকচুক করে উঠলো।

‘পরশু রাতে কী করেছিলে?’ কলারওয়ালা জিজ্ঞেস করলো। ‘স্কুল থেকে ফিরে কোথায় গেছিলে?’

‘পরশু দিন?’ ঠোঁটটা জিভ দিয়ে ভিজিয়ে নিলো তোমোহিকো। এখানেই আসল খেলাটা খেলতে হবে। ‘আমি আশাহিয়াতে সময় কাটাচ্ছিলাম। টেনোজিতে যে বইয়ের দোকানটা আছে সেখানে।’

‘আর বাড়ি গেছিলে কখন?’

‘সাড়ে সাতটা নাগাদ।’

‘আর তারপর থেকে বাড়িতেই ছিলে?’

‘হ্যাঁ।’

‘পরিবারের সদস্য ছাড়া অন্য কারো সাথে দেখা করেছিলে?’

‘আমার এক বন্ধু এসেছিলো সেদিন রাত আটটা নাগাদ। আমার ক্লাসেই পড়ে সে। নাম রিও।’

কলারওয়ালা একটা নোট বের করে টুকে নিলো নামটা। ‘কতক্ষণ ছিলো তোমার বাড়িতে সে?’

'নয়টা পর্যন্ত।'

'নয়টা। এরপর কী করেছিলে তুমি?'

'টেলিভিশন দেখেছিলাম এরপর। আর একটা ফ্রেন্ডের সাথে কথা বলেছিলাম ফোনে।'

'কার সাথে?'

'মোরিশিতা নামের একটা ছেলের সাথে। মিডল স্কুলের বন্ধু।'

'কখন কথা বলেছিলে তার সাথে?'

'এগারোটা নাগাদ ফোন করেছিলো সে। তার মানে মধ্যরাত অবধি কথা বলেছিলাম আমরা।'

'ও-ই ফোন করেছিলো?'

'হ্যাঁ।' এখানে একটা চাল চেলেছে সে। আসলে প্রথমে তোমোহিকোই ফোন দিয়েছিলো তাকে। সে জানতো ঐ সময়ে ছেলেটা বাড়িতে থাকবে না। ওর মাকে বলে দিয়েছিলো যখন বাড়িতে আসবে সে, তখন যেন তাকে একটা ফোন দেয়। এসবই রিওর বুদ্ধিতে করেছিলো সে। কলারওয়ালার ভ্রুদুটো কুঁচকে যেতেই মোরিশিতার নাম্বার চাইলো সে। তোমোহিকো তখনই দিয়ে দিলো কারণ নাম্বারটা তার মুখস্থই ছিলো।

'আচ্ছা, আরেকটা প্রশ্ন ছিলো। তোমার রক্তের গ্রুপ কী?' কলারওয়ালা জিজ্ঞেস করলো।

'আমার রক্তের গ্রুপ? ও। কিন্তু কেন?'

'ও? নিশ্চিত তুমি?'

'হ্যাঁ, আমার মা-বাবারও একই।'

তোমোহিকো লক্ষ করলো গোয়েন্দাদের আগ্রহ তার উপর থেকে কিছুটা পড়ে গেছে। তার মনে আছে রিও-ও তাকে তার রক্তের গ্রুপ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলো। কিন্তু কেন করেছিলো তা বলেনি।

'উম,' তড়িঘড়ি করে বললো তোমোহিকো, 'মিসেস হানাওকার কি কিছু হয়েছে?'

'পত্রিকা পড়ো না তুমি?' কলারওয়ালা জিজ্ঞেস করলো।

তোমোহিকো ঠিকই একটা কলাম দেখেছিলো সকালবেলা, কিন্তু এখন মাথা ঝুলিয়ে অস্বীকার করলো।

'মহিলা মারা গেছে। পরশু রাতে একটা হোটেলে।'

'কী?' তোমোহিকো অবাক হওয়ার অভিনয় করলো। অবশ্য, মনে মনে ভাবছিলো অভিনয়টা যেন অতিরিক্ত না হয়ে যায়। 'কীভাবে?'

'কে জানে?' বেঞ্চ থেকে উঠে দাঁড়ালো অফিসারটা। 'ধন্যবাদ তোমাকে। অনেক বড় সাহায্য করেছ তুমি। আমাদের হয়তো পরে আরো প্রশ্ন করতে হতে পারে, কিন্তু এখনকার মতো এখানেই শেষ।'

'ওহ...আচ্ছা, ঠিক আছে।'

'চলো, যাওয়া যাক,' কলারওয়ালা অফিসারটা পোলো শার্টওয়ালার দিকে ফিরে বললো। এরপর পেছনে একবারের জন্যেও না তাকিয়ে নিজেদের রাস্তায় চলে গেল দুজনে।

তোমোহিকোর সাথে শুধু গোয়েন্দাই যে দেখা করেছিলো এমন না। সেই অফিসারদের যাওয়ার চার দিনের মাথায় স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে তার কাঁধে কেউ একজন হাত রাখে। পেছনে ফিরে তাকিয়ে দেখে যে পেছন দিকে চুল আঁচড়ানো একটা বয়স্ক লোক তার কাঁধে হাত রেখেছে। মুখে মৃদু একটা হাসির আভা।

'তোমোহিকো সোনোমুরা?'

'জি, বলুন?' লোকটার ডান হাতটা অভ্যাসবশত পকেটে ঢুকে গেল যেন। এরপর সেখান থেকে একটা বিজনেস কার্ড বেরিয়ে এলো, যেটাতে বড় করে লেখা রয়েছে: ইকুও হানাওকা।

তোমোহিকো টের পাচ্ছে তার মুখ থেকে রং সরে যাচ্ছে। যদিও ওর স্বাভাবিক থাকা উচিত, কিন্তু শরীরটা শক্ত হয়ে আসছে।

'ভাবছিলাম একটু কথা বলা যাবে কি না,' রাশভারী কণ্ঠে বলে উঠলো লোকটা। এতটাই গমগমে ছিলো যে তোমোহিকোর বুক কেঁপে উঠলো কিছুটা।

'ঠিক আছে।'

'চলো, গাড়িতে বসে কথা বলা যাক।' লোকটা একটা রুপালি রঙের গাড়ির দিকে ইশারা করলো, যা রাস্তার একপাশে রাখা আছে। প্যাসেঞ্জার সিটে গিয়ে বসলো তোমোহিকো। 'মিনামি থানার কিছু পুলিশ তোমার সাথে কথা বলেছে, না?' ড্রাইভিং সিটে বসতে বসতে জিজ্ঞেস করলো হানাওকা।

'হ্যাঁ।'

'জানতাম। আসলে আমিই তাদেরকে তোমার নামটা দিই। তোমার নাম্বারটা আমার স্ত্রীর নোটবুকে লেখা ছিলো। দুঃখিত, যদি পুলিশ তোমাকে বেশি হেনস্থা করে থাকে তো। আসলে সে সময় অনেক কিছুই মিলছিলো না বলে করতে হয়েছিলো অমন।'

তোমোহিকো বুঝতে পারছে লোকটা মেকি আবেগ দেখাচ্ছে। চুপচাপ জিভ কামড়ে বসে শুনতে লাগলো সে।

'পুলিশ বলেছে আমার স্ত্রী নাকি কয়েকবার ফোন দিয়েছিলো তোমাকে?' ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসলো সে। কিন্তু চোখদুটোতে তেমন হাসির ছাপ দেখা গেল না।

'হ্যাঁ, একটা ক্যাফেতে বসে কথা বলেছিলাম আমরা।'

'ওরাও সেটাই বলেছে। আচ্ছা, আমার স্ত্রীই কি প্রতিবার ফোন করেছিলো? তুমি করোনি, তাই তো?'

না-বোধক ভঙ্গিতে মাথা দোলালো তোমোহিকো। শুনতে পেল হানাওকা বাঁকা হাসি দিচ্ছে।

'ওর মনে সব সময় সুন্দর ছেলেদের জন্য একটা জায়গা ছিলো। ওরকম একটা বয়সে নেশার ঘোরে থাকতো। খুদে রক স্টারগুলোর প্রতি বেশ মোহ ছিলো তার। আর তুমি...কী দারুণ চেহারা, অল্প বয়স। আমার মনে হয় ওর জন্য একদম পার্ফেক্ট ছিলে তুমি।'

তোমোহিকো তার হাতদুটো হাঁটুর উপর রেখে হালকা শব্দ করলো। লোকটার গলায় একধরনের চিটচিটে ভাব রয়েছে, অনেকটা আলকাতরার মতো। তার বলা শব্দগুলো থেকে সে স্পষ্ট ঈর্ষার পরিমাণটা ধরতে পারছে।

'তো শুধু কথাই বলেছিলে তুমি?' জিজ্ঞেস করলো সে।

'হ্যাঁ।'

'সে কি আর কিছু করতে কখনো ডাকেনি তোমাকে? মানে হোটেল-মোটেলে যেতে?' স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে বলে যাওয়ার ভান করছে হানাওকা। কিন্তু তার স্বরে এমন কিছুই ছিলো না যা শুনে স্বাভাবিক লাগে।

'একবারের জন্যও না।'

'এসবই সত্যি?'

'জি, স্যার,' তোমোহিকো হালকা মাথা দুলিয়ে উত্তর দিলো।

'তাহলে আরেকটা বিষয়ে তুমি আমাকে একটু সাহায্য করতে পারবে বলে মনে হচ্ছে। আচ্ছা, ও কি অন্য কারো সাথেও এরকম দেখা করতো?'

'মানে আমি বাদে অন্য কেউ?' কাঁধ ঝাঁকালো তোমোহিকো। 'না, সে ব্যাপারে জানি না কিছু।'

লোকটার চোখের চাহনির গভীরতা টের পাচ্ছে তোমোহিকো। একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের চাহনি। ঐ চাহনি যেন ছুরি হয়ে বিঁধে দিচ্ছে ওকে।

আর তখনই তোমোহিকোর পাশে থাকা জানালায় টোকা দিলো কেউ। তাকাতেই দেখলো রিও দাঁড়িয়ে আছে। দরজা খুললো তোমোহিকো।

'কী করছো এখানে বসে? স্যার খুঁজছে তোমাকে,' বললো রিও।

'কী?'

'অফিস রুমে বসে আছে স্যার। ভালো চাও তো তাড়াতাড়ি দেখা করে এসো।'

কয়েক মুহূর্ত রিওর চোখের দিকে তাকিয়ে রইলো তোমোহিকো, এরপর হানাওকার দিকে ফিরে বললো, 'আর কিছু জিজ্ঞেস করবেন?'

'না, না, যেতে পারো তুমি।' তার গলার স্বরই বুঝিয়ে দিচ্ছে সে এই প্রশ্নপর্বে সন্তুষ্ট না।

তোমোহিকো গাড়ি থেকে নেমে স্কুলের দিকে রওয়ানা দিলো রিওর সাথে।

'কী জিজ্ঞেস করছিলো সে তোমাকে?' ফিসফিস করে বললো রিও।

'জানতে চাচ্ছিলো আমরা কী করেছিলাম।'

'নাটক করেছ না তুমি?'

'তা আর বলতে।'

'দারুণ, দারুণ!'

'কী হচ্ছে এসব? কী করেছ তুমি রিও?'

'তা নিয়ে চিন্তা না করলেও চলবে তোমার।'

'হ্যাঁ, তবুও...'

তোমোহিকোর কাঁধে আলতো আঘাত করে রিও বললো, 'গাড়িতে বসে আমাদেরকে দেখতে পারে সে। স্কুলের ভেতরে চলে যাও তুমি। আর ফেরার সময় পেছনের রাস্তা দিয়ে যেও।'

এই মুহূর্তে স্কুলের মূল ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে আছে ওরা দুজন।

'আচ্ছা,' বললো তোমোহিকো।

'দেখা হবে পরে।'

রিওকে চলে যেতে দেখে স্কুলের ভেতরে চলে গেল তোমোহিকো।

এরপর আর কখনো ইউকো হানাওকার স্বামীকে কিংবা মিনামি পুলিশকে দেখেনি সে।

***

আগস্ট মাসের মাঝামাঝি এক রবিবার রিও আবার তোমোহিকোকে নিশিনাগাহোরির সেই অ্যাপার্টমেন্টে নিয়ে গেল। এবার নিজেই অনেকগুলো চাবি থেকে একটা বের করে দরজাটা খুললো রিও।

'ভেতরে যাও তুমি,' জুতো খুলতে খুলতে বললো সে।

ভেতরের বসার ঘর আর রান্নাঘরের তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি। আগের বার যেমনটা দেখে গেছিলো তেমনটাই আছে। সেই কমদামি টেবিল, চেয়ার, রেফ্রিজারেটর আর মাইক্রোওয়েভ। যেটার অনুপস্থিতি ছিলো তা হলো, বাতাসে সেই পারফিউমের গন্ধটা আর পাওয়া যাচ্ছে না। গতকাল রাতে রিও ওকে ফোন করে বলেছিলো যে ওকে একটা জিনিস দেখাবে সে। কী জিনিস তা জিজ্ঞেস করাতে হেসে বলেছিলো, 'সিক্রেট।' হাসিটা তোমোহিকোকে নাড়িয়ে দিয়েছিলো একদম। কারণ সত্যিকার অর্থেই হেসেছিলো রিও, যা এযাবৎ রিওর মুখে কখনো দেখেনি সে। তোমোহিকো যখন শুনলো যে তাকে আবারো সেই অ্যাপার্টমেন্টে যেতে হবে, তখন একদম জমে গেছিলো।

'চিন্তা কোরো না। তোমাকে এবার শরীর বেচতে বলবো না আমি,' বলেছিলো রিও। আবারো হেসেছিলো সে, কিন্তু হাসিটা এবার আর আগের মতো খাঁটি মনে হয়নি।

ভেতরে গিয়ে প্রথমেই ডিভাইডারে থাকা দরজাটা খুললো রিও। এটাই সেই জায়গা যেখানে ইউকোর সাথে তার প্রথম দেখা হয়েছিলো। আজকে অবশ্য কেউ নেই সেখানে, কিন্তু যা আছে তা দেখে চোখদুটো খুলে পড়তে চাইলো তোমোহিকোর।

'ভাবলাম পছন্দ করবে তুমি,' হেসে বললো রিও। চারটা কম্পিউটার একসাথে একটা ছোট টেবিলের উপর রাখা আছে। সাথে আরো কিছু যন্ত্রপাতি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে আশেপাশে।

'কোথায় পেলে তুমি এসব?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো তোমোহিকো।

'কিনেছি। আর কোথায় পাবো?'

'তুমি জানো এগুলো কীভাবে চালাতে হয়?'

'আমি জানি কিছুটা। তবে তোমার সাহায্য লাগবে।'

'আমার?'

'এজন্যই এখানে ডেকেছি তোমাকে।'

আর তখনই দরজায় কড়া নাড়লো কেউ। জমে গেল তোমোহিকো। সে ভাবেনি আর কেউ আসবে এখানে।

দাঁড়িয়ে গেল রিও। 'মনে হয় নামি এসেছে।'

এক কর্নারে রাখা কার্ডবোর্ড বাক্সের দিকে এগিয়ে গেল তোমোহিকো। ভেতরে উঁকি দিতেই দেখতে পেল অজস্র ক্যাসেট টেপ দিয়ে ভরা বাক্সটা। *যদি সবগুলো বাক্সই এরকম ভরা হয়ে থাকে, তবে যথেষ্ট ক্যাসেট টেপ রয়েছে এই ঘরে*, ভাবলো সে। মূল দরজা খোলার শব্দ শোনার পরপরই টের পেল কেউ একজন ভেতরে ঢুকছে।

'তোমোহিকো এসেছে,' বললো রিও। একজন মহিলাকে উদ্দেশ করে বলছে সে।

ভেতরে ঢুকলো তারা। মহিলার বয়স ত্রিশ-বত্রিশ হবে। কিন্তু কোনো এক কারণে কেন যেন পরিচিত পরিচিত লাগছে তোমোহিকোর কাছে।

'অনেক দিন পর দেখা,' বললো মহিলাটা।

'হাঁহ?' হাঁ করে রইলো তোমোহিকো।

'সেদিন প্রথমে উঠে চলে গেছিলো যেই মহিলা, এ সে,' বললো রিও।

'তার মানে–ওহ আচ্ছা!' তোমোহিকো ভালো করে দেখলো তাকে। আজকে তেমন মেকআপ করেনি সে। এর কারণেই হয়তো আজকে আরো বেশি বয়স্ক দেখাচ্ছে তাকে।

'আচ্ছা, প্রশ্ন করে করে আবার বিরক্ত কোরো না ওকে, কেমন? ওর নাম নামি। সে আমাদের হিসাবরক্ষক হিসেবে আছে। আর কিছু জানার দরকার নেই এখন,' বললো রিও।

'হিসাবরক্ষকের কী দরকার আমাদের?'

রিও তার পেছনের পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে তোমোহিকোর হাতে দিলো। যার পেছনে বেশ সুন্দর করে লেখা রয়েছে:

আনলিমিটেড ডিজাইনস
যেকোনো ধরনের কম্পিউটার গেম পাবেন এখানে

'আনলিমিটেড ডিজাইনস?'

'ওটাই আমাদের কোম্পানির নাম। আমরা ক্যাসেট টেপে করে মেইলের মাধ্যমে গেম বিক্রি করে থাকি।'

'ওহ আচ্ছা।' মাথা দোলালো তোমোহিকো। একটা ছবি তার মাথায় স্পষ্ট হয়ে গেল। 'এগুলো বিক্রি হবে হয়তো।'

'হয়ে যাবে, এতে কোনো সন্দেহই নেই,' বললো রিও।

'সফটওয়্যার কোথায় পাবো আমরা এর জন্য?'

রিও তার একটা কম্পিউটারের দিকে এগিয়ে গিয়ে একটা শিট বের করলো। 'এটা আমাদের বেস্টসেলার গেম,' তোমোহিকোকে দেখিয়ে বললো সে। একটা প্রোগ্রাম লেখা ছিলো ওটাতে। যা তোমোহিকোর মাথার উপর দিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। শিটের একদম উপরে *সাবমেরিন* শব্দটা দেখলো সে।

'কোথায় পেয়েছ এই গেম তুমি? নিজে নিজে বানিয়েছ নাকি?'

'তাতে কী আসে যায়? নামি, ভালো কোনো নাম খুঁজে পেয়েছ তুমি?'

'একটা পেয়েছি, কিন্তু বুঝতে পারছি না পছন্দ করবে কি না তুমি।'

'বলো শুনি।'

'*মেরিন ক্র্যাশ*,' কিছুটা দ্বিধা নিয়ে বললো নামি।

'*মেরিন ক্র্যাশ*...খারাপ না। চলো, এটাই রেখে দেই,' বুকে হাত রেখে বললো রিও।

হেসে উঠলো নামি। স্বস্তির হাসি যাকে বলে। রিও তার হাতে থাকা ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বললো, 'আমি একটু প্রিন্টের দোকানে যাবো।'

'কেন?' বললো তোমোহিকো। 'কীসের জন্য?

'প্রচার ছাড়া কিছু বিক্রি হয় নাকি আজকাল?' জুতো পরতে পরতে বললো সে। এরপর বেরিয়ে গেল সম্মুখ দরজা দিয়ে।

তোমোহিকো হাঁটু গেড়ে বসে প্রোগ্রামটার কোডগুলো দেখতে লাগলো। অন্য দিকে নামি একটা ক্যালকুলেটরে কী নিয়ে যেন খটখট করে হিসাব করছে। 'এই, নামি, রিওর ব্যাপারে তেমন কিছু জানো তুমি?'

'কী বলছো এসব? আমি তো জানতাম তোমরা একে অপরের বন্ধু।'

'আমি ব্যস এটুকুই জানি যে সে আমার সাথে একই স্কুলে পড়ে। কিন্তু সেদিন এখানে আসার আগ পর্যন্ত ওকে আমি খেয়ালই করিনি কখনো। তার কোনো বন্ধু নেই স্কুলে, এমনকি তেমন কিছুই করে না সে ক্লাসে। তবুও সে এসব করছে তার অবসর সময়ে?'

নামি ঘুরে তাকিয়ে বললো, 'স্কুলের পড়াশোনা বাদেও জীবনে আরো অনেক কিছুই আছে, জানো তো?'

'হ্যাঁ, তাও ঠিক। তবে...আসলে ওর কথা মাথা থেকে নামানো কষ্টকর।'

মাথা নাড়লো নামি। 'আমার মনে হয় রিওর ক্ষেত্রে অতটা গভীরভাবে না ভাবলেই বরং ভালো হবে।'

'আমি গভীরভাবে ভাবছি না। শুধু এমনিতেই একটু ভাবছিলাম আর কি। আসলে যখন...' থেমে গেল তোমোহিকো। কতটুকু বলা উচিত হবে ভেবে পাচ্ছে না।

'যখন ইউকো মারা গেল?' বললো নামি। ওর কণ্ঠ বেশ শীতল।

'হ্যাঁ।' স্বস্তিতে মাথা দোলালো সে। 'কীভাবে উধাও হয়ে গেল বিষয়টা? মনে হলো যেন একদম কালো জাদু করে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।'

'আসলেই জানতে চাও তুমি?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই জানতে চাই।'

একটা বলপয়েন্ট কলমের ডগা দিয়ে কানের পেছনে চুলকাতে লাগলো নামি। 'যতটুকু আমি শুনেছি তা হলো, ওর মৃতদেহ ঐ হোটেলে ঢোকার পরদিন দুপুর দুটো নাগাদ শনাক্ত করা হয়েছিলো। হোটেল কর্তৃপক্ষ ওকে জানাতে চেয়েছিলো যে চেকআউটের সময় হয়ে গেছে, কিন্তু কেউ জবাব দিচ্ছিলো না ভেতর থেকে। পরে তারা রুমে ঢুকে দেখে পুরো নগ্ন অবস্থায় পড়ে আছে ওর মৃতদেহ।'

মাথা দোলালো তোমাহিকো। তার নিজেরই খুব ভালো করে মনে আছে সেই দৃশ্য।

'দ্রুত পুলিশকে ডাকা হলেও ওরা ওটাকে হত্যাকাণ্ড হিসেবে ভাবলো না। কারণ তারা দেখেই বুঝেছিলো সেক্স করার সময় উত্তেজনাবশত হার্ট অ্যাটাক হয়েছে তার। এও বলেছে যে মৃত্যুটা হয়েছে আগের রাত এগারোটা নাগাদ।'

'এগারোটা নাগাদ?' মাথা ঝাঁকালো তোমোহিকো। 'সময়টা তো ঠিক মনে হচ্ছে না...'

'রুম সার্ভিসের এক কর্মী দেখেছিলো ওকে,' ওর দিকে তাকিয়ে বললো নামি।

‘দেখেছিলো বলতে কী বোঝাতে চাচ্ছো?’

‘এগারোটা নাগাদ সে হোটেল ডেস্কে ফোন করে একটা শ্যাম্পু নিয়ে যেতে বলে তার রুমে। তারা শ্যাম্পু দিয়ে এলে তা নেয়ও সে।’

‘হতেই পারে না। আমি যখন বের হলাম হোটেল থেকে–’ থেমে গেল সে কারণ নামি তার মাথা ঝাঁকাচ্ছে।

‘রুম সার্ভিস স্পষ্ট বলেছে যে ওরা এগারোটা নাগাদ শ্যাম্পু দিয়েছিলো তাকে।’

চোয়াল ঝুলে গেল তোমোহিকোর। ইউকোর পরনের ড্রেস আর টুপি পরলে যে কাউকে ইউকো মনে হবে। এমনকি...তোমোহিকো নামির দিকে তাকালো এবার। ‘তুমিই ছিলে ওটা, না?’

নামি হেসে মাথা নাড়লো। ‘আরে না, আমি না। আমাকে কি ওরকম মেয়ে মনে হয় যে এমন কাজ করে আসতে পারবে? ঐ অবস্থায় ভালো করে কথাই বলতে পারতাম না আমি।’

‘তবে কে?’

‘এটাও হলো এমন আরেকটা জিনিস যা নিয়ে অত ভাবা যাবে না,’ প্রাণবন্তভাবে বললো নামি। ‘এতটুকু জানাই কি ভালো না যে কেউ না কেউ, কোথাও না কোথাও তোমার পাছাটা বাঁচিয়েছে?’

‘হ্যাঁ, তবুও...’

‘আরেকটা বিষয়,’ একটা আঙুল তুলে বললো নামি। ‘পুলিশ তোমাকে বাড়ির বাইরে নিয়ে যাওয়ার পরে আর কখনো কেন আসেনি সে বিষয়ে জানতে ইচ্ছা করেনি তোমার?’

‘কেন?’

‘কারণ ওরা জানে, যে-ই সেদিন ইউকোর সাথে সেক্স করেছিলো, তার রক্তের গ্রুপ ছিলো এবি।’

‘ওরা কি রক্তের দাগ খুঁজে পেয়েছিলো সেখানে?’

‘বীর্য খুঁজে পেয়েছিলো,’ কোনো রকম পলক না ফেলেই বললো নামি। ‘সেখানে এমন কারো বীর্য খুঁজে পাওয়া গেছিলো যার রক্তের গ্রুপ এবি।’

‘এটা কীভাবে সম্ভব!’

‘কিন্তু সেটাই তারা খুঁজে পেয়েছে। ওর ভেতরে এবি গ্রুপের বীর্য পেয়েছিলো তারা।’

ভেতরে শব্দটা বেশ নাড়া দিলো তোমোহিকোকে। ‘রিওর রক্তের গ্রুপ কী?’

‘এবি,’ ডেস্কের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললো নামি।

হাত দিয়ে নিজের মুখ ঢাকলো তোমোহিকো। অসুস্থ বোধ করছে সে। এই গরমের মধ্যেও একটা শীতল স্রোত নেমে গেল তার মেরুদণ্ড বেয়ে।

‘তার মানে তুমি বলতে চাচ্ছো সে...তার সাথে...’

'দুঃখিত, ওসব নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি না,' ঠান্ডা গলায় বললো নামি।

তোমোহিকো খুঁজে পেল না কী বলবে সে। টের পেল তার আঙুল কাঁপছে।

দরজা খুলে গেল তখুনি। 'সব রেডি করে ফেলেছি,' ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বললো রিও। তার হাতে থাকা কাগজটা নামির দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, 'একদম বাজেট অনুযায়ী এগিয়েছি আমরা, কী বলো?'

নামি কাগজটা হাতে নিয়ে একটু হাসলো। ঐ হাসিটা একটু আড়ষ্ট লাগলো তোমোহিকোর কাছে।

রিও খেয়াল করলো ঘরের পরিবেশ কিছুটা পালটে গেছে। দুজনের দিকে একবার তাকিয়ে জানালার কাছে গিয়ে একটা সিগারেট ধরালো সে।

'কী হয়েছে?' লাইটার জ্বালাতে জ্বালাতে জিজ্ঞেস করলো রিও।

'শোনো,' ওর দিকে তাকিয়ে বললো তোমোহিকো।

'হ্যাঁ?'

'আমি আসলে বলতে চাচ্ছিলাম আর কি...যে...' ঢোক গিললো তোমোহিকো। তার মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে। 'আসলে বলতে চাচ্ছিলাম তোমার যেকোনো প্রয়োজনে আমাকে পাবে, কেমন? যেকোনো কিছুই করে দেবো আমি।'

রিও বেশ কিছুক্ষণ তোমোহিকোর চেহারার দিকে তাকিয়ে রইলো। এরপর নামির দিকে তাকাতেই হালকা মাথা দোলালো নামি। একটা ঠান্ডা হাসি খেলে গেল রিওর মুখে। সিগারেটে বড় একটা টান দিয়ে বললো, 'অবশ্যই করবে।'

এরপর জানালার দিকে ঘুরে ঘন নীল আকাশ দেখতে লাগলো সে।

অধ্যায় চার

প্রায় প্রত্যেক সন্ধ্যাতেই বৃষ্টি হচ্ছে ইদানীং। মুষলধারে না, অনেকটা গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি। ছাতাও নেওয়ার দরকার পড়ে না, আবার ধীরে ধীরে ভিজিয়ে জবুথবু করে দেয়। আবার মাঝে মাঝে রাতের পরিষ্কার আকাশ দেখার ফুরসতও মেলে। *কাল নিশ্চয়ই কোনো খেঁকশিয়ালের বিয়ে হবে*, ভাবলো মাসাহারু। তার মা এরকম আবহাওয়া দেখলে এই কথাটা বলতো একসময়।

একটা বোজানো ছাতা ইউনিভার্সিটির লকারে রেখে এসেছে সে। অবশ্য, কথাটা গেট দিয়ে বেরিয়ে আসার পর মনে পড়েছিলো তার। আর সে সময় আবার ফিরে গিয়ে ছাতা নিয়ে এলে কোনো লাভও হতো না কারণ ততক্ষণে অনেকটাই ভিজে গেছে সে। আবার ফিরে গেলে শুধু ভিজতেই হবে ভেবে আর যায়নি।

হাতে থাকা স্ফটিকের ঘড়িটার দিকে তাকালো মাসাহারু। সাতটা বেজে পাঁচ মিনিট। আজও দেরি করে ফেলেছে সে। ও জানে যে মেয়েটা দেরি করার জন্য তাকে কিছু বলবে না, কিন্তু এবারের হিসাব আলাদা। ব্যাপারটা হচ্ছে, ওর আসলে মেয়েটাকে দেখার জন্য তর সইছে না।

মাথার উপরে খবরের কাগজটা তুলে ধরলো সে যাতে চুলটা না ভেজে। গত বছর থেকেই একটা বিশেষ বাতিক হয়েছে ওর; *ইয়াকাল্ট সোয়ালোজ* ম্যাচ জেতার পরদিন খবরের কাগজ কিনবেই সে। এখনো সে *সোয়ালোজ*-এর একজন অন্ধ ভক্ত। যদিও সেই কবে হাই স্কুলে পড়ার সময় টোকিওতে ছিলো সে, তবুও। মাঝে মাঝে তার কাছে মনে হয় একজন ভক্ত হিসেবেই হয়তো তার জন্ম হয়েছে। এমনকি আগে এই দলটার নাম যখন *অ্যাটমস* ছিলো, তখনকার খেলাও দেখেছে সে।

গত বছর কাকতালীয়ভাবে একটা লিগ জিতে যায় *সোয়ালোজ* টিম। সে সময়ে টিম ম্যানেজার ছিলো হিরুকা। কিন্তু এ বছর দেখে মনে হচ্ছে পুরো অন্য একটা টিম নিয়ে মাঠে নেমেছে তারা। সেপ্টেম্বর আসতে না আসতেই র‍্যাংকিং-এর শেষ দিকে নাম লিখিয়ে ফেলেছে একদম। এর কারণে খবরের কাগজ কেনায় কিছুটা ভাটা পড়েছে তার। তবে আজকে একটা থাকায় ভালোই হয়েছে, নয়তো ভিজতে হতো অনেক।

কয়েক মিনিট পর একটা বাড়ির সামনে এসে বেল বাজালো সে। দরজার নিচে একটা নেমপ্লেট দেখা যাচ্ছে যেখানে লেখা রয়েছেঃ কারাশাওয়া।

ভেতর থেকে দরজাটা খুললেন রেইকো কারাশাওয়া। একটা বেগুনি রঙের ড্রেস পরেছেন তিনি। ড্রেসটা এতটাই চাপা যে তার বৃদ্ধ হাড়গুলো জামার উপর দিয়ে বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মার্চ মাসে যখন প্রথম এসেছিলো মাসাহারু, তখন

কালচে ধূসর রঙের বেশ সুন্দর একটা কিমোনো পরেছিলেন ভদ্রমহিলা, যেটা বেশ মানিয়েও ছিলো তাকে। কিন্তু গ্রীষ্মকাল আসার পরে যেই একটু-আধটু বৃষ্টি নামতে শুরু করেছে, অমনি ড্রেস পরা শুরু করে দিয়েছেন তিনি। মাসাহারু অবশ্য ভেবেছে যে আবার শীতকাল এলে কিমোনো পরতে শুরু করবেন হয়তো।

'দুঃখিত আমি,' মাসাহারুকে দেখে বললেন ভদ্রমহিলা। 'আমি মাত্র ইউকিহোর কাছ থেকে খবর পেলাম যে স্কুলের অনুষ্ঠানের জন্য তার আসতে আধা ঘণ্টা দেরি হবে।'

'কোনো সমস্যা নেই,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বললো সে। 'ভালো হয়েছে আমি আজকে আর লেট করিনি।'

'অনেক সময়জ্ঞান আছে তোমার, আমি জানি। আমি শুধু চাই যে এর কিছুটা ইউকিহোর উপরেও যেন পড়ে,' বললেন রেইকো।

মাসাহারু হেসে ঘড়ির দিকে তাকালো একবার। এখনো বেশ কিছুটা সময় কাটাতে হবে বলে বিড়বিড় করে উঠলো মনে মনে।

'আরে আরে! বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে নাকি তুমি? এসো, ভেতরে এসো। আমি ঠান্ডা কিছু বানিয়ে দিচ্ছি। খাবে, এসো,' বললেন রেইকো।

প্রথম তলার বসার ঘরে তাকে বসতে বলেছেন তিনি। পুরো রুমটা আগে জাপানিজ স্টাইলেই গড়া হয়েছিলো। মেঝেতে তাতামি মাদুরও রয়েছে। কিন্তু বেতের তৈরি কিছু আসবাবের মাধ্যমে মিসেস কারাশাওয়া ঘরটায় পশ্চিমা ভাব নিয়ে এসেছেন। প্রায় ছয় মাস আগে প্রথম এই রুমে ঢুকেছিলো মাসাহারু। এরমধ্যে আর ঢোকা হয়নি এখানে।

তার সাথে কারাশাওয়া পরিবারের পরিচয় ঘটে তার মায়ের মাধ্যমে। তার মা এখানে *চা পানের রীতি* শিখতো। ভদ্রমহিলার জুনিয়র স্কুল পড়ুয়া মেয়ে ইউকিহোর একজন গণিত শিক্ষকের প্রয়োজন ছিলো তখন। আর এদিকে মাসাহারু নিজে ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে গ্র্যাজুয়েশন করছে, গণিতে বেশ পাকাপোক্ত। ওর সর্বশেষ ছাত্র কলেজ এন্ট্রেন্স পরীক্ষায় পাস করায় অতিরিক্ত কিছু টাকা উপার্জনের আশায় ঘুরছিলো। টাইমিংটা অনেক ভালোই হয়েছিলো, আবার টাকাও বেশ ভালোই দেয়। কিন্তু মাসাহারু শীঘ্রই বুঝতে পারে যে ইউকিহোর সাথে ঘনিষ্ঠ হতে পারার মতো সুযোগ টাকা-পয়সার থেকেও অনেক মূল্যবান।

রেইকো স্বাভাবিক দুটো গ্লাসে করে তার জন্য চা নিয়ে এলেন...আরেকটা স্বস্তির কারণ। কারণ প্রথমবার যখন মাসাহারু এসেছিলো, তখন তিনি গ্রিন টি এনেছিলেন, তাও ঐতিহ্যবাহী কোনো পেয়ালার মধ্যে করে। মাসাহারুর ঘাম ছুটে গেছিলো সেই চা পান করবে কীভাবে তা ভাবতে গিয়ে।

গ্লাসটা হাতে নিলো মাসাহারু। তার গলা শুকিয়ে ছিলো এতক্ষণ। ঠান্ডা চা পেয়ে বেশ আরামই লাগছে এখন।

'খুবই দুঃখিত আমি,' তার সামনাসামনি বসতে বসতে আবারো ক্ষমা চাইলেন রেইকো। 'বুঝতে পারছি না কেন সে তাড়াতাড়ি আসছে না।'

'আরে না, না, চিন্তার কিছু নেই। ঠিক আছি আমি। আমার মনে হয় এই সময়টাতে বাচ্চাদের একটু বন্ধুবান্ধবদের সাথে থাকতে দেওয়া উচিত, বিশেষ করে হাই স্কুলের সময়ে,' বললো মাসাহারু। মনে মনে প্রার্থনা করছিলো যাতে কথাটা ঠিকঠাক শোনায়।

ইউকিহো কারাশাওয়া সেইকা গার্লস হাই স্কুলে পড়ছে, যেটা তাকে সেইকা গার্লস কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য বিরাট এক সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে। যদি ভালো একটা নম্বর পায়, তবে শুধু একটা ইন্টারভিউ দিয়েই ভর্তি হতে পারবে সে। এছাড়া, কোন ডিপার্টমেন্ট নিতে চায় তার উপরেও নির্ভর করবে যে এডমিশন পরীক্ষা কতটা কঠিন হবে। তার পছন্দের সাবজেক্ট হলো ইংরেজি সাহিত্য, যেটাতে সবচেয়ে বেশি প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে। আর সেজন্য তাকে প্রত্যেকটা সাবজেক্টে ভালো নাম্বার পেতে হবে। অবশ্য, সবগুলোতেই ভালো করেছে সে-শুধু গণিতটা ছাড়া।

'পেছনের কথা ভাবলে, আমরা আসলেই ভালো করেছি ইউকিহোকে সেইকাতে ভর্তি করে,' বললেন তিনি। 'এর মাধ্যমে সিনিয়রদের সাথে সে সহজ হতে পারছে। আর অন্য কোথাও থাকলে পাবলিক কলেজে ভর্তি হওয়ার টেনশন নিয়ে পড়ে থাকতে হতো।' নিজের বার্লি চায়ের গ্লাসটা দুহাতে নিলেন।

'একদম,' স্বীকার করে নিলো মাসাহারু। তার নিজের কাছেও ঐ পরীক্ষাগুলো ভয়াবহ মনে হয়। এমনকি এযাবৎ যত ছাত্রছাত্রী পড়িয়েছে, তাদের সবার বাবা-মায়ের কাছে এটাই বলেছে সে। 'আমার মনে হয় সেজন্যই এখন অনেক বাবা-মা তাদের সন্তানদের জন্য প্রাইভেট স্কুলগুলো বেছে নিচ্ছেন। এমনকি একদম প্রাথমিক শ্রেণি থেকেই শুরু করছেন তারা।'

'ওটাই করা উচিত। আমার ভাতিজা-ভাতিজিদেরও আমি সেটাই করতে বলেছি। যদিও ওদেরকে একটা পরীক্ষা দিয়েই ঢুকতে হবে, তবুও যত আগে সেটা দেয় ততই ভালো।'

মাসাহারু মাথা দোলালো, এরপরই একটা চিন্তা মাথায় এলে বললো, 'ইউকিহো তো মিডল স্কুলের আগে প্রাইভেটে শিফট হয়নি, না?'

কিছুক্ষণের জন্য চুপ মেরে গেলেন রেইকো। একটা ভাবুক চাহনি দেখা গেল তার চোখে। মাসাহারু ভাবলো যে অন্য কোনো টপিকে জিজ্ঞেস করা উচিত কি না, আর তখনই জবাব দিলেন তিনি, 'যদি আমি সেখানে থাকতাম, তবে অবশ্যই আমি তার মাকে এই উপদেশ দিতাম। কিন্তু আফসোস, মেয়েটা দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় শ্রেণিতে উঠার আগ পর্যন্ত আমার সাথে ওর দেখাই হয়নি। যদিও ওদের অবস্থা অতটা ভালো ছিলো না সে সময়ে যে মেয়েকে প্রাইভেট স্কুলে পড়াবে।'

প্রথম যখন পড়াতে এসেছিলো মাসাহারু, তখন থেকেই জানতো যে ইউকিহো রেইকো কারাশাওয়ার আপন মেয়ে না। কিন্তু তবুও এই ব্যাপারগুলো নিয়ে কথা ওঠেনি কখনো। আর এখন মাসাহারু নিজের ভেতরেই কিছুটা কৌতূহল বোধ করছে এ বিষয়ে।

রেইকো নিজেই অবশ্য টের পেলেন বিষয়টা। বললেন, 'ইউকিহোর বাবা আমার কাজিন ছিলো। সে ইউকিহো খুব ছোট থাকা অবস্থায় দুর্ঘটনায় মারা যায়। আর তার মায়ের অবস্থাও শোচনীয় হয়ে পড়ে তখন। একসাথে দুটো চাকরি করতো সে। আমার মনে হয় সে সময়ে একটা বাচ্চা পালা তার জন্যে বেশ কষ্টসাধ্য একটা কাজ ছিলো।'

'ওর মায়ের কী হয়েছিলো?' জিজ্ঞেস করলো মাসাহারু। কেন করলো সেজন্য অবশ্য প্রশ্ন করার পরপরই অনুতপ্ত বোধ করলো ভেতরে।

রেইকোর চেহারায় কালো মেঘ নেমে এলো যেন। 'সেও একটা দুর্ঘটনায় মারা গেছে,' ভদ্রমহিলা খুব ধীর গলায় বললেন। 'ইউকিহো তখন সিক্সে পড়তো মনে হয়। যদি আমি ভুল না করে থাকি তো।'

'গাড়ি দুর্ঘটনায়?'

'উঁহু।' মাথা ঝাঁকালেন তিনি। 'গ্যাস পয়জনিং।'

'গ্যাস?'

'চুলায় পাত্র রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিলো সে। এরপরই চুলার আগুন বাতাসে নিভে গেলে গ্যাস চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। জেগে ওঠার আগেই মারা যায় সে। হয়তো অনেক ক্লান্ত ছিলো সেদিন।' দুটো ভ্রু একত্র হয়ে যায় ভদ্রমহিলার।

মাসাহারু অবশ্য এরকম ঘটনা শুনেছে আগে, তবে সে স্পষ্ট জানে যে বেশ কয়েক বছর ধরেই প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে কার্বন মনোঅক্সাইড বিষক্রিয়ার সম্ভাবনা কমে এসেছে। 'ইউকিহো নিজে যদি ডেড বডিটা খুঁজে না পেত...আরো ভালো হতো। ভাবতেও পারছি না ঐ দৃশ্য দেখার পর কেমন লেগেছে ওর।'

একটা দুঃখের ছাপ স্পষ্ট হলো ভদ্রমহিলার মুখে। 'খুবই মর্মান্তিক একটা ঘটনা।'

'হুম,' মেনে নিলো মাসাহারু। বুঝতে পারলো এ বিষয়ে অনেক কিছু জিজ্ঞেস করে ফেলেছে এরমধ্যে। কিন্তু এতটুকু শোনার কারণে তার কৌতূহল আরো বেড়ে গেছে। নিজের সাথে তর্ক করতে লাগলো কথোপকথনটা শেষ করার জন্য, কিন্তু ইউকিহো বাড়ির বাইরে থাকায় এটাই তার শেষ সুযোগ এ বিষয়ে প্রশ্ন করার। চায়ের কাপে একটু চুমুক দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'আচ্ছা, ও কি একাই খুঁজে পেয়েছিলো তার মাকে?'

'না,' ওর দিকে না তাকিয়েই বললেন রেইকো। 'দরজা ভেতর থেকে লাগানো ছিলো। পরে রিয়েল এস্টেট এজেন্টকে দরজা খোলাতে নিয়ে এসেছিলো সে। একসাথে ভেতরে ঢোকে তারা।'

লোকটার জন্যও তাহলে দিনটা বেশ বাজে ছিলো। লোকটার চেহারা তখন কেমন হয়েছিলো তা ভাবছে মাসাহারু। 'আমি তো পরিবারের সবাইকে দুর্ঘটনায় হারানোটা কল্পনাও করতে পারছি না।'

'আমরা কেউই পারি না। হয়তো না পারাটাই ভালো। আমি তার শেষকৃত্যে গেছিলাম। ইউকিহো কফিনটা আঁকড়ে ধরে ছিলো যাতে ওরা তার মাকে নিয়ে যেতে না পারে। সেদিনের মতো চিৎকার করে কাঁদতে আমি আর কখনো দেখিনি ওকে।' চোখ বন্ধ করে ফেললেন তিনি। মনে হচ্ছে সেদিনের ঘটনা মনে করছেন। 'ওকে সেখানে দেখার পরই মনে হয়েছিলো তার জন্য কিছু একটা করতে হবে আমাকে।'

'তখনই কি অ্যাডাপ্ট করার কথা ভেবেছিলেন আপনি?'

'হ্যাঁ।'

'ওর কি আর কোনো আত্মীয় ছিলো না?'

'সত্যি বলতে, আমি ওর মায়ের সাথে তেমন কথা বলিনি। আর তার পরিবারের ব্যাপারেও তেমন জানতাম না। কিন্তু ইউকিহোকে তার মায়ের মৃত্যুর আগে অনেকবার দেখেছিলাম আমি। এখানে প্রায়ই আসতো সে।'

মাসাহারু একটু অবাক হলো এই ভেবে যে ইউকিহো কেন তার এক আত্মীয়ের বাড়িতে আসতো যে কিনা তার মায়ের সাথে ততটা ঘনিষ্ঠ না। জিজ্ঞেস করেই ফেলছিলো সে, এমন সময় রেইকো বললেন যে ইউকিহোর সাথে তার প্রথম দেখা হয়েছিলো তখন, যখন ইউকিহোর মায়ের আরেকবার বিয়ের কথা হচ্ছিলো।

'অল্প কিছু সময়ের জন্য কথা বলেছিলাম ইউকিহোর সাথে। কিন্তু যখন সে আমার *চা পানের রীতি*-র ব্যাপারে জানলো, খুব আগ্রহ দেখিয়েছিলো। অনেক প্রশ্ন করছিলো বলে আমি তাকে এখানে আসার জন্য বলি। তার কয়েক সপ্তাহ পরেই ওকে আসতে দেখে বেশ অবাক হয়েছিলাম আমি। তেমন একটা সিরিয়াস হয়ে দাওয়াত দিইনি আসলে। এমন না যে অল্পবয়সি মেয়েগুলো চা পানের এই রীতি সম্পর্কে জানতে আগ্রহ দেখায় না, কিন্তু তার ভেতর সত্যিকার অর্থেই আমি আগ্রহ দেখেছিলাম। আমিও পরে তাকে শেখাতে থাকি। প্রথম প্রথম হাসি-ঠাট্টার মধ্য দিয়েই শেখাচ্ছিলাম। একা মানুষ আমি, একটু সঙ্গ পাচ্ছিলাম, তাই ভালোও লাগছিলো। প্রতি সপ্তাহেই আসা-যাওয়া করতো সে। স্কুলে কী হতো না হতো তা চা খেতে খেতে বলতো সে আমাকে। এমন একটা সময় এলো যখন তার অনুপস্থিতি আমাকে পোড়াতে লাগলো। ফলে আমি চাইতাম যেন বেশি বেশি আসে সে আমার কাছে।'

'তার মানে প্রাথমিক শ্রেণিতে থাকতেই *চা পানের রীতি* সম্পর্কে শিখেছে সে?'

'হ্যাঁ, এরপরে *ফুল সাজানোর রীতি* শেখার ব্যাপারে আগ্রহ দেখাতে তেমন একটা দেরি করেনি সে। আমাকে কোনো ফুলদানিতে ফুল রাখতে দেখলেই সে এগিয়ে এসে সাহায্য করতো। ও অবশ্য আমাকে কিমোনো কীভাবে পরতে হয় তাও শেখাতে বলেছিলো।'

'শুনে মনে হচ্ছে স্কুলের মতো একটার পর একটা শ্রেণি পড়ছে,' হেসে বললো মাসাহারু।

'অনেকটা সেরকমই। অবশ্য, বাচ্চা ছিলো বলে আমার মনে হয় ব্যাপারটাকে ছেলেখেলা হিসেবেই দেখতো সে। আমি যেভাবে কথা বলতাম, সেটাকে হুবহু নকল করারও চেষ্টা করতো। যখন আমি ওকে বললাম যে আমি কিন্তু লজ্জা পাচ্ছি, তখন সে বললো তার মায়ের সাথে থাকতে থাকতে তার ভাষার অবনতি হচ্ছে, যেটা সে এখানে এসে ঠিক করতে চায়। ভাবতে পারো?'

যখন কথাগুলো শুনছিলো মাসাহারু, তখন একটা জিনিস ভাবছিলো সে। তার কাছে এখন পরিষ্কার হলো যে কেন ইউকিহোর আচরণ এতটা মাপা ছিলো। যেভাবে সে কথা বলতো বা যেভাবে সে নড়াচড়া করতো, তা একটা হাই স্কুলের বাচ্চার মতো কখনোই ছিলো না। অবশ্য, মাসাহারু এটা ভেবে মুগ্ধ হলো যে তাকে এসব করার জন্য কোনো রকম চাপ দেওয়া হয়নি–সে নিজে থেকেই সেসব করেছে।

'আপনি বলাতে এখন বোঝা গেল ব্যাপারটা। ওর মধ্যে আর ওসাকার সেই এক্সেন্ট নেই, তাই না?'

হাসলেন ভদ্রমহিলা। 'তোমার মতো আমিও টোকিওতেই বড় হয়েছি। আমার নিজের মূল এক্সেন্টের অভাবটাকেই সে বেশি পছন্দ করে বলে মনে হয়েছে।'

'আমি অবশ্য এতে দোষের কিছু মনে করি না। কারণ আমার নিজেরও স্থানীয় ভাষায় দক্ষতা নেই তেমন।'

'আমার মনে হয় এর জন্যই সে তোমার সাথে কথা বলতে পছন্দ করে। ও বলেছে যে এই এক্সেন্ট ছাড়া অন্য কোনো এক্সেন্টের কারো সাথে সে কথা বলবে না।'

'ওখানে জন্ম নেওয়া কেউ এই কথা বলছে শুনেই হাসি পাচ্ছে।'

'আসলে ও যেখানে জন্মেছে, সে জায়গাটা নিয়ে তেমন গর্ববোধ নেই তার।'

'তাই নাকি! তবে তো বেশ বাজে মনে হচ্ছে ব্যাপারটা।'

'তবে ও নিজেকে নিয়ে গর্ববোধ করে,' ঠোঁট কামড়ে বললেন রেইকো। 'তবে আরেকটা ব্যাপার আমাকে অনেক ভাবাচ্ছে। আমার মতো বয়স্ক এক মহিলার সাথে অনেক বেশিই সময় কাটাচ্ছে সে। এই ব্যাপারটা ওর জীবনে বেশ প্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে হচ্ছে আমার। অবশ্যই আমি চাই না সে বিশৃঙ্খলভাবে চলুক, কিন্তু একটু-আধটু পাখা মেলাটা তো জরুরি তা বুঝতেই পারছো। আমি বলি কি, কখনো

সুযোগ পেলে ওকে কোথাও ঘুরতে নিয়ে যেতে পারো তুমি। ঘর থেকে একটু বাইরে ঘুরিয়ে আনার চেষ্টা করতে পারো। ওর এটা দরকার খুব।'

'আমি? ভেবে বলছেন আপনি?'

'যাদের উপর বিশ্বাস আছে, আমি তাদের উপরই দায়িত্বটা ছাড়তে চাচ্ছি আসলে।' হাসলো সে।

'আচ্ছা, আমি এ নিয়ে কিছু একটা ভেবে দেখবো পরে।'

'একটু ভেবো, কেমন? আমার মনে হয় ওরও ভালোই লাগবে বিষয়টা।' অনেকক্ষণ কিছু না বলার কারণে মাসাহারু আরেকবার চুমুক দিলো তার কাপে। কোনো রকম ম্যাড়ম্যাড়ে কথাবার্তা চলেনি এতক্ষণ ধরে–তার থেকেও বেশি কিছু চলেছিলো আর কি। এটা পরিষ্কার যে ইউকিহোর পালক মা তার মেয়ের সম্পর্কে অনেক কিছুই জানেন না। ইউকিহো এতটাও সেকেলে টাইপের মেয়ে না–এটা মাসাহারু তার চালচলন দেখেই বুঝেছিলো। এমনকি মহিলা যতটা ভাবছেন, ততটা ভোলাভালাও না।

একদিনের ঘটনা হঠাৎ মনে পড়লো তার। জুলাই মাসের দিকে সম্ভবত ঘটেছিলো ঘটনাটা। দুই ঘণ্টার লেকচার শেষে ওরা কফি খাচ্ছিলো আর কথা বলছিলো। এমন সময়গুলোতে মাসাহারু সব সময় ইউনিভার্সিটির কথা পাড়ে। ও জানতো ইউকিহো ওগুলো শুনতে পছন্দ করে। পাঁচ মিনিটের মতো কথা বলেছিলো তারা, এরমধ্যেই ফোন বেজে ওঠে।

'ইংরেজি বক্তৃতা প্রতিযোগিতার ওখান থেকে কেউ ফোন করেছে তোমাকে,' ফোনের জন্য ইউকিহোকে ডেকে বলেছিলেন রেইকো।

'আসছি।' বলেই নিচে চলে যায় সে।

ততক্ষণে মাসাহারুর যাওয়ার সময় হয়ে গেছিলো বলে সে তাড়াতাড়ি কফিটা শেষ করে নিচে নামছিলো, আর তখনই দেখতে পায় ইউকিহো হলওয়েতে বসে ফোনে কথা বলছে। একটা কঠিন ছাপ এঁটে ছিলো তার মুখে। একটু দ্বিধা নিয়ে সে যখন চলে যাওয়ার ইশারা করে, তখন একপলকের মধ্যে ইউকিহোর মুখাবয়ব হাসিতে পরিবর্তিত হয়ে যায়।

'তাহলে ইউকিহো ইংরেজি বক্তৃতা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে? বাহ, ভালোই হয়েছে,' রেইকোকে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলেছিলো সে।

'যদি অংশ নেয় আর কি। আমি এই প্রথম শুনলাম এই বিষয়ে,' বলেছিলেন রেইকো।

এরপরে মঙ্গলবার তার স্বাভাবিক রুটিন অনুযায়ী একটা রামেন[১২] শপে ডিনার করতে যায় সে। দোকানের ভেতরে থাকা ছোট টিভিতে কিছু একটা দেখছে আর খাচ্ছে, এমন সময় রাস্তার পাশ দিয়ে কাউকে দ্রুত চলে যেতে দেখে। ভালো করে তাকিয়ে দেখলো, ওটা ইউকিহো ছিলো।

অস্বাভাবিক রকমের তাড়া ছিলো তার, দেখেই বোঝা যাচ্ছিলো। যার কারণে দ্রুত রাস্তায় নেমে একটা ট্যাক্সি নিয়ে চলে গেছিলো সে।

রাত দশটা বাজছিলো সে সময়। *নিশ্চয়ই কিছু একটা হয়েছে*, ভেবেছিলো মাসাহারু। চিন্তিত অবস্থায় রামেন শপে থাকা ফোনটা দিয়ে ইউকিহোর বাড়িতে ফোন দেয় সে। কয়েকবার বাজার পরে ফোনটা ধরেছিলেন রেইকো।

'কিছু হয়েছে কি?' মাসাহারুর গলা শুনেই জিজ্ঞেস করেছিলেন তিনি। তার স্বরটা উদ্বেগের থেকে অবাক হওয়ার মতোই বেশি শোনাচ্ছিলো।

মাসাহারু দ্বিধা নিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'ইউকিহো বাড়িতে আছে?'

'হ্যাঁ, কথা বলবে ওর সাথে?'

'কীহ! ওখানে দাঁড়িয়ে আছে সে?'

'না, উপরের ঘরে আছে। আগামীকাল কীসের যেন ক্লাব ইভেন্ট রয়েছে। তার জন্য তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়েছে সে যাতে সকাল সকাল উঠতে পারে। তবে আমার মনে হচ্ছে এখনো জেগেই আছে সে।'

অল্প কিছুক্ষণের জন্য ভাবনায় পড়ে গেল মাসাহারু। 'না, থাক তাহলে,' বললো সে। 'পরের সপ্তাহে কথা বলে নেবো আমি। তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু না।'

'নিশ্চিত তুমি?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওকে ঘুমিয়ে থাকতে দিন।'

'আচ্ছা। আমি তাহলে সকালে বলবো যে রাতে ফোন করেছিলে তুমি।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে। দুঃখিত এত রাতে বিরক্ত করার জন্য।'

তারপর ফোনটা কেটে দিয়েছিলো দ্রুত। বগলের নিচে ঘাম জমে গেছিলো তার।

তার মানে ইউকিহো রাতের বেলা পালিয়ে বাড়ির বাইরে যায়...কিন্তু কোথায়?

এর আগের দিন যে ফোনটা ধরেছিলো ইউকিহো সেটার সাথে সম্পর্কিত কিছু একটা হয়েছে হয়তো, ভাবলো মাসাহারু। মনে মনে এটাও আশা করছিলো যেন তার এইমাত্র দেওয়া ফোন কলটা ইউকিহোকে অন্য কিছু ভাবতে না দেয়।

পরের দিন কল করলো ইউকিহো।

'সরি,' বললো সে। 'গত রাতে ফোন করেছিলেন আপনি? আসলে ক্লাবের একটা কাজ ছিলো আজ সকালে, তাই তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কী জন্যে ফোন করেছিলেন?'

'তেমন কিছুই না,' বললো সে। 'ভাবলাম কোনো সমস্যা হলো কি না তোমার, সেজন্য ফোন করেছিলাম আর কি।'

'ওহ, কীরকম সমস্যার কথা বলতে চাচ্ছেন?'

'যেরকম সমস্যা হলে তোমাকে রাত দশটা বাজে ট্যাক্সি ঠিক করতে দেখা যায় সেরকম সমস্যা। বেশ চিন্তিত দেখাচ্ছিলো তোমাকে।'

কথাটা ওকে কিছুক্ষণের জন্য থামিয়ে দিলো। ধীর গলায় বললো, 'আপনি দেখেছেন আমাকে?'

'রামেন শপ থেকে,' মৃদু হেসে বললো মাসাহারু।

দীর্ঘশ্বাস ফেললো ইউকিহো। 'ধন্যবাদ মাকে না বলার জন্য।'

'বললে ভালো হতো না তোমার জন্য, তা আমি জানি।'

'না, মোটেও ভালো হতো না,' হাসতেই হাসতেই বললো ইউকিহো।

'তো কী হয়েছিলো? আমার মনে হয় সেদিনের ফোন কলটার কারণে কিছু একটা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।' যদিও ফোনের ওপাশে মেয়েটার গলা শুনে মনে হচ্ছে অতটা সিরিয়াস কিছু হয়নি।

'আপনার বুদ্ধি আছে বটে,' ইউকিহো বললো। 'আসলে আমার এক ফ্রেন্ড আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে।'

'কী! আসলেই?'

'আসলে ছ্যাঁকা খেয়েছে ও। আমার মনে হয় অতটা ভেবেচিন্তে কাজটা করেনি সে। সে যাক গে, আমি আর আমার কিছু বন্ধু মিলে দেখতে গেছিলাম। মা শুধুশুধু চিন্তা করবে বলে বাসায় বলিনি।'

'হ্যাঁ, বুঝতে পারছি কেন বলোনি। তোমার বন্ধুর কী অবস্থা এখন?'

'ভালো আছে। ধন্যবাদ জিজ্ঞেস করার জন্য। আমার মনে হয় আমাদেরকে দেখে একটু উন্নতি হয়েছে তার।'

'যাক, শুনে ভালো লাগলো।'

'পাগলামি মনে হচ্ছে না বিষয়টা? একটা ছেলের জন্য মরতে বসেছিলো, ভাবা যায়?'

'এ নিয়ে তোমার সাথে একমত আমি।'

'আচ্ছা, সে যাই হোক,' বললো সে। 'মাকে বলবেন না দয়া করে।'

'ও নিয়ে ভাবতে হবে না তোমাকে।' এরপরে ধন্যবাদ দিয়ে ফোন রেখে দেয় সে।

মাসাহারু কল্পনা থেকে ফিরে এলো। আপনমনেই হাসছে সে। যে ইউকিহোকে সে পড়ায় আর যার সাথে সেদিন ফোনে কথা বলেছে, তাদের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য বিদ্যমান। *কারো মনের ভেতরে কী চলছে তা জানাটা বেশ কঠিন। এই বয়সি মেয়েদের ক্ষেত্রে তো অনেক বেশ কঠিন*, ভাবলো সে।

চিন্তা করবেন না, আপনার মেয়ে ততটাও বোকা না যতটা আপনি ভাবছেন, পাশের বেতের চেয়ারে বসে বলতে নিয়েছিলো সে।

হাতে থাকা চা-টা যখন শেষ হলো, তখন মূল দরজা খোলার শব্দ শুনলো সে।

'মনে হচ্ছে এসে পড়েছে ও,' উঠে দাঁড়িয়ে বললেন রেইকো।

মাসাহারুও তার দেখাদেখি উঠে দাঁড়ালো। দরজার কাচের উপর পড়া প্রতিবিম্বটা দেখছে। *গাধা*, নিজেই নিজেকে বললো। *এত ঘাবড়ানোর কী আছে এখানে?*

***

আন্ডারগ্র্যাজুয়েট থিসিসের জন্য মাসাহারুকে উত্তর ওসাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের ছয় নাম্বার ল্যাবরেটরিতে রোবট কন্ট্রোল সিস্টেম নিয়ে তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করতে হচ্ছে। আরো সুনির্দিষ্ট করে বলতে গেলে, সে একমুখী ভিজুয়াল ইনপুট প্রয়োগ করে একটা কম্পিউটারের মাধ্যমে ত্রিমাত্রিক বস্তুকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা চালাচ্ছে–যাতে করে রোবটের চোখ দিয়ে এই বিশ্বকে দেখতে এবং বুঝতে পারা যায়।

ডেস্কে বসে ডিবাগিং করছিলো, এমন সময় পেছন থেকে কে যেন ডাক দিলো তাকে।

'এই, মাসাহারু, এটা দেখো।' মিনোবে নামের ছেলেটা ডেকেছে তাকে। সেও এখানকারই ছাত্র। তার হিউলেট-প্যাকার্ড কোম্পানির পার্সোনাল কম্পিউটারের সামনে বসে রয়েছে সে, চোখ ডিসপ্লের দিকে।

উঠে এসে তার পেছনে দাঁড়ালো মাসাহারু। কম্পিউটারের স্ক্রিনে একরঙা একটা ছবি দেখা যাচ্ছে। একটা লম্বা, আয়তাকার কিছু একটার উপর তিনটা বর্গাকার বস্তু রাখা। আগেও কোথায় যেন দেখেছিলো সে এটা। একটা কম্পিউটার গেম। গেমটার নাম *সাবমেরিন*। গেমের উদ্দেশ্য হলো প্রতিপক্ষের সাবমেরিনটা দ্রুত ডুবিয়ে দেওয়া। তিন অক্ষবিশিষ্ট কো-অরডিনেট ডাটায় অবস্থান দেখে নিয়ে আন্দাজ করতে হয় যে প্রতিপক্ষের সাবমেরিনটা আসলে কোথায় আছে। যদি আক্রমণ করতে খুব দেরি করে ফেলে তো বুম! প্রতিপক্ষ তার জায়গা দখল করে নেবে চোখের পলকে।

আন্ডারগ্র্যাজুয়েট আর গ্র্যাজুয়েট ছাত্রছাত্রীরা তাদের অবসর সময়ে এই ছয় নাম্বার রুমে একসাথে বসে বানিয়েছিলো গেমটা। সব রকমের কাজ শেয়ার করা হয়েছে ওখানে, ফ্লো-চার্ট থেকে শুরু করে প্রোগ্রামিং পর্যন্ত। একটা আন্ডারগ্রাউন্ড প্রজেক্টকে ল্যাবরেটরির অনেকে নিজেদের থিসিসের থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করে ফেলেছিলো বলে ধারণা মাসাহারুর।

'কী করবো এটা দিয়ে? *সাবমেরিন* গেম এটা,' বললো মাসাহারু।

'আসলেই? ভালো করে দেখো তো!'

'হাঁহ?'

'আরে, স্থানাঙ্কের যে প্যাটার্নটা এখানে ব্যবহার করা হয়েছে, তার দিকে লক্ষ করেছ? আগেরটা থেকে আলাদা ওটা। খোদ সাবমেরিনের আকারই অন্য রকম হয়ে গেছে।'

মিনোবে যেটা দেখাতে চাচ্ছে তা একটু ঝুঁকে দেখতে লাগলো মাসাহারু। 'আসলেই তো। কেউ কি প্রোগ্রামটা পালটে দিয়েছে নাকি?'

'নাহ। আমাদের ভেতর থেকে তো কেউ করেনি—এটা অন্তত জানি।' কম্পিউটারের টেপে থাকা বাটনে চাপ দিয়ে ক্যাসেটটা বের করে আনলো মিনোবে। মাসাহারুকে দেখালো সেটা। ক্যাসেট টেপটার উপরে প্রিন্ট করে লেখা হয়েছে: *মেরিন ক্র্যাশ।*

'এটা কী?'

'তিন নাম্বার রুমের নাগাতা এটা আমাকে ধার দিয়েছে।'

'ও কোথায় পেয়েছে এটা?'

'এটা দেখো।' জিন্সের পকেট থেকে একটা লিফলেট বের করলো মিনোবে। দেখে মনে হচ্ছে কোনো ম্যাগাজিন থেকে নেওয়া হয়েছে ওটা। টেবিলের উপর রাখতেই ওতে থাকা লেখাগুলো দেখতে পেল মাসাহারু।

পার্সোনাল কম্পিউটারের জন্য সকল প্রকার গেম পাওয়া যায় এখানে

আর তার নিচে একটা লিস্টে কী কী গেম আছে এবং তার মূল্য দেওয়া হয়েছে। সব মিলিয়ে ত্রিশটার মতো গেম। সবচেয়ে কম দামিটা এক হাজার ইয়েন। আর সবচেয়ে বেশি দামেরটা পাঁচ হাজার ইয়েনের কিছু বেশি।

মেরিন ক্র্যাশ সবার মাঝখানে রয়েছে। বড় করে প্রিন্ট করে সামনে আলাদা করে লিখে দেওয়া হয়েছে: 'আকর্ষণীয়'। আরো তিনটা গেম অবশ্য বোল্ড করে প্রিন্ট করা হয়েছে, তবে এটাতে চার তারকা দেওয়া হয়েছে আলাদা করে। *মেরিন ক্র্যাশ* সেসবের থেকে একটু বেশিই এগিয়ে আছে, আর এসব বিক্রি করছে আনলিমিটেড ডিজাইনস নামের একটা কোম্পানি। মাসাহারু এমন নামের কোনো কোম্পানির কথা আগে শোনেনি কোথাও। 'তো ওরা কি এগুলো মেইলের মাধ্যমে অর্ডার নিয়ে বিক্রি করছে নাকি?'

'হ্যাঁ। অনেকগুলোই দেখেছিলাম আশেপাশে। কিন্তু অতটা খেয়াল করে দেখিনি। নাগাতা হয়তো এ সম্পর্কে আরো আগে থেকে জেনে থাকবে। তারই কোনো বন্ধু অর্ডার দিয়েছিলো এটা। পরে সে একটা কপি নিয়ে এসে দেখেছিলো। একদম পুরো আমাদেরটার মতোই এটা।'

'হচ্ছেটা কী এসব?' মাথা ঝাঁকালো মাসাহারু।

'*সাবমেরিন*,' চেয়ারে হেলান দিয়ে বলা শুরু করলো মিনোবে, 'আমাদের অরিজিনাল গেম। মানছি পুরোটাই অরিজিনাল না, ওটা সেই এমআইটি গেমের উপর ভিত্তি করে বানিয়েছিলাম, কিন্তু ঐ গেমটাকে তো পুরোপুরিভাবে আমরাই রূপদান করেছি, তাই না? কী মনে হয়, কতটুকু চান্স আছে আমাদের আইডিয়ার সাথে অন্য কারো আইডিয়া পুরোপুরি মিলে যাওয়ার? তার উপর একদম একই রকম দেখতে তৈরি করা...কতটা কাকতালীয় মনে হয় তোমার কাছে?'

'এরকম হওয়া তো সম্ভবই না। এর অর্থ কী তাহলে?'

'আমাদের মধ্য থেকে কেউ একজন *সাবমেরিন*-এর কাজ পাচার করে দিয়েছে এই আনলিমিটেড ডিজাইনস কোম্পানির কাছে।'

'অসম্ভব!'

'এছাড়া আর কোনো ভালো ব্যাখ্যা আছে তোমার কাছে? একমাত্র আমরাই প্রোগ্রাম নিয়ে কাজ করেছিলাম ওটার। সবাই-ই যত্নশীল ছিলো কাজটা প্রকাশের জন্য।'

চুপ করে রইলো মাসাহারু। ঠিক বলছে সে। এটা যে কেউ বাইরে নিজেদের নামে বিক্রি করছে, এর প্রমাণ তার চোখের সামনেই রাখা আছে। 'মনে হচ্ছে আমাদের একটা মিটিং ডাকা দরকার,' বললো মাসাহারু।

'ভালো বলেছ। দুপুরের খাবারের পরে হলে কেমন হয়? সবাইকে পাওয়া যাবে তখন। কিছু একটা বের করতে পারবো আমরা। সামনাসামনি যে এই চুরির জন্য দায়ী সে আর মিথ্যা বলতে পারবে না।' মিনোবে ভ্রুকুটি করে চশমাটা হাতে তুলে নিলো।

'আসলে আমার কেন যেন ভাবতে কষ্ট হচ্ছে আমাদের মধ্য থেকে কেউ এটা সেই কোম্পানির কাছে পাচার করেছে।'

'তুমি চাইলে ওদেরকে বিশ্বাস করতে পারো, তাতে সমস্যা নেই। কিন্তু একটা কথা মাথায় রেখো: আমাদের মধ্যেই একজন বিশ্বাসঘাতক লুকিয়ে আছে।'

'বুঝতে পারছি না। আচ্ছা, দুর্ঘটনাবশত লিক হয়নি তো? কেউ হয়তো কাজ করছিলো, এমন সময় সেটা দেখে নিয়ে যায়নি তো কেউ?'

'তার মানে বলতে চাচ্ছো চোর আসলে আমাদের মধ্যে কেউ না, বরং আমাদের পরিচিত কেউ?'

'হ্যাঁ, এমনটাই হয়েছে হয়তো।' মাথা দোলালো মাসাহারু। যদিও 'চোর' শব্দটা তার পছন্দ হলো না। এটা ওয়ালেট টান দিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো কোনো বিষয় না। এই ব্যাপারটা অন্য রকম।

'যাই হোক, আমাদের তবে গ্রুপের সাথে কথা বলা উচিত,' হাতদুটো ছড়িয়ে দিয়ে বললো মিনোবে।

মিনোবে সহ ছয়জন মিলে *সাবমেরিন* তৈরি করেছিলো। ছয়জনের সবাই-ই দুপুরের খাবার শেষে ছয় নাম্বার রুমে এসে জড়ো হলো। মিনোবে পুরো বিষয়টা খুলে বললো সবার কাছে, কিন্তু কেউ বলতে পারলো না কী করে এমনটা হয়েছে।

সবার থেকে সিনিয়র একজন বলে উঠলো, 'মনে হয় না আমাদের গ্রুপের কেউ এটা পাচার করেছে। যদি আমাদের মধ্য থেকে কেউ বিক্রি করতে চাইতো, তবে তো সে আগে আমাদের সাথেই কথা বলতো। মানে একসাথে বিক্রি করার চিন্তা করলে অন্তত গ্রুপকে জানাতো।'

কেউ কি পরিচিত কাউকে *সাবমেরিন* ধার হিসেবে দিয়েছিলো কি না জানতে চাইলো মিনোবে। তিনজন বললো যে তারা তাদের বন্ধুদেরকে খেলতে দিয়েছিলো, কিন্তু এতটা সময় একা থাকতে দেয়নি যে কেউ সেটাকে কপি করে নিয়ে যাবে।

'তাহলে একটা অপশনই থেকে গেল তবে,' বলে উঠলো মিনোবে। 'কেউ একজন কাউকে না জানিয়ে কারো কাছ থেকে চুরি করেছে ওটা। পেছনের কথা মনে করো। ভালো করে মনে করার চেষ্টা করো সবাই। যদি আমরা না করে থাকি, তবে নিশ্চয়ই আমাদের পরিচিত কেউ ওদের কাছে গেমটা বিক্রি করেছে।'

মিটিং শেষে নিজের ডেস্কে ফেরার পরে মাসাহারুর তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছিলো সব। তার নিজের ক্যাসেট কেউ নেবে এটা হতেই পারে না। সাবমেরিনের ক্যাসেট সে তার নিজ বাসায় অন্যান্য ক্যাসেটের ভেতর রেখেছিলো। খুব কম সময়ের জন্য বের করেছে সে ওগুলো, চোখের আড়াল করার তো প্রশ্নই আসে না। ল্যাবরেটরিতে আনা তো বহু দূরের কথা।

এই ব্যাপারটা যতটা না রহস্যময় লাগছে, তার থেকেও বেশি বিহ্বল করে দিচ্ছে ওকে। গেমটা ওরা দুষ্টুমির জন্যই তৈরি করেছিলো, নিজেদের খেলার জন্যই বানিয়েছিলো। কিন্তু সেটাই যে বাইরে কেউ মোটা অঙ্কে বিক্রি করতে পারে, এই ধারণাটা ছিলো না। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো প্রোগ্রাম এখন প্রোডাক্ট হয়ে গেছে। এটা যে অভূতপূর্ব একটা উদ্যোগ তা আর বলার দাবি রাখে না।

রেইকোর সাথে সেদিন কথা বলার দুই সপ্তাহের মাথায় মাসাহারু তার বন্ধু কাকিউচির সাথে পাবলিক লাইব্রেরিতে গেল। কাকিউচি একটা সাবজেক্ট নিয়ে রিসার্চ করছে। স্কুলের একই হকি টিমে খেলে তারা। কয়েকটা পুরোনো কাগজ দেখতে দেখতে হঠাৎ হেসে উঠলো সে।

'এটা দেখো।' একটা আর্টিকেলের দিকে নির্দেশ করলো মাসাহারু। 'আমার এখনো মনে আছে এর ব্যাপারে। আমার মা প্রায় প্রত্যেক সকালে আমাকে দিয়ে টয়লেট পেপার আনানোর জন্য লম্বা লাইনে দাঁড় করিয়ে রাখতো।' আর্টিকেলটা দোসরা নভেম্বর ১৯৭৩ সালের। ছবিতে দেখা যাচ্ছে উত্তর ওসাকার একটা সুপারমার্কেটের সামনে প্রায় তিনশো লোক লাইনে দাঁড়িয়ে আছে টয়লেট পেপার নেওয়ার জন্য। এটা হলো অয়েল শকের সময়কার কথা। আর কাকিউচির রিসার্চ বিদ্যুতের চাহিদা নিয়ে।

'ওরা কি টোকিওতেও এরকম লাইন ধরেছিলো নাকি?' জিজ্ঞেস করলো কাকিউচি।

'হ্যাঁ, তবে ওখানে হয়েছিলো সম্ভবত ডিটারজেন্টের জন্য। আমার এক চাচাতো ভাই বলতো যে তাকে নাকি *শপিং মিশনে* পাঠানো হচ্ছে।'

'আরে হ্যাঁ, এই তো। এই দেখো, এক মহিলা চল্লিশ হাজার ইয়েনের ডিটারজেন্ট কিনেছে এক সুপারমার্কেট থেকে। তোমার মা না তো আবার?' একটা বিদঘুটে হাসি দিয়ে বললো কাকিউচি।

মাসাহারুও পালটা হাসলো। 'আরে নাহ, আমরা তত দিনে ওখান থেকে এসে পড়েছিলাম।' হাই স্কুলের ফার্স্ট ইয়ারেই ওসাকাতে চলে এসেছিলো তারা। সে সময়ে এরকম নিউজে মন দেওয়া থেকে এখানে মানিয়ে নেওয়াটাই বরং বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিলো তার জন্য।

হঠাৎ ওর মাথায় একটা ভাবনা এলো যে ইউকিহো তখন কীসে পড়তে পারে। হয়তো পঞ্চম শ্রেণিতে পড়তো সে সময়ে। ঐ সময়ে ওর বয়স কত ছিলো তা কল্পনা করতে একটু কসরত করতে হচ্ছিলো তার।

হঠাৎ তার রেইকোর কথা মনে পড়লো। তিনি বলেছিলেন যে ইউকিহো সিক্সে থাকতেই তার মা মারা যায়। তার মানে, ১৯৭৪ সালের ঘটনা ওটা।

আর তারপর ১৯৭৪ সালের মে মাসের পত্রিকা টান দিয়ে চোখ বোলাতে লাগলো সে। হেডলাইনগুলো পড়তে লাগলো একে একে: *অল্পাহার সেশন চালু হয়েছে*, *পরিবেশ রক্ষা আইন সংশোধন*, *ইউজেনিক প্রটেকশন এক্ট-এর বিরুদ্ধে নারী নেত্রীদের আন্দোলন* ইত্যাদি ইত্যাদি।

দেশের খবর নামক শিরোনামের পাতাটা উলটালো মাসাহারু। খুব ছোট ছোট লেখাগুলোও নজরে আনতে লাগলো সে। হঠাৎ একদম কর্নারে ছোট করে একটা লেখা নজরে পড়লো তার।

আগুন নিভে যাওয়ায় গ্যাস পয়জনিং?

নিচে বিস্তারিত লেখা রয়েছে:

'ওসাকার ওয়ে জেলার ইকুনো ওয়ার্ডের ইওশিদা হাইটস অ্যাপার্টমেন্ট থেকে ফুমিও নিশিমোতো (৩৬) নামের এক মহিলার মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মরদেহটি ঐ বিল্ডিংয়ের রিয়েল এস্টেট এজেন্সির এক কর্মীর দ্বারা প্রথম শনাক্ত করা হয়েছিলো। এরপর অ্যাম্বুলেন্সকে ফোন দেয় সে। ইকুনো ওয়ার্ডের কর্মরত পুলিশদের মতে, পুরো ঘরটা গ্যাসে ভরপুর ছিলো, যার কারণে গ্যাস পয়জনিং হয়ে মারা যান নিশিমোতো। তারা আরো বলে যে চুলার উপরে স্যুপ রান্না করার সময় পানি ফুটে আগুন নিভে যায় এবং সারা ঘরে গ্যাস ছড়িয়ে পড়ে।'

খবরটা রেইকোর থেকে শোনা কাহিনির সাথে একেবারে মিলে গেল। শুধু ইউকিহোর কথাটা বাদে, যে সেখানে উপস্থিত ছিলো সে। অবশ্য, সে সময়ে তার বয়স কম ছিলো বলেই হয়তো ওর নামটা লেখেনি নিউজ কর্তৃপক্ষ।

'মজার কিছু খুঁজে পেয়েছ নাকি?' জিজ্ঞেস করলো কাকিউচি।

'হ্যাঁ, কিছুটা।' আর্টিকেলের দিকে ইশারা করে তার ছাত্রী সম্পর্কে পুরো ঘটনাটা বললো মাসাহারু।

'আরে বাপরে!' কাকিউচি নিজে একবার খবরের কাগজটা টেনে নিয়ে পড়লো আর্টিকেলটা। 'ওয়ে, হাঁহ? নাইতোর বাড়ি তো ওদিকটায়।'

'আসলেই? সে ওদিক থেকেই আসে?'

'আমার জানামতে তাই।' নাইতো ওদের থেকে এক বছরের জুনিয়র। একই হকি টিমের প্লেয়ার।

'আচ্ছা, ওকে একবার জিজ্ঞেস করবো তবে,' বলে উঠলো মাসাহারু। অ্যাপার্টমেন্টের নামটা মনে রাখার চেষ্টা করলো।

এর দুই সপ্তাহ পরে একদিন এ বিষয়ে নাইতোকে জিজ্ঞেস করার সুযোগ পেল সে। ছোটখাটো গড়নের একটা ছেলে। বরফের উপর হকি খেলার সময় দারুণ স্লিপ করতে পারে। যদিও তার ওজন দেখে তাকে হাস্যকর মনে হতে পারে, কিন্তু খুবই ভদ্র স্বভাবের ছেলে। যার কারণে হকি টিমও তাকে বাছাই করেছে।

নতুন বছর শুরু হওয়ার পরে তেমন একটা প্র্যাকটিসে আসা হয় না মাসাহারুর। এমনিতেও সে হকি খেলা বেছে নিয়েছিলো এই কারণে যাতে সারা দিন প্রোগ্রাম লিখতে লিখতে যেন মোটা না হয়ে যায়। অ্যাথলেটিক্স মাঠে নাইতোকে দেখলো মাসাহারু।

'ওহ, ঐ যে মহিলাটা গ্যাসের কারণে মারা গেল, সে? মনে পড়েছে আমার। অনেক দিন আগের ঘটনা যদিও,' শোনার পরে বললো নাইতো। 'আমাদের সামনের বাড়িতেই হয়েছিলো ওটা। মানে অতটা সামনে না আর কি, অল্প একটু হাঁটতে হতো।'

'তার মানে সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছিলো ঘটনাটা?'

'সবাই-ই জেনে গেছিলো বিষয়টা। তবে সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো, অনেকে গুজব ছড়িয়েছিলো যে ওটা নাকি কোনো দুর্ঘটনা ছিলো না।'

'তুমি বলতে চাচ্ছো কোনো কারণে আত্মহত্যা করেছে সে?'

'হ্যাঁ,' ওর দিকে তাকিয়ে বললো নাইতো। 'তো ওটা দিয়ে আপনার কী কাজ?'

'আরে আমার না। ব্যাপারটা আসলে এক বন্ধুর সাথে সম্পর্কিত।' তারপর ব্যাখ্যা করলো মাসাহারু।

পুরো ঘটনাটা শোনার পরে চোখ বড় বড় হয়ে গেল নাইতোর। 'ওয়াও, আপনি তার মেয়েকে পড়ান? কাকতালীয় ব্যাপার তো!'

'পরে ঐ গুজব কেন ছড়িয়েছিলো? মানে, লোকজন কেন মনে করেছিলো যে সে আত্মহত্যা করেছে?'

'বিস্তারিত তেমন জানি না। আমি হাই স্কুলে পড়তাম তখন,' মাথা চুলকাতে চুলকাতে বললো নাইতো। হঠাৎ চোখ উপরে উঠিয়ে বললো, 'দাঁড়ান, হয়তো সেই লোকটা জানবে এ বিষয়ে।'

'কোন লোক?'

'রিয়েল এস্টেট এজেন্সির লোক। পার্কিং করার জন্য ওকে ভাড়া দিতে হয় আমার। একদিন এই গ্যাস নিয়ে ওকে কথা বলতে শুনেছিলাম। যারা মনে করে ঐ মহিলা আত্মহত্যা করেছে, সেও তাদের মধ্যে একজন।'

'আর্টিকেলটায় বলা হয়েছিলো যে একটা রিয়েল এস্টেট এজেন্সির কর্মী মরদেহটা উদ্ধার করেছিলো। এটাই কি তোমার সেই লোকটা?'

'আরে হ্যাঁ! হতে পারে তো!'

'তুমি খুঁজে বের করতে পারবে?' বললো মাসাহারু। ও জানে এটার জন্য বেশ খাটতে হবে ছেলেটাকে, কিন্তু মাসাহারু নাইতোর থেকে সিনিয়র। আর কলেজের হকি টিমে সিনিয়রদেরকে আলাদা সম্মান দেওয়া হয়।

আবারো মাথা চুলকালো নাইতো। 'সমস্যা নেই, জিজ্ঞেস করবো তাকে আমি।' একটা ঘাবড়ে যাওয়ার মতো হাসি দিলো সে।

সেদিন সন্ধ্যাবেলাই নাইতোর টয়োটা গাড়িতে চেপে বসলো মাসাহারু।

'তোমাকে ভেজালের মধ্যে ফেলে দেওয়ার জন্য দুঃখিত,' গাড়ি ছাড়ার কিছু পরে বললো মাসাহারু।

'আরে না, না, ভাই, কিছু মনে করিনি আমি। এমনিতেও আমার বাসার ওদিকটাতেই ঐ রাস্তা,' হেসে বললো নাইতো।

সাহায্য করার বিষয়ে নাইতো যেভাবে কথা দিয়েছিলো, ঠিক তেমনটাই করলো। ঐ লোকটাকে জিজ্ঞেস করতেই সে বললো যে ওটা তার ছেলে ছিলো। সে-ই পাঁচ বছর আগে গ্যাস পয়জনিং-এ নিহত মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার করেছিলো। ফুকাবেশিতে একটা নতুন এজেন্সিতে আছে সে এখন। মাসাহারু সেই জায়গারই একটা ম্যাপ আর ফোন নাম্বার নিয়ে নিলো সেখান থেকে।

'তো আপনি আপনার পড়ানোর ব্যাপারটা নিয়ে এতটা সিরিয়াস, হাঁহ?' বলে উঠলো নাইতো। 'মানে ওটার জন্যই তো করছেন এসব, না? অর্থাৎ, বাচ্চাটা সম্পর্কে যতটুকু জেনে নিতে পারেন, তাই না?' এরপরেই মাথা ঝাঁকালো সে। 'আমি হলে অবশ্য চাকরির জন্য এত কষ্ট করতাম না।'

মাসাহারু জবাবে কিছু না বলে চুপ করে রইলো। বলতে গেলে ও নিজেও জানে না কী জন্য করছে সে এসব। ও বুঝতে পারছিলো ইউকিহোর উপরে একটা টান তার রয়েছে। কিন্তু তার মানে এই না যে মেয়েটার সম্পর্কে সবকিছুই জানতে

হবে। মাসাহারু নিজেই বিশ্বাস করতো যে অতীত দিয়ে কখনো কাউকে বিচার করা যায় না।

হয়তো এত কিছু করার কারণ এটা হতে পারে যে ইউকিহোর বর্তমান সম্পর্কে ও বেশি কিছু জানে না, তাই। ওরা অনেক ভালো বন্ধুর মতোই কথাবার্তা বলে, কিন্তু তবুও মাসাহারুর কাছে কেন যেন মনে হয় ইউকিহো অনেক দূরের কোনো মানুষ। কেন এমন হয় তা জানে না সে, আর এটাই তাকে আরো বেশি করে ঠেলে দিচ্ছে জানার জন্যে।

মেইন রোড থেকে সরু একটা পথে যাওয়ার কিছু পরেই ওরা তাগাওয়া রিয়েল এস্টেট এজেন্সির একটা শাখা দেখতে পেল।

ভেতরে শুকনো মতো একজন লোককে ডেস্কে দেখা গেল, ফর্ম ভরছিলো বসে বসে। ওদেরকে দেখার পর উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো যে কোনো অ্যাপার্টমেন্টের খোঁজ করছে কি না ওরা। নাইতো বলে দিলো যে তারা ঐ দুর্ঘটনাটা সম্পর্কে জানতে এসেছে। 'আপনাদের ইকুনো শাখার এক কর্মীর সাথে কথা বললাম। সে বললো যে এখানকার বস মি. তাগাওয়া নাকি কী ঘটেছিলো তা দেখেছে।'

'আমিই তাগাওয়া,' কিছুটা সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো লোকটা। 'সেই মান্ধাতার আমলের কাহিনি দিয়ে আপনাদের কী কাজ?'

'সেই সময়ে আপনার সাথে একটা মেয়ে ছিলো, তাই না? যখন লাশ খুঁজে পান তখন?' জিজ্ঞেস করলো মাসাহারু। 'ইউকিহো নিশিমোতো নাম ছিলো যার?'

শুষ্ক এক চাহনি দিলো লোকটা। 'ওর কোনো আত্মীয় আপনি?

'আসলে আমার ছাত্রী সে। পড়াই ওকে আমি।'

'ওহ, আচ্ছা,' বললো লোকটা। 'কোথায় থাকে এখন সে? আমার জানামতে, মা মারা যাওয়ার পরে এতিম হয়ে গেছিলো মেয়েটা।'

'ওর এক আত্মীয়ের সাথে থাকে। মেয়েটার সারনেম এখন কারাশাওয়া।'

মাথা নাড়লো লোকটা। 'তা কেমন আছে সে? সেদিনের ঘটনার পর আর কখনো দেখিনি ওকে।'

'ভালোই আছে। জুনিয়র হাই স্কুলে পড়ছে সে এখন।'

'আচ্ছা, তাহলে তো ভালোই। সময় চলে যায় কেমন কেমন করে, তাই না?' লোকটা পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে একটা সিগারেট পুরলো মুখে। প্যাকেটের দিকে নজর দিতেই মাসাহারু খেয়াল করলো মাইল্ড সেভেনের সিগারেট। পুরোনোগুলো না, সম্ভবত সেভেনের নতুন প্রডাক্ট। মাসাহারু বেশ অবাক হলো এরকম বয়সের কোনো লোক এতটা ট্রেন্ড মেনে চলছে ভেবে।

'ও কি এ ব্যাপারে কখনো কিছু বলেছে?' মুখ থেকে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে জিজ্ঞেস করলো মি. তাগাওয়া।

'আপনি সাহায্য করেছেন, এটা বাদে তেমন কিছু বলেনি এ ব্যাপারে,' কিছুটা মিথ্যা বললো মাসাহারু।

'আসলে পুরোটাই সত্য, তবে বেশ অবাক করার মতো ছিলো ঘটনাটা।' মাথার পেছনে হাত দিয়ে চেয়ারের সাথে হেলান দিলো তাগাওয়া। এরপর পুরো ঘটনাটার বর্ণনা দিলো ওদের কাছে। সেদিন কী হয়েছিলো, কীভাবে হয়েছিলো, পুরো কাহিনিটাই বললো।

'লাশ পাওয়ার পরের ঘটনাটা তো আরো বাজে ছিলো,' কাহিনি শেষ করে বললো তাগাওয়া। 'পুলিশ সব ধরনের প্রশ্ন করা শুরু করেছিলো আমাকে। অ্যাপার্টমেন্টের ভেতরে যাওয়ার পর সবকিছু কেমন অবস্থায় ছিলো, জানালা বা স্টোভ বাদে আর কিছুতে হাত দিয়েছিলাম কি না। যে পাতিলটা চুলার উপরে রাখা ছিলো সেটা ধরেছিলাম কি না। দরজা আসলেই লক করা ছিলো কি না ইত্যাদি ইত্যাদি। খুবই ভয়াবহ অবস্থা ছিলো সে সময়।'

'পাতিলটা নিয়ে কি কোনো সমস্যা ছিলো নাকি?'

'আমার দেখামতে তো ছিলো না। ওরা বলছিলো যে যদি স্যুপ ফুটে চারপাশে ছড়িয়ে পড়তো, তবে নাকি ময়লা হয়ে থাকতো জায়গাটা। অবশ্যই স্যুপ বাইরে পড়ে ছিলো, নয়তো আগুন নিভলো কীভাবে, বলুন?'

ঘটনাটা মাসাহারু তার মাথায় ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করলো। ও নিজেও দুয়েকবার রামেন স্যুপ চুলায় রেখে কাজ করতে গেছিলো। আর তা চুলার আশেপাশে পড়ে জায়গাটা ময়লা করে দিয়েছিলো ঠিকই।

'যাক, শুনে ভালো লাগলো যে মেয়েটা ভালো আছে। যেহেতু ও এখন যে বাড়িতে আছে সে বাড়ির মানুষেরা প্রাইভেট টিউটর রাখতে পারে, তবে ভালোই আছে বলা যায়। নিজের মায়ের সাথে বেশ ভোগান্তিই পোহাতে হতো তাকে।'

'কোনো সমস্যা ছিলো নাকি ওর মায়ের?'

'হ্যাঁ, গরিব ছিলো অনেক। মিসেস নিশিমোতোর জীবনটা অনেক কষ্টের ছিলো। একটা নুডলসের দোকানে কাজ করতো সে। বাড়ি ভাড়াই ঠিকমতো দিতে পারতো না অনেক সময়। কয়েক মাসের বকেয়া পড়েই থাকতো তাদের কাছে।'

মাসাহারু নিজের অভিজ্ঞতার সাথে মিলিয়ে দেখলো; মনে হলো যেন অন্য কোনো গ্রহের কথা শুনছে।

'এর কারণেই হয়তো স্বাভাবিক বয়সের থেকে একটু বেশিই বয়সি দেখাতো মেয়েটাকে। একটু বেশিই সচেতন, বুঝলেন তো? আমার মনে হয় না ও সেদিন তার মাকে পড়ে থাকতে দেখে কেঁদেছিলো।'

'আসলেই?' লোকটার মুখের দিকে তাকালো মাসাহারু। রেইকো বলেছিলেন শেষকৃত্যের দিন কেঁদেছিলো ইউকিহো।

'আচ্ছা, গুজবের ব্যাপারটা কী আসলে?' জিজ্ঞেস করে উঠলো নাইতো। 'মানুষ না বলাবলি করছিলো যে মহিলা আত্মহত্যা করেছে?'

'হ্যাঁ,' ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বললো তাগাওয়া। 'ঐ সময়ে কিছু একটা ঘটেছিলো আসলে। ঐ ঘটনাটা এটার সাথে মিলে আরো জটলা পাকিয়ে দিচ্ছিলো। গোয়েন্দাদের এ বিষয়ে কিছু বলতে শুনেছিলাম আমি।'

'কীরকম বিষয়ে?'

'এঁহ...ওরা বলেছিলো যে মিসেস নিশিমোতো নাকি ঠান্ডার জন্য ঔষধ খেত, তাও দিনে পাঁচবারের মতো। ময়লার বাক্সে ঔষধের খোসা পেয়েছিলো ওরা।'

'ওগুলো তার মৃত্যুর জন্য যথেষ্ট ছিলো নাকি?'

'না, তবে পুলিশ বলেছে যে সেই ঔষধই নাকি ঘুমিয়ে পড়তে সাহায্য করেছিলো তাকে। মানে বুঝতে পারছেন না? গ্যাস অন করে ঘুমিয়ে পড়া। আসলে ঘুমের ঔষধ পাওয়া তো সহজ ছিলো না, তাই ঠান্ডার ঔষধ দিয়ে কাজ চালিয়েছিলো সে।'

'বেশ হতাশার মধ্যে ছিলো তবে,' মাথা দুলিয়ে বললো মাসাহারু।

'মদও খেত, জানেন! পুলিশ তিনটা মদের বোতলও পেয়েছিলো তার ময়লার ঝুড়িতে। ঐ যে যেগুলো সস্তায় পাওয়া যায় আর কি। যদিও অত বেশি খেত না।'

'বুঝলাম।'

'হ্যাঁ, আর জানালার ব্যাপারে তো বলাই হয়নি,' স্মৃতি মনে পড়াতে গড়গড় করে বলে যাচ্ছে তাগাওয়া। 'কারো কারো কাছে সবকিছু এরকম বন্ধ করে রাখাটা অস্বাভাবিক ঠেকেছিলো। ঐ বিল্ডিংয়ের রান্নাঘরে কোনো ভেন্টিলেশন ছিলো না। তাই ভাড়াটিয়ারা রান্না করলে জানালার কপাট খুলে রান্না করতো।'

'তারপরেও,' বলে উঠলো মাসাহারু, 'পুরো ব্যাপারটা স্রেফ দুর্ঘটনাই হতে পারে, তাই না?'

'হ্যাঁ, আর এজন্যই আত্মহত্যার বিষয়টাতে অতটা নজর দেয়নি পুলিশ। কোনো রকম ধোঁয়া দেখেনি তারা, এছাড়াও ঔষধের ব্যাপারটারও একটা ব্যাখ্যা দিয়েছিলো তার মেয়ে।'

'কী বলেছিলো ইউকিহো?'

'বলেছিলো যে তার মায়ের নাকি এক সপ্তাহ থেকেই ঠান্ডা লেগে ছিলো, আর মাঝে মাঝে ঠান্ডার কারণেই একটু-আধটু মদ খেত আর কি। গোয়েন্দাদের অবশ্য মনে হয়েছিলো যে কেবল ঠান্ডার জন্যই এত কিছু...একটু বেশিই হয়ে যায়। কিন্তু কিছুই করার ছিলো না তাদের। সত্যটা জানতে হলে মহিলাকেই কবর থেকে তুলে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হতো। তবে সবচেয়ে বড় ব্যাপার হলো, যদি সে আত্মহত্যাই করতে যাবে, তবে চুলায় রান্না কেন বসাবে? যাই হোক, ওরা পরে ঘোষণা দেয় যে ওটা একটা দুর্ঘটনা ছিলো—এই-ই যা। পুলিশ অবশ্য বলেছিলো যে আরো আধা

ঘণ্টা আগে আমরা তাকে উদ্ধার করলে হয়তো সে বেঁচে থাকতো আজ। চিন্তা করে দেখুন, মাত্র ত্রিশ মিনিট! কত বড় দুর্ভাগা ছিলো! যা-ই ভাবুন না কেন, দুর্ঘটনা অথবা আত্মহত্যা, আসলে সেদিনই তার মৃত্যুর দিন নির্ধারিত ছিলো হয়তো।'

***

বাদামি রঙের লম্বা, মসৃণ চুলগুলো একেবারে মুখের উপর এসে পড়লো ইউকিহোর। বাঁ হাত দিয়ে কানের পেছনে গুঁজে দিলো সে, কিন্তু তবুও দুচারটা সেখানেই থেকে গেল অবাধ্য হয়ে। তার সাদা, মোলায়েম গালটাতে চুমু খেতে ইচ্ছা করছে মাসাহারুর। অবশ্য, ইউকিহোর গালে সেই প্রথম দিন থেকেই চুমু খাওয়ার ইচ্ছা তার।

একটা সমস্যা সমাধান করছে ইউকিহো। সাদা পৃষ্ঠার উপরে পেন্সিল দিয়ে ভেদাঙ্কের একটা অঙ্ক করছে সে।

'হয়ে গেছে,' সময় শেষ হওয়ার আগেই বলে উঠলো ইউকিহো।

ধীরে সুস্থে সূত্রগুলো দেখতে লাগলো মাসাহারু। হাতের লেখা চমৎকার মেয়েটার। প্রত্যেকটা সংখ্যা বা দাগ একদম কারুকার্যখচিত কোনো শিল্পের মতো মনে হয়।

'সুন্দর হয়েছে,' ওর দিকে ফিরে বললো মাসাহারু। 'নিখুঁত হয়েছে আসলে। কোনো কিছুই ভুল যায়নি।'

'উফ, এই প্রথম,' মেয়েটা বললো।

হাসলো মাসাহারুও। 'আচ্ছা, শোনো, বোঝা যাচ্ছে প্রাথমিক ধারণাগুলো পেয়ে গেছ তুমি। যেহেতু এই অঙ্কটা ঠিকঠাক করতে পেরেছ, সেহেতু বাকি সবগুলোই পারবে। কারণ বাকি সবগুলোই প্রায় একরকম।'

'তবে তো একটু ছুটি মিলবে মনে হচ্ছে। দাঁড়ান, আমি চা নিয়ে আসি।'

উঠে চা আনতে চলে গেল সে। তার ডেস্কে বসে রইলো মাসাহারু। কী করা উচিত বসে বসে তা ভেবে পেল না। তার অবশ্য রুমের ভেতর খুঁটিনাটি দেখার ইচ্ছা জেগেছিলো। ড্রয়ারে কী আছে, নোটবুকে কী লিখে রাখে ইত্যাদি। এমনকি কী ধরনের মেকআপ ব্যবহার করে তাও দেখতে ইচ্ছা করছিলো তার। তবুও করলো না কারণ হুট করে ইউকিহো এসে পড়লে সমস্যা হয়ে যাবে। ও চায় না ইউকিহোর কাছে খারাপ হতে। এমন সময়গুলোতে সে কিছু ম্যাগাজিন খুলে পড়ে, কিন্তু ম্যাগাজিনটা তার ব্যাগের মধ্যে রাখা আছে। আর ব্যাগটাও নিচ তলার মেঝেতে রাখা। প্রথম বর্ষে থাকাকালীন হকি খেলার সময় থেকেই ব্যাগটা ব্যবহার করে সে। তবে ব্যাগটা যে পুরোনো হয়ে গেছে তা বোঝা যায় বিধায় ইউকিহোদের নিচ তলার দরজার পাশেই ওটাকে রেখে পড়াতে আসে সে।

তার চোখ গিয়ে পড়লো ছোট্ট একটা রেডিওর উপর। বুকশেলফের পাশেই রাখা আছে ওটা। কিছু ক্যাসেট টেপও রয়েছে ওখানে। পাশে থাকা নামগুলোতে

চোখ বোলাতে লাগলো সে: সবগুলোই ইউমি আরাইয়ের নতুন বের হওয়া পপ মিউজিক। সাইড থেকে দেখা দৃশ্যটা তাকে আরেকটা জিনিস মনে করিয়ে দিলো: *সাবমেরিন*-এর সেই ক্যাসেটটা। এখনো কোনো খোঁজ পায়নি আসলে কে বা কারা ক্যাসেটটা লিক করেছে। মিনোবে অবশ্য কোম্পানির বিজ্ঞাপনে থাকা নাম্বারে ফোন করেছিলো, কিন্তু তাতে কোনো লাভ হয়নি।

'আমি ওদের জিজ্ঞেস করেছিলাম যে তারা গেমটার প্রোগ্রাম কোথায় পেয়েছে। কিন্তু বললো যে কোনো রকম প্রশ্নের উত্তর নাকি তারা দেয় না। একটা মহিলা ধরেছিলো ফোনটা। তো আমি তাকে বললাম যে ফোনটা তাদের কোনো পুরুষ টেকনিশিয়ানকে দিতে। কিন্তু লোকটা মেয়েটার থেকেও বেশি চালাক। আমার মনে হয় এরাই অপরাধী কিন্তু স্বীকার করতে চাইছে না। মনে হচ্ছে তাদের বাকি গেমগুলোও তারা অন্য কোথাও থেকে চুরি করেছে,' বলেছিলো মিনোবে।

'আমরা ওদের ঠিকানায় গেলে কেমন হয়?' সাজেশন দিলো মাসাহারুও।

'তাতেও কোনো লাভ হবে বলে মনে হচ্ছে না,' বলেছিলো মিনোবে। 'আমরা সফটওয়্যার চুরির ব্যাপারে কথা বলতে যাচ্ছি, এটা শুনলে ওরা ঢুকতেই দেবে না আমাদের।'

'যদি *সাবমেরিন*-এর একটা কপি সাথে নিয়ে ওদের দেখাই তবে?'

আবারো মাথা ঝাঁকালো মিনোবে। 'কী প্রমাণ আছে যে *সাবমেরিন-ই* অরিজিনাল কপি? ওরা বলবে যে তাদের মেরিন না কোন বাল—ঐটা দেখে আমরাই কপি করেছি।'

চুল ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছা হচ্ছে মাসাহারুর। 'তাহলে তো দেখছি তাদের এই চুরি থামানোর কোনো উপায়ই নেই!'

'একদম,' বললো মিনোবে। 'আমাদের আরো আগেই এই গেমের কপিরাইট নিয়ে নেওয়া উচিত ছিলো। ল' নিয়ে পড়া আমার এক বন্ধু বলেছে এটা। আমি ওকে জিজ্ঞেসও করেছিলাম যে কোনো উপায়ে চুরি প্রমাণ করতে পারলে আমরা টাকা-পয়সা কিছু পাবো কি না। উত্তরে বলেছে যে কিছুই পাবো না। কারণ কপিরাইট ছাড়া এগুলোর মূল্য কিছুই না।'

'বাহ,' তিক্ততার সাথে বললো মাসাহারু। 'তবে আমার এখনো মন চাচ্ছে এই কাজটা কে করেছে তা বের করতে।' এরপর ঠান্ডা গলায় আরেকটু যোগ করলো, 'এবং এর মূল্য যে কী তা হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে দিতে।'

এরপরে যারা যারা *সাবমেরিন*-এর কথা জানতো বা শুনেছে, মিনোবে তাদের সবাইকে একত্র করার উপদেশ দিলো। 'গেমটা চুরি করতে হলে চোরের অবশ্যই *সাবমেরিন* সম্পর্কে জানতে হবে আগে,' এটাই বলেছিলো সে। তারপর একেকজন একেকজনের নাম বলছিলো এসে এসে। তারা আরো মানুষের, এরপর তারাও

আরো অনেকের নাম নিচ্ছিলো। দেখা গেল যে স্কুলের বন্ধুরাও সবাই ওটার সম্পর্কে জানে।

'এদের মধ্য থেকেই কেউ না কেউ আনলিমিটেড ডিজাইনসের সাথে যুক্ত আছে,' দীর্ঘশ্বাস নিয়ে নামের লম্বা লিস্টটা দেখতে দেখতে বললো মিনোবে।

ওর দীর্ঘশ্বাসের মানেটা বুঝতে পেরেছিলো মাসাহারু। ও নিজেও সন্দিহান যে সরাসরি কোনো কানেকশন তারা পাবে কি না। হয়তো প্রোগ্রামটা একজন থেকে আরেকজন—এরকম করে সেই কোম্পানির হাতে গিয়ে পড়েছে। ভাগ্য কাজ না করলে ঐ কোম্পানিকে ধরাটা অসম্ভব তাদের জন্য।

'যাক, আমাদের উচিত যাদের যাদের সাথে আমরা *সাবমেরিন* নিয়ে কথা বলেছিলাম, তাদের সাথে আবার কথা বলা শুরু করা। এতে কোনো না কোনো রাস্তা পাওয়া যাবে।' তার নিজের ক্ষেত্রে খুব কম লোকের সাথে এ নিয়ে আলাপ করেছিলো মাসাহারু। এটা যে নিরাপত্তার জন্য ছিলো, তেমন না আসলে। তার ডিপার্টমেন্টের বাইরে এতে কারো আগ্রহ থাকতে পারে, এটাই ভাবতে পারেনি কখনো সে। গ্রাফিক্সের কিছু বিষয় ছাড়া *স্পেস ইনেভেডার*-এর মতোই ছিলো ওটা।

বস্তুত ইউকিহোকে ছাড়া আর কাউকেই এই গেম সম্পর্কে বলেনি সে। একদিন বিকালবেলা সে বিশ্ববিদ্যালয়ে কী নিয়ে পড়াশোনা করে এটা জানতে চেয়েছিলো ইউকিহো। সেদিনই এ নিয়ে কথা বলেছিলো সে। প্রথমে ওর প্রোগ্রামিং নিয়ে কথা বলা শুরু করেছিলো, কিন্তু ছাত্রীর তেমন একটা আগ্রহ দেখতে না পেয়ে গেমের ব্যাপারে বলা শুরু করে সে। ভালো কাজে দিয়েছিলো সেটা। বর্ণনা শুনে চোখ বড় বড় হয়ে গেছিলো ইউকিহোর।

'গেম বানাচ্ছেন? শুনতে তো বেশ লাগছে,' বলেছিলো মেয়েটা। 'আচ্ছা, কীরকম গেম বানাচ্ছেন?'

সাবমেরিন-এর একটা ছবি এঁকে দেখিয়েছিলো তাকে সেদিন। এরপর ব্যাখ্যা করেছিলো কী কী করতে হয় তার। প্রত্যেকটা কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলো মেয়েটা। শেষে বললো যে সে খুবই আনন্দিত এরকম কাজ মাসাহারু নিজ থেকে করছে দেখে।

'ওহ, ওটা আমাদের গ্রুপের সবাই মিলে করেছি,' বললো মাসাহারু।

'কিন্তু আপনি তো জানেন এটা কী করে কাজ করে, তাই না?'

'হ্যাঁ, অনেকটাই।'

'দেখেছেন, আসলেই দারুণ কিছু।'

মেয়েটার কথা বলা আর তাকানোর ভঙ্গি দেখে বুকের ভেতর মোচড় দিয়ে উঠেছিলো মাসাহারুর। ওর থেকে পাওয়া এমন প্রশংসা উন্মাদ করে দিচ্ছিলো তাকে।

'কখনো খেলতে পারলে বেশ ভালো লাগবে আমার,' ওর ছাত্রী বললো।

কিন্তু নিজের কোনো কম্পিউটার না থাকায় এবং ওকে ল্যাবে না নিয়ে যেতে পারার কারণে মন খারাপ হয়েছিলো তার। ইউকিহোও কিছুটা মন খারাপ করেছিলো সেদিন।

'আমার একটা ধনী বন্ধু থাকলেই হতো এখন,' বলেছিলো মাসাহারু।

'একটা কম্পিউটার হলেই খেলা যাবে ওটা?'

'সাথে একটা টেপ লাগবে, এই-ই যা।'

'টেপ? কেমন টেপ?'

'ঐ এমনিতেই যেরকম ক্যাসেট টেপ দেখো না? ওরকম। ওটার ভেতরে সব তথ্য থাকে। গান শোনার টেপ না আবার।'

মুগ্ধতা ছড়িয়ে পড়লো তার ছাত্রীর চেহারা থেকে। পরে কখনো ওকে দেখাতে পারবে কি না সে বিষয়ে জিজ্ঞেসও করলো।

'করাই যায়,' বললো মাসাহারু। 'ওগুলো স্বাভাবিক ক্যাসেটের মতোই দেখতে। ঐ যেগুলো তোমার কাছে আছে সেরকম।'

'তারপরেও একটু দেখবো আমি।'

'আচ্ছা, আনবো তবে একদিন।'

পরের দিন মাসাহারু তার সাথে করে টেপটা নিয়ে এসেছিলো। ভেবেছিলো মেয়েটা দেখে আশাহতই হবে।

'ওয়াও, স্বাভাবিক টেপের মতোই তো দেখাচ্ছে,' নিজের হাতে নাড়াচাড়া করার সময় বললো ওর ছাত্রী।

'আগেই বলেছিলাম।'

'আমি কল্পনায়ও ভাবিনি এরকম কাজ এই টেপ দিয়ে করা যায়,' টেপটা ফেরত দিতে দিতে বললো ইউকিহো। 'ব্যাগে রেখে আসেন ওটা। অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য থাকতে পারে আপনার।'

'অতটাও গুরুত্বপূর্ণ কিছু না,' বললো সে। যদিও পরক্ষণেই ভাবলো কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ এটা। এরপর নিচ তলায় নেমে ব্যাগের মধ্যে রেখে এসেছিলো টেপটা।

প্রোগ্রামের সাথে অতটুকুই সাক্ষাৎ ঘটেছিলো ইউকিহোর। এরপর ওরা দুজনের কেউই আর এ ব্যাপারে কথা তোলেনি। এমনকি মিনোবেকেও এই ব্যাপারে কিছু বলেনি সে। ইউকিহো প্রোগ্রামটা নিতে পারে, এই কথাটাই কেন যেন হাস্যকর লাগতো ওর কাছে। এমনটা যে হতে পারে, তা কখনো মাথাতেও আসেনি ওর।

অবশ্য, ইউকিহো সেদিন চাইলে অনায়াসেই মাসাহারুর ব্যাগ থেকে টেপটা নিতে পারতো। তাকে শুধু বাথরুমে বা কিছু আনতে যাওয়ার অভিনয় করতে হতো, ব্যস। কিন্তু তারপর কী করতো সে? টেপটা চুরি করাই যথেষ্ট না এর জন্য। মাসাহারুর যাতে সন্দেহ না হয় সেজন্য দুই ঘণ্টা পড়ানোর সময়টুকুতে ওটা কপি করে আসলটা ব্যাগে ফিরিয়ে দিতে হতো। কিন্তু তাতে লাভ কী হতো? টেপ কপি

করার জন্য যে যন্ত্র দরকার তা তো ওর কাছে নেই–মাসাহারু জানে। ইউকিহোর কোনো পার্সোনাল কম্পিউটারও নেই। আর তার উপর একটা তথ্যভরা টেপ কপি করা অতটাও সহজ কাজ না।

যদিও ছাত্রীকে চোর হিসেবে ভাবতে বেশ মজাই লাগছিলো ওর, এরমধ্যেই দরজাটা খুলে গেল।

'হাসছেন কী জন্য আপনি?' দুটো কাপে চা নিয়ে ঢোকার সময় জিজ্ঞেস করলো ইউকিহো।

'না, ও কিছু না,' বললো মাসাহারু। 'বাহ, ঘ্রাণটা দারুণ তো!'

'দার্জিলিং-এর চা এটা।'

ডেস্কের উপর কাপ দুটো রাখতেই একটা কাপ নিয়ে দ্রুত চুমুক দিলো সে। কিছুটা চা তার জিন্সের প্যান্টের উপরও ছিটকে পড়লো। ঝাড়া দিয়ে মোছার জন্য কাপটা নামিয়ে রাখলো সে। 'আরে, কী যে করলাম...' রুমাল বের করতে গিয়ে এক টুকরো কাগজ নিচে গড়িয়ে পড়লো মাসাহারুর পকেট থেকে।

'ঠিক আছেন আপনি?' জিজ্ঞেস করলো ইউকিহো।

'ঠিক আছি। অতটাও পড়েনি।'

'কিছু একটা নিচে পড়ে গেছে আপনার পকেট থেকে,' মেঝে থেকে কাগজটা তুলতে তুলতে বললো মেয়েটা। কিন্তু যখন ওটাতে চোখ বোলালো, ওর বাদামি রঙের চোখদুটো বড় বড় হয়ে গেল যেন। 'এটা কী?' মাসাহারুর দিকে তুলে ধরলো কাগজটা। কাগজে একটা হাতে আঁকা ম্যাপ। আর তার নিচে 'তাগাওয়া রিয়েল এস্টেট' লেখা রয়েছে।

হায় হায়।

'তাগাওয়া রিয়েল এস্টেট? ইকুনোতে?' ছাত্রী জিজ্ঞেস করলো। একটু আগের হাসি হাসি ভাবটা চলে গেছে তার মুখ থেকে।

'না, ইকুনোতে না তো,' দ্রুত বললো সে। 'হিগাশিনারি ওয়ার্ডে এটা। এই যে এখানে লেখা ফুকায়েবাশি লেখাটা দেখছো?' আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলো মাসাহারু।

'কিন্তু সেটাও তো ইকুনোরই একটা শাখা। তার ছেলে খুলেছে সেটা।'

'হাঁহ, জানতাম না তো!' মাসাহারু শতভাগ চেষ্টা করতে লাগলো যাতে তার চেহারায় বিব্রত হওয়ার ছাপ না পড়ে।

'আপনি কি অ্যাপার্টমেন্ট খুঁজছেন?'

'নাহ! আমার এক বন্ধুর সাথে গেছিলাম।'

'ওহ, আচ্ছা...' ঐ বাদামি চোখদুটো যেন হারিয়ে গেল বহু দূরে। 'এইমাত্র একটা অদ্ভুত ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল আমার।'

'কী বলছো?'

'ইকুনোর অরিজিনাল তাগাওয়া রিয়েল এস্টেট-এর বিল্ডিংয়ে আমার শৈশব কেটেছে। সেখানেই বাস করতাম আমি। ওয়ে জেলায়।'

'আসলেই?' চায়ের কাপের দিকে তাকিয়ে বললো মাসাহারু। ছাত্রীর চোখের দিকে তাকাতে পারছে না সে।

'আপনি কি আমার মা কবে মারা গেছে সে বিষয়ে শুনেছেন? মানে আমার আসল মা আর কি,' খুব গম্ভীর এবং শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো সে।

'কই, না তো! তেমন কিছু তো শুনিনি!' কাঁপা গলায় বললো সে।

হেসে উঠলো ইউকিহো। 'খুব বাজে অভিনয় করেন আপনি। ঐদিন যখন আমার আসতে দেরি হয়েছিলো, সেদিন মা আপনাকে সব খুলে বলেছে। বলেনি, বলুন?'

'উমম...হ্যাঁ, একটুখানি বলেছিলো বটে।' কাপটা টেবিলে রেখে মাথা চুলকাতে লাগলো মাসাহারু।

ইউকিহো নিজের কাপ থেকে কয়েক চুমুক খেয়ে লম্বা একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো।

'মে মাসের বাইশ তারিখ,' বললো সে। 'আমার মা মারা যায়।'

নিঃশব্দে মাথা নাড়লো মাসাহারু।

'কিছুটা ঠান্ডা ছিলো সেদিন। কার্ডিগান পরা ছিলাম আমি। ওটা মা নিজ হাতে বানিয়ে দিয়েছিলো আমার স্কুলে যাওয়ার জন্য। এখনো আমার কাছে আছে সেটা।'

কর্নারে থাকা ড্রেসারের দিকে তাকালো মেয়েটা। মাসাহারু বুঝতে পারলো যে কতটুকু আর্তনাদ লুকিয়ে আছে ওটার মধ্যে।

'খুবই মর্মান্তিক ছিলো ঘটনাটা,' বললো মাসাহারু। এরপরেই কেন এমন কথা বললো তা নিয়ে খচখচানি শুরু হয়ে গেল তার মনে।

'মনে হচ্ছিলো কোনো স্বপ্ন দেখছি–অবশ্যই দুঃস্বপ্ন,' বললো ইউকিহো। অমলিন একটা হাসিতে মুখটা ছেয়ে গেল তার। 'স্কুল শেষে বন্ধুদের সাথে খেলতে গেছিলাম। এর জন্যই বাড়ি ফিরতে সেদিন দেরি হয়েছিলো কিছুটা। যদি না খেলতে যেতাম, তবে অন্তত এক ঘণ্টা আগে বাড়িতে চলে যেতাম।'

মাসাহারু বুঝতে পারছে ও কী বলছে। ঐ এক ঘণ্টাই তার জীবনের সবকিছু পালটে দিয়েছে।

নিচের ঠোঁটটা একটু কামড়ে আবার বললো সে, 'যখনই এ সম্পর্কে ভাবি, আমি–'

ওর কণ্ঠে কান্নার শব্দ শুনে নড়েচড়ে উঠলো মাসাহারু। একবার রুমাল এগিয়ে দেওয়ার কথা ভাবলেও জায়গা থেকে নড়ার সাহস পেল না।

'মাঝে মাঝে মনে হয় আমিই মেরে ফেলেছি তাকে,' বললো ইউকিহো।

'এরকমটা ভাবা উচিত না তোমার। তুমি তো আর ইচ্ছা করে দেরি করোনি,' বললো মাসাহারু।

'ওটার কথা বলিনি। মায়ের তখন বেশ খারাপ সময় যাচ্ছিলো। ঘুম বাদ দিয়ে কাজ করতো সে। যদি আমি একটু সাহায্য করতাম, তাহলে হয়তো এতটা কষ্ট করতে হতো না তাকে...'

মাসাহারু দেখলো এক ফোঁটা চোখের পানি তার সাদা গাল বেয়ে নিচে গড়িয়ে পড়ছে। ওকে ভীষণ জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছা হচ্ছে তার। *একটা আস্ত গাধা আমি*, মনে মনে নিজেকে গালি দিলো মাসাহারু। সেই রিয়েল এস্টেট কোম্পানির কাছে কাহিনিটা শোনার পর থেকেই একটা অসুস্থ চিন্তা ওর মাথায় ঘুরছে।

অনেকগুলো ঠান্ডার ঔষধ খাওয়া, মদ আর জানালা বন্ধ করা, এগুলো সবই আত্মহত্যার দিকেই ইঙ্গিত করে। কিন্তু যেটা মিলছে না সেটা হলো, পাতিল থেকে গড়িয়ে পড়া ফুটন্ত স্যুপ। যদি পড়ে থাকতো, তবে অবশ্যই সেখানে ময়লা জমতো। কিন্তু পুলিশের মতে তা জমেনি। অর্থাৎ, যতটুকু জমেছে তা আগুন নেভানোর জন্য যথেষ্ট না।

হয়তো বা এটা আত্মহত্যাই ছিলো। আর সে সময়ে কেউ একজন ঘরে ঢুকে অমন দেখতে পেয়ে স্যুপ ফেলে দিয়ে চলে যায় যাতে ওটা একটা দুর্ঘটনা মনে হয়। আর এই কাজটা ইউকিহো বাদে আর কেউ করতে পারে না। ওর পক্ষেই স্যুপটা ফেলে দেওয়া সম্ভব ছিলো। মদের কাপ আর ঔষধের প্যাকেটও ওরই কাজ হওয়া সম্ভব।

কিন্তু ও কেন এটাকে দুর্ঘটনা হিসেবে দেখাতে চাইবে? ও কি মানুষ কী ভাববে তা নিয়ে ভয় পেয়ে গেছিলো? যদিও এই পর্যায়ে আরেকটা প্রশ্ন মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। যদি সেদিন রিয়েল এস্টেট এজেন্সির লোকের সাথে আসার আগে ইউকিহো বাড়িতে এসে থাকে, তবে ততক্ষণে কি তার মা মারা গেছিলো? নাকি চাইলেই বাঁচানো যেত তাকে? মি. তাগাওয়া না বলেছিলো যে আর আধা ঘণ্টা আগে পৌঁছাতে পারলেই বাঁচাতে পারতো তাকে?

নাকি ছোট্ট ইউকিহোর মাথায় অন্য কিছু চলছিলো? নিজের মাকে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দেখাটাকে হৃদয়বিদারক হিসেবে না নিয়ে নিজের রাস্তা পরিবর্তন করার একটা সুযোগ হিসেবে নিয়েছিলো? প্রতি সপ্তাহে রেইকো কারাশাওয়ার বাড়িতে যাতায়াত করার ফলে কি ওর মাথায় এটাই ঢুকে গেছিলো যে যদি তার মায়ের এমন কিছু হয়ে যায়, তবে সে এই বাড়িতে এসে থাকতে পারবে?

চিন্তাটা মাথা থেকে না পারছে ঝাড়তে, আর না পারছে রাখতে। তার ইচ্ছা করছিলো চিন্তাটা ঝেড়ে ফেলে দেয়, কিন্তু সম্ভাবনাগুলো এতটাই বাস্তবিক যে তা করতেও পারছিলো না সে।

কিন্তু এইমাত্র ইউকিহোর চোখের পানি দেখে নিজেই নিজেকে ধিক্কার দিলো সে এমন চিন্তাভাবনা করার জন্য। তার সামনে বাস্তবে একটা নরম মনের মেয়ে বসে আছে। এরকম ঠান্ডা মাথার কাজ তাকে দিয়ে হবে না।

'এতে তোমার কোনো দোষ নেই ইউকিহো,' মুখ ফুটে বললো সে। 'তোমার এরকমটা ভাবাই উচিত না। তোমার মা হয়তো যেখানে আছে, সেখানে বসে দুঃখ পাচ্ছে তোমার জন্য।'

'আমার কাছে যদি সেদিন চাবিটা থাকতো,' কান্নার মধ্য থেকেই বললো ইউকিহো।

'এটা একটা দুর্ভাগ্য ছিলো।'

ইউকিহো তার মাথা নেড়ে উঠে দাঁড়ালো। তার স্কুলের পোশাকটার দিকে এগিয়ে গিয়ে একটা চাবি বের করে বললো, 'এজন্যই আমি এখন আমার সাথে চাবিটা রাখি সব সময়।'

'আরে, চাবির রিংটা তো বেশ আগের মনে হচ্ছে,' বললো মাসাহারু।

'হ্যাঁ। এটা সব সময় আমার কাছে থাকতো। শুধু সেদিনই ছিলো না।'

চাবিটা আবার যখন আলমারির ভেতর ভরতে নিলো, রিং-এ থাকা ছোট বেলটা টুং করে বেজে উঠলো তখন।

অধ্যায় পাঁচ

টিকেট গেট পার হতেই হট্টগোলের শব্দ যেন আছড়ে পড়লো ওদের উপর। পাশের একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেরা একে অপরের উপর দিয়ে এসে সেইকা গার্লস কলেজের মেয়েদের হাতে প্রচারপত্র দেওয়ার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। 'আমাদের টিমে যোগ দাও', 'আমাদের স্কিইং ক্লাবে এসো' ইত্যাদি বলে চেঁচাচ্ছে ওরা। গলা না ভাঙার আগ পর্যন্ত চেঁচাতেই থাকলো ছেলেগুলো।

এরিকো একটাও প্রচারপত্র না নিয়ে খুব দ্রুত বেরিয়ে এলো স্টেশন থেকে। ইউকিহোর সাথে চোখে চোখ মিলে যেতেই হেসে উঠলো দুজনে।

'উফ, দারুণ তো!' বললো এরিকো। 'জানি না কতগুলো স্কুলের ছেলেপেলে ছিলো ওখানে।'

'আজকের দিনটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ ওদের কাছে,' পালটা জবাব দিলো ইউকিহো। 'একটা উপদেশ দেই, শোনো: কোনো প্রচারপত্র দেওয়া ছেলের সাথে ভাব জমিও না।' হাত দিয়ে লম্বা চুলগুলো পেছনের দিকে ছুঁড়ে দিলো সে।

সেইকা গার্লস কলেজের স্কুল বিল্ডিংগুলো আবাসিক এলাকার কিছু নতুন বাড়ির মাঝখানে অবস্থিত। অবশ্য, এখানে-সেখানে কিছু পুরোনো বাড়িও আছে। তিনটা ডিপার্টমেন্ট নিয়ে গঠিত হয়েছে এই ছোট্ট কলেজটা: ইংরেজি সাহিত্য, গার্হস্থ্য অর্থনীতি আর শরীরচর্চা। বোঝাই যায় যে শহরটায় অনেক কলেজ থাকলেও তেমন কোনো ছাত্রী নেই সেইকাতে। যার কারণে বেশিরভাগ সময় নীরব থাকে কলেজটা। কিন্তু রিক্রুটমেন্টের সময় আশেপাশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ছেলেরা নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ে সেইকা গার্লস কলেজের মেয়েদেরকে তাদের ক্লাবে ভেড়ানোর জন্য। এদিক দিয়ে আবার অগ্রণী ভূমিকা পালন করে এইমেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা। স্কুলে যাওয়ার পুরো পথটায় তারা ঘুরঘুর করতে থাকে। নতুন কাউকে পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে তার দিকে।

'ক্লাবে জয়েন করতে না চাইলে করতে হবে না তোমাদের!' পাশ দিয়ে চলে যাওয়ার সময় একজন চেঁচিয়ে উঠলো। 'শুধু পার্টিতে এসো। কোনো রকম টাকা-পয়সাও দিতে হবে না কিন্তু!'

স্বাভাবিক সময়ে পাঁচ মিনিটে পৌঁছে যাওয়ার রাস্তায় তাদের আজ বিশ মিনিট লেগেছে। ওদের প্রতি অন্যদের তুলনায় বেশিই আকর্ষণ দেখিয়েছে ছেলেগুলো। অবশ্য, এরিকো জানে এগুলো সবই ইউকিহোর জন্যই করছিলো ওরা। এরকমটাই হয়ে আসছে, সেই মিডল স্কুল থেকে।

কলেজ গেট দিয়ে ঢুকে যাওয়ার পরে হট্টগোলটা নেতিয়ে পড়তে শুনলো তারা। এরিকো আর ইউকিহো দুজনেই জিমনেসিয়ামের দিকে যাচ্ছে। উদ্বোধন অনুষ্ঠান সেখানেই হবে এ বছর।

ভাঁজ করা চেয়ারগুলোর সামনে প্ল্যাকার্ডে ডিপার্টমেন্টের নাম লিখে রাখা হয়েছে। ইংরেজি ডিপার্টমেন্ট লেখা চেয়ারের সারিতে গিয়ে বসলো তারা। প্রায় চল্লিশজন নতুন শিক্ষার্থীর আসার কথা, কিন্তু অর্ধেকের মতো চেয়ার এখনো খালি। শিক্ষার্থীদের কোনো রকম বাধ্যবাধকতা ছিলো না অনুষ্ঠানে আসার, তাই হয়তো অনেকেই দেরি করে আসবে, ভাবলো এরিকো। ঠিক স্কুল ক্লাব রিক্রুটমেন্টের সময়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটা ডিপার্টমেন্ট হেড এবং সভাপতির সংবর্ধনার মধ্য দিয়ে শুরু হলো। বক্তব্যগুলো মারাত্মক রকমের বিরক্তিকর ছিলো, যার কারণে এরিকো হাই তোলা ছাড়া আর কিছুই করেনি সে সময়।

জিমনেসিয়ামের বাইরের মাঠে সারি করে রাখা আছে বিভিন্ন স্কুল ক্লাবের চেয়ার। এইমেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ছাত্রকেও দেখা যাচ্ছে, এখনো হালকা-পাতলা চেঁচাচ্ছে, কিন্তু সকালের মতো অতটা শক্তি নেই এখন আর।

'কোনো ক্লাবে জয়েন করবে নাকি?' বাইরে বের হওয়ার পরে ইউকিহোকে জিজ্ঞেস করলো এরিকো।

'করতে পারি,' অনাগ্রহ নিয়ে একবার পোস্টারগুলোর দিকে তাকিয়ে বললো সে।

'টেনিস ক্লাবের সংখ্যা দেখি অনেক বেশিই। স্কিইং-এর ক্ষেত্রেও একই অবস্থা,' বললো এরিকো।

দেখা গেল অধিকাংশ ক্লাবই এদুটো নিয়ে। তার কাছে মনে হয় এই খেলাগুলো ক্লাসে উপস্থিত করতে উৎসাহী করার চেয়ে বরং অনুপস্থিত থাকতেই বেশি উৎসাহিত করে।

'না, আগ্রহ নেই,' বললো ইউকিহো।

'নেই?'

'রোদে পুড়ে যাবো পরে।'

'তাও ঠিক।'

'তুমি কি জানো যে তোমার চামড়া কতটুকু অতিবেগুনি রশ্মি শোষণ করেছে তা মনে রাখে? তামাটে ভাবটা যদি চলেও যায়, এরপরেও কিন্তু যতটুকু ক্ষতি হওয়ার তা হয়ে যাবে। আর যখন আরো বয়স বাড়বে তোমার, চামড়া ভাঁজ হয়ে যাবে। অনেকে বলে যে শুধু তরুণদের চামড়াতেই নাকি রোদে পোড়া ভাব দেখা যায়, কিন্তু আমার মতে যাদের চামড়ায় কখনো তামাটে ভাব পড়া উচিত না, তরুণরা তাদের মাঝে একদম উপরের দিকে আছে।'

এরিকো তাকালো তার বন্ধুর দিকে। তার চামড়া 'ইউকি', মানে তুষারের মতো সাদা। আসলেই ওর এই চামড়া রক্ষা করা উচিত।

মেয়ে দুটোর দিকে মাছির মতো উড়ে আসতে শুরু করলো ছেলেগুলো। ওদেরকে বিভিন্ন ক্লাবে যোগ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছে সবাই। ইউকিহো সেদিকে কোনো রকম মনোযোগ দিচ্ছে না। তার চোখ পড়ে আছে একটা পোস্টারের উপর, যেটাতে লেখা রয়েছেঃ

বলরুম ড্যান্স

(এইমেই বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা যৌথ ক্লাব)

ক্লাব টেবিলে থাকা সদস্যদের সাথে দুটো নতুন মেয়ে কথা বলছে। খেলার সাজসরঞ্জাম পরা ছেলেমেয়ে নেই সেখানে। সেইকা গার্লসের মেয়েরা বা এইমেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেগুলো সবাই কালো রঙের ফিটফাট জ্যাকেট পরে আছে। অন্যান্য ক্লাবের সদস্যদের থেকে ওদেরকে একটু বেশি পরিণত এবং রুচিসম্পন্ন লাগছে।

ছেলেগুলোর মধ্যে একজন এইমাত্র খেয়াল করেছে যে ইউকিহো থেমেছে ওদেরকে দেখে। প্রায় তখনই সে এগিয়ে এলো ওদের দিকে।

'তুমি কি নাচতে আগ্রহী?' জিজ্ঞেস করলো সে। ছেলেটা যথেষ্ট হ্যান্ডসাম এবং কথায় একধরনের মাধুর্য আছে।

'কিছুটা,' সত্যিটাই বললো ইউকিহো। 'কিন্তু এর আগে কখনো চেষ্টা করিনি আমি। আর তেমন কিছু জানিও না এ ব্যাপারে।'

'প্রত্যেককে কোথাও না কোথাও থেকে শুরু করতে হয়,' বললো ছেলেটি। 'চিন্তার কিছু নেই, সামনের মাস থেকেই নাচতে শিখে যাবে।'

'আচ্ছা, না নেচে শুধু দেখা যাবে না?'

'অবশ্যই যাবে।' ছেলেটা ইউকিহোকে তাদের ডেস্কের সামনে পথ দেখাতে দেখাতে নিয়ে গেল। সেখানে সেইকা স্কুলেরও কিছু সদস্য রয়েছে। এর একটু পরেই হঠাৎ মনে পড়ার কারণেই বোধহয় ছেলেটা এরিকোকে জিজ্ঞেস করলো, 'আর তোমার?'

'না, না, আমি ঠিক আছি।'

'আচ্ছা!'

সোজা ইউকিহোর দিকে এগিয়ে গেল সে। হয়তো অন্য কোনো ছেলে এসে ওর সাথে আলাপ শুরু করে দেবে এ ভয় পাচ্ছে, ভাবলো এরিকো। অবশ্য, এরই মধ্যে আরো তিনজন ঘিরে ধরেছে ইউকিহোকে।

'তুমি অংশ নিচ্ছো না কেন?' হঠাৎ এরিকোর পেছন থেকে একটা কণ্ঠ বলে উঠলো। পেছনে তাকিয়ে একটা লম্বা ছেলেকে দেখতে পেল সে।

'না, না, ঠিক আছি আমি,' বললো এরিকো।

'না কেন?' হেসে জিজ্ঞেস করলো ছেলেটা।

'আমার মনে হয় নাচ-টাচ আমার জন্য না। ওসব আমাকে মানায় না। আর যদিও বা নাচি, আমার পরিবার আঁতকে উঠবে।'

'নাচের ভেতর কাকে মানালো আর কাকে মানালো না, এসবে আসলে কিছু যায় আসে না। তোমার বন্ধুও তো অংশ নিচ্ছে, তাই না?' ইউকিহোর দিকে ইশারা করে বললো সে। 'ওর সাথেই নাহয় একবার এসো। একপলক দেখো। যদি পছন্দ না করো তো নেই। কেবল দেখতে এসেছ বলেই নাচের ক্লাবে যোগ দিতে জোর করবো, ব্যাপারটা তা না।'

'সত্যিই বলছি, সমস্যা নেই।'

'নাচতে চাও না তাহলে?'

'আসলে তা না। সত্যি বলতে, আমার নিজের কাছেও নাচলে ভালো লাগবে। কিন্তু মনে হয় না আমি পেরে উঠবো,' মাথা ঝাঁকিয়ে বললো সে। 'আমার দ্বারা হবে না ওসব।'

'ওহ হো, আমার তো মনে হয় ভালোই হবে,' বলে উঠলো লম্বা ছেলেটা। তার চোখদুটো যেন হাসছে।

'মাথা ঘুরিয়ে পড়ে যাবো আমি।'

'মাথা ঘুরিয়ে?'

'সি-সিকনেস। এপাশ থেকে ওপাশে দ্রুত দোলাটা নিতে পারি না।'

চোখ বড় বড় করে তাকালো ছেলেটা। 'এর সাথে নাচের কী সম্পর্ক?'

'উমম,' একটু নিচু গলায় বললো এরিকো, 'ঐ যে ছেলেগুলো মেয়েদেরকে এপাশ থেকে ওপাশে ঘোরায় না? ঐ যে *গন উইদ দ্য উইন্ড* মুভিতে রেট বাটলার স্কারলেটকে যেভাবে ঘুরিয়েছিলো। ওটা দেখেই আমার পেটের মধ্যে গুড়গুড় করে উঠেছিলো।'

এরিকো সিরিয়াস মুখেই বলেছে কথাটা, কিন্তু মাঝপথে ছেলেটা হোহো করে হেসে ওঠার কারণে ভালো করে ব্যাখ্যাটা দিতে পারলো না সে।

'অনেক মানুষ নাচের কথা শুনলে একটু ঘাবড়ে যায় শুনেছি, কিন্তু এই প্রথম এরকম কোনো অজুহাত শুনলাম।'

'কিন্তু আমি তো মজা করছি না। আসলেই সমস্যা হয় আমার।'

'বিশ্বাস করি না আমি।'

'সত্যি বলছি।'

মাথা ঝাঁকালো ছেলেটা। 'তোমার উচিত অন্তত একবারের জন্য নিজের ভয়টাকে খতিয়ে দেখা।' এরিকোর হাত ধরে ডেস্কের দিকে টানতে টানতে নিয়ে গেল ছেলেটা।

অডিটের জন্য মাত্রই সাইন শেষ করেছে ইউকিহো। ডেস্কের ওপাশ থেকে তিনটা ছেলে কী যেন বলছে, তা নিয়ে হাসছে ইউকিহো। কিন্তু যখন দেখলো এরিকোকে ধরে নিয়ে আসছে একটা ছেলে, ওর চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল পুরোপুরি।

'আরেকজনকে পেয়েছি,' বলে উঠলো লম্বা ছেলেটা।

'আরে বাপরে! কাজুনারি রিক্রুটিংও করছে নাকি?' ডেস্কের পাশ থেকে বলে উঠলো একটা মেয়ে।

'আমার মনে হচ্ছে নাচ সম্পর্কে এই তরুণীর বেজায় ভুল ধারণা রয়েছে। আর তা ভেঙে দেওয়া দরকার।' এরিকোর দিকে তাকিয়ে দুপাটি সাদা দাঁত বের করে হাসলো ছেলেটা।

***

পাঁচটা নাগাদ নাচের অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেল। এরপর যেসব নতুন রিক্রুট ভালো দক্ষতা দেখিয়েছে, এইমেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ছাত্র ওদের ক্যাফেতে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছে। এই ক্যাফে ডেটই হলো ওদের অনেকের ক্লাবে জয়েন করার মূল উদ্দেশ্য।

আজকে রাতটা কাটানোর জন্য ওসাকার এক হোটেলে উঠেছে কাজুনারি শিনোজুকা। একটা জানালার পাশের সোফায় বসে আছে সে এখন, কোলের উপর একটা নোটবুক, যাতে ২৩টা নাম রয়েছে। *খারাপ না*, ভাবলো সে। নামের সংখ্যা অতটাও বেশি না, কিন্তু গত বছরের তুলনায় অনেক বেশি। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এদের মধ্যে আসলে কতজন জয়েন করবে।

'এ বছর অন্যান্য সময়ের থেকে আরো বেশি ছেলে জয়েন করেছে,' বিছানা থেকে বলে উঠলো কেউ একজন।

কানায়ে কুরাহাশি হাতে থাকা সিগারেটটায় একটা টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে দিলো উপরে। কাঁধের কিছু অংশ দেখা যাচ্ছে, যদিও কম্বল দিয়ে স্তন ঢেকে রেখেছে সে, তবুও। ডিম লাইটটা জ্বলার কারণে তার মুখের অদ্ভুত সৌন্দর্যটাও আরো বেশি করে ফুটে উঠছে।

'তাই মনে হচ্ছে তোমার?'

'তোমার মনে হচ্ছে না?'

'আগের মতো একই তো মনে হচ্ছে আমার কাছে।'

মাথা ঝাঁকালো কানায়ে। তার লম্বা চুলগুলো দুলে উঠলো কিছুটা। 'না, আজকে অবশ্যই কিছুটা আলাদা ছিলো। আর আমি জানি কার জন্য এটা হয়েছে।'

'খোলাসা করে বলো।'

'ঐ কারাশাওয়া মেয়েটার জন্য। ও জয়েন করছে, না?'

'কারাশাওয়া?' কাজুনারি আঙুল দিয়ে ধরে একবার চোখ বোলালো নোটটাতে। 'ইউকিহো কারাশাওয়া...ইংরেজি সাহিত্য ডিপার্টমেন্ট।'

'তোমার ওর কথা মনে নেই? বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে।'

'না, মনে আছে আমার। তবে চেহারা অতটা মনে নেই যে তোমাকে বোঝাতে পারবো। আজকে অনেক মানুষের সাথেই দেখা করতে হয়েছে তো...'

নাক দিয়ে শব্দ করে উঠলো কানায়ে। 'যাক, ধরে নিলাম সে তোমার গোছের না।'

'কীরকম গোছের সে?'

'একদম নিখুঁত এক উচ্চবংশীয় নারী। তুমি তো আবার খুঁতওয়ালা পছন্দ করো। মানে বাজে মেয়েদের। আমার মতো।'

'আমি আর দশটা পুরুষের মতোই উচ্চবংশের নারীদেরকেও পছন্দ করি। সে যাক গে, তোমার কাছে ওকে উচ্চবংশীয় কেন মনে হলো?'

'নাগায়ামার দিকে একবার তাকানো উচিত ছিলো তোমার। ওর তো মাথাই খারাপ হয়ে গেছিলো মেয়েটাকে দেখে। বলছিলো মেয়েটা নাকি এখনো ভার্জিন।' ফিকফিক করে হাসলো কানায়ে।

'এটা ও যে একটা বলদ, এছাড়া আর কিছুই প্রমাণ করে না।'

কাজুনারি রুম সার্ভিস থেকে আনা স্যান্ডউইচটাতে একটা কামড় বসিয়ে আবার ভাবতে লাগলো আজকের দিনে কে কে এসেছিলো তার ব্যাপারে। ইউকিহো কারাশাওয়াকে আসলেও ওর অতটা মনে নেই। কারণ ওর দিকে ততটা তাকানোর সময় পায়নি সে। তাই কানায়ের 'নিখুঁত নারীর' যুক্তিটা তার কাছে অর্থহীন। ও নিজেও দেখেছিলো নাগায়ামাকে উত্তেজিত হতে, কিন্তু সে সময় কারণটা বুঝতে পারেনি।

যার কথা তার মনে আছে সে হলো এরিকো। সে-ই একমাত্র মেয়ে যে কোনো রকম মেকআপ করেনি। স্বাভাবিক পোশাক পরেছিলো মেয়েটা, কথাও বলছিলো একদম সোজাসাপটা...আর এতেই সুন্দর দেখাচ্ছিলো তাকে।

মেয়েটাকে কারো জন্য অপেক্ষা করতে দেখেছে সে। এখন মনে হচ্ছে, ইউকিহোর জন্যই অপেক্ষা করছিলো। অন্য ছেলেরা যে ওকে উদ্দেশ করে চিল্লাচিল্লি করছিলো বা পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলো, তার দিকে কোনো ভ্রুক্ষেপই ছিলো না তার। মনে হচ্ছিলো অপেক্ষা করতেই ভালো লাগছে ওর। ও যেন রাস্তার ধারে অযত্নে বেড়ে ওঠা কোনো এক লতাগাছ, যে গাছে আচমকা নতুন ফুল এসেছে। রাস্তার ধারেই অনিল প্রবাহে একাকী দুলছে সেই ছোট্ট ফুলটি, যে ফুলের কোনো নাম নেই। অন্তত কেউ এখনো জানে না।

আর তারপর ফুলটাকে নিজ হাতে ছিঁড়তে চলে যায় সে। ড্যান্স ক্লাবের প্রধান হওয়ার কারণে রিক্রুটের বিষয়টা তার দায়িত্বের মধ্যে ছিলো না। কিন্তু এরিকো

সবার চেয়ে আলাদা। কাজুনারির কথার বিপরীতে দেওয়া অভিব্যক্তিগুলো প্রত্যেকটাই ছিলো অপ্রত্যাশিত, চমকপ্রদ। একধরনের সতেজতা আছে মেয়েটার মাঝে। এই সতেজতা আছে ওর কথার মাঝে, ওর তাকানোর মাঝে।

সারাটা দিনই ওকে নিয়ে ভেবেছে সে, যদিও কেন ভেবেছে তার কোনো উত্তর খুঁজে পায়নি। বারবারই তার চোখদুটো এরিকোর দিকে চলে যাচ্ছিলো সে সময়।

সম্ভবত এর কারণ হলো, সব সম্ভাব্য সদস্যের মধ্য থেকে ওকেই সবচেয়ে সিরিয়াস হতে দেখেছে সে। অন্যরা সবাই নিজ নিজ চেয়ারে বসে গল্প করছিলো, তাকিয়ে দেখছিলো। আর একমাত্র ঐ মেয়েটাই দাঁড়িয়ে থেকে পুরো অনুষ্ঠানটা দেখেছে। কাজুনারি অবশ্য সেশন শেষ হওয়ার পরে ওর মতামত জানতে গেছিলো একবার।

'অবিশ্বাস্য!' হাতদুটো এক করে তালি দেওয়ার ভঙ্গিতে বলেছিলো এরিকো। 'আমি আরো ভাবতাম বলরুম ড্যান্স বুঝি সেকেলে টাইপের নাচ, কিন্তু এইমাত্র ওদেরকে দেখে মনে হলো এরা জন্ম থেকেই নাচ জানে।'

'কেউই নাচ জেনে জন্ম নেয় না।'

'ওদের দেখে তাই মনে হয়েছে।'

মাথা ঝাঁকালো কাজুনারি। 'প্রথম যখন শুরু করেছিলাম, আমরা কেউই তখন নাচ জানতাম না, এমনকি আমাদের অনেকেই ড্যান্সার হতে চায়নি।'

'তাহলে লেগে থাকলো কেন?'

কাজুনারি হাসলো। 'নাচের অজুহাতে কত ধরনের সুযোগ যে আসে তা জানলে হতবাক হবে। কিন্তু যদি একবারের জন্যও নাচার সুযোগ আসে, তোমার কি সেজন্য প্রস্তুত থাকা উচিত না? একবার নাচ শিখে নাও, এরপর আজীবন নাচের সাথেই থাকবে।'

'ভালো লেগেছে কথাটুকু।' হেসে ফেললো এরিকো।

'কথাটা যদিও উদ্ভট। আমাদের বয়স্ক ড্যান্স কোচ বলতো সব সময়।'

'মোটেও উদ্ভট না,' মাথা নেড়ে বললো এরিকো। 'উদ্দীপনা জাগানোর জন্য দারুণ একটা উক্তি। কথাটা আমি সারা জীবন মনে রাখবো।'

'তার মানে তুমি ড্যান্স ক্লাবে যোগ দিচ্ছো?'

'হ্যাঁ। আমরা দুজনেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি নাচ শিখবো,' ইউকিহোর দিকে তাকিয়ে বললো সে।

কাজুনারিও ওদিকে তাকালো। 'দারুণ। তবে সামনে তোমাদেরকে পেতে যাচ্ছি আমরা।'

'ধন্যবাদ আপনাকেও।' চোখে চোখ পড়ার আগে ইউকিহো মাথা নুইয়ে সম্মান জানালো ওকে।

আর তখনই প্রথমবারের মতো ইউকিহো কারাশাওয়াকে দেখলো কাজুনারি। স্বীকার করতেই হবে যে মেয়েটা যথেষ্ট সুন্দরী এবং কমনীয়, নাজুক শরীর। তবে আরো একটা ব্যাপার আছে ওর মধ্যে। *ঐ বাদামি চোখদুটোতে যেন কাঁটা আছে*—এর চেয়ে ভালো ব্যাখ্যা ওর মাথায় আসেনি। প্রথমে তো ভেবেছিলো ওর সাথে কথা না বলে কেবল তার বন্ধুর সাথে বলেছে দেখেই অমন দৃষ্টি ছুঁড়ে দিচ্ছে। কিন্তু পরে যখন ইউকিহো হাসলো, তখনই কাজুনারি বুঝে গেল যে ঐ কাঁটা তার চোখে সব সময়ই থাকে।

একজন সত্যিকারের অভিজাত নারীর চোখ কখনো এমন হয় না।

***

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের দুই সপ্তাহ কেটে গেছে এরমধ্যে। শুক্রবার বিকালবেলা এইমেই বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার জন্য ট্রেনে উঠেছে এরিকো আর ইউকিহো। স্কুল খোলার পর থেকে এই নিয়ে চতুর্থবারের মতো নাচ শিখতে যাচ্ছে তারা।

'হে বিধাতা, দেখো আজকে যেন একটু ভালো করে নাচতে পারি,' হাতদুটো একত্র করে প্রার্থনার ভঙ্গিতে বললো এরিকো।

'ভালোই নাচছো তুমি,' বললো ইউকিহো।

'অনেক কষ্ট করতে হচ্ছে। পাদুটোকে যেদিকে যেতে বলি, সেদিকে যেতে চায় না যেন। মনে হয় যেন নিজেই নিজেকে ল্যাং মেরে ফেলে দেবো একটা সময়।'

'দেখো, কাজুনারি যেন আবার এসব না শোনে। তুমিই তার আশার একমাত্র আলো, জানো তো।'

'খুব উপকার করলে। এখন আরো বাজে হবে দেখো।'

'অনেককেই বলতে শুনেছি যে তুমিই নাকি একমাত্র মেয়ে যাকে সে ব্যক্তিগতভাবে রিক্রুট করেছে। গর্ব করার মতো খ্যাতি পেয়ে গেছ তুমি!' উত্ত্যক্ত করার মতো চাহনি দিয়ে মুচকি হাসলো ইউকিহো।

'থামো তো, ইউকি। চাপের মধ্যে থাকলে আরো বাজে ফল আসে আমার। আর আমার নিজেরও কোনো ধারণা নেই কেন সে আমাকে রিক্রুট করেছিলো।'

'কারণ সে তোমাকে পছন্দ করে, বোকা।'

'ধুর...ওসব কিছু না। ওগুলো তোমার সাথে ঘটলে ঘটতে পারে, কিন্তু আমার সাথে না। আর তাছাড়া, কানায়ের সাথে না প্রেম করছে সে?'

'ওহ, হ্যাঁ, মিস কুরাহাসি,' বললো ইউকিহো। 'ওদের মধ্যে বেশ কিছু দিন যাবৎ কিছু একটা চলছে মনে হচ্ছে।'

'নাগায়ামা বললো যে ভর্তি হওয়ার সময় থেকেই নাকি ওরা প্রেম করছে।'

'মনে হয় কোনো কিছু পছন্দ হয়ে গেলে সেটার পেছনে লাগতে সময় নেয় না ছেলেটা।'

'আসলে,' বললো এরিকো, 'আমি শুনেছি কানায়েই নাকি প্রথমে প্রপোজ করেছে।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে ইউকিহো বুঝিয়ে দিলো যে এসবে তার কিছু যায় আসে না। 'সে নিশ্চয়ই কাজুনারির বিষয়ে ছেড়ে কথা বলবে না।'

কাজুনারি আর কানায়ের সম্পর্কটা সবাই-ই কমবেশি জানে। যদি নতুন রিক্রুটরা না-ও জেনে থাকে, তবে প্রথম দিন তাদের নাচ দেখে আর না জেনে থাকার কথা না। যেভাবে উরু আর কোমরে হাত দিয়ে নাচছিলো তারা, তা দেখলে যে-কারোই বুঝে যাওয়ার কথা।

আর এই বিষয়টা যদি কানায়ে নিজে থেকে করে থাকে, তবে বলতে হবে মেয়েটা নিজের অবস্থানটা খুব ভালো করে বুঝিয়ে দিয়েছে। এরিকো খুব কম সময় ধরে কাজুনারিকে চেনে, কিন্তু তবুও দুজনকে একসাথে নাচতে দেখে হালকা ঈর্ষা ওরও কাজ করছিলো। অবশ্য, এমনও না যে তার কোনো সুযোগ আছে। জাপানের অন্যতম ঔষধ কোম্পানি শিনোজুকা ফার্মাসিউটিক্যালসের ম্যানেজিং ডিরেক্টরের বড় ছেলে কাজুনারি। বর্তমান চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার তার আংকেল। সে যে বড় ঘরের ছেলে তা বোঝাই যাচ্ছে।

ট্রেন থেকে নেমে পড়লো দুজনে। স্টেশনের বাইরে বের হতেই গরম একটা হাওয়া ছেয়ে গেল এরিকোর।

'আজকে ক্লাস শেষ হওয়ার আগে আমাকে একটু বের হতে হবে,' বললো ইউকিহো। 'আগেই সরি বলে নিচ্ছি, কেমন?'

'ডেটে যাচ্ছো নাকি?'

'ইশ, যদি তাই হতো। যেতে হবে এক জায়গায়।'

কাঁধ ঝাঁকালো এরিকো। কিছু দিন আগে থেকেই এরিকোকে একা ফেলে এরকম উধাও হওয়া শুরু করেছে ইউকিহো। একবার অবশ্য জিজ্ঞেস করেছিলো এরিকো যে কোথায় যায় সে। এর জবাবে প্রায় সপ্তাহখানেক কথা বলেনি ইউকিহো তার সাথে। তাদের বন্ধুত্বের ভেতর এই প্রথম এরকম তিক্ত বিষয় ঘটেছিলো। এরপর আর এরিকো জিজ্ঞেস করেনি কোথায় যায় সে।

***

কাজুনারি চিন্তার ভেতর এতটাই ডুবে ছিলো যে গাড়ির কাচে কখন পানির ফোঁটা পড়েছে তা টেরই পায়নি। যখন বুঝলো, তখন বৃষ্টি জোরেসোরে নামতে শুরু করে দিয়েছে। রাস্তায় কিছুই দেখতে পাচ্ছে না সে। স্টিয়ারিং-এর বাম পাশে ওয়াইপ লিভারটার দিকে হাত বাড়াতেই বুঝলো কোথায় ভুল হচ্ছে তার। এরপর ডান পাশে হাতটা বাড়িয়ে দিলো সে। আমদানি করা গাড়িগুলোতেও এখন ডান পাশে স্টিয়ারিং থাকলে তার বিপরীত পাশে ওয়াইপ লিভার দিয়ে রাখে। কাজুনারির মাসখানেক আগে কেনা ভক্সওয়াগন গলফ মডেলের গাড়িটাও একই ধাঁচের।

গাড়িতে বসে স্কুল গেটের দিকে দেখতে লাগলো সে। ছেলেমেয়েগুলো স্টেশনে যাওয়ার জন্য দৌড়াদৌড়ি করছে। মাথায় ছাতার পরিবর্তে খাতা, ব্যাগ ইত্যাদি দিয়ে ঢাকছে যাতে বৃষ্টি থেকে কিছুটা হলেও বাঁচা যায়। তখনই এরিকোকে দেখলো সে। সব সময় যেমনটা হাঁটতে দেখেছে তাকে, তেমন করেই হাঁটছে। তার সাদা জ্যাকেটটা যে ভিজে যাচ্ছে সেদিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না। তার সাথের সাগরেদ ইউকিহোকে দেখা যাচ্ছে না কোথাও অবশ্য।

গাড়িটা টান দিয়ে ফুটপাতের কাছাকাছি নিয়ে এসে পাশাপাশি চালাতে লাগল কাজুনারি। মনে হলো না এরিকো তা খেয়াল করেছে। তার আগের গতিতেই চলতে থাকলো সে, অদ্ভুত হাসি খেলা করছে তার মুখে। দুইবার হর্ন বাজাতেই ঘুরে তাকালো মেয়েটা। বাম দিকের জানালার কাচটা নামিয়ে নিলো কাজুনারি।

'হেই? নামিয়ে দিয়ে আসবো? ভেজা কাকের মতো ভিজে গেছ দেখছি।'

মনে হলো না জোকটা পছন্দ হয়েছে ওর। কঠিন হয়ে গেল তার মুখটা, এরপরে আরো জোরে হাঁটতে শুরু করলো। এক্সিলেটরে চাপ দিয়ে আরেকটু গতি বাড়িয়ে দিলো কাজুনারি।

'আরে, দৌড়াচ্ছো কেন, কী সমস্যা?' বলে উঠলো সে।

এবার আরো জোরে হাঁটতে শুরু করলো এরিকো।

মনে হচ্ছে আমাকে ভুল বুঝছে, ভাবলো কাজুনারি।

'এই এরিকো, আমি কাজুনারি!' জোরে বলে উঠলো সে।

এবার থামলো এরিকো। অবাক ভঙ্গিতে ঘুরে তাকালো গাড়ির দিকে।

'বিশ্বাস করো,' এরিকো কাছে এগিয়ে আসতেই বললো সে, 'যদি ওরকম কিছু করার ইচ্ছাই থাকতো, তবে অন্তত বৃষ্টির সময় গাড়ি নিয়ে বের হতাম না।'

হাসলো এরিকো। বৃষ্টি তার চুলের উপর পড়ে গাল বেয়ে নেমে পড়ছে। এরপর গাল থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় গড়িয়ে পড়ছে নিচে।

গাড়িতে উঠে রুমাল দিয়ে হাতমুখ মুছতে শুরু করলো এরিকো। এরপর ঘাড়ের দিকেও মুছতে শুরু করলো। জ্যাকেট খুলে পায়ের কাছে রেখেছে। অবশ্য, কাজুনারি বলেছে যে পেছনের সিটে রাখলে সমস্যা হবে না, কিন্তু সে না করে দিয়েছে। কারণ ওতে সিট ভিজে যেতে পারে।

'সরি, আমি বুঝিতে পারিনি ওটা আপনি ছিলেন। এত অন্ধকার যে মুখ দেখা যাচ্ছে না।'

'আরে না, ঠিক আছে। যেভাবে ডাকাডাকি করছিলাম, তাতে ভুল বোঝা দোষের কিছু না,' একটা বাঁক ঘুরতে ঘুরতে বললো সে। এরিকোকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসছে সে।

'আসলে এসব হুটহাট হয়ে যায় তো, তাই আগে থেকে সতর্ক থাকতে হয় কিছুটা।'

'অপরিচিত মানুষরা তোমাকে প্রায়ই ডাকাডাকি করে গাড়িতে উঠার জন্য, নাকি?'

'আমমম...না। আসলে আমাকে না। ইউকিহো সাথে থাকলে আর কি...'

'ওহ, ওর কথা বলতে ভুলে গেছিলাম। কোথায় সে?'

'কী যেন কাজে গেছে বললো।'

'ওহ, এজন্যই একা ছিলে তুমি।' কাজুনারি তাকালো এরিকোর দিকে। 'আচ্ছা, সবাই-ই তো দৌড়াচ্ছিলো। তুমি কেন হাঁটছিলে?'

'আসলে তেমন কোনো তাড়া ছিলো না আমার।'

'কিন্তু ভিজে যাচ্ছিলে তো।'

'যদি জোরে দৌড়াতাম, তবে বৃষ্টির ফোঁটাগুলো অনেক জোরে জোরে আঘাত করতো আমার মুখে। তাই আসলে,' গাড়ির কাচটার দিকে ইশারা করে বললো সে। যেটা বৃষ্টিতে ভিজে অনেকটা ঘোলাটে হয়ে গেছে এতক্ষণে। ওয়াইপার যতটুকু সরাতে পারছে না, ততটুকু অংশ বেশি ঘোলাটে হয়ে আছে।

'কিন্তু জোরে দৌড়ালে কি বৃষ্টিতে কম ভেজা হতো না?'

'বিশ্বাস করুন, আমিও এমনটা ভেবেছিলাম। আমি যদি জোরে দৌড় দিতাম, তবে কমপক্ষে তিন মিনিট সময় লাগতো পৌঁছাতে। চাচ্ছিলাম না একটা ভেজা রাস্তায় একা একা তিন মিনিট দৌড়াতে। পড়ে যেতে বা পিছলে যেতে পারতাম।'

হোহো করে হেসে উঠলো কাজুনারি।

'মজা করছি না কিন্তু। সব সময় হোঁচট খাই আমি। আজকের ক্লাসেই হোঁচট খেয়ে ইয়ামামোতোর পায়ের উপর পড়ে গেছিলাম। সে ব্যথা না পাওয়ার ভান ধরেছিলো। কিন্তু আমি তার চোখদুটো দেখেছি–সত্যিকার অর্থেই ব্যথা পাওয়া কোনো ছেলের চোখ,' পায়ের যেখানটাতে লেগেছিলো, সেখানে হালকা ডলতে ডলতে বললো এরিকো।

আবারো হাসলো কাজুনারি। 'নাচতে পারছো তবে?'

'কিছুটা, তবে এখনো খুবই বাজে অবস্থা আমার। ওদিকে ইউকিহো কত সুন্দর করে শিখে গেছে এরমধ্যে।' দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো সে।

'ঠিক সময়ে তুমিও পারবে।'

'তাহলে তো ভালোই হয়।'

ট্রাফিকের লাল বাতি জ্বলাতে থামলো কাজুনারি। পাশ থেকে একপলক তাকালো এরিকোর দিকে। সব সময়ের মতোই কোনো মেকআপ নেই তার গালে। ল্যাম্পপোস্টের আলোয় খুব মসৃণ লাগছে তার গায়ের চামড়া। *মাটির বাসনের মতো*, ভাবলো সে। কয়েকটা ভেজা চুল গালের উপর আটকে আছে তার। হাত বাড়িয়ে সরিয়ে দিলো সে। চমকে উঠলো এরিকো।

'সরি, চেহারার উপর চুল পড়ে ছিলো তোমার।'

কানের পেছনে চুলগুলো গুঁজে নিলো এরিকো। গাড়ির মৃদু আলোতেও টুকটুকে লাল হয়ে ওঠা গালটা স্পষ্টভাবেই দেখতে পেল কাজুনারি। সবুজ বাতি জ্বলতেই আবার চলতে শুরু করলো গাড়িটা।

'কত দিন হয়েছে এরকম চুল রাখছো তুমি?' রাস্তার দিকে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করলো কাজুনারি।

'এটা?' মাথার দিকে ইশারা করে বললো এরিকো। 'হাই স্কুল থেকে পাশ করার কিছু আগে থেকে হয়তো।'

'আমিও তাই ভাবছি। ওটা সেইকো কাট, না? ঐ গায়িকাটার মতো আর কি। বেশ বিখ্যাত এই কাট–বলা যায় একটু বেশিই বিখ্যাত। সবাই-ই এই কাট দেয়, তা মানাক কিংবা না মানাক।'

এটাকে সেমি-লং কাট বলে। দুই পাশে হালকা বড় করে রাখা হয় যাতে পেছনের দিকে চুল নেওয়া যায়।

'আপনার কি মনে হয়, এটা মানাচ্ছে না আমাকে?'

'আম...' এক্সিলেটরে চাপ দেওয়ার আগে বললো সে, 'সত্যি বলতে, একটুও না।'

'ওহ।' বলেই চুলগুলো আবার পেছনের দিকে গুঁজতে লাগলো এরিকো।

'তোমার ভালো লাগে?'

কাঁধ ঝাঁকালো সে। 'আসলে অতটা ভাবিনি এ নিয়ে। ইউকিহো বলেছিলো এরকম রাখতে, তাই রেখেছিলাম।'

'আবারো ইউকিহো। দয়া করে এটা বোলো না যে বান্ধবী যা করতে বলে তুমি তাই করো।'

'মোটেও না।'

কাজুনারি ফিরে তাকিয়ে দেখলো, কোলের উপর তাকিয়ে আছে এরিকো। তখুনি একটা বুদ্ধি এলো মাথায়। ঘড়ির দিকে তাকালো সে। সাতটা বাজতে কিছুটা দেরি আছে এখনো।

'কোনো কাজ আছে তোমার আজ রাতে? মানে ভুলে গেছি আর কি যে তুমি কোনো পার্ট-টাইম জব-টব করো কি না।'

'না তো। তেমন কিছু নেই। কেন?'

'আমার সাথে অল্প কিছুক্ষণের জন্য যাবে এক জায়গায়?'

'কোথায় যাবেন আপনি?'

'চিন্তা কোরো না। তেমন অদ্ভুত কিছু না,' পা দিয়ে ব্রেকে চাপ দিয়ে বললো কাজুনারি।

একটা বুথের সামনে গাড়িটা রেখে নামলো সে। ফোন করলো কাউকে, কিন্তু কাকে করলো তা এরিকোকে বললো না। তাকে কিছুটা চিন্তিত দেখে হাসলো সে।

একটা বিল্ডিংয়ের সামনে এসে আবার থামলো তারা। প্রথম তলাতে যেতে যেতে এরিকো বড় সাইনবোর্ডটা দেখলো। 'বিউটি সেলুন? এখানে কেন?'

'ওখানে গত এক বছর ধরে যাই আমি,' বললো সে। 'ভালোই কাটে এরা। চিন্তার কিছু নেই।' এরিকোর পিঠে হালকা করে হাতটা রেখে মূল দরজার দিকে এগিয়ে নিয়ে গেল তাকে।

নরসুন্দর লোকটার বয়স আনুমানিক ত্রিশ বছরের মতো। নাকের তলায় পশম দেখা যাচ্ছে। দেয়ালে ঝুলছে বিভিন্ন অ্যাওয়ার্ড। বোঝাই যাচ্ছে সেলুন জগতে বেশ নামডাক আছে। 'আহ, এসে পড়েছ তাহলে,' কাজুনারিকে দেখে বলে উঠলো।

'সরি, দেরি হয়ে গেল কিছুটা।'

'আরে, ও কিছু না। তোমার জন্য একটু-আধটু অপেক্ষা করাই যায়।'

'ভাবছিলাম ওর চুলের একটা বিহিত করে দিতে পারো কি না,' এরিকোর দিকে ইশারা করে বললো কাজুনারি। 'মানে ওকে যেটাতে মানাবে আর কি।'

'চমৎকার,' এরিকোর দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর বললো লোকটা। তার কল্পনা নির্ঘাত দৌড়াচ্ছে। আবারো লাল হয়ে গেল এরিকোর গাল।

'আর,' নরসুন্দরের মেয়ে সহকর্মীর দিকে ফিরে বললো কাজুনারি, 'কিছুটা মেকআপ করে দিতে পারবে না যেটা ওর নতুন চেহারার সাথে যাবে?'

'অবশ্যই,' বললো মেয়েটি। চোখ চকচক করছে তার।

'শুনছেন?' ভীত গলায় বললো এরিকো। 'আমার সাথে অত টাকা নেই আজকে। আর আমি কখনো মেকআপ করিনি এর আগে...'

'আরে ওসব নিয়ে ভেবো না,' বললো সে। 'ওখানে বসো। আর ওদেরকে ওদের কাজ করতে দাও।'

'কিন্তু ভয় হচ্ছে যে আমার বাসায় চিন্তা করবে। আমি তাদেরকে বলিনি যে আমি সেলুনে যাবো।'

কাজুনারি সহকর্মী মেয়েটার দিকে ফিরে বললো, 'তোমার ফোনটা দেওয়া যাবে?'

কাউন্টারের পাশে রাখা ফোনটা দিয়ে গেল সে। অনেক বড় একটা তার লাগানো আছে ওতে। অবশ্য, যাতে কাস্টমাররা চুল কাটতে কাটতে কথা বলতে পারে, তার জন্যই করা ওটা। কাজুনারি সেটা উঠিয়ে এরিকোর দিকে বাড়িয়ে দিলো।

'নাও, বাসায় ফোন করে বলে দাও। বলো যে চুল কাটানোর জন্য একটু দেরি হবে। আমার মনে হয় তারা বুঝবে।'

রিসিভারটা হাতে নিলো এরিকো। তার চোখেমুখে দ্বিধার ছাপ স্পষ্ট। তবে সম্ভবত এটাও বুঝতে পারছে যে এখন না করে দিলেও লাভ নেই।

পাশের সোফায় বসে অপেক্ষা করতে লাগলো কাজুনারি। একজন পার্ট-টাইম কাজ করা মেয়ে এসে তাকে কফি দিয়ে গেছে। দেখে মনে হয় এখনো হাই স্কুলে পড়ে। মেয়েটা মাথার দুই পাশ থেকে চুল একটু বেশিই কেটে ফেলেছে। কে জানে, দুই দিন পর হয়তো এটাই আবার ট্রেন্ড হয়ে যাবে।

এরিকোর পরিবর্তন দেখার জন্য তর সইছে না কাজুনারির। যদি এরিকোর ব্যাপারে ওর ধারণা সঠিক হয়ে থাকে, তো আজ এরিকোর সত্যিকার সৌন্দর্য বেরিয়ে আসতে যাচ্ছে।

ও জানে না ঠিক কোন শক্তি ওকে এরিকোর কাছে যেতে বাধ্য করেছে, তবে সেই প্রথম থেকেই মেয়েটার প্রতি মোহিত হয়ে পড়েছিলো সে। শুধু এতটুকুই বলতে পারে যে ওদের সম্পর্কটা–যদি একে সম্পর্ক বলা যায় আর কি–কাজুনারি নিজেই শুরু করেছে। ওদের মাঝে কোনো রকম জানাশোনা ছিলো না। এরিকো নিজ থেকেও তার কাছে আসেনি। ও নিজে গিয়ে এরিকোর সাথে কথা বলেছে, আর এই জিনিসটাই সবচেয়ে বেশি ভালো লাগছে তার। এর আগে যত প্রেম করেছে সে, তাদের কারো বেলায় এমনটা ঘটেনি।

আর যখনই এটা ভাবলো সে, তখন আরেকটা চিন্তা মাথায় এসে বসলো তার। এ যাবৎ সবকিছুই তার চাওয়ার আগে মিলে গেছে–তার খেলনা, তার পোশাক, সবকিছু। যদিও এর মাঝে বেশিরভাগই সে চাইতো কি না সন্দেহ আছে।

তার অর্থনীতি নিয়ে পড়ার কারণ হলো বাবা-মা এটা পছন্দ করে দিয়েছিলো তাই। এমনকি এইমেই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার কারণ হলো তার কিছু আত্মীয় এখান থেকে পড়েছে সেজন্য। নাচার ক্লাবেও সে নিজ থেকে জয়েন করেনি। এই একটা ক্লাবই তার জন্য বরাদ্দ ছিলো। ওর বাবা মনে করে, ক্লাব হলো পড়াশোনার পথে ক্ষতিকর। তবে নাচ শেখাটা গুরুত্বপূর্ণ ছিলো; কারণ তার বাবার ধারণা এতে সামাজিক দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। ছেলে যখন ভবিষ্যতে তার কোম্পানির দায়িত্ব নেবে, তখন তা ভালোই কাজে দেবে।

এমনকি কানায়েকেও আমি নিজে বেছে নেইনি।

সেইকা স্কুল থেকে আসা সুন্দরী কানায়ে নাচের পার্টনার খুঁজছিলো। অনেকেই তাকে পার্টনার হিসেবে চাইলেও সে কাজুনারিকে পার্টনার হতে বলে। সে সময় এসব নিয়ে তেমন ভাবেনি কাজুনারি। তার নিজেরও চোখ ছিলো কানায়ের উপর। আর যখন তারা নাচের পার্টনার হয়ে গেল, তখন সবকিছু আরো সহজ হয়ে গেল। আর তার কিছু পরেই ওরা একে অপরের প্রেমে পড়ে যায়।

আসলেই কি প্রেমে পড়েছিলাম ওর?

কাজুনারিকে নিজের কাছে স্বীকার করতেই হলো যে যাকে সে প্রেম ভাবছে তা আসলে কোনো প্রেমই না। সে মূলত সুন্দরী একটা মেয়ের সাথে বিছানায় যেতে চেয়েছিলো–এই আর কি। যার প্রমাণস্বরূপ বলা যায়, যখনই ওর অন্য কোনো কাজ

থাকে, প্রথম সুযোগেই প্রেমিকার কাছ থেকে চলে আসে। ওর জন্য এটা করা কঠিন কিছুও না। কারণ কানায়ের দাবি খুবই কম; দিনে অন্তত একবার ফোন করতে হবে তাকে। কিন্তু মাঝে মাঝে ঐ একবারও অনেক বেশিই হয়ে যায় কাজুনারির জন্য।

আবার এটাও পরিষ্কার না যে কানায়ে তাকে ভালোবাসে কি না। হয়তো পকেটভরতি টাকা পাওয়ার জন্যই এমনটা করে সে। তাদের সম্পর্কের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেক কথাই সে বলে, কিন্তু এই ভবিষ্যৎ বলতে যদি ওর স্ত্রী না হওয়ার থেকে বরং পরিবারের একজন সদস্য হওয়ার কথা বুঝিয়ে থাকে?

এরমধ্যে এই সম্পর্ক ভাঙার বিষয়ে ভেবে রেখেছে কাজুনারি। খুব বেশিই গা ঘেঁষাঘেঁষি করছে মেয়েটা ইদানীং। আজকেও নাচার সময় এমনভাবে জড়িয়ে ধরেছিলো যেন সে তার নিজের কোনো সম্পত্তি। অনেক সহ্য করেছে সে এসবের।

মুচকি হেসে কফিতে চুমুক দিতে লাগলো সে। এমন সময় দেখলো সেই সহকর্মী মেয়েটা তার দিকে এগিয়ে আসছে।

'কাজ শেষ,' বললো মেয়েটা।

'কেমন দেখাচ্ছে ওকে?'

'নিজের চোখেই দেখে নাও এসে,' এক চোখ টিপে বললো মেয়েটা।

নরসুন্দরের চেয়ারটায় বসে আছে এরিকো। সামনেই বড় একটা আয়না। ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল কাজুনারি। আয়নায় এরিকোর প্রতিবিম্ব দেখে থ মেরে গেল একদম। শ্বাস আটকে গেছে তার। কাঁধের উপর পর্যন্ত চুল কেটেছে মেয়েটা। এমনভাবে কাটা হয়েছে যাতে কানের লতিটা হালকা দেখা যায়, অবশ্য ছেলেদের মতো করে না। দেখতে বেশ মোহনীয় লাগছে। সাথে একটুখানি মেকআপের ছোঁয়ায় ওর রূপ যেন আরো বিকশিত হয়েছে। আসলেই দোকানের লোকগুলো তার ভেতরের সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছে। আর তার চোখদুটো কাজুনারির ভেতরটাকে নাড়িয়ে দিয়ে গেল যেন।

'ওয়াও,' বলে উঠলো সে।

'হাস্যকর লাগছে না দেখতে?' জিজ্ঞেস করলো এরিকো।

'একটুও না।' জোরে মাথা ঝাঁকিয়ে নরসুন্দরের দিকে তাকালো কাজুনারি। 'সত্যিই দারুণ হয়েছে!'

'কাজ করার জন্য সুন্দর চুল আর চেহারাও পেয়েছিলাম বটে।' হাসলো নরসুন্দর।

'উঠে দাঁড়াও তো একবার,' বললো কাজুনারি।

কাজুনারির দিকে একটু দ্বিধা নিয়ে তাকিয়ে দাঁড়ালো এরিকো।

কিছু না বলে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইলো কাজুনারি। এরপর মুখ খুলে বললো, 'কাল ফ্রি আছো তুমি?'

'কাল?'

'হ্যাঁ, কাল শনিবার। সকালে ক্লাস আছে তোমার?'

'শনিবার সকালে আমার কোনো ক্লাস নেই...'

'চমৎকার। কোথাও যাওয়ার আছে? কোনো বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়ের বাসায়?'

'না, তেমন কিছুই নেই, কিন্তু–'

'তাহলে আর কিন্তু-টিন্তু নেই। কাল আমরা কয়েকটা জায়গায় ঘুরতে যাচ্ছি।'

'কী? কোথায়?'

'কালকেই দেখতে পাবে।'

কাজুনারি একবার এরিকোর নতুন হেয়ারকাট, আরেকবার মুখের দিকে তাকাচ্ছে। পরিবর্তনটা এতটাই চোখে ধরার মতো যে ও নিজেও এরকমটা কল্পনা করেনি। অন্য রকম এক সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে এই মেয়ের ভেতর। কালকের ডেটের কথা ভেবে আনন্দে ভরে উঠলো তার মন।

***

সোমবার দিন যখন এরিকো ক্লাসে ঢুকছে, তখন ইউকিহো সেখানেই ছিলো। ওর দিকে তাকিয়ে চোয়াল ঝুলে গেল ইউকিহোর। অনেকক্ষণ যাবৎ দুজনের কেউই কোনো কথা বললো না।

'কী হয়েছে তোমার?' এতটুকুই বলতে পারলো ইউকিহো। তার গলার স্বরটা একেবারে নতুন ঠেকলো এরিকোর কাছে।

'অনেক লম্বা কাহিনি,' তার পাশে বসতে বসতে বললো এরিকো। খেয়াল করলো, অন্য শিক্ষার্থীরা তার দিকে উঁকিঝুঁকি মেরে দেখছে। নতুন এক অনুভূতি এটা। এরকম করে দেখার বিষয়টা ভালো লাগছে তার।

'তোমার চুল কাটলে কখন?'

'শুক্রবার।' হাসলো সে। 'বৃষ্টির সময়।'

এরপর এরিকো যখন সেদিনের সব ঘটনা খুলে বললো ইউকিহোর কাছে, তখন তার স্বাভাবিক প্রশান্ত ভাব খসে পড়ে বিস্ময় ভর করলো। তারপর একচিলতে হাসি ফুটে উঠলো মুখে।

'আগেই বলেছিলাম কাজুনারির তোমার প্রতি কিছু একটা আছে,' বললো সে।

'হয়তো,' বললো এরিকো। গালের পাশে ঝুলে থাকা কয়েকটা চুলে হাত বোলাচ্ছে সে।

'তো শনিবার কোথায় গেলে তোমরা?'

শনিবার দিন বিকালবেলা কাজুনারি তাকে বুটিক শপে নিয়ে গেছিলো। যেখানে দামি দামি কাপড় বিক্রি করে। ওটার মধ্যে সে এমনভাবে ঢুকেছিলো যেন ওটা তারই দোকান, আবার কাজের লোকদের সাথে এমনভাবে কথা বলছিলো যেন তারা বহু দিনের পরিচিত। মনে হচ্ছিলো ঐ সেলুনের মতো সব জায়গায় পরিচিতি আছে তার।

'কিছু জামা দেখান তো যা পরলে ওকে মানাবে।'

ড্রেস এসিস্ট্যান্ট শোনামাত্রই কাজে লেগে পড়লো। অবশ্য, এরিকো পরে জেনেছিলো যে এসিস্ট্যান্টই এই দোকানের মালিক। কর্মরত সবাইকে একটার পর একটা ড্রেস আনার হুকুম দিচ্ছিলো শুধু। প্রায় এক ঘণ্টার মতো এরিকোই শুধু তাদের কাজের কেন্দ্রবিন্দু ছিলো।

যখন এরিকো প্রথম শুনেছিলো যে তারা বুটিক শপে যাবে, তখন সে ভেবেছিলো হালকা-পাতলা কিছু ড্রেস হয়তো কিনবে সে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যেরকমটা পরে সেরকম। কিন্তু পরে যখন প্রাইজ ট্যাগটা দেখলো, তার চোখ কপালে উঠে গেল। এত টাকা তার কাছে ছিলো না, এমনকি থাকলেও পোশাকের পেছনে তা খরচ করতো না।

কিন্তু বিষয়টা যখন কাজুনারিকে ফিসফিস করে বললো, তখন ছেলেটা জবাবে বললো, 'ওসব নিয়ে ভাবতে হবে না তোমার। আমার পক্ষ থেকে ট্রিট এটা।'

'না, না! আমি এটা নিতে পারবো না। অনেক দামি এগুলো।'

হেসে ফেললো ছেলেটা। 'একটা উপদেশ দিই: যখন কোনো ছেলে বলে সে তোমাকে কিছু দিতে চায়, তবে তা নিতে হয়। চিন্তার কিছু নেই; এর বিনিময়ে আমি কিছু চাইবো না। আমার শুধু মনে হয়েছে একটা সুন্দরী মেয়ের সুন্দর পোশাক থাকাটা জরুরি।'

আবারো টুকটুকে লাল হয়ে গেল তার গালদুটো। 'কিন্তু আপনি তো গতকালের সেলুনের বিল এবং অন্যান্য অনেক কিছুই দিয়েছেন।'

'হ্যাঁ, দিয়েছি। কারণ আমিই জোর করেছিলাম তোমাকে চুলটা কাটার জন্য। আমার নিজেরও কিছুটা স্বার্থ ছিলো বটে। সেইকো কাট দেওয়া কোনো মেয়ে আমার সাথে হাঁটছে, এটা কেউ দেখুক তা চাচ্ছিলাম না। দেখলে মনে হতো কোনো সেলসম্যানের সাথে হাঁটছি।'

'অতটা খারাপ ছিলাম দেখতে?'

'নিষ্ঠুরের মতো বলতে হলে বলবো, হ্যাঁ।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো এরিকো। অথচ ও এত দিন নিজেকে পোশাকের দিক দিয়ে রুচিসম্মত মানুষ ভাবতো।

'এখন কেবল তুমি তোমার গুটি বানাচ্ছো, ব্যস,' ড্রেসিং রুমের বাইরে থেকে বলে উঠলো কাজুনারি। 'তুমি নিজেও জানো না কতটা সুন্দরী হয়ে উঠবে তুমি। আমি শুধু সে সুযোগ তৈরি করে দিচ্ছি মাত্র। একটু সাহায্য করতে চাই আর কি।'

'হুমম...তবে এটা মানছি না যে এই শুঁয়োপোকা থেকে কোনো একদিন প্রজাপতি বেরোবে।'

'বের হবে। গ্যারান্টি দিচ্ছি আমি,' আরেকটা পোশাক দিতে দিতে বললো সে।

এরিকো একটা ড্রেস কেনার জন্য রাজি হয়। কিন্তু কাজুনারি জোর করে আরো দুই-তিনটা ড্রেস নিতে বললো তাকে। এরিকো আসলে চিন্তা করছে তার মাকে কী বলবে। বিশেষ করে ওরকম স্টাইলে চুল কাটার কারণে গতকাল যে পরিমাণ হতবাক হয়েছে তার পরে।

'আরে, বলে দেবে স্কুলের কারো থেকে পোশাক বদলে নিয়েছ,' হেসে বললো কাজুনারি। 'আসলেই দারুণ মানিয়েছে তোমাকে, বিশ্বাস করো। নায়িকাদের মতো লাগছে একদম।'

'মোটেও না,' বললো এরিকো। আয়নায় নিজেকে দেখতে দেখতে লাল হয়ে গেছে ওর গাল। কারণ কাজুনারি অতটা মিথ্যাও বলেনি।

'মনে হচ্ছে সিন্ডারেলার কোনো গল্প শুনছি,' এরিকোর গল্প শেষ হওয়ার পরে মাথা দুলিয়ে বললো ইউকিহো। 'আমি আসলে বুঝতেই পারছি না কী বলবো।'

'জানি আমি। আমিও ভেবেছিলাম স্বপ্ন দেখছি হয়তো...আর বলতে গেলে কিছুটা দুশ্চিন্তাও করছিলাম।'

'কী নিয়ে আবার দুশ্চিন্তা করলে সে সময়?'

'এই যে চুল কাটা বা কাপড় নেওয়া...একজনের কাছ থেকে অনেক বেশিই নিয়ে ফেললাম না?'

'কিন্তু তুমি নিজেও তো তাকে পছন্দ করো, নাকি?'

'মনে তো হচ্ছে।'

ইউকিহো তার মাথা নেড়ে নরম গলায় বললো, 'তুমি যদি তোমার এই হাসিটা দেখতে, তবে আর কোনো দ্বিধা থাকতো না।'

পরের দিন মঙ্গলবার এইমেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ড্যান্স ক্লাবে এরিকোর চুলের নতুন কাটিং শোরগোল পাকিয়ে দিলো একদম। শুধু যে মেয়েরাই করছে এমন না। এইমেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেগুলোও ওর দিকে তাকাচ্ছে, জানতে চাইছে আসলে এর পেছনের রহস্য কী? এই সপ্তাহের মধ্যে কি কোনো চাকরি পেয়ে গেছে নাকি সে? অথবা নতুন কোনো ক্লাবে ঢুকেছে? কেউ কি ছেড়ে দিয়েছে তাকে, নাকি নতুন কাউকে ধরেছে?

জীবনে এই প্রথম এরিকো দেখলো লোকে তাকে নিয়ে কথা বলছে, ইউকিহোকে নিয়ে নয়। যখন সে ইউকিহোর দিকে তাকালো, দেখলো একপাশে দাঁড়িয়ে আছে সে, হাসছে। কিন্তু হাসিটা মেকি মনে হচ্ছে। কয়েক মুহূর্তের জন্য মনে হলো হয়তো ইউকিহো কিছুটা ঈর্ষা করছে তাকে। কিন্তু এরপরেই তার নিজের ঈর্ষা বেড়ে গেল এটা ভেবে যে এত দিন ধরে ইউকিহো একাই এসব পেয়ে আসছিলো।

তবে সবাই-ই যে তার এই পরিবর্তনে খুশি হয়েছে এমনও না। কিছু উপরের ক্লাসের মেয়েরা তাকে একদম এড়িয়ে গেল। কানায়ে তীক্ষ্ণ চোখে দেখলো ওকে, এরপর বিড়বিড় করে 'বাচ্চাদের মতো যেমন-খুশি-তেমন-সাজোতে অংশ নিয়েছে' জাতীয় কিছু একটা বললো। অবশ্য, এই দৃষ্টিও কিছুটা স্বস্তির। অন্ততপক্ষে সে এখনো জানে না যে এসবের পেছনে তার বয়ফ্রেন্ডেরই হাত আছে।

কিন্তু তারপরও ড্যান্স ক্লাবে ক্ষমতার এই অসমতার কারণে সে পরিষ্কারভাবে অসন্তুষ্ট। ড্যান্স প্র্যাকটিস শুরু হওয়ার আগেই দ্বিতীয় বর্ষের একটা মেয়ে তাকে ডাক দিলো।

'ক্লাবের খরচগুলো টালি করে দিতে পারবে?' জিজ্ঞেস করলো লম্বা চুলের মেয়েটা। হাতের বাদামি রঙের ব্যাগটা এরিকোর হাতে দিয়ে বললো, 'সবকিছু এখানে আছে; গত বছর থেকে এ বছরের সকল হিসাব। শুধু তারিখ আর টাকার হিসাবটা করবে। বুঝেছ?'

'কখন লাগবে এটা?'

'আজকে প্র্যাকটিস শুরু হওয়ার আগে করলেই হবে, যদি পারো আর কি,' কাঁধের পেছনে তাকিয়ে বললো মেয়েটা। 'এটা কানায়ের অর্ডার।'

'আচ্ছা...ঠিক আছে।'

মেয়েটা চলে যাওয়ার পরে ইউকিহো কাছে চলে এলো এরিকোর। 'বিশ্বাসই করতে পারছি না,' বললো সে। 'প্র্যাকটিসের আগে শেষ করতে পারবে না তুমি। আমিও কিছু সাহায্য করবো।'

'আরে না, না, দরকার নেই। তেমন একটা সময় লাগবে বলে মনে হয় না।'

ব্যাগের ভেতরটা দেখলো এরিকো; রিসিপ্টের কাগজ দিয়ে ভরতি। খতিয়ানের বইটা বের করে একবার চোখ বোলালো। কিন্তু দেখে মনে হলো গত দুই-তিন বছরে এসব হিসাব করার জন্য কেউ তেমন একটা গা করেনি।

হঠাৎ বইটা থেকে একটা প্লাস্টিকের কার্ড গড়িয়ে পড়লো নিচে। 'স্যানকিও ব্যাংক। মনে হচ্ছে ক্লাবের ব্যাংক একাউন্ট ওটা,' বললো ইউকিহো। 'এরকম একটা জায়গায় কেউ এটিএম কার্ড রাখে! যে-কেউই তো চুরি করতে পারে।'

'কিন্তু পিন ছাড়া তো কেউ ওটা ব্যবহার করতে পারবে না, রাইট?' বললো এরিকো। তার বাবা একটা এটিএম কার্ড পেয়েছে কিছু দিন হলো। তা থেকেই জেনেছে সে।

'হয়তো,' বললো ইউকিহো। যদিও তার স্বর শুনে মনে হলো না এই উত্তরে সন্তুষ্ট হতে পেরেছে সে।

প্র্যাকটিস হলের কর্নারে গিয়ে একেকটা এন্ট্রি তুলতে শুরু করলো এরিকো। যা ভেবেছিলো তার থেকে যথেষ্ট বেশিই সময় লেগে গেল নামগুলো তুলতে। ইউকিহো অবশ্য মাঝপথে এসে সাহায্য করেছিলো তাকে, কিন্তু যখন নামগুলো তোলার পরে

হিসাব করা শেষ করলো, তখন দেখলো প্র্যাকটিসের জন্য আর কোনো সময় বেঁচে নেই।

'বুঝতে পারছি না এখানে আসার জন্য কেন এত উতলা হয়েছিলাম আমরা,' বললো ইউকিহো।

হতাশ হয়ে দুজনে জিমনেসিয়াম হলের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলো। কানায়ের কাছে তাদের কাজ দেখাতে যাচ্ছে তারা। মেয়েটা বলেছে যে সে লকার রুমে থাকবে। বাকি সবাই-ই চলে গেছে এরমধ্যে। হলওয়ের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলো, এমন সময় হঠাৎ কারো গলার শব্দ শুনলো তারা। ওখানেরই কোনো একটা দরজার ওপাশ থেকে আসছে শব্দগুলো।

'আমাকে বোকা ভেবো না!'

থেমে গেল এরিকো। গলার স্বরটা আর কারো না। কানায়ের।

'বানাচ্ছি না আমি,' আরেকটা গলার আওয়াজ ভেসে এলো। এবারেরটা কাজুনারির যে তাও স্পষ্ট বোঝা গেল। 'আমি সত্য বলছি। কারণ আমি তোমাকে সম্মান করি, তাই।'

'এটাকে সম্মান বলছো তুমি? আমি মনে করি বোকা বানাচ্ছো স্রেফ আমাকে।'

দড়াম করে খুলে গেল দরজাটা। ঝড়ের বেগে কানায়ে বের হয়ে এলো রুম থেকে। মুখ গোমড়া হয়ে আছে তার। বের হয়ে দুটো মেয়েকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখবে এটা ভাবেনি সে। তবুও প্র্যাকটিস হলের দিকে হনহন করে ছুটে গেল সে। এরিকো আর ইউকিহো নিজেদের দিকে দৃষ্টিবিনিময় করলো একবার। দুজনেরই কারোরই পেছন থেকে ডাকার সাহস হলো না। এরপরে বেরিয়ে এলো কাজুনারি। ওদের দুজনকে দেখে শুষ্ক একটা হাসি দিয়ে বললো, 'একটু কথাবার্তা বলছিলাম আর কি। তোমরা শুনে ফেলেছ?'

'ওর পেছন পেছন যাওয়া উচিত না আপনার?' জিজ্ঞেস করলো ইউকিহো।

'না,' স্বাভাবিক ভঙ্গিতেই বললো কাজুনারি। 'তোমরা তো বাড়ির দিকেই যাচ্ছো, না? লিফট লাগবে?'

'আসলে আমাকে অন্য এক জায়গায় যেতে হবে,' বললো ইউকিহো। 'তবে এরিকো যেতে পারবে।'

'ইউকি-'

'আমি কানায়েকে এই খতিয়ান দিয়ে দেবো পরের প্র্যাকটিসের সময়,' ওকে থামিয়ে দিয়ে বললো ইউকিহো। ব্যাগটাও এরিকোর হাত থেকে নিয়ে নিলো নিজের হাতে।

'তোমার আসলেই লিফট লাগবে না, ইউকিহো?' জিজ্ঞেস করলো কাজুনারি।

'সমস্যা নেই।' বলেই কানায়ে যেদিকে গেছে, সেদিকে চলে গেল ইউকিহো।

শ্বাস ছাড়লো কাজুনারি। 'ও নিশ্চয়ই কানায়েকে শান্ত করতে যাচ্ছে।'

'সব কি ঠিক আছে?' বললো এরিকো। 'মানে আপনাকে যেতে হবে না কানায়ের কাছে?'

'না, ঠিক আছে। সমস্যা নেই,' এরিকোর বাহুতে হাত রেখে বললো। 'সব শেষ হয়ে গেছে আমাদের মধ্যে।'

***

হাসলো এরিকো, সাথে আয়নায় থাকা তার প্রতিবিম্বটাও হেসে উঠলো। যে কালো মিনি স্কার্টটা সে পরে আছে তা এখন পর্যন্ত ওর পরা সবচেয়ে ছোট কাপড়। পায়ের অনেকাংশ দেখা যাচ্ছে এতে। একটু পাক খেলো সে। *পছন্দ হবে ওর।*

'কেমন লাগছে এটাতে?' শপ এসিস্ট্যান্টকে জিজ্ঞেস করলো এরিকো। কাজুনারির সাথে ডেট করার পর থেকে শপের ভেতর কর্মরত লোকদের সাথে কথা বলায় সহজ হয়ে গেছে সে। এসিস্ট্যান্ট ঘুরে তাকিয়ে একবার দেখলো। জ্বলজ্বল করে উঠলো তার চোখদুটো।

'অনেক সুন্দর লাগছে এটায়,' বললো সে।

'এটাই নেবো তবে।'

অতটা দামি না এটা। কিন্তু একদম ফিট হয়েছে তার পোশাকটা। আগের থেকে এখন কাপড়চোপড় পছন্দ করার ক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাস অনেক বেড়েছে তার।

বাইরে এরমধ্যে অন্ধকার নেমে আসছে। স্টেশনের দিকে পা বাড়ালো সে। একটু দ্রুত হাঁটলো অন্য সময়ের থেকে। মে মাসের অর্ধেকটা চলে গেছে এরমধ্যে। মনে মনে গুনলো সে। এ মাসে এই নিয়ে চারটা পোশাক কিনেছে। ইদানীং প্রায়ই নিজের জিনিস নিজেই কিনছে এরিকো। অবশ্য, এখনো ইউকিহো সাথে থাকলে এসব দোকানে ঢুকতে কিছুটা লজ্জা পায় সে, তবে তা বাদে পায়ে ব্যথা হওয়ার আগ পর্যন্ত হেঁটে হেঁটে পোশাক পছন্দ করতে ভালোই লাগে তার।

একটা ডিপার্টমেন্ট স্টোরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সেটাতে থাকা জানালায় নিজের চেহারা দেখলো এরিকো। দুই মাস আগের এরিকো এখনকার এরিকোকে চিনতে পারতো কি না সন্দেহ আছে। নিজের বাহ্যিক রূপ নিয়ে এখন ও যতটা সচেতন, আগে কখনোই এতটা ছিলো না। একটা কথা ইদানীং প্রায় সব সময়ই তার মাথায় ঘোরে: মানুষ তাকে কীভাবে দেখবে, বা কাজুনারি নিজে ওকে দেখে কী বলবে। হালকা মেকআপ কী করে করতে হয় তা শিখছে এখন সে। আজকাল ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফ্যাশন ম্যাগাজিন পড়ে পার করে দেয়। চিন্তা করতে থাকে কীসে তাকে সুন্দর লাগবে। ওর কাছে দিব্যি পরিষ্কার হয়ে গেছে যে এসবের পেছনে যতটা শ্রম দেবে, আয়নায় ততই বেশি সুন্দর দেখাবে ওকে। আর এই ব্যাপারটাই ওকে আনন্দ দিচ্ছে ভীষণ।

ইউকিহোও একদিন বলে ফেলেছে যে সে নতুন কিছুতে পরিণত হচ্ছে। 'মনে হচ্ছে প্রতিদিনই পরিবর্তন হচ্ছে তোমার। যেন গুটি থেকে প্রজাপতি বের হচ্ছে।'

'কী যে বলো না তুমি!'

'সত্যিটাই বলছি,' মাথা নেড়ে বলেছিলো ইউকিহো।

এরিকো নিজেও চাচ্ছিলো নিজের গুটি থেকে বের হতে। একজন নারী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে চায় সে। এরমধ্যে দশবারের থেকেও বেশি সে কাজুনারির সাথে ডেটে গেছে। যেদিন কানায়ের সাথে তার ঝগড়া হলো, সেদিনই বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার পথে অফিশিয়ালি তাকে ডেটের জন্য প্রস্তাব দেয় কাজুনারি।

'তুমি কি কানায়ের সাথে ব্রেকআপ করেছ বলেই আমার সাথে ডেটে যেতে চাচ্ছো?' জিজ্ঞেস করেছিলো এরিকো। আপনি থেকে সরাসরি তুমিতে নেমে গেছে সে।

মাথা ঝাঁকালো কাজুনারি। 'আরো আগে থেকেই ওর সাথে ছাড়াছাড়ি করতে চাচ্ছিলাম। তুমি আসায় ইচ্ছাটা আরো জোরালো হয়েছে।'

'ও কিন্তু এটা শুনলে খুশি হবে না।'

'কিছু দিনের জন্য আমরা গোপন রাখবো এটা। যতক্ষণ না আমরা কাউকে কিছু বলছি, ততক্ষণ কোনো সমস্যা হবে না।'

'মানুষ ঠিকই বের করে ফেলবে।'

'সে নিয়ে তোমার চিন্তা করতে হবে না। আমি দেখবো ওসব।'

'কিন্তু...' বলতে নিয়েছিলো এরিকো, কিন্তু বলার মতো কিছুই খুঁজে পেল না।

তারপরেই ওর ঠোঁটে চুমু খেলো কাজুনারি।

যেদিন থেকে এরিকো এই স্বপ্নের জীবনযাপন করছে, সেদিন থেকেই ওর মনের ভেতর একটা ভয় এসে জমেছে যে এরকম সুখ হয়তো বেশি দিন টিকবে না। ওরা তাদের সম্পর্কটাকে ক্লাবের সবার কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছে এখন পর্যন্ত। এরিকো শুধু ইউকিহোকেই বলেছে। আর কেউ জানে না এ বিষয়ে। আর কেউ যে জানে না তার প্রমাণ হলো গত দুই সপ্তাহের মধ্যে এইমেই বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটো ছেলে তাকে ডেটে নেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে। যদিও তাদেরকে না করে দিয়েছে সে। কীভাবে কীভাবে যেন সবকিছু কেমন পালটে গেল, ভাবতেও অবাক লাগে ওর। এক মাস আগেও যেখানে কারো কাছ থেকে ডেটের প্রস্তাব পাওয়ার কথা ভাবতেও পারতো না, সেখানে সপ্তাহের মাথায় দুইজন তাকে প্রস্তাব দিয়েছে!

কানায়েকে নিয়ে কিছুটা দুশ্চিন্তা করছিলো সে। ব্রেকআপের পরে মাত্র দুটো প্র্যাকটিস সেশনে উপস্থিত হয়েছে মেয়েটা। বোঝাই যাচ্ছিলো যে কানায়ে চাচ্ছে না কাজুনারির সাথে তার দেখা হোক, কিন্তু এরিকো ভাবছিলো অন্য কিছু। সে ভাবছে হয়তো কানায়ে বুঝে গেছে এরিকোই এখন কাজুনারির গার্লফ্রেন্ড। দুই-তিনবার পাশ কাটিয়ে যেতে হয়েছিলো তাদের, আর প্রত্যেকবারই কানায়ের তীক্ষ্ণ চোখ তার উপরে ছিলো। এরিকো ভদ্রতার খাতিরে হ্যালো বললেও কানায়ে কখনো

জবাব দিতো না। এখনো এ নিয়ে কাজুনারিকে কিছু বলেনি সে, কিন্তু এ নিয়ে কথা বলার মতো সময় এসেছে বলেই মনে হচ্ছিলো তার।

এগুলো বাদে এরিকোর ভালো যাচ্ছিলো দিনগুলো। বসন্তের মৌসুম চলছে যেন তার মনে। মাঝেমধ্যেই একা একা হাসতো সে।

শপিংয়ের ব্যাগ দুটো তার হাতেই রয়েছে। বাড়ির কাছাকাছি এসে পড়েছে। দুইতলা একটা বাড়ি যেখানে তার সারা জীবন কাটিয়ে দিয়েছে সে। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলো তারা উঠেছে অনেক। *কাল দিনের বেলায় ঝলমলে রোদ উঠবে*, ভাবলো সে। আগামীকাল শুক্রবার আবারো কাজুনারির সাথে ঘুরতে যাওয়ার প্ল্যান আছে তার। কাল মিনি স্কার্টটা পরবে বলে ঠিক করে রাখলো।

বুঝতে পারলো অবচেতন মনে হাসছে সে। ভাবতেই গালদুটো লাল হয়ে গেল আবারো।

***

তিনবার ফোন বাজার পরে রিসিভার তোলার শব্দ শুনতে পেল সে।

'কাওয়াশিমা রেসিডেন্স থেকে বলছি,' এরিকোর মায়ের গলা শুনলো সে।

'হ্যালো, আমি কাজুনারি বলছি। কাজুনারি শিনোজুকা। এরিকো কি বাড়িতে আছে?'

কিছুক্ষণের জন্য নীরব রইলো অপর পাশে। বুকটা ধক করে উঠলো সাথে সাথে।

'দুঃখিত, বাসায় ফেরেনি এখনো সে,' বলে উঠলো তার মা।

কাজুনারিও জানতো এমনটা হবে। 'আপনি কি জানেন কখন ফিরবে সে?'

'সরি, তা তো নিশ্চিত করে বলতে পারছি না আমি।'

'আমি ফোন দিলেই সে বাইরে থাকে। কোনো রকম সমস্যা হচ্ছে?' এই সপ্তাহে এ নিয়ে তিনবারের মতো ফোন দিয়েছে সে।

'এক আত্মীয়ের বাসায় গেছে সে, তার জন্য দেরি হচ্ছে,' বললো তার মা।

কাজুনারি স্পষ্ট বুঝলো এরিকোর মায়ের গলায় একধরনের দ্বিধা রয়েছে। বিষয়টা আরো বিরক্ত করে তুললো তাকে।

'আপনি কি ও এলে একটা ফোন করতে পারবেন? এইমেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজুনারি নামে সেইভ করা আছে তার ফোনে।'

'আচ্ছা, করবো আমি, কাজুনারি।'

'ধন্যবাদ।'

'আসলে...'

'জি?'

এরিকোর মা বলার আগে থামলো কিছুটা। 'আচ্ছা, আগেই দুঃখপ্রকাশ করছি। তোমাকে সত্যিটাই বলছি: তুমি আর ফোন না করলে খুশি হবো আমি।'

‘কীহ!’

‘আমি জানি তোমরা দুজনে ঘোরাঘুরি করেছ অনেক, কিন্তু ও এখনো বাচ্চা। অন্য কাউকে খুঁজে নাও দয়া করে। এটাই চায় সে।’

‘কী বলতে চাচ্ছেন আপনি? আসলেই ও এটা বলেছে? আমার সাথে আর কথা বলতে চায় না সে?’

‘না...’ আবার থামলো তার মা। ‘তোমার সাথে আর কখনো কথা বলতে *পারবে* না সে। দুঃখিত, কিন্তু এটা সম্ভব না। দয়া করে বোঝার চেষ্টা করো। আমাদের সময়টা ভালো যাচ্ছে না। ভালো থেকো।’

‘একটু দাঁড়ান!’ চেঁচিয়ে উঠলো সে। কিন্তু ততক্ষণে ফোন কেটে দিয়েছে ওপাশ থেকে।

ফোন বুথ থেকে বেরিয়ে সংশয়ে পড়ে গেল কাজুনারি।

এক সপ্তাহের উপরে হয়ে গেছে এরিকোর থেকে কোনো সংবাদ পায়নি সে। গত বুধবার দিন তাদের শেষ কথা হয়েছিলো। মেয়েটা বলেছিলো পরের দিন কী একটা ড্রেস কিনতে যাবে যাতে শুক্রবার দিন দেখা করতে পারে তার সাথে। কিন্তু শুক্রবারে আর তার দেখা পাওয়া যায়নি।

ইউকিহো অবশ্য ড্যান্স ক্লাবে ফোন দিয়ে বলেছিলো যে একজন প্রফেসরের অতিরিক্ত ক্লাসের কারণে তারা আসতে পারবে না, তাই সেদিন প্র্যাকটিসেও আসেনি সে। সেদিন রাতেই কাজুনারি এরিকোকে ফোন দিয়েছিলো। সেদিন নাকি কোন আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে গেছে সে–এটাই বলা হয়েছিলো তাকে। শনিবার দিন কল দেওয়ার পরেও একই কথা শুনেছিলো। তার মায়ের গলাটা দূর থেকেই বেশ উগ্র শোনাচ্ছিলো, আর কাজুনারিও বুঝতে পারছিলো তাকে ভালোভাবে নেওয়া হচ্ছে না।

এরপর থেকে এরিকো আর ড্যান্স ক্লাবেই আসেনি। ইউকিহোও আসছে না। তাই কাউকে যে জিজ্ঞেস করবে কী হচ্ছে তারও কোনো উপায় নেই। আজ শুক্রবার, আর আজকের দিনেও মাঝপথে ফোন কেটে দিলো এরিকোর মা।

কাজুনারি চিন্তা করতে লাগলো যে কেন হঠাৎ করে এরিকো তাকে অপছন্দ করা শুরু করেছে। মানে যদি তাই হয়ে থাকে আর কি। কিন্তু মহিলা যে বললো ‘আমাদের সময়টা ভালো যাচ্ছে না’, এ দ্বারা কী বোঝাতে চাইলো?

কাজুনারি তার প্র্যাকটিসের জন্য হলের দিকে যাচ্ছিলো, এমন সময় একটা মেয়ে এসে বললো যে উদ্ভট একটা লোক কল দিয়েছে ওদের ফোনে।

‘উদ্ভট লোক মানে?’

‘কেউ একজন সেইকা গার্লস কলেজের ড্যান্স ক্লাবের প্রধানকে চাচ্ছিলো। যখন আমরা বললাম যে কানায়ে নেই, তখন এইমেই বিশ্ববিদ্যালয়েরটা চাইলো।’

‘কে ছিলো?’

'বলেনি তো। এখনো ফোনেই রয়েছে।'

'আচ্ছা।'

জিমনেশিয়ামের প্রথম তলার দিকে পা বাড়ালো কাজুনারি। ফোনটা ওখানেই রাখা। রিসিভারটা তুলে নিলো সে। 'হ্যালো?'

'ড্যান্স ক্লাবের প্রধান বলছেন?'

'হ্যাঁ। কে আপনি?'

প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল লোকটা। 'সেইকা কলেজের একটা মেয়ে আপনাদের সাথে আছে, নাম কানায়ে কুরাহাসি, ঠিক?'

'কী জন্য এসব জিজ্ঞেস করছেন?'

'ওকে বলবেন সে যেন দ্রুত তার বকেয়া পরিশোধ করে।'

'দুঃখিত, আপনি কি টাকা-পয়সার ব্যাপারে ফোন করেছেন?'

'হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন। এক লাখ বিশ হাজার অগ্রিম আর এক লাখ ত্রিশ হাজার কাজ শেষ হওয়ার পরে—এটাই চুক্তি ছিলো। ওকে বলুন প্রয়োজনে ক্লাবের টাকাগুলো থেকে দিতে।'

'মানে কীসের কাজ শেষ হওয়া বুঝাচ্ছেন?'

'সরি, বস, আপনার তা জেনে কোনো কাজ নেই।'

'তাহলে ওর কাছেই ফোন করুন, কেমন?'

হেসে উঠলো লোকটা। 'ওওও। কিন্তু ওকে এই ম্যাসেজটা পৌঁছে দেওয়ার জন্য আপনার চেয়ে ভালো কেউ নেই তো।'

'কী বোঝাতে চাচ্ছেন খোলাসা করে বলুন।'

ফোন কেটে দিলো লোকটা।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে রিসিভারটা যেখানে ছিলো সেখানে রেখে দিলো কাজুনারি।

দুই লাখ পঞ্চাশ হাজার ইয়েন! যেকোনো কাজের জন্য অনেক টাকা এগুলো। কী এমন কাজের জন্য খরচ করলো কানায়ে? আর ফোনের ওপাশের লোকটার গলার স্বরে ততটা উচ্চমার্গীয়ও মনে হলো না। কাজুনারির অবশ্য ততটা আগ্রহ জাগলো না যে কানায়েকে এর জন্য ফোন করে জিজ্ঞেস করবে। ব্রেকআপের পর থেকে আর কথা বলেনি তারা। তার তাছাড়াও তার মাথা এখন এরিকোর চিন্তা দিয়ে ভরপুর। নতুন কোনো চিন্তা ঢোকাতে চাচ্ছে না।

প্র্যাকটিস শেষে বাড়ি ফেরার পর মেইলবক্সে একটা খাম খুঁজে পেল কাজুনারি। এক্সপ্রেস মেইলে পাঠিয়েছে কেউ। বেনামি চিঠি। তার বাড়ির ঠিকানাটা দেখে মনে হচ্ছে কেউ একজন স্কেল দিয়ে মেপে মেপে প্রতিটা অক্ষর লিখেছে। অস্বাভাবিক রকমের কোনা বেরিয়ে আছে অক্ষরগুলোতে।

রুমে ঢুকে বিছানার উপর বসলো সে। খামটা খুলতে লাগলো এরপর। অন্য রকম এক অনুভূতি বুকের ভেতর ছড়িয়ে পড়লো তার।

একটা ছবি রাখা আছে ওতে শুধু। কাজুনারি বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে রইলো ছবিটার দিকে। কয়েক মুহূর্ত পরে ছবিটা তার হাত থেকে গড়িয়ে নিচে পড়ে গেল।

***

নির্দিষ্ট সময়ের পাঁচ মিনিট পরে এসে পৌঁছালো ইউকিহো। হাত নাড়লো কাজুনারি। দেখতে পেয়ে ওর দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো ইউকিহো।

'সরি, একটু দেরি করে ফেলেছি,' বললো সে।

'সমস্যা নেই, মাত্রই এসেছি আমি।'

ওয়েটার আসার পরে দুধ চা অর্ডার দিলো ইউকিহো। দুপুরবেলা, সাথে কাজের দিন বলে রেস্টুরেন্টটা ফাঁকাই ছিলো প্রায়।

'আসার জন্য ধন্যবাদ,' বললো কাজুনারি।

'অবশ্যই। কিন্তু ফোনে যেমনটা বলছিলাম তেমনই বলতে হচ্ছে আবারো: আমি এরিকোর ব্যাপারে তেমন কিছুই বলতে পারবো না।'

'আমি জানি তুমি তাকে আগলে রাখবে, বুঝতে পেরেছি তা।'

টেবিলের উপরে চোখ নামিয়ে নিলো ইউকিহো। লম্বা আইল্যাশ লাগিয়েছে সে। ক্লাবের অনেককেই বলাবলি করতে শুনেছে যে ওকে দেখতে ফ্রেঞ্চ পুতুলগুলোর মতো লাগে। তুলনাটা একেবারেই মিলে যায়, শুধু ঐ *এশিয়ান* চোখদুটো বাদে।

'অবশ্য,' বললো কাজুনারি, 'যদি আমি জেনেই থাকি পুরোটা, তবে আর আমার কাছে বলেই বা কী হবে?'

উপরে তাকালো ইউকিহো। চমকে গেছে সে।

'একটা ছবি পেয়েছি আমি মেইলে। বেনামি হিসেবে পাঠিয়েছে কেউ।'

'ছবি?'

জ্যাকেটের ভেতর হাত ঢুকিয়ে দিলো কাজুনারি। 'যদি না দেখে থাকো, তবে তোমাকে দেখানো উচিত হবে বলে মনে হচ্ছে না।'

'থামুন,' দ্রুত বলে ফেললো ইউকিহো। 'ট্রাকের পেছনের কোনো ছবি?'

'হ্যাঁ।'

হাত দিয়ে মুখটা ঢেকে ফেললো মেয়েটা। দেখে মনে হচ্ছে কান্নায় ভেঙে পড়বে। কিন্তু ওয়েটার চা নিয়ে আসার কারণে তা করলো না আর।

'তুমিও দেখেছ ওটা?' জিজ্ঞেস করলো কাজুনারি।

'হ্যাঁ।'

'কোথায়?'

'এরিকোর বাড়িতে। ওরা তার বাড়িতেও একটা পাঠিয়েছে। আমি বিশ্বাস করতে পারিনি,' স্বর ভেঙে গেছে ইউকিহোর।

‘কীসের জন্য হচ্ছে এসব?’ হাত মুষ্টিবদ্ধ করে টেবিলের উপর হালকা ঘুসি মেরে বলে উঠলো কাজুনারি।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো সে যাতে নিজেকে শান্ত করতে পারে। গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে বাইরে। এখনো জুন মাস আসেনি, তার আগেই বৃষ্টি নামতে শুরু করে দিয়েছে। কাজুনারির এরিকোকে সেলুনে নিয়ে যাওয়ার দিনটা মনে পড়লো। সেদিনও এরকম বৃষ্টি হয়েছিলো।

‘তুমি কি বলতে পারবে আমাকে যে আসলে কী হয়েছে?’

‘ওটাই কি সব বলে দিচ্ছে না? যা দেখছেন তাই ঘটেছে,’ কাজুনারির পকেটে থাকা ছবিটার দিকে ইশারা করে বললো ইউকিহো।

‘ওটা থেকে কিছুই বুঝতে পারছি না আমি। কোথায় হয়েছে এসব?’

‘ওর বাড়ির কাছেই। গত সপ্তাহের আগের সপ্তাহের বৃহস্পতিবার দিন।’

‘বৃহস্পতিবার, নিশ্চিত তুমি?’

‘একদম।’

পকেট থেকে ক্যালেন্ডারটা বের করে একবার চোখ বুলিয়ে নিলো কাজুনারি। যেটা ভেবেছিলো সেটাই হয়েছে। যেদিন তাকে ফোন করেছিলো, তার পরের দিনের ঘটনা–যেদিন সে ড্রেস কিনবে বলেছিলো।

‘কেউ কি পুলিশ ডেকেছে?’

‘না।’

‘কেন না?’

‘ওর বাবা-মা চাচ্ছে না বিষয়টা ছড়িয়ে পড়ুক বাইরে। ওরা বলেছে যে বাইরে জানাজানি হলে পরিস্থিতি আরো খারাপ হতে পারে। তবে আমার মনে হয় ওর বাবা-মা ঠিকই বলছে।’

এবার কাজুনারি জোরেসোরেই ঘুসি মারলো টেবিলটায়। এরিকোর বাবা-মায়ের কেমন লাগছে এখন তা সে বুঝতে পারছে, তবুও কিছু করতে পারছে না কারণ তারা ক্ষমতাহীন। আর এই বিষয়টাই কাজুনারিকে রাগিয়ে তুলছে।

‘যদি ওর ছবিটা আমাকে এবং তার বাবা-মাকে একসাথে পাঠিয়ে থাকে, তবে এটা কোনো উদ্দেশ্যবিহীন আক্রমণ ছিলো না। ওর বাবা-মা কি এটা বুঝতে পারছে?’

‘হ্যাঁ,’ বললো ইউকিহো। ‘কিন্তু এরকম কাজ কে করতে পারে?’

‘আমার মনে হয় আমি কিছুটা ধারণা করতে পারছি,’ নরম সুরে বললো কাজুনারি।

‘কী? কে?’

‘আমার মনে হয় তুমিও ধরতে পারছো কে হতে পারে।’

নিজেদের মধ্যে দৃষ্টিবিনিময় করলো তারা। বোঝা গেল ইউকিহোও বুঝতে পেরেছে কে করে থাকতে পারে কাজটা।

'কিন্তু একটা মেয়ে কী করে–মানে ও তো পারবে না...'

'কাউকে ভাড়া করেছে সে। এমন কাউকে যে এটা করতে পারবে।'

কাজুনারি এরপর গত শুক্রবারের ফোনের ব্যাপারটা খুলে বললো ইউকিহোর কাছে। 'ছবিটা ফোন পাওয়ার পরই পেয়েছিলাম। যার কারণে দুটোকে একসাথে মেলাতে বেশি সময় লাগেনি আমার। আর ফোনের লোকটা অদ্ভুত একটা কথা বলেছিলো। কানায়ে নাকি চাইলে ক্লাবের টাকা ব্যবহার করতে পারে এ ব্যাপারে।'

দম নেওয়ার শব্দ শুনলো কাজুনারি। 'বাকি টাকাটা পরিশোধ করতে?'

'হ্যাঁ। বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিলো, তাই খতিয়ে দেখেছিলাম।'

'কানায়েকে জিজ্ঞেস করেছিলেন?'

'না, তা করিনি। তবে আরেকটা রাস্তা খোলা ছিলো। ব্যাংকে ফোন করে জিজ্ঞেস করে নিয়েছিলাম যে কোনো রকম টাকা-পয়সা উত্তোলন করা হয়েছে কি না।'

'কিন্তু কানায়ের কাছে কি কোনো ব্যাংকের বই ছিলো?'

'ছিলো, কিন্তু আরেকটা উপায়ে বের করতে হয়েছে আমাকে সে তথ্য।' তার পরিচিত এক লোক স্যানকিও ব্যাংকে কাজ করতো। তাকে ধরে এসব জেনেছে সে।

'তো,' গলার স্বর নরম করলো কাজুনারি। 'আমি খুঁজে পেলাম যে দুই সপ্তাহ আগের মঙ্গলবার এক লাখ বিশ হাজার ইয়েন উত্তোলন করা হয়েছে কার্ড থেকে। আজকে সকালে আবার যখন চেক করলাম, দেখলাম এ সপ্তাহের শুরুতে আরো এক লাখ ত্রিশ হাজার নাই হয়ে গেছে।'

'কিন্তু এটা যে কানায়েই তুলছে এর তো কোনো প্রমাণ নেই, না? অন্য যে-কেউই তো হতে পারে এটা।'

'আমার জানামতে, গত তিন সপ্তাহে ও ছাড়া আর কেউ কার্ডটা ব্যবহার করেনি। আর তার আগে তুমি কেবল ধরেছ ওটা,' বললো সে।

'হ্যাঁ, যখন এরিকো আর আমি বইতে নাম তুলছিলাম। কিন্তু তার তিন-চার দিন বাদে আমি আবার কানায়ের কাছে সেটা ফিরিয়ে দিয়েছিলাম।'

'আর এখন পর্যন্ত ওর কাছেই আছে ওটা। আর যেটা পরিষ্কার করে দিচ্ছে যে সে-ই এই কাজ করার জন্য কাউকে ভাড়া করেছে।'

লম্বা একটা নিঃশ্বাস ছাড়লো ইউকিহো। 'কেন যেন বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে আমার।'

'আমিও বিশ্বাস করতে পারছি না।'

'কিন্তু এসবই কেবল মনগড়া ধারণা। আপনার কাছে কোনো প্রমাণ নেই। যে-কেউই টাকাটা ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট থেকে নিতে পারে।'

'যদি তাই হয়ে থাকে, তবে বলতে হবে বেশ বড় কোনো কাকতালীয় ঘটনা এটা। আমার মনে হয় পুলিশের কাছে যাওয়া উচিত আমাদের।'

চোখ পিটপিট করে তাকালো ইউকিহো। 'বললাম না একটু আগে যে এরিকোর বাবা-মা চাচ্ছে না বিষয়টা বাইরে ছড়িয়ে পড়ুক? যদি পুলিশ জড়িয়ে পড়ে, অথবা বেরও করে কে করেছে কাজটা, তাহলেও যা করেছে তা ফেরত পাওয়া যাবে না। আর এরিকোর জন্য তখন সবকিছু আরো কঠিন হয়ে যাবে।'

'এর মানে এই না যে এমনি এমনি ছেড়ে দিতে হবে। এমনি এমনি ছাড়ছি না আমি এটাকে।'

ওর দিকে তাকালো ইউকিহো। 'আমার তো মনে হয় না এ ব্যাপারে আপনার কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার আছে।'

চোখের পলক ফেললো কাজুনারি। এটা আশা করেনি সে। শ্বাস আটকে রেখে এক মুহূর্তের জন্য তাকিয়ে রইলো ইউকিহোর দিকে।

এরপরে মুখ খুললো ইউকিহো, 'এরিকোর কাছ থেকে একটা ম্যাসেজ রয়েছে আপনার জন্য: *গুডবাই*।'

'ব্যস, এটুকুই? তোমাকে শুধু গুডবাই বলতেই পাঠিয়েছে সে?' কাজুনারি আবারো ঘুসি মারলো টেবিলের উপর। 'আমি ওর সাথে দেখা করতে চাই।'

'তা করতে পারবেন না আপনি।' দাঁড়িয়ে গেল মেয়েটা। অল্প একটু চা খেয়েছে কেবল। 'আমি আসলে এই বার্তাবাহকই হতে চাইনি এখানে।'

'ইউকিহো–'

'ভালো থাকবেন, গেলাম।' বলেই বের হওয়ার জন্য রওয়ানা দিলো সে। কিন্তু একটু যেতেই থমকে দাঁড়ালো।

'আরেকটা কথা, আমি ড্যান্স ক্লাব ছাড়ছি না। আমি চাচ্ছি না ও ভাবুক যে তার জন্য আমি ড্যান্স ক্লাব ছেড়ে দিয়েছি।'

ইউকিহো চলে যাওয়ার পরে লম্বা একটা শ্বাস ছেড়ে বাইরের দিকে তাকালো কাজুনারি। এখনো অনবরত বৃষ্টি পড়ছে সেখানে।

***

টিভিতে বিরক্তিকর টক শো আর খবরই প্রচারিত হচ্ছে শুধু। ছোট চারপায়া টেবিলটার উপর থেকে রুবিকস কিউবটা হাতে নিলো এরিকো। গত বছরে এত সাড়া ফেলে দেওয়া খেলনাটা এখন কেউ ছুঁয়েও দেখে না আর। মজাই লাগতো যখন সবাই বলাবলি করতো যে এটা সমাধান করা অসম্ভব, কিন্তু যখন একবার সমাধানের রাস্তা পেয়ে গেল, তখন প্রাইমারির বাচ্চারাও মিনিটের মধ্যে সমাধান করে ফেলতে লাগলো। যদিও এরিকো পারেনি এখনো। গত চার দিন ধরে এই

বস্তুটার সাথে লড়ছে সে। ইউকিহো তাকে মূল ধাপ এবং কী মেলাতে হয় তা শিখিয়ে দিয়ে গেছিলো, তবুও পারছে না সে।

কোনো কিছুতেই ভালো না আমি।

দরজায় কড়া নাড়লো কেউ। 'ইউকিহো এসেছে তোমার সাথে দেখা করতে,' বললো তার মা।

'ঠিক আছে।'

পায়ের শব্দ শুনতে পেল সে। দরজাটা হালকা খুলে যেতেই উঁকি দিলো ইউকিহো। 'ঘুমাচ্ছিলে নাকি?'

'এটার সমাধান করতে গিয়ে আবার ঘুম। মাথা খারাপ হয়েছে নাকি?' রুবিকস কিউবটা তুলে ধরে বললো সে।

হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকলো ইউকিহো। 'এই নাও।' একটা বাক্স তুলে ধরলো তার সামনে। ক্রিম পাফ, এরিকোর পছন্দের খাবার। 'তোমার মা বললো চা আনতে যাচ্ছে সে।'

'দারুণ,' বললো এরিকো। 'দেখা হয়েছে ওর সাথে?'

'হ্যাঁ, দেখা হয়েছে।'

'বলেছ তুমি?'

'হ্যাঁ। অত সহজও ছিলো না।'

'সরি তোমাকে দিয়ে বলানোর জন্য।'

'না, ঠিক আছে।' ইউকিহো তার নিজের হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে এরিকোর হাতটা তার হাতের মধ্যে নিলো। 'কেমন লাগছে এখন? মাথাব্যথা করছে এখনো?'

'না, অনেকটা ভালো লাগছে এখন।'

ওকে আক্রমণ করা দুর্বৃত্তটা ক্লোরোফর্ম দিয়ে নিয়েছিলো, তাই সেদিনের পর থেকে হালকা মাথাব্যথা করছে তার। যদিও ডাক্তার বলেছে যে শরীরের থেকে মনের দিক দিয়ে বেশি ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

সেদিন এরিকোর জ্ঞান ফেরার পর নিজেকে একটা পিকআপ ভ্যানের উপর আবিষ্কার করে। পাশেই বসে ছিলো তার মা, কাঁদছিলো অবশ্যই। সেদিন এরিকোকে বাড়িতে ফিরতে না দেখে তার মা সেই ট্র্যাকের পাশের রাস্তা দিয়েই স্টেশনের দিকে যাচ্ছিলো। আর সেখানেই খুঁজে পেয়েছিলো তাকে।

ছবিটা আসে তার কিছু দিন পর। কোনো নাম-ঠিকানা লেখা ছিলো না ওতে। কিন্তু তারপরও খামটার ভেতর এতটাই ঘৃণাভরতি ছিলো যে রীতিমতো কাঁপছিলো এরিকো। ও বুঝে গেছে তাকে কী করতে হবে। অনেকের মাঝে আলাদা করে চোখে পড়া যাবে না। বন্ধুর পেছনেই থাকতে হবে তাকে—ইউকিহোর পেছনে। যেমনটা হয়ে আসছিলো এত দিন। এটাই তার জন্য উত্তম।

তবে সেদিন রাতে একটা ব্যাপারে বেঁচে গেছে ও। না, এরিকোকে ধর্ষণ করেনি কেউ সে রাতে। দুর্বৃত্তদের উদ্দেশ্য একটাই ছিলো। এরিকোকে উলঙ্গ করে একটা ছবি তোলা। আর এজন্যই তার বাবা-মা পুলিশকে জানাতে চায়নি ঘটনাটা। একবার কথা ছড়িয়ে পড়লে সবাই মনে করবে ওকে ধর্ষণ করা হয়েছে। সারা জীবনের জন্য কালো দাগ পড়ে যাবে ওর গায়ে।

এরিকোর মনে পড়লো সেই মিডল স্কুলে থাকার সময়কার ঘটনার কথা। যেদিন ইউকিহো আর সে তাদের সহপাঠীর নগ্ন দেহ খুঁজে পায় সেদিন। ফুজিমুরার মা বারবার করে বলছিলো যে শুধু জামা-কাপড়টাই খোলা হয়েছিলো তার, আর কিছুই না। ওরাও বিশ্বাস করেনি সেটা, কিন্তু এবার এরিকোর সাথেই ঘটে গেল তেমন কিছু। এখন ও বুঝতে পারছে যে এমনটা ঘটা আসলেই সম্ভব। এটাও বুঝতে পারলো যে সে আর কখনো অন্য কাউকে এটা বোঝাতে পারবে না।

'আশা করি খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠবে তুমি। তোমার সাথেই আছি আমি। যখন দরকার পড়বে ডাকবে আমায়,' বললো ইউকিহো। এরিকোর হাতটা আরেকটু জোরে চেপে ধরলো সে।

'ধন্যবাদ, ইউকিহো। তুমিই আমার একমাত্র বন্ধু।'

'কোনো সমস্যাই না এটা। আমরা এগুলো পেরিয়ে যাবো একদিন।'

দুজনেই চুপচাপ বসে রইলো সেখানে। রাতের খবরের শব্দ ভেসে বেড়াচ্ছে পুরো ঘর জুড়ে।

'...ভিক্টিম টোকিওর একজন ব্যবসায়ী। বলছেন যে তার অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা উধাও হয়ে গেছে, আর তিনি এ বিষয়ে কিছুই জানেন না। উনি এটা বুঝতে পারেন তখন, যখন নিজে কিছু টাকা উত্তোলনের জন্য ব্যাংকে যান। কিন্তু গিয়ে দেখেন দুই মিলিয়ন ইয়েনের জায়গায় শূন্য ইয়েন পড়ে আছে তার অ্যাকাউন্টে। ব্যাংকের নিজস্ব তদন্ত থেকে জানা যায় যে সব মিলিয়ে সাতবার এটিএম কার্ড ব্যবহার করে টাকাটা উঠানো হয়েছে। আর তা করা হয়েছে ফুচু এলাকার স্যানকিও ব্যাংক শাখা থেকে। সর্বশেষ টাকা উঠানোর তারিখ হলো ২২ই এপ্রিল। দেখা গেছে ব্যাংক থেকে সেই ভদ্রলোককে একটাই ক্যাশ কার্ড দেওয়া হয়েছিলো, যা তিনি তার নিজের অফিসের ডেস্কে রেখেছিলেন। ওটা কখনোই ব্যবহার করেননি এর আগে। পুলিশ বলছে, সম্ভবত কেউ ওটার কপি করে টাকাগুলো উঠিয়ে নিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে তারা তদন্ত চালাচ্ছে—'

ইউকিহো একটু এগিয়ে গিয়ে বন্ধ করে দিলো টিভিটা।

অধ্যায় ছয়

তোমোহিকো সোনোমুরা দুই পাশে আরেকবার ভালো করে দেখে নিশ্চিত হয়ে নিলো যে তাকে কেউ দেখছে কি না। লম্বা একটা দম নিয়ে অটোমেটিক দরজাটার ভেতরে ঢুকে পড়লো সে।

ঢোকার সাথে সাথেই মনে হলো তার পরচুলাটা এই বুঝি পড়ে গেল, কিন্তু তবুও হাত দিয়ে ঠিক করা থেকে বিরত থাকলো সে। রিও তাকে এসব করতে অনেকবার করে নিষেধ করেছে। একই জিনিস তার চশমার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। উলটা-পালটা নড়াচড়া করার কারণে তার ছদ্মবেশ ফাঁস হয়ে যেতে পারে।

তামাতসুকুরি শাখায় স্যানকিও ব্যাংকের দুটো এটিএম আছে। যেটার একটাতে এখন মাঝবয়সি একটা মহিলা ঢুকেছে। আর অনেক সময় নিচ্ছে সে; বোধহয় ততটা অভ্যস্ত না এসব মেশিনের ব্যাপারে। একটু পরপর আশেপাশে ঘুরে তাকাচ্ছে মহিলা। বোঝা গেল ব্যাংকের কোনো কর্মচারীকে খুঁজছে যাতে তাকে কিছুটা সাহায্য করতে পারে। কিন্তু ক্যাশিয়াররা ততক্ষণে চলে গেছে। চারটার পরে শুধু মেশিনই খোলা থাকে।

তোমোহিকো কিছুটা দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল এই ভেবে যে হয়তো মহিলাটা তাকে সাহায্যের জন্য ডাকতে পারে। আর ডাকলে আজকের মতো পরিকল্পনা গচ্ছা দিতে হবে তাকে। যার কারণে পাশের এটিএমটার দিকেও আগাতে পারছে না সে। কিন্তু আর কোনো কাস্টমার না থাকায় ওখানে দাঁড়িয়ে থাকাটাও সন্দেহজনক মনে হবে। সে একবার ভাবলো ঘুরে বেরিয়ে যাবে কি না, কিন্তু তাতে আবার আগামীকালের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। এতটা অপেক্ষা করতে চাচ্ছে না সে।

ধীরে ধীরে পাশের মেশিনটার দিকে এগিয়ে গেল সে। মহিলাটা এখনো বাটন চাপছে অনবরত। তোমোহিকো ব্যাগটা খুলে হাত ঢোকালো তার মধ্যে।

কার্ডটা বের করে আনবে, এমন সময় মহিলাটা ওর দিকে ফিরে বললো, 'এক্সকিউজ মি, আমি এরমধ্যে টাকাগুলো ভরতে চাচ্ছি, কিন্তু কোনো কাজ হচ্ছে না।'

মাথাটা নিচু রেখেই কাঁধ ঝাঁকালো তোমোহিকো।

'ওরা সব সময় বলে যে এটা নাকি ব্যবহার করাটা বেশ সহজ,' বলতে লাগলো মহিলাটা। 'কিন্তু আমি তো ভাজা মাছটাও উলটাতে পারছি না।'

তোমোহিকো আবারো মাথা দুলিয়ে কাঁধ ঝাঁকালো। ও আর যাই করুক, মহিলার সাথে কথা বলতে পারবে না।

ব্যাংকের দরজাটা হঠাৎ খুলে যেতেই আরেকজন মহিলার গলা শুনতে পেল তোমোহিকো। সম্ভবত মহিলার কোনো বন্ধু।

'এতটা সময় লাগছে কেন তোমার? এখানে দেরি করলে আমাদের পৌঁছাতে দেরি হয়ে যাবে।'

'আরে এটা কাজ করছে না!' বললো পাশে থাকা মহিলাটা। 'এই জিনিসটা ডিপোজিট নিচ্ছেই না কোনোভাবে। তুমি কখনো চালিয়েছ এগুলো?'

'কখনোই না,' জবাব দিলো সে। 'এক কাজ করো, পরে এসো। ক্যাশিয়ার যখন আসবে তখন। অপেক্ষা তো করা যাবে, নাকি?'

'হ্যাঁ, কিন্তু আমি এক ব্যাংকারকে দিয়ে এই কার্ড আর বাকি সবকিছু বানিয়ে নিয়েছি। এখন তো এটা ব্যবহার না করাটাই বোকামি মনে হচ্ছে। ও শুধু বলতো যে ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টাকা উঠানোর থেকে মেশিন থেকে উঠানো সহজ। কিন্তু আমি তো কিছুই করতে পারছি না।' দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে একটু পিছিয়ে এলো সে। 'দেখো, এক বছরের মাথায় এই সবকিছু ভেঙেচুরে যাওয়ার পরে আবার আগের মতোই হয়ে যাবে সব।' তারপর বিড়বিড় করতে করতে বেরিয়ে গেল মহিলাটা।

হালকা নিঃশ্বাস ছেড়ে আবার কালো ব্যাগটার মধ্যে হাত ঢোকালো তোমোহিকো। ধীরে ধীরে কার্ডটা বের করে আনলো সে। আকার-আকৃতিতে একদম স্যানকিও ব্যাংকের কার্ডের মতোই মনে হচ্ছিলো ওটা। কিন্তু সামনের দিকটা একদম ফাঁকা। ম্যাগনেটিক স্ট্রিপটা রয়েছে শুধু। এর বাইরে না তো কোনো নাম আর না তো কোনো লোগো আছে। যার কারণে সিকিউরিটি ক্যামেরাতে যেন কার্ডটা না দেখা যায় সেজন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে ও।

বাটনের দিকে তাকিয়ে উইথড্রয়াল বাটনটায় চাপ দিলো সে। স্ক্রিনে একটা লেখাসহ আলো জ্বলে উঠলো–*কার্ডটি ভেতরে ঢোকান*। তোমোহিকোর হৃৎপিণ্ড দৌড়াতে শুরু করে দিয়েছে এরমধ্যে। স্লটের মধ্যে কার্ডটা ঢুকালো সে।

মেশিনটা এবার পিন চাইলো ওর কাছে।

এই যে, নাও।

নাম্বার প্লেটের দিকে হাত চলে গেল তার। ৪-১-২-৬ দিয়ে ওকে টিপলো। বেশ কিছুক্ষণ সময় নিলো মেশিনটা। এরপর কিছুই হলো না। মেশিনটা যদি অস্বাভাবিক কোনো আচরণ করে, তবে দ্রুত স্থান ত্যাগ করতে হবে তাকে। কিন্তু তা আর করতে হলো না। কিছুক্ষণ পরে মেশিনটি বিপ দিয়ে কত টাকা তুলতে চাচ্ছে তা জানতে চাইলো। তোমোহিকো আনন্দে লাফ দিয়ে ওঠা থেকে বিরত রাখলো নিজেকে। যতটা সম্ভব ঠান্ডা থেকে ও লিখলো: ২,০০,০০০।

তার দুই-তিন সেকেন্ড পরেই সে পেয়ে গেল পুরো দুই লক্ষ ইয়েন এবং একটা রিসিপ্ট। এটিএম কার্ডটা পুনরায় ব্যাগে ভরে বেরিয়ে গেল সেখান থেকে।

ছড়িয়ে থাকা স্কার্টটা তাকে স্বাভাবিকভাবে হাঁটতে দিচ্ছে না। ব্যাংকের সামনে অনেকগুলো গাড়ি রাখা, যদিও কোনো পথচারী নেই বলে তেমন সমস্যা হচ্ছে না তার। অনেক ভারী মেকআপের কারণে তার চেহারাটা শক্ত হয়ে আছে। এর অবশ্য

আরেকটা কারণও আছে। ওর চেহারার উপরে গ্লু দিয়ে আরেকটা স্তর লাগানো হয়েছে।

ভ্যান গাড়িটা বিশ মিটারের মতো দূরে রাখা আছে। গাড়ির কাছাকাছি যেতেই খুলে গেল প্যাসেঞ্জার সিটের দরজাটা। চারপাশে একবার দেখে নিলো সে। স্কার্টটা একটু তুলেই গাড়িতে ঢুকে বসলো।

মন দিয়ে *উরুসেই ইয়াতসুরা* নামের পুরাতন যে মাঙ্গাটা পড়ছিলো তা বন্ধ করে দিলো রিও। তোমোহিকোর দিকে তাকিয়ে ইগনিশনে পা রাখলো। 'কেমন হলো?'

'তাকাও এদিকে,' ব্যাগের মধ্যে থাকা ব্যাংকের ফ্রেশ নোটগুলো দেখিয়ে বললো তোমোহিকো।

রিও একপলক তাকালো টাকাগুলোর দিকে। এরপরে গাড়িটাকে নিচের গিয়ারে নামিয়ে নিয়ে ট্রাফিক থেকে বেরিয়ে গেল। মুখের ভাবভঙ্গির কোনো পরিবর্তন হয়নি।

'তবে তো মনে হচ্ছে আমরা কেল্লাফতে করে ফেলেছি,' সোজা রাস্তার দিকে তাকিয়ে বললো সে। কোনো রকম আনন্দ বা প্রাপ্তির চিহ্নও নেই তার গলায়। 'তবে এমন না যে কোনো রকম সন্দেহ ছিলো আমার।'

'আমারও যে ছিলো তাও না। তবে যখন পিনটা মিলে গেল, আমি রীতিমতো কাঁপছিলাম,' উরু চুলকাতে চুলকাতে বললো তোমোহিকো। প্যান্টি পরে থাকার কারণে ওখানে চুলকাচ্ছে খুব।

'সিকিউরিটি ক্যামেরা থেকে সাবধানে থেকেছিলে তো?'

'হ্যাঁ, কোনো সমস্যা হয়নি ওটায়। আমি সেদিকে না তাকানোর চেষ্টা করেছিলাম। তবে–'

'তবে কী?' রিও তাকালো তার দিকে।

'একজন মহিলা ছিলো সেখানে...'

তোমোহিকো এরপর পুরো ঘটনাটা খুলে বললো রিওকে। গল্পের মাঝখানে হঠাৎ ঘন কালো মেঘ এসে হাজির হলো রিওর মুখে। গাড়িটাকে রাস্তার পাশে রেখে ওর দিকে তাকিয়ে বললো, 'তোমাকে কী বলেছিলাম আমি?' রেগেমেগে বললো সে। 'বলেছিলাম না যে পরিস্থিতি স্বাভাবিকের থেকে একটু এদিক-সেদিক গেলেই ওখান থেকে বেরিয়ে পড়তে?'

'হ্যাঁ, তা তো জানি আমি। ভাবলাম কোনো সমস্যা হবে না হয়তো,' গলার কম্পনটা থামাতে গিয়েও থামাতে পারলো না সে।

রিও তোমোহিকোর ব্লাউজের কলারটা ধরে বললো, 'আমি চাই না তুমি তোমার নিজের মতো করে এতে মাথা খাটাও। জীবন-মরণ খেলা এটা। এত সহজ না।' জ্বলে উঠলো তার চোখদুটো।

‘ও আমার মুখ দেখেনি,’ জড়তা নিয়ে বললো তোমোহিকো। ‘কোনো কথাও বলিনি আমি। সত্যি বলছি। ওদের বোঝার কোনো রাস্তাই ছিলো না যে আমি একটা ছেলে।’

বিকৃত হয়ে গেল রিওর মুখ। তোমোহিকোর কলারটা ছেড়ে দিলো সে। ‘গর্দভ।’

‘কী হলো?’

‘কী মনে হয়, তোমাকে এরকম করে সাজানোর কারণ কী?’

‘আমার ছদ্মবেশের জন্য, না?’

‘হ্যাঁ। তবে এই ছদ্মবেশ কাকে বোকা বানানোর জন্য? ব্যাংকের মানুষজন বা পুলিশ। যখন ওরা জানতে পারবে আমরা নকল কার্ড ব্যবহার করেছি, তখন প্রথমে যেটা তারা চেক করবে তা হলো সিসিটিভি ফুটেজ। আর সেখানে ওরা তোমাকে মেয়ে হিসেবে ধরে নেবে–একদম প্রত্যেকেই। এমনিতেই তোমার যে নাজুক শরীর আর কমনীয় চেহারা, হাই স্কুলে তো তোমার নামে ফ্যান ক্লাবই চালু হয়ে গেছিলো।’

‘কিন্তু ক্যামেরাতে তো আমার মুখ দেখা যায়নি–’

‘তা হয়তো যায়নি, কিন্তু কথা বলার কারণে ওরা তোমাকে দেখেছে। তো পুলিশ কী করবে এখন জানো? তারা ঐ মহিলাকে খুঁজে বের করবে। আর একবার খুঁজে পেলে প্রশ্ন করতে শুরু করবে। ওরা তার পাশে থাকা মেয়েটার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করবে। যে মেয়েটা আসলে তুমি। যদি সে বলে ফেলে যে “অফিসার, আমার পাশে যে দাঁড়িয়ে ছিলো, সে আসলে কোনো মেয়েই ছিলো না। ও ছিলো একটা ছেলে”, তাহলে ছদ্মবেশের বারোটা বেজে যাবে তোমার।’

‘ও এমন কিছুই বলবে না। কসম খেয়ে বলছি, কিছুই খেয়াল করেনি সেই মহিলা।’

‘এতটা নিশ্চিত কী করে হচ্ছো তুমি? মহিলারা একটু বেশিই মনোযোগ দেয় অন্যদের উপর। তুমি কোন ব্র্যান্ডের হ্যান্ডব্যাগ ব্যবহার করেছ তাও হয়তো মনে থাকবে তার।’

‘কিন্তু আমি এখনো বুঝতে পারছি না এতে কী সমস্যা হতে পারে।’

‘ঐ মহিলা যদি খুব ছোটখাটো কোনো বিষয়ও খেয়াল করে থাকে, তবে অবশ্যই সমস্যা। শুধু ভাগ্যের উপর নির্ভর করে এ ধরনের কাজ করা যায় না। কোনো বুটিক শপ থেকে জ্যাকেট মেরে দিচ্ছি না আমরা–মাথায় রাখতে হবে তোমাকে।’

‘হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি আমি। সরি,’ মাথা নুইয়ে ক্ষমা চাইলো তোমোহিকো।

রিও ছোট্ট করে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আবার লো গিয়ারে চালু করে দিলো গাড়িটা। ধীরে ধীরে রাস্তার কিনারা থেকে মাঝপথে চলে এলো তারা।

'তারপরও,' সাবধানে বললো তোমোহিকো। 'আমাদের ঐ মহিলাকে নিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই বলে মনে হচ্ছে। মেশিনটার ভেতরেই তার সব মনোযোগ ডুবে ছিলো।'

'সে যাই হোক। ছদ্মবেশটা স্রেফ সময় নষ্ট করা ছাড়া আর কোনো কাজেই এলো না তবে।'

'ব্যাপারটা মোটেও তেমন না।'

'তুমি ওর সাথে কোনো কথাই তো বলোনি, না? একটা শব্দও তো উচ্চারণ করোনি, রাইট?'

'হ্যাঁ, এজন্যই তো বলছিলাম-'

'এর জন্যই তো সময় নষ্ট হয়েছে বললাম,' নরম সুরে বললো রিও। 'কী ধরনের মানুষ প্রশ্ন করার পর কোনো কথা না বলে চুপ থাকে? পুলিশ বুঝে যাবে যে তোমার কথা না বলার পেছনে কোনো কারণ ছিলো। এরপরে হয়তো কারো মাথায় চলে আসবে যে তুমি কথা বলোনি কারণ এতে তুমি যে মেয়ে সাজার ভান করছিলে তা প্রমাণিত হয়ে যাবে।'

চোয়াল ঝুলে গেল তোমোহিকোর। এরপর কিছু না বলে মুখটা বন্ধ করে ফেললো আবার। কারণ রিও ঠিক কথাই বলছে। যেমনটা সব সময়ই হয়ে থাকে। 'সরি,' বললো সে।

রাস্তার উপরে দৃষ্টি দিলো রিও। 'তোমাকে আর এ ব্যাপারে বলবো না আমি।'

'আচ্ছা। আর বলতেও হবে না, প্রমিজ,' বললো সে। ভালো করেই জানে রিও সেই লোকদের অপছন্দ করে যারা একই ভুল দুইবার করে।

সাপের মতো পেঁচিয়ে ভ্যানের পেছনের সিটে চলে গেল তোমোহিকো। পাশে থাকা একটা ব্যাগ থেকে নিজের পোশাক বের করে ড্রেস পরিবর্তন করা শুরু করলো সে। টাইট স্কার্টটা খুলে ফেলতেই হাঁফ ছাড়লো। ওর ছদ্মবেশের সবকিছু আগে থেকেই সংগ্রহ করে রেখেছিলো রিও। সে অবশ্য এসব কোথা থেকে বা কীভাবে এনেছে তা বলেনি। তোমোহিকোও জিজ্ঞেস করেনি। বছরখানেক একসাথে থাকার পরে তোমোহিকো বুঝে গেছে কোন কোন জিনিসের ব্যাপারে রিওকে জিজ্ঞেস করা অর্থহীন।

মেকআপ উঠিয়ে ফেলেছে, এমন সময়ে গাড়িটা থামলো। সাবওয়ে স্টেশনের সামনে আছে তারা।

'আজকের রাতটা অফিসে কাটিয়ে দিও,' রিও বললো।

তোমোহিকো ভেবে রেখেছিলো আজ রাতে তার কিছু বন্ধুর সাথে *গুন্ডাম* নামের নতুন সাই-ফাই এনিমেশন মুভিটা দেখবে।

'আচ্ছা, আমিও তাই ভাবছিলাম।' বলেই নেমে পড়লো ভ্যান থেকে। ভ্যানটা চলে যাওয়ার আগ পর্যন্ত সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে এরপরে সাবওয়েতে নামার জন্য সিঁড়ির দিকে এগোলো সে।

***

ক্লাসে চলা হাই ভোল্টেজ ইঞ্জিনিয়ারিং লেকচারটা শোনার জন্য ঘুমের সাথে তুমুল লড়াই করতে হচ্ছে সবাইকে। খবর পাওয়া গেছে যে এর আগের ক্লাসের প্রফেসর হাজিরা নিতে ভুলে গেছিলো। আর যেহেতু এক্সামে নকল করা সহজ, তাই যে ক্লাসরুমে পঞ্চাশজন থাকার কথা, সেখানে এই সকালবেলা মাত্র বারো-তেরোজন আছে। বাকিরা পালিয়ে গেছে।

সামনে থেকে দ্বিতীয় বেঞ্চে বসেছে তোমোহিকো। মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টা করছে পড়ায়। সাদা চুলের একজন প্রফেসর আর্ক ডিসচার্জ এবং গ্লো ডিসচার্জের ব্যাখ্যা দিচ্ছে। নোট নিচ্ছে তোমোহিকো। কারণ ও জানে, যদি এখন লেখা বন্ধ করে দেয়, তবে সে-ই প্রথমে টেবিলের উপর মুখ থুবড়ে পড়বে ঘুমের কারণে।

সব রকম কার্যকলাপ দিয়ে তোমোহিকোকে একজন সিরিয়াস স্টুডেন্টই মনে হয়। অবশ্য, শিনওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের সবাই এটাই ভাবতো। প্রায় সব ক্লাসে তার উপস্থিতি রয়েছে। আর যেগুলোতে নেই সেগুলো হলো আইন, শিল্প আর মনোবিজ্ঞান ক্লাস। ওগুলো তার মেজর সাবজেক্টের সাথে সম্পর্কিত না। যেহেতু এখনো দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র সে, সেহেতু এরকম কিছু কোর্স রেখে দিয়েছে পরবর্তীতে দেখবে বলে। এর বাইরে সব মনোযোগ সে তার মেজর সাবজেক্টগুলোতেই দিয়েছে: কারণ রিও তাকে ওটাই করতে বলেছে। ব্যবসার ক্ষতি হবে ওসব করলে–ঠিক এটাই বলেছে রিও।

তোমোহিকোর ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ভর্তি হওয়ার পেছনেও রিওর হাত ছিলো। কলেজের সিনিয়র ক্লাসে তার ম্যাথ আর বিজ্ঞানে বেশ ভালো রেজাল্ট এসেছিলো, কিন্তু সে বুঝতে পারছিলো না ইঞ্জিনিয়ারিং নেবে না পদার্থবিজ্ঞান। আর তখনই রিও বলেছিলো, 'এখানে আর ওখানে যেখানেই করো না কেন, সবই কম্পিউটারকে ঘিরেই করতে হবে। এই ব্যাপারে যা কিছু পারো শিখে নাও। এতে আমারও সুবিধা হবে।'

তখনকার সময়ে রিও মেইলের মাধ্যমে গেম বিক্রি করে বেশ সফলই হচ্ছিলো বলা যায়। অন্যদিকে, প্রোগ্রামিং-এর বিষয়ে প্রায় সবকিছুই দেখছিলো তোমোহিকো। কিন্তু তোমোহিকোর ইঞ্জিনিয়ারিং নেওয়ার পেছনে রিওর আগ্রহ এজন্য ছিলো না যে তোমোহিকো যেন ওখানেই থিতু হতে পারে। রিও চায় আরো বড় কিছু করতে।

একদিন অবশ্য তোমোহিকো বলেছিলো যে যদি এতটাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে বিষয়টা, তবে রিও নিজে কেন করছে না? কারণ রিওর গণিতে বা বিজ্ঞানে তোমোহিকোর থেকে ভালো রেজাল্ট ছিলো।

শুনে হেসে ফেললো রিও। 'যদি আমার হাতে কলেজে যাওয়ার মতো সময় থাকতো, তবে এখানে বসে এই কাজ করতাম না।'

সেই সময়েই প্রথম জেনেছিলো তোমোহিকো যে রিও কলেজে ভর্তি হবে না। আর এটা তার সাবজেক্ট পছন্দ করার কাজটা সহজ করে দিয়েছিলো। কারণ সে বুঝতে পেরেছিলো যে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং সে শুধু নিজের সুবিধার জন্যই পড়ছে না। রিওকেও সাহায্য করতে হবে তাকে।

আর এগুলো সেই ঋণ পরিশোধ করার জন্য করতে হচ্ছে তাকে। জুনিয়র হাই স্কুলে থাকাকালীন সেই ঘটনা, যা তার স্মৃতিতে এক বিশাল দাগ কেটে গেছে।

আর এজন্যই তোমোহিকো মনোযোগের সাথে ক্লাসগুলো করে। তবে অবাক করার বিষয় হলো, যখনই সে তার নোটবুক অফিসে নিয়ে যায়, তখনই তাতে চোখ বোলায় রিও। মাঝেমধ্যে আবার বই খুলে নোটের সাথে মেলায়। তার জন্য একটা কথা সহজেই বলা যায় যে শিনওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে একদিনও না গিয়ে ওখানকার অনেক শিক্ষার্থীর থেকে এই সাবজেক্ট সম্পর্কে রিওর ধারণা বেশি।

রিওর নতুন একটা প্যাশন দেখা গেছিলো সে সময়। ম্যাগনেটিক স্ট্রিপ কার্ড নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করা। ঐ যেমনটা এটিএম কার্ড বা সিম কার্ডে থাকে। এ সম্পর্কে তার ধারণা আসে তোমোহিকোর ভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার পরে ডিপার্টমেন্টে ঘোরার সময় একটা ডিভাইস দেখে। ওটা একটা এনকোডার, যা যেকোনো ম্যাগনেটিক স্ট্রিপ কার্ডে থাকা তথ্য পড়তে সক্ষম ছিলো।

যখন এ বিষয়ে রিওকে জানিয়েছিলো সে, তার চোখ চকচক করে উঠেছিলো। বলেছিলো, 'ওটা দিয়ে চাইলে নকল এটিএম কার্ড বানানো সম্ভব।'

'হ্যাঁ, চাইলে পারা যায়,' তোমোহিকো জবাব দিয়েছিলো। 'কিন্তু তাতে কী লাভ হবে? পিন তো লাগবে।'

'পিন, না?'

রিও এরপরের কিছু দিন বেশ ছুটোছুটি করেছিলো কিছু একটার জন্য।

এর দুই কি তিন সপ্তাহ বাদে রিও বড় একটা বাক্সে করে কী যেন নিয়ে আসে অফিসে। একটা এনকোডার ছিলো ওটা। একটা স্লট ছিলো ওতে, যেটাতে ম্যাগনেটিক স্ট্রিপ রাখা যেত। আর ছিলো মনিটর, যাতে তথ্যগুলো দেখা যেত।

'এটা কোথায় পেলে তুমি?' জিজ্ঞেস করেছিলো তোমোহিকো, কিন্তু রিও শুধু ঠোঁট বাঁকিয়ে কাঁধ ঝাঁকিয়েছিলো।

কিছু দিন ওটা নিয়ে নাড়াচাড়া করার পরে রিও তার প্রথম এটিএম কার্ড বের করে। তোমোহিকো অবশ্য জানে না ওটার আসল মালিক কে। তবে যে-ই হয়ে

থাকুক না কেন, এ সম্পর্কে সে কিছুই জানে না। রিও শুধু আসলটা কপি করতে এনেছিলো কয়েক ঘণ্টার জন্য।

রিও দুইবারের মতো কার্ডটা ব্যবহার করে প্রায় দুই লাখ ইয়েন উঠিয়েছিলো। তোমোহিকোকে অবাক করে দিয়ে সেই এনকোডারে পাওয়া তথ্য থেকেই পিন নাম্বার বের করেছিলো রিও।

ওটা করার জন্য একটা কৌশল আছে, যেটা রিও মেশিন আনার আগেই ধরে ফেলেছিলো। রিও তাকে কৌশলটা দেখিয়েছিলো যে কী করে বিশেষ কিছু ব্যবহার করে সব তথ্য পড়ে নেওয়া যায়। কৌশলটা সহজ, একটা বাচ্চাও পারবে। কিন্তু যে এই কৌশলটা বের করেছে, সে যথেষ্ট মেধাবী।

ওটা দেখার জন্য রিও কিছু চুম্বকের গুঁড়ো এনেছিলো। সেগুলো কার্ডে থাকা ম্যাগনেটিক স্ট্রিপে ফেলে দেয়। তোমোহিকো অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখে।

গুঁড়োগুলো নির্দিষ্ট একটা প্যাটার্ন মেনে ছড়িয়ে গেছে স্ট্রিপে।

'অনেকটা মোর্স কোডের মতো এগুলো,' ব্যাখ্যা করেছিলো রিও। 'যে কার্ডগুলোর পিন জানতাম, সেই কার্ডগুলো দিয়ে কয়েকবার চেষ্টা করেছি। আর এরপরেই বুঝতে পারি কাজটা কেমন করে হচ্ছে। শুধু এবারেরটা উলটো করে করতে হয়েছে এই-ই যা। যদি পিন না-ও জানো, তবে প্যাটার্ন দেখলেই বুঝে যাবে পিন কী।'

'তার মানে শুধু কার্ড জোগাড় করে তাতে এই চুম্বকের গুঁড়া ছিটিয়ে দিলেই হয়ে যাবে?'

'একদম। সহজে টাকা কামানো যাবে।'

বাকরুদ্ধ হয়ে মাথা ঝাঁকালো তোমোহিকো।

রিও অবশ্য ওটা দেখে পেট ফাটানো হাসি দিয়েছিলো। 'এই সব বিষয়ে অতটা নিরাপত্তা দেওয়া হয় না। ব্যাংকের লোকগুলো শুধু বলে যে আপনার কাগজপত্র কারো সাথে শেয়ার করবেন না। ব্যস। কিন্তু এরকম কোনো এটিএম কার্ড নিয়ে এসো, দেখবে তোমার কাছেও ওটা খোলার জন্য চাবি চলে এসেছে।'

'আর ব্যাংক এ ব্যাপারে জানবে না?'

'আমি নিশ্চিত ব্যাংকের কিছু লোক জানে কী বিপদ হয়ে গেছে। কিন্তু এই মুহূর্তে কিছু করারও নেই, তাই নিজেদের মধ্যেই রেখে দিয়েছে ব্যাপারটা। পরবর্তী কোনো অঘটনের জন্য অপেক্ষা করছে ওরা।' বলেই হোহো করে হেসে উঠেছিলো সে।

যদিও খারাপ কাজে ব্যবহার করার মতো কৌশল রিও পেয়ে গেছিলো, তবুও তড়িঘড়ি কিছু করার মতো অবস্থায় দেখা গেল না রিওকে। একটা কারণ হতে পারে সফটওয়্যার বিজনেসটা ভালোই চলছিলো, যার কারণে ব্যস্ত ছিলো সে। আর অন্যটা হলো অন্য কারো এটিএম কার্ডে হাত ছোঁয়ানোটাও কষ্টসাধ্য কাজ। সেই

প্রথম রাতে একটা নকল কার্ড বানানোর পরে আর এ বিষয়ে তেমন কথা বলতে দেখা যায়নি তাকে।

তবে একদিন দারুণ এক আইডিয়া নিয়ে হাজির হয়েছিলো সে। 'জানো তো,' বলা শুরু করেছিলো রিও, 'ওটা নিয়ে ভাবার সময় একটা জিনিস বুঝতে পারলাম: এটিএম কার্ড চুরি করার কোনো দরকারই নেই আসলে।' ছোট ডেস্কের সামনে বসে তখন চা খাচ্ছিলো সে।

'কী বলতে চাচ্ছো?' জিজ্ঞেস করলো তোমোহিকো।

'শুধু একটা একাউন্ট নাম্বার জানলেই হয়ে যাবে। পিনও লাগবে না এমনকি। অবাক হচ্ছি এই বিষয়টা আগে কেন মাথায় এলো না ভেবে।'

'কোন বিষয়টা?'

'অনেকটা এরকম।' চেয়ারের সাথে হেলান দিয়ে পা টেবিলের উপর রাখলো রিও। এরপর ডেস্কের উপরে থাকা একটা বিজনেস কার্ড হাতে নিয়ে বললো, 'ধরো এটা একটা এটিএম কার্ড। মেশিনের ভেতর ঢোকালে মেশিন সব তথ্য দেখাবে, তাই না? এখন আমরা তো জানি যে একটা স্ট্রিপে একাউন্ট নাম্বার এবং পিন, দুটোই থাকে। অবশ্যই এটিএম মেশিন তো আর জানবে না যে নকল মালিক না আসল মালিক কার্ডটা ঢোকাচ্ছে। আর এজন্যই মূলত পিন দেওয়া হয়েছে। আর স্ট্রিপে থাকা ঐ নাম্বারের উপর নির্ভর করে সে টাকাটা বের করে দেয়। তো এখন আমরা যা করতে পারি তা হলো, খালি একটা কার্ডে আমরা যাবতীয় দরকারি তথ্যাদি দেবো, মানে এক্ষেত্রে কেবল একাউন্ট নাম্বার, তারপর নিজেদের মনমতো একটা পিন বসিয়ে দেবো।'

চোখ কপালে উঠে গেল তোমোহিকোর।

'কার্ডটা আসল কার্ডের থেকে দেখতে ভিন্ন হবে,' বলে চলেছে রিও। 'আর মেশিনও ধরতে পারবে না যে যেই পিনটা ওখানে দেওয়া হচ্ছে সেটা আসল মালিকের দেওয়া একই পিন না। কিন্তু তবুও মেশিনটা কাজ করবে কারণ মেশিন তখন কার্ডের নাম্বারের সাথে ম্যাগনেটিক স্ট্রিপে থাকা প্যাটার্ন মিলিয়ে দেখবে।'

'তার মানে, যদি কারো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নাম্বার আমাদের হাতে আসে তো–'

'আমরা তার কার্ড বানিয়ে টাকা তুলতে পারবো,' রিও শেষ করলো বাক্যটা। মুখের কোণে বাঁকা হাসি ফুটে উঠলো তার।

গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো তোমোহিকোর। *আসলেই আমরা এটা করতে পারি!*

এরপর দ্রুত কাজে লেগে পড়লো ওরা।

প্রথমে তারা কার্ডে থাকা কোডগুলো সম্পর্কে ধারণা নিলো। প্রত্যেকটা কার্ড শুরু হয় স্টার্টিং কোড দিয়ে, এরপর আইডি কোড, পরেরটায় স্বীকারোক্তি কোড, এরপর পিন এবং শেষমেশ ব্যাংক আইডেন্টিফিকেশন কোড। সবগুলোই এক লাইনে লেখা হয়।

এরপরে তারা বিভিন্ন ব্যাংকের বিভিন্ন শাখার ময়লার ঝুড়িতে খোঁজ লাগানো শুরু করে। রিসিপ্টগুলো থেকে একাউন্ট নাম্বার নেয়। এরপর ওরা যে প্যাটার্নগুলো নিয়ে পড়াশোনা করেছে, সেগুলোর সাহায্যে ব্যাংক একাউন্ট নাম্বার আর নিজেদের ইচ্ছামতো পিনকোড মিলিয়ে সত্তরটা ছয় ডিজিটওয়ালা বর্ণ আর সংখ্যার সিরিজ হিসেবে এনকোড করে।

সব শেষে এনকোডারের সাহায্যে এই সিরিজটাকে ম্যাগনেটিক স্ট্রিপে এনকোড করে বসিয়ে দেয় প্লাস্টিকের কার্ডে। যেই সাদা কার্ডটা দিয়ে তোমোহিকো টাকা তুলেছিলো, সেটা ছিলো তাদের প্রথম কাজ। ওরা একটা রিসিপ্ট থেকে নাম্বার নিয়ে চেক করে দেখেছিলো যে ওদের কাছে পাওয়া ব্যাংক নাম্বারগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি টাকা ওটাতেই আছে। যার কারণে ওটা থেকে টাকা তুললে অনেক দিন পর্যন্ত মালিক টের পাবে না বিধায় ওটা থেকেই তুলেছিলো তারা।

যদিও ওরা যা করছিলো তা স্পষ্টতই অপরাধ, কিন্তু তবুও তোমোহিকোর ভেতরে কোনো অনুশোচনা কাজ করছিলো না। এর একটা কারণ হলো এই কার্ড বানানোর পুরো প্রক্রিয়াটা ওর কাছে স্রেফ গেমের মতো মনে হচ্ছে। এটা যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তা মনেই হয়নি তার। আরেকটা কারণ হলো, যাদের কার্ড থেকে তারা টাকা চুরি করছিলো, তাদেরকে সামনাসামনি তো দূর, কখনো দেখেওনি ওরা।

তবে এছাড়াও আরেকটা জিনিস রয়েছে এর পেছনে যা রিও তাকে বুঝিয়েছিলো। ও বলেছিলো, 'ধরো এক লোক একটা আপেল খাবে না বলে ছুঁড়ে ফেলে দিলো। এখন আমি গিয়ে সেই আপেলটা তুলে নিয়ে খেলাম। এতে তো কোনো সমস্যা নেই, না? এবার ধরো আরেকজন লোক একটা আপেল রেখে দিলো পরে খাবে বলে। তারপর আপেলটা আমার চোখে পড়ার পর আমি তুলে নিলাম। এখন এখানে প্রথম লোকের সাথে দ্বিতীয় লোকের কি কোনো পার্থক্য আছে আমার কাছে? নেই। যদি সে তার আপেল দেখে না রাখে, তবে সেটা ওভাবে রেখে দেওয়া আর ফেলে দেওয়ার মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। যে ঝিমিয়ে গেল সে হেরে গেল, সিম্পল।'

কথাগুলো তোমোহিকোর অবচেতন মনে ঢুকে গেল, সেখান থেকে ধীরে ধীরে জায়গা করে নিলো সচেতন মনে। একটা সময় কথাগুলোকে ও নিজের বলেই ভাবতে শুরু করলো। যতবারই ঐ কথাগুলো ভাবে, ততবারই ভয় আর উত্তেজনার ঢেউ বয়ে যায় ওর উপর দিয়ে।

ক্লাস শেষে সোজা অফিসের দিকে রওয়ানা দিলো তোমোহিকো। ওরা ওটাকে অফিস বলেই ডাকে, যদিও পুরোনো বিল্ডিংয়ের একটা অ্যাপার্টমেন্ট ছাড়া ওটা আর কিছুই না।

জায়গাটা নিয়ে অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে তোমোহিকোর মনে। প্রথম যখন এখানে এসেছিলো সে, তখন কল্পনাও করতে পারেনি এতটা জড়িয়ে যাবে এই জায়গার সাথে।

৩০৪ নাম্বার রুমের সামনে চলে এলো সে। পকেট থেকে চাবি বের করে খুললো দরজাটা। দরজার সামনেই বসার ঘরের টেবিলে বসে ছিলো রিও। এভাবে বসেই কাজ করে সে।

'তাড়াতাড়ি এসেছ আজ,' চেয়ারটা একটু ঘুরিয়ে বললো রিও।

'সোজা এখানে চলে এসেছি আমি,' জুতো খুলতে খুলতে বললো তোমোহিকো। 'স্টেশনের পাশে নুডলসের দোকানটা ভরা দেখলাম।'

টেবিলের উপরে NEC PC8001 মডেলের একটা কম্পিউটার রাখা আছে। সবুজ স্ক্রিনে 'হ্যালো ওয়ার্ল্ড' শব্দটা ভেসে আছে।

'এটাই ওয়ার্ড প্রসেসর?' রিওর পেছন থেকে জিজ্ঞেস করলো তোমোহিকো।

'হ্যাঁ, নতুন চিপ আর সফটওয়্যার এনেছি।'

কিবোর্ডের উপরে ভাসাভাসা টাইপ করতে লাগলো রিও। যদিও ইংরেজি বর্ণমালা ব্যবহার করছে সে, কিন্তু স্ক্রিনে জাপানিজ বর্ণমালা ভেসে উঠছে। ফ্রন্ট-এন্ড প্রসেসর নামের এই প্রসেসর প্রথমে ইংরেজিকে হিরাগানা বর্ণমালায় রূপান্তর করে। পরে স্পেস বাটনে চাপ দিতেই হিরাগানা থেকে কানজিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। কানজিও আরেকটা জাপানিজ বর্ণমালা। যখনই কোন পদ্ধতির বর্ণ লিখতে হবে এই প্রশ্নটা আসছে, তখনই স্ক্রিনে বিভিন্ন অপশন দিয়ে দেওয়া হচ্ছে তার জন্য। আর এই পুরো প্রক্রিয়াতে একটা শব্দ গঠনের জন্য সময় নেয় দশ সেকেন্ডের মতো।

বিদ্রুপের হাসি দিলো তোমোহিকো। 'এর থেকে হাতে লিখলেও কম সময় লাগবে।'

'এই সিস্টেমটা ফ্লপি ডিস্কে আছে। প্রত্যেকটা ডাটাবেজ পড়ার পরেই কেবল এটা কাজ করে, তাই বলতে পারো সময় খাবে অনেক। পুরো ওয়ার্ড প্রসেসরটা যদি মেমোরিতে লোড করা যায়, তবে কিছুটা তাড়াতাড়ি করতে পারবে। তবে এই কম্পিউটারে তা সম্ভব হবে না। কিন্তু তারপরও এই রিড/রাইটের গতি দেখে আমি অবাক হয়েছি।'

'ক্যাসেটকে তাহলে আর অত মিস করছি না,' বললো তোমোহিকো।

'কথা সত্য,' বিড়বিড় করে বললো রিও। 'তবে সমস্যা হচ্ছে সফটওয়্যার খুঁজে পাওয়াটা।'

ডেস্কের উপর থেকে একটা পাঁচ ইঞ্চির ফ্লপি ডিস্ক হাতে তুলে নিলো তোমোহিকো। ও জানে রিও কী ভাবছে এখন। তারা যখন গেম বিক্রি করছিলো, তখন বাজারে বেশ সাড়া পেয়েছিলো। একটার পর একটা গেম বিক্রি হচ্ছিলো

তখন। দেখে রিও বলেছিলো, 'এটা একদিন অনেক বড় কিছু হবে।' আর রিও ঠিকই ধরেছিলো সেদিন।

অনেক দিন পর্যন্ত বিক্রি চলে। অনেক টাকাও কামায় তারা। কিন্তু তারপরও হঠাৎ কোণঠাসা হয়ে পড়ে তাদের কোম্পানি। প্রতিযোগী বেড়ে যায় তাদের। আর সবচেয়ে বড় শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছিলো কপিরাইট আইন।

এখন পর্যন্ত কিছু জনপ্রিয় গেম যেমন *স্পেস ইনভেডার্স* তারা চুরি করে বিক্রি করে আসছে। কিন্তু দেয়ালে দেয়ালে ঝুলে থাকা পোস্টারগুলো বুঝিয়ে দিচ্ছিলো যে এই কাজ বেশি দিন করতে পারবে না। এরমধ্যে আন্দোলনও হয়েছে যে সফটওয়্যার চুরির জন্য শাস্তি নির্ধারণ করতে হবে। বৈধ নোটিশ দেওয়াও শুরু করেছিলো অনেক কোম্পানি। এমনকি তাদের নিজেদের কোম্পানিও মেইলের মাধ্যমে সতর্কবার্তা পেয়েছে।

'যদি এগুলোর কোনো একটা কোম্পানি আদালত পর্যন্ত যায় তো গেম বা সফটওয়্যার কপি করা নিষিদ্ধ হয়ে যাবে এরপর,' অনুমান করেছিলো রিও। ইতোমধ্যে আমেরিকা ১৯৮০ সালে কপিরাইট আইন পাশ করিয়ে নিয়েছে। প্রোগ্রাম এখন 'বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তার বহিঃপ্রকাশ আর শিল্প' হিসেবে নির্ণীত হয়েছে, যার কারণে সেগুলোকে নকল করা একটা অপরাধ।

আর এই পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তাদের একমাত্র যে পথ খোলা ছিলো তা হলো নিজেদের প্রোগ্রাম তৈরি করা। সমস্যাটা হলো, দুজনেরই এই ব্যাপারে আবশ্যকীয় জ্ঞানের অভাব ছিলো।

'আচ্ছা, এই নাও।' চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটিয়ে তোমোহিকোর দিকে একটা খাম এগিয়ে দিলো রিও।

খামটার ভেতরে তাকালো তোমোহিকো। খামের ভেতরে আটটা দশ হাজার ইয়েনের বিল রয়েছে।

'তোমার শেয়ার,' বললো রিও।

খামটা ছুঁড়ে ফেলে বিলগুলো পকেটে পুরে নিলো তোমোহিকো। 'কোন খেলাটা খেলবো এরপরে?'

'মানে?'

'জানো তো তুমি...'

'এটিএম কার্ডের কথা বলছো?'

'হ্যাঁ।'

বুকে হাত বাঁধলো রিও। 'ওটা নিয়ে খেলতে গেলে আমাদের আরো তাড়াতাড়ি খেলতে হবে। মানে এত সময় নষ্ট করা যাবে না। পরে দেখা যাবে হামলা আটকানোর আরো অনেক উপায় বের করে ফেলেছে তারা।'

'জিরো-পিন সিস্টেমটার কথা বলছো?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু তাতে তো খরচ অনেক বেড়ে যাবে তাদের।'

ওর দিকে তাকালো রিও। 'তুমি কি ভাবছো একমাত্র আমরাই এটিএমের দুর্বল দিক সম্পর্কে জানি? খুব তাড়াতাড়িই দেখবে আমরা যা করেছি তা পুরো দেশ করা শুরু করে দিয়েছে। তখন খুব ছোট কোনো ব্যাংকও এরকম কিছু একটা করতে নেমে যাবে। তাতে যতই খরচ বাড়ুক না কেন।'

'তা ঠিক।' দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো তোমোহিকো।

জিরো-পিন সিস্টেমটা হলো ব্যাংক লেনদেনের আরেকটা কৌশল। আর এই কৌশলটা অধিক কার্যকর। কার্ডের ভেতর ম্যাগনেটিক স্ট্রিপে কাস্টমারের কোনো রকম ব্যক্তিগত আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার থাকবে না। তার পরিবর্তে দূরবর্তী কোথাও কাস্টমারের পিন কোড সংরক্ষণ করে রাখা হবে। আর যতবারই কাস্টমার এটিএম কার্ড ব্যবহার করবে, ততবারই মেশিনটাকে ব্যাংকের মূল কম্পিউটারে যোগাযোগ করে লেনদেনটা যাচাই করে নিতে হবে। যদিও আগের নিয়মের থেকে এটা অনেক ধীর এবং খরুচে পদক্ষেপ, তবুও ব্যাংকগুলো এই পদ্ধতিটা ব্যবহার করা শুরু করলে ওদের ক্যাশ কার্ড জাল করার পদ্ধতি মার খেয়ে যাবে।

'আমরা সেদিন যা করেছিলাম তা অত্যন্ত বিপজ্জনক কাজ ছিলো। আমরা যদি প্রত্যেকটা সিসি ক্যামেরাকে বোকাও বানাই, তবুও কোথাও না কোথাও আটকে যেতে পারি আমরা,' বললো রিও।

'হুঁ।' মাথা দোলালো তোমোহিকো। 'তার উপর যাদের থেকে টাকা চুরি করেছি, তারা যদি ব্যালেন্স চেক করে, তবে পুলিশের কাছেও যেতে পারে–'

'তবে,' ওকে থামিয়ে দিয়ে বললো রিও, 'আমরা চাচ্ছি কার্ডগুলো এমনভাবে ব্যবহার করতে যাতে তারা জানতেও না পারে যে আমরা নকল কার্ড ব্যবহার করছি।'

এটা পরিষ্কার যে পরবর্তীতে কী করতে হবে তা নিয়ে ভেবে রেখেছে রিও। কিন্তু সেটা বলার আগেই দরজায় ঘণ্টা বাজার আওয়াজ পেল তারা। দুজনেই চোখাচোখি করে নিলো একবার।

'নামি বোধহয়?' জিজ্ঞেস করলো তোমোহিকো।

'ওর তো আজকে আসার কথা ছিলো না। আর তাছাড়া ওর তো এখনো ব্যাংকে থাকার কথা,' ঘড়ি দেখে বললো রিও। 'যাক গে, গিয়ে দেখো কে এসেছে।'

দরজার কাছে এসে পিপহোল দিয়ে তাকালো তোমোহিকো। ধূসর রঙের ওভারঅল পরা একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে বাইরে। বয়স আনুমানিক ত্রিশের মতো হবে।

দরজাটা খুলে তোমোহিকো জিজ্ঞেস করলো, 'বলুন?'

'আহ...হাই,' বলে উঠলো লোকটা। চেহারায় কেমন যেন শূন্যতা কাজ করছে তার। 'বিল্ডিংয়ের কাজ...মানে ভেন্টিলেশন ফ্যান ঠিক করার জন্য এসেছি আমি।'

'এখনই করতে হবে আপনাকে?'

কোনো জবাব না দিয়ে মাথা নাড়লো লোকটা। তোমোহিকো একটু তাকিয়ে থেকে দরজাটা লাগিয়ে দিলো। এরপর চেইনটা নামিয়ে খুলে দিলো দরজাটা।

সাথে সাথে দরজার ওপাশে লোকের সংখ্যা তিনগুণ হয়ে গেল। বেশ বড়সড়ো গড়নের এবং আকাশি রঙের জ্যাকেট পরা একজন লোক আর কিছুটা অল্পবয়সি এক লোক সবুজ পোশাক পরে দাঁড়িয়ে আছে বাইরে। ওভারঅল-পরা লোকটা বাকি দুজনের পিছে চলে গেল। বিপদের ঘ্রাণ পেয়ে তোমোহিকো দরজাটা লাগিয়ে দিতে গেলে বড় গঠনের লোকটা পালটা ধাক্কা দিলো দরজায় যাতে সেটা বন্ধ না হয়ে যায়।

'ভেতরে আসছি আমরা,' বলে উঠলো বিশালাকৃতির লোকটা।

'কোন মাদারচোত রে–' লোকটা দরজায় ধাক্কা দিয়ে ভেতরে ঢুকতেই বলে উঠলো তোমোহিকো।

লোকটার প্রশস্ত কাঁধ দেখে অবাক না হওয়ার উপায় নেই। পোশাক থেকে মিহি গন্ধও বের হচ্ছে একটা। পেছনে পেছনে আসা সবুজ পোশাকধারীও ভেতরে ঢুকলো। ডান চোখের ভ্রুতে একটা দাগ দেখা গেল তার। সম্ভবত কেটে যাওয়ার পরে সেলাই করতে হয়েছিলো তাকে।

রিও টেবিলে বসে থেকেই তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনারা কারা?'

সুঠাম দেহের অধিকারী লোকটা কোনো জবাব দিলো না। জুতো নিয়েই ভেতরে ঢুকলো সে। রুমের চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে শেষে যেখানটাতে তোমোহিকো কিছুক্ষণ আগে বসে ছিলো সেখানে তাকালো লোকটা।

'নামি কোথায়?' রিওকে উদ্দেশ করে জিজ্ঞেস করলো লোকটা। চোখ স্থির হয়ে আছে। কালো চুলগুলো মাথার পেছনে কায়দা করে রাখা হয়েছে।

'বলতে পারছি না,' বললো রিও। 'যে জিজ্ঞেস করছে সে কে?'

'নামি কোথায়?'

'কোনো কিছুর জন্য দরকার নাকি আপনার তাকে?'

পেছনে থাকা সবুজ পোশাকধারী লোকটার দিকে তাকালো সুঠাম দেহের লোকটা। সেও জুতো না খুলে ভেতরে ঢুকলো এবং পেছনের রুমের দিকে চলে গেল। এবার সুঠাম দেহের লোকটার চোখ চলে গেল টেবিলে থাকা কম্পিউটারের উপর। 'এটা কী?'

'জাপানিজ ওয়ার্ড প্রসেসর,' বললো রিও।

অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে নিলো লোকটা। বোঝা গেল কোনো রকম আগ্রহ তার নেই ওতে। রুমের আশেপাশে আবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললো, 'এসব করে অনেক টাকা-পয়সা কামাও তুমি?'

'যদি ঠিকভাবে করা যায়, তবে হ্যাঁ,' বললো রিও।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাসলো লোকটা। 'তার মানে দেখে মনে হচ্ছে তুমি ঠিকঠাকভাবে করছো না।'

রিও আর তোমোহিকো নিজেদের মধ্যে একবার দৃষ্টিবিনিময় করলো। ওদিকে পেছনের রুমে থাকা কার্ডবোর্ড হাতিয়ে দেখতে লাগলো সবুজ পোশাক পরা লোকটা। পেছনের রুমটাতে কেউ না যাওয়ার কারণে ওটাকে স্টোররুম হিসেবে ব্যবহার করে আসছিলো রিও আর তোমোহিকো।

'যদি নামিকে খুঁজতে এসে থাকেন আপনারা, তবে শনি অথবা রবিবার আসবেন এখানে। সপ্তাহে অন্য কোনো দিনে এখানে আসে না সে।'

'জানি আমরা,' পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরাতে ধরাতে বললো লোকটা। দুই ঠোঁটের মাঝে একটা শলাকা রেখে ডানহিল লাইটার দিয়ে তাতে আগুন জ্বালালো সে।

'এরমধ্যে তার কোনো খবর আছে তোমার কাছে?' ধোঁয়া বের করে জিজ্ঞেস করলো সে।

'আজকে পাইনি। আপনি চাইলে আমি কল করতে পারি তাকে, করবো?'

'দরকার নেই।'

লোকটা টেবিলের উপরেই ছাই ফেলতে নিচ্ছিলো, এমন সময় রিও তার নিজের হাত বের করে দেয় যাতে ছাইটা ধরতে পারে।

একটা ভ্রু তুলে লোকটা বলে উঠলো, 'কিছু প্রমাণ করার চেষ্টা করছো নাকি তুমি?'

মাথা নাড়লো রিও। 'আসলে এখানে প্রচুর ইলেকট্রনিক্স ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। সেগুলোর মধ্যে ছাই ঢুকে যাক তা চাচ্ছি না আর কি।'

'তো একটা অ্যাশট্রে নিয়ে আসো।'

'নেই আমাদের কাছে।'

বিদঘুটে একটা হাসি ফুটে উঠলো লোকটার মুখে। 'আচ্ছা?' আরেকবার রিওর হাতে ছাই ফেলতে ফেলতে বললো লোকটা। রিও চমকালো না। 'আমি বলছি তোমার কাছে আছে।' বলেই সিগারেটের ডগায় থাকা আগুনটা রিওর হাতে ডলে দিলো সে।

তোমোহিকো দেখলো রিওর শরীরে থাকা প্রত্যেকটা পেশি নড়ে উঠলো, কিন্তু তবুও চেহারায় কোনো ছাপ নেই। একদম শূন্য হয়ে আছে। হাতটা যেরকম

টেবিলে ছিলো সেরকমই আছে, একটুকুও নড়েনি। চোখদুটো সোজা লোকটার দিকে তাকিয়ে আছে।

'বেশ শক্ত ছেলে তুমি, তাই না?' জিজ্ঞেস করে বসলো লোকটা।

'সেরকম না।'

'সুজুকি,' জোর গলায় ডেকে উঠলো লোকটা। 'পেলে কিছু ওখানে?'

'কিছুই না,' বলে উঠলো সবুজ পোশাকধারী।

লোকটা তার পেছনের পকেটে সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার ভরে একটা বলপয়েন্ট কলম নিয়ে সফটওয়্যারের প্যাকেটটার উপর কিছু একটা লিখলো। এরপর টেবিলের উপর রাখলো সেটা।

'যদি নামির ব্যাপারে কোনো খোঁজ পাও, তবে এই নাম্বারে ফোন করে প্রথমে *ইলেকট্রিশিয়ান*-কে চাইবে। এরপর খবর জানাবে।'

'আপনার নাম?'

'আমার নাম জেনে তোমার কোনো কাজ নেই।' দাঁড়িয়ে গেল লোকটা।

'যদি ফোন না করি, তবে?' জিজ্ঞেস করলো রিও।

একটু হেসে উঠে নাক দিয়ে শ্বাস ছাড়লো লোকটা। 'ওরকম বোকার মতো কোনো কাজ কেন করবে তুমি?'

'নামি হয়তো চায় না আমরা তা করি।'

'শোনো,' লোকটা রিওর বুকের দিকে তাকিয়ে বললো, 'আমাদের ফোন করাতে তোমার কোনো সমস্যা হবে না। কিন্তু যদি না করো, তবে এই সব–' আশেপাশের সব কিছুর দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলো–'হারাতে হবে তোমাকে। অথবা এর থেকেও বেশি কিছু যা নিয়ে পরে আফসোস করতে হবে। আর কোনো প্রশ্ন আছে?'

কিছুক্ষণ লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে রিও মাথা ঝাঁকালো। 'নাহ।'

'ভালো। দেখে ভালো লাগলো যে বোকা নও তুমি,' বলে উঠলো লোকটা। একবার সবুজ পোশাকধারী লোকটার দিকে তাকালো সে। চোখের ইশারা পেয়ে পেছনের রুম থেকে বেরিয়ে বাইরে চলে গেল সুজুকি।

পকেট থেকে দশ হাজার ইয়েনের একটা বিল বের করে তোমোহিকোর হাতে দিলো লোকটা। 'ছেলেটা যেন ঠিকঠাক কাজটা করে তা দেখে রাখবে।'

লোকটার হাত থেকে টাকাটা নিলো তোমোহিকো, হাত কাঁপছে। হেসে উঠলো লোকটা, বিদঘুটে সেই হাসি।

ওরা চলে যাওয়ার পরে তোমোহিকো দরজা লাগিয়ে দিয়ে রিওকে জিজ্ঞেস করলো, 'ঠিক আছো তুমি?'

কোনো রকম জবাব না দিয়ে পেছনের রুমে গিয়ে জানালায় থাকা পর্দাটা সরিয়ে দিলো রিও। তার পেছন পেছন গিয়ে নিজেও বাইরে তাকালো

তোমোহিকো। একটা কালো মার্সিডিজ দাঁড়িয়ে আছে তাদের অ্যাপার্টমেন্টের সামনে। একটু অপেক্ষা করতেই লোকগুলো বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে, তারপর গিয়ে বসলো গাড়িটায়। সুঠাম দেহের লোকটা আর সুজুকি নামের লোকটা গিয়ে বসলো গাড়ির পেছনে। আর সেই ওভারঅল-পরা লোকটা গিয়ে বসলো ড্রাইভিং সিটে।

মার্সিডিজটা চোখের সামনে থেকে চলে যেতেই রিও বলে উঠলো, 'নামিকে ফোন করো একবার।'

বসার ঘরের দিকে গিয়ে ওখানে থাকা ফোনটা হাতে তুলে নিলো তোমোহিকো। তার অ্যাপার্টমেন্টের নাম্বারে ফোন দিলো সে। অনেকক্ষণ বাজলেও কেউ ধরলো না। রিসিভার নামিয়ে রেখে মাথা ঝাঁকালো সে।

'মনে হচ্ছে যদি ঘরেই থাকতো সে, তবে ঐ লোকগুলো এখানে আসতো না,' বললো রিও।

'এর মানে সে ব্যাংকেও নেই তবে?' অবাক হওয়ার ভঙ্গিতে বলে উঠলো তোমোহিকো।

'হয়তো ছুটি নিয়েছে আজ,' রেফ্রিজারেটরের দরজাটা খুলে আইস ট্রে বের করতে করতে বললো রিও। বেসিনে একবার ভিজিয়ে নিয়ে একটা কিউব বের করলো সে।

'হাত ঠিক আছে তোমার?'

'ঠিক হয়ে যাবে।'

'কারা ছিলো এরা? গ্যাংয়ের কেউ নাকি?'

'ওটাই মনে হচ্ছে আপাতত।'

'গ্যাংদের সাথে নামির কী কাজ থাকতে পারে?'

'কে জানে?' আরেকটা কিউব তুলে নিয়ে বললো রিও। আগেরটা গলে গেছে। 'তোমার এখন বাড়ি চলে যাওয়া উচিত, তোমোহিকো। যদি কিছু বের করতে পারো তো ফোন করে জানিও আমাকে।'

'তুমি কী করবে?'

'আমি আজকে রাতে এখানে থাকবো। নামি হয়তো ফোন করতে পারে।'

'আমি তাহলে থেকে–'

'বাড়ি যাও,' থামিয়ে দিয়ে বললো রিও। 'ওরা হয়তো কাউকে এখানে রেখে গেছে পাহারা দেওয়ার জন্য। যদি আমরা দুজনেই এখানে থাকি, তবে সন্দেহ করতে পারে আমরা কী করি সে বিষয়ে।'

ঠিক বলেছে সে।

'আচ্ছা, ব্যাংকে কোনো সমস্যা হয়েছে নাকি?'

কাঁধ ঝাঁকালো রিও। নিজের হাতে একটু খোঁচা দিতেই কুঁচকে গেল তার মুখ।

***

রাতের খাবারের সময় পেরোনোর পরপর বাড়িতে পৌঁছালো তোমোহিকো। টিভির ঘরে বসে তার বাবা বেসবল খেলা দেখছে আর বোন তার নিজের রুমে রয়েছে।

তোমোহিকোর বাবা-মা তার এমন জীবনযাপনের জন্য তেমন কিছু বলে না। বরং তারা কিছুটা খুশি যে তাদের ছেলে স্বনামধন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়ছে এবং সমবয়সি অনেক ছেলেমেয়ের মতো বখে না গিয়ে নিয়মিত ক্লাস করছে এবং ভালো ফলাফল আনছে দেখে। রিওর সাথে থাকার বিষয়টা নিয়ে সে ঘরে বলেছে যে একটা কম্পিউটার শপে পার্ট টাইম চাকরি নিয়েছে সে।

তার মা তার জন্য কিছু মাছ, শাকসবজি, মাংস আর স্যুপ রেখে দিয়েছে। নিজের ভাত নিজে বেড়ে নিলো তোমোহিকো। রিও এখন এই সময়ে সেখানে কী করছে সে বিষয়ে ভাবলো একবার।

যদিও প্রায় তিন বছরেরও বেশি সময় হতে চলেছে তাদের পরিচয়ের, তবুও রিওর পরিবার সম্পর্কে খুব কমই জানে তোমোহিকো। ও শুধু এতটুকুই জানে যে তার বাবা একটা পনশপ চালাতো। রিও যখন খুব ছোট ছিলো, তখনই তার বাবা মারা যায়। কোনো ভাইবোন নেই তার। মা অবশ্য বেঁচে আছে, তবে রিও তার সাথে থাকে কি না তা পরিষ্কার না। কোনো কাছের বন্ধুও নেই তার। তোমোহিকোর জানামতে আর কি।

একই কথা নামির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ব্যবসার হিসাবনিকাশের জন্য তাকে রাখলেও তার ব্যক্তিগত জীবন যে কেমন, সে সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই তাদের। এতটুকু জানে যে মহিলা একটা ব্যাংকে চাকরি করে, কিন্তু সেটা যে কোন পদে তাও জানে না। আর এখন গ্যাংস্টাররা তাকে খোঁজা শুরু করে দিয়েছে। ভেবে পেল না কেনই বা খুঁজছে তাকে লোকগুলো।

তোমোহিকো তার খাবার শেষ করে ঘরে যেতে নেবে, এমন সময় টিভিতে চলা সংবাদটা শুনতে পেল সে। বেসবল খেলা শেষ। সেখানে এখন সংবাদ চলছে।

'একজন মধ্যবয়স্ক লোককে সকাল আটটা নাগাদ ছুরিকাঘাতের ফলে আহত অবস্থায় খুঁজে পাওয়া গেছে বলে জানা যায়,' নিউজ রিপোর্টার বলে চলেছে। 'একজন পথচারী লোকটাকে দেখতে পেয়ে পুলিশকে ফোন করে। লোকটার নাম মিকিও মাকাবে। হাসপাতালে নেওয়ার কিছু বাদেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন সেই ভদ্রলোক। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছে যে একজন লোককে হাতে ছুরি নিয়ে হত্যাকাণ্ড ঘটার আগে ঘুরঘুর করতে দেখা গেছে। পুলিশ ধরে নিয়েছে সেই লোকই এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। জানা গেছে, মি. মাকাবে তাইকো ব্যাংকের শোওয়া শাখার একজন কর্মকর্তা। আজ সকালে সেখানেই যাচ্ছিলেন তিনি। যেখানে তার আহত

দেহটি খুঁজে পাওয়া যায়, তার থেকে তাইকো ব্যাংকের দূরত্ব সর্বোচ্চ একশো মিটারের মতো। এরপরে–'

সবকিছু বেশ স্বাভাবিকভাবেই নিচ্ছিলো তোমোহিকো। কারণ এরকম হত্যাকাণ্ড বেশ কদিন ধরেই ঘটছে। কিন্তু যখন ব্যাংকের নামটা শুনলো, ভয়ে হাত-পা ঠান্ডা হয়ে এলো তার। ঐ ব্যাংকেই নামি কাজ করে। তোমোহিকো হলওয়েতে দৌড়ে গিয়ে ফোনটা হাতে তুলে নিলো। বাটনের উপর জোরে চাপতে লাগলো সে, তার হৃৎপিণ্ড বেরিয়ে আসছে যেন খাঁচা থেকে।

ফোন ধরলো না রিও। কেটে দেওয়ার আগে অন্তত দশবার রিং হতে দিলো তোমোহিকো।

একটু থেমে ভাবলো সে। এরপরে টিভির রুমে চলে গেল পুরো সংবাদটা শুনতে। হয়তো কে খুন করেছে তার কোনো বর্ণনা পাওয়া যেতে পারে। বাবার পাশে গিয়ে বসে পড়লো সে। তার বাবা অন্য সময় হলে তার ভবিষ্যৎ নিয়ে হালকা-পাতলা কথা তুলতো, কিন্তু ছেলেকে নিউজের প্রতি আগ্রহ নিয়ে আসতে দেখে আর কিছু বললো না। সংবাদ শেষ হওয়ার কিছু আগে ফোন বেজে উঠলো ওঘর থেকে। 'আমি ধরছি।' বলেই হলওয়েতে চলে গেল সে।

'সোনোমুরা রেসিডেন্স থেকে বলছি।'

'আমি বলছি।'

'ফোনে ধরার চেষ্টা করেছিলাম তোমাকে,' গলার স্বর নামিয়ে নিয়ে বললো তোমোহিকো।

'খবরটা দেখেছ তুমিও?'

'হ্যাঁ। এসবের মানে কী?'

'ফোনে বলতে হলে অনেক সময় লাগবে। বের হতে পারবে এখন?'

'কী?' বসার ঘরের দিকে একবার তাকালো তোমোহিকো। 'এখন, এই রাতে?'

'হ্যাঁ, এখনই।'

'পারা যাবে।'

'বেশ। আমাদের নামির ব্যাপারে কিছু আলোচনা করা দরকার।'

'ওর থেকে কোনো খবর পেয়েছ?' রিসিভারটা শক্ত করে ধরে বললো তোমোহিকো।

'আমার পাশেই বসে আছে সে।'

'কীহ?'

'পরে বিস্তারিত বলবো। চটজলদি চলে এসো এখন। আর অফিসে না কিন্তু...' রিও হোটেলের নাম এবং রুম নাম্বার দিয়ে দিলো তোমোহিকোকে।

হোটেলের নাম শুনে ঢোক গিললো তোমোহিকো। এটা সেই হোটেল যেটাতে ইউকো হানাওকা আর সে যাওয়া-আসা করতো। মিডল স্কুলে থাকাকালীন তার সেই প্রেমিকা।

'আসছি আমি।' বলে আরেকবার রুম নাম্বার আর হোটেলের নাম মনে করার চেষ্টা করলো নিজে নিজে। এরপর রেখে দিলো ফোন।

ট্রেন ধরার জন্য তখনো সময় ছিলো তার হাতে। রাস্তাগুলো বেশ পরিচিত। তার জীবনে ইউকোই ছিলো প্রথম নারী। এর আগে কোনো মেয়েকে চুমুও খায়নি সে। তবে গত বছর এক ক্লাস পার্টির কথা বাদে।

হোটেলের ভেতর ঢুকে সোজা ২০১৫ নাম্বার রুমে চলে গেল সে। দরজায় নক দিতেই ভেতর থেকে রিওর আওয়াজ ভেসে এলো।

'কে?'

'দ্য কিয়োতো এলিয়েন,' জবাব দিলো তোমোহিকো। ওটা আসলে তাদের কম বিক্রি হওয়া একটা গেমের নাম।

দরজা খুলে দিলো রিও। ক্লান্ত দেখাচ্ছে তাকে। তোমোহিকোকে দুই রুম বিশিষ্ট ঘরটাতে ঢুকতে ইশারা করলো সে। জানালার পাশে একটা টেবিল এবং দুটো চেয়ার রয়েছে। সেগুলোর একটাতে বসে আছে নামি।

'হাই,' বললো নামি। হাসছে সে, কিন্তু তাকেও বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

'শুভ সন্ধ্যা,' বলে বিছানার পাশে বসলো তোমোহিকো। 'তারপর...' রিওর দিকে তাকিয়ে বললো সে। 'কী চলছে তা বলো?'

রিওর দুহাত তার ট্রাউজারের পকেটে। টেবিলের পাশের দেয়ালে হেলান দিয়ে আছে সে।

'তুমি যাওয়ার ঘণ্টাখানেক পরে ফোন দিয়েছিলো নামি। বলেছে যে সে আর আমাদের সাথে কাজ করতে পারবে না। তাই যত কাগজ আর খতিয়ানের হিসাব আছে তা ফিরিয়ে দিতে চাচ্ছে। পালাতে হবে তাকে।'

নামির দিকে তাকালো তোমোহিকো। 'এটা কি তোমার ব্যাংকের সেই লোকটার খুন হওয়ার জন্য করছো?'

'সেরকমই কিছু,' বললো রিও। 'আবার ভেবো না নামি খুন করেছে তাকে। ও করেনি।'

'না, না, ওটাও ভাবিনি আমি,' দ্রুত বললো তোমোহিকো। যদিও কয়েক মুহূর্তের জন্য সম্ভাবনাটা ওর মাথাতেও খেলে গেছিলো।

'আসলে যেই লোকটা আমাদের অফিসে এসেছিলো সে করেছে এসব,' বললো রিও।

ঢোক গিললো তোমোহিকো। 'কেন?'

মাথা নিচু করেই বসে রইলো নামি। একবার সেদিকে তাকিয়ে আবার তোমোহিকোর দিকে ফিরলো রিও। 'ঐ যে বিশালাকৃতির লোকটার কথা মনে আছে, আকাশি রঙের জ্যাকেট পরেছিলো যে? তার নাম ইনোমোতো। নামি তাকে...সাহায্য করতো।'

'মানে টাকা দিয়ে?'

'হ্যাঁ, টাকা দিয়েই। তবে সেটা তার নিজের টাকা না। ব্যাংকের অনলাইন সিস্টেম থেকে কারচুপি করে ঐ লোকের অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠাতো সে।'

'কত টাকা?'

'সে জানে না সব মিলিয়ে কত টাকা পাঠিয়েছে। যা পাঠিয়েছে সেগুলোর মধ্যে কয়েকটা লেনদেন ছিলো দুই মিলিয়নের কাছাকাছি। আর এগুলো বছরখানেক ধরে চলছিলো।'

'এগুলো করতে পারো তুমি?' নামিকে জিজ্ঞেস করলো তোমোহিকো।

মাথা না তুলে যেভাবে বসে ছিলো সেভাবেই রইলো নামি।

'হ্যাঁ, করতে পারে,' তার হয়ে বললো রিও। 'কিন্তু এতটাও সহজ না যে ধরা পড়বে না। একজন টের পেয়ে যায় এর কিছুটা। আর সে-ই হলো এই মাকাবে।'

'খবরের সেই লোকটা?'

মাথা নাড়লো রিও। 'অবশ্য, যখন নামিকে এই ব্যাপারে বলছিলো, তখন জানতো না যে নামিরই এই কাজের পেছনে হাত রয়েছে। তো নামি সে বিষয়টা গিয়ে ইনোমোতোকে জানায়। আর ইনোমোতো তো চাইবে না তার সোনার হাঁস মারা পড়ুক। তাই সে এর একটা বিহিত করে বসে।'

বুকের খাঁচা থেকে হৃৎপিণ্ড বেরিয়ে আসতে চাইছে তোমোহিকোর।

'ভালো খবর হলো,' বলতে লাগলো রিও, 'যে নামি যে এর পেছনে রয়েছে তার কোনো প্রমাণ এখনো বেরিয়ে পড়েনি। আর খারাপ খবর হলো, মাকাবে নামক লোকটা মারা গেছে, আর এর জন্য নামিই দায়ী।'

কাঁধদুটো কেঁপে উঠলো নামির। কাঁদছে সে।

'একটু ভালো করে বলা যায় না?' বললো তোমোহিকো।

'ওটার গায়ে রং মেখে এখন আর কোনো লাভ নেই।'

'তবুও–'

'ঠিক আছে, সমস্যা নেই,' বলে উঠলো নামি। উপরের দিকে তাকালো সে। স্থির হয়ে আছে তার চোখ। 'এমনিতেও এটাই সত্যি। রিও ঠিকই বলছে।'

'আর এর জন্যই নামি ইনোমোতোর সাথে সব রকম দেখাশোনা বন্ধ করে দিতে চাচ্ছে,' বলতে লাগলো রিও। তার চোখ এখন দুটো বড় লাগেজের উপর। সেদিকে ইশারা করেই বলছে সে। 'ওরা তাকে খুঁজতে নেমে গেছে। যদি নামি উধাও হয়ে যায়, তবে তাদের মাকাবেকে খুন করাটা অর্থহীন হয়ে পড়বে। আর

তার উপর ইনোমোতোর আরো টাকা দরকার। তাকে আজকে দুপুর নাগাদ টাকা পাঠানোর কথা ছিলো।'

'অনেকগুলো ব্যবসা আছে তার, কিন্তু একটাও তেমন ভালো চলছে না ইদানীং,' বিড়বিড় করে বললো নামি।

'তো প্রথমে কেন সাহায্য করেছিলে তুমি তাকে?' জিজ্ঞেস করলো তোমোহিকো।

'এখন এসবে কিছু যায় আসে না,' ভ্রু কুঁচকে বললো রিও।

মাথা চুলকে বললো তোমোহিকো, 'আচ্ছা, এখন কী করবো তবে আমরা?'

'আমরা ওকে এখান থেকে বাইরে কোথাও পালিয়ে যেতে সাহায্য করবো,' বললো রিও। 'সমস্যা হচ্ছে, তাকে কোথায় রাখবো তা এখনো ঠিক করিনি। যদি সে এখানে থাকে তো পুলিশ বা ইনোমোতো যে-কেউ তাকে ধরে এখানে চলে আসবে। তাই আমি আজ বা কালকের মধ্যে এমন একটা জায়গা খুঁজে বের করবো যেখানে সে বেশ কিছু দিনের জন্য গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারে।'

'তোমার মনে হচ্ছে তুমি পারবে তা?'

'না পারলেও পারতে হবে এখন,' ফ্রিজ থেকে একটা বিয়ার বের করতে করতে বললো সে।

'দুঃখিত আমি,' বললো নামি। 'দুজনের কাছেই ক্ষমা চাইছি। যদি পুলিশ আমাকে ধরেও ফেলে, তবুও আমি তোমাদের কথা বলবো না। বলবো না যে তোমরা আমাকে সাহায্য করেছ।'

'টাকা আছে তোমার সাথে?' জিজ্ঞেস করলো তোমোহিকো।

'যা আছে তাতে হয়ে যাবে,' একটু দ্বিধা নিয়ে বললো সে।

'এখানেই নামি চালাকিটা করেছে,' হাতের বিয়ার সমেত উত্তর দিলো রিও। 'ও জানতো এরকম একটা দিন সামনে আসতে চলেছে, তাই পাঁচটা আলাদা একাউন্ট খুলে সেখানে টাকা জমিয়ে রেখেছে। দারুণ কাজ।'

'এটা এমন কোনো কাজ না যে গর্ব করবো,' কপালে হাত রেখে বললো নামি।

'টাকা না থাকার চেয়ে থাকা অবশ্যই ভালো,' বললো তোমোহিকো।

'সত্য কথা,' বিয়ারটা একটু তুলে ধরে সায় দিলো রিও।

'তো আমি কী করবো তবে?' দুজনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো তোমোহিকো।

রিও তার দিকে স্থির চোখে তাকালো। 'আমি চাই তুমি এই রুমে তার সাথে দুই দিন থাকো।'

'কী?'

'আমরা ওকে বাইরে নিয়ে যেতে পারবো না। তার জন্য কিছু না কিছু কিনতে হবে। আর এক্ষেত্রে তোমার উপরই কেবল ভরসা করতে পারি আমি।'

'তবে তো...' কপালে ঝুলে থাকা চুলগুলো পেছনে নিয়ে একবার নামির দিকে তাকালো সে। নামিও পালটা দৃষ্টি দিলো। তার চাহনি বুঝিয়ে দিলো যে তার এই রুমে থাকাটা কতটা জরুরি। 'আচ্ছা, ঠিক আছে। থাকবো আমি।'

***

শনিবারের খাবারে জন্য তোমোহিকো দোকান থেকে কিছু বেন্টো[১৩] কিনে নিয়ে আবার হোটেলে ফিরে এলো। ওটার ভেতরে ভাত, মাছ, সবজি আর মুরগির মাংস রয়েছে। হোটেল থেকে আনা কয়েকটা গ্রিন টির ব্যাগ এনে তা দিয়ে চা বানিয়ে ছোট একটা টেবিলে খেতে বসেছে তারা।

'দুঃখিত, আমার জন্যই এসব খেতে হচ্ছে তোমার,' বললো নামি। 'চাইলে তুমি রেস্টুরেন্টে বা অন্য কোথাও গিয়ে খেয়ে আসতে পারো।'

'নাহ,' বললো তোমোহিকো। 'একা খাওয়ার থেকে এখানে বসে খেতেই ভালো লাগছে। আর এই বেন্টোর খাবার ততটাও খারাপ না।'

'অতটাও ভালো না আবার, কী বলো?' বলে উঠলো নামি। হাসছে সে।

খাওয়া শেষে তোমোহিকো উঠে গিয়ে ফ্রিজ থেকে একটা পুডিং নিয়ে এলো, যেটা খানিকক্ষণ আগেই কিনেছিলো সে। তোমোহিকোর দিকে তাকিয়ে মেয়েলি একটা হাসি দিলো নামি।

'অনেক ভেবেচিন্তে কাজ করো তুমি। ভালো একজন স্বামী হবে তুমি ভবিষ্যতে।'

'তোমার তাই মনে হয়?' মুখভরতি পুডিং নিয়ে হেসে উঠলো তোমোহিকো।

'তোমার কোনো গার্লফ্রেন্ড নেই, না?'

'উঁহু, নেই। গত বছরের দিকে একটা ছিলো, কিন্তু ব্রেকআপ করে ফেলেছি আমরা। বলা যায় ও-ই ব্রেকআপ করেছে।'

'আসলেই? কেন করেছিলো এমন?'

'বলেছিলো, যেসব ছেলেরা দুষ্টুমি করতে জানে, তার নাকি সেরকম ছেলে পছন্দ। মনে হয় আমাকে একটু বেশিই চুপচাপ স্বভাবের ধরে নিয়েছে সে।'

'আসলে মেয়েটা জানতোই না সে কী নিয়ে কথা বলছে,' মাথা দুলিয়ে বললো নামি। এরপর হঠাৎ হেসে উঠলো। 'তবে এমনটাও না যে আমি অনেক বেশি অভিজ্ঞ হয়ে গেছি যে আরেকজনকে প্রেম সম্পর্কে জ্ঞান দেবো।' চামচ দিয়ে অল্প একটু পুডিং মুখে ভরলো সে ।

কিছু মুহূর্ত কেটে যাওয়ার পরে নামি বলে উঠলো, 'তুমি নিশ্চয়ই ইনোমোতোর ব্যাপারে অনেক কিছু ভাবছো, না? কেন আমি তার সাথে জড়িয়েছি, তাই তো?'

'আরে, এসব দিয়ে আমার কোনো কাজ নেই–'

'না, না, ঠিক আছে। এমনিতেও কাহিনিটা বেশ হাস্যকর,' বললো নামি। অর্ধেক খাওয়া পুডিংয়ের বাটিটা নামিয়ে রাখলো টেবিলের উপর। 'সিগারেট আছে?'

'মাইল্ড সেভেন ব্র্যান্ডের। মাইল্ড সেভেন লাইট, ফিল্টার আছে যেটায়।'

'চলবে।'

একটা সিগারেট নিলো সে তার থেকে। আগুন ধরিয়ে লম্বা একটা টান দিলো। সাদা ধোঁয়া এঁকেবেঁকে মিশে গেল বাতাসে।

'দেড় বছর আগের ঘটনা। একটা ছোটখাটো গাড়ির দুর্ঘটনায় ফেঁসে যাই আমি,' জানালার দিকে তাকিয়ে বলতে শুরু করলো সে। 'একটা দাগ বসে যায় আর কি। আসলে আমার কারণেও হয়নি পুরোটা। ভ্যান বাদে অন্য যেকোনো গাড়িতেও লাগালেও ভালো হতো।'

'গ্যাং?' ভ্রু তুলে জিজ্ঞেস করলো তোমোহিকো।

মাথা দোলালো নামি। 'ওরা ভ্যান থেকে নেমে আমার গাড়িকে ঘিরে দাঁড়িয়ে পড়ে। একদম রাস্তার মাঝখানে। এক সেকেন্ডের জন্য বুঝতে পারছিলাম না কী হচ্ছে আমার সাথে। আর তখনই ইনোমোতোকে দেখতে পাই আমি। আরেকটা গাড়িতে ছিলো সে। কিন্তু দেখে মনে হচ্ছিলো, যারা আমাকে ঘিরে ধরেছে ওদেরকে চেনে সে। সে-ই সব মিটমাট করে দেয় যাতে আমি ওদের ভ্যানের দাগটা মেরামত করার খরচটা দিয়ে বেঁচে যেতে পারি।'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও। সেই মেরামত করার খরচের পরিমাণ ছিলো এক মিলিয়ন ইয়েন?'

মাথা ঝাঁকালো নামি। 'না, এক লাখের মতো ছিলো। ইনোমোতো অবশ্য আমার কাছে ক্ষমাও চেয়েছিলো আরো কমে মিটমাট করতে পারেনি দেখে। হয়তো তোমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হবে, কিন্তু সে সময়ে ইনোমোতোকে দেখে ভদ্রই মনে হয়েছিলো।'

'ঠিকই বলছো, আমারও বিশ্বাস হচ্ছে না।'

'আরে না, সত্যিই এরকম করেছিলো সে। ভালো কাপড় পরে সব সময় বলতো যে সে তাদের সাথে থাকে না।'

'তার মানে তোমরা দুজন প্রেম করতে তখন?' জিজ্ঞেস করলো তোমোহিকো।

তৎক্ষণাৎ জবাব দিলো না নামি। জবাব দেওয়ার পরিবর্তে সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়লো সে।

'আমি জানি কথাটা অজুহাতের মতো শোনাচ্ছে, তবুও বলছি, সে সময় ও আমার সাথে ভালোই আচরণ করতো। আমার মনে হয়েছিলো সে আমাকে আসলেই ভালোবাসে। জানো, জীবনে প্রথমবারের মতো ওরকম অনুভূতি পেয়েছিলাম আমি।'

'আর তাই তুমি তার জন্য কিছু একটা করতে চেয়েছ, বুঝতে পেরেছি।'

'আরো বেশি কিছু ছিলো। আমি ভেবেছিলাম হয়তো আমি কিছু না করলে সে আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে আমার উপর থেকে। তাই যেকোনো উপায়ে সাহায্য করতাম তাকে।'

'মানে তার জন্য চুরিও করতে?'

'জানি, বোকামি ছিলো ওটা। ও বলেছিলো যে নতুন একটা ব্যবসার জন্য তার দরকার ছিলো টাকাটা। আর আমি তো কোনো সন্দেহই করিনি তার কথায়, যার কারণে যা বলতো তাই করতাম।'

'কিন্তু পরবর্তীতে জানতে পেরেছ যে সে গ্যাংয়ের লোক?'

'অনেকটাই। কিন্তু যখন বুঝে গেছিলাম, তখন আর কোনো ব্যাপারই ছিলো না ওটা আমার জন্য।'

'মানে?'

'মানে ও আমার সাথে থাকলেই আমি খুশি ছিলাম। কী করছে না করছে এসব নিয়ে মাথা ঘামাতাম না।'

তোমোহিকো টেবিলের দিকে তাকালো একবার। সিগারেটের ফিল্টারটা ফেলে দিলো নামি।

'যার কারণে আমি বাজে লোকদের সাথে থাকতে লাগলাম। ধরেই নিয়েছিলাম ওটাই আমার ভাগ্য।'

'এরকমটা আগেও হয়েছিলো নাকি?'

'ওরকমই কিছু একটা। আরেকটা সিগারেট দেবে?'

প্যাকেট এগিয়ে দিলো তোমোহিকো। সেখান থেকে আরেকটা সিগারেট নিয়ে আগুন ধরালো সে।

'একটা মদের দোকানের লোকের সাথে দেখা করতাম আমি। সে বলেছিলো যে সে মদের দোকানে কাজ করে, কিন্তু আমি খুব কমই তাকে কাজে যেতে দেখতাম। জুয়া খেলতে পছন্দ করতো সে। যার কারণে আমার থেকে টাকা নিয়ে দুহাতে উড়াতো। যখন আমার সঞ্চয় ফুরিয়ে এলো, সে আমাকে ছেড়ে চলে গেল। ভেবেছিলো তার আর কোনো কাজে আসবো না আমি।'

'এটা কবে হয়েছিলো?'

'তিন বছর আগে মনে হয়।'

'তিন বছর...'

'হ্যাঁ, তোমার সাথে আমার প্রথম দেখা হওয়ার কিছু আগে। তোমাদের সাথে রুমে যাওয়ার ওটাও একটা কারণ ছিলো।'

রুমে গিয়ে তরুণ ছেলেদের সাথে সেক্স করতে চাওয়ার কারণ।

'রিওকেও এই ঘটনা বলেছিলাম একদিন। মনে হয় না সে মনোযোগ দিয়েছিলো তাতে। আমার ছেলেসংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে বিরক্ত সে।'

'তাই নাকি ?'

'আমি যদি রিও হতাম, তবে আমিও তাই হতাম। আর তাছাড়া, সে অমন মানুষ পছন্দ করে না যারা একই ভুল দুবার করে।'

'এটা আসলে ঠিক বলেছ,' স্বীকার করলো তোমোহিকো। 'আচ্ছা, একটা প্রশ্ন করি। কিছু মনে করবে না তো?'

'কী?'

'ব্যাংকের ঐ লেনদেনগুলো করা কি সহজ কাজ ছিলো?'

'একটু কঠিন প্রশ্ন এটা,' পায়ের উপর পা তুলে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললো নামি। মনে মনে উত্তর সাজিয়ে নিচ্ছিলো সে। কথা বলতে নিতেই হাতে থাকা সিগারেটটা পুড়ে আঙুলে এসে লাগলো তার। 'বলতে পারো সহজই ছিলো। আর সহজ হওয়ার কারণেই এতটা ঝুঁকিপূর্ণ ছিলো।'

'মানে?'

'আসলে তোমাকে যা করতে হবে তা হলো, একটা নকল লেনদেনের স্লিপ বানাতে হবে,' কপালটা হালকা চুলকে নিয়ে বললো সে। দুই আঙুলের ফাঁকে সিগারেটটা দুলছে। 'কত টাকা উঠাতে চাও এবং কোন অ্যাকাউন্ট থেকে–তা লিখে নিয়ে আরো দুজন কর্মীর স্বাক্ষর নিতে পারলেই হয়ে যাবে। সেই দুজন মানুষের একজন হলো শাখা প্রধান, যে কিনা বেশিক্ষণ তার টেবিলে থাকে না। যার কারণে তার টেবিল থেকে স্ট্যাম্প নেওয়াটা কঠিন কিছু না। আর বাকি লোকটার স্ট্যাম্প চাইলেই নকল করা যায়।'

'কেউই কি নেই ওখানে যে এগুলো পর্যবেক্ষণ করে?'

'প্রতিদিনের একটা খতিয়ান রয়েছে, যেটাতে দিন শেষে কত টাকা জমা আছে তার হিসাব লেখা থাকে। প্রধান হিসাবরক্ষকের দায়িত্ব সেগুলো খতিয়ে দেখা। কিন্তু তোমার কাছে নকল স্ট্যাম্প থাকার অর্থ হলো, তুমি নকল কাগজপত্র তৈরি করতে পারবে, যেগুলো দেখে মনে হবে চেক করা হয়েছে। আর এতে করে অনেক দিন পর্যন্ত ওদের নজর এড়িয়ে থাকা যাবে।'

'অনেক দিন বলতে কী বোঝাচ্ছো?'

'অর্থাৎ, আমি যে টাকাগুলো নিচ্ছিলাম সেগুলো দিয়ে কিছু না কিছু করতে হতো। বিশেষ এক পুল থেকে আসতো এগুলো, যেগুলো অল্প সময়ের জন্য রাখা হতো ওখানে।'

'আর সেগুলো কী?'

'ধরো, কেউ একজন তাদের ব্যাংক থেকে একজন গ্রাহকের জন্য অন্য একটা ব্যাংকে টাকা পাঠালো। এখন ঘটনা হলো, দ্বিতীয় ব্যাংক টাকাটা তখনই কাস্টমারকে দিয়ে দেয়। কিন্তু যে ব্যাংক টাকাটা পাঠিয়েছিলো, তাদের সাথে পরে হিসাবনিকাশ করে। যেখান থেকে টাকাটা তারা অগ্রীম দিয়ে থাকে সেটাকে অস্থায়ী

তহবিল বলে। যা প্রত্যেকটা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে আলাদা করে রাখা হয়। আর ওটাতেই আমার চোখ ছিলো।'

'বেশ কৌশলের কাজ মনে হচ্ছে।'

'কিছুটা তো কৌশল দরকারই। অস্থায়ী তহবিলের টাকা ব্যবহার করার জন্য অবশ্যই বিশেষ জ্ঞান থাকতে হবে। তাই একমাত্র তারাই ঐ বিষয়ে ভালো জানবে যারা ঐ সেক্টরে অনেক দিন ধরে কাজ করছে। আর আমার শাখার ব্যাংকে আমিই সেরাদের মাঝে একজন ছিলাম। তাত্ত্বিকভাবে বলতে গেলে, অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্টের দায়িত্ব ছিলো আমার কাজ শেষ হওয়ার পরে দুই-তিনবার হিসাব মেলানোর। কিন্তু দেখা যেত পুরোটাই আমি করতাম।'

'তার মানে আসলে ওদের চেক করার কথা থাকলেও করতো না?'

'একদম। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ধরো যদি তুমি আমাদের ব্যাংকে এক মিলিয়ন ইয়েন ট্রান্সফার করো, তবে তোমাকে সেই পরিমাণ টাকার হিসাব রাখতে হবে। এরপর একটা বিশেষ খতিয়ানে তোমার নাম লেখা হবে যেখানে শাখা প্রধানের আন্ডারে সব লেনদেন হবে। প্রতিদিনের যত লেনদেন তুমি করবে তা প্রিন্ট আউট হবে কম্পিউটার থেকে এবং শাখা প্রধান সেসব চেক করবে। যদিও ওরা খুব কমই সেসব চেক করে। আর এর জন্যই তুমি যদি অবৈধ লেনদেনের স্লিপটা লুকিয়ে ফেলতে পারো এবং নিশ্চিত করতে পারো যে শাখা প্রধান স্বাভাবিক দিনের মতোই সেগুলো দেখছে, তবে কেউ আর টের পাবে না এ বিষয়ে।'

'আচ্ছা, অনেক জটিল মনে হচ্ছে এখন। কিন্তু একটা জিনিস বুঝতে পারছি। আর তা হলো, তোমার বস আসলে একটা আমড়া কাঠের ঢেঁকি।'

'হ্যাঁ, তবে খুব বেশি দিন এসব দুনম্বরি কাজ টানা যায় না,' দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো নামি। 'মাকাবের মতো কারো পক্ষে ধরে ফেলাটা সময়ের ব্যাপার ছিলো মাত্র।'

'সেটা তো জানতেই তুমি। তারপরও চালিয়ে গেলে কাজ, হাঁহ।'

'হ্যাঁ, মনে হচ্ছিলো নেশায় ডুবে গেছি আমি,' অ্যাশট্রেতে ছাই ফেলতে ফেলতে বললো সে। 'কিবোর্ডের বাটনে কেবল একটা চাপ দিতে হবে, আর সাথে সাথে অঙ্কের পরিমাণগুলো উড়াউড়ি শুরু করবে। তোমার কাছে মনে হবে কোনো জাদু জানো তুমি। কিন্তু ওসবই আসলে একটা ভ্রম।'

***

তোমোহিকো গতকালই বলে দিয়েছিলো তার বাসায় যে দুয়েক রাত তাকে কাজের জন্য বাইরে থাকতে হবে। আর এখানে রুমে থাকা দুটো বিছানার একটাতে সে ঘুমায়।

গোসল শেষে হোটেলের টাওয়ালটা গায়ে জড়িয়ে সে বেরিয়ে এলো বাথরুম থেকে। তারপরেই নামি ঢুকলো বাথরুমে। ঘরে কোনো আলো নেই। যতটুকু আছে তা বিছানার তলা থেকে আসছে।

নামির বাথরুম থেকে বেরিয়ে অন্য বিছানাটায় যাওয়ার শব্দ শুনতে পেল সে। যদিও তার পেছন দিকে ছিলো নামি, তবুও কেন যেন মনে হচ্ছিলো হাত বাড়ালেই তাকে ছোঁয়া যাবে। শ্যাম্পুর মিহি গন্ধ তার চারপাশ ভরে রেখেছে। অন্ধকারের মধ্যেই শুয়ে রইলো তোমোহিকো। মাথায় শত শত চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে তার। নামিকে এখান থেকে বাইরে নিতে পারলেই হাফ ছেড়ে বাঁচতে পারবে তারা। তারই উপায় ভাবছে সে। এদিকে রিও সারা দিনে একবারও ফোন করেনি তাদের কাছে।

'তোমোহিকো?' পেছন থেকে নামির গলা শুনলো সে। 'ঘুমিয়ে পড়েছ?'

'না,' চোখ বন্ধ রেখেই জবাব দিলো তোমোহিকো।

'আমিও না।'

অবাক করার মতো কোনো ঘটনা না এটা। যেকোনো সময় অন্য কোথাও পাড়ি জমাতে হবে তাকে। তাই ঘুম না আসারই কথা।

'ঐ মেয়েটার বিষয়ে কখনো মনে পড়ে তোমার?'

'কার?'

'ইউকো।'

'ওহ।' নামটা শোনামাত্রই মেরুদণ্ড দিয়ে ঠান্ডা স্রোত নেমে গেল তোমোহিকোর। কণ্ঠ থেকে আবেগ দূরে সরিয়ে রেখে জবাব দিলো, 'মাঝেমধ্যে।'

'আমিও তাই ভেবেছিলাম,' বললো নামি। 'তুমি কি ওকে...ভালোবাসতে?'

'জানি না। অনেক ছোট ছিলাম তখন।'

নামিকে হাসতে শুনলো সে। 'এখনো ছোটই আছো তুমি।'

'হয়তো।'

'আর আমি...আমি তো দৌড়ে পালিয়ে গেছিলাম।'

'ঐ অ্যাপার্টমেন্টে? হ্যাঁ, তা তো পালিয়েছিলেই।'

'তোমরা দুইজন হয়তো ভেবেছিলে যে আমি বুঝি উপেক্ষা করেছি। এত দূর সেই অ্যাপার্টমেন্ট পর্যন্ত গিয়েও লেজ গুটিয়ে পালিয়েছি।'

'সেরকমটাও ভাবিনি।'

'মাঝেমধ্যে সেদিন চলে যাওয়ার কারণে অনুশোচনা হয় আমার।'

'আসলেই?'

'হ্যাঁ, আসলেই। আমার মনে হয় সেদিন যদি থেকে যেতাম, যা কিছু হচ্ছিলো তা করতে দিতাম, তবে আমার জীবন হয়তো পালটে দিতো ওটা। জানি হাস্যকর

লাগছে, তবুও বলছি, আমার কাছে মনে হতো আমি বুঝি নতুন করে জন্মেছি আবার।'

নিঃশব্দে শুয়ে রইলো তোমোহিকো। মহিলার গলার স্বরে কিছু একটা আছে যা পুরোপুরি ধরতে পারছে না সে। কিন্তু কিছু একটা আঁচ করতে পারছে।

রুমের ভেতরের বাতাস ভারী হয়ে আসছে। মহিলা আবার বললো, 'ভাবছি...খুব বেশি দেরি হয়ে গেল কি না।'

'নামি...' ধীরে ধীরে বললো তোমোহিকো। *চেষ্টা করেই দেখি না একবার।* 'আমি যা ভাবছি তুমিও কি তাই ভাবছো?'

মহিলা চুপ করে রইলো। *আরে কাজ হয়ে গেছে দেখছি*, ভাবলো তোমোহিকো।

'তুমি কি আমাকে অনেক বুড়ি ভাবো?' অনেকক্ষণ চুপ থেকে বললো নামি।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লো তোমোহিকো। 'এই তিন বছরে তোমার কোনো পরিবর্তন হয়নি দেখছি।'

'তার মানে তিন বছর আগেই আমি বুড়ি হয়ে গেছিলাম?'

হাসলো তোমোহিকো। 'আমি ওটা বোঝাইনি।'

বিছানা থেকে নামির নামার শব্দ শুনলো সে। কয়েক মুহূর্ত বাদেই তার কম্বলের ভেতর টের পেল নামির দেহ।

'আবার জন্ম নিতে পারলে সবচেয়ে ভালো হতো,' ফিসফিস করে তোমোহিকোর কানে কানে বললো নামি। 'কিন্তু আমি এতেই খুশি।'

***

সোমবার দিন সকালবেলা দেখা গেল রিওকে। কোথাও বাসা খুঁজে না পেয়ে নামির কাছে মাফ চেয়েছে সে। যার কারণে অন্য একটা হোটেলে তাকে নিতে হবে এখন। যে হোটেল ঠিক করেছে সেটা উত্তর দিকে কয়েক ঘণ্টার রাস্তা, নাগোয়াতে।

'আর কিছু দিন থাকতে হবে ওকে, অস্থায়ীভাবে।'

'গত রাতে তো এমনটা বলোনি তুমি,' পালটা বললো তোমোহিকো। কাল রাতে রিও ফোন করে বলেছিলো যে একটা বাসা খুঁজে পেয়েছে সে। ওখানে সকালে নামিকে দিয়ে আসবে।

'একটু সমস্যা হয়েছে ওতে। সরি। কিন্তু এবার আর বেশি দেরি করতে হবে না, কথা দিচ্ছি।'

'আমার সমস্যা নেই,' বললো নামি। 'নাগোয়াতে আরো আগে থেকেছি আমি। তাই রাস্তাঘাট চেনা আছে আমার।'

'এজন্যই ওদিকটা বেছে নিয়েছি,' বললো রিও।

একটা সাদা সেডান গাড়ি হোটেলের আন্ডারগ্রাউন্ড লটে দাঁড়িয়ে আছে। রিও বলেছে যে ভাড়ায় এনেছে ওটা সে। যদি তার ভ্যানে করে এদিক-সেদিক যাওয়া-

আসা করে, তবে ইনোমোতোর লোকগুলো ধরে ফেলতে পারবে। তাই ভ্যান বাদ দিয়েছে।

'এই নাও বুলেট ট্রেনের টিকেট। আর এখানে হোটেলের ম্যাপ দেওয়া আছে, ধরো,' গাড়িতে উঠার পরে একটা খাম নামির দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো সে।

'এত কিছু করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাকে,' বললো নামি।

'আরেকটা বিষয়...তোমার সাথে এটা রাখা উচিত,' একটা পেপার ব্যাগ বের করলো রিও।

ব্যাগের ভেতর তাকিয়ে হেসে উঠলো নামি।

গলাটা একটু বাড়িয়ে তোমোহিকোও দেখার চেষ্টা করলো ভেতরে কী আছে। ব্যাগের ভেতর কোঁকড়া পরচুলা, বড় চশমা আর কিছু ফেইসমাস্ক–যেগুলো মানুষ শীতের সময়ে পরে।

'তোমার টাকার প্রয়োজন হলে নির্ঘাত তুমি তোমার অ্যাকাউন্টের এটিএম ব্যবহার করবে,' ইগনিশনে চাপ দিয়ে বলতে লাগলো রিও। 'তো যখন করবে, তখন নিশ্চয়ই আসল রূপে যাবে না? তাই ওগুলো দিলাম। আর সিসি ক্যামেরা যেন তোমার মুখ না দেখে ফেলে সেদিকে সতর্ক থেকো।'

'সবদিকেই নজর আছে দেখছি তোমার।' পেপার ব্যাগটা গুটিয়ে একটা স্যুটকেসের মধ্যে ভরলো নামি।

'যখন পৌঁছাবে, তখন একটা ফোন দিও,' বললো তোমোহিকো।

'দেবো।' বলেই ওর দিকে তাকিয়ে একটু হাসলো সে।

গাড়িটা এরপরই পার্ক করা জায়গা থেকে রাস্তায় নেমে গেল।

নামিকে ট্রেনে উঠিয়ে দিয়ে অফিসে ফিরে এলো তোমোহিকো আর রিও।

'ও যেন ঠিকঠাক থাকে,' বলে উঠলো তোমোহিকো।

মাথা ঝাঁকালো রিও। 'ইনোমোতোর গল্পটা শুনেছ তুমি?'

শুনেছে বলে জানালো তোমোহিকো।

'বোকা মেয়ে, তাই না?'

'আমার তো মনে হয় না।'

'সেই গোড়া থেকেই ওকে পেয়ে বসেছিলো ইনোমোতো। ব্যাংকে তার অবস্থানটার সুবিধা নিতে চেয়েছিলো। এই পুরো বিষয়টা, এমনকি এক্সিডেন্টের বিষয়টাও শুনেছ না? এগুলো সবই ইনোমোতোর পরিকল্পনা অনুযায়ী হয়েছে। বুঝতে পারছো? আস্ত একটা বেয়াক্কেল মেয়ে। অমনই ছিলো সে সব সময়। বারবার এমন মানুষের প্রেমে পড়ছে যাদের সমস্যা আছে।'

ঢোক গিললো তোমোহিকো। কিছুই বলার নেই তার। মনে হচ্ছিলো সীসার কোনো বল ঢুকে গেছে তার পেটে। ও নিজেও ধরতে পারেনি যে এই পুরো বিষয়টাই পরিকল্পিত হতে পারে।

সেদিন একটু আগে আগেই বাড়ি চলে গেল তোমোহিকো। নামির ফোনের অপেক্ষা করছে, কিন্তু কোনো ফোন এলো না।

এর চার দিন বাদে খবরের কাগজে নামি নিশিগুচির মৃতদেহ খুঁজে পাওয়ার সংবাদ পেল সে। নাগোয়ার একটা হোটেলে তার মৃতদেহ খুঁজে পেয়েছে বলে জানানো হয়। বুকে এবং পেটে ছুরিকাঘাতের মাধ্যমে খুন করা হয়েছে তাকে।

কাজ থেকে দুই দিনের ছুটি নিয়েছিলো নামি। তিন দিনের দিন যখন সে অফিসে এলো না, সেদিনই তাকে খুঁজতে শুরু করে দেয় লোকজন। ওর দখলে পাঁচটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুঁজে পায় তারা। সোমবার পর্যন্তও সেখানে বিশ মিলিয়ন ইয়েন ছিলো। কিন্তু তার মৃতদেহ পাওয়ার দিন সবগুলো অ্যাকাউন্ট খালি হয়ে যায়। ব্যাংক থেকে তদন্ত শুরু হলে অবৈধ লেনদেনের প্রমাণ মেলে। যে অ্যাকাউন্টগুলো সে ব্যবহার করতো, সেগুলো ধরে সেই ব্যাংকের এক ডিরেক্টরের বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাৎ করার প্রমাণ পায় পুলিশ। তাকেই নামির হত্যার পেছনে দায়ী হিসেবে সন্দেহ করে গ্রেপ্তার করে তারা।

যে টাকাগুলো নামি তার মৃত্যুর আগে উঠিয়েছিলো, সেগুলোর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। এক এটিএমে থাকা সিসিটিভি ফুটেজ থেকে দেখা গেছে, যে পরচুলা এবং চশমা পরে ছদ্মবেশে টাকাটা উঠিয়েছিলো নামি, সেই ছদ্মবেশের উপকরণগুলো তার লাগেজেই ছিলো। ওগুলো পরে উদ্ধার করেছে পুলিশ।

পেপারটা মেঝেতে ছুঁড়ে মেরে বাথরুমের দিকে দৌড় লাগালো তোমোহিকো। এরপর পেটের ভেতরে যা ছিলো তা গড়গড় করে ঢেলে দিলো।

অধ্যায় সাত

মাকোতো তাকামিয়া তার হাতে থাকা পেটেন্ট এপ্লিকেশনের দিকে তাকিয়ে আছে। ওটার শিরোনাম: *এডি-কারেন্ট টেস্টিং কয়েলসের স্থাবর সম্পত্তি*। যে টেকনিশিয়ান এটা লিখেছে, তার সাথে মাত্রই ফোনে কথা বলেছে সে।

দাঁড়ানোর জায়গা থেকে ঘাড় সোজা করে সামনে তাকালো মাকোতো। চারজন 'ডাটা এন্ট্রি টেকনিশিয়ান' তার উলটো দিকে ঘুরে চারটা কম্পিউটারের সামনে বসে কাজ করছে। এটাই ওদের পদবি। আর টেকনিশিয়ান চারজনই মেয়ে। এদের মাঝে তিনজন সিভিলিয়ান ড্রেসে আছে–অস্থায়ী কর্মী এরা। আর একজন ফুল টাইম কর্মী হিসেবে তোজাই অটোমোটিভের অফিশিয়াল ইউনিফর্ম পরে আছে।

কোম্পানির কাছে যত পেটেন্ট ইনফরমেশন রয়েছে, কিছু দিন আগেও তা মাইক্রোফিল্মে রাখা হতো। কিন্তু এখন সেগুলো ফ্লপি ডিস্কের ভেতর নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে যাতে কম্পিউটার থেকেই তথ্য দেখা যায়। ইদানীং অনেক কোম্পানিই অস্থায়ী কর্মী নিয়োগ দিচ্ছে এই কাজগুলো করার জন্য। যদিও এই অস্থায়ী কর্মী প্রদানের এজেন্সিগুলো বরাবরই *কর্ম নিরাপত্তা আইন*-এর অবমাননা করে আসছে, এরপরেও গতবারের প্রশাসন তাদেরকে বৈধতা দিয়েছে। সেই সাথে *অস্থায়ী কর্মী নিয়োগ আইন* তৈরি করে সুরক্ষাও দিয়েছে ওদেরকে।

সামনের দিকে একদম বাম পাশে বসা মেয়েটার কাছে গেল মাকোতো। মেয়েটার লম্বা চুলগুলো পেছন দিকে বিনুনি করে বাঁধা। *আমার টাইপিং-এর সময় যাতে বিরক্ত না করে ওগুলো, সেজন্য*, একবার বলেছিলো তাকে মেয়েটা।

শিজুরু মিসাওয়া একবার তার স্ক্রিন, আরেকবার পাশে রাখা পেপার স্ট্যান্ডের দিকে তাকালো। সাথে সাথে তড়িদ্বেগে আঙুল চলতে শুরু করলো কিবোর্ডের উপর। মেয়েটার হাত বেশ দ্রুত চলছে। এতটাই দ্রুত যে মাঝে মাঝে মনে হয় মানুষের পরিবর্তে কোনো রোবট বসে আছে বুঝি তার জায়গায়।

'মিস মিসাওয়া?' বলে উঠলো মাকোতো।

শিজুরুর হাত থেমে গেল, মনে হলো যেন কেউ সুইচে টিপ দিয়ে তার কাজ বন্ধ করে দিয়েছে। মাকোতোর দিকে তাকানোর আগে একটু সময় নিলো শিজুরু। বেশ বড় চশমা পরে আছে সে। স্ক্রিনে অতিরিক্ত তাকিয়ে থাকার কারণে চোখে একধরনের তীক্ষ্ণতা জন্ম নিয়েছে। কিন্তু মাকোতোকে দেখার সাথে সাথে নরম হয়ে গেল তার ভাবভঙ্গি।

'জি?' হালকা হাসির কারণে মৃদু নড়ে উঠলো তার ঠোঁটটা। তার দুধসাদা দেহের সাথে হালকা গোলাপি লিপস্টিকটা দারুণ মানিয়েছে। যদিও তার গোলগাল

চেহারা দেখে মনে হতে পারে যে সে এখনো অল্পবয়সি, কিন্তু আসলে মাকোতোর থেকে মাত্র এক বছরের ছোট সে।

'ভাবছিলাম এডি-কারেন্ট টেস্টিং কয়েলস-এর জন্য আর কী কী আবেদন পেয়েছি আমরা।'

'কী বললেন, এডি-কারেন্ট?'

'হ্যাঁ।' হাতে থাকা কাগজটার শিরোনাম দেখালো মাকোতো।

তাড়াতাড়ি মেমোর দিকে চোখ বোলালো মেয়েটা। 'আচ্ছা, দেখছি আমি। যদি পেয়ে যাই, তবে কি প্রিন্ট করে আপনার ডেস্কে রেখে আসবো?' সতেজ গলায় জিজ্ঞেস করলো সে।

'তাই ভালো হবে। কাজের মাঝখানে ব্যাঘাত ঘটানোর জন্য দুঃখিত।'

'না, না! এসবও তো কাজের মধ্যেই পড়ে,' হাসিমুখে বললো শিজুরু।

মুখের বুলি এটা তার। কে জানে, প্রত্যেকটা অস্থায়ী কর্মীই হয়তো এটা বলে। কিন্তু মাকোতো নিশ্চিত না। কারণ একমাত্র এই মেয়েটার সাথেই সরাসরি কথা বলেছে সে।

নিজের ডেস্কে এসে বসতেই তার এক সহকর্মী এসে জিজ্ঞেস করলো যে সে একটু বিরতি নেবে কি না। 'এখন না,' মাথা ঝাঁকিয়ে জবাব দিলো মাকোতো। এই *বিরতি* মানে হলো ভেন্ডিং মেশিনের পাশে দাঁড়িয়ে চা খাওয়া। ঐ মেশিনটা একটা কাগজের কাপে চা ঢেলে দেয়। আর দশটা জাপানি কোম্পানির মতো মহিলা কর্মচারীদের দিয়ে চা আনা-নেওয়াতে বিশ্বাস করে না তোজাই অটোমোটিভ।

গত তিন বছর ধরে তোজাই অটোমোটিভ কোম্পানির টোকিওতে থাকা মূল শাখায় পেটেন্ট লাইসেন্সিং বিভাগে কাজ করছে মাকোতো। তোজাই অটোমোটিভ গাড়ির স্টার্টার, স্পার্ক প্লাগ এবং অন্যান্য ইলেকট্রিক্যাল জিনিস উৎপাদন করে। আর পেটেন্ট লাইসেন্সিং বিভাগের কাজই হলো নিজেদের পণ্যগুলোর ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস নিয়ে কাজ করা। নিজেদের নিজস্ব রিসার্চগুলোর পেটেন্ট করে রাখে ওরা, সেই সাথে তাদের যন্ত্রপাতি বা কৌশল নিয়ে অন্য কোম্পানির সাথে ঝামেলার ব্যাপারগুলোও দেখে।

কিছুক্ষণ পরেই শিজুরু হাতে কিছু কাগজ নিয়ে মাকোতোর ডেস্কে এলো। 'মনে হচ্ছে এগুলোই খুঁজছিলেন আপনি।'

'অনেক ধন্যবাদ,' শিটগুলোর দিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললো মাকোতো। 'কোনো ব্রেক নিয়েছ এরমধ্যে তুমি?'

'না তো।'

'ভালো, চলো একটু চা খেয়ে আসা যাক। আমার পক্ষ থেকে ট্রিট।' উঠে দরজার দিকে পা বাড়ালো মাকোতো। কাঁধের উপর দিয়ে পেছনে তাকিয়ে নিশ্চিত হয়ে নিলো যে শিজুরুও তার পেছন পেছন আসছে কি না।

ভেন্ডিং মেশিনটা হলওয়েতে রাখা। এক কাপ কফি নিয়ে জানালার পাশে দাঁড়ালো মাকোতো। শিজুরুও একটু পরে সেখানে এলো, দুহাত দিয়ে লেবু চা ধরা অবস্থায়।

'কিবোর্ডের সামনে সারা দিন পড়ে থাকাটা বেশ কষ্টের। কাঁধ ভেঙে আসে না তোমার?' জিজ্ঞেস করলো মাকোতো।

'কাঁধের থেকে বেশি হয় চোখের সমস্যা। সারা দিন স্ক্রিনে তাকিয়ে থাকা লাগে।'

'হুম, বুঝতে পারছি আমি।'

হাসলো শিজুরু। 'আর এখানে চাকরি নেওয়ার পর থেকেই চোখে খানিকটা কম দেখছি মনে হয়। এর আগে চশমা ছাড়াই চলতে পারতাম, সমস্যা হতো না।'

'অকুপেশনাল হ্যাজার্ড আর কি।' ও লক্ষ করেছে শিজুরু তার ডেস্ক থেকে উঠার পর চশমা খুলে ফেলেছে। চশমা না থাকার কারণে চোখগুলো বড় দেখাচ্ছে আগের থেকে।

'বোঝা যাচ্ছে ব্যাপারটা ধীরে ধীরে নিঃশেষ করে দিচ্ছে তোমাকে। মানে এই যে এক কোম্পানি থেকে আরেক কোম্পানিতে যাওয়া-আসার বিষয়টা।'

'আমি তো তাও ডাটা এন্ট্রির কাজ করি। আইটির কাজ যারা করে, তাদের অবস্থা তো আরো বাজে। ডেডলাইনের আগ পর্যন্ত সারা রাত জাগতে হয় তাদের। যেহেতু স্বাভাবিক কর্মীরা দিনের বেলায় কাজ করে, তাই তারা কম্পিউটার ব্যবহার করে। ফলে রাতের বেলা সব রকম কাজ করতে হয় আইটির লোকদের। শুনেছি এক লোক নাকি ১৭০ ঘন্টারও বেশি সময় ওভার টাইম করেছে।'

'বলো কী! এও সম্ভব নাকি?'

'নির্ভর করে কী করছে তার উপর। প্রোগ্রাম প্রিন্ট আউট হতেই তো দুই-তিন ঘণ্টা লেগে যায়। যার কারণে মনিটরের সামনে একটা স্লিপিং ব্যাগ নিয়ে রাখতো সে। অভ্যাসটা এমনভাবে করেছিলো যে প্রিন্টার অফ হয়ে গেলেই ঘুম ভেঙে যেত তার।'

'বাপরে, এ যে পাগলের কাণ্ডকারখানা,' মাথা দুলিয়ে বললো মাকোতো। 'আশা করি যেরকম কাজ করেছে, সেরকম টাকাও পেয়েছে সে।'

শুষ্ক একটা হাসি দিলো শিজুরু। 'ওরা অস্থায়ী কর্মী নিয়োগ দেয় কারণ তাদের সস্তায় পাওয়া যায়। অনেকটা...সস্তা লাইটারের মতো। ব্যবহারের পর ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া যায়।'

'মানছি আমি। তবে এতটা খারাপ অবস্থা তা বুঝিনি আগে। অবাক হচ্ছি এটা ভেবে যে তবুও এত মানুষ এরকম চাকরির পেছনে ছুটছে।'

'পেট চালানোর জন্য তো টাকা প্রয়োজন।'

মেয়েটার দিকে চোখের কোনা দিয়ে তাকালো মাকোতো। চা খেতে খেতে ঠোঁট কামড়ে ধরেছে মেয়েটা। 'আর আমাদের কোম্পানি?' জিজ্ঞেস করলো মাকোতো। 'আমরা নিশ্চয়ই তোমাদের প্রাপ্যটুকু দিচ্ছি?'

'তোজাই অন্যান্য কোম্পানির থেকে অবশ্যই ভালো। পরিচ্ছন্ন কাজের জায়গা, ভালো পরিবেশ,' বললো সে। এরপরই ভ্রুটা কুঁচকে গেল কিছুটা। 'যদিও মনে হয় না বেশি দিন কাজ করতে পারবো আমি এখানে।'

'সত্যি? কেন?' বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠলো মাকোতোর। এরকম কোনো খবর আশাই করেনি সে।

'এখানে আমার জন্য বরাদ্দ করা টাকার পরিমাণ শেষ হবে সামনের সপ্তাহে। ছয় মাসের চুক্তি ছিলো আমার, যদি আমার কাজ শেষ করতে দেরিও হয়, তবুও দুয়েক দিনের বেশি থাকা যাবে না।'

হাতে থাকা খালি কাপটা দুমড়ে-মুচড়ে ফেললো মাকোতো। মনে হচ্ছে কিছু একটা বলা দরকার, কিন্তু সে বুঝতে পারছে না আসলে কী বলবে।

'ভাবছি কীরকম কোম্পানিতে জয়েন করবো এরপরে,' বললো শিজুরু। অস্পষ্ট একটা হাসি তার ঠোঁটের কোণে উঁকি দিয়ে আবার মিলিয়ে গেল।

***

সারা দিনের কাজ শেষে শিজুরু আকেমি নামের এক বান্ধবীর সাথে আওইয়ামাতে থাকা এক ইতালিয়ান রেস্টুরেন্টে ডিনার করতে গেল। আকেমিও তোজাই কোম্পানিতে অস্থায়ী কর্মী হিসেবে কাজ করে। সমবয়সি হওয়ায় এবং দুজনেই অবিবাহিত থাকায় এই ডিনারের সময়টা সাপ্তাহিক ছুটির মতো মনে হয় ওদের কাছে।

'তার মানে খুব তাড়াতাড়ি আমাদের বিদায়ক্ষণ চলে আসছে,' বললো আকেমি। 'যখনই আমাদের করা পাহাড়সম পেটেন্টগুলোর কথা ভাবি, তখনই হতবাক লাগে আমার।' গ্লাস থেকে একটু ওয়াইনে চুমুক দিয়ে অক্টোপাসের একটা টুকরো কাটাচামচে তুলে নিয়েছে সে।

হাসলো শিজুরু। যদিও তার বন্ধুটি মুখে মেকআপ করে এবং মেয়েলি পোশাক পরে, কিন্তু ও যেভাবে খায় আর যেভাবে কথা বলে তা বেশ রুক্ষ। তার ভাষ্যমতে, এটা তার বেড়ে ওঠার জায়গা থেকে পাওয়া।

'তারপরেও যা টাকা পেয়েছি তা কিন্তু খারাপ না,' বললো শিজুরু। 'বিশেষ করে ঐ স্টিল কোম্পানির থেকে অনেক ভালো। যথেষ্ট খারাপ ওরা।'

'হ্যাঁ, আশা করছি ওরকম আর কোনো কোম্পানি যেন কপালে না জোটে,' ভ্রু দুলিয়ে বললো আকেমি। 'শালার বসগুলোও বেশ বলদ প্রকৃতির ছিলো। আমাদেরকে কীভাবে ব্যবহার করতে হবে তা নিয়ে ওদের কোনো ধারণাই ছিলো

না। আমার তো মনে হয় আমাদের চাকরানি ভাবছিলো ওরা। মনে হচ্ছিলো যেন গোলামি করে টাকা কামাচ্ছি।'

আবারো হাসলো শিজুরো। গ্লাস থেকে আলতো চুমুক দিয়ে ওয়াইন তুলে নিলো মুখে। আকেমির এই ধরনের কথাগুলো তার মানসিক চাপ কিছুটা কমিয়ে দিচ্ছে।

'তো কী করবে তুমি?' জিজ্ঞেস করলো শিজুরু। 'অন্য কোনো কাজে ঢুকে যাবে নাকি?'

'ভাবার মতো একটা প্রশ্ন করেছ বটে,' হাতে থাকা মাংসের টুকরোটা মুখে ভরে হাতের উপর গাল রেখে বললো আকেমি। 'আমার তো মনে হচ্ছে চাকরি-বাকরি ছেড়ে দেবো।'

'মজা করছো না তো? বয়ফ্রেন্ড প্রেশার দিচ্ছে নাকি?'

'দেয় তো অবশ্যই।' ভ্রু কুঁচকালো আকেমি। 'ও যদিও বলে যে এই দিনভর কাজ করা নিয়ে তার কোনো আপত্তি নেই, তবুও আমার মনে হয় না ওটা মন থেকে বলছে ও। জানোই তো রাত-বিরাত শিডিউলের সাথে মেলাতে হয় আমাদের। এরমধ্যে একটু বাইরে যাবো ওকে নিয়ে, তারও উপায় হয় না। তার উপর ইদানীং বলছে ওর নাকি বাচ্চা লাগবে এখন। যার মানে হলো আমি আর চাকরি করতে পারবো না। তাই আগে আগেই ছেড়ে দিচ্ছি, এই আর কি।'

কথার মাঝপথ থেকেই মাথা দোলাচ্ছিলো শিজুরু। 'হ্যাঁ, চাইলেও আজীবন এই কাজ চালিয়ে যেতে পারবে না তুমি।'

'সেটাই,' সালাদটা মুখে দিয়ে বললো আকেমি।

সামনের মাসেই তার বিয়ে। তার বাগদত্তা বেতনভুক্ত কর্মচারী এবং বয়সে তার থেকে পাঁচ বছরের বড়। বেশ কদিন ধরেই তাদের মধ্যে ঝগড়া চলছিলো তার চাকরি করা নিয়ে। এখন বোঝা গেল যে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে সে।

এরমধ্যেই পাস্তা চলে এলো তাদের টেবিলে। শিজুরু সামুদ্রিক শজারুর স্প্যাগেটি অর্ডার দিয়েছিলো আর আকেমি দিয়েছিলো গার্লিক পেপারনচিনি[১৪]।

'তোমার ব্যাপারে বললে না? কী করবে তুমি? ওটাতেই লেগে থাকবে?'

'জানি না কিছু,' স্প্যাগেটিটাকে কাটাচামচ দিয়ে দুভাগ করতে করতে বললো সে। কিছুক্ষণের জন্য প্লেটেই রেখে দিলো ওটাকে। 'আমি হয়তো বাবা-মায়ের কাছে চলে যেতে পারি কিছু দিনের জন্য।'

'স্যাপোরোতে, না? বেশ সুন্দর জায়গা ওটা।'

কলেজের জন্য টোকিওতে এসেছিলো শিজুরু। অনেক দিন হয়ে গেছে বাড়িতে যায় না সে।

'কখন যাবে ঠিক করেছ?'

'যখন তোজাই কোম্পানির কাজ শেষ হবে, তখন হয়তো।'

'তার মানে খুব তাড়াতাড়ি, এই সামনের সপ্তাহে,' পেপারনচিনি মুখে ঢুকিয়ে বললো আকেমি। গিলে নিয়ে বললো, 'এই, মি. তাকামিয়া নাকি সামনের সপ্তাহের রবিবারে বিয়ে করছে?'

'কী? সত্যি?'

'হ্যাঁ, কাকে যেন এ নিয়ে কথা বলতে শুনেছি আমি।'

'মজা কোরো না। কোম্পানির কাউকে করছে নাকি?'

'না, তা মনে হচ্ছে না। কলেজের কোনো মেয়েকে করছে শুনলাম।'

'আচ্ছা...' ধীরগতিতে মুখে স্প্যাগেটি তুলে নিলো সে। পানসে লাগলো ওটা।

'জানি না মেয়েটা কে, তবে মনে হচ্ছে বেশ ভালোই জামাই ঠিক করে নিয়েছে নিজের জন্য। এরকম ছেলে লাখে একটা মেলে।'

'হাঁহ, নিজের দিকে দেখো একবার। দেখে মনে হচ্ছে না তোমার বিয়ে সামনের মাসে। নাকি তাকামিয়া তোমার টাইপের, হুঁ?' মজার ছলে খোঁচা দিয়ে বললো শিজুরু।

'টাইপ পরে দেখবো, আগে দেখবো কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা আসছে কি না আমার কাছে। ওর পরিবার বাড়ি-গাড়ির মালিক, জানো তো।'

'কোনো ধারণাই নাই আমার এ ব্যাপারে।'

যদিও ও আর তাকামিয়া কয়েকবার চা খেয়েছিলো একসাথে, কিন্তু ব্যক্তিগত কোনো কথাবার্তা সেখানে ওঠেনি কখনো।

'বেশ ধনী ওরা। ওর বাড়ি সেইজোতে, আর সেখানে অনেক জমি আছে তাদের। একটা অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংও আছে। শুনেছি তার বাবা নাকি মারা গেছে। মাকে নিয়েই থাকে সে। ইশ, শ্বশুর ছাড়া ওরকম জামাই পেলে মন্দ হতো না।'

'ভালোই খবর রেখেছ দেখা যাচ্ছে,' টেবিল বরাবর তাকিয়ে বললো শিজুরু।

'আরে, পুরো পেটেন্ট টিমের মধ্যেই এরকম কথাবার্তা হয়। প্রায় অনেক মেয়েরই নজর তার উপর ছিলো। কিন্তু দুঃখের ব্যাপারটা হলো, ওরা কেউই তো আর কলেজ পড়ুয়া তরুণী না।' বোঝাই যাচ্ছে এই ব্যাপারগুলো আকেমি বেশ উপভোগ করে। সম্ভবত নিজে সেই প্রতিযোগিতার মধ্যে না থাকার কারণেই।

'আমার মনে হয় সে ধনী বা দেখতে সুন্দর না হলেও মেয়েদের কাছে পাত্তা পেত,' বললো শিজুরু। 'কারণ অস্থায়ী কর্মীদের প্রতি তার একটা সহানুভূতি কাজ করে সব সময়। আর বসের কাছ থেকে এমন ব্যবহার পাওয়াটা বেশ দুর্লভ।'

হাত নাড়লো আকেমি। 'এই যে এখন তুমি তোমার মনগড়া কথাগুলো বলছো। তুমি যা বলছো ওগুলো কিছুই হতো না। একমাত্র ধনীর দুলালরাই এরকম পাত্তা পায়। প্রথমেই আসে টাকা, তারপর আসে চেহারা, স্টাইল ইত্যাদি। ঐ ছেলেকেই কোনো গরিব পরিবারে বসিয়ে দেখো, দেখবে কেউ তাকিয়েও দেখছে না। ওরকম পরিবারে জন্মালে হয়তো তার গজদন্তও থাকতো।'

'তা হয়তো ঠিকই বলছো,' হেসে বললো শিজুরু।

মূল খাবার চলে এলে অন্যান্য বিষয় নিয়ে কথা চালিয়ে গেল তারা। এরপর আর একবারের জন্যেও মাকোতো তাকামিয়ার কথা ওঠেনি তাদের টেবিলে।

***

দশটা বাজার কিছু পরপর নিজের অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছালো শিজুরু। আকেমি চেয়েছিলো রাতটা এদিক-সেদিক ঘুরতে, কিন্তু ক্লান্তির বাহানা দিয়ে চলে আসে সে। দরজা খুলে ঘরের বাতি জ্বালালো, ম্লান একটা আলো তার ঘরটায় ভরে গেল যেন।

তার ক্লান্তিকে আরো দশগুণ বাড়িয়ে দিলো এদিক-সেদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা কাপড়চোপড় আর ম্যাগাজিনের স্তূপ। কলেজের দ্বিতীয় বর্ষ থেকে এই এক রুমের অ্যাপার্টমেন্টে আছে সে। একটা সময় মনে হতো এই রুমটাই তার সমস্ত দুঃখ-বেদনার ধারক।

বিছানার এককোনায় জামা-কাপড় না বদলিয়েই ধপাস করে শুয়ে পড়লো সে। বিছানার উপর ধপ করে পড়াতে ক্যাঁচ করে উঠলো খাটটা। *এই ঘরে কিছুই নতুন না। সবই পুরাতন হয়ে যাচ্ছে।*

মাকোতোর চেহারাটা ভেসে উঠলো তার চোখের সামনে। মাকোতোর জীবনে কেউ একজন আছে এটা পুরোপুরি যে সে জানতো না, এমনও না। কদিন আগেই লাইসেন্সিং বিভাগের একটা মেয়েকে এ বিষয়ে কথা বলতে শুনেছিলো সে। কিন্তু এটা কতটা সিরিয়াস ছিলো তা জানতো না, আর কখনো জিজ্ঞেসও করেনি এ বিষয়ে। আর জানলেও বা কী হতো? কিছুই করতে পারতো না সে এ ব্যাপারে।

অস্থায়ী কর্মী হওয়ার একটা সুবিধাই কেবল ভালো লেগেছিলো ওর–মানুষের সাথে মিশতে পারা, বিশেষ করে পুরুষদের সাথে। প্রত্যেকটা নতুন কর্মস্থলই নতুন কোনো পুরুষের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। যদিও কোনোটাই সামনে আগায়নি। ওর এমনকি এও সন্দেহ হয় যে কিছু কিছু কোম্পানি ইচ্ছা করেই অস্থায়ী নারী কর্মীদের আলাদা কোথাও বসার ব্যবস্থা করে, যাতে পুরুষদের থেকে দূরে রাখতে পারে।

কিন্তু এক্ষেত্রে তোজাই অটোমোটিভ আলাদা। প্রথম দিনেই মনের মতো পুরুষের সাথে দেখা হয়ে যায় তার–মাকোতো তাকামিয়া। মাকোতোর চেহারাই প্রথমে আকর্ষণ করেছিলো ওকে। দেখেই মনে হয়েছিলো, এরকম ছেলে কেন মুভি স্টার হলো না। প্রত্যেকটা চালচলনে তার উচ্চবংশের পরিচয় ঝরে পড়ে, মনে হয় যেন অন্য এক উচ্চতার মানুষ সে। এ জীবনে সুবেশী অনেক পুরুষ দেখেছে শিজুরু, কিন্তু বেশিরভাগই কেবল কাজের প্রয়োজনেই সেভাবে চলে। কিন্তু মাকোতোর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ভিন্ন। ও সত্যিকার অর্থেই সুবেশী ও সুন্দর।

যতই সে মাকোতোর সাথে কাজ করছিলো, ততই ওর ফার্স্ট ইম্প্রেশন সঠিক প্রমাণিত হচ্ছিলো। অস্থায়ী কর্মীদের প্রতি সহানুভূতিশীল থাকে মাকোতো,

যেকোনো সমস্যায় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। উৎসাহ দেয় যেকোনো খারাপ পরিস্থিতিতে। শিজুরু কল্পনায় এতটাই ডুবে ছিলো যে তার মনে হতো কোনো এক দিন তারা দুজনে বিয়ে করবে।

অবশ্য, মাকোতোকে দেখলে তার মনে হতো যে সেও তাকে পছন্দ করে। অন্তত পক্ষে শিজুরু কী করে না করে তার খবর নিতো। ততটা কথা বলতো না, কিন্তু যেভাবে তাকাতো বা ভাবভঙ্গি করতো, তাতে মনে হতো তার মনেও ওর প্রতি কিছু একটা আছে।

কিন্তু তারপরও শিজুরু ভাবতে ভুল করেছে। সেদিনের সেই টি ব্রেকের কথা ভাবলো সে, এরপর নিজের বোকামির কথা ভেবে হেসে উঠলো। গাধার মতো কিছু একটা প্রায় বলে ফেলতে নিয়েছিলো সে।

যখন তাকে চা খেতে ডেকেছিলো মাকোতো, তখনই শিজুরু ভেবেছিলো, *এই তো, এখনই হয়তো ডেটে নেওয়ার কথা বলবে।*

কিন্তু সেই কথাটাই আর উঠলো না, এমনকি যখন সে তার শেষ চাল হিসেবে তাড়াতাড়ি কাজ ছেড়ে দেওয়ার কথাটা বললো, সে সময়ও 'গুড লাক' ছাড়া কিছুই মেলেনি।

অবশ্য, আকেমির থেকে পুরোটা শোনার পর এখন সে বুঝতে পারছে যে মাকোতোর ব্যাপারটা সবাই জানতো, কেবল ও নিজে ছাড়া। *যার এক সপ্তাহ পর বিয়ে, সে নিশ্চয়ই কোনো অস্থায়ী কর্মচারীকে নিয়ে অন্য কিছু ভাববে না। মাকোতো আমার সাথে ভালো ব্যবহার করে, তার একমাত্র কারণ হলো সে আসলেই ভালো মানুষ, তাই।*

ওর সম্পর্কে আর না ভাবাটাই ভালো হবে বলে মনে করলো সে। কষ্ট হলেও উঠে বসলো শিজুরু। ফোনটা হাতে তুলে নিয়ে তার বাবা-মায়ের কাছে ফোন করলো। ভাবছে তারা কী ভাববে যখন শুনবে যে সে তাদের কাছে চলে আসছে।

***

সমুদ্রের পাশের জানালাটা দিয়ে ঠান্ডা বাতাস ভেতরে আসছে। প্রথম যখন মাকোতো এখানে এসেছিলো, তখন বর্ষার মাঝামাঝি সময় চলছিলো, কিন্তু সেটা আরো তিন মাস আগের ঘটনা।

'বাসায় আসবাবপত্র আনার জন্য দারুণ একটা দিন বটে,' মেঝে পরিষ্কার করা থামিয়ে দিয়ে বললো তার মা। 'আবহাওয়ার কারণে কিছুটা দুশ্চিন্তা হচ্ছিলো যদিও, তবে মনে হচ্ছে আজকের এই পরিবেশে ওদের সুবিধাই হবে।'

'ওরা পেশাদার,' বললো মাকোতো। 'আবহাওয়া কেমন তা নিয়ে কিছু যায় আসে না ওদের।'

'সন্দেহ আছে যদিও আমার। গত মাসে ইয়ামাশিতার নতুন বউ না তুফানের সময় এরকম আসবাবপত্র এনেছিলো বাড়িতে? ওরা বলেছিলো যে ভয়ানক অবস্থা হয়েছিলো নাকি তাদের।'

'তুফানের ব্যাপার আলাদা, মা। আর তাছাড়া, এখন অক্টোবর মাস চলছে।'

'অক্টোবরেও বৃষ্টি পড়তে পারে,' নিজের কাজে ফিরে যেতে যেতে বললো তার মা। এরমধ্যে কলিংবেল বেজে উঠলো হঠাৎ।

'এখন আবার কে এলো?' অবাক হয়ে জোরেই বলে ফেললো মাকোতো।

'ইউকিহো আসেনি তো?'

'কিন্তু ওর কাছে তো চাবি আছে।' বলেই ইন্টারকমটা হাতে নিলো সে। 'কে?'

'আমি।'

'ওহ, তুমি? চাবির কথা ভুলে গেছ?'

'উমম, না।'

'আচ্ছা, সমস্যা নেই। দরজা খুলে দিচ্ছি আমি।'

হাতে থাকা রিমোটের বাটন চেপে বিল্ডিংয়ে ঢোকার দরজাটা খুলে দিলো মাকোতো। এরপর নেমে গিয়ে নিজেদের ইউনিটের দরজাটা খুলে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলো ইউকিহোর অপেক্ষায়। দরজা খোলার শব্দ শোনার পরপরই পায়ের শব্দ শুনলো সে। এরপর কর্নার থেকেই দেখতে পেল একটা সবুজ হাতাওয়ালা জামা এবং সাদা ট্রাউজার্স পরে এগিয়ে আসছে ইউকিহো। এক কাঁধের উপরে একটা জ্যাকেট রয়েছে তার। কাপড়টা এই শরতের জন্য অবশ্যই বেশ উষ্ণ।

'হেই,' ওর দিকে তাকিয়ে হেসে বললো মাকোতো।

'সরি, একটু দেরি হয়ে গেল আমার। কিছু শপিং করার ছিলো আর কি।' সুপার মার্কেট থেকে আনা ব্যাগগুলো উঁচু করে ধরলো ইউকিহো। মাকোতো দেখলো পরিষ্কার করার জন্য বিভিন্ন সরঞ্জাম রয়েছে সেখানে।

'আমি তো ভাবলাম গত সপ্তাহেই পরিষ্কারের কাজ করে ফেলেছ তুমি।'

'হ্যাঁ, কিন্তু সে তো সপ্তাহখানেক আগে। নতুন আসবাব ঢোকামাত্রই ধুলোবালি পড়তে শুরু করে দেবে আবার।'

'একদম মায়ের মতো বলছো। গিয়ে দেখো এক ট্রাক বোঝাই স্পঞ্জ আর সাবান দিয়ে কাজ করছেন উনি।'

'তাহলে তো আমাকে সাহায্য করতে যেতেই হয়।' দ্রুত জুতো হাতে তুলে নিলো ইউকিহো।

ভ্রু উপরে উঠে গেল মাকোতোর। এর আগে হাই হিল ছাড়া কখনোই দেখেনি সে ইউকিহোকে। তাছাড়াও এই প্রথম স্কার্ট বা ড্রেস ছাড়া দেখছে তাকে। এ নিয়ে বলতেই অবাক হয়ে তাকিয়ে ইউকিহো বললো, 'ঘরে জিনিসপত্র আসছে এমন দিনে স্কার্ট পরবো? স্কার্ট পরলে কাজ করবো কীভাবে?'

'সেটাই তো,' ভেতর থেকে জবাব দিলো মাকোতোর মা। দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো সে, জামার হাতা কনুই পর্যন্ত উঠানো। হাসি দিয়ে বললো, 'হাই, ইউকিহো।'

'হ্যালো।' মাথাটা নুইয়ে অভিবাদন জানালো সেও।

'আমার ছেলের হয়ে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, কেমন? নিজের রুম জীবনেও কখনো পরিষ্কার করেনি তো, তাই জানেও না কী করতে হয়। আগেই কষ্ট হচ্ছে এটা ভাবতে যে তোমার উপর কীরকম ছেলে চাপিয়ে দিচ্ছি। আশা করি তুমি তৈরিই আছো।'

'পুরোপুরি তৈরি আমি।'

বসার ঘরে গিয়ে কাজে লেগে পড়লো দুজনেই। কিছুক্ষণ তাদের আলাপ শুনে আবার জানালার কাছে চলে এসে নিচে রাস্তার দিকে তাকালো মাকোতো। ফার্নিচারের দোকান থেকে যেকোনো সময় ট্রাকটা এসে পড়বে। আর তার ঘণ্টাখানেক বাদে আসবে যন্ত্রপাতি ঠিক করার কর্মীরা।

অবশেষে, ভাবলো মাকোতো। আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে একটা পরিবারের কর্তা হয়ে যাবে সে। এর আগে এরকমভাবে নাড়া দেয়নি তাকে বিষয়টা। আরো অবাক হলো এটা ভেবে যে কিছুটা নার্ভাস লাগছে এখন তার।

পেছনের রুমে ইউকিহো হাঁটু গেড়ে বসে তাতামি মাদুরটা পরিষ্কার করছে। অ্যাপ্রোন পরে আছে সে এখন। কাজের পোশাকেও তাকে অপরূপ লাগে দেখতে।

চার বছর, ভাবলো সে। এতটা সময় ধরে প্রেম করছে ওরা। কলেজের ড্যান্স ক্লাবে ওদের প্রথম দেখা হয়েছিলো: এইমেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র ছিলো সে, আর ইউকিহো এসেছিলো সেইকা গার্লস কলেজ থেকে নতুন রিক্রুট হিসেবে।

যতগুলো রিক্রুট সে বছর হয়েছিলো, তাদের মধ্য থেকে ইউকিহোকেই বেশি সুন্দর লাগছিলো। চেহারার গঠন আর অঙ্গভঙ্গিতে সে স্বাভাবিকভাবেই যেকোনো ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদে জায়গা করে নিতে পারতো। প্রথম যখন ওর উপর চোখ পড়ে, তখনই তার হৃদয় চুরি করে ফেলে মেয়েটা। অবশ্য, মাকোতোর মতো এরকম আরো অনেক ছেলেই ইউকিহোর জন্য পাগল ছিলো। যদিও মাকোতো তখন কারো সাথে সম্পর্কে ছিলো না, কিন্তু তবুও মেয়েটাকে প্রস্তাব দেওয়ার ইচ্ছা ছিলো না তার। কারণ তত দিনে কয়েকটা ছেলেকে ফিরিয়ে দিয়েছে সে, আর মাকোতো চাচ্ছিলো না সেই ছেলেদের মধ্যে একজন হতে।

ও হয়তো কোনোদিনই তাকে বলার সাহস পেত না, যদি-না ইউকিহো নিজের নাচের কিছু সমস্যা নিয়ে তার কাছে আসতো। আর এই সময়েই সে বুঝে যায় যে তার হাতে এখন ইউকিহোর হৃদয় জয় করার মতো অজুহাত রয়েছে। এরপর আর বেশি দিন লাগেনি তাদের একসাথে নাচতে। আর সে সময়ই মাকোতোর মনে

হয়েছিলো ইউকিহোরও তার প্রতি ভালোলাগা কাজ করে হয়তো। তো একদিন সে সিদ্ধান্ত নিলো যে তাকে ডেটে যাওয়ার প্রস্তাব দেবে। যেই বলা সেই কাজ।

ইউকিহো কোনো জবাব দেওয়ার আগে অনেকক্ষণ তাকিয়ে ছিলো তার দিকে। এরপর মুখ খুলে জিজ্ঞেস করেছিলো, 'কোথায় যাওয়ার প্ল্যান করেছেন?'

নাচ থামিয়ে দিয়ে মাকোতোও বলেছিলো, 'যেখানে তুমি যেতে চাইবে।'

এরপরে তারা ডিনার এবং গানের একটা আসরে গেল। সেখান থেকে ইউকিহোকে বাড়িতে পৌঁছে দেয় সে। সেই শুরু, এরপর থেকে এই চার বছর ধরে তারা প্রেম করছে।

আর এখনো মাঝে মাঝে মাকোতো ভাবে যে যদি সেদিন ইউকিহো নাচের সমস্যা নিয়ে তার কাছে না আসতো, তাহলে হয়তো কখনোই তাকে ডেটে নেওয়ার প্রস্তাব দিতে পারতো না সে। যদি ইউকিহোর বদলে অন্য কোনো মেয়ে থাকতো সেদিন, তবে আগামী দুই সপ্তাহ পর হয়তো সেই মেয়েকেই বিয়ে করতে হতো তার। এমনকি ইউকিহোর বন্ধু এরিকোও তার মনে একটা দাগ রেখে গেছে–যার কারণে আজও এরিকোর নাম মনে আছে তার। যদিও মেয়েটা তার প্রথম বর্ষের অর্ধেকটা পার করে দেওয়ার আগ পর্যন্ত সে ততটা খেয়াল করেনি ওকে।

ভাগ্য আসলেই অদ্ভুত, ভাবলো সে।

'তো ইন্টারকমে বেল বাজিয়েছিলে কেন তুমি?' জিজ্ঞেস করলো মাকোতো। তখন রান্নাঘরটা পরিষ্কার করছিলো ইউকিহো।

'অসভ্যের মতো হুটহাট ঢুকে পড়তে চাইনি আর কি,' জবাব দিলো সে। হাতের কাজ থামলো না তার।

'ঢুকলে কী হবে? চাবি তো এজন্যই দিয়েছি তোমাকে।'

'কিন্তু এখনো তো বিয়ে হয়নি আমাদের।'

'মনে হয় না কারো তাতে কিছু যায় আসে।'

'হ্যাঁ। তবুও যদি এই ব্যাপারগুলো একটু ভালো করে মেনে না চলি, তাহলে আমাদের বিয়ের অনুষ্ঠানটা ততটা বিশেষ কিছু হবে না।'

মাকোতোর মা-ও মুখ টিপে হেসে তাল মেলালো হবু বউয়ের সাথে।

হবু শাশুড়ির দিকে তাকিয়ে ফিরতি হাসি দিলো ইউকিহো। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে জানালার দিকে ফিরে তাকালো আবার মাকোতো। তার মা যেদিন ইউকিহোকে প্রথম দেখেছিলো, সেদিন থেকেই পছন্দ করে ফেলেছিলো। এটাও ইউকিহোকে বিয়ে করার পেছনে অন্যতম একটা কারণ। তাকে শুধু এই কারণগুলো অনুসরণ করতে হতো–বাকি কাজ এমনিতেই হয়ে যাবে, জানতো সে।

কিন্তু তবুও তার মস্তিষ্কের কোনো একটা জায়গায় অন্য এক নারীর ছবি ভেসে ওঠে মাঝেমধ্যে–যেখানে মূলত তার হবু বউয়ের ছবি ভাসার কথা। কোনো উদ্দেশ্য

নিয়ে সে ভাবছে না সেই নারীর কথা। বস্তুত সে চাচ্ছে ভুলে যেতে, কিন্তু চোখ বন্ধ করলেই তার সামনে ভেসে উঠছে চেহারাটা।

কপালের দুপাশে ডলতে লাগলো মাকোতো। এমন সময় রাস্তা থেকে আওয়াজ শুনে ভ্রু কুঁচকে ফেললো। আসবাবপত্র চলে এসেছে।

***

সন্ধ্যা সাতটা বাজে। শিনজুকু স্টেশনের একটা ক্যাফেতে বসে আছে মাকোতো। পাশের টেবিলে কিছু লোক ওসাকার ভাষায় বেসবল খেলা নিয়ে কথা বলছে। *হানশিন টাইগারস*-এর এরকম আমূল পরিবর্তন নিয়েই কথা হচ্ছিলো। এই বছরের খেতাবটা কুড়াতে অনেকগুলো টিমের সাথে প্রতিযোগিতায় নামতে হয়েছিলো তাদের। পশ্চিম দিকে প্রায় অধিকাংশ লোকই এ নিয়ে উত্তেজিত ছিলো। তোজাই কোম্পানির একটা বিভাগ এজন্য প্রায় প্রতি রাতে কাজের শেষে ড্রিংকস পান করে। এমনকি সব *হানশিন টাইগারস* সাপোর্টার একসাথে একটা ক্লাবই খুলে ফেলেছে তোজাইতে। এদিকে মাকোতো *জায়ান্টস*-এর ভক্ত। তাই ভেতরে ভেতরে দীর্ঘশ্বাস নেওয়া ছাড়া আর কিছুই করার নেই তার।

তবুও ওসাকার স্থানীয় ভাষা শুনতে ভালো লাগছিলো তার। কলেজে ভর্তি হওয়ার পরে প্রায় চার বছরের মতো সেনরিতে একটা অ্যাপার্টমেন্টে বাস করতো সে। সেনরি হলো ওসাকার উত্তর দিকের একটা উপশহর।

কফির কাপে দ্বিতীয়বার চুমুক দিতেই যে লোকটার জন্য অপেক্ষা করছিলো সে এসে পড়লো। একদম নিখুঁতভাবে সেলাই করা একটা ধূসর স্যুট পরে আছে সে–খাঁটি ব্যবসায়ী যাকে বলে।

'তো বলো, ব্যাচেলর লাইফকে বিদায় জানাতে কেমন লাগছে?' তার পাশে বসতে বসতে জিজ্ঞেস করলো কাজুনারি শিনোজুকা। একটা এসপ্রেসো অর্ডার করলো সে।

'তোমাকে এমন হুট করে ডাকার জন্য দুঃখিত,' বললো মাকোতো।

'আরে, তেমন কিছুই না। সোমবার দিনটাকে সব সময় হালকাভাবেই নিই আমি,' লম্বা পাদুটো একটার উপর একটা রেখে বললো কাজুনারি।

যে যে শিক্ষার্থীরা বলরুম ড্যান্সের প্রতি যত্নবান ছিলো, তাদের অধিকাংশই সম্মানিত পরিবার থেকে এসেছে। কাজুনারির পরিবার বড় ফার্মাসিউটিক্যালের ব্যবসা চালায়। তাদের পরিবার কোবেতে থাকে। আর সে টোকিওতে এসেছে তাদের কোম্পানির একটা শাখার দেখাশোনা করতে।

'আমি ভাবছি আমার থেকে বেশি ব্যস্ত তো এখন তোমার থাকার কথা,' বললো কাজুনারি।

'হয়তো। গতকাল ঘরের আসবাবপত্র দিয়ে গেছে বাসায়। আজকে থেকে একা একা রাত কাটাতে হবে ওখানে।'

'বাহ, বাসা তো তবে একদম খাসা করে ফেলেছ দেখছি! এখন শুধু বউ লাগবে একটা, ব্যস।'

'ওর জিনিসপত্র আগামী শনিবার আসবে।'

'অভিনন্দন,' হাসি দিয়ে বললো কাজুনারি। 'শেষমেশ বিয়েটা করেই ফেলছো তবে।'

'তাই তো দেখছি,' বললো মাকোতো। আরেক দিকে ফিরে কফির কাপটায় চুমুক দিলো সে।

'তো কোন বিষয়ে কথা বলার জন্য ডেকেছ? বেশ সিরিয়াস লাগলো তোমাকে গতকাল ফোনে। আমি তো ঘাবড়েই গেছিলাম।'

'হুম, সরি ওটার জন্য।'

'তো এখন বলো, এমন কী গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটা ফোনে বলতে পারোনি তুমি? ব্যাচেলর লাইফ কি ছাড়তে ইচ্ছা করছে না?' হেসে উঠলো কাজুনারি।

ঠাট্টার ভঙ্গিতেই বলেছে সে, কিন্তু মাকোতো হাসলো না। কাজুনারি সেদিকে লক্ষ করে একটু থেমে গেল। তারপর সামনের দিকে এগিয়ে এসে বললো, 'কী হয়েছে বলো।'

আর সে সময়ই তার এসপ্রেসো নিয়ে এলো ওয়েটার। আবার ঠিক করে বসে পড়লো সে, চোখ এখনো মাকোতোর উপরেই।

'মজা করছো তুমি, না?' ওয়েটারটা চলে যাওয়ার পরে বলে উঠলো সে। কফির দিকে একপলক তাকালোও না কাজুনারি।

'উঁহু, মজা করছি না আমি,' হাতদুটো বুকে বেঁধে বললো মাকোতো।

কাজুনারির চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসছে যেন কোটর থেকে, চোয়াল ঝুলে গেছে। কফি শপটার দিকে একবার তাকিয়ে আবার চোখ গিয়ে পড়লো মাকোতোর উপর। 'একটু বেশিই দেরি হয়ে গেল না তোমার মত বদলানোর জন্য?'

'হ্যাঁ, জানি আমি। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আমি প্রস্তুত না এখনো।'

জমে গেল কাজুনারি। এরপর ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বললো, 'আচ্ছা, অত চিন্তা করে লাভ নেই। অনেক মানুষের ক্ষেত্রেই এটা ঘটেছে, আমি দেখেছি। বিয়ের দিন এগিয়ে এলে একটু-আধটু অমন হয়। তোমার একারই যে এমন হচ্ছে তা না।'

মাথা ঝাঁকালো মাকোতো। 'ওসব কিছুই না।'

'তাহলে কী?'

এবার আর চোখে চোখ মেলাতে পারলো না মাকোতো। ও ভয় পাচ্ছে তার বন্ধু আবার তার সমস্যার কথা শুনে হেসে না দেয়। কিন্তু তারপরও কাজুনারিকে যদি না বলতে পারে, তবে কাকে বলবে? এক চুমুক পানি মুখে দিলো সে। এরপর ধীরে ধীরে বললো, 'অন্য কাউকে ভালো লাগে আমার।'

কয়েক মুহূর্তের জন্য চুপ করে রইলো কাজুনারি। হাবভাব আগের মতোই আছে। মাকোতো ভাবছিলো কথাটা আবার বলবে, এমন সময় কাজুনারি বলে উঠলো, 'কে?' ওর দিকে কঠিন চোখে তাকিয়ে আছে তার বন্ধু।

'আমার অফিসের কেউ...এখনো পর্যন্ত।'

'*এখনো পর্যন্ত* মানে?' ভ্রু তুলে জিজ্ঞেস করলো কাজুনারি।

শিজুরু মিসাওয়া সম্পর্কে সবকিছু খুলে বললো মাকোতো।

'তার মানে শুধু কাজের সময়ই তোমাদের দেখা হয়। এছাড়া একান্তভাবে কখনো দেখা হয়নি?' কাহিনি শেষ হওয়ার পরে জিজ্ঞেস করলো কাজুনারি।

'হ্যাঁ। ওকে তো আর ডেটে নেওয়ার কথা বলতে পারি না।'

'না, তা পারো না। আর এতেই একটা প্রশ্ন উঠছে: তুমি কী করে জানো মিসাওয়া তোমাকে নিয়ে কী ভাবছে?'

'জানি না আমি।'

'তাহলে কান খুলে শুনে রাখো,' বলে উঠলো কাজুনারি, মুচকি হাসি খেলা করছে তার মুখে। 'আমার উপদেশ হলো, ওকে ভুলে যাও। আমার মতে, অতিরিক্ত দুশ্চিন্তার কারণেই এমনটা হচ্ছে।'

হাসলো মাকোতো। 'বুঝেছিলাম এটাই বলবে তুমি। আসলে তোমার জায়গায় থাকলে আমিও এটাই বলতাম।'

'হুম। আচ্ছা, সরি,' বললো কাজুনারি। 'আমি জানি এগুলো যে আসলে কী তা তুমি জানো। আর আমি তোমার অনুভূতিকে হালকা করে দেখছি না। আমার কাছে আসাটা ভুল হয়েছে তাও বলছি না।'

'আমি বুঝতে পারছি যে আমি বোকার মতো কাজ করছি।'

এক চুমুক এসপ্রেসো মুখে নিলো কাজুনারি। 'তো কখন শুরু হয়েছে এটা?'

'কোনটা কখন শুরু হয়েছে?'

'এই যে তার প্রতি তোমার ভালোলাগা কাজ করছে। এটা কবে থেকে শুরু হলো?'

'ও আচ্ছা।' একটু থামলো মাকোতো। মনে করে বললো, 'এই বছরের এপ্রিলের দিকে সম্ভবত। যেদিন প্রথম দেখলাম তাকে।'

'তার মানে প্রায় ছয় মাস আগের কাহিনি। আজকের আগে কেন এটা নিয়ে কিছু করোনি?' বললো কাজুনারি। কথায় হালকা বিরক্তির ছাপ স্পষ্ট।

'করতামটা কী আসলে? বিয়েটাও ঠিক হয়েছিলো। আর তার থেকেও বড় কথা, নিজের অনুভূতিকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না আমি। যেমনটা এইমাত্র বললে তুমি, আমিও এরকমই ভাবছিলাম। মনে হচ্ছিলো অবচেতন মনের কোনো অনুভূতি এটা। বারবার নিজেকেই বলতাম যে এটা থেকে বের হয়ে আসতে হবে আমাকে।'

'কিন্তু তুমি তা পারোনি। আর এখন এইখানে বসে আমরা এ নিয়ে আলোচনা করছি।' দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো কাজুনারি। মাথা চুলকালো হালকা। ছাত্রজীবনে চুল লম্বা রাখলে খানিকটা কোঁকড়া হয়ে থাকতো, আর এখন আগের থেকে অনেকটা ছোট করে কাটা। 'মনে হচ্ছে যেন দুই সপ্তাহ পরের বিশাল অনুষ্ঠানকে পণ্ড করার জন্য একটা বোমা ফেলা হচ্ছে।'

'জানি আমি। আর এ নিয়ে সত্যিই লজ্জিত হয়ে আছি। আর কেউই নেই যাকে এগুলো বলতে পারতাম।'

'আরে ওজন্য বলছি না,' বললো কাজুনারি। কিন্তু তার চেহারা আগের মতোই রইলো। 'এখন কাজের কথায় আসি। আমরা কিন্তু এখনো জানি না সেই মেয়েটা কী ভাবছে তোমাকে নিয়ে। নাকি জানি?'

'না, সে বিষয়ে কিছুই জানি না।'

'তবে যা বলছি শোনো। কিছুটা অদ্ভুত শোনাতে পারে যদিও, তবু বলছি: এখানে মূল সমস্যাটাই হলো তোমার অনুভূতি।'

'একদম। আর আমার বর্তমান অনুভূতিটা হলো, একজনের প্রতি অনুভূতি নিয়ে অন্যকে বিয়ে করাটা ঠিক কি না তা আমি নিজেও বুঝতে পারছি না। এমনকি বিয়ের অনুষ্ঠানে যাওয়ার কথাও কল্পনা করতে পারছি না আমি।'

'বুঝতে পারছি।' দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো আবার কাজুনারি। 'আর ইউকিহোর ব্যাপারে? ওর ব্যাপারে কেমন বোধ করো তুমি? ওকে নিয়ে ভাবলে ঠিক হয় সব?'

'না, তাও না। একই রকম অনুভূতি আসে আমার–'

'তার মানে ওর ব্যাপারেও তোমার অনুভূতি একশো ভাগের নিচেই?'

কোনো জবাব না দিয়ে ঢকঢক করে গ্লাসের সমস্ত পানি সাবাড় করে দিলো মাকোতো।

'নিষ্ঠুরের মতো কিছু বলছি না, তবে আমার মনে হয় তোমার সহজাত প্রবৃত্তি এখানে ঠিক বলছে। যেরকমটা এখন অনুভব করছো, এমন অনুভব করতে থাকলে তোমাদের দুজনের জন্যই বিয়েটা খারাপ কিছু ছাড়া ভালো কিছু বয়ে আনবে না।'

'তো আমার জায়গায় তুমি থাকলে কী করতে এখন?' জিজ্ঞেস করলো মাকোতো।

'বিয়ের আগে মেয়েদের থেকে অন্তত এক বছর দূরে থাকতাম।'

নিঃশব্দে হাসলো মাকোতো। ও হয়তো তার বন্ধুর সেন্স অব হিউমার দেখে জোরে হাসতো, কিন্তু ওর কথার ভেতর থাকা লুকোনো সত্যটা গিলতে অনেক বেশি কষ্ট হচ্ছে তার।

'তবে আমার যদি বিয়ের আগে অন্য কোনো নারীর প্রতি মোহ থাকতো–' কাজুনারি সিলিংয়ের দিকে একবার তাকিয়ে ফের মাকোতোর দিকে ফেরালো তার দৃষ্টি–'তবে আমি বিয়েটা করতামই না।'

'এমনকি বিয়ের দুই সপ্তাহ আগেও না বলে দিতে?'

'এমনকি বিয়ের আগের দিন হলেও।'

কাজুনারির কথার ভারে চুপ হয়ে গেল মাকোতো।

হালকা হাসলো কাজুনারি। 'এটা বলতে পারছি কারণ আগুনের উপরে আমি বসে নেই, তাই। আমি জানি এটা এতটাও সহজ কাজ না। আর এটা পুরোটাই নির্ভর করছে সেই অন্য মেয়েটার প্রতি তোমার অনুভূতিটা আসলে কেমন তার উপর।'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়লো মাকোতো। 'ধন্যবাদ, মনে হয় ধরতে পেরেছি তোমার কথা।'

'প্রত্যেকে তাদের নিজস্ব নীতি মেনে চলে,' বললো কাজুনারি। 'তোমার সিদ্ধান্ত তোমাকেই নিতে হবে। আর তুমি যে কী সিদ্ধান্ত নেবে, তা আমি আগেই ধারণা করতে চাচ্ছি না।'

'তোমাকে জানাবো আমি কী সিদ্ধান্ত নিলাম।'

হাসলো কাজুনারি। 'সিদ্ধান্তটা একটু দ্রুতই নিও কিন্তু।'

***

হাতে থাকা ম্যাপটা শিনজুকু স্টেশনের ইসেতান ডিপার্টমেন্টের সামনে নিয়ে এসেছে ওদেরকে। ওখানে তিন নাম্বার ফ্লোরে একটা বারের নাম দেখা যাচ্ছে। বোঝাই যাচ্ছে প্রায় কয়েক দশক ধরে এখানে আছে বারটা।

'ওরা এসব করছে বলে আমাদের খুশি হওয়া উচিত, কিন্তু আরেকটু ভালো জায়গা বাছাই করতে পারতো মনে হচ্ছে,' এলিভেটরে ঢুকতে ঢুকতে বললো আকেমি।

'টাকলা ইঞ্জিনিয়ারদের দিয়ে পার্টি এরেঞ্জ করলে এগুলোই পাবে তুমি,' হেসে বললো শিজুরু।

'হয়তো,' ভ্রু কুঁচকে বললো আকেমি।

দরজার কাছাকাছি যেতেই অটোমেটিক দরজাটা খুলে গেল। ভেতরের চেঁচামেচির শব্দ ভেসে এলো তাদের কানে। সাতটা বাজতে এখনো কিছুটা দেরি, অথচ এরমধ্যেই মাতাল দিয়ে ভরে উঠেছে জায়গাটা। একজন কর্মী গোছের লোক বসে আছে দরজার পাশে, গলার টাই বুকের উপর ঝুলছে।

বারের পেছন থেকে একটা স্বর ভেসে এলো ওদের উদ্দেশে। অনেকগুলো টেবিলই ইতোমধ্যে তাদের চেনা মানুষ দিয়ে ভরে গেছে। পেটেন্ট লাইসেন্সিং বিভাগেরই বেশি। অনেকে তো মদ খেয়ে ঢুলছে এরই মধ্যে।

'মনে রেখো, এটা কিন্তু আমাদের পার্টি,' শিজুরুর কানে ফিসফিস করে বললো আকেমি। 'যদি আমাদের দিয়ে তাদের বিয়ারের বোতল ভরতে বলে, লাথি মেরে চলে যাবো কিন্তু আমি।'

হেসে উঠলো শিজুরু। তার মনে হচ্ছে না আজকে এমন কিছু হতে চলেছে। এরমধ্যেই মাকোতো তাকামিয়াকে একটা টেবিলে বসে থাকতে দেখেছে সে।

বিদায়ী কর্মীদের উদ্দেশে টোস্ট করলো সবাই, এছাড়া অভিবাদন তো আছেই। *সবই কাজের অংশ*, ভাবলো সে। জোর করে হাসি ফুটিয়ে তুললো মুখে। তার মাথায় এরমধ্যেই এই পার্টি কখন শেষ হবে তার চিন্তাভাবনা চলছে। পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে তার জানা আছে যে অনেক পুরুষ কর্মী নিজেদের কোম্পানিতে থাকা মেয়েদের সাথে উলটা-পালটা কিছু করার সাহস না করলেও অস্থায়ী কর্মীদের গা ঘেঁষে দাঁড়ানোর আগে ভাবে না। কারণ এক্ষেত্রে পরবর্তীতে কোনো সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা নেই। আর আজ টেবিলে স্থায়ী নারী কর্মীরাও নেই যে এদের লাইনে রাখবে।

এদিকে ওদের সামনেই বসে ছিলো মাকোতো। এরই মধ্যে খাওয়াদাওয়া শুরু করে দিয়েছে সে। তার টেবিলের উপর এক গ্লাস বিয়ারও দেখা যাচ্ছে। কখনোই অত বেশি কথা বলে না সে, কিন্তু আজকে একদম চুপ মেরে আছে। যেন আজকে সে শুধু শুনবে কিন্তু কিছুই বলবে না।

এরপরও কেন যেন শিজুরুর মনে হলো সারা রাত ধরেই মাকোতোর চোখদুটো ওর দিকে তাকিয়েছে। সে ভেবেও রেখেছে যে দুয়েকবার হয়তো আকস্মিক চোখাচোখি হবে। কিন্তু এরপরেই মনে হলো, হয়তো তার মনই তাকে দিয়ে এরকম উদ্ভট চিন্তাভাবনা করাচ্ছে।

একটু বেশিই আত্মসচেতন হয়ে যাচ্ছো, নিজেকেই নিজে বললো শিজুরু।

কথা ঘুরে শেষমেশ এসে আকেমির বিয়ের কথাতে পড়লো।

'আমি জানি না এরকম একটা সময়ে আমি কোনো বাচ্চা নেবো কি না, মানে এত ঝুটঝামেলার ভেতরেও। তারপরও যদি বাচ্চা নিই, তবে আমি তার নাম রাখবো টাইগার, *হানশিন টাইগারস*-এর নামে,' কয়েক গ্লাস মদ খেয়ে বললো আকেমি।

সবাই সমস্বরে হেসে উঠলো তার কথায়।

'মি. তাকামিয়াও না বিয়ে করছে সামনে?' গলার স্বর যথাসাধ্য স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করে বলে উঠলো শিজুরু।

'উমমম...অ্যা...হ্যাঁ, হ্যাঁ,' কিছুটা কাঁচুমাচু হয়ে জবাব দিলো মাকোতো। যেটা আরেকটা হাসির রোল তৈরি করলো রুমের ভেতর।

'কালকের পরের দিন, মানে পরশু,' নারিতা নামের এক লোক বলে উঠলো। শিজুরুর পাশেই ছিলো সে। মাকোতোর কাঁধে হাত রেখে বললো, 'যদি কারো ওকে কিছু বলার থাকে, এক্ষুনি বলে ফেলো। কারণ এই ব্যাচেলর আদমি অতি শীঘ্রই তার ব্যাচেলরশিপ ত্যাগ করতে যাচ্ছে।'

'অভিনন্দন,' বললো শিজুরু।

নিঃশব্দে ধন্যবাদ দিলো মাকোতো।

'অভিনন্দন!' বেশ জোরেই বলে উঠলো নারিতা। 'কারণ তুমি প্রমাণ করে দিয়েছ যে কেউ কেউ ভাগ্যের জোরেই সব পেয়ে যায়।'

ছোট্ট করে হাসলো মাকোতো। 'যদিও কথাটা একদমই ঠিক না, তারপরেও ধন্যবাদ।'

'না, না, না, একদমই না!' মাথা ঝাঁকিয়ে হাসতে লাগলো নারিতা। 'এটা পুরোপুরি সত্য কথা।' এরপর শিজুরুর দিকে তাকিয়ে বললো, 'এই যে মিস মাসাওয়া, শুনুন, এই লোক আমার থেকে দুই বছরের ছোট, আর এরমধ্যেই একটা ঘরের মালিক সে। এটা কি ঠিক, বলুন?'

'ওটা তো আমার না। আর ওটা তো আসলে কোনো বাড়িও না।'

'অবজেকশন!' কথা বলতে গিয়ে মুখ থেকে লালা বেরিয়ে এলো নারিতার। 'আমি কিন্তু বাড়ি বলিনি, আমি বলেছি ঘর। আর যে অ্যাপার্টমেন্টের কোনো ভাড়া দেওয়া লাগে না, ওটাকে ঘরই বলে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললো মাকোতো। 'ওটা আমার মায়ের নামে করা। আমাকে থাকতে দিচ্ছে, এই-ই যা। আমিও ঐ একই গোয়ালের গরু।'

'দেখলেন, তার মায়ের অ্যাপার্টমেন্ট আছে! এটা যদি ভাগ্য না হয়, তাহলে ভাগ্য যে কী তাই জানি না আমি।'

শিজুরুর দিকে একটু সম্মতি পাওয়ার জন্য তাকালো নারিতা। এরপর আবার হাতে থাকা মগে মদ ঢালতে লাগলো সে। কিন্তু না ভরে আবার বলা শুরু করলো, 'একটা অ্যাপার্টমেন্ট বলতে কী বোঝায়? দুটো রুম বা তিনটা রুমের মতো জায়গা? না, এই লোকের তো পুরো বিল্ডিংই আছে!'

'অনেক হয়েছে,' বললো মাকোতো। তখনো হাসছে, তবে এটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে তার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙছে একটু একটু করে।

'না, না, আজকে সব বলবো আমি। বিশেষত যখন বিউটি কুইনের মতো একটা হবু বউ পায় কেউ।'

'নারিতা!' ভ্রু কুঁচকে তাকালো মাকোতো। পাশে থাকা মদের বোতলটা হাতে নিয়ে নারিতার মগ ভরে দিলো যাতে কিছুক্ষণের জন্য হলেও সে চুপ থাকে।

'এতই সুন্দরী সে?' বলে উঠলো শিজুরু।

'অপরূপ সুন্দরী,' বললো নারিতা। 'চাইলেই নায়িকা হতে পারতো। কোনো সমস্যাই হতো না। তার উপর *চা পানের রীতি* আর *ফুল সাজানোর রীতি*-র বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে তার, ঠিক কি না, মাকোতো?'

'কিছুটা,' স্বীকার করে নিলো মাকোতো।

'দেখলেন, বলেছিলাম না? ইংরেজিও ভালো বলতে পারে, খুব সুন্দর শোনায়। আসলেই, ভাই, এত ভাগ্য কোত্থেকে পেলে, বলো তো দেখি?'

'আস্তে, আস্তে,' টেবিলের একদম শেষ দিক থেকে বলে উঠলো বিভাগীয় প্রধান। 'সৌভাগ্যের অনেক রাস্তাই খোলা আছে এখনো। তোমারটাও আসবে, নারিতা।'

'আচ্ছা? কবে আসবে, গুরু, শুনি?'

গম্ভীর হয়ে মাথা দোলালো বিভাগীয় প্রধান। 'আগামী শতাব্দীর মাঝামাঝি। অন্তত এরমধ্যে তো এসেই যাবে।'

'তার মানে আরো পঞ্চাশ বছর পরে! মরার পরে সৌভাগ্য পাওয়ার দরকার নেই।'

সবার সাথে শিজুরুও হাসিতে যোগ দিলো। হাসতে হাসতে মাকোতোর দিকে তাকালো সে। তাদের চোখে চোখ পড়ে গেল এক মুহূর্তের জন্য। তার চোখের মধ্যে কিছু একটা বলার আকুতি দেখলো যেন শিজুরু। *নাকি আবারো অতিরিক্ত চিন্তা করছি?*

ফেয়ারওয়েল পার্টি শেষ হলো রাত নয়টা বাজে। সবাই যখন বার থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলো, শিজুরু মাকোতোকে ডাক দিলো একটু অন্য দিকে আসার জন্য। 'আপনার বিয়ের জন্য একটা গিফট এনেছি।' ব্যাগ থেকে কাগজ দিয়ে মোড়ানো একটা চিকন প্যাকেজ বের করলো সে। 'ভেবেছিলাম আজকে কাজের সময়ই দেবো, কিন্তু সময় করতে পারিনি।'

'আরে, এসবের কী দরকার ছিলো!' প্যাকেজটা খুলতে খুলতে বললো সে। ভেতরে একটা নীল রুমাল। 'অনেক ধন্যবাদ। আসলেই বিশেষ কিছু এটা।'

'গত ছয় মাসের জন্য ধন্যবাদ,' মাথাটা একটু নুইয়ে বললো শিজুরু।

'ধন্যবাদ পাওয়ার মতো কোনো কাজ করিনি। তবুও স্বাগত তোমাকে। তো এরপরে কোথায় যাচ্ছো?'

'বাড়িতে যাবো আমি। কিছু দিন রেস্ট নেবো। একটু সহজ হওয়াটা জরুরি। আগামী পরশু স্যাপোরোতে যাওয়ার জন্য রওয়ানা দেবো—ঐ যেদিন আপনার বিয়ে সেদিন।'

'ওহ,' হালকা মাথা নেড়ে বললো মাকোতো। হাতে থাকা রুমালটা কাগজের মধ্যে ভরে পকেটে ঢুকিয়ে রাখলো সে।

'আপনার বিয়ের অনুষ্ঠান তো আকাসাকার হোটেলে হবে, তাই না? ভেবেছিলাম একবার দেখার জন্য আসবো, কিন্তু মনে হচ্ছে ট্রেনে বসেই বিদায় জানাতে হবে আপনাদের।'

'এত তাড়াতাড়িই চলে যাবে?'

'হ্যাঁ, কালকে রাতে থাকার জন্য শিনাগাওয়ার এক হোটেলে উঠবো। তো আগেভাগেই চলে যাবো আমি।'

'কোন হোটেলে?'

'পার্কসাইড হোটেল।'

মনে হলো কিছু একটা বলতে চায় মাকোতো। কিন্তু এলিভেটর থেকে আসা আওয়াজ তাকে বলতে দিলো না।

'তোমাদের দুজনের এত দেরি হচ্ছে কেন? সবাই তো নিচে নেমে গেছে এরমধ্যে।'

হেসে দরজার দিকে হাঁটতে শুরু করলো মাকোতো। শিজুরুও পেছন পেছন আসতে লাগলো, যেমনটা গত ছয় মাসে চা খাওয়ার পরে সে করেছে। যেন আর কখনো করতে পারবে না এটা ভেবেই করছে কাজটা।

***

সে রাতে মাকোতো তার মায়ের কাছে মানে সেইজোতে চলে গেল। যেহেতু সে একেবারেই অন্য জায়গায় একা থাকার জন্য চলে গেছে, সেহেতু সেইজোতে এখন তার পরিবার–মা এবং নানা-নানি–থাকে। তার মায়ের পক্ষই তাদের সকল জমির মালিক। এমনকি তার বাবাও তার মায়ের পদবি 'তাকামিয়া' ব্যবহার করেছিলো।

'আর মাত্র একটা দিন,' ঘরে ঢুকতেই তার মা উচ্ছ্বাসের সাথে বলে উঠলো। 'আগামীকাল অনেক কাজ আছে আমার। চুল ঠিক করতে হবে। আর কিছু গহনা অর্ডার দিয়েছি, সেগুলো আনতে যেতে হবে। আশা করি সবাই ঠিকঠাকভাবেই সবকিছু করবে।'

একটা খবরের কাগজ বিছিয়ে আপেল ছিলছে সে। মুখোমুখি বসলো মাকোতো। ম্যাগাজিনটা পড়ার ভঙ্গিতে তাকিয়ে থেকে ঘড়ি দেখতে লাগলো।

এগারোটা বাজে নাকি, ভাবলো সে। *একটা ফোন করতে হবে ওকে।*

'মাকোতোর বিয়ে হচ্ছে,' তার নানা বলে উঠলো পাশ থেকে। সোফায় গিয়ে বসেছেন তিনি। 'তো তুমি কেন এত পোশাক পরবে তা বুঝছি না আমি।'

একটা দাবার বোর্ড তার সামনে পড়ে আছে। বাঁ হাতে তামাক খাওয়ার নল। বয়স আশির উপরে হলেও এখনো সটান হাঁটেন। গলায় এখনো সেই তেজ আছে।

'একমত হতে পারলাম না। আমার একমাত্র ছেলের বিয়ে। এই অনুষ্ঠানে ভালো ভালো পোশাক পরাই তো উচিত আমার, তাই না?'

তার মায়ের বলা শেষে 'তাই না' কথাটা তার নানুকে উদ্দেশ করে বলেছে সে। যে কি না তার নানার সামনে বসেই সেলাই করছে। একটু হাসলেন তিনি, মুখে কিছু বললেন না।

ছোটবেলা থেকেই এই দাবার বোর্ডের সামনে নানার বসে থাকা, নানুর সেলাই করা আর মায়ের এমন কথার সাথে অভ্যস্ত মাকোতো। ভালো লাগে তার এগুলো, এমনকি আজকেও লাগছে। বিয়ের দুদিন আগেও এমন কথাবার্তা খারাপ ঠেকছে না তার কাছে। বাড়িটার কোনোদিনই পরিবর্তন হবে না, এমনকি এর ভেতরে থাকা মানুষগুলোও না।

'আমার নাতির বিয়ে দেখবো–এটা ভাবতেই তো মনে হচ্ছে আমি বুড়ো হয়ে গেছি,' গম্ভীর সুরে বললো তার নানা।

'হ্যাঁ, আমার কাছেও সবকিছু কেমন যেন তাড়াতাড়ি হয়ে যাচ্ছে মনে হচ্ছে,' বলে উঠলো তার মা। 'এখনো অনেক ছোট ওরা। চারটা বছর ধরে যেহেতু কথাবার্তা বলছে, আরো কিছু দিন অপেক্ষা করলে তেমন একটা ক্ষতি হতো না মনে হয়।'

'আর এই মেয়ে, মানে ইউকিহো, মেয়েটা আসলেই ভালো। তার ব্যাপারে খুশি আমি,' তার নানু বলে উঠলো পাশ থেকে।

'হ্যাঁ, আসলেই ভালো মেয়ে। বেশ বুদ্ধিমান,' তার নানাও সায় দিলো এতে। 'আর এই বয়সেই বেশ শক্তপোক্তও আছে।'

'আমি তো তখনই পছন্দ করে ফেলেছিলাম যখন মাকোতো দেখা করতে নিয়ে এসেছিলো আমার কাছে। এরকম মেয়ে আজকাল পাওয়া যায় নাকি?' ছেলা আপেলগুলো টুকরো করতে করতে বললো তার মা।

মাকোতোর মনে পড়ে গেল সেদিনের কথা, যেদিন তার পরিবারের সাথে ইউকিহোর দেখা করিয়েছিলো সে। প্রথমেই মা তাকে পছন্দ করেছিলো তার বাহ্যিক সৌন্দর্য দেখে। এরপর যখন শুনলো তাকে অ্যাডাপ্ট করা হয়েছে, তখন তো আরো ভালো লেগে যায়। এরপর যখন জানতে পারে যে তার সেই পালক মা তাকে ভদ্রতার পাশাপাশি *চা পানের রীতি* এবং *ফুল সাজানোর রীতি*-ও শিখিয়েছেন, তারপর থেকে তো ইউকিহোর প্রতি তার ভালোলাগা বেড়েই যাচ্ছে।

দুই টুকরো আপেল খেয়ে দাঁড়িয়ে গেল মাকোতো। প্রায় এগারোটা বাজে এখন। 'উপরে যাচ্ছি আমি।'

'কালকে রাতে ইউকিহোকে নিয়ে ডিনার করবো আমরা, ভুলে যেও না আবার,' মা বললো।

'ডিনার?'

'ইউকিহো আর তার মা একটা হোটেলে উঠবে কাল। তাই ফোন করে জেনে নিয়েছি যে তারা আমাদের সাথে খাবে কি না।'

'এগুলো নিজে নিজেই সিদ্ধান্ত নিয়ে নিতে পারো না, মা,' ধরা গলায় বললো মাকোতো। নিজের গলার আওয়াজে নিজেই কিছুটা অবাক হলো সে।

'অন্য কোনো কাজ আছে তোমার? এমনিতেও তো কালকে ইউকিহোর সাথে রাতে দেখা করতে যেতে তুমি, যেতে না?'

'আচ্ছা, কখন যাচ্ছো?'

'রেস্টুরেন্টে সাতটার কথা বলে টেবিল ঠিক করে রেখেছি। ঐ হোটেলের *ফ্রেঞ্চ প্লেস* নামক জায়গাটার ভালোই নাম শুনেছি।'

নিঃশব্দে বসার ঘর থেকে চলে গেল মাকোতো। সিঁড়ি বেয়ে নিজের ঘরে চলে এলো সে। নতুন কিছু পোশাক বাদে অন্যান্য যত কিছু তার আগে ছিলো, সব এখনো এই রুমেই আছে। ডেস্কের সামনে বসলো সে, যেখানে একসময় কলেজ থেকে ফিরে বসতো। ডেস্কের উপরে থাকা ফোনটা হাতে নিলো। তার নিজস্ব লাইন এটা। এখনো কানেক্ট করে রেখেছে একে।

ফোনে থাকা নাম্বারগুলোর উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে ডায়াল করলো সে। দুইবার রিং হওয়ার পরে ফোন তুললো কাজুনারি।

'হ্যালো?' হতাশ কণ্ঠে জবাব দিলো তার বন্ধু। হয়তো ঘরে বসে ক্লাসিক কোনো গান শুনছিলো। টোকিওর একেবারে মাঝখানে ইওতসুয়াতে একাই একটা অ্যাপার্টমেন্ট নিয়ে থাকে সে।

'হেই, আমি বলছি।'

'হেই,' একটু জোর এলো কাজুনারির কণ্ঠে। 'কী খবর?'

'একটু কথা বলা যাবে?'

'বলো, শুনছি।'

'ওকে। অনেক বড় একটা কথা বলবো। আর মনে হচ্ছে শোনার পরে বেশ অবাক হতে পারো। শুধু কথা দাও উলটা-পালটা কিছু বলবে না।'

মাকোতো বুঝলো যে কাজুনারি ধরে ফেলেছে সে কী নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছে। কিন্তু তবুও ফোনের অপর পাশ থেকে কোনো শব্দ আসছে না। হিসহিস আওয়াজ শুনতে পেল মাকোতো। শব্দটা বেশ কিছু দিন ধরেই জ্বালাচ্ছে। মাঝেমধ্যে অপর পাশ থেকে কী বলছে তাও বোঝা যায় না।

'ঐ দিন যে ব্যাপারে কথা বলেছিলাম সে ব্যাপারটাই?'

'হ্যাঁ।'

'ওহে...' মাকোতো শুনতে পেল কাজুনারি হাসছে। যদিও সত্যিকার হাসির মতো মনে হলো না। 'দুই দিন পরে না তোমার বিয়ে?'

'মনে নেই তুমি কী বলেছিলে? যদি বিয়ের আগের দিনেও তোমার এমনটা মনে হতো, তবে বিয়ে ভেঙে দিতে?'

'হ্যাঁ, তা তো বলেছিলাম,' ফোনে কথা বলার জন্য যতটুকু জোর প্রয়োজন, তার থেকে একটু বেশি জোরেই শোনালো কাজুনারির কথা। 'তুমি কি সিরিয়াস?'

'হ্যাঁ,' ঢোক গিলে বললো মাকোতো। 'আগামীকাল আমার অনুভূতির কথা বলবো ওকে।'

'আর এই "ওকে" বলতে কি সেই অস্থায়ী কর্মীটাকে বোঝাচ্ছো তুমি? শিজুরু, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা, ওকে বললে তোমার অনুভূতির কথা, তারপর? প্রপোজ করবে নাকি?'

'এতটা ভাবিনি এখনো। শুধু আমার অনুভূতিটুকুই বলবো ওকে...আর সে কী ভাবে তাও জানবো। ব্যস, এটুকুই।'

'যদি তার এরকম কোনো অনুভূতিই না থাকে?'

'তাহলে অন্তত আমি জানতে তো পারবো।'

'মানে তুমি বলছো, ও ফিরিয়ে দিলে তুমি তার পরের দিন গিয়ে ইউকিহোকে বিয়ে করবে। ভান করবে যেন কিছুই হয়নি?'

'জানি, এতটা বাজে কাজ কোনোদিনও করিনি আমি।'

'আরে নাহ,' বললো কাজুনারি। 'আমার মনে হয় যা করা উচিত মনে করছো, তাই করা উচিত তোমার। আর এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটা তা হলো, কোনো রকম অনুশোচনা রাখা যাবে না।'

'তোমার কথা শুনে ভালো লাগলো।'

'কিন্তু সমস্যা তো আরেক জায়গায়,' বলে চললো কাজুনারি। 'যদি শিজুরু বলে যে তোমাকে সে পছন্দ করে, তবে তো সমস্যা হয়ে যাবে।'

'আসলে–'

'ভালোমতো ভাবো। সবকিছু এক ধাক্কায় সরিয়ে দিতে পারবে?'

'পারবো।'

অপর পাশ থেকে লম্বা শ্বাস নেওয়ার শব্দ শুনলো মাকোতো।

'যত সহজে বলছো, তার থেকেও অনেক কঠিন এটা, মাকোতো। অনেকগুলো মানুষকে নরকের ভেতর ছুঁড়ে দিচ্ছো তুমি, আর এদের মধ্যে অনেকেই চরম কষ্ট পাবে এতে। সবচেয়ে বেশি পাবে ইউকিহো।'

'ওকেও বোঝাবো দরকার হলে। যা কিছু করা লাগে তাই করবো আমি।'

দুজনেই কিছুক্ষণের জন্য চুপ করে রইলো। শুধু ফোনের হিসহিস শব্দটা বেজে যেতে লাগলো অনবরত।

'তো মনে হচ্ছে তুমি তোমার সিদ্ধান্ত ঠিক করে নিয়েছ। এখানে আর আমার কিছু বলার নেই।'

'তোমাকে এরমধ্যে জড়িয়ে ফেলার জন্য দুঃখিত।'

'আমাকে নিয়ে ভাবতে হবে না। আমি শুধু কালকের পরের দিনটার কথা ভাবছি। কী হবে সেদিন তা ভাবতেই গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে আমার।'

'আমি নিজেও কিছুটা নার্ভাস এটা নিয়ে।'

'আমিও নিশ্চিত যে তুমি নার্ভাস।'

'আচ্ছা, এই ব্যাপারে আরেকটা উপকার তোমাকে করতে হবে। কাল রাতে ফ্রি আছো?'

***

যেই দিনটাতে ওর ভাগ্য ঠিক হবে, সেই দিনটা শুরুই হলো মেঘ দিয়ে। সকালের নাস্তা সেরে নিজের রুমে গিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলো মাকোতো। রাতে ভালো ঘুম হয়নি তার, যার কারণে মাথাটা ভার ভার লাগছে। রাত থেকেই মাথার মধ্যে শিজুরুর সাথে দেখা করার জন্য অস্থির সব চিন্তাভাবনা চলছে মাকোতোর। ও জানে যে আজকের রাতটা শিনাগাওয়ার কোনো হোটেলে কাটাবে শিজুরু। রাতের বেলা দেখা হলে তো ভালোই, কিন্তু সে চাচ্ছিলো দিনের বেলায় একটু বলে রাখতে ওকে। বা একটু হোটেলের বাইরে যদি দেখা করা যায়। যদিও এখন পর্যন্ত কখনোই অফিসের বাইরে তার সাথে দেখা হয়নি মাকোতোর। যার কারণে কোথায় থাকে তা জানে না, বা কোনো ফোন নাম্বারও তার কাছে নেই। কোনো কোম্পানিই অস্থায়ী কর্মচারীদের এসব তথ্য রাখে না। হয়তো শিজুরুর বিভাগীয় প্রধান জেনে থাকতে পারে, কিন্তু তাকে কীভাবে জিজ্ঞেস করবে বা কী বলে জানতে চাইবে তা বুঝতে পারছে না সে। তার উপর শনিবার আজকে। বাড়িতে ফোন করেও ওকে পাওয়া যাবে না।

একটা রাস্তাই খোলা আছে তার জন্য। তার নিজের একবার অফিসে গিয়ে খোঁজ করতে হবে। শনিবার যেহেতু, তাই প্রচুর লোক থাকবে অফিসে। আর তার দিকে দ্বিতীয়বার তাকানোর সুযোগ থাকবে না কারো।

উঠে দাঁড়ালো মাকোতো, যাওয়ার জন্য রওয়ানা দেবে, এমন সময় বেল বাজলো ঘরের। একটা পূর্ব শঙ্কা মনের মধ্যে দোলা দিয়ে গেল তার। এরপর পায়ের শব্দ শুনতেই ভয়টা বাস্তবে রূপ নিলো। তার মা আসছে সিঁড়ি বেয়ে।

'মাকোতো,' দরজার ওপাশ থেকে তার মায়ের গলা শুনলো সে। 'ইউকিহো এসেছে।'

'আসছি আমি।'

বসার ঘরেই বসে আছে ইউকিহোকে। তার নানা-নানুর সাথে বসে চা খাচ্ছে। গাঢ় বাদামি রঙের একটা ড্রেস পরেছে সে।

'ইউকিহো কিছু কেক এনেছে। খাবে তুমি?' জিজ্ঞেস করলো তার মা। বেশ আনন্দিত দেখাচ্ছে তাকে এই মুহূর্তে।

'না, থাক। কী অবস্থা তোমার?' ইউকিহোর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলো মাকোতো।

'হানিমুনের জন্য কিছু জিনিস কিনতে হবে আমার। ভাবছিলাম আমার সাথে একটু আসবে কি না,' উৎফুল্ল কণ্ঠে বললো ইউকিহো। চোখদুটো আনন্দে দুলে উঠলো কিছুটা। সত্যি সত্যি বউয়ের মতো লাগছে তাকে এখন, আর এই বিষয়টা ভাবতেই বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠলো মাকোতোর।

'উমম, আসলে, আ...আমার একটু অফিসে যাওয়া দরকার ছিলো।'

'অফিস? আজকে?' ভ্রু তুলে বললো তার মা। কপালের চামড়ায় ভাঁজ পড়ে গেছে তার। 'বিশ্বাস করতে পারছি না বিয়ের এক দিন আগেও তোমাকে দিয়ে কাজ করাচ্ছে ওরা।'

'আসলে কাজের জন্য না। একটা বিষয়ে একটু নজর বোলানো লাগবে আমার।'

'যাওয়ার পথে যেতে পারি আমরা,' বললো ইউকিহো। 'তুমি না বলেছিলে সপ্তাহের ছুটির দিনে বাইরের মানুষ যেতে পারে অফিসে?'

'হ্যাঁ, তা যাওয়া যায়, কিন্তু–' ভেতরে ভেতরে ঘাবড়ে যাচ্ছে মাকোতো। একসাথে যাওয়ার কথা শুনে বেশ অবাকই হয়েছে সে।

'সব সময় শুধু কাজ আর কাজ,' বলে উঠলো তার মা। 'কোন জিনিসটা গুরুত্বপূর্ণ তোমার কাছে, কাজ না পরিবার?'

'হয়েছে, হয়েছে, ততটা গুরুত্বপূর্ণ কিছু না। আজকে যাবো না আর।'

'আমার সমস্যা নেই একসাথে যেতে,' বললো ইউকিহো।

'না, না, ঠিক আছে,' হাসলো মাকোতো। মনে মনে ভাবলো শিজুরুর কাছে কনফেশনটা হয়তো রাতেই হোটেলে করতে হবে ।

কাপড় পরিবর্তন করার নাম করে নিজের রুমে চলে গেল সে। একটা জ্যাকেট পরে ফোন হাতে নিলো। এরপর ডায়াল করলো কাজুনারির ফোনে। ওপাশ থেকে কাজুনারি ফোন ধরতেই তড়িঘড়ি করে বললো, 'আমি বলছি। মনে আছে না আমাদের ব্যাকআপ প্ল্যানের কথা? ঐ যেটা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম।'

'তার মানে কোনো রকম তথ্য খুঁজে পাওনি, না?'

'দুর্ভাগ্যবশত, না। আর এখন আবার ইউকিহোর সাথে শপিংয়ে যেতে হবে আমাকে।'

ওপাশ থেকে কাজুনারির দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনলো মাকোতো।

'খুবই দুঃখিত, এরকম একটা পরিস্থিতির মধ্যে তোমাকে ফেলার জন্য।'

'আরে না, না, ওসব কিছু না। ঠিক আছি আমি। নয়টা বাজে দেখা হচ্ছে তবে।'

'তাহলে ঐ কথাই রইলো।'

কাপড় পালটে নিয়ে দরজা খুলে দেখলো ইউকিহো দাঁড়িয়ে আছে হলওয়েতে। হাত পেছনে দিয়ে দেয়ালের সাথে ঠেস দিয়ে আছে। কৌতূহলী একটা হাসি উপহার দিলো মাকোতোর দিকে তাকিয়ে।

'এত দেরি কেন লাগছে তা দেখতে এসেছিলাম,' বললো ইউকিহো।

'সরি, কোন কাপড়টা পরবো তা নিয়ে একটু দ্বিধায় পড়ে গেছিলাম। যাওয়া যাক?' পাশ দিয়ে সিঁড়ি পর্যন্ত গিয়ে বললো মাকোতো।

'কীসের ব্যাকআপ প্লানের কথা বলছিলে?'

প্রায় সিঁড়ি থেকে পড়েই যাচ্ছিলো মাকোতো। 'ওহ, শুনে ফেলেছ তবে তুমি?'

'এখানে দাঁড়িয়েই শুনতে পেলাম।'

'আরে ও কিছু না। কাজের কথা বলছিলাম একটু,' সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বললো সে। কিছুটা ভয় পেল পরের প্রশ্ন কী হতে পারে ভেবে, কিন্তু এরপর আর কোনো প্রশ্ন এলো না তার কাছ থেকে।

গিনজায় শপিংয়ের জন্য গেল তারা। বেশ নামি-দামি ডিপার্টমেন্ট স্টোর এবং বুটিক শপ রয়েছে এখানে।

ইউকিহো বলেছিলো যে তার ট্রাভেলের জন্য কিছু জিনিস লাগবে। কিন্তু মাকোতোর কাছে মনে হচ্ছে না এমন কোনো ইঙ্গিত ইউকিহোর মধ্যে আছে। বিষয়টা পরিষ্কার করতেই ইউকিহো একটু হেসে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো, 'সত্যি বলতে, একসাথে একটু সময় কাটাতে চাচ্ছিলাম আমি। মানে বুঝতেই পারছো বিয়ের আগে শেষ ডেট এটা। কোনো সমস্যা নেই তাতে, কী বলো?'

লম্বা শ্বাস ছাড়লো মাকোতো। একটা সমস্যা যে আছে তা বলতেও পারছে না সে। দোকানের এপাশ থেকে ইউকিহোর দিকে তাকালো মাকোতো, গত চার বছরের কথা ভাবলো একবার। এটা সত্য যে এই চার বছরে সে তার সাথে থেকেছে কারণ তাকে সে ভালোবেসেছে। কিন্তু তাকে বিয়ে করার জন্য কোনো নির্দিষ্ট কারণ ওর কাছে নেই। এটা কি কোনো মিথ্যা আবেগ ছিলো তবে?

ভালোভাবে ভাবলো মাকোতো; নাহ, এটা এরকম কোনো বিষয় না আসলে। কারণ দুই বছর আগেই বিয়ের কিথা ভেবেছিলো সে।

একদিন সকালবেলা ইউকিহো ছোট কোনো হোটেল থেকে তাকে ফোন করে। যখন সে ওখানে গিয়ে পৌঁছায়, তখন দেখে যে ইউকিহো সেখানে বসে আছে। তার চেহারায় গাম্ভীর্যের ছাপ।

'কী সমস্যা?' জিজ্ঞেস করেছিলো সে। 'আর এরকম একটা জায়গায় কেন থাকছো তুমি?'

হোটেলের রুমে নিয়ে গিয়ে টেবিলের উপরে থাকা বস্তুটির দিকে ইশারা করলো সে। অর্ধেক সিগারেটের সমান একটা টিউব পড়ে আছে সেখানে। কোনো তরল পদার্থ দিয়ে হালকা ভরা ওটা। 'ধোরো না আবার ওটা, উপর থেকেই দেখো,' বললো সে।

মাকোতো তাকিয়ে দেখলো টিউবের নিচে দুটো লালরঙা গোল দাগ রয়েছে। ওটা ইউকিহোর কাছে বলতেই একটা কাগজ ঝড়ের বেগে তার দিকে এগিয়ে দেয় ইউকিহো।

প্রেগন্যান্সি টেস্টের টিউব ছিলো ওটা। দুটো দাগ মানে পজিটিভ।

‘এটায় বলা আছে যে সকালে ঘুম থেকে উঠার পর প্রথম প্রস্রাবের থেকে কয়েক ফোঁটা নিয়ে টেস্ট করতে। আর এজন্যই এখানে, এই হোটেলে থেকেছি আমি যাতে তোমাকে দেখাতে পারি।’

কিন্তু এরপরে ইউকিহো যা বললো তাতে কিছুটা ভ্রু কুঁচকে গেল ওর। সে বললো, ‘চিন্তার কিছু নেই। আমি বাচ্চা নেওয়ার জন্য আবদার করবো না। আর আমি নিজেই হাসপাতালে যেতে পারবো।’

‘নিশ্চিত তুমি?’

‘অবশ্যই। বাচ্চা নেওয়ার মতো অবস্থায় নেই এখন আমরা।’

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলো সেদিন মাকোতো। এর আগে কখনোই বাবা হওয়ার অনুভূতি টের পায়নি সে। আর টের পাওয়ার সাথে সাথেই বুঝেছিলো, এর জন্য আসলেই প্রস্তুত না সে।

তার কথামতোই ইউকিহো নিজে নিজে হাসপাতালে গিয়ে অ্যাবোরশন করিয়েছিলো। কাউকেই বলেনি কিছু। সপ্তাহখানিকের মতো দেখা মেলেনি তার। এরপরে যখন দেখলো, তখন সেই আগের ইউকিহোই ছিলো তার সামনে। আর কখনোই ওটা নিয়ে কথা বলেনি সে। দুয়েকবার মাকোতো নিজ থেকে এ নিয়ে কথা বলতে চেয়েছিলো, কিন্তু যখনই ইউকিহো টের পেত যে এরকম কিছু বলতে যাচ্ছে মাকোতো, তখনই মাথা ঝাঁকিয়ে না করে দিতো।

‘আরে ঠিক আছে। এটা নিয়ে আমাদের কথা বলার দরকার নেই কোনো।’

আর এই বিষয়টার পরপরই বিয়ের চিন্তাভাবনা ঘুরতে থাকে মাকোতোর মাথায়। যেহেতু একবার সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, সেহেতু আরো দুয়েকবার যে হবে না এর কোনো নিশ্চয়তা নেই। একজন পুরুষ হিসেবে মেয়েটার পুরো দায়িত্ব নেওয়ার চিন্তা করতে থাকে সে। সেই সময়ে বিষয়টা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঠেকেছিলো। কিন্তু এখন...এখন তার মনে হচ্ছে সম্পূর্ণ ভুল কারণে এত বড় একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো কি না।

***

কফি খেতে খেতে ঘড়ির দিকে তাকাতে লাগলো মাকোতো। নয়টার কিছু বেশি বাজে।

দুটো পরিবার–তার আর ইউকিহোর–সেই সাতটা থেকে খেয়ে চলেছে। যদিও বেশিরভাগ সময় কেটেছে তার মায়ের বলা কথাবার্তায়। ইউকিহোর পালক মা রেইকো কারাশাওয়া দারুণ একজন মানুষ–ভদ্র এবং বেশ বিচক্ষণ। স্মিত হেসে সব কথা শুনেছেন। মাকোতোকে বিষয়টা আরো বেশি পীড়া দিচ্ছিলো এটা ভেবে যে আগামীকাল সকালের মধ্যেই সে এই হাসি মুছে যাওয়ার কারণ হবে।

নয়টা পনেরোর দিকে রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে গেল সবাই। তার মা বললো, ‘এখনো তো অল্প রাত। সবাই মিলে একটু বারে গিয়ে আড্ডা দিলে কেমন হয়?’

মাকোতো জানতো তার মা খাওয়ার পর এটাই বলবে। 'আজকে প্রচুর ভিড় থাকবে বারগুলোতে,' বললো সে। 'তার চেয়ে ভালো প্রথম তলায় থাকা লাউঞ্জে যাই চলো।'

ইউকিহোর মা-ও এতে রাজি হলো। ভদ্রমহিলা বললেন যে তিনি ততটা মদ্যপান করেন না।

লিফটে উঠে প্রথম তলায় নেমে লাউঞ্জের দিকে যেতে থাকলো তারা। আবার ঘড়ি দেখলো মাকোতো। নয়টা বিশ।

লাউঞ্জের দিকে যাচ্ছিলো, এমন সময় পেছন থেকে *মাকোতো* বলে কেউ একজন ডাক দিলো। পেছন ফিরতেই দেখলো কাজুনারি এগিয়ে আসছে তার দিকে।

'হেই!' অবাক স্বরে বললো মাকোতো।

কাজুনারি কাছে এসে ওর কাঁধে আলতো বাড়ি দিলো। ফিসফিস করে বললো, 'বেশ দেরি করে ফেলেছ তুমি। আমি আরো ভাবলাম পরিকল্পনা বাদ দিয়েছ।'

'আরে ডিনারের কারণে ফেঁসে গেছি,' নিচু স্বরে পালটা জবাব দিলো মাকোতোও।

নিজেদের মধ্যে আরো কিছু বিষয় নিয়ে কথাবার্তা বলে ইউকিহো আর অন্যান্যদের কাছে গেল তারা। 'এই পাশেই এইমেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ছেলেপেলে এসেছে,' বলে উঠলো মাকোতো। 'আমি একটু দেখা করে আসি, কেমন?'

'যেতেই হবে তোমার? এরমধ্যেও? মানে আজকে রাতটাও একটু থাকতে পারছো না?' তার মায়ের চোখেমুখে নিরানন্দের ছাপ স্পষ্ট।

রেইকো এগিয়ে এলেন এ সময়ে। 'কী হবে গেলে? বন্ধুদের সাথে থাকাটাও গুরুত্বপূর্ণ ছেলেদের জন্য।'

তার দিকে তাকিয়ে হাসলো মাকোতো।

'বেশি দেরি কোরো না তবে,' ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বললো ইউকিহো।

লাউঞ্জ থেকে বাইরে বেরিয়েই হোটেল ছেড়ে পালালো মাকোতো। বাইরে কাজুনারির পোরশে দাঁড় করিয়ে রাখা ছিলো। সেটাতে উঠেই দ্রুত গতিতে ছুটতে লাগলো তারা।

'যদি আজকে গতি বাড়ানোর কোনো মামলা খাই, তবে তুমি দেবে সেটা,' গাড়ির গতি বাড়াতে বাড়াতেই বললো কাজুনারি।

শিনাগাওয়া স্টেশন থেকে পাঁচ মিনিট হাঁটা দূরত্বে পার্কসাইড হোটেল। দশটা বাজার কিছু আগেই গাড়ির সামনের সিট থেকে লাফিয়ে নামলো মাকোতো। সরাসরি ডেস্কের সামনে গিয়ে শিজুরু মিসাওয়া নামের কোনো মেয়ে হোটেলে উঠেছে কি না তা জানতে চাইলো। চুল পরিপাটি করে রাখা এক লোক বললো যে

তার আসার কথা ছিলো। 'কিন্তু,' আরো যোগ করলো সে, 'এখনো চেক-ইন করেননি তিনি।'

লোকটাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ডেস্কের সামনে থেকে সরে গেল মাকোতো। আশেপাশে তাকিয়ে একটা সোফা নজরে পড়তেই এগিয়ে গিয়ে বসলো সেটায়।

'যেকোনো সময় চলে আসবে সে,' ফিসফিস করে নিজেই নিজের কাছে বললো মাকোতো। আর ভাবতেই হৃৎপিণ্ড যেন আবার ধুকপুক করতে শুরু করলো।

***

দশটা বেজে দশ মিনিটের সময় শিনাগাওয়া স্টেশনে এসে পৌঁছালো শিজুরু। যতটা তাড়াতাড়ি প্যাক করে বাড়ি থেকে বেরোবে ভেবেছিলো, ততটা তাড়াতাড়ি হয়নি। পথচারী পারাপারের অংশ দিয়ে রাস্তা পার হলো সে। এরপর হোটেলের দিকে হাঁটা শুরু করলো।

পার্কসাইড হোটেলের মূল ফটকটা রাস্তার পাশেই বানানো হয়েছে। কিন্তু ভেতরে যেতে হলে একটা বাগান পেরিয়ে যেতে হয়। ভারী ব্যাগ হাতে নিয়ে একটু দম নিলো শিজুরু। বাগানের ভেতরে থাকা ছোট ছোট বাতিগুলো বেশ সুন্দর করে জ্বলছে, কিন্তু তার এখন সেদিকে মন দেওয়ার মতো কোনো ইচ্ছাই নেই।

বাগানের পরেই অনেকগুলো ট্যাক্সি একটার পর একটা দাঁড়িয়ে আছে। অতিথিদের নামিয়ে দিচ্ছে। শিজুরু দেখলো প্রায় সব মানুষই হোটেলে গাড়ি কিংবা ট্যাক্সিতে করে এসেছে। তার মতো পথচারীর দিকে এমনকি কোনো দারোয়ানও তাকানোর চেষ্টা করছে না।

আর এ কারণেই যখন সে কারো গলায় 'এক্সকিউজ মি, মিস?' শুনতে পেল, তখন অবাক না হয়ে পারলো না। লবিতে ঢোকার সময় পেছন থেকে ডাকলো কেউ একজন।

পেছনে ফিরতেই দেখলো কালো স্যুট পরা এক তরুণ দাঁড়িয়ে আছে। 'দুঃখিত, আপনি কি চেক-ইন করতে ঢুকছেন?' জিজ্ঞেস করলো লোকটা।

'হ্যাঁ,' শুষ্ক গলায় জবাব দিলো সে।

'আসলে আমি পুলিশের লোক,' পকেট থেকে ব্যাজ দেখিয়ে বললো সে। 'ভাবছিলাম, যদি একটু কথা বলতে পারতাম আপনার সাথে। আসলে একটা অনুরোধ আছে আর কি।'

'আমার কাছে?' চোয়াল ঝুলে গেছে শিজুরুর।

লোকটা তার পেছনে পেছনে বাগানের দিকে যাওয়ার ইশারা করলো। শিজুরুও পেছন পেছন যেতে লাগলো তার।

'এখানে কি একাই থাকবেন আজ রাতে?' জিজ্ঞেস করলো লোকটা।

'হ্যাঁ, কেন বলুন তো?'

'আসলে ভাবছিলাম...আপনার জন্য কি এই হোটেলটায় রাতে থাকাটা বেশিই প্রয়োজন?'

'হ্যাঁ, এখানে আগে থেকে সব ঠিক করে রেখেছিলাম আমি। আর সকাল সকাল আমাকে ট্রেন ধরতে হবে। তাই স্টেশনের পাশেই রাতে থাকতে হবে আমাকে।'

'তা ঠিক, তা ঠিক। তা যদি আমি আপনাকে এই হোটেলের পাশের একটা হোটেলে রুম ঠিক করে দিই, তবে কি তাতে কাজ হবে? ওটাও স্টেশনের কাছাকাছি।'

'এখনো বুঝতে পারছি না কেন আপনি এসব বলছেন।'

'আসলে আমরা একটা লোককে সন্দেহ করছি যে এই হোটেলে রাতে থাকবে। আমাদেরকে একটু চোখে চোখে রাখতে হবে তাকে। কিন্তু সমস্যা হলো, বড় একটা গ্রুপ এই মাত্র চেক-ইন করলো, যার কারণে আমাদের দেওয়ার মতো কোনো ফাঁকা রুম নেই ওদের কাছে।'

'তার মানে আমার রুম লাগবে আপনাদের?'

'জি, ঠিক ধরেছেন,' বললো লোকটা। 'চেক-ইন করা কোনো কাস্টমারের সাথে আমরা কথা বলতে পারবো না। আর আমরা চাচ্ছিও না যাকে সন্দেহ করছি সে বিষয়টা কোনো না কোনোভাবে জেনে যাক।'

'ওহ, বুঝতে পেরেছি,' লোকটার দিকে তাকিয়ে বললো শিজুরু। বেশ অল্পবয়সি লাগছে লোকটাকে। *হয়তো নতুন ঢুকেছে কাজে।* কিন্তু পোশাক-পরিচ্ছদ বেশ গোছানো। আর কেন যেন শিজুরুর মনে হলো এই অনুরোধটার জন্য বেশ সিরিয়াস সে।

'যদি আপনি রাজি হন তো আমরা আপনাকে হোটেলে থাকার খরচ দেবো, সেইসাথে এখান থেকে হোটেলে যাওয়ার জন্য সাহায্যও করবো,' বললো লোকটা।

শিজুরুর হঠাৎ মনে হলো কথাগুলো ওসাকার ভাষায় বলতে শুনলো সে।

'এই হোটেলের পেছনে? মানে কুইন হোটেলে?' জিজ্ঞেস করলো শিজুরু। অন্তুতপক্ষে পার্কসাইড হোটেল থেকে এক স্টার বেশি র‍্যাংক ঐ হোটেলের।

'হ্যাঁ, চল্লিশ হাজার ইয়েনের একটা রুম বুক করা আছে সেখানে,' বললো লোকটা।

এরকম কোনো রুম জীবনেও দেখতে পাবো কি না সন্দেহ, ভাবলো শিজুরু। ভেবে নিয়েছে সে। 'তো এখানে অপেক্ষা করছি কেন তবে?'

'অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। দিন, ওসব আমি নিচ্ছি,' শিজুরুর হাতে থাকা লাগেজটার দিকে হাত বাড়িয়ে বললো সে।

***

সাড়ে দশটার উপরে বাজে, কিন্তু শিজুরুর দেখা নেই। কারো ফেলে যাওয়া একটা পত্রিকা নিয়ে মুখ গুঁজে বসে ছিলো মাকোতো। চোখ পড়ে রয়েছে ডেস্কের দিকে। শিজুরুর মুখ দেখার আকুতি তার কাছে কনফেশন করার ইচ্ছাটাকে মাটি করে দিয়েছে। আধা ঘণ্টার উপরে হবে সে এখানে এসেছে, আর এখনো তার হৃৎপিণ্ড লাফাচ্ছে আগের মতো।

একটা মেয়েকে ডেস্কের দিকে যেতে দেখেই ধক করে উঠলো তার বুক। এরপরে মুখ দেখে মেঝের দিকে চোখ ফিরিয়ে নিলো সে।

'আচ্ছা, আমি আগে থেকে রিজার্ভ করে রাখিনি, কিন্তু আপনাদের কাছে কি কোনো রুম ফাঁকা আছে এখন?' ওপাশ থেকে ভেসে আসা কথাগুলো শুনলো মাকোতো।

'আপনি একাই?' লোকটাকে বলতে শুনলো সে।

'হ্যাঁ, দেখুন না একটু, প্লিজ।'

'একটা সিঙ্গেল রুম হলে হবে?'

'চলবে, চলবে।'

'আচ্ছা, আমাদের কাছে বারো হাজার ইয়েনের স্ট্যান্ডার্ড রুম আছে। পুলের পাশের রুম পনেরো হাজার ইয়েন, আর সুন্দর আকাশের ভিউ দেখতে চাইলে আঠারো হাজার ইয়েন। কোনটা নিতে চাচ্ছেন?'

'স্ট্যান্ডার্ড রুমটা।'

এরপর আর শুনতে ইচ্ছা করলো না মাকোতোর। একবার দরজার দিকে তাকিয়ে আবার পত্রিকায় ফেরালো চোখ। পড়ছে ঠিকই, কিন্তু মন পড়ে রয়েছে অন্য কোথাও। হঠাৎ একটা আর্টিকেল চোখে পড়তেই কিছুটা আগ্রহ বোধ করতে শুরু করলো সে: আর্টিকেলটা ছিলো জাপানিজ কমিউনিস্ট পার্টির এক নেতার ফোনালাপ পুলিশ রেকর্ড করেছে তা নিয়ে। বিষয়টা গোপনীয়তা লঙ্ঘন করায় বেশ বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। রাজনৈতিক আলাপ মাকোতোকে টানে না, কিন্তু যে বিষয়টাতে তার টনক নড়লো তা হলো এই ফোনালাপে আড়ি পাতার ঘটনা লোকে জানলো কী করে।

খবরে বলা হয়েছে, যার ফোনলাপ ফাঁস করা হয়েছে সে টেলিফোন কোম্পানিতে যোগাযোগ করে বলেছিলো যে তার ফোনের ভেতর অস্বাভাবিক শব্দ হচ্ছিলো অনেক দিন ধরে। মাঝে মাঝে এমন শব্দ হতো যে অপর পাশ থেকে কী বলছে তাই শোনা যেত না।

আমার বাসার ফোনটা আবার কেউ রেকর্ড করে না বসে, ভাবলো মাকোতো। নিজে নিজেই কিছুটা হেসে উঠলো এতে। যদিও লক্ষণগুলো মিলে যাচ্ছে, কিন্তু তার ফোনে আড়ি পেতে কে-ই বা কী পাবে।

পত্রিকাটা ভাঁজ করে রাখতেই ডেস্কে থাকা লোকটা এগিয়ে এলো তার দিকে।

'আপনি কি মিস মাসাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলেন?' জিজ্ঞেস করলো সে।

'জি?' অর্ধেক দাঁড়ানো অবস্থায় বলে উঠলো মাকোতো।

'একটা ফোন পেয়েছি আমরা। তার রিজার্ভেশন বাতিল করে দিয়েছেন তিনি।'

'কী?' মাকোতো টের পেল তার চামড়া লাল হয়ে উঠছে। 'কোথায় আছে সে?'

'কিন্তু ভদ্রলোক তো সে বিষয়ে কিছু বললো না,' মাথা ঝাঁকিয়ে বললো ডেস্কের লোকটা।

'ভদ্রলোক?'

'জি, স্যার।' মাথা নাড়লো সে।

দরজার দিকে হাঁটা শুরু করলো মাকোতো। সে জানে না কী করবে এখন, তবে এটা পরিষ্কার যে এখানে বসে থেকে কোনো লাভ হবে না। হোটেল থেকে বেরিয়ে প্রথমে থাকা ট্যাক্সিটাতে চেপে বসলো সে।

সেইজোতে যাওয়ার জন্য বললো ট্যাক্সিওয়ালাকে। হঠাৎ হাসতে শুরু করলো মাকোতো। *পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে এটা আমার কপালেই নেই*, ভাবলো সে। হয়তো আগেভাগেই ট্রেনে চেপে বসেছে সে। হয়তো যে লোকটা তার হয়ে ফোন করেছিলো সে শিজুরুর বাগদত্তা নয়তো প্রেমিক। হয়তো প্রথম থেকেই মাকোতোর কোনো সুযোগ ছিলো না। কিন্তু যা হয়েছে তাকে অকস্মাৎ কিছু ঘটার চাইতেও বড় মনে হলো তার কাছে। মনে হচ্ছে এটাই বুঝি হওয়ার ছিলো। হয়তো আধ্যাত্মিকভাবেই হয়ে গেছে।

কিন্তু আগের কথা চিন্তা করলে দেখা যায় যে শিজুরু আর তাকে আলাদা করার জন্য কোনো আধ্যাত্মিক ক্ষমতার দরকার ছিলো না। হাজারবার তার মনের কথা বলে দেওয়ার সুযোগ পেয়েছিলো সে, কিন্তু তবুও বলতে পারেনি।

পকেট থেকে রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছলো সে। ফের পকেটে ভরার সময় একবার দেখলো ওটার দিকে। সেই নীল রুমালটা যেটা শিজুরু তাকে দিয়েছিলো সেদিন। এরপরে চোখ বন্ধ করে একবার ভাবলো আগামীকাল রিসিপশনে কী কী করতে হবে সে ব্যাপারে। যখন ট্যাক্সি ড্রাইভার তাকে ঘুম থেকে তুলে দিলো, তখন সে দেখলো গাড়িটা তার বাড়ির বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে।

অধ্যায় আট

দোকান বন্ধ হওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে দুজন ক্রেতা এলো। বেঁটে লোকটার বয়স আনুমানিক পঞ্চাশের কাছাকাছি। আর সাথে হ্যাংলা-পাতলা হাই স্কুল পড়ুয়া একটা ছেলে। *বাবা আর ছেলে হয়তো*, প্রথমেই এই চিন্তাটা মাথায় এলো তোমোহিকোর। ছেলেটাকে আগেও দেখেছে সে। আগেও কয়েকবার দোকানে এসেছিলো। কোনো কিছু জিজ্ঞেস করতো না, কিনতোও না। ফ্যালফ্যাল করে কম্পিউটারের দিকে তাকিয়ে থেকে বাড়িতে চলে যেত। তার মতো আরো কয়েকজন আছে, যারা আসে কেবল চোখভরে যন্ত্রটাকে দেখার জন্য। নিয়ম অনুযায়ী, ওদের সাথে কোনো রকম কথা বলা নিষিদ্ধ, আর সে-ও চায় না ওদেরকে তাড়িয়ে দিতে। 'যখন ইচ্ছা তখনই উইন্ডো-শপে আসতে পারবে তারা,' রিও বলে সব সময়। 'কারণ যখনই বেতনের চেক একাউন্টে ঢুকবে, অথবা বাচ্চারা ভালো রেজাল্ট করার পরে বাবা-মায়েরা তাদের কিছু কিনে দিতে চাইবে, তখনই এখানে ছুটে আসবে তারা।'

দোকানের ম্যানেজার হলো রিও। যদি সে খুশি থাকে, তোমোহিকোও খুশি।

ছেলেটার বাবাকে সাজিয়ে রাখা কম্পিউটারগুলোর দিকে তাকাতে দেখলো তোমোহিকো। ওটার দিকে ছেলেটা এর আগেও তাকাতো প্রায়। এপাশ-ওপাশ থেকে ঘুরে ঘুরে দেখছে তারা। ফিসফিস করে কী কী যেন বলছে নিজেদের মধ্যে। সবকিছু দেখা হয়ে গেলে দামের দিকে নজর দিলো ভদ্রলোক। 'আরে বাপরে!' শান্ত দোকানটায় তার গলার আওয়াজে গমগম করে উঠলো যেন। অন্য দিকে ছেলেটা তাকে বেরিয়ে যাওয়া থেকে আটকাতে চেষ্টা করছে, আরো কম দামের মধ্যে পাওয়া যাবে বলে।

তোমোহিকো স্ক্রিনের দিকে চোখ ফিরিয়ে নিলো; কেন যেন আর আগ্রহ পাচ্ছে না দেখার, তাই। কিন্তু তবুও চোখের এককোনা দিয়ে হালকা খেয়াল করছিলো তাদের কর্মকাণ্ড। ছেলের বাবা কম্পিউটার আর বিভিন্ন পেরিফেরাল ডিভাইস ঘুরে ঘুরে দেখছে, তাকানোর ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে যেন বিদেশি কোনো দেশের ভূমির দিকে তাকিয়ে আছে। সাধারণ পোশাক পরে আছে লোকটা– গলা-ঢাকা সোয়েটারের উপরে একটা কার্ডিগান। কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে কোনো কোম্পানিতে কাজ করে। হয়তো শিল্প-কারখানার মধ্যবর্তী কোনো পদে আছে সে, ভেবে নিলো তোমোহিকো।

হিরোয়ে নাকাজিমা যন্ত্রাংশের শিপমেন্টগুলো পরীক্ষা করছিলো, ওখান থেকে মুখ তুলে তাকালো তোমোহিকোর দিকে। চোখের ভাষায় যেন বলতে চাইছে, *যাও, গিয়ে কথা বলে এসো।*

ভঙ্গিটা বুঝতে পেরে মাথা নাড়লো তোমোহিকো। *জানি, জানি, বলতে হবে না।*

ঠিক সময়ের জন্য অপেক্ষা করছিলো সে। এরপরই হেসে জিজ্ঞেস করলো, 'আমি কি আপনাদেরকে কোনো রকম সাহায্য করতে পারি?' কণ্ঠে আকুলতা।

ছেলেটার বাবা তাকালো তার দিকে। ভদ্রলোকের চোখে স্বস্তির আভা দেখলো যেন তোমোহিকো। অন্যদিকে, ছেলেটা সফটওয়্যার থাকা শেলফটার দিকে চোখ ফিরিয়ে নিলো।

ছেলেটা ততটা সামাজিক না।

'আসলে আমার ছেলে একটা কম্পিউটারের কথা বলছে,' মৃদু হেসে বলে উঠলেন ভদ্রলোক। 'কিন্তু সত্যি বলতে, আমি বুঝতেই পারছি না কী দেখবো।'

'আপনি কি জানেন সে কী জন্য ব্যবহার করতে চাচ্ছে আসলে?' ছেলেটার দিকে একটু তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো তোমোহিকো।

'কী জন্যে ব্যবহার করতে চাচ্ছো তুমি?' জিজ্ঞেস করলেন ভদ্রলোক।

'ওয়ার্ড প্রসেসিং, ম্যাসেজ বোর্ডস–এরকম কাজগুলো করার জন্য,' মেঝের দিকে তাকিয়ে জবাব দিলো ছেলেটা।

'কোনো গেম?' ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করলো তোমোহিকো।

ছেলেটা খুব ছোট্ট করে মাথা নাড়লো। একদমই বোঝা যায় না এমনভাবে।

'আচ্ছা...' তোমোহিকো এবার ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে বললো। 'আপনার বাজেট কত?'

'ভাবছিলাম এক লাখের মধ্যে কিছু পাবো কি না।'

'এক লাখের মধ্যে কিছুই পাবে না, বলেছি আমি তোমাকে,' ছেলেটা বলে উঠলো পেছন থেকে।

'এক মিনিট দাঁড়ান।' তোমোহিকো তার ডেস্কে এসে কম্পিউটারে কিছু একটা লিখতেই দোকানে থাকা কম্পিউটারের লিস্ট ভেসে উঠলো তার স্ক্রিনে। 'একটা আট-আট মডেলের কম্পিউটার আছে, যেটা দেখতে পারেন।'

'আট-আট?' ভ্রু কুঁচকে তাকালো ভদ্রলোক।

'একটা এনইসি-এইট্টি এইট সিরিজ। এই অক্টোবরে বিক্রির জন্য এসেছে বাজারে। কম্পিউটারটার গায়ের দাম লাখখানেকের মতোই, কিন্তু আপনার জন্য কিছুটা কম করতে পারি আমি। খারাপ না এটার মডেল। ১৪ মেগাহার্টজ সিপিউ, ৬৪ কিলোবাইট র‍্যাম, বেশ ভালো মানের। আর তার সাথে মনিটর যদি যোগ করতে চান, তবে একদম এক লাখ বিশের মধ্যে হয়ে যাবে।'

টেবিলের পাশ থেকে একটা প্রচারের বই তুলে নিয়ে ভদ্রলোকের হাতে দিলো তোমোহিকো। লোকটা একটা একটা করে পৃষ্ঠা উলটিয়ে দেখতে লাগলো তার সামনে। এরপর ছেলেটার হাতে দিলো সে।

'প্রিন্টার লাগবে তোমার?' ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করলো তোমোহিকো।

'হ্যাঁ, লাগতে পারে,' বিড়বিড় করে বললো ছেলেটা।

আবারো স্টকে কী আছে তার লিস্ট দেখতে লাগলো তোমোহিকো। 'জাপানিজ একটা রয়েছে আমাদের কাছে, যেটার দাম পড়বে প্রায় উনসত্তর হাজার আটশো ইয়েন।'

'তার মানে সব মিলিয়ে এক লাখ নব্বই হাজার পড়বে?' লোকটার চেহারাটা কুঁচকে গেল কিছুটা। 'বাজেটের বাইরে চলে যাচ্ছে আমার।'

তোমোহিকো ঠোঁট উলটে বললো, 'তার সাথে সফটওয়্যারের টাকাটাও যোগ করতে হবে আসলে।'

'সফটওয়্যার?'

'প্রোগ্রাম আর কি, যেগুলো দিয়ে কম্পিউটারটা চালাতে হয়। ওগুলো ছাড়া এই যে এসব দেখছেন,' কম্পিউটারের দিকে নির্দেশ করে বললো, 'এসবই ফাঁকা বাক্স মাত্র।'

'ওগুলো কি কম্পিউটারের সাথে দিয়ে দেবেন না?'

'উঁহু। আসলে একেক কাজের জন্য একেক সফটওয়্যার দরকার পড়ে। তাই এক প্যাকেজ সবাই নিতে চাইবে না।'

ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠলো লোকটা।

'আমরা হয়তো ভালো মানের একটা ওয়ার্ড প্রসেসর দিতে পারবো,' বললো তোমোহিকো। বলতে বলতে ক্যালকুলেটরে চেপে কত টাকা এসেছে তা দেখালো লোকটাকে: ১,৯৯,৮০০। 'এটা দাঁড়াবে সব শেষে। এর নিচে আর কোথাও পাবেন না, গ্যারান্টি দিচ্ছি।'

লোকটার চোখেমুখে না নেওয়ার ছাপ স্পষ্ট। এত টাকা দিতে ইচ্ছুক না সে, মুখাবয়ব দেখেই বোঝা যাচ্ছে।

কিন্তু তার ছেলের ক্ষেত্রে পুরো উলটো। পাশ থেকে বলে উঠলো, 'আর এনইসি-৯৮ মডেলের ক্ষেত্রে?'

'৯৮ সিরিজের দাম তিন লাখ ইয়েন থেকে শুরু হয়েছে। আর আনুষঙ্গিক সব মিলিয়ে দাম পড়বে চার লাখের মতো।'

'চার লাখ ইয়েন? একটা খেলনার জন্য?' অবাক হয়ে মাথা ঝাঁকাতে লাগলো ভদ্রলোক। 'এমনকি ৮৮ মডেলই বেশি দাম হয়ে যাচ্ছে।'

'তাহলে কেমন চাচ্ছেন তা জানাবেন আমাকে। যদি বাজেট ফিক্সড হয়ে থাকে, তবে আমি আপনাদেরকে দিতে পারবো, কিন্তু তাতে অনেক সমস্যা হতে পারে পরে। এমনকি আগের মডেলের কিছু জিনিসও দিতে হতে পারে।'

ভদ্রলোককে দেখেই বোঝা যাচ্ছিলো ভেতরে ভেতরে বেশ চিন্তা করছেন তিনি। কিন্তু শেষমেশ ছেলের চোখে খুশি দেখতে পেল সে।

তার দিকে ঘুরে ছেলেটা বললো, '৮৮ সিরিজটা নেবো আমরা।'

হিরোয়ের কাছে পেমেন্টের বিষয়গুলো রেখে দোকান থেকে বের হলো তোমোহিকো। আর দোকান বলতে একটা অ্যাপার্টমেন্টের অংশ আর কি। যদি দরজায় থাকা 'লিমিটলেস কম্পিউটার' সাইনটা না থাকতো, তবে অন্যান্য অ্যাপার্টমেন্ট থেকে আলাদা করা অসম্ভব হয়ে পড়তো। আর পাশের যে রুমটায় কিছু লেখা নেই, ওটা তাদের স্টকরুম হিসেবে পড়ে আছে।

স্টকরুমের ভেতর কাজ করার জন্য একটা ডেস্ক আর ছোট একটু জায়গা যেখানে গেস্টদের চা-পানি খাওয়ানো বা একটু বিশ্রাম নেওয়ার জন্য সোফা রয়েছে। ভেতরে ঢুকতেই দুটো লোক তাকালো তোমোহিকোর দিকে। একজন তো রিও নিজে, আরেকজনকে কয়েক দিন ধরে দেখছে সে। নামঃ কানেশিরো।

'৮৮ সিরিজের কম্পিউটারটা বিক্রি করলাম,' স্লিপটা দেখিয়ে বললো তোমোহিকো। '১,৯৯,৮০০ ইয়েনে, একটা মনিটর আর প্রিন্টারসহ।'

'বেশ,' বললো রিও। '৯৮ সিরিজেরগুলো রাখার জন্য আরেকটু জায়গা পাওয়া গেল তবে।'

ওদের পেছনে থাকা রুমটাতে কার্ডবোর্ড সিলিং ছুঁয়েছে প্রায়। কার্ডবোর্ডের সারির মাঝখান দিয়ে যেতে যেতে নাম্বারগুলোতে চোখ বোলাতে লাগলো তোমোহিকো।

'বাহ, বেশ ভালোই তো কাজ চলছে এখানে তোমার,' বললো কানেশিরো। 'সপ্তাহে কতগুলো লাখ টাকার কাস্টমার পাও এখানে?' তার গলায় বিদ্রুপের রেশ ছিলো কিছুটা। তোমোহিকোর বিপরীতে ঘুরে ছিলো বিধায় চেহারাটা দেখতে পেল না সে কিন্তু হাসিটা চিন্তা করতে পারলো। চোখগুলো দুলে দুলে উঠেছে, ফাঁপা গালগুলো ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে–এগুলো চোখের কোণে ভাসতে লাগলো তোমোহিকোর। ওকে দেখলে তোমোহিকোর মনে হয় একটা কঙ্কালকে স্যুট পরানো হয়েছে।

'আয়ত্তের মধ্যে রেখে কাজ করতে পছন্দ করি আমি,' বললো রিও। 'অল্প ঝুঁকি আর অল্প আয়।'

হালকা একটু হাসি দিলো কানেশিরো। 'গত বছর তো ঠিকঠাকই করেছিলে তুমি, আর সে সময়ে কোনো রকম অভিযোগ শুনিনি আমি। এই জায়গাটা তুমি পেতেও না, যদি-না আমি তোমাকে ঐ কাজটা দিতাম।'

'দেখো,' বললো রিও, 'আগেই বলেছি চোখ বেঁধে আবার ঐ একই রাস্তা পার হওয়াতে আগ্রহী নই আমি। আর এখন তো এও জেনে গেছি যে রাস্তাটা কতটা সংকীর্ণ। একটা ভুল পদক্ষেপে আমার সবকিছু ধুলোর সাথে মিশে যাবে।'

'একটু বেশিই ভাবছো তুমি। তার উপর বোকা না আমরা। অনেক কিছুই নিয়ন্ত্রণে আছে আমাদের। এবার আর দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই।'

'তারপরও, আগ্রহ নেই আমার। তোমাকে তোমার ব্যবসা অন্য কোথাও নিয়ে যেতেই হবে।'

তোমোহিকো ভাবার চেষ্টা করলো কী হতে পারে কানেশিরোর কাজটা। কয়েকটা সম্ভাবনা মাথায় এসেছে তার, কিন্তু সেগুলোর একটাও বৈধ না।

সবগুলো জিনিস–একটা কম্পিউটার, একটা প্রিন্টার, মনিটর–একত্র করতে কিছুটা সময় লাগলো তোমোহিকোর। একটা একটা করে দরজার কাছে রেখে আসছিলো সে। রিও আর কানেশিরো একদম চুপ মেরে যাওয়ার কারণে আর তেমন কিছু শুনতে পেল না।

'রিও,' যাওয়ার সময় বললো তোমোহিকো, 'দোকান কি বন্ধ করে দেবো?'

'করে দাও,' জবাব দিলো রিও। 'মনে হয় না আজ রাতে আর কোনো কাস্টমার আসবে।'

হালকা মাথা দুলিয়ে চলে গেল তোমোহিকো। এই পুরো সময়টার মধ্যে একবারও তার চেহারার দিকে তাকায়নি কানেশিরো।

তোমোহিকো গিয়ে কম্পিউটার বুঝিয়ে দিলো সেই ছেলে আর বাবাকে।

'ডিনার করতে যাবে?' হিরোয়েকে জিজ্ঞেস করলো সে।

'ঐ লোকটা এসেছে না?' ভ্রু তুলে বললো হিরোয়ে। 'ঐ যে যেটাকে দেখতে কঙ্কালের মতো দেখায়।'

হাসলো তোমোহিকো।

'লোকটা আসলে কে?' ভ্রু কুঁচকেই জিজ্ঞেস করলো হিরোয়ে। 'রিওর সাথে এত মেলামেশার কারণ কী?'

'অন্য কোথাও গিয়ে এ নিয়ে আলাপ করলে ভালো হবে,' কোট গায়ে জড়াতে জড়াতে বললো তোমোহিকো।

দোকান থেকে নেমে ফুটপাতের উপর দিয়ে হাঁটতে লাগলো তোমোহিকো আর হিরোয়ে। ডিসেম্বর মাস চলছে, এরই মধ্যে ক্রিসমাসের আমেজ দেখা যাচ্ছে এদিক-সেদিক। এবারের ক্রিসমাস ডে-তে কী করবে তারা তা ভাবতে লাগলো তোমোহিকো। একটা ঐতিহ্যবাহী দিন এটা। গত বছর বড় একটা হোটেলের ফ্রেঞ্চ রেস্টুরেন্টে গেছিলো সে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত ভালো কোনো আইডিয়া পায়নি। যেভাবেই হোক না কেন, এই দিনটা হিরোয়ের সাথেই কাটাবে বলে ঠিক করে রেখেছে। আর এটা ওদের তৃতীয় ক্রিসমাস উৎসব।

কলেজের দ্বিতীয় বর্ষে থাকাকালীন হিরোয়ের সাথে দেখা হয় তোমোহিকোর। একটা বড় ইলেকট্রনিক দোকানে পার্ট টাইম জব করতো সে। তার কাজ ছিলো মাইক্রোকম্পিউটার আর ওয়ার্ড প্রসেসর বিক্রি করা। সেই সময়ে এতটা জ্ঞান কারো মধ্যে ছিলো না বিধায় তোমোহিকো বেশ গুরুত্ব পায়। যদিও চাকরিটা কাউন্টারের

পেছনে থেকেই করতে হতো, কিন্তু মাঝেমধ্যে সার্ভিস কলের কাজও করতো সে। কারণ তেমন মানুষ ছিলো না করার জন্য।

ওদের কোম্পানি আনলিমিটেড ডিজাইনস-এ বিক্রির ভাটা পড়ায় চাকরিটা নিয়েছিলো সে। ট্রেনের গতিতে ছুটতে থাকা বিক্রি হুট করেই কচ্ছপের গতিতে চলা শুরু করে। কয়েকটা দোকান বন্ধ করে দিতে হয় বিভিন্ন জায়গা থেকে অভিযোগ আসার ফলে। আর এত এত অভিযোগ আসার কারণে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া পড়ে আনলিমিটেড ডিজাইনস-এর উপরে।

তোমোহিকো মনে মনে অবশ্য খুশিই হয়েছিলো—সামাজিকভাবে নিজেকে মেলে ধরতে পারার জন্য আর কি। যে ফ্লোরে তোমোহিকো ছিলো, হিরোয়ে ঠিক সেই ফ্লোরেই কাজ করতো। ফ্যাক্স আর ফোন বিক্রি করতো সে। একে অপরের কাছে প্রায়ই যাওয়া-আসা করতে হতো তাদের, আর একটু-আধটু ফাঁক পেলে কথা বলতো। তার এক মাস পরে প্রথম ডেটে যায় তারা। এরপর দীর্ঘ সময় ধরে তাদের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

একটা মেয়েকে যতটা সুন্দরী বলা যায় ততটা হিরোয়ে না। বেঁটে এবং গোলগাল মুখ তার। হাঁটার সময় মেয়েদের মতো কম, ছেলেদের মতোই লাগে বেশি। কিন্তু স্বভাবে বেশ নম্র হওয়ার কারণে লোকজনের কাছে স্বাভাবিক লাগে তাকে। ওর দিকে তাকালেই তোমোহিকোর সব চিন্তা উধাও হয়ে যায়।

তবে তাদের সম্পর্ক যে একদম পালতোলা জাহাজের মতো স্বচ্ছন্দে যাচ্ছিলো এমনও না। দুই বছর আগে তার ভুলের কারণে হিরোয়ের পেটে বাচ্চা এসে যায়। অ্যাবোরশন করাতে চায় সে। অপারেশন শেষে বিছানায় শুয়ে ছিলো সেদিন তারা। হিরোয়ের শরীরটা কাছে টানতেই জল নেমে পড়ে মেয়েটার চোখ বেয়ে। তবে এরপরে আর কখনো কাঁদতে দেখেনি তোমোহিকো তাকে।

এখনো তোমোহিকোর পকেটে সেই প্রেগন্যান্সি টেস্টের টিউবটা আছে। একটা সিগারেটের অর্ধেক সাইজের টিউবটা ওয়ালেটে রেখে দিয়েছে সে। সেটার দিকে তাকালে একদম নিচে দুটো গোল দাগ দেখা যাবে। আর ওটার মানেই প্রেগন্যান্সির রিপোর্ট পজিটিভ। কনডমের প্যাকেটের পাশে জিনিসটা রেখে দিয়েছে তোমোহিকো, যাতে পরবর্তীতে ওটা দেখলেই মনে পড়ে কনডমের কথা।

রিওকে অবশ্য একবার দেখিয়েছিলো সে। তবে তাকে অবাক করে দিয়ে রিও আরেকজনকে দেখাবে বলে নেয় সেটা। তার কিছু দিন বাদে অবশ্য ফেরত দিয়েছিলো সে। কিন্তু কেন নিয়েছিলো সে ব্যাপারে কিছুই বলেনি।

শুধু এতটুকু বলেছিলো যে, 'পুরুষ মানুষ আসলে অনেক দুর্বল। একটা মেয়ে শুধু ফিসফিসিয়ে "আমি প্রেগন্যান্ট" বললেই হলো। এরপর পুরুষরা যেকোনো কিছু করতে দ্বিধা করে না।'

সেদিন সেই কথার কিছুই বোঝেনি তোমোহিকো।

একটা ছোট বারের ভেতর ঢুকলো তোমোহিকো আর হিরোয়ে। এরমধ্যেই চাকরিজীবী লোক দিয়ে ভরা বারটা। একদম সামনের দিকে একটা টেবিল ফাঁকা আছে। তোমোহিকো আর হিরোয়ে টেবিলের দুপাশে মুখোমুখি বসে পড়লো। পাশে থাকা খালি চেয়ারে রাখলো তাদের কোটগুলো। তোমোহিকোর মাথার উপরে একটা টেলিভিশন রয়েছে। শব্দ শুনতে পাচ্ছে শুধু। সাদা অ্যাপ্রোন পরা মধ্যবয়সি এক নারী তাদের টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াতেই দুটো বিয়ার আর কিছু খাবারের অর্ডার দিলো তোমোহিকো। এখানকার সাশেমিটার বেশ নামডাক রয়েছে, আর অ্যাপেটাইজারটাও খেতে বেশ ভালো।

'কানেশিরোর সাথে আমার গত বসন্তে দেখা হয় প্রথম,' বিয়ারে চুমুক দিয়ে মুখে থাকা স্কুইডের টুকরোটা গেলার সময় বললো তোমোহিকো। 'রিওই পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলো। সেই সময়ে কিছুটা স্বাস্থ্য ছিলো তার।'

'ওর কঙ্কালের উপরে আবার মাংসও ছিলো?'

হেসে উঠলো তোমোহিকো। 'ওরকমই কিছু একটা। ভালো জামা-কাপড়ও পরতো সে সময়। বেশ জোর নিয়েই আমাদের কাছে এসেছিলো একটা গেমের প্রোগ্রাম বানাতে।'

'কীরকম গেম?'

'গলফ।'

'তার মানে পুরো একটা গেমের প্রোগ্রাম তুমি লিখেছ, একদম শুরু থেকে শেষ অবধি?'

পুরো বিয়ারটা শেষ করলো তোমোহিকো। 'তার থেকেও জটিল ছিলো কাজটা।'

পুরোনো স্মৃতিতে চলে গেল তার মন। শুরু থেকেই বিষয়টা সন্দেহজনক ঠেকছিলো তোমোহিকোর কাছে। গেমটার অল্প কিছু অংশ এবং আংশিক করা প্রোগ্রামটা দেখেছিলো সে। কানেশিরো চাচ্ছিলো দুই মাসের মধ্যে তারা যেন কাজটা করে দেয় তাকে।

'এত দূর করা শেষে কেন আরেকজনকে দিয়ে করাতে চাচ্ছে এটা?' জিজ্ঞেস করেছিলো তোমোহিকো।

'কারণ এই প্রোগ্রাম যে করেছিলো সেই লোক মারা গেছে। হার্ট অ্যাটাক হয়েছে তার। কোম্পানিতে আর কোনো লোক নেই যে ভালো প্রোগ্রাম করতে পারে। ওরা ভাবছে নির্ধারিত সময়ের আগে শেষ করতে না পারলে সমস্যায় পড়ে যাবে তারা, তাই আমার কাছে নিয়ে এসেছে কাজটা,' কানেশিরো জবাবে বলেছিলো। তোমোহিকোর মনে আছে সেদিন কানেশিরো কতটা ঠান্ডা গলায় বলেছিলো কথাগুলো। অবশ্য, বেশি দিন টেকেনি সে কথা।

'তবে?' জিজ্ঞেস করেছিলো রিও।

'মূল জিনিসগুলো দেওয়াই আছে এতে। বাকি যে অংশগুলো নেই সেগুলো দিতে বেশি একটা সময় লাগবে না।'

তোমোহিকোর অবশ্য এত আত্মবিশ্বাস ছিলো না। 'আর ডিবাগের কী হবে? হয়তো এক মাসের মধ্যে কাজটা শেষ করতে পারবো, কিন্তু সহজভাবে চালাতে হলে? সেক্ষেত্রে আরো মাসখানেক লাগবে।'

'প্লিজ, যা পারো তাই একটু করো,' অনুরোধ করে বলেছিলো কানেশিরো। 'আর কেউ নেই যে তাদের কাছে যাবো আমি।' কানেশিরোকে সেই প্রথম ভালো ব্যবহার করতে দেখেছিলো তোমোহিকো।

কাজটা করেছিলো তারা। টাকাও পেয়েছিলো বেশ। এতটাই যে আবার আনলিমিটেড ডিজাইনস শুরু করতে পারতো।

ওরা চেয়েছিলো এমন এক গেম বানাতে যা দেখতে সত্যিকার গলফের মতোই লাগে। বেশ উচ্চভিলাসী এক প্রচেষ্টা বলা যায়। প্লেয়াররা দল পরিবর্তন করতে পারতো, সেই সাথে নিজেদের অবস্থানের উপর নির্ভর করে বলে আঘাতও করতে পারতো। এছাড়াও কোন জায়গায় বল ফেলবে তাও দেখতে পারতো। অতি সূক্ষ্ম বিষয়গুলো নিশ্চিত করতে রিও আর তোমোহিকোকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গলফ নিয়ে পড়ে থাকতে হয়েছিলো। দুজনেরই কেউই জানতো না যে আসলে বাস্তবে গলফ কীভাবে খেলতে হয়।

গল্পটা এমন ছিলো যে তারা যে গেমটা বানাচ্ছে সেটা বিভিন্ন গেমের দোকানে বা ক্যাফেতে থাকবে। কানেশিরো তাদেরকে এও বলেছিলো যে সব ঠিকঠাক থাকলে পরবর্তী *স্পেস ইনভেডারস* হতে চলেছে এটা।

কানেশিরো সম্পর্কে খুব অল্পই জানতো তোমোহিকো, এর অন্যতম কারণ ছিলো রিও এ বিষয়ে কোনো কথাই বলতো না তাকে। যাই হোক, কয়েকবার কথা বলার পরে তোমোহিকো জানতে পারে যে কানেশিরোর সাথে হিরোশি ইনোমোতোর যোগাযোগ রয়েছে। হিরোশি ইনোমোতো হলো সেই গ্যাংস্টার যার সাথে তাদের গতবারের হিসাবরক্ষক নামি নিশিগুচির প্রেম ছিলো। পরবর্তীতে যাকে হোটেলে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছিলো আর কি।

নাগোয়াতে নামির সেই হত্যাকাণ্ডের কোনো সুরাহা করতে পারেনি পুলিশ। সেই কাগজের লেজ ধরতে ধরতে পুলিশ ইনোমোতো পর্যন্ত পৌঁছেছিলো। কিন্তু জোরালো প্রমাণ না থাকায় খুন বলে প্রমাণ করতে পারেনি। এমনকি আত্মহত্যারও কোনো আলামত ছিলো না। নামি মরে যাওয়ায় পুলিশের জন্য আসল দোষীকে শনাক্ত করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

অবশ্য, তোমোহিকো নিশ্চিত ছিলো খুনটা ইনোমোতোই করেছে। কিন্তু প্রশ্নটা হলো, নামি যে নাগোয়াতে আছে সে বিষয়ে ইনোমোতোকে কে বলেছিলো? এটার

একটা উত্তর অবশ্য তোমোহিকোর মনে ছিলো, কিন্তু উত্তরটা কখনো মুখ ফুটে বের করেনি সে।

হিরোয়েকে গলফের ব্যাপারে সব খুলে বললো তোমোহিকো। কথা বলার সময় একটা প্লেটে করে সাশেমি এলো তাদের টেবিলে, সাথে কিছু বেগুন ভাজা।

'তো গলফ গেমের কাজটা শেষ হয়েছে?' চপস্টিক দিয়ে বেগুন ভাজাটা কাটতে নিয়ে জিজ্ঞেস করলো হিরোয়ে।

'দুই মাস পরেই, যেমনটা কথা হয়েছিলো আর কি। আর তার এক মাস বাদে পুরো দেশে ছড়িয়ে যায় ওটা।'

'ভালোই বিক্রি হয়েছে তবে ওটা, কী বলো?'

'তুমি কী করে জানলে?'

'কারণ গেমটা সম্পর্কে শুনেছিলাম আমি। কয়েকবার খেলেছিও। মনে আছে যে এপ্রোচ আর পুটিং-এর সময় বেশ কষ্ট করতে হয়েছিলো আমাকে।'

হিরোয়ের মুখে গলফের ভাষা শুনে খানিকটা অবাক লাগলো তোমোহিকোর। বললো, 'এক্ষেত্রে আমি এর দায়ভার নিতে পারলে খুশিই হতাম, কিন্তু আমার মনে হয় না যে আমরা যে গেমটা বানিয়েছি সেটাই তুমি খেলেছ।'

'কেন না?'

'প্রায় দশ হাজারেরও বেশি ইউনিট বিক্রি হয়েছে ওটার। যার অর্ধেকের মতো বিক্রি করেছি আমরা। বাকিটা অন্য কোনো কোম্পানি করেছে।'

'তার মানে বলতে চাচ্ছো কোনো কোম্পানি তোমাদেরটা চুরি করেছে? ঐ *স্পেস ইনভেডারস*-এর মতো?'

'অমনটাও না। *স্পেস ইনভেডারস* কপি করা হয়েছে তখন, যখন মূল গেম তুঙ্গে ছিলো। কিন্তু আমাদের গলফ গেমটার ঠিক একই সময় কপিটা রিলিজ হয়েছিলো। অর্থাৎ, মেগাহিট এন্টারপ্রাইজ থেকে অফিশিয়াল গেম মুক্তির সাথে সাথেই ওটার কপি ভার্সন বাজারে ছড়িয়ে পড়ে।'

'কী?' মুখে ভরতে নেওয়া খাবারটা মাঝপথেই থেমে গেল তার। 'কোনো কাকতালীয় ঘটনা নয়তো?'

'হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। কেউ একজন আসল প্রোগ্রামটা আগেই হাতে পেয়ে যায়, তারপর গেমটা রিলিজ হওয়ার আগেই কপি নিয়ে কাজ করা শুরু করে দেয়।'

'এক মিনিট, তাহলে তোমরা কোনটা নিয়ে কাজ করছিলে? আসলটা, নাকি নকলটা?' জিজ্ঞেস করলো হিরোয়ে। চোখে সন্দেহের দৃষ্টি।

দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো তোমোহিকো। 'এটাও বলে দিতে হবে আমাকে?'

মাথা ঝাঁকালো সে। 'না, আর বলতে হবে না।'

'আমি এখনো জানি না কী করে কানেশিরোর হাতে সেই প্রোগ্রাম আর ডিজাইন এসেছিলো।'

'অবাক হচ্ছি এটা দেখে যে কোনো রকম নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া পড়েনি এটার উপর।'

'উঁহু, পড়েছিলো। মেগাহিট কোম্পানি দেশের সব জায়গায় খুঁজেছে। একদম রগে রগে গিয়ে। কিন্তু কিছুই পায়নি। যারা এটা বিক্রি করতো, তারা বেশ গোপন সেলস রুট ব্যবহার করতো।'

গ্যাং চ্যানেল, মনে মনে ভাবলো তোমোহিকো। ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়োজন মনে করলো না আর।

'তোমার ভয় লাগছে না? যদি কোনো বিপদ হয়?'

'এখন পর্যন্ত ভালোই চলছে। যদি পুলিশ আসেও, তবে আমরা কিছুই জানি না বলে চালিয়ে দেবো। আসলে আমাকে কিছুই করতে হবে না।'

হাসলো হিরোয়ে। 'জানতামই না এরকম ঘোলাটে কোনো চুক্তির সাথে জড়িয়ে আছো তুমি।'

'উমম, বলতে গেলে অনেকটা ঘোলাটে হয়েই আছি আমি।'

তোমোহিকো নিশ্চিত যে রিও এই ব্যাপারটা প্রথম থেকেই জানতো। ঝানু খেলোয়াড় সে। কানেশিরোর মতো ছোটখাটো চিটিংবাজ তার নাকের ডগা দিয়ে চলে যাবে, এমনটা হতেই পারে না। যখন তোমোহিকো খবরটা নিয়ে যায় ওর কাছে, বলে যে তারা পাইরেটেড কপি বানিয়েছে এত দিন, কথাটা শোনার পরে ততটা বিস্মিত লাগেনি তাকে।

সত্যি বলতে, প্রথমবার কাহিনিটা শোনার পর তোমোহিকোও অতটা অবাক হয়নি। কারণ রিওর সাথে বছরের পর বছর থাকতে থাকতে এসব অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। উপরন্তু কারো অর্ধেক করা কাজ চুরি করা নীরস লেগেছে তার কাছে।

সেই নকল ক্রেডিট কার্ড দিয়ে কত টাকা হাতিয়ে নিয়েছে তা ভেবেও কিছুটা অবাক হলো তোমোহিকো–যেটাতে তার হাত ছিলো আর কি। দুই লাখ ইয়েনের উপরে তো হবেই। ইদানীং আবার ফোনে আড়ি পাতার স্বভাব মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে রিওর। তোমোহিকো জানে না কে বা কারা ওকে ফোনে আড়ি পাততে বলছে অথবা কার ফোনেই বা আড়ি পাতছে। কিন্তু রিও কয়েকবার তার কাছে এসে কী প্রক্রিয়ায় করা যাবে তা জিজ্ঞেস করেছিলো।

যার কারণে ইদানীং দোকান হালকা-পাতলা চলাতেই খুশি সে। তোমোহিকো আশা করছে যাতে কানেশিরো কোনো লোভনীয় অফার না আনে আবার–এরকম কিছুই না যাতে রিওর মাথায় দোকান বাদে অন্য চিন্তা ঢুকে পড়ে। মূল সমস্যা হচ্ছে রিও যে ভেতরে ভেতরে কী ভাবছে তাই জানে না তোমোহিকো। রিও তার বেস্ট ফ্রেন্ড, তবুও তার সম্পর্কে ছিটেফোঁটাও জানে না সে।

হিরোয়েকে স্টেশনে ছেড়ে এসে আবার দোকানে ফিরলো তোমোহিকো। উপরের বাতিগুলো জ্বলছে এখনো। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে নিজের কাছে থাকা চাবি দিয়ে খুললো দরজাটা। ভেতরে রিওকে কম্পিউটারের স্ক্রিনে বুঁদ হয়ে থাকতে দেখলো। পাশেই টেবিলের উপর একটা বিয়ারের বোতল রাখা।

'আবার আসবে ভাবিনি,' বলে উঠলো সে।

'হুম, আসলে কানেশিরোর ব্যাপারে কথা বলার ছিলো কিছু,' দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা একটা ফোল্ডিং চেয়ার টেনে বললো তোমোহিকো। সেটা খুলে সামনাসামনি বসে জিজ্ঞেস করলো, 'কী চাচ্ছিলো সে?'

'টাকা! আর কিইবা চাইবে? ভালোই স্বাদ পেয়েছে গলফ গেমে, আর এজন্যই এটা ছাড়তে কষ্ট হচ্ছে তার।' আরেকটা বিয়ার টেনে নিয়ে কয়েক ঢোক গিললো রিও। তার পায়ের কাছে একটা ছোট্ট রেফ্রিজারেটর রেখে দিয়েছে সে। সব সময় ওটা হেইনিকেনের বোতল দিয়ে ভরা থাকে।

'এইবার কী নিয়ে এসেছিলো তবে?'

'হাস্যকর জিনিস নিয়ে এসেছিলো ব্যাটা,' তাচ্ছিল্যের সুরে বললো রিও। 'এমনিতেই এত ঝুঁকি নিয়ে পড়ে আছি, তার উপর আবার এটা। কোনো চান্সই নেই এটাতে হাত দেওয়ার।'

চোখমুখ শক্ত হয়ে আছে রিওর, যেন মনে হচ্ছে কোনো একটা ব্যাপারে তালগোল পাকিয়ে ফেলেছে। কানেশিরো যে প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলো তা হয়তো সে নেয়নি, কিন্তু বিষয়টাতে তার আগ্রহ ঠিকই আছে তা বোঝা যাচ্ছে।

'তো কী সেটা?' জিজ্ঞেস করলো তোমোহিকো।

হাসলো রিও। 'সেটা তোমার না জানলেই ভালো।'

তার বলার ভঙ্গি শুনেই চোখ ছোট করে আনলো তোমোহিকো। 'অসম্ভব! মনস্টারের কথা বলছো না তো?'

বিয়ারের বোতলটা তুলে ধরে পুরোটা গিলে ফেললো রিও। যেন সম্মতি দিলো তোমোহিকোর কথায়। নির্বাক হয়ে চেয়ারে বসে রইলো তোমোহিকো। ভাষা হারিয়ে ফেলেছে সে।

দ্য মনস্টার হলো ইতিহাসের সবচেয়ে আলোচিত গেম *সুপার মারিও ব্রোস*-এর বিপরীতে ওদের দেওয়া একটা নিকনেম। নিনটেন্ডোর গেম কনসোলের জন্য বানানো হয়েছিলো সেই গেম। চার্টে একপ্রকার ঝড় তুলেছে এই গেম, সেপ্টেম্বরের দিকে রিলিজ হয়ে সারা দেশে ছড়িয়ে গেছে। প্রায় দুই মিলিয়নের বেশি বিক্রি হয়েছে এবং হচ্ছে এখনো।

গেমের ভেতরে একটা সুদর্শন প্লাম্বারকে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা দূর করে গেমে থাকা প্রিন্সেসকে বাঁচাতে হয়, আর যাত্রাপথে মারতে হয় শত্রুদের। গেমটাতে মূল পথ বাদ দিয়ে অসংখ্য শর্টকাট আর ভিন্ন রাস্তায় যাওয়ার উপায় আছে। আর এই

বৈশিষ্ট্যের কারণেই প্রতিদ্বন্দ্বী অন্যান্য গেমকে পেছনে ফেলে দিয়েছে মারিও। এছাড়া, গেমে ট্রেজার হান্টের ব্যাপারটাও আছে। এদিকে ক্রিসমাসের ছুটিতে যে শুধু গেমটাই বিক্রি হচ্ছিলো এমন না, ঐ গেম কী করে খেলতে হয় তার নিয়মাবলিও বিক্রি হচ্ছিলো দেদারসে। তরতর করে বিক্রির পরিমাণ বাড়ছে। রিও আর তোমোহিকো দুজনেই স্বীকার করে নিয়েছে যে মারিওর এই গেম এ বছর তো রাজ করবেই, সাথে আগামী বছরও মাতিয়ে রাখবে।

'আর মারিওর ব্যাপারে কী করবে? এটা বোলো না যে কানেশিরো আমাদেরকে এটার কপি করতে বলছে,' বললো তোমোহিকো।

'এটাই তো চাচ্ছে সে,' হাসতে হাসতে বললো রিও। 'তার মতে এটা করা সহজ।'

'সহজের ব্যাপারে জানি না, তবে গেম তো এরমধ্যে বাজারে চলে এসেছে। তাই ওটার ডাটা কপি করে নতুন বোর্ড বানালেই হলো। ততটাও কঠিন হবে না, যদি ঠিকঠাক সরঞ্জাম জোগাড় করা যায় আর কি।'

'ওটাই করাতে চাচ্ছে কানেশিরো আমাদের দিয়ে। যাতে সেটআপ করে দিই আমরা তাকে। তার কাছে শিগাতে একটা প্রিন্টার আছে, যেটা দিয়ে নকল প্যাকেজিং আর নির্দেশনা কপি করা যায়।'

'শিগায়? অত দূরে কেন?'

'কোনো গ্যাংয়ের কারবার মনে হয়,' বললো রিও।

'এই ক্রিসমাসের আগে সম্ভবই না বানানো। বানাতে পারবে না তারা।'

'ক্রিসমাসের চিন্তাও করছে না সে। নতুন বছরে যে বাচ্চারা বিভিন্ন বখশিস পায় আত্মীয়দের কাছ থেকে, সেটাই ধরতে চাইছে সে। তারপরও আমরা যদি এখন কাজ করা শুরু করি, তবে শেলফে পণ্য তুলতে কমপক্ষে জানুয়ারি পর্যন্ত যাবে। আর তত দিনে বাচ্চারা সব টাকা উড়িয়ে দেবে,' কণ্ঠে অবজ্ঞার সুর রিওর।

'যদি পাইকারি বিক্রি করতে চায় সে, তবে এমন জায়গা দেখতে হবে যেখানে সরাসরি ক্যাশ টাকা দেবে তাকে—'

মাথা ঝাঁকালো রিও। 'ওটা করলে পাইকারি বিক্রেতারা ঘাড়ের কাছে এসে শ্বাস নেওয়া শুরু করবে। তোমার কি মনে হয় না যে এত বিক্রিত একটা গেমের পুরো শিপমেন্ট বিক্রি করলে সন্দেহ জাগবে ওদের? নিনটেন্ডোর সাথে একবার চেক করলেই খেল খতম।'

'তো বিক্রি করবে কীভাবে?'

'অবশ্যই কালোবাজারে। কোনো মধ্যস্থতাকারী থাকবে না। ঐ *ইনভেডারস* আর *গলফ* গেমের মতো হবে। একদম সরাসরি বাচ্চাদের কাছে বিক্রির চিন্তা করছে সে।'

'এখন তো করছে না। কারণ তুমি না করে দিয়েছ, তাই না?' জিজ্ঞেস করলো তোমোহিকো।

'অবশ্যই না করে দিয়েছি। সবকিছু ডোবাবো নাকি হ্যাঁ বলে?'

'তবে তো স্বস্তির খবর এটা,' নিচ থেকে নিজে একটা হেইনিকেনের বোতল বের করতে নিয়ে বললো তোমোহিকো। ঢাকনাটা খুলতেই কয়েক ফোঁটা গড়িয়ে পড়লো তার হাত থেকে।

***

তোমোহিকো আর রিওর সেই কথা বলার সপ্তাহখানেক বাদে সোমবার দিন একটা লোক এলো দোকানে। রিও বেরিয়েছিলো মাল কিনতে, অন্য দিকে তোমোহিকো সামনাসামনি আর হিরোয়ে ফোনে কাস্টমার সামলাচ্ছিলো। ওদের দোকানের অধিক কাস্টমারই ফোন কলের মাধ্যমে যোগাযোগ করে। গত বছরের শেষ দিকে যখন প্রথম তাদের লিমিটলেস নামক কোম্পানির শুরু করেছিলো, তখন তোমোহিকো আর রিওই সামলাচ্ছিলো সব, কিন্তু পরবর্তীতে চাপ বেড়ে যাওয়ায় এপ্রিলের দিকে হিরোয়েকে নিয়োগ দেয় তারা।

অর্ধেক দামে একটা পুরোনো মডেলের কম্পিউটার বিক্রি করে বেশ খোশ মেজাজেই ছিলো তোমোহিকো, আর তখনই লোকটাকে দেখলো সে। মধ্যবয়স্ক একটা লোক, পেটানো শরীর আর পঞ্চাশের মতো বয়স। চুল পেছন দিকে রাখার কারণে মাথার কিছু অংশ কপালের সাথে মিশে গেছে। লোকটার পরনে মোটা সুতির জিন্স প্যান্ট এবং গায়ে কালো সোয়েডের জ্যাকেট। চোখ থেকে সোনালি ফ্রেমের চশমাটা নামিয়ে বুক পকেটে ভরলো সে। তোমোহিকো লোকটার পাণ্ডুর মুখটা দেখে থমকে গেল একদম। তার মুখটা দেখে মনে হচ্ছিলো আজীবনের জন্যই বুঝি অমন ছিলো ওটা। সাথে ঠোঁটদুটো এমন করে বাঁকানো যে তোমোহিকোর গিরগিটির কথা মনে পড়লো।

প্রথমে তোমোহিকোর দিকে নজর পড়লো লোকটার, এরপর হিরোয়ের দিকে। যতক্ষণ তোমোহিকোর দিকে তাকিয়ে ছিলো তার চেয়ে দ্বিগুণ হারে চেয়ে রইলো হিরোয়ের দিকে। ভ্রুকুটি করে তাকালো হিরোয়ে, এরপর চেয়ারটা ঘুরিয়ে পিঠটা লোকটার দিকে ঘুরিয়ে দিলো। আগন্তুক এরপর এগিয়ে গেল কম্পিউটার আর সফটওয়্যার থাকা শেলফগুলোর দিকে। তার চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছিলো কিছু কেনার জন্য এখানে আসেনি সে।

'কোনো গেম আছে?' কর্কশ সুরে জিজ্ঞেস করলো আগন্তুক।

'কীরকম গেম চাচ্ছেন আপনি?' জিজ্ঞেস করলো তোমোহিকো।

'মজার গেম,' বলে উঠলো লোকটা। 'ঐ *সুপার মারিও ব্রোস*-এর মতো। ওরকম কিছু আছে?'

'দুঃখিত, আমরা শুধু কম্পিউটারের সফটওয়্যার বিক্রি করি।'

'এহ হে, এ তো লজ্জার কথা,' বললো সে। যদিও তার অঙ্গভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে না আশাহত হয়েছে সে। অস্বাভাবিক মৃদু হাসি ফুটে উঠেছে তার ঠোঁটের কোণে।

'যদি তাই হয়, তবে একটা ওয়ার্ড প্রসেসর কিনে নিচ্ছেন না কেন?' ওপাশ থেকে ফোনে কথা বলার সময় একটু জোরেই বলে উঠলো হিরোয়ে। 'হ্যাঁ, আপনি ফ্লপিতেই সেভ করতে পারবেন সব ফাইল।' তোমোহিকো জানে কী করছে সে: সুন্দর করে বুঝিয়ে দিচ্ছে যে তারা যা বিক্রি করে না তার সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করলে তাদের সময় নষ্ট হয়। ওদিকে লোকটার *সুপার মারিও ব্রোস* কথাটা বলার অন্য কোনো কারণ থাকতে পারে বলে মনে হচ্ছে তোমোহিকোর।

হিরোয়ে ফোন রাখতেই লোকটা মাথা তুলে তাকালো, দুজনের দিকে ঘুরলো তার চোখ। তারপর শেষমেশ থামলো হিরোয়ের উপর এসে। 'রিও আছে?'

'রিও?' তোমোহিকোর দিকে দ্বিধান্বিত দৃষ্টি দিয়ে বললো হিরোয়ে। চেহারায় দ্বিধার ছাপ স্পষ্ট।

'রিও কিরিহারা,' বলে উঠলো লোকটা। 'এটার ম্যানেজার তো সে, না? কই সে? বাইরে গেছে?'

'হ্যাঁ, একটু কাজে বেরিয়েছে সে,' বললো তোমোহিকো।

তোমোহিকোর দিকে ঘুরলো এবার লোকটা। 'কখন ফিরবে?'

'তা তো বলতে পারছি না। বলেছে ফিরতে দেরি হবে,' মিথ্যা বললো তোমোহিকো। সে জানে যেকোনো সময় রিও এসে পড়বে, কিন্তু এই লোকটাকে তা বললে পস্তাতে হবে পরে।

ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠে তোমোহিকোর দিকে তাকিয়ে রইলো লোকটা। অন্য দিকে চোখ ফেরানো থেকে বিরত থাকলো তোমোহিকোও।

'তাহলে কিছুক্ষণ এখানে অপেক্ষা করি আমি, কেমন,' অল্প কিছুক্ষণ থেমে বললো লোকটা। 'আশা করি সমস্যা হবে না আপনাদের?'

'কোনো সমস্যা নেই,' আবারো মিথ্যা বললো তোমোহিকো। আসলে এছাড়া আর কোনো উপায় নেই তার। হয়তো রিও কোনো রাস্তা খুঁজে পাবে লোকটাকে তাড়ানোর জন্য। এরকম পরিস্থিতিতে ওর মতো একটু বুদ্ধি যদি তার থাকতো।

দরজার পাশে একটা ফোল্ডিং চেয়ার নিয়ে বসলো লোকটা। পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করতেই খেয়াল করলো 'নো স্মোকিং' লেখাটা। আবার পকেটে ঢুকিয়ে রাখলো সে। ছোট্ট একটা রিং দেখা গেল তার কড়ে আঙুলে, যেটাতে প্লাটিনামের রশ্মি জ্বলজ্বল করছে।

নিজের ডেস্কে ফিরে গেল তোমোহিকো। বিক্রির স্লিপিগুলো চেক করতে লাগলো। কিন্তু বারবার ভুল হচ্ছে তার হিসাবে। কারণ লোকটার চোখ ওর দিকেই

আছে বলে মনে হচ্ছে। হিরোয়ে আবার তার পিঠ এদিকে দিয়ে বসে অর্ডার দেখছে।

'দোকানটা দারুণ,' চারপাশে তাকিয়ে বললো লোকটা। 'রিও ভালোই সামলেছে দেখা যাচ্ছে। কেমন আছে সে?'

'ভালো আছে,' না তাকিয়েই জবাব দিলো তোমোহিকো।

'বাহ, বাহ, শুনে ভালো লাগলো। শক্ত মনের মানুষ সে।'

মাথা তুলে তাকালো তোমোহিকো। 'আপনি রিওকে চেনেন কী করে?'

'ওহ, সেসব অনেক আগের কথা,' বলে উঠলো লোকটা। বাঁকা হাসি খেলা করছে তার মুখে। 'রিওকে আমি চিনি তার বাচ্চাকাল থেকে। ওকে, তারা বাবা-মাকে।'

'আপনি তার আত্মীয়?'

'বলতে পারেন,' বললো লোকটা। নিজের কথার গভীরতা মেপে মাথা দোলাচ্ছে। তোমোহিকোর দিকে ফিরে বললো, 'এখনো মনমরা হয়ে পড়ে থাকে সে?'

প্রশ্ন শুনে পলক ফেললো তোমোহিকো।

'মনমরা...মানে এখনো মাথায় দুশ্চিন্তা ঘোরাঘুরি করে তার?' ব্যাখ্যা করলো লোকটা। 'ঘন কালো দুটো চোখ। কোন সময় কী ভাবছে তা ধরতেই পারা যায় না। ভাবছিলাম সময়ের সাথে সাথে কিছুটা পরিবর্তন এসেছে কি না।'

'আমার কাছে তো স্বাভাবিকই লাগে তাকে।'

'স্বাভাবিক, হাঁহ?' হাসলো লোকটা। 'যাক, এটা শুনেও ভালো লাগলো।'

লোকটার স্বভাব-চরিত্রে একটা জিনিস স্পষ্ট হচ্ছে তোমোহিকোর কাছে। তা হলো, যদি রিওর কোনো আত্মীয়ও হয়ে থাকে লোকটা, তবুও মনে হয় না রিও কোনো কাজ করতে রাজি হবে এর সাথে।

হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে উরুতে হালকা চাপড় মেরে উঠে দাঁড়ালো লোকটা। 'মনে হচ্ছে দেখা পাবো না আজকে। যাক গে, আরেক দিন আসবো তবে।'

'কোনো কিছু বলতে চান তাকে?'

'নাহ, ঠিক আছে। সামনাসামনি দেখা হলেই বলবো।'

'আপনি যে এসেছেন এটা বলবো তাকে?'

'বললাম না কোনো কিছুই বলার দরকার নেই।' বলেই দরজার দিকে হাঁটতে শুরু করলো লোকটা।

কাঁধ ঝাঁকালো তোমোহিকো। রিওকে বর্ণনা দিলে এমনিতেই চিনে যাবে সে। আর তার চেয়েও বড় কথা লোকটা চলে যাচ্ছে। 'আবার আসবেন,' পেছন থেকে বলে উঠলো তোমোহিকো।

লোকটা দরজা ধরে টান দিতে যাবে, অমনি একা একাই খুলে গেল ওটা। বাইরে থেকে খোলা হয়েছে। ওখানে দাঁড়িয়ে আছে রিও, ঘটনার আকস্মিকতায় চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে। তোমোহিকোর মনে হলো এই বুঝি সে চোখ রাঙানোর মতো কিছু একটু দেখবে রিওর মুখে। তার পরিবর্তে শক্ত হয়ে গেল মুখটা। রিওর এমন অবস্থা কখনোই দেখেনি তোমোহিকো। আর তার পরের মুহূর্তেই হেসে দিলো সে।

'আরে মাতসুরা!'

লোকটা দুই পা পেছনে চলে গিয়ে ভেতরে ঢুকতে দিলো রিওকে। 'অনেক দিন পর দেখা। ভালোই দেখাচ্ছে তোমাকে।'

হাত মেলালো দুজনে।

পাশের স্টকরুমে যাওয়ার আগে রিও বললো, 'অনেক পুরোনো বন্ধু আমার।'

দ্বিধায় পড়ে গেছে তোমোহিকো। রিওর মুখে হাসি, অথচ মাতসুরাকে দেখার সাথে সাথে যে শক্ত অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছিলো তার মুখে, তার কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পাচ্ছে না। যে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া তার মুখ থেকে ঝরছিলো তা ফেলে দেওয়া যায় না। নিঃসন্দেহে অদ্ভুত ছিলো বিষয়টা।

একটু পরে ঐ রুমে চা দিয়ে এসে ফিরলো হিরোয়ে।

'কেমন দেখলে ওখানে?' জিজ্ঞেস করলো তোমোহিকো।

'হাসছে,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো সে। 'একে অপরকে জোকস শোনাচ্ছে। রিও জোক বলছে, ভাবতে পারছো?'

'আসলেই পারছি না।'

'আমার তো মনে হচ্ছিলো আমি ভুল শুনছি,' কান ডলতে ডলতে বললো হিরোয়ে।

'এই মাতসুরা লোকটা কী চায় তা শুনেছ তুমি?'

মাথা ঝাঁকালো সে। 'আমি যখন ছিলাম, তখন খুব আস্তে আস্তে কথা বলছিলো। যা নিয়েই বলুক না কেন, মনে হচ্ছিলো আমি যেন শুনতে না পাই এমন করেই বলছিলো।'

বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠলো তোমোহিকোর। দেয়ালের ওপাশে যা কিছু নিয়েই কথা বলুক না কেন, তা যে একটা সমস্যা তা বুঝতে পারছিলো সে। প্রায় ত্রিশ মিনিট বাদে বাইরে থেকে দরজা খোলার শব্দ শুনলো সে। আরো দশ সেকেন্ডের মতো সময় যাওয়ার পরে দোকানের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলো রিও। 'মাতসুরাকে বিদায় দিয়ে আসছি আমি।'

তার পেছনে মাতসুরাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলো তোমোহিকো। দরজা বন্ধ হওয়ার সময় তার উদ্দেশে হাত নাড়লো সে। হিরোয়ে আর তোমোহিকো একবার দৃষ্টিবিনিময় করলো নিজেদের মধ্যে।

'ভাবছি কী নিয়ে এমন কথা হলো ওদের মধ্যে?' ভাবনায় ডুবে থেকে বলে উঠলো তোমোহিকো।

'কখনোই এরকম হতে দেখিনি আমি রিওকে,' নিজেও স্বীকার করলো হিরোয়ে। চোখদুটো আগের তুলনায় কিছুটা বড় হয়ে আছে তার।

এর কয়েক মিনিট বাদেই দোকানে ফিরলো রিও। 'তোমোহিকো,' মাথাটা দরজার ভেতরে ঢুকিয়ে বললো সে, 'পাশের রুমে এসো।'

'আসছি।'

তোমোহিকো বের হওয়ার আগেই রিও চলে গেল দরজার সামনে থেকে।

আড়চোখে একবার তাকালো হিরোয়ে, কিন্তু মাথা ঝাঁকিয়ে না করে দিলো তোমোহিকো।

পাশের রুমে কম্পিউটার চালু করা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে রিও। সিগারেটের গন্ধ এখনো মিশে রয়েছে বাতাসে। তোমোহিকোর জানামতে, রিও এ রুমে কাউকেই সিগারেট ধরাতে দেয়নি এর আগে। একটা এঁটো করা অ্যালুমিনিয়ামের ট্রে-কে অ্যাশট্রে হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

'একসময় অনেক কিছু করেছে লোকটা আমার জন্য, তাই একটু ধরাতে দিলাম আর কি,' ব্যাখ্যা করতে লাগলো রিও।

প্রথমে জোকস, আর এখন অজুহাত বানাচ্ছে?

রুমের বাতাস আবার ঠিক হয়ে আসতেই রিও জানালাটা বন্ধ করে দিয়ে সোফায় বসে পড়লো। 'এতসব জিনিস দেখে হয়তো হিরোয়ে উলটা-পালটা কিছু ভেবে নিয়েছে। ওকে বলে দিও যে মাতসুরা পাইকারিতে কিছু কম্পিউটার কিনতে চেয়েছে।'

'কে আসলে লোকটা?' বললো তোমোহিকো। 'কেন যেন ভালো ঠেকলো না আমার কাছে।'

'অনেক আগের একজন কর্মী,' বললো রিও।

'কী? আনলিমিটেড ডিজাইনস-এর?'

'আরে আমার কর্মী না। আমার বাবার। পনশপে কাজ করতো। এটার ব্যাপারে তো বলেছিলাম আমি তোমাকে, বলিনি?'

মাথা দোলালো তোমোহিকো। বিস্মিত হয়ে আছে সে।

'বাবার মৃত্যুর পরে সে-ই চালিয়েছে দোকান, ঐ পুরোপুরি বন্ধ হওয়ার আগ পর্যন্ত। সে সময়ে মাতসুরা না থাকলে রাস্তায় বসতে হতো আমাদের।'

তোমোহিকো বুঝতে পারছে না কী বলা উচিত তার। এত বছর পর এই প্রথম মনে হয় রিওর অতীত সম্পর্কে এতটা জানছে সে।

'তো কথা বলার পরে তোমার কী লাভ হয়েছে? আর তুমি যে এখানে আছো, এটাই বা জানলো কী করে সে? তুমি ডেকেছ তাকে?'

'না, তবে জানতাম সে আসবে। কারো থেকে শুনেছে যে আমি এখানে কাজ করি।'

'কার থেকে?'

ঠোঁটের কোণে হালকা হাসি ফুটে উঠলো রিওর। 'কানেশিরোর কাছ থেকে।'

ভ্রুকুটি করে তাকালো তোমোহিকো।

'মনে আছে মারিওর সেই গেমটা বিক্রি করা কতটা কঠিন হবে তা নিয়ে বলাবলি করেছিলাম আমরা? ওটারই সমাধান খুঁজে পেয়েছে তারা।'

'কী চাল চালবে?'

'কোনো চালই চালবে না,' হেসে বললো রিও। 'যাদের কাছে বিক্রি করতে চায়, তাদেরকে নিয়েই একটা কালোবাজার রয়েছে তাদের।'

'যাদের কাছে মানে? বাচ্চাদের বোঝাচ্ছো?'

'হ্যাঁ। মাতসুরা আপাতত একটা গোপন স্পেশিয়ালিটি শপের দালালি করছে। তোমার মাথায় যত ধরনের জিনিসের কথা আসে, মনে করো তার সবই ওখানে পাওয়া যায়। যে প্রডাক্টই বিক্রি হবে বলে মনে হয় তাদের কাছে, তাই কিনে নেয়। ইদানীং বাচ্চাদের সফটওয়্যারের দিকে বেশি নজর দিচ্ছে। আর এর কারণ হলো *সুপার মারিও ব্রোস*। এটা এতটাই মার্কেট ধরে রেখেছে যে আসলটার দামে বিক্রি করলেও সমস্যা হচ্ছে না।

'কিন্তু তার সোর্স কী? কোথা থেকে পাচ্ছে এসব? নিনটেন্ডো বা অন্য কারো সাথে যোগাযোগ আছে তার?'

'আরো ভালো কারো সাথে আছে,' দাঁতের পাটি দেখিয়ে হাসলো রিও। 'বাচ্চাদের দিয়ে এসব করায় তারা। মালবাহী গাড়ি থেকে চুরি করে বা বন্ধুদের কাছ থেকে হাতিয়ে নিয়ে ঐ দোকানে বিক্রি করে দেয়। মাতসুরা বলেছে তিনশোর উপরে কিশোর-তরুণ কাজ করে তার জন্য। দশ থেকে ত্রিশ পার্সেন্টে ওদের কাছ থেকে কিনে সত্তর পার্সেন্টে বিক্রি করে সে।'

'আর মারিওর গেমসও তার দোকানে বিক্রি করতে চাচ্ছে সে?'

'শুধু তার দোকানে না। আরো কয়েকজন দালাল ঠিক করা আছে তার। অবৈধ মালামাল বিক্রির জন্য পাইপলাইন করে নিয়েছে সে। মারিওর মতো পণ্য পাঁচ-ছয় হাজার কপি বিক্রি করাটা নাকি তার এক আঙুলের কাজ।'

'রিও,' বলে উঠলো তোমোহিকো, 'তুমি বলেছিলে এটা নিয়ে কাজ করবে না। বিপজ্জনক বলে না করে দিয়েছিলে, আর তার সাথে একমতও ছিলাম আমি।'

শুষ্ক একটা হাসি খেলে গেল রিওর মুখে। 'হ্যাঁ, মনে আছে আমার। আর এজন্যই ওরা মাতসুরাকে পাঠিয়েছে আমার কাছে।'

'প্লিজ বোলো না তুমি রাজি হয়েছ।'

লম্বা একটা শ্বাস ছাড়লো রিও। একটু এগিয়ে এসে বললো, 'দেখো, এটা একাই করছি আমি। এতে তোমার জড়ানোর কোনো দরকার নেই। আর তাছাড়া, আমি চাচ্ছিও না এতে তুমি জড়াও। এমনকি হিরোয়ের ক্ষেত্রেও না। ওর কাছ থেকে বিষয়টা গোপন রাখবে, কেমন?'

'রিও।' হালকা মাথা ঝাঁকালো তোমোহিকো। 'আর ঐ যে "বেশ ঝুঁকিপূর্ণ কাজ"–এই কথাটার কী হবে?'

'এখনো অনেক ঝুঁকিই আছে এটায়।'

তোমোহিকো চাচ্ছিলো এর বিরোধিতা করতে, কিন্তু রিওর চোখে স্থিরতা দেখে আর কিছু বললো না। 'ঠিক আছে,' বললো সে। 'আমিও তোমাকে সাহায্য করবো এ ব্যাপারে।'

'না, তুমি কিচ্ছু করবে না।'

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে অন্য দিকে ঘুরলো তোমোহিকো। ভালো লক্ষণ না এটা।

***

পুরো দেশ যখন নতুন বছরের ছুটিতে বন্ধ হয়ে আছে, তখন ডিসেম্বরের ৩১ তারিখ পর্যন্ত খোলা রইলো লিমিটলেস। এর দুটো সম্ভাব্য কারণ অবশ্য রয়েছে। প্রথমত, সেই সকল মানুষদের জন্য খোলা আছে যারা নতুন বছরের কার্ড সহজে লেখার জন্য ওয়ার্ড প্রসেসর কিনতে আসবে। আর দ্বিতীয়ত, ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের জন্য, যারা তাদের ভাঙাচোরা কম্পিউটার নিয়ে দোকানে আসবে সার্ভিসিং করাতে। কারণ তাদের পুরো বছরের হিসাব করার জন্য ওটা লাগবে।

এটাই রিওর ধারণা ছিলো। কিন্তু বাস্তবে ক্রিসমাসের পর তেমন কেউ দোকানে আসেইনি। শুধু একটা বাচ্চা ভুল করে ভিডিও গেমের দোকান ভেবে ঢুকে পড়েছিলো। হিরোয়ের সাথে কার্ড খেলে সময়টা পার করে তোমোহিকো। টেবিলভরতি কার্ড সামনে নিয়ে ওরা আলোচনা করে যে মানুষ *গো ফিশ* বা *ওল্ড মেইড*-এর মতো গেম খেলা বাদ দিয়ে দেবে কি না।

এদিকে কাস্টমারের অভাবে রিও পুরোপুরি ব্যস্ত হয়ে পড়েছে *সুপার মারিও ব্রোস* নিয়ে। রিও জানে এটা। আর হিরোয়েকে এ বিষয়ে অজুহাত দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে গেছে সে।

২৯ তারিখের দিন আবার এলো মাতসুরা। হিরোয়ে দাঁতের ডাক্তার দেখাতে যাওয়ায় দোকানে একাই ছিলো তোমোহিকো। সেই প্রথম দেখার পর থেকে আর তেমন দেখেনি সে মাতসুরাকে। এখনো পাণ্ডুর হয়ে আছে মুখটা, চোখগুলো চশমা দিয়ে ঢাকা। রিওর কথা জিজ্ঞেস করায় তোমোহিকো বললো যে সে বাইরে গেছে। লোকটা কিছু না বলে সেদিনের মতো একটা চেয়ার নিয়ে দরজার পাশে বসে পড়লো।

গায়ের থেকে কালো লেদারের জ্যাকেটটা খুলে চেয়ারের পেছনে ঝুলিয়ে দোকানের আশেপাশে একবার চোখ বোলালো মাতসুরা। 'বেশ অবাক হচ্ছি এখন পর্যন্ত দোকান খোলা রেখেছ দেখে,' বললো সে।

তোমোহিকো বললো যে এটা রিওর পলিসি। শুনে কাঁধ দুলিয়ে হাসলো মাতসুরা। 'বংশের রক্ত পেয়েছে ছেলেটা। ওর বাবাও এরকম নতুন বছর আসার আগে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করতো। সে সময় অনেক মানুষ ঘরদোর পরিষ্কার করতো, তাই অনেক পুরোনো জিনিস বিক্রি করতে আসতো আমাদের কাছে।'

এই প্রথম রিও ব্যতীত অন্য কাউকে রিওর বাবার সম্পর্কে বলতে শুনলো তোমোহিকো।

'ওর বাবা যখন মারা যায়, আপনি ছিলেন তখন?' জিজ্ঞেস করলো তোমোহিকো।

মাতসুরা তার দিকে চোখ ঘুরিয়ে বললো, 'ও তোমাকে এ ব্যাপারে বলেছে?'

'হালকা। বলেছিলো ছিনতাইয়ের ঘটনা ছিলো ওটা।'

রিওর বাবা ছুরিকাঘাতে মারা গেছে–ব্যস, এতটুকুই রিও বলেছিলো তার বাবার সম্পর্কে। আর সেটাও বছরখানেক আগে। ঘটনাটা নিয়ে বেশ আগ্রহ জেগেছিলো তোমোহিকোর, কিন্তু রিও এ নিয়ে কোনো আলোচনা করতে চায় না বলে জানিয়ে দিয়েছিলো তাকে।

'জানি না ছিনতাইয়ের কাহিনি ছিলো কি ছিলো না। তবে এতটুকু জানি এর পেছনে যে বা যারা ছিলো, তাদের কাউকেই ধরতে পারেনি পুলিশ।'

'ওহ, আচ্ছা।'

'পাশের এলাকার একটা পরিত্যক্ত বিল্ডিংয়ের ভেতর হত্যা করা হয়েছিলো তাকে। বুকের মধ্যে ছুরি ঢুকিয়ে,' ভ্রুকুটি করে বললো মাতসুরা। 'সাথে থাকা টাকাও নিয়ে গেছিলো তারা। মূল বিষয়টা হচ্ছে, সেদিন সে একটু বেশি টাকাই নিয়ে বেরিয়েছিলো। মানে যেমনটা সচরাচর কখনো করেনি আর কি। আর ওটাই পুলিশকে ভাবতে সাহায্য করে যে কাজটা যে বা যারা করেছে, তারা আগে থেকে ভিক্টিমকে চিনতো।' ঘটনার মাঝপথে নির্মম হাসি দিলো মাতসুরা যাতে তোমোহিকোর মনে থাকা প্রশ্নটা জেগে ওঠে।

'আপনাকেও সন্দেহ করেছিলো?'

'কিছু দিনের জন্য সন্দেহভাজনদের মধ্যে ছিলাম,' বললো মাতসুরা। হাসি বাড়ছে ধীরে ধীরে। যদিও তেমন কোনো আমেজ নেই ওতে। 'আসলে সে সময়ে রিওর মা দেখতে বেশ সুন্দরী ছিলো। যখন পুলিশ দেখলো একজন একা পুরুষ কাজ করছে পনশপে, তখন তাদের মাথায় আজেবাজে চিন্তা ঢুকে যায়।'

চোখের পলক ফেলে তাকিয়ে রইলো তোমোহিকো। *পুলিশ এই লোকের সাথে রিওর মায়ের সম্পর্ক আছে বলে সন্দেহ করেছিলো?*

'তার মানে, আপনি...?'

বলতে নিলো তোমোহিকো, কিন্তু তার আগেই প্রশ্নটা কেড়ে নিয়ে জবাব দিলো মাতসুরা। 'খুন করেছি? আরে নাহ!'

'রিওর মায়ের কথা বলছিলাম।'

'ওহ,' গালটা হালকা চুলকে নিয়ে বললো সে। 'আমি শুধু বেতনভুক্ত কর্মচারী ছিলাম, এই-ই যা।'

'আচ্ছা।'

'বিশ্বাস হচ্ছে না তোমার?'

'না, না, বিশ্বাস করেছি আপনাকে,' মিথ্যা বললো তোমোহিকো। তার মন বলছে নিশ্চয়ই এই লোক আর রিওর মায়ের মধ্যে কিছু একটা ছিলো। যদিও এর জন্য রিওর বাবাকে সে খুন করেছে—এমন সন্দেহ এলো না তার। 'আপনার অ্যালিবাই ঘেঁটে দেখেছিলো তারা?'

'অবশ্যই। ঐ পুলিশগুলো আসলেই নাছোড়বান্দা ছিলো। প্রথমে তো আমার অ্যালিবাই বিশ্বাসই করতে চাচ্ছিলো না। ঈশ্বরের কাছে অঢেল ধন্যবাদ সেদিন এক লোক ঠিক সময়ে ফোন করেছিলো বলে। যে সময়টাতে রিওর বাবা খুন হয়েছিলো, সে সময়ে দোকানের ফোনে কল করেছিলো লোকটা। আর যখন পুলিশ বুঝলো যে এগুলোর কোনোটাই বানানো কথা না, তখন হাল ছেড়ে দিলো তারা।'

'ভাগ্য সহায় হয়েছে আপনার,' বললো তোমোহিকো। পুরো বিষয়টা কেমন যেন গল্প-উপন্যাসের মতো লাগছে তার কাছে। 'রিও কী করে সামলালো শেষে?'

'ওহ, ওর প্রতি সবাই সহানুভূতি দেখিয়েছিলো। আর আমরা, মানে আমি আর রিওর মা যখন বললাম খুনের সময় সে আমাদের সাথেই ছিলো, তখন তার ব্যাপারে তেমন ঘাঁটেনি পুলিশ।'

'আপনি বলেছিলেন?' ভ্রু তুলে জিজ্ঞেস করলো তোমোহিকো।

'হ্যাঁ,' বলে উঠলো মাতসুরা। 'ও যে আমাদের সাথে ছিলো সেটা পুলিশকে বলেছিলাম। কারণ ও আসলেই আমাদের সাথে ছিলো।' নিকোটিন লেগে থাকা দাঁতের পাটি বের করে হাসলো সে। 'আমার সম্পর্কে রিও কিছু বলেছে তোমাকে কখনো?'

'উমম, বলেছে যে আপনি তার বাবার হয়ে পনশপে কাজ করতেন আর আপনার প্রতি ও অনেক ঋণী। মানে ওকে বেড়ে ওঠা, খাবার খাওয়ানো ইত্যাদি ব্যাপারে সাহায্য করেছেন আর কি।'

'আমার কাছে ঋণী, হাঁহ?' কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাসলো মাতসুরা। 'ভালো বলেছে। আসলেই সে ঋণী আমার কাছে। অন্তত যতটুকু সে ভাবে, তার থেকে আরো বেশিই।'

তোমোহিকো এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে নিচ্ছিলো, এমন সময় রিওর গলা শুনতে পেল সে।

'পুরোনো দিনের কথা হচ্ছে নাকি?'

তোমোহিকো মাথা তুলে তাকাতেই দেখলো রিও দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

'সেই পুরোনো আমলের কাহিনি ঘাঁটার কী দরকার?' মাফলার খুলতে খুলতে জিজ্ঞেস করলো রিও। 'যা হয়ে গেছে তা হয়ে গেছে।'

'আসলে বেশ ইন্টারেস্টিং বিষয়টা,' বললো তোমোহিকো।

'অ্যালিবাই নিয়ে কথা বলছিলাম আমরা,' বললো মাতসুরা। 'তোমার সেই গোয়েন্দাটার কথা মনে আছে, সাসাগাকি নাম যার? লোকটা কখন হাল ছেড়ে দিতে হয় তাই জানে না। সবকিছু বলার পরেও বারবার আসতো। মনে হয় একশোবারের উপরে একই কথা বলেছি তাকে।'

ইলেকট্রিক হিটারটার সামনে চেয়ার নিয়ে বসলো রিও, হাত গরম করছে ওতে। মাতসুরার দিকে ঘুরে বললো, 'কিছু লাগবে তোমার?'

'না, না, তেমন কিছু না। আসলে পাশ দিয়েই যাচ্ছিলাম, ভাবলাম শুভ নববর্ষ জানিয়ে যাই তোমাকে।'

'তাহলে এখন আসতে পারো। দুঃখিত, আজকে অনেক কাজ আছে আমাদের।'

'*আমাদের* বলতে?'

'আমি আর মারিও।'

মুখ টিপে হাসলো মাতসুরা। 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, করো তবে। ঠিকঠাক যাচ্ছে সবকিছু?'

'পরিকল্পনা অনুযায়ী আগাচ্ছে সব।'

সন্তুষ্ট চিত্তে মাথা দোলালো মাতসুরা। চেয়ার থেকে দাঁড়িয়ে গিয়ে আবার গলায় মাফলারটা পেঁচিয়ে নিলো রিও।

'আবার কথা হবে পরে, কেমন?' যেতে যেতে বলে উঠলো মাতসুরা।

তার কিছু বাদেই হিরোয়ে ঢুকলো দোকানে। নিচে রিওকে দেখেছে সে। মাতসুরাকে একটা ট্যাক্সি ধরিয়ে বিদায় জানাচ্ছে।

'রিওর সাথে ঐ লোকটার এত খাতির কীসের?' বিস্ময় নিয়ে বললো মেয়েটা। 'মানে ওর বাবা মারা যাওয়ার পরে সাহায্য করেছিলো, এর বাইরে কিছু আছে? দেখে তো অনেক ঘনিষ্ঠ মনে হচ্ছে দুইজনকে।'

কাঁধ ঝাঁকালো তোমোহিকো। একটু আগে যে বিশ্বাসটা তার ভেতর জন্ম নিয়েছিলো–মাতসুরা আর রিওর মায়ের মধ্যেকার সম্পর্ক নিয়ে–সেটা দ্রুত গায়েব হয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে একটা জায়গায় এসে থেমে যাচ্ছে সব–রিও ধরতে

পারেনি এটা কল্পনা করা যাচ্ছে না। আর সেই বিশ্বাস মিথ্যা না হলে এখন চোখের সামনে মাতসুরার সাথে তার এরকম ঘনিষ্ঠ হওয়ার কী ব্যাখ্যা আছে?

হিরোয়ে অফিস ডেস্কে বসে ঘুরে তাকিয়ে বললো, 'রিও কি আসবে না?'

'মনে হয় না।'

দোকান থেকে বেরিয়ে নিচে নামতে নিলো তোমোহিকো। হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো সে। সিঁড়ির তলাতেই দাঁড়িয়ে আছে রিও। পিঠের দিকটা দেখা যাচ্ছে তার। প্রায় ডাক দিতে নিচ্ছিলো তোমোহিকো, কিন্তু শব্দ না বেরিয়ে গলায় আটকে গেল তার। একটু অদ্ভুত লাগলো বিষয়টা। রিও সিঁড়ির মাঝখানে দাঁড়িয়ে ওখানে থাকা জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে। রাস্তা দিয়ে চলে যাওয়া গাড়ির আলোগুলো তার দেহের উপর এসে পড়ছে। ফলে গাঢ় একটা ছায়া তৈরি হতে হতেই আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। ওর ভেতর কেমন যেন একটা গাঢ় আঁধার টের পাচ্ছে তোমোহিকো। আর সেই আঁধার ওকে মনে করিয়ে দিচ্ছে মাতসুরাকে প্রথম দেখার পর রিওর মুখভঙ্গির কথা।

যথাসম্ভব শব্দ না করে আবার দোকানে ফিরে এলো সে।

১৯৮৫ সালের ডিসেম্বর মাসের ৩১ তারিখের দিনটায় লিমিটলেসের কাজ শেষ হলো সন্ধ্যা ছয়টা নাগাদ। অফিসের সবকিছু পরিষ্কার করার পর নতুন বর্ষ উদ্‌যাপন করলো তারা। তারা মানে তারা তিনজনই। হিরোয়ে জিজ্ঞেস করলো যে নতুন বছরের পরিকল্পনা কী।

তোমোহিকো বললো যে সে একটা গেম বানাতে চায় যেটা খেললে নিনটেন্ডোর গেম খেলার মতোই মজা পাবে মানুষ।

রিও বললো যে সে দিনের বেলা একটু হাঁটার জন্য সময় বের করবে।

'স্কুলে হেঁটে যাওয়ার সেই দিনগুলো মিস করছো?' হেসে জিজ্ঞেস করলো হিরোয়ে। 'নাকি যথেষ্ট ব্যায়াম করা হচ্ছে না, হুঁ?'

'ওরকম কিছু না...' মাথা ঝাঁকিয়ে বললো রিও। 'আসলে মাঝে মাঝে মনে হয় আমার জীবনটা কোনো মধ্যরাতের সূর্যের তলে বসেই কেটে যাচ্ছে।'

'আবার এসেছিলো?' জিজ্ঞেস করলো তোমোহিকো।

মাথা ঝাঁকালো রিও। হেইনিকেনের বোতলটা শেষ করে ওদের দিকে তাকালো একবার। 'তোমরা দুজন বিয়ে করছো কবে?'

তোমোহিকোর গলায় বিয়ার প্রায় আটকেই যাচ্ছিলো। 'আহ...ওসব নিয়ে ভাবিনি আমি তেমন।'

রিও একটু এগিয়ে এসে ডেস্কের ড্রয়ারটা খুললো। প্রিন্ট করা একটা কাগজ আর পাতলা বাক্স দেখা গেল ভেতরে। এই বাক্সটা এর আগে কখনো দেখেনি তোমোহিকো। বেশ পুরোনো দেখাচ্ছে ওটা, যদিও চারপাশটা মসৃণ এখনো বাক্সটার। ওটা খুলে এক জোড়া কেঁচি বের করলো রিও। দশ সেন্টিমিটারের মতো

লম্বা ওগুলো। বেশ ধারালো আর মাথায় সুচালো। কেঁচিটার উপরিভাগ রুপালি রঙের। দেখে মনে হয় যেন নতুন ধার দেওয়া হয়েছে, কিন্তু দেখে বোঝা যাচ্ছিলো কেঁচিটা অনেক পুরোনো।

'ওয়াও, সুন্দর কেঁচি তো,' বলে উঠলো হিরোয়ে।

'জার্মানদের এটা,' বললো রিও। 'পনশপ থাকাকালীন কেউ একজন বিক্রি করে দিয়েছিলো।' কেঁচিটা হাতে নিয়ে কয়েকবার কুচকুচ শব্দ করে চালালো ওটা। ধারালো ব্লেডগুলো নিশ্চুপ দোকানের ভেতরে মচমচ করে উঠলো কিছুটা। একটা কাগজ তুলে রিও হাত চালাতে লাগলো ওতে। এদিক-সেদিক ঘুরিয়ে কাটতে লাগলো কাগজটা। তোমোহিকো একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো রিওর হাতের দিকে। কাটা শেষ হলে কাগজটা হিরোয়ের হাতে দিলো রিও।

'চমৎকার!' চোয়াল ঝুলে গেছে হিরোয়ের।

কাগজটার ভেতরে দুটো অবয়ব দেখা যাচ্ছে; একটা ছেলে, আরেকটা মেয়ে। ছেলেটার মাথায় টুপি আর মেয়েটার চুল বাঁধা। দুজনে হাত ধরে আছে সেখানে।

'আসলেই দারুণ হয়েছে,' বললো তোমোহিকো। 'অনেক গুণ দিয়ে ঠাসা তুমি একেবারে, রিও।'

'ভেবে নাও বিয়ের আগের উপহার এটা।'

ওকে ধন্যবাদ জানিয়ে কাগজের টুকরোটা সাবধানে কাচের টেবিলের উপর রাখলো হিরোয়ে।

'তোমোহিকো,' বলে উঠলো রিও, 'কম্পিউটারের ব্যবসাটা মনে হচ্ছে না এত তাড়াতাড়ি হারিয়ে যাবে। আর এর থেকে ভালো কিছু টাকাও পাবে তুমি।'

'আমি কী বলবো এখানে? সবকিছু তো তুমিই চালাবে,' বললো তোমোহিকো।

মাথা ঝাঁকালো রিও। 'না, আমি না। এখন থেকে দোকানের ভার তোমার কাঁধে পড়বে।'

'মানে কী?' হাসলো তোমোহিকো। 'আমার মতো লোকের জন্য দায়িত্বটা অনেক ভারী।'

'মজা করছি না।'

'রিও–'

হঠাৎ ফোন বেজে উঠলো। অনেকটা দূরে বসে থেকেও ফোনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলো হিরোয়ে, অভ্যাসবশত ফোনটা কানে তুলে নিলো।

'হ্যালো, ধন্যবাদ লিমিটলেসে ফোন করার জন্য।' হঠাৎ কালো মেঘে ঢেকে গেল তার মুখটা। রিসিভারটা রিওর দিকে দিয়ে বললো, 'কানেশিরো।'

'নতুন বছরের এই দিনে?' বলে উঠলো তোমোহিকো।

ফোনটা কানের কাছে নিলো রিও। 'বলো?'

কয়েক মুহূর্ত পেরিয়ে যেতেই রিওর মুখটা শক্ত গেল। দাঁড়িয়ে গেল সে, হাতে তখনো ফোন। আরেক হাত ছুটে গেল চেয়ারে রাখা বেসবল জ্যাকেটটার দিকে। 'আচ্ছা, বাক্সটা আর প্যাকেজগুলো, বুঝেছি। ধন্যবাদ।' ফোনটা নামিয়ে রেখে ওদের দিকে একবার ফিরলো সে। 'যেতে হবে আমাকে একটু।'

'কোথায়?'

'পরে বুঝিয়ে বলবো,' বললো সে। মাফলারটা তুলে নিয়ে গলায় পেঁচিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল বেরিয়ে যাওয়ার জন্য।

তোমোহিকো একটু উঠেছিলো এগিয়ে দেওয়ার জন্য, কিন্তু রিও দ্রুত গতিতে ছুটে যাওয়ার কারণে ধরতে পারলো না। একদম রাস্তায় এসে একসাথে হলো তারা।

'রিও!' জোরে ডাক দিয়ে থামালো তাকে। 'কী হয়েছে?'

'কী হয়েছে না, কী হতে যাচ্ছে জিজ্ঞেস করো।' রাস্তার পাশ দিয়ে গাড়ি পার্ক করার জায়গায় যাওয়ার জন্য হাঁটছে রিও, তার ভ্যান রাখা ওখানে। 'মারিওর কপি করার বিষয়ে কেউ একজন জেনে গেছে। ক্রিমিনাল এফেয়ার আগামীকাল সব ফ্যাক্টরি আর গুদামঘরে তল্লাশি চালাবে।'

'ওরা কী করে জানলো?'

'নিশ্চয়ই কেউ গাদ্দারি করেছে।'

'কিন্তু পুলিশ যে আসছে এটা কানেশিরো কী করে জানলো?'

'গাদ্দারি দুই পক্ষ থেকেই হতে পারে।'

পার্ক লটে পৌঁছালো তারা। লাফ দিয়ে গাড়িতে উঠেই ইগনিশনে চাপ দিলো সে। গাড়ির ইঞ্জিন গরগর করে গর্জে উঠলো এই ডিসেম্বরের হিম শীতের মাঝেও।

'জানি না কখন ফিরবো আমি। তাই বলছি, চলে যাও। গিয়ে দোকান বন্ধ করে দিও। আর হ্যাঁ, দরজা লাগাতে ভুলো না। হিরোয়েকে যা বলে বোঝাতে পারো তাই বোলো।'

'তুমি নিশ্চিত আমার যাওয়া লাগবে না তোমার সাথে?'

'আগেই বলেছি এ ব্যাপারে তোমার জড়ানোর কোনো দরকার নেই।'

গাড়ির টায়ারগুলো প্রতিবাদ করতে করতে যেন পার্কিং লট থেকে বেরিয়ে গেল, তারপর মুহূর্তের মাঝে মিশে গেল রাতের অন্ধকারে। তোমোহিকো দোকানে ফিরে দেখলো হিরোয়ে তার জন্য অপেক্ষা করে আছে, চোখেমুখে চিন্তার ছাপ।

'রিও কোথায় চলে গেল?'

'ঐ একটা আর্কেড গেমে সমস্যা দেখা দিয়েছে...যেটাতে রিও প্রোগ্রাম করেছিলো আর কি।'

'নতুন বছরের এই অনুষ্ঠানের মধ্যেও সমস্যা খুঁজে পেয়েছে তারা?'

'এই সময়টা গেম প্রস্তুতকারকদের জন্য অনেক বড় সমস্যা। কারণ দোকানপাট খোলার আগে সবকিছু ঠিকঠাক করে রাখতে হয়।'

তোমোহিকো নিশ্চিত হিরোয়ে গল্পটা বিশ্বাস করছে না, কিন্তু যতটা সম্ভব তথ্যনির্ভর কিছু বলার চেষ্টা করছে সে। ভ্রু কুঁচকে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো হিরোয়ে।

তোমোহিকো আর হিরোয়ে এরপর টেলিভিশন ছেড়ে তার সামনে বসলো। পুরোনো কিছু প্রোগ্রাম চলছে টিভিতে। *টাইগারস* দলের ম্যানেজারকে খেলোয়াড়রা আকাশে তুলছে আনন্দের সাথে–এরকম একটা ফুটেজ ভাসতে লাগলো স্ক্রিনে। তোমোহিকো এ নিয়ে কমপক্ষে দশবার দেখেছে ফুটেজটা। তবুও নিঃশব্দে তাকিয়ে আছে টিভির দিকে। কেউই কোনো কথা বলছে না। যদিও তোমোহিকো বুঝছে যে হিরোয়ে টিভি দেখায় মনোযোগ দিতে পারছে না তার মতোই।

রিওর আসার আর কোনো খবর নেই।

'তুমি বাড়ি চলে যাও, হিরোয়ে,' বেশ লম্বা সময় পরে বললো তোমোহিকো। টিভিতে বড় একটা প্রোগ্রাম চালু হয়েছে এইমাত্র।

'আমিও তাই ভাবছিলাম,' একটু থেমে বললো হিরোয়ে। 'তুমি কি ওর জন্য অপেক্ষা করবে?'

মাথা দোলালো তোমোহিকো।

'গরম কাপড় পরে থেকো, কেমন?'

'আচ্ছা, ধন্যবাদ।'

'আর তারপর ও এলে কী করবে?'

'চলে আসবো আমি। একটু দেরি হবে হয়তো।'

'আচ্ছা। আমি সোবা নুডলস রেডি করে রাখবো তবে। রীতি এটা,' পাশ থেকে কোটটা গায়ে জড়িয়ে দোকান থেকে বের হতে নিলো সে।

একা থাকায় তোমোহিকোর মাথার ভেতর উদ্ভট সব চিন্তাভাবনা খেলা করতে শুরু করেছে। একবার ভেবেছে পুলিশ হয়তো দোকানের দরজা ভেঙে ফেলবে। এরপর খেয়াল করে দেখলো পুরোনো সেই প্রোগ্রাম বাদ দিয়ে নতুন বছরের উদ্‌যাপনের অনুষ্ঠান চালু করছে টিভি চ্যানেলগুলো। হিরোয়ের অ্যাপার্টমেন্টে ফোন করে জানিয়ে দিলো যে রাতে হয়তো ফিরতে পারবে না সে।

'রিও এখনো আসেনি?' জিজ্ঞেস করলো হিরোয়ে।

'না, মনে হচ্ছে একটু সমস্যার মধ্যে পড়ে গেছে সে। আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবো আমি ওর জন্য। আমার আশায় জেগে থেকো না যেন।'

'ঠিক আছি আমি। কয়েকটা মুভি দেখবো বলে ঠিক করেছি,' জোর করে কণ্ঠে উচ্ছ্বাস টেনে এনে বললো সে।

তোমোহিকো নিজেও একটা মুভি দেখা শুরু করলো রাত তিনটার পরে। আর তখনই দরজা খুলে গেল দোকানের। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে রিও, চোখেমুখে একধরনের তিক্ততা। ওর দিকে একপলক তাকাতেই চোয়াল ঝুলে গেল

তোমোহিকোর। পরনের জিন্সটা কাদায় মাখামাখি অবস্থা, আর সেই বেসবল জ্যাকেটটার হাতা ছেঁড়া। এক হাতে মাফলার ধরে আছে সে।

'কী হয়েছে, রিও?'

জবাব দিলো না সে। ক্লান্ত দেখাচ্ছে তাকে। মাথা ঝুলিয়ে উবু হয়ে বসলো ছেলেটা।

'রিও-'

'বাড়ি যাও,' বললো রিও। চোখ বন্ধ হয়ে আছে তার।

'কিন্তু-'

'বাড়ি যেতে বলেছি আমি।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে নিজের মালামালগুলো গোছাতে শুরু করলো তোমোহিকো। পুরো সময়টা রিও সেভাবেই বসে রইলো, একটুও নড়লো না।

'ঠিক আছে, যাচ্ছি। পরে আবার দেখা হবে,' বললো তোমোহিকো। এবারও কোনো জবাব দিলো না তার বন্ধু।

তোমোহিকো যেই দরজাটা খুললো, অমনি পেছন থেকে তার নাম ধরে ডাকলো রিও।

'হ্যাঁ?' ফিরে তাকালো তোমোহিকো। একই রকমভাবে বসে আছে রিও, চোখ মেঝের দিকে। যেই ও কিছু একটা বলতে নিচ্ছিলো, হঠাৎ রিও বলে উঠলো, 'হ্যাপি নিউ ইয়ার।'

'হুম, তোমাকেও। বাড়ি গিয়ে কিছুটা ঘুমানো দরকার তোমার।'

এবারও জবাব দিলো না রিও। কাঁধ ঝাঁকিয়ে দরজা খুলে দোকান থেকে বেরিয়ে গেল তোমোহিকো।

***

জানুয়ারির ৩ তারিখে পত্রিকায় বিশাল বড় করে ছাপা হলো *সুপার মারিও ব্রোস*-এর পাইরেটেড কপি উদ্ধারের খবর। মালগুলো উদ্ধার করা হয়েছে এক পাইকারি ভিডিওগেম বিক্রেতার বাড়ির পাশ থেকে, যে কিনা এখনো পর্যন্ত নিখোঁজ আছে। তোমোহিকো নিশ্চিত এটা মাতসুরার বাড়ি। পুলিশ অবশ্য এই পাইরেটেড কপি কী করে করা হয়েছে বা এই কপি বিক্রির রাস্তাই বা কী তা কিছুই ধরতে পারেনি। তাদের ধারণা কোনো গ্যাংয়ের কাজ এটা। আর্টিকেলের কোথাও রিওর নাম নেই। রিওর বাসায় ফোন দিয়েছিলো সে, কিন্তু কেউ ধরেনি।

জানুয়ারির ৫ তারিখ নিয়ম অনুযায়ী লিমিটলেস খোলা হলো। রিওর তখনো কোনো দেখা নেই, ফলে তোমোহিকো আর হিরোয়েকেই সামলাতে হলো দোকানের বেচাকেনা। এখনো স্কুলগুলোতে শীতকালীন ছুটি চলায় স্কুলের ছাত্রছাত্রীরাই বেশি আসছে তাদের দোকানে। আজকেও তোমোহিকো কয়েকবার ফোন করেছিলো রিওকে, কিন্তু কেউ তোলেনি।

'তোমার কি মনে হয় কিছু হয়েছে তার?' জিজ্ঞেস করলো হিরোয়ে।

'ওকে চিনি বলেই বলছি, এগুলো নিয়ে দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই,' আশ্বাস দিলো তোমোহিকো। 'বাড়িতে যাওয়ার সময় একবার দেখা করে যাবো।'

'হ্যাঁ, ভালো বলেছ,' মেনে নিলো মেয়েটা। ওর চোখদুটো রিও যেখানে বসতো সেখানে গেল একবার। রিওর মাফলারটা চেয়ারের পেছনে ঝুলছে–যেটা নতুন বছরের অনুষ্ঠানে পরেছিলো সেটা।

হিরোয়ে একটা ছোট ফ্রেম এনেছে দেয়ালে টানানোর জন্য। ওটার ভেতরে সেদিন রিওর দেওয়া সেই কাগজের কাটা টুকরোটা রেখেছে সে। হঠাৎ তোমোহিকোর মাথায় একটা ভাবনা আসতেই রিওর ডেস্কের ড্রয়ারটা খুললো সে। কেঁচিসহ সেই বাক্সটা নেই ওখানে। এই প্রথম তোমোহিকোর মনে একটা কুডাক দিলো যে সে হয়তো রিওকে আর কখনো দেখতে পাবে না।

কাজ শেষে বাড়ি ফেরার পথে রিওর বাসার সামনে একবার থামলো তোমোহিকো। চারপাশ অন্ধকার হয়ে আছে, আর সব আলো নেভানো। দরজায় কয়েকবার কড়া নাড়লো সে। তারপর দরজার বেল বাজিয়েও কারো সাড়া পাওয়া গেল না।

সেদিনের পরের দিন কিংবা তার পরের দিনও রিও কাজে ফিরলো না। শেষমেশ তার ফোনটাও বন্ধ শোনালো। তোমোহিকো আরেকবার তার অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে দেখলো যে কিছু লোক ঘরের মালপত্র একটা ট্রাকে বোঝাই করছে। এদেরকে এর আগে কখনোই দেখেনি।

'কী করছেন এসব আপনারা?' একটা লোককে দেখে জিজ্ঞেস করলো সে। দেখে মনে হচ্ছিলো এসবের হর্তাকর্তা সে-ই।

'অ্যাপার্টমেন্ট খালি করছি। মালিক বলে দিয়েছে করতে।'

'আপনারা কারা?'

'হ্যান্ডিমেন সার্ভিস,' সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে জবাব দিলো লোকটা।

'রিও কি অন্য কোথাও চলে গেছে?'

ভ্রু তুলে ওকে দেখলো লোকটা। 'কোন রিও?'

'এখানে থাকতো যে।'

'অবশ্যই গেছে। যেহেতু আমরা পরিষ্কার করছি, সেহেতু ওর থাকার কথা না এখানে।'

'আপনি জানেন কোথায় গেছে সে?'

'এ বিষয়ে কিছু শুনিনি আমরা। তাই বলতে পারছি না।'

ভ্রুকুটি করে তোমোহিকো বললো, 'আপনারা এই মালপত্র কি কোথাও নিচ্ছেন না?'

'আসলে আমাদেরকে বলা হয়েছে সবকিছু ফেলে দিতে।'

'ফেলে দিতে? সবকিছু?'

'হ্যাঁ, সবকিছু।' বলেই কর্মরত অন্য লোকদের দিকে ফিরে কোন কাজটা কীরকম করে করতে হবে তা চেঁচিয়ে নির্দেশ দিলো লোকটা। 'দুঃখিত, কিছুটা ব্যস্ত আছি তো, তাই কথা বলতে পারছি না।'

***

যখন হিরোয়ে ঘটনাটা শুনলো, ওর চেহারায় বিহ্বলতার ছাপ স্পষ্ট হয়ে পড়লো। 'আমাদের কিছু বললো না কেন?'

মাথা নাড়লো তোমোহিকো। 'আমি নিশ্চিত রিও কিছু একটা পরিকল্পনা করেছে—এমনটাই করে সে। আমাদেরকে শুধু একটু অপেক্ষা করতে হবে। আর যা করছি তার পেছনে লেগে থাকতে হবে।'

'তোমার মনে হচ্ছে সে ফোন করবে?'

'অবশ্যই করবে। আমাদের শুধু সেই সময়টুকু পর্যন্ত গুছিয়ে চলতে হবে।'

মাথা দোলালো হিরোয়ে, যদিও তার মুখ দেখে মনে হচ্ছে না পুরোপুরি বিশ্বাস করছে সে।

দোকান খোলার পাঁচ দিন পরে এক দুপুরবেলা একটা লোক তাদের দোকানে এলো। পঞ্চাশের কাছাকাছি তার বয়স, পুরোনো হেরিংবোনের একটা জ্যাকেট গায়ে জড়ানো। বয়সের তুলনায় যথেষ্ট লম্বা সে, আর কাঁধটাও বেশ চওড়া। চোখে একধরনের তীক্ষ্ণতা আছে। তবে কোমল হাসির কারণে প্রথম দেখাতেই লোকটাকে পছন্দ হয়ে গেল তোমোহিকোর। এমনকি এটা বোঝা সত্ত্বেও যে লোকটা এখানে কিছুই কিনতে আসেনি।

'তুমি চালাও এই ব্যবসা?' ওর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো লোকটা।

'জি,' তোমোহিকো বললো।

হালকা মাথা দোলালো লোকটা। 'তোমার বয়স তো অনেক কম। রিওর সমবয়সি তুমি?'

চোখ কিছুটা বড় হয়ে গেল তোমোহিকোর।

'আমি কিছু প্রশ্ন করতে চাই তোমাকে, যদি সময় থাকে তো।'

'দুঃখিত, আপনি কি কিছু খুঁজছেন?'

মাথা ঝাঁকালো লোকটা। 'আমি কোনো কাস্টমার না।' পুলিশের ব্যাজটা পকেট থেকে বের করে দেখালো তোমোহিকোকে।

তোমোহিকোর মনে পড়ে গেল স্কুলে থাকতে এরকম গোয়েন্দা আসার কথা। যে লোকটা দাঁড়িয়ে আছে সামনে, তার থেকেও সেই একই রকমের দ্যুতি বেরোচ্ছে। হিরোয়ে বাইরে থাকা অবস্থায় লোকটা আসাতে তোমোহিকো কিছুটা স্বস্তি পেল মনে মনে।

'রিওকে খুঁজতে এসেছেন আপনি?'

'বসতে পারি একটু?' তোমোহিকোর সামনে রাখা ফোল্ডিং চেয়ারটার দিকে নির্দেশ করে বললো লোকটা।

'অবশ্যই। আসুন, আসুন।'

'ধন্যবাদ।' চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে পড়লো লোকটা। দোকানের ভেতরে একবার চোখ বুলিয়ে নিলো সে। 'বেশ ভালো জিনিস দিয়েই ভরে রেখেছ দোকান। তা বাচ্চারা এসব কিনতে আসে?'

'অনেক প্রাপ্তবয়স্ক কাস্টমারও আছে আমাদের, কিন্তু বেশিরভাগই মিডল স্কুলের বাচ্চাদের পণ্য।'

মাথা ঝাঁকালো লোকটা। 'দুনিয়া কখনোই পরিবর্তন হওয়া থামায় না। আর আমিও হাল ছাড়তে পারি না।'

'দুঃখিত, আপনি কী যেন জিজ্ঞেস করবেন বলেছিলেন আমাকে?' কিছুটা উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করলো তোমোহিকো।

হেসে উঠলো গোয়েন্দা, তোমোহিকোর এই অস্বস্তি দেখতে ভালো লাগছে তার। 'তোমার ম্যানেজার, মানে রিও কিরিহারা, জানো কোথায় আছে সে?'

'কোনো কিছুর জন্য দরকার ওকে?'

'কিছু প্রশ্ন করতাম আর কি,' হেসে বললো গোয়েন্দা। 'যে বাসায় সে গত এক বছর ধরে থাকতো, সেখান থেকে সরে যাচ্ছে সে। গিয়ে দেখলাম পুরো খালি পড়ে আছে জায়গাটা। সে কারণেই এখানে এসেছি।'

তোমোহিকো প্রথম থেকেই বুঝেছিলো লোকটাকে ঘোল খাইয়ে তার কোনো লাভ হবে না। 'আসলে আমরাও বেশ চিন্তিত সে কোথায় আছে তা নিয়ে। আপনার ম্যানেজার যদি হুট করে হাওয়া হয়ে যায়, তবে বুঝতেই পারছেন কী অবস্থা হতে পারে।'

'শেষ কবে দেখা হয়েছিলো ওর সাথে?'

'নতুন বছরের শুরুতে। একসাথে দোকান বন্ধ করেছিলাম আমরা।'

'এরপর আর কোনো কথা হয়েছে তোমাদের মধ্যে? মানে ফোন বা অন্য কিছু?'

'নাহ।'

'বন্ধুদের কিছু না বলে একদম হুট করে উধাও হয়ে গেল সে। অস্বাভাবিক লাগছে কিছুটা।'

'*অস্বাভাবিক* শব্দটা দিয়ে ঝামেলার অর্ধেকটাও বোঝা যাবে না। আমাদের নিজেদেরই বেশ সমস্যার মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে এর জন্য।'

'তাতে কোনো সন্দেহ নেই আমার,' গাল চুলকে বললো গোয়েন্দা। 'শেষ কবে রিওকে দেখেছিলে? তখন কি অস্বাভাবিক কিছু দেখেছ তার মধ্যে?'

'তেমন কিছু তো নজরে আসেনি,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো তোমোহিকো। গলার স্বর স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করলো সব সময়ের মতো। 'যেরকম দেখতাম ওকে, তেমনই ছিলো সেদিন।'

পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা ছবি বের করে আনলো গোয়েন্দা। 'এই লোককে দেখেছ কখনো?'

কোমর থেকে উপরে তোলা মাতসুরার একটা ছবি। তোমোহিকো এক মুহূর্তের জন্য দ্বিধায় পড়ে গেল এর জবাব কী দেবে তা নিয়ে। *মিথ্যা যত কম বলা যায় ততই ভালো।*

'এ তো মাতসুরা। রিওর পারিবারিক কর্মী ছিলো না সে?'

'এখানে কখনো এসেছিলো?'

'হ্যাঁ, কয়েকবার এসেছিলো।'

'কীসের জন্য?'

কাঁধ ঝাঁকালো তোমোহিকো। 'প্রথম যেদিন এসেছিলো, সেদিন একটু কথা হয়েছিলো আমার। বলেছিলো রিওকে ছোটবেলা থেকে দেখেশুনে আসছে সে।'

তীক্ষ্ণ চাহনি দিয়ে তোমোহিকোর দিকে তাকালো গোয়েন্দা, পলক না ফেলে তোমোহিকোও তার দিকে তাকিয়ে রইলো।

'যেদিন মাতসুরা এসেছিলো, সেদিন কি রিওর মধ্যে কোনো পরিবর্তন লক্ষ করেছিলে? এমন কিছু বলো যেটা তোমার মনোযোগ কেড়ে নিয়েছিলো সেদিন।'

'না তো। বেশ খুশিই লাগছিলো ওকে দেখে। অনেক দিন বাদে দেখা হলে যেমন কথা বলে মানুষ, তারা তেমন করে কথা বলেছিলো অনেকক্ষণ।'

'অনেকক্ষণ? তাই তো?' চোখ আচমকা দুলে উঠলো গোয়েন্দার।

'হ্যাঁ।'

'তোমার কি মনে আছে কী নিয়ে কথা বলেছিলো ওরা, নাকি নেই? পুরোনো দিনের কোনো কথা শুনেছিলে নাকি?'

'তেমন নির্দিষ্ট কিছু তো শুনিনি। বেশিরভাগ সময় কাস্টমার সামলাতেই চলে গেছিলো আমার।' তোমোহিকোর মনে হলো রিওর বাবার সম্পর্কে যে কথা হয়েছিলো লোকটার সাথে, তা না বলাটাই উত্তম।

আর তখনই দরজা খুলে একটা ছেলে ভেতরে ঢুকলো। তোমোহিকো একটু হেসে 'হাই' বলে চেঁচিয়ে উঠলো সেখান থেকেই।

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লো গোয়েন্দা। 'পরে আবার আসবো তবে।'

'রিওর কি কিছু হয়েছে?' লোকটাকে দাঁড়াতে দেখে জিজ্ঞেস করলো তোমোহিকো।

জবাব দিতে গিয়ে একটু যেন দ্বিধায় পড়ে গেল গোয়েন্দা। 'আমি এখনো জানি না সে কী করেছে। তবে মনে হচ্ছে কিছু একটার সাথে জড়িয়ে পড়েছে সে।'

'কিছু একটা বলতে?'

গোয়েন্দা জবাব দিলো না তার প্রশ্নের। উপরে তাকিয়ে দেয়ালে থাকা ফ্রেমটার দিকে লক্ষ করে বললো, 'রিও বানিয়েছে ওটা?'

'হ্যাঁ।'

'ছেলেটার হাত এখনো পাকাই আছে তাহলে। একটা ছেলে আর একটা মেয়ে হাত ধরে আছে? ভালোই।'

তোমোহিকোর মনে হলো যে কারণেই লোকটা আসুক না কেন, তা এই মারিও পাইরেসি বা এখনকার কোনো বিষয়ের জন্য আসেনি। আরো গভীর কিছু আছে এখানে।

'তোমার সময় নষ্ট করার জন্য দুঃখিত,' দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বললো গোয়েন্দা।

'এক্সকিউজ মি, স্যার?' পেছন থেকে ডাকলো তোমোহিকো। 'আপনার নামটা কি জানতে পারি?'

থেমে গেল গোয়েন্দা। 'সাসাগাকি।' বলেই আর না ঘুরে হাত নেড়ে বেরিয়ে গেল।

কপালের উপর আঙুল বোলাতে লাগলো তোমোহিকো। মাতসুরা না একবার এই সাসাগাকি নামটা বলেছিলো? এটাই কি সেই গোয়েন্দা যে অত বছর আগের সেই অ্যালিবাইগুলো বিশ্বাস না করে তাদের জ্বালাতন করতো?

একটা লম্বা শ্বাস ছেড়ে দেয়ালে থাকা কাটা কাগজের ফ্রেমটার দিকে তাকালো সে। ওটা আর সেই মাফলারটাই ফেলে গেছে রিও।

অধ্যায় নয়

সোমবার দিন সকালবেলা তোজাই অটোমোটিভ কোম্পানির অধিকাংশ ম্যানেজারই তাদের সাপ্তাহিক মিটিং রাখে। প্রত্যেকটা বিভাগীয় প্রধান তাদের উর্ধ্বতন কর্মকর্তার থেকে বিভিন্ন সংবাদ পেয়ে থাকে এই দিনে। আবার কোনো টিম লিডারের যদি কোনো সমস্যা থেকে থাকে, তবে এই দিনেই তা বলা হয়।

আজ, এই এপ্রিলের মাঝামাঝি সোমবারে, পেটেন্ট লাইসেন্সিং বিভাগের প্রধান নাগাসাকা বিশাল সেতো ব্রিজের কথা তুললো। এই কিছু দিন হলো ওটার কাজ শেষ হয়েছে এবং ইনল্যান্ড সি-তে যাওয়ার জন্য গত সপ্তাহে খুলেও দিয়েছে। একই সাথে সেইকান টানেলের কথাও তুললো, যেটা গত মাসে খুলে দেওয়া হয়েছিলো। ওটা দিয়ে মূল ভূখণ্ডের উত্তরে থাকা হোক্কাইডোতে যাওয়া যাবে। এর প্রেক্ষিতে সে বলতে লাগলো যে জাপান হাতের মুঠোয় চলে আসছে দিন দিন, সেই সাথে মানুষ বেশি বেশি গাড়ি ব্যবহার করার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। যার মানে হলো, এখন গাড়ির বিভিন্ন পার্টসের চাহিদা বাড়বে। আর এতে করে প্রতিযোগিতাও বাড়বে সেসব পার্টস মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। 'জাপান হাতের মুঠোয় চলে আসছে দিন দিন'–কথাটা সে প্রায় মিটিংয়েই বলে থাকে।

মিটিং শেষ হওয়ার পর যে যার ডেস্কে ফিরে গিয়ে কাজ করতে শুরু করলো। কেউ ফোন করছে, কেউ বা ডকুমেন্ট দেখছে, কেউ কেউ আবার ছুটোছুটি করছে। তোজাই অটোমোটিভ কোম্পানির ব্যস্ততায় ভরা সোমবারের এক সকাল।

মাকোতো তাকামিয়াও অন্য সবার মতো করেই আজকের দিনটা শুরু করেছে। গত শুক্রবার যে পেটেন্ট অ্যাপ্লিকেশন ফেলে গেছিলো, সেগুলো নিয়ে কাজ শুরু করলো সে। কাজের চাপ কমানোর জন্য সে একটু বেশি কাজ করতে লাগলো যাতে আগামী সপ্তাহের মধ্যে কাজটা শেষ হয়। আর এরমধ্যেই আবার ডাক এলো ই-টিমের থেকে। নারিতা ডেকেছে এবার, যার কিনা এই গত বছরের শেষ দিকে প্রমোশোন হয়েছে।

কোম্পানির ই-টিম হচ্ছে সকল প্রকার ইলেকট্রনিক্স পণ্যের দায়িত্বে থাকা টিম। সব মিলিয়ে পাঁচজন নারিতার অধীনে কাজ করে। সবাই-ই বসের ডেস্কের সামনে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে এই মুহূর্তে।

'খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এটা,' বললো নারিতা। চোখমুখ শক্ত হয়ে আছে তার। 'আমাদের ম্যানুফ্যাকচারিং এক্সপার্ট সিস্টেমের ব্যাপারে কথা বলার জন্যই আসলে ডাকা হয়েছে আপনাদের। আপনারা কি জানেন সেটা কী?'

ইয়ামানো বাদে সবাই-ই মাথা দোলালো। নতুন জয়েন করেছে সে। একটু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'সরি?'

'তুমি কি এক্সপার্ট সিস্টেম কী তা জানো?' জিজ্ঞেস করলো নারিতা।

'আমি এটার সম্পর্কে হালকা-পাতলা শুনেছি। এর বাইরে তেমন জানি না।'

'আর এআই সম্পর্কে?'

'আর্টিফিশিয়াল ইন্টালিজেন্স। হ্যাঁ, তা জানি,' বললো ইয়ামানো। যদিও কণ্ঠে আত্মবিশ্বাসের ছাপটুকুও নেই।

পুরো বিশ্বে কম্পিউটারের অগ্রগতি তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে বলতে গেলে মানুষের মস্তিষ্কের অনুরূপ সব ফাংশন তৈরি করা হচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, দুটো লোক একে অপরের পাশ দিয়ে চলে যাওয়ার সময় তাদের মাঝখানে কতটুকু খালি জায়গা থাকলে ধাক্কা লাগবে না তা মেপে দেখে না। এর বদলে তারা তাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা এবং অনুমান ব্যবহার করে। আর এই ধরনের নমনীয় চিন্তাভাবনা এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা যেন কম্পিউটারের থাকে সে উদ্দেশ্যেই এআই প্রযুক্তি এসেছে।

'আচ্ছা, শুনুন তাহলে, এক্সপার্ট সিস্টেম হচ্ছে এই এআইয়েরই একটা প্রয়োগ। কিছু কিছু ফিল্ডে যারা দক্ষ হিসেবে নিয়োজিত আছে, তাদেরকে সরিয়ে দেওয়াই এর উদ্দেশ্য,' ব্যাখ্যা করে বললো নারিতা। 'আর, কোনো একটা ক্ষেত্রে একজন দক্ষ মানুষ থাকা মানে সে ঐ বিষয় সম্পর্কে যে শুধু জানে এমন না, তার মাথায় সেই তথ্য কীভাবে পরিচালনা করতে হয় সে জ্ঞানও থাকে। এখন যদি আপনি সেই জানার বিষয় এবং তথ্যকে একত্র করে একটা সিস্টেমের ভেতর আনতে পারেন তো যেকোনো অনভিজ্ঞ লোকও অভিজ্ঞ লোকের মতো কাজ করতে পারবে। আর এটাই হলো এক্সপার্ট সিস্টেমের কাজ। এরই মধ্যে ঔষধ এবং আর্থিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে কাজ করা শুরু করে দিয়েছে এটা।'

তার কথা বুঝতে পারছে কি না এটা দেখার জন্য ইয়ামানোর দিকে তাকালো নারিতা।

মাথা দোলালো ইয়ামানো, যদিও এখনো কিছুটা সন্দিহান দেখাচ্ছে ওকে।

'আমরা আমাদের অনেক শ্রম গত দুই-তিন বছর ধরে এটার পেছনে ব্যয় করছি। আমাদের কোম্পানি দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে, আর এর ফলে বয়সের একটা ফারাক তৈরি হচ্ছে আমাদের নতুন এবং পুরাতন কর্মীদের মধ্যে। তার মানে, যখন আমাদের পুরোনো কর্মীরা সব অবসর নিয়ে নেবে, তখন দক্ষ কর্মীদের হারাবো আমরা। বিশেষ করে ম্যানুফ্যাকচারিং-এ, যেমন ধাতুবিদ্যা, তাপ পরিচালনা আর কেমিক্যাল প্রসেসের ক্ষেত্রে। এসব বিষয়ে প্রফেশনালদের দক্ষতা আর জ্ঞানের প্রয়োজন আমাদের। আর এজন্যই পুরোনো কর্মী হারানোটা আমাদেরকে বেশ কঠিন পরিস্থিতির মুখে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে। তাই এরকম একটা এক্সপার্ট সিস্টেম বানাচ্ছি যাতে একদমই নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মীরাও সেটা পরিচালনা করতে সক্ষম হয়।'

'আর এটাই কি সেই ম্যানুফ্যাকচারিং এক্সপার্ট সিস্টেম?'

'একদম। আমরা বর্তমানে একটা ট্যান্ডেমের[৫] উপর এর প্রয়োগ করছি, আমাদের ম্যানুফ্যাকচারিং টেকনোলজি এবং সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট বিভাগে। এরমধ্যেই ওটা ওদের ওয়ার্কস্টেশনে চলে গেছে এবং ব্যবহারযোগ্য বলে নিশ্চিত করা হয়েছে, অথবা ব্যবহারযোগ্য বলে ধরে নেওয়া হয়েছে,' বললো নারিতা। এরপর বাকি তিনজনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'ঠিক কি না?'

'কাজ করবে নিশ্চিত,' বললো মাকোতো। 'যদিও ওটা ব্যবহার করার জন্য পাসওয়ার্ড দিতে হবে।'

এই টেকনোলজিক্যাল ইনফরমেশন পাসওয়ার্ড দেওয়ার কারণ ছিলো যাতে করে কোম্পানির বাইরের কেউ অথবা কোম্পানির ভেতরের কেউ যাদের কাছে ব্যবহার করার অনুমতি নেই, তারা যেন ব্যবহার করতে না পারে। মাকোতোর পেটেন্ট বিভাগের সবার কাছেই এটা রয়েছে কারণ পেটেন্টের বিভিন্ন তথ্য খুঁজে বের করতে এটার প্রয়োজন হয়।

'যাই হোক, অনেক ব্যাখ্যা দিয়েছি,' গলা নামিয়ে বললো নারিতা। 'আমাদের এত কিছু জানার দরকার নেই। যেহেতু এখনো পর্যন্ত এই এক্সপার্ট সিস্টেম কোম্পানিতেই ব্যবহার করা হচ্ছে, সেহেতু আমাদের পেটেন্ট বিভাগের উপর এর কোনো প্রভাব পড়বে না। অন্তত পড়া উচিত না বলেই আমার বিশ্বাস।'

'কিন্তু কিছু একটা তো হয়েছে?' জিজ্ঞেস করলো একজন।

মাথা দোলালো নারিতা। 'সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট বিভাগের কেউ একজন এসেছিলো। মূলত মধ্যম পর্যায়ের কিছু কর্মীর বিপরীতে একটা কম্পিউটার প্রোগ্রাম তৈরি করছে তারা। ধাতুবিদ্যার একটা এক্সপার্ট সিস্টেম।'

একে অপরের দিকে তাকালো একবার সবাই।

'কোনো সমস্যা হয়েছে সফটওয়্যারটা নিয়ে?' জিজ্ঞেস করলো মাকোতো।

একটু সামনে এগিয়ে এলো নারিতা। 'টিমের এক মেম্বার একটা কপি পেয়েছে সেদিন। সেটাতে ভালো করে খেয়াল করতেই দেখে যে আমাদের কোম্পানির ম্যানুফ্যাকচারিং সিস্টেমে থাকা ধাতুর উপাদানের অনেক কিছুই ওটাতে হুবহু রয়েছে।'

'আমাদের প্রোগ্রাম কি কেউ ফাঁস করে দিলো?' মাকোতোর এক ঊর্ধ্বতন বলে উঠলো।

'নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না। তবে হ্যাঁ, এটা হওয়ার সম্ভাবনা আছে।'

'আর এই সফটওয়্যারটা কারা বানিয়েছে তাও জানা যায়নি, না?' জিজ্ঞেস করলো মাকোতো।

'না, আমরা জানি কারা চালাচ্ছে এটা। শহরেরই এক সফটওয়্যার কোম্পানি এটা। টোকিওর ভেতরে। পিআর-এর মাধ্যমে প্রোভাইড করছে তারা এটা।'

'পিআর?'

'হ্যাঁ, মূল সফটওয়্যারের ডেমো ভার্শন। প্রথমে কাস্টমারদের ওটা দিয়ে চালাতে দেওয়া হয়, এরপর পছন্দ হলে পুরো প্যাকেজটা কিনতে পারে।'

মাথা নাড়লো মাকোতো। তার কাছে মনে হচ্ছে কোনো কসমেটিক কোম্পানির মতো স্যাম্পল দেখিয়ে বেড়াচ্ছে কোম্পানিটা।

'সমস্যা হলো,' বলতে থাকলো নারিতা, 'এই যে আমাদের কোম্পানি থেকে তথ্য চুরি হলো, আর এই চুরি করা তথ্য দিয়েই যে তারা প্রোগ্রাম বানালো, এটা কীভাবে প্রমাণ করবো আমরা? আর যদিও বা পারি প্রমাণ করতে, তবুও কি বৈধ কোনো উপায়ে ওদের সফটওয়্যার বন্ধ করতে পারবো?'

'আমরা কি খতিয়ে দেখতে চলেছি নাকি এ বিষয়ে?' জিজ্ঞেস করলো মাকোতো।

হালকা মাথা দোলালো নারিতা। 'এর আগেও সফটওয়্যারের উপর কপিরাইট জারি করা হয়েছিলো। কিন্তু মূল সমস্যাটা হলো এটা প্রমাণ করা যে আদৌ প্রোগ্রামটা চুরি করা কি না। অনেকটা লেখা কারচুপি করার মতো। চুরি আর কাকতালীয়ভাবে হয়ে যাওয়া এই দুটো বিষয়ের মধ্যে প্রমাণ করা আসলে কঠিন হয়ে পড়ে। তবুও যতটুকু পারা যায়, ততটুকু করতে হবে আমাদের।'

'তা ঠিক,' বলে উঠলো ইয়ামানো, 'কিন্তু আমাদের এক্সপার্ট সিস্টেমটা কী করে লিক হলো? আমার জানামতে তো সব তথ্য লক করা থাকতো।'

ঠোঁট উলটে হাসলো নারিতা। 'এটার পেছনেও একটা মজার ঘটনা আছে। একটা নির্দিষ্ট কোম্পানি সম্প্রতি একধরনের টারবোচার্জার বানিয়েছে যেটা দিয়ে এক কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারে তথ্য স্থানান্তর করা যায়। তারা এর মাধ্যমেই আমাদের কোম্পানির সেই প্রোগ্রামের প্রত্যেকটা উপাদান খুব গোপনীয়তার সাথে হাতিয়ে নেয়। আর তার এক মাস পরে সব তথ্য একত্র করে। আর তার ঠিক দুই ঘণ্টা পরে–' ইয়ামানোর দিকে একটু ঝুঁকে এলো নারিতা–'বিভাগীয় প্রধানের ডেস্কে টারবো ইঞ্জিন ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি নামে এক প্রতিদ্বন্দ্বী বাজারে এসেছে বলে খবর যায়।'

চোখ বড় বড় হয়ে গেল ইয়ামানোর। 'এভাবেই লিক হয়েছে তাহলে?'

এখনো হাসছে নারিতা। 'যাক, তোমার কিছুটা উন্নতি হলো তাহলে।'

সদ্য জয়েন হওয়া কর্মীর এই শিশুসুলভ আচরণ দেখে শুষ্ক একটা হাসি দিলো মাকোতো। সে হয়তো সান্ত্বনা দিতে পারতো এটা বলে যে এই একই কথা ওকেও শুনতে হয়েছে–তাও বেশি দিন আগের কথা না।

***

রাত আটটার কিছু পরপর বাসায় ফিরলো মাকোতো। এরমধ্যেই এই এক্সপার্ট সিস্টেমটা নিয়ে বিশ্লেষণ করা শুরু করেছে তারা, আর এর ফলে ওভারটাইম

করতে হচ্ছে। দরজাটা যখন খুললো, মনে হলো আরো কিছুক্ষণ অফিসে থেকে কাজ করা উচিত ছিলো তার। গাঢ় অন্ধকার হয়ে আছে বাসার ভেতর।

ভেতরে ঢুকে বসার ঘর, হলঘর, করিডর ইত্যাদি সব জায়গার লাইট জ্বালিয়ে দিলো সে। যদিও এপ্রিল মাস চলছে, তবুও ঠান্ডা হয়ে আছে পুরো ঘর। ফ্লোরের ঠান্ডাটা পায়ে স্যান্ডেল থাকা সত্ত্বেও টের পাচ্ছে।

কোটটা খুলে টাইটা একটু ঢিলা করে সোফায় বসলো মাকোতো। টেবিলের পাশ থেকে রিমোটটা হাতে নিয়ে লাল বাটনে চাপ দিলো সে। কয়েক সেকেন্ড বাদেই তার বত্রিশ ইঞ্চি টিভিতে একটা ট্রেন উলটে থাকার ছবি ভেসে উঠলো। এরই মধ্যে কয়েকবার ছবিটা দেখেছে সে; গত মাসে সাংহাইতে ঘটে যাওয়া ট্রেন দুর্ঘটনার খবর। প্রোগ্রাম দেখে মনে হচ্ছে ঐ ট্রেন দুর্ঘটনার পরিণাম নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। জাপানের কোচি এলাকার একটা প্রাইভেট স্কুলের একশো তিরানব্বই জন ছাত্রছাত্রী সেই ট্রেনের একটা বোর্ডে ছিলো। কোনো এক ট্রিপে যাচ্ছিলো তারা। প্রায় ছাব্বিশজন শিক্ষার্থী মারা গেছে, সাথে মারা গেছে সেই ট্রিপ পরিচালনা করা শিক্ষার্থীও।

এরপর রিপোর্টার একটানা বলে যাচ্ছিলো যে এই দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণের ব্যাপারে চীন-জাপান আলোচনা স্থগিত হয়ে আছে।

খেলার কিছু দেখার জন্য চ্যানেল চেঞ্জ করে দিলো মাকোতো। এরপরই আজ যে সোমবার তা মনে পড়তেই বন্ধ করে দিলো টিভি। ঘর আগের থেকে আরো বেশি নীরব হয়ে পড়লে ফের ছাড়লো টিভিটা। দেয়ালে থাকা ঘড়িটার দিকে তাকালো সে। ঘড়ির সামনের দিকটা ফুলের মতো করে প্যাটার্ন করা–বিয়ের উপহার ছিলো ওটা। আটটা বিশ বাজে ঘড়িতে।

সোফা থেকে উঠলো মাকোতো। শার্টের বোতাম খুলে কিচেনের দিকে পা বাড়ালো। কোনো রকমের ময়লা নেই রান্নাঘরে, এমনকি ময়লা করা থালাবাসনও নেই। দেখে মনে হচ্ছে নতুন আনা হয়েছে সবগুলো। রান্নাঘরের পরিচ্ছন্নতার থেকেও রাতে তার স্ত্রী কী রান্না করবে তা নিয়ে বেশি চিন্তা হচ্ছে তার। সে জানতে চাচ্ছে তার স্ত্রী কি বের হওয়ার আগে কিছু বানিয়ে গেছে নাকি এসে বানাবে। যদিও রান্নাঘরের চেহারা দেখা মনে হচ্ছে যে উত্তরটা হলো: এসেই বানাবে।

আবারো ঘড়ির দিকে তাকালো সে; দুই মিনিট পার হয়েছে মাত্র।

পকেট থেকে বল পয়েন্টের একটা কলম বের করে আজকের তারিখটায় ক্রস দিলো সে। ঘরে আগে এসে পৌঁছেছে সে এর জন্য এটা করা। এই মাসের শুরুতেই এটা করা শুরু করেছে সে। এখনো তার স্ত্রীকে এই বিষয়ে জানায়নি যে এগুলো আসলে কীসের জন্য করছে। সঠিক সময়ের জন্য এসব জমিয়ে রাখছে সে। এটা কোনো ভালো কিছু না যদিও, কিন্তু তার কাছে কেন যেন মনে হলো এই রেকর্ডটা রাখা দরকার।

এরমধ্যেই দশ দিনে ক্রস পড়ে গেছে। এখনো মাসের অর্ধেকটা বাকি। স্ত্রীকে কাজ করার অনুমতি দিয়ে এই নিয়ে একশোবারের মতো সে অনুতপ্ত হয়েছে। আবার একই সময়ে এতটা সংকীর্ণমনা হওয়ার জন্যও অনুশোচনা হয়েছে তার।

দুই বছর পার হয়ে গেছে ইউকিহোর সাথে তার বিয়ে হওয়ার পর।

যেরকমটা মাকোতো ভেবেছিলো সেরকমটাই হয়েছে। একদম নিখুঁত স্ত্রীর ভূমিকা পালন করছে ইউকিহো। সবকিছুতেই সে পারদর্শী। যেটাতেই হাত ছোঁয়াতো সেটাই সোনা হয়ে যেত যেন। বিশেষ করে রান্নার দক্ষতা দেখে তো মুগ্ধ হয়ে গেছিলো মাকোতো। বাড়িতে বসেই ফ্রেঞ্চ, ইতালিয়ান, জাপানিজ বানাতে পারে সে। আর এতটাই নিখুঁত হয় যে মনে হয় কোনো রেস্টুরেন্ট থেকেই আনানো হয়েছে বুঝি।

'স্বীকার করতেই হয়, বস, তুমি হচ্ছো এই পৃথিবীর সবচেয়ে ভাগ্যবান পুরুষ,' তার এক বন্ধু বলেছিলো তাকে। বিয়ের পর কিছু বন্ধুবান্ধবকে দাওয়াত দিয়েছিলো সে বাসাতে।

'অপরূপ বধু, আর এতেই শেষ না। একজন দারুণ রাঁধুনিও বটে। যখন ভাবি যে তুমি আর আমি একই পৃথিবীতে আছি, আমার নিজের উপর ঘেন্না চলে আসে,' আবেগের সাথে লুকিয়ে থাকা ঈর্ষা প্রকাশ করে আরেকটা বন্ধু বলে উঠেছিলো।

মাকোতো নিজেও তার রান্নার প্রশংসা করতো। বিয়ের প্রথম কয়েক মাস তো প্রতিদিনই কিছু না কিছু বলতো তার রান্নার ব্যাপারে।

'আসলে মা আমাকে ভালো কিছু রেস্টুরেন্টে নিয়ে যেত প্রায়ই,' প্রথম যেদিন প্রশংসা করেছিলো মাকোতো, সেদিন এই জবাবই দিয়েছিলো ইউকিহো। 'আমার মনে হয় সবারই উচিত বয়স কম থাকতে সুস্বাদু সব খাবার খাওয়া। যাতে করে ভালো খাবারকে মূল্যায়ন করতে পারে।' তারপরেই গাল লাল হয়ে গেছিলো মেয়েটার। 'ভালো লাগলো শুনে যে আমার খাবার তুমি পছন্দ করেছ।'

লজ্জার সাথে বলা সেই কথাগুলো তাকে মাকোতোর কাছে আরো বেশি প্রিয় করে তুলেছিলো। কিন্তু তারপরেও তাদের মধ্যে শান্ত সম্পর্ক তৈরি হতে দুই মাস সময় লেগেছিলো। আর সেটাও শুরু হয়েছিলো আপাতদৃষ্টিতে অমূলক কিছু কথার মধ্য দিয়ে।

'আচ্ছা, তোমার মার্কেটের খেলা সম্পর্কে কীরকম ধারণা রয়েছে?'

'শেয়ার মার্কেটের কথা বলছো?'

এক মুহূর্তের জন্য সে বুঝতে পারেনি আসলে কী নিয়ে কথা বলছে ইউকিহো। তখনকার সময়ে শেয়ারের কারবার তাদের জীবন থেকে প্রায় মুছে গেছিলো। অবাক হওয়ার থেকে বেশি হতভম্ব হয়েছিলো সে। 'তুমি স্টক সম্পর্কে কী জানো?'

'হালকা-পাতলা জানি। এটা নিয়েই পড়ছি আসলে।' বুকশেলফ থেকে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের কয়েকটা বই বের করে দেখালো তাকে। মাকোতো তেমন বই পড়ার ভেতর না থাকায় এসবের খবরও ছিলো না তার কাছে।

'শেয়ার কিনতে কেন চাচ্ছো তুমি?' জিজ্ঞেস করলো মাকোতো। কথার মোড় অন্য দিকে ঘোরাতে চাইছে।

'আসলে বাসার কাজ করার পরেও অনেক সময় থাকে আমার কাছে। আর তাছাড়া, শেয়ার মার্কেটও নাকি বেশ ভালো যাচ্ছে ইদানীং, তাই। ব্যাংকে টাকা রাখার থেকে শেয়ারে টাকা খাটানো উত্তম।'

'হ্যাঁ, তবে এতে ঝুঁকি আছে।'

'আর এজন্যই তো এর নামকরণ এটা হয়েছে। মানে *মার্কেটের খেলা* তো এমনি এমনি হয়নি,' হালকা হেসে উত্তর দিয়েছিলো সে। 'এটা শুধু একটা খেলা মাত্র।'

এই 'এটা শুধু একটা খেলা মাত্র' বাক্যটা বেশ দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছিলো মাকোতোকে। এটা নিয়ে তেমন কথা বলেনি সে, তবে কেন যেন তার মনে হয়েছিলো কোনো কারণে প্রতারণার স্বীকার হয়েছে সে।

স্ত্রীর বলা পরের কথাটাই মাকোতোর ধারণাকে আরো পোক্ত করে দিয়েছিলো।

'চিন্তার কিছু নেই। আমি জানি যে আমি হারবো না। আর আমার নিজের টাকাই এখানে খাটাবো আমি।'

'তোমার নিজের টাকা?'

'কিছু সঞ্চিত টাকা আছে আমার।'

'হ্যাঁ, তা জানি আমি। কিন্তু–'

'নিজের টাকা' কথাটা ভালো লাগেনি মাকোতোর কাছে। ওরা বিবাহিত। অতএব, ওদের নিজেদের কাছে থাকা টাকা কি দুজনেরই হওয়ার কথা না?

'করবো না?' মাকোতোর দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো ইউকিহো। মাকোতো কিছুই বলেনি। দেখে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো ইউকিহো।

'আমি জানি যে এখনো ভালো গৃহিণী হয়ে উঠতে পারিনি। আর এত তাড়াতাড়ি অন্য কিছুর দিকে মন দেওয়াটাও উচিত হবে না। সরি, হ্যাঁ? আর কখনো এই ব্যাপারে বলবো না।' কাঁধটা একটু নামিয়ে নিয়ে বইটা শেলফে তুলে রাখলো সে।

ইউকিহোর পাতলা গড়ন দেখতে দেখতে মাকোতো ভাবছে যে কতটা সংকীর্ণমনা সে। ইউকিহো এর আগে তার কাছে তেমন কিছুই চায়নি কখনো।

'আমার কিছু শর্ত আছে,' বলে উঠলো মাকোতো। 'বেশি গভীরে যাওয়া যাবে না, আর ঋণ করা যাবে না কোথাও থেকে। এগুলো মানতে পারবে?'

পেছনে ফিরে তাকালো ইউকিহো। চোখ চকচক করে উঠলো তার। 'সত্যি? সত্যি বলছো তুমি?'

'যা বলেছি তা যদি মানতে পারো, তবেই কেবল হবে।'

'মানবো, মানবো, প্রতিজ্ঞা করলাম। অনেক ধন্যবাদ তোমাকে,' বুকে জড়িয়ে নিতে নিতে বললো সে।

আর তারপরেও মাকোতো যখন ইউকিহোর কোমরে হাত রাখলো, খারাপ কিছু একটার পূর্বাভাস জেগে উঠলো তার মনে।

ইউকিহো যেমনটা বলেছিলো যে সে হারবে না, ঠিক তেমনটাই হচ্ছিলো। *মার্কেটের খেলা* শুরু করার পরপরই ভাগ্য খুলে যায় তার। মাকোতো জানতো না কী পরিমাণ টাকা নিয়ে ইউকিহো এই শেয়ার মার্কেটের ধান্দা শুরু করেছিলো, আর কতটুকুই বা প্রশিক্ষণ নিয়েছে। তবুও যখনই কোনো স্টকব্রোকার বাড়িতে ফোন দিতো, এসব বিষয়ে ইউকিহোর সাথে কথা বলতো, তখন হালকা-পাতলা কিছু কথা কানে যেত মাকোতোর। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিলো দশ মিলিয়ন ইয়েনের নিচে কোনো কারবার সে করছে না।

কিছু সময়ের জন্য ইউকিহোর জীবনের কেন্দ্র হয়ে পড়ে শেয়ার মার্কেট। দিনে দুইবার যাওয়া-আসা শুরু করে দেয়। আর কখন আবার ঘরে ব্রোকাররা কল দিয়ে বসে, এর জন্য খুব কমই বের হতো বাসা থেকে। আর বের হলেও প্রতি ঘণ্টায় ঘণ্টায় ফোন করতো। ছয় ছয়টা পত্রিকা পড়তো সে, যার মধ্যে আর্থিক আর উৎপাদনভিত্তিক কিছু পেপারও ছিলো।

'ব্যস, অনেক হয়েছে,' একদিন বলে উঠলো মাকোতো। ইউকিহো মাত্রই কোনো এক ব্রোকারের সাথে কথা শেষ করে উঠেছে, আর এরপর থেকেই সারা সকাল ধরে বেজে চলেছে ফোনটা। সচরাচর সে সময় মাকোতো অফিসে থাকে বিধায় তেমন একটা কেয়ার করে না, কিন্তু সেদিন কোম্পানির প্রতিষ্ঠাবার্ষিক থাকায় ছুটি ছিলো তার। 'ছুটির দিনটাও একটু আরামে থাকা যাচ্ছে না! আর কোথাও যেতেও পারছি না তোমার এই ব্যস্ততার কারণে। যদি স্বাভাবিক জীবনযাপনই না করতে পারলাম, তাহলে এসবের কী দরকার তাই বুঝছি না আমি।'

সেই প্রথম স্ত্রীর উপর গলা তুলেছিলো মাকোতো। বিয়ের আট মাস চলছিলো তখন। এরমধ্যে কখনোই গলা উঁচু করে কিছু বলেনি মাকোতো।

ইউকিহো চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলো কিছুক্ষণ, হয়তো বা চমকে গিয়েও থাকতে পারে। মাকোতো যখন দেখলো যে তার চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, তৎক্ষণাৎ খারাপ লাগতে শুরু করে তার।

ও ক্ষমা চাওয়ার আগেই ইউকিহো ক্ষমা চেয়ে বসে। 'সরি। তোমাকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য কিছু করিনি আমি, বিশ্বাস করো। কাজের সাথে জড়িয়ে গেছি, এই-ই

যা। কারণ বেশ ভালো যাচ্ছে সবকিছু। খুবই খুবই দুঃখিত আমি। যোগ্য স্ত্রী হতে পারিনি বলে।'

'তা বলিনি আমি।'

'না, না, বুঝতে পেরেছি আমি।' সাথে সাথে রিসিভার তুলে নিলো সে। ব্রোকারকে ফোন করে সেই মুহূর্তেই তার সকল শেয়ার বিক্রি করে দিতে বললো।

ফোন রেখে দেওয়ার পরে ঘুরে দাঁড়ালো মাকোতোর সামনে। 'বিনিয়োগ করা প্রজেক্টগুলো নিয়ে এই মুহূর্তে কিছু করা যাবে না। তার জন্য দুঃখিত।'

'তুমি নিশ্চিত এগুলো বাদ দিলে ভালো থাকবে তুমি?'

'ঠিক আছি আমি। সত্যি বলতে, ভালোই লাগছে এখন। আর ভাবতেও পারিনি আমার এসবের কারণে তোমার জীবনের বারোটা বাজাচ্ছিলাম।'

হাঁটু গেড়ে কার্পেটের উপর বসে মেঝের দিকে তাকিয়ে আছে ইউকিহো, কাঁধদুটো কাঁপছে। এক ফোঁটা চোখের পানি গড়িয়ে পড়লো তার হাতের উলটো পিঠে।

'এ নিয়ে আর কথা না বাড়াই,' ইউকিহোর কাঁধে হাত রেখে বললো মাকোতো।

পরের দিনই শেয়ার মার্কেট নিয়ে চলা সবকিছু একদম উধাও হয়ে গেল। সেসব বিষয়ে আর কোনো কথাই বলেনি ইউকিহো।

আর এতে এটাও পরিষ্কার হয়ে গেল যে তার ভেতরে থাকা চঞ্চলতা কমে গেছে। বোর দেখাচ্ছিলো তাকে। বাইরে না যাওয়ার কারণে এমনিতেই মেকআপ করার প্রয়োজন পড়তো না, আর খুব কমই সেলুনে যেত সে।

'আহ, চেহারার কী হাল হয়েছে,' একদিন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ক্লান্ত হাসি দিতে দিতে বললো ইউকিহো।

মাকোতো অবশ্য একটা কমিউনিটি কলেজে কিছু কোর্স করার কথা বলেছিলো ইউকিহোকে, কিন্তু তেমন আগ্রহ দেখায়নি তার স্ত্রী। স্কুলে থাকাকালীন *চা পানের রীতি*, *ফুল সাজানোর রীতি* আর ইংরেজির কোর্স করে নিয়েছিলো সে–যার কারণে হয়তো নতুন কিছু শিখতে ইচ্ছা হয়নি তার।

মাকোতো জানতো তাদের সে সময়ে কী দরকার ছিলো। একটা বাচ্চা হলে এই অবসর সময় কেটে যাবে। কিন্তু তারপরও তারা তা নিতে পারেনি। বিয়ের ছয় মাস পরেই আর কোনো জন্মনিয়ন্ত্রক ঔষধ খায়নি ইউকিহো, কিন্তু তবুও প্রেগন্যান্ট হওয়ার কোনো লক্ষণ ইউকিহোর মাঝে ছিলো না।

আর এতে খুশি হয়নি মাকোতোর মা। তার বিশ্বাস নতুন বিয়ে করা ছেলেমেয়েদের তাড়াতাড়ি বাচ্চা নিয়ে নিতে হয়। এ নিয়ে কয়েকবার ডাক্তারের সাথে দেখা করতে বলেছিলো সে। মাকোতো নিজেও করতে চেয়েছিলো। ইউকিহোকেও বলেছিলো, কিন্তু মুখের উপর সরাসরি না করে দিয়েছিলো সে, যা

কিন্সা তার সাথে একেবারেই যায় না। মাকোতো যখন জানতে চাইলো কেন, তার স্ত্রী চোখ লাল করে বলেছিলো, 'যদি সেই আগের অপারেশনটার জন্যই এমনটা হয়ে থাকে? সত্যিটা যদি তাই হয়, আমার মনে হয় না আমি সেটা জানার পর আর বেঁচে থাকতে পারবো।'

'তাও তো আমাদের সত্যটা জানতে হবে, নাকি? হয়তো ডাক্তাররা এই সমস্যার সমাধান দিতে পারবে।'

জবাবে কেবল মাথা ঝাঁকালো সে। 'ফার্টিলিটি ট্রিটমেন্ট কাজ করে না, জানো তো? আর যদি বাচ্চা নিতে না-ই পারি আমরা, তাহলে তার সাথে মানিয়ে নাও। তবে যদি এমন স্ত্রীর সাথে থাকতে না চাও যার বাচ্চা নেওয়ার ক্ষমতা নেই, তাহলে আলাদা কথা।'

'ওটা বোঝাইনি আমি। বাচ্চা নেওয়ার বিষয় চুলোয় যাক,' বললো মাকোতো। 'আর কখনো এ বিষয়ে কথা বলবো না আমরা।'

একটা মেয়ের বিরুদ্ধে পরিবার গঠন করার অক্ষমতা নিয়ে অভিযোগ তোলা কতটা বাজে হতে পারে, মাকোতো ভালোই বুঝতে পারছিলো। তাই এ বিষয়ে তেমন কোনো কথা তোলেনি সে। এরপর সে মাকে বলে দেয় যে তারা দুজনেই হাসপাতালে গেছিলো। ইউকিহোর চেকআপ করিয়ে কোনো সমস্যা পায়নি। কিন্তু মাঝেমধ্যে সে নিজেও ইউকিহোকে বিড়বিড় করে বলতে শুনতো, 'কেন বাচ্চা নিতে পারছি না আমি?' আর তারপরই বলতো, 'ঐ অ্যাবোরশনটা করাই উচিত হয়নি আমার।'

মাকোতোর সেসব চুপচাপ শোনা ছাড়া আর কিছুই করার ছিলো না।

এই মুহূর্তে কাউচের উপর শুয়ে আছে মাকোতো, সিলিংয়ের দিকে চোখ তার। আর তখনই মূল দরজা খোলার শব্দ শুনলো সে। হালকা করে উঠলো শোয়া থেকে। ঘড়িতে তাকিয়ে দেখলো নয়টা বাজে। হলঘরে পায়ের শব্দ পাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই দেখলো দরজাটা খুলে যাচ্ছে।

'সরি, দেরি হয়ে গেল অনেকটা।' ইউকিহোর পরনে শ্যাওলা সবুজ একটা ড্রেস। ডান হাতে কাগজের দুটো থলি ঝুলছে আর বাম হাতে সুপারমার্কেট থেকে আনা দুটো প্লাস্টিকের ব্যাগ। কাঁধেও একটা ব্যাগ রয়েছে তার। 'খুব ক্ষুধা লেগেছে নিশ্চয়ই তোমার? দাঁড়াও, এক্ষুনি কিছু বানিয়ে নিয়ে আসছি তোমার জন্য।'

হাতে থাকা জিনিসগুলো কিচেনে রেখেই বেডরুমের দিকে ছুটলো সে। তার ব্যবহার করা পারফিউমের ঘ্রাণটাই থেকে গেল শুধু।

এর কিছুক্ষণ বাদেই তার স্বাভাবিক ড্রেসে ফিরে এলো সে, হাতে ভাঁজ করা একটা অ্যাপ্রোন। কিচেনে ঢোকার সময় গলায় পেঁচিয়ে নিলো সেটা।

'আমি কিছু নিয়ে এসেছি সাথে করে যা এখনই বানিয়ে দেওয়া যাবে, তাই অতটা দেরি হবে না। আর কিছু স্যুপের ক্যানও আছে ওখানে,' কিচেন থেকে জোরে বলে উঠলো সে। এখনো দম নিচ্ছে।

মাকোতো পত্রিকাটা হাতে নিয়েছিল পড়ার জন্য, কিন্তু টের পেল ভেতরে রাগ ফুলে-ফেঁপে উঠছে তার। কীসের জন্য এটা হচ্ছে তাও জানে না সে। যদি স্বীকার করতেই হয়, তবে বলতে হয় যে ইউকিহোর এই প্রফুল্ল আচরণের জন্যই হচ্ছে।

পত্রিকাটা নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ালো মাকোতো। রান্নাঘরের দিকে এগোতেই ইউকিহোর তড়িঘড়ি করে করা কাজের শব্দ শুনতে পেল সে।

'আবারো রাতের বেলায় ক্যান খেয়ে থাকবো?'

'সরি, কী বললে?' কিচেনে কানে তালা লাগানো ফ্যানের নিচে বসে কাজ করছিলো ইউকিহো। যেটা আরো বেশি বিরক্ত করে তুললো মাকোতোকে।

কিচেনের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইলো সে। গ্যাস স্টোভের উপর পানি ফোটাচ্ছে ইউকিহো। মাকোতোর দিকে তাকালো একবার।

'এতক্ষণ অপেক্ষা করিয়ে আগের খাবার গরম করে দেবে তুমি?'

চোয়াল ঝুলে গেল ইউকিহোর। হাত বাড়িয়ে কিচেনের ফ্যানটা বন্ধ করলো সে। মুহূর্তের জন্য নীরব হয়ে গেল ঘরটা।

'তুমি কি রাগ করেছ আমার উপর?'

'দুয়েক দিনের জন্য হলে ঠিক আছে,' বলে উঠলো মাকোতো। 'কিন্তু প্রত্যেকটা দিন একই ঘটনা ঘটছে। দেরি করে বাসায় আসা, ক্যান খুলে দেওয়া। ব্যস, এসবই চলছে এ কয়দিন।'

'সরি, আসলে আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করাতে চাইনি আমি, তাই–'

'ওহ, যথেষ্ট অপেক্ষা করেছি আমি। বলা যায় তার চেয়েও কিছুটা বেশি করেছি। আমি নিজেই রামেন বানাতে এসেছিলাম। আর যদি জানতাম এরকম কিছু বের করে দেবে, তাহলে রামেন দিয়েই চালিয়ে দিতাম।'

'সরি। জানি এটা অজুহাতের মধ্যে পড়ে না, তবুও অনেক ব্যস্ত ছিলাম আমি। আর বেশ কদিন ধরে যে তোমার খেয়াল রাখতে পারছি না ঠিকঠাক, এটাও বুঝতে পারছি।'

'ব্যবসা যে বেশ ভালোই যাচ্ছে তা শুনে খুব ভালো লাগলো,' কুৎসিত একটা হাসি দিয়ে বললো মাকোতো।

'এরকম করে বোলো না। আসলেই অনুতপ্ত আমি। সামনে থেকে আরো বেশি যত্নশীল হবো, দেখো।' পরনের অ্যাপ্রোনের উপর দুহাত এক করে মাথা ঝোঁকালো মেয়েটা।

'প্রত্যেকবার এই এক কথাই বলো,' পকেটে হাত ঢুকিয়ে ঝট করে বললো মাকোতো।

মাথা নিচু করেই দাঁড়িয়ে রইলো ইউকিহো। কিইবা বলতে পারে সে? *হয়তো ঝড়টা তার উপর দিয়ে বয়ে যাওয়ার অপেক্ষা করছে।*

'ছেড়ে দিচ্ছো না কেন এটা?' জিজ্ঞেস করলো মাকোতো। 'একসাথে ঘরের কাজ আবার চাকরি, অনেক চাপ পড়ে যাচ্ছে তোমার উপর।'

চুপ মেরে রইলো ইউকিহো। আবারো কাঁপতে শুরু করেছে তার কাঁধদুটো। অ্যাপ্রোনের যে অংশটুকু নিচে পরেছিলো সেটুকু তুলে মুখ ঢাকলো। কান্নার শব্দ শুনলো মাকোতো।

আবারো ক্ষমা চাইলো ইউকিহো। 'আমি জানি আমি কিছুই ঠিকমতো করতে পারছি না। এও জানি তোমার জন্য বারবার সমস্যা তৈরি করছি আমি। আমাকে যা ইচ্ছা তাই করতে দিচ্ছো তুমি, কিন্তু বিনিময়ে আমি কিছুই দিচ্ছি না। আমি আসলে, আমি আসলে ভালো মানুষই না। হয়তো আমাকে বিয়ে করাই উচিত হয়নি তোমার,' কান্নার ভেতর হেঁচকি তুলতে তুলতে কথাগুলো বললো সে।

যার এটাই মানে দাঁড়ালো যে মাকোতোর আর কিছু বলার নেই। বস্তুত, তার ভেতর আবারো সেই অনুভূতি কাজ করতে শুরু করলো; এত ছোট একটা বিষয়কে টেনে এত বড় করার জন্য দুঃখবোধ।

'যাই হোক, ঠিক আছে ওসব,' বলে উঠলো সে। রাগটাকে দমিয়ে আনলো অনেকটা তরবারি খাপে ঢোকানোর মতো করে। ইউকিহো কখনো পালটা জবাব দেয় না, তাই কখনোই তাদের ভেতর ঝগড়া লাগে না।

ফের সোফায় গিয়ে পত্রিকাটা খুললো মাকোতো। এমন সময় কিচেন থেকে ডাকলো ইউকিহো, 'মাকোতো?'

'হ্যাঁ?' সোফায় বসেই সেদিকে তাকিয়ে জবাব দিলো মাকোতো।

'রাতের খাবারের কী হবে? মানে কিছু একটা বানাতে পারতাম, কিন্তু তেমন কিছু তো নেই এখন।'

'ওহ।' মাকোতোর পুরো শরীর ক্লান্তির চোটে নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। 'আর দরকার নেই কিছু করার। যা কিনে এনেছ তাই নিয়ে এসো।'

'ঠিক তো?'

'এইমাত্র বললে না যে আর কিছু নেই?'

'এখনই নিয়ে আসছি আমি।' বলেই মেয়েটা কিচেনের দিকে ছুটলো আবার।

আবারো কিচেনের সেই ঘরঘর-করা ফ্যান চলতেই মাকোতো মাথা ঝাঁকালো। মনের মাঝে অদ্ভুত একটা বোধ হচ্ছে যে কোনো ঝামেলাই ঠিক হয়নি এখনো।

ওদের প্রথম এনিভার্সারির এক মাস পরে ইউকিহো চাকরি করতে পারবে কি না সে বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছিলো মাকোতোর কাছে। তার কোনো এক বন্ধু নাকি পোশাকের ব্যবসা খুলেছে, আর সেখানে কো-ম্যানেজার হিসেবে ইউকিহো থাকতে

পারবে কি না তা জিজ্ঞেস করেছে। মাকোতো জিজ্ঞেস করেছিলো যে ইউকিহো আসলেই যোগ দিতে চায় কি না। মেয়েটা জবাবে হ্যাঁ বলে দিয়েছিলো।

স্টকমার্কেট ছাড়ার পরে সেই প্রথম ইউকিহোর চোখে একধরনের ঝলক দেখতে পেয়েছিলো মাকোতো। আর তারপর আর না করতে পারেনি সে। বেশি বাড়াবাড়ি যেন না হয়ে যায়–এ বিষয়ে সাবধান করে দিতেই অজস্র ধন্যবাদ দিয়ে ভরিয়ে তুলেছিলো ইউকিহো।

নতুন দোকানটা ছিলো আওইয়ামাতে। শহরের সবচাইতে ফ্যাশন-সচেতন জায়গায়। দোকানের সামনের দিকটা একদম চকচকে করে তৈরি করা হয়েছে যাতে মানুষজন আসা-যাওয়া করার সময় সেদিকে একপলক তাকায়। মাকোতো অবশ্য পরে জেনেছিলো যে এই দোকানের মেরামতের সব কাজ ইউকিহোর পয়সায় হয়েছে।

ইউকিহোর ব্যবসার পার্টনারও নারী। নাম নাওমি তামুরা। গোলগাল চেহারা আর গড়নের মেয়েটাকে দেখতে অতি সাধারণ লাগে। তবে সত্যি বলতে, বেশ পরিশ্রমী সে। দোকানের ভেতর কাস্টমারদের সামলাতো ইউকিহো, আর নাওমি কাপড়চোপড় নিয়ে এসে রেজিস্টার করতো।

দোকানের কাস্টমারগুলো ধরাবাঁধা ছিলো। আরো ভালো করে বলতে গেলে, একচেটিয়াভাবে চলছিলো তাদের ব্যবসা, যা কিনা ইউকিহো বা নাওমিকে আরো ভালো করে কাস্টমারের সাইজ আর পছন্দ সম্পর্কে জানার সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে। আর এর জন্য তাদের বড় কোনো ওয়্যারহাউজ বা দোকান নেওয়ার প্রয়োজন ছিলো না। কারণ কিছু বিশেষ কাস্টমারের জন্যই তাদের পোশাক সংরক্ষণ করতে হতো।

প্রশ্ন হলো যে তারা কি আসলে কাস্টমারদের নিকট তাদের খবর পৌঁছাতে পারবে কি না, কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল যে দোকানে কাস্টমারদের আনাগোনা থাকে সব সময়।

প্রথমে মাকোতোর চিন্তা হয়েছিলো এটা ভেবে যে ইউকিহো বুঝি তার ব্যবসায় অনেক সময় দেবে। কিন্তু প্রথম দিকে তেমন সমস্যা হয়নি এ নিয়ে। বলতে গেলে দোকানে যাওয়ার পর ঘরের কাজে আরো বেশি মনোযোগ দিয়েছিলো সে। প্রতিদিন কাজ থেকে ঘরে ফিরতেই দেখতো খাবার রেডি করে রাখা আছে, এবং খুব কম সময়ই মাকোতোর পরে ইউকিহো বাসায় ফিরতো।

তবে দোকান খোলার দুই মাস বাদে আরেকটা অস্বাভাবিক আবদার করে বসে ইউকিহো। সে জিজ্ঞেস করে যে মাকোতো সেই ব্যবসার মালিক হতে চায় কি না।

'মালিক? আমি? কেন?'

'আসলে সেই বাড়ির মালিকের জমির কর দিতে টাকার প্রয়োজন হয়েছে, তাই আমাদের জিজ্ঞেস করলো জায়গাটা কিনতে চাই কি না।'

'তুমি চাও?'

'অবশ্যই চাই! আমার মনে হয় জায়গাটা কিনে নিলে দারুণ একটা কাজ হবে। ওখানে জায়গার দাম কখনোই নিচে নামবে না। আর যে টাকা সে চাচ্ছে, তা নেহাতই নগণ্য।'

'আর যদি আমি না কিনি, তবে?'

'তাহলে হয়তো আমাদের হাতে আর কোনো উপায় থাকবে না,' দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেছিলো সে। 'আমার নিজেকেই কিনতে হবে তখন।'

'তুমি?'

'মনে তো হচ্ছে ব্যাংক ঐ জায়গার জন্য আমাকে ঋণ দেবে।'

'তো তুমি ব্যাংক থেকে টাকা ধার করবে দোকানটা কেনার জন্য? এতই দরকার তোমার ওটা?'

'যদি আমরা না কিনি, তবে বাড়ির মালিক জায়গাটা অন্য কারো কাছে বিক্রি করে দেবে। আর এতে করে আমাদের দোকানের লিজটাও চলে যেতে পারে। যদি নতুন মালিক আমাদের ওখান থেকে সরিয়ে দেয়, তবে অন্য যে-কারো কাছে চড়া দামে বিক্রি করতে পারবে।'

কিছুক্ষণের জন্য ভাবনায় পড়ে যায় মাকোতো। আর্থিকভাবে ধরাছোঁয়ার বাইরে না ওটা। সেইজোতে এরমধ্যে মাকোতোর পরিবারের অনেক সম্পত্তি রয়েছে, আর সেগুলোর কর মাকোতোকে দিতে হচ্ছিলো। সেগুলোর দুয়েকটা বিক্রি করে দিয়ে অনায়াসে কিনতে পারে সে দোকানটা। যদি তার মায়ের কাছে ঠিকঠাক বলতে পারে, তবে তার মা-ও না করবে না। জমিজমা খুব কমই ব্যবহার করে তারা।

আর তাছাড়া, ইউকিহো কোনো জায়গা থেকে টাকা ধার করুক এটা চায়নি মাকোতো। তার ধারণা ছিলো একবার কোথাও থেকে ধার করে ফেললে ইউকিহোকে আর বাড়িতে রাখা যাবে না। কাজের ফাঁদে ফেঁসে যাবে সে। আবার ইউকিহোর নিজের নামে একটা দোকান থাকুক এটাও চাইছিলো না সে।

কয়েক দিন ভাবার জন্য সময় দিতে বলে তাকে। যদিও সত্যি বলতে, এ বিষয়ে সেই মুহূর্তেই চিন্তাভাবনা করে ফেলেছিলো সে। ১৯৮৭ সালের প্রথম মাসেই নিজের নামে জায়গাটা কিনে ফেলে সে। এরপর ইউকিহোর দোকানের প্রতি মাসের ভাড়া গিয়ে জমা হয় তার একাউন্টে।

আর তখনই মাকোতো বুঝতে পারে যে ইউকিহো কতটা ঠিক বলেছিলো। টোকিওতে বিভিন্ন অফিস বানানোর জন্য জায়গার চাহিদা বাড়তে থাকে, ফলে দামও তরতর করে বাড়তে থাকে। সপ্তাহখানেকের ব্যবধানে দুই-তিনগুণ হারে দাম বেড়ে যেতে শুরু করে সে সময়। মাকোতো নিজেও কয়েকটা অফার

পেয়েছিলো ঐ দোকানটা তুলে দিয়ে জায়গাটা বিক্রি করার জন্য। ওরা যে দাম হাঁকাতো তা শুনে ওর নিজেকেই নিজের চিমটি কাটতে মন চাইতো।

আর তখনই একটা বিষয় জেগে ওঠে মাকোতোর মনে। ইউকিহোকে নিয়ে হীনম্মন্যতায় ভুগতে শুরু করে সে। ভাবতে শুরু করে যে ব্যবসা, বাড়ি বা যেকোনো কিছুতেই সে তার থেকে অনেক পিছিয়ে আছে। কখনোই তার সমান হতে পারবে না। তার জানা ছিলো না কী করে ব্যবসায় এত ভালো করছে ইউকিহো। যাই হোক, ব্যবসার লাভ ধীরে ধীরে বাড়ছিলো। এতটাই বাড়ছিলো যে ইউকিহো ভেবেও ফেলেছিলো ডাইকানায়ামাতে আরেকটা দোকান খুলবে।

এদিকে মাকোতো নতুন কিছু করার সাহস পাচ্ছিলো না। যা পারতো তা হলো কোম্পানির জব করা আর অন্যদের আদেশ পালন করা। তার মাথায় এমন কোনো ধারণাও আসতো না যে, যে জমিগুলো তার অধীনে রয়েছে তা দিয়ে কিছু একটা করার। সে এমনকি তার বাবা-মায়ের দেওয়া একটা অ্যাপার্টমেন্টে বাস করছিলো।

সেই বছরের স্টক মার্কেটের অস্বাভাবিক উন্নতি তার ব্যর্থতার আরেকটা ধাপ প্রমাণ করে দিয়েছিলো। গত বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে এনআইটি বাজারে ইনিশিয়াল পাবলিক অফারিং ছাড়ে। তার মাধ্যমে নতুন একটা স্টক বাবল তৈরি করে। সে সময়ে যার কাছে অল্প কিছু টাকা ছিলো, তারও শেয়ারে ঢুকে পড়াটা সময়ের ব্যাপার ছিলো মাত্র।

কিন্তু তবুও এতে তাদের কোনো লাভ হয়নি কারণ ইউকিহোকে সে না করে দিয়েছিলো এগুলো করতে। এরপরে আর কখনোই শেয়ার নিয়ে কথা তোলেনি ইউকিহো। তবু এই যে শেয়ারের দাম এখন তরতর করে বাড়ছে, এটা নিয়ে ইউকিহো কী ভাবছে তা ভাবতেই অস্বাভাবিক লাগছে তার কাছে।

'গলফ খেলতে যাবে?'

আয়নায় ভেসে ওঠা ইউকিহোর চেহারার দিকে তাকালো সে। একটা সেমি-ডাবল খাটে শুয়ে আছে মাকোতো। ইউকিহোর খাটটা সিঙ্গেল। এক বাসায় থাকতে শুরু করার পর থেকেই আলাদা বিছানায় ঘুমাচ্ছে তারা।

'ভাবছিলাম শনিবার রাতে একসাথে যাবো,' হাত থেকে একটা লিফলেট মাকোতোর সামনে নামিয়ে রেখে বললো ইউকিহো।

'গলফের প্রতি আগ্রহ এলো কবে থেকে তোমার?'

'অনেক মেয়েকেই তো দেখি খেলতে। দম্পতিদের জন্যেও নাকি বেশ ভালো। দুজনে গেলে অনেক মজা হবে, দেখো।'

'আচ্ছা।'

মাকোতোর বাবাও একসময় গলফ খেলতে পছন্দ করতো। প্রত্যেক ছুটির দিনে তার বাবা একটা বিশাল ব্যাগে করে গলফের সব সরঞ্জাম ভরে গাড়ির ট্যাংকের ভেতর রাখতো, এরপর চলে যেত কান্ট্রি ক্লাবে। মাকোতোর মনে পড়লো

কত সুন্দর ছিলো তার বাবার কাটানো সেই দিনগুলো। হয়তো বাড়ির বাইরে গিয়েই ভালো থাকতো সে, যেহেতু স্ত্রীর পরিবারের সাথে থাকতে হতো তাকে।

'আরেকটা সেমিনারও আছে সেদিন। সেখানে যাই চলো,' নিজের বিছানায় যেতে যেতে বললো ইউকিহো।

'যাওয়া যায়।'

'বেশ।'

'অবশ্য, আমার কাছে আরেকটা বুদ্ধি আছে। যেটা আমরা একসাথে করতে পারি।'

ইউকিহো হেসে উঠেই নিজের বিছানা ছেড়ে মাকোতোর বিছানায় চলে এলো।

স্ত্রী বিছানায় আসতেই হাত বাড়িয়ে লাইটটা অফ করে দিলো মাকোতো। এরপর তার পরনের সাদা নেগলিজের উপরে থাকা স্তনে হাত বুলিয়ে দিলো। ওর স্তনগুলো বেশ বড় এবং তুলতুলে নরম। তবে অন্য কিছু ভাবছে মাকোতো; আজকেও আবার কোনো সমস্যা না দেখা দেয়। কারণ ইদানীং একটু বেশিই হচ্ছে সেটা। স্তনগুলো টিপে নিয়ে নিপলের দিকে তাকানো শেষে নেগলিজেটা খুলে ফেললো মেয়েটার। নিজের পরনে থাকা পায়জামাও খুলতে নিলো। ইউকিহো এখনো পর্যন্ত একটু ছুঁয়েও দেখেনি, এরমধ্যেই পুরুষাঙ্গ শক্ত হয়ে গেছে তার।

পুরো উলঙ্গ দুজনেই। এমন অবস্থায় জড়িয়ে ধরলো মাকোতো তাকে। এখনো ফিট আছে ইউকিহো, যদিও মাকোতো কখনো তাকে জিম করতে দেখেনি। স্ত্রীর কোমরে হাত দিতেই সে মোচড় দিয়ে উঠলো খানিকটা। হাত দিয়ে ইউকিহোর দেহটা জড়িয়ে ধরে গলায়, স্তনে চুমু খেতে লাগলো মাকোতো। এবার হাত চলে গেল ওর প্যান্টির দিকে। ওটা হাঁটু পর্যন্ত নামিয়ে দিয়ে বাকিটা তার নিজের পা ব্যবহার করে করলো। সব সময়ই এটা করে মাকোতো।

ওর হাত গিয়ে ইউকিহোর দুপায়ের মাঝখানে পৌঁছালো, আর তারপর পড়লো ওখানে থাকা গুপ্ত লোমের উপর। যে শঙ্কাটা তার মনে উদিত হয়েছিলো সেটাই সত্য প্রমাণিত হলো আবারো। কোনো রকম আর্দ্রতা নেই ওখানে। দুপায়ের মাঝে হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলো সে। নাহ, যত আস্তেই নাড়াক না কেন, কোনো রকম তেল চিটচিটে ভাব সেখানে নেই। মাকোতো নিশ্চিত তার টেকনিকে কোনো ভুল নেই। এই কিছু দিন আগেও সব ঠিকঠাকমতোই হচ্ছিলো। এবার হাত নাড়ানো বন্ধ করে একটু নিচে আঙুল ঢোকানোর চেষ্টা করতে লাগলো সে। একটু জোরে চাপ দিতেই 'আউচ' বলে উঠলো ইউকিহো। এই আবছা আলোতেও মাকোতো বুঝতে পারলো তার স্ত্রী ভ্রুকুটি করে আছে।

'সরি, ব্যথা লেগেছে?'

'সমস্যা নেই, ভেতরে ঢোকাও।'

'যদি আঙুলেই ব্যথা পাও, তাহলে আর করে লাভ নেই।'

'না, না, ঠিক আছি আমি। ওটা নিতে পারবো। আস্তে আস্তে নিলেই বরং বেশি ব্যথা লাগে,' পাদুটো হালকা ছড়িয়ে দিয়ে বললো ইউকিহো।

একটু নড়ে স্ত্রীর দুপায়ের মাঝখানে এসে বসলো মাকোতো। এরপর এক হাতে পুরুষাঙ্গ ধরে তার যোনিদ্বারে চাপ দিলো।

ও দেখলো ইউকিহো হাঁ করে হাঁফাচ্ছে। এরমধ্যেই দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছে তার। পলক ফেললো মাকোতো। ততটা জোরেও চাপ দেয়নি সে। এমনকি ভেতরেও ঢোকেনি পুরুষাঙ্গ। আবারো চাপ দিতেই অস্বাভাবিক আর্তনাদ করে উঠলো ইউকিহো।

'কী সমস্যা?' জিজ্ঞেস করলো সে।

'আসলে পেটে ব্যথা করছে আমার।'

'পেটে?'

'মানে তলপেটে।'

'আবারো?' বললো মাকোতো।

'সরি, কিন্তু সমস্যা নেই। ঠিক হয়ে যাবে ওটা।'

'না, ঠিক হয়ে যাবে না।' উঠে গিয়ে পায়ের কাছে থাকা আন্ডারপ্যান্ট পরে নিলো মাকোতো। পায়জামাও পরে নিলো তারপর। 'মনে হচ্ছে আজকে রাতটাও আগের মতোই হয়েছে।'

ইদানীং এরকমটাই হচ্ছে মূলত। ইউকিহো নিজেও ভেতরের পোশাক পরতে লাগলো। নেগলিজেটা উঠিয়ে গায়ে জড়িয়ে নিজের বিছানায় চলে গেল সে। 'আমি সত্যিই দুঃখিত,' বললো সে। 'আমি জানি না কী সমস্যা হয়েছে আমার।'

'আমাদের আসলেই ডাক্তার দেখানো উচিত, বুঝলে?'

'জানি আমি, শুধু–'

'কী?'

'আমি শুনেছি অ্যাবোরশন করালে নাকি এমনটা হয়। মানে শুকনো থাকে আর ব্যথা লাগে।'

'কই, আমি তো কখনো শুনিনি।'

'তুমি কীভাবে শুনবে...তুমি তো ছেলে।'

'হ্যাঁ, তবুও...' মাকোতো বুঝলো এই কথোপকথন কোনো সমাধান আনবে না, তাই অপর পাশে ফিরে কাঁথা গলা পর্যন্ত টান দিয়ে শুয়ে পড়লো। এরমধ্যেই তার পুরুষাঙ্গ নরম হয়ে গেছে, কিন্তু উত্তেজনা কমেনি তার। যদি তারা সেক্স না-ই করতে পারে, তবে অন্য অনেক উপায় তো রয়েছে আদর করার, কিন্তু ইউকিহো সেরকম কিছু করার মতো মেয়ে না। আর মাকোতো তাকে সেসব করতে বলতেও পারবে না।

কয়েক মিনিট বাদেই হালকা কান্নার শব্দ শুনতে পেল সে। তার কাছে মনে হলো এখন মানাতে যাওয়াটা একটু বেশিই হয়ে যাবে, তাই কাঁথা মুড়ি দিয়ে মুখটা ঢেকে শুয়ে পড়লো। শুনতে না পাওয়ার ভান করছে।

***

দ্য ঈগল গলফ ড্রাইভিং রেঞ্জটা বর্গাকার একটা আবাসিক এলাকার একদম মধ্যখানে বানানো হয়েছে। সামনে একটা সাইনবোর্ড ঝুলছে যেখানে দুইশো ইয়ার্ডের মতো ড্রাইভিং রেঞ্জ এবং সর্বাধুনিক বল ডেলিভারি সিস্টেম থাকার কথা বলা হয়েছে। ছোট একটা সবুজ নেটের ভেতর সাদা রঙের ছোট ছোট বল একটার পর একটা উড়ছে।

স্কুলটায় আসতে তাদের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে লাগে বিশ মিনিটের মতো। চারটা ত্রিশ নাগাদ ওরা এসেছে এখানে। সেই লিফলেটের মতে, পাঁচটা নাগাদ শুরু হবে সেমিনার। 'আগেই এসে গেছি দেখা যাচ্ছে। আগেই বলেছিলাম আরেকটু দেরিতে রওয়ানা দিতে,' বিএমডব্লিউটা ঘোরাতে ঘোরাতে বললো মাকোতো।

'আমি আরো ভাবলাম রাস্তায় বুঝি জ্যাম থাকবে। চলো আমাদের সময় আসার আগে আমরা অন্যদের খেলা দেখি। হয়তো কিছু জিনিস শিখতেও পারবো,' পাশের সিট থেকে বললো ইউকিহো।

'বুঝতে পারছি না অপেশাদার কোনো মানুষের খেলা দেখে কী শেখার আছে।'

পুরো দেশের মধ্যেই গলফ খেলার একটা প্রবণতা বাড়ছে। আর তার উপর আজকে শনিবার, যার মানে হলো পুরো জায়গাটা ভরে আছে এখন সেখানে। আর এই বিষয়টা পার্ক করা গাড়ি দেখেই বলে দেওয়া যাচ্ছিলো। একটু সময় লাগলো খালি একটা জায়গা পেতে, কিন্তু তবুও জায়গা পেল মাকোতো। গাড়ি থেকে বেরিয়ে ভেতরে ঢোকার জন্য পা বাড়ালো দুজনেই। যাওয়ার পথে একটা ফোন বুথ পড়তেই থমকে দাঁড়ালো ইউকিহো। 'যদি কিছু মনে না করো, একটা ফোন করে আসি আমি?' ব্যাগ থেকে শিডিউলের বইটা বের করে বললো সে।

'ঠিক আছে, আমি ভেতরে গিয়ে দেখছি কী অবস্থা।'

'আচ্ছা,' বললো সে। রিসিভার হাতেও নিয়ে ফেলেছে এরমধ্যেই।

মূল ফটকের সামনের দিকটা বেশ উজ্জ্বল আলো দিয়ে সাজানো হয়েছে। আর দুজন তরুণী বেশ জমকালো পোশাক পরে লোকজনকে অভিবাদন জানাচ্ছে। বেশ কিছু লোক ধূসর কার্পেটটার উপর দাঁড়িয়ে সময় কাটানোর চেষ্টা করছে।

'ধন্যবাদ। আপনার নামটা ঠিক এখানে লিখুন। খেলা চালু হলে আপনাকে ডাকবো আমরা,' বলে উঠলো সেই তরুণীদের একজন। এক ভুঁড়িওয়ালার সাথে কথা বলছে সে। দেখে মনে হচ্ছে না লোকটার কোনো কালে খেলার প্রতি আগ্রহ ছিলো। কালো একটা গলফ ব্যাগ রয়েছে তার পাশে।

'অনেক ভিড় নাকি আজকে?' জিজ্ঞেস করলো লোকটা, মুখ গোমড়া করে আছে।

'কিছুটা। বিশ থেকে ত্রিশ মিনিটের মতো অপেক্ষা করতে হবে।'

'বাহ, চমৎকার।' বিরক্তি নিয়েই খাতায় নাম লিখলো লোকটা।

মাকোতো এগিয়ে গেল ডেস্কের দিকে। বললো যে ইনফরমেশন সেশনের জন্য এসেছে। একজন কর্মী পাশ থেকে বললো যে ঘোষণা দেওয়া হবে এই ব্যাপারে। ও যেন লবিতে অপেক্ষা করে। মুহূর্তেই ইউকিহো ভেতরে ঢুকে মাকোতোর পাশে এসে দাঁড়ালো।

'একটা সমস্যা হয়েছে,' বললো সে। 'দোকানে যেতে হবে আমাকে।' ঠোঁট কামড়ালো সে। শনিবার দিন নাওমি আর অন্য একজন পার্ট-টাইম কর্মী সামলায় দোকান।

'এখন?' জিজ্ঞেস করলো মাকোতো। তার ভেতরের ক্রোধ গলায় স্পষ্ট ফুটে উঠেছে।

মাথা দোলালো শুধু ইউকিহো।

'তো গলফ স্কুলের কী হবে? ইনফরমেশন সেশনের জন্যও অপেক্ষা করতে পারবে না তুমি?

'না, সরি। কিন্তু তুমি থাকতে পারো চাইলে। আমি একটা ট্যাক্সি ধরে চলে যাবো। আর যদি বিরক্ত লাগে, তবে বাড়ি চলে যেও।'

'আচ্ছা।'

'খুবই খুবই দুঃখিত। দেখা হবে পরে।' বলেই দরজার দিকে হাঁটা ধরলো ইউকিহো। মাকোতো তাকিয়ে রইলো তার যাওয়ার দিকে। অনুভব করলো পেটের মধ্যে রাগ ফুলে-ফেঁপে উঠছে। ও জানে, যদি এই রাগ সে বাড়তে দেয়, তবে নিজেরই ক্ষতি হবে। এরমধ্যেই কয়েকবার এই অনুভূতি টের পেয়েছে সে।

লবির এককোনায় থাকা একটা গলফের দোকানে ঘুরে সময়টা পার করতে লাগলো সে। দোকানের ভেতর খেলার এত সরঞ্জাম দেখার পরেও গলফের প্রতি তেমন আগ্রহ জাগলো না তার। গলফ সম্পর্কে খুব কমই জানে সে। একটা সাধারণ নিয়মের চার্ট দেখে বুঝলো যে অধিকাংশ গলফারেরই টার্গেট থাকে একশো নাম্বার তোলা। এখন এটা দ্বারা আসলে কী বুঝিয়েছে তাও জানে না সে, এমনকি একশো নাম্বারের উপরেও কোনো নাম্বার আছে কি না তাও বুঝতে পারছে না।

মাকোতো এক সেট ড্রাইভিং আয়রন[১৬] দেখছিলো, এমন সময় টের পেল কেউ একজন তাকিয়ে আছে ওরই দিকে। এক মহিলা, যার পরনে ঢোলা বিজনেস প্যান্ট, পাশ থেকে দেখছে ওকে।

মাথা তুলে সামনে তাকাতেই চোখে চোখ পড়লো তাদের।

একটু সময় লাগলো তার বুঝে উঠতে, কিন্তু যখন বুঝলো ওটা কে, তখন চোয়াল ঝুলে গেল তার।

শিজুরু মিসাওয়ার দিকে তাকিয়ে আছে সে। চুল কিছুটা ছেঁটে ফেলেছে সে, আর আগের থেকে একটু ভিন্ন লাগছে, কিন্তু এটা যে সে তাতে কোনো ভুল নেই।

'শিজুরু? এখানে কী করছো তুমি?' জিজ্ঞেস করলো মাকোতো।

'গলফ শিখছি,' ক্লাবের কেস দেখিয়ে বললো শিজুরু।

'ওহ আচ্ছা, মানে, উমম...' চিবুকে চুলকে নিয়ে বললো মাকোতো। যদিও ওতে চুলকানোর প্রয়োজন ছিলো না।

'আপনিও তো একই কারণে এসেছেন, তাই না, মি. তাকামিয়া?' জিজ্ঞেস করলো সে।

'হ্যাঁ, ঐ আর কি।' মাকোতোর ভালো লাগলো যে মেয়েটা এখনো তার নাম মনে রেখেছে।

'একাই এসেছেন নাকি?'

'হ্যাঁ, তুমি?'

'হ্যাঁ। বসে কথা বলি?' দুটো খালি সিট দেখামাত্রই অন্যরা যাতে বসতে না পারে তার আগেই দখল নিলো ওরা।

'তোমাকে এখানে দেখে বেশ অবাক হলাম,' মাকোতোই শুরু করলো বলা।

'মজা করছি না, প্রথমে আমিও ভেবেছিলাম অন্য কাউকে দেখে ভুল ভাবছি কি না।'

'তো কোথায় আছো আজকাল?'

'শিমোকিতাজাওয়াতে। শিনজুকুর একটা আর্কিটেকচারাল ফার্মে কাজ করছি আপাতত।'

'এখনো সেই অস্থায়ী কর্মীর কাজ করছো?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি না বলেছিলে আমাদের কোম্পানির সাথে চুক্তি শেষ হওয়ার পরে স্যাপোরোতে চলে যাবে?'

'বাহ, মনে আছে দেখছি,' হালকা হেসে বললো শিজুরু। হাসার সাথে সাথে উজ্জ্বল দাঁতগুলো দেখা গেল তার। হাসির কারণে মাকোতোর কাছে মনে হলো এই ছোট চুল তার সাথে মানিয়েছে ভালো।

'তো যাওনি তবে সেখানে?'

'না, না, গেছিলাম। অল্প কিছু দিনের জন্য। কিন্তু ফিরে আসি আবার।'

'বুঝতে পেরেছি,' ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললো মাকোতো। চারটা পঞ্চাশ বেজে গেছে। ইনফরমেশন সেশন আর দশ মিনিট বাদে শুরু হবে। এখন ওর কাছে ব্যাপারটা অনেক তাড়াহুড়ার মনে হচ্ছে।

সেই দিনের কথা হঠাৎ মাথায় এলো মাকোতোর। দুই বছর আর কয়েক মাস আগের কথা হবে হয়তো। ইউকিহো আর তার বিয়ের আগের রাতের কথা, যে রাতে সে শিজুকুর জন্য অপেক্ষা করেছিলো লবিতে, কিন্তু সে আসেনি। আজ বুঝতে পারছে, তখন সে আসলেই তার প্রেমে পড়ে গেছিলো। কারণ সবকিছু ছেড়ে দিতে চেয়েছিলো সে সময় তার জন্য। সত্যি বলতে, কয়েক মুহূর্তের জন্য সে ভেবেও নিয়েছিলো যে শিজুকুই বুঝি তার গন্তব্য।

কিন্তু মেয়েটা আসেনি সেদিন। ও জানে না কেন। যা জানে তা হলো, ভাগ্য তার প্রতি অসদাচরণ করেছে। মেয়েটা কখনোই তার গন্তব্য ছিলো না।

কিন্তু এই মুহূর্তে ওকে দেখামাত্র মাকোতোর মনে হচ্ছে যে তার প্রতি যে অনুরাগ মাকোতোর কাজ করতো তা উধাও হয়ে যায়নি এখনো। ওর কাছাকাছি থাকাতেই হার্টবিট বেড়ে যাচ্ছে তার। আনন্দ অনুভব করছে সে, একধরনের মিষ্টি আনন্দ, যেটা অনেক দিন ধরে পায়নি।

'তো কোথায় থাকেন এখন, মি. তাকামিয়া?'

'সেইজোতে।'

'ওহ, হ্যাঁ, বলেছিলেন একবার মনে হয়,' বললো সে। 'আড়াই বছর হয়ে গেছে। বাচ্চা আছে?'

'না, এখনো নিইনি।'

'নিতে চাচ্ছেন না?'

'নিচ্ছিও না, আবার পারছিও না নিতে।' শুষ্ক হাসি দিলো মাকোতো।

'হুম, বুঝলাম,' বললো শিজুকু।

'তোমার ব্যাপারে বলো। বিয়ে করেছ?'

'নাহ, এখনো সিঙ্গেলই আছি।'

'কোনো পরিকল্পনা?' বললো মাকোতো। ওর চেহারার দিকে তাকিয়ে আছে সে।

হেসে মাথা ঝাঁকালো শিজুকু। 'তেমন কেউ নেই যে পরিকল্পনা করবো।'

কেন যেন মাকোতোর মনে স্বস্তি এলো এ কথা শুনে। আবার এমনকি নিজের কাছে জিজ্ঞেসও করলো যে মেয়েটা বিবাহিত না অবিবাহিত তা দিয়ে তার কী কাজ!

'প্রায়ই আসা হয় এখানে তোমার?' জিজ্ঞেস করলো মাকোতো।

'সপ্তাহে একবার। যেহেতু শিখছি, সেহেতু একবার আসতেই হয়।'

মেয়েটা আরো বললো যে প্রায় মাসদুয়েক ধরেই আসা-যাওয়া করছে সে। প্রত্যেক শনিবার পাঁচটায় এসে প্রাথমিক সব লেসন শেখে। যেই ক্লাসটা মাকোতো আর ইউকিহো আজকে করবে ভেবেছিলো। মাকোতো বললো যে সেও এই কোর্সের ইনফরমেশন সেশনটা শুনতেই এসেছে।

'মজা করছেন না তো?' জিজ্ঞেস করলো সে। 'ওরা প্রতি দুমাসে নতুন মানুষ নেয়, তার মানে এখন থেকে প্রায়ই দেখা হবে আমাদের।'

'তাই তো মনে হচ্ছে,' বললো মাকোতো।

মাকোতো এই কাকতালীয় বিষয়টা নিয়ে কিছুটা দ্বিধার মধ্যে আছে। কারণ যতবারই সে এখানে আসবে, ততবারই ইউকিহো তার সাথে থাকবে। আর সে চাচ্ছে না ইউকিহোর সাথে শিজুরুর দেখা হোক। অথবা শিজুরুকেও বলতে চাচ্ছে না যে ইউকিহো তার সাথে আসবে। আর সেই মুহূর্তেই ঘোষণা এলো যে যারা যারা ইনফরমেশন সেশনের জন্য এসেছে, তারা যেন রিসিপশন ডেস্কে দেখা করে।

'আমার তাহলে প্র্যাকটিস করতে যাওয়া উচিত,' গলফ ব্যাগটা তুলে নিয়ে বললো শিজুরু। 'আমি পরে এসে দেখবো কেমন খেলেন।'

'আরে না, না, আসা লাগবে না। বিব্রতকর একটা পরিস্থিতি হয়ে যাবে আমার জন্য,' হেসে বললো সে। নাকের ডগার চামড়াটা কিছুটা কুঁচকে গেল সেই সাথে।

***

মাকোতো বাড়ি ফিরে দেখলো ইউকিহোর জুতো দরজার সামনে রাখা। ভেতর থেকে কিছু একটা ভাজার শব্দ শুনলো সে। ভেতরে ঢুকে বসার ঘরে যেতেই দেখলো ইউকিহো গায়ে অ্যাপ্রোন জড়িয়ে রান্নাঘরে ডিনার বানাচ্ছে।

'এসে পড়েছ। যতটা দেরি হবে ভেবেছিলাম তার থেকে বেশ দেরি করেই ফিরেছ দেখছি,' তেলের কড়াইটা নাড়াতে নাড়াতে বেশ জোরেই বলে উঠলো মেয়েটা। সাড়ে আটটা বাজে এরমধ্যে।

'তুমি কখন এসেছিলে?' রান্নাঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো মাকোতো।

'ঘণ্টাখানেক আগে। আগেই এসেছি যাতে রাতের খাবারটা রান্না করতে পারি।'

'আচ্ছা।'

'আরেকটু অপেক্ষা করো। হয়ে গেছে প্রায়।'

'মজার একটা ঘটনা ঘটেছে।' স্থির হয়ে ইউকিহোর সালাদ বানানো দেখছে সে। 'আজকে এক পুরোনো বন্ধুর সাথে দেখা হলো আমার।'

'সত্যি? আমার চেনা কেউ?'

'মনে হয় না চেনো তুমি।'

'তারপর?'

'তারপর আর কি। অনেক দিন পরে দেখা, তাই একটু খেতে গেলাম। ঐ গলফ স্কুলের ওখানের একটা রেস্টুরেন্টে খাওয়াদাওয়া করি আমরা।'

থেমে গেল ইউকিহোর হাত। ঘাড়ের কাছে হাতটা নিয়ে এসে বললো, 'ওহ।'

'আমি ভাবলাম তোমার বুঝি দোকানে দেরি হবে। তো কী সমস্যা হয়েছিলো দোকানে?'

'আসলে দোকান থেকে সরাসরি বাসায় চলে আসি আমি,' ঘাড়ের পেছনটা ডলতে ডলতে বললো ইউকিহো। 'আর তাছাড়া, এত তাড়াতাড়ি যে আমি ফিরবো তাও তুমি আশা করোনি। কেনই বা করবে?'

'সরি, আমার আসলে খোঁজ নেওয়া উচিত ছিলো।'

'সমস্যা নেই, ওটা নিয়ে ভাবতে হবে না। আমি রান্না শেষ করছি, ক্ষুধা লাগলে খেয়ে নিও।'

'থ্যাংক্স।'

'তো কেমন ছিলো গলফ সেশন?'

হালকা ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠলো মাকোতো। 'তেমন বিশেষ কিছু ছিলো না। ওরা বললো যে তাদের নাকি আলাদা কিছু কারিকুলাম রয়েছে, আর সেগুলো বইয়ের মতো কিছু একটায় দেবে হয়তো।'

'উপভোগ করার মতো কিছু ছিলো নাকি?'

'হালকা-পাতলা,' বললো মাকোতো। বুঝতে পারছে না আসলে কীভাবে ব্যাখ্যা করবে বিষয়টা। এখন যেহেতু সে জেনে গেছে যে শিজুরু ওখানে প্র্যাকটিস করতে যায়, সেহেতু ইউকিহোকে সেখানে নিতে চাচ্ছে না। কিন্তু ইউকিহোকে কী বলে বোঝাবে তা বুঝতে পারছে না। 'জানি না আসলে...' মাথায় চটপট জবাব খুঁজতে লাগলো সে।

কিন্তু তার আগেই ইউকিহো থামিয়ে দিলো তাকে। 'জানি আমিই ওখানের কথা তোমাকে বলেছিলাম। আর এখন যা বলবো তা হাস্যকর শোনাতে পারে, তবে আমার মনে হয়...আমার জন্য এখন উপযুক্ত সময় না আর কি।'

'কী?' ইউকিহোর মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো মাকোতো। 'কীসের জন্য উপযুক্ত সময় না?'

'আসলে জানোই তো আমরা আরেকটা দোকান দিচ্ছি। তো এখন সেখানে তো কর্মী লাগবে। আর কর্মী পাওয়াটাই বেশ মুশকিলের কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভালো ভালো কোম্পানিগুলো ভালো কর্মীদের চোখে চোখে রেখে নিজেদের করে নেয়, আর আমাদের এই ছোট বুটিকের দোকানে তেমন কারো আগ্রহও পাচ্ছিলাম না।'

'তারপর?'

'তো আমি এটা নিয়ে নাওমির সাথে কথা বললাম আজ। সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো যে শনিবার দিনটা আর ছুটি নিতে পারবো না আমি। কাজ করতে হবে। তবে প্রত্যেক সপ্তাহে না।'

'মানে রবিবার দিন ছুটি পাবে শুধু, তাই তো?'

'হ্যাঁ, ওরকমই কিছুটা,' ওর দিকে তাকিয়ে বললো ইউকিহো। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে সে ধরেই নিয়েছে মাকোতো রাগ করবে এই কথা শুনে।

কিন্তু মাকোতো মোটেও রাগ করেনি।

'তার মানে তো গলফ লেসন নিতে পারছো না তুমি।'

'মনে তো হচ্ছে না। আর সেজন্যই বেশ অনুতপ্ত আমি। কারণ পুরো পরিকল্পনাটা আমার ছিলো। আবারো সরি বলছি।' মাথাটা হালকা ঝোঁকালো সে।

'আচ্ছা।' বুকে হাত বেঁধে সোফার দিকে যেতে লাগলো মাকোতো। 'তাহলে তাই হবে।' বসে পড়লো সে। 'আমি একাই করবো তাহলে ক্লাসগুলো।'

'রাগ করোনি তুমি?' কিছুটা অবাক হয়ে বললো ইউকিহো।

'রাগ কেন করবো? সিদ্ধান্ত নিয়েছি এসব বিষয়ে আর তোমার উপর রাগ করবো না আমি।'

'উফ, আমি আরো ভয়ে মরছিলাম আমার উপর ভীষণ রাগ করবে ভেবে। আসলে তেমন লোক পাওয়া যায়নি তো, তাই একটু অতিরিক্ত সময় দিতে হচ্ছে–'

'ঠিক আছে, ওতে সমস্যা নেই। কিন্তু পরে আবার বোলো না যে তুমি ক্লাস করবে। কারণ তত দিনে অনেক দেরি হয়ে যাবে তোমার জন্য।'

'বলবো না, প্রমিজ।'

'আচ্ছা।'

টিভির রিমোটটা তুলে নিয়ে বাটন চাপলো মাকোতো, আর চিন্তা করতে লাগলো কখন ফোন করলে ইউকিহো শুনতে পাবে না।

***

রাতে ঘুমাতে বেশ কষ্ট হলো মাকোতোর। যখনই শিজুরুর কথা মাথায় এলো, তখনই মনে হলো সে গরম হয়ে উঠছে, অনেকটা জ্বর এলে যেমন হয়। মাথার ভেতরে সেই হাসির ছবি, কানের ভেতর তার গলার স্বর–সব একসাথে বাজছে যেন। সেই ইনফরমেশন সেশনের কিছু অংশ ছিলো বাস্তবিক খেলার ক্লাস। শিজুরু পুরো ক্লাসটাতে বলে ঠিকঠাকভাবে আঘাত করছিলো, ইন্সট্রাক্টর যেভাবে বলে দিচ্ছিলো ঠিক সেভাবে। আর পুরোটা সময়ই পেছন থেকে দেখছিলো মাকোতো। কিন্তু যখন শিজুরু বুঝলো যে মাকোতো তাকে দেখছে, কয়েকবারের জন্য তার বল গর্ত মিস করে গেছিলো। আর প্রত্যেকবারই তার দিকে তাকিয়ে জিহ্বায় কামড় দিয়েছিলো সে। প্র্যাকটিস শেষে মাকোতো তাকে ডিনারের অফার করে বসে। 'আসলে বাসায় খাওয়ার মতো তেমন কিছু নেই, তাই এমনিতেও বাইরেই খেতে হতো আমাকে। ভাবলাম একা একা না খাই,' অজুহাত হিসেবে বলে সে।

অল্প একটু দ্বিধা যে মেয়েটা করেনি তা কিন্তু না। কিন্তু এরপরে হালকা হাসি দিয়ে তার সাথে ডিনারে যায় সে। মাকোতো ভাবেওনি এত সুন্দর করে তার সাথে খেতে চলে যাবে মেয়েটা। শিজুরু গলফ ক্লাস করতে ট্রেনে করে এসেছিলো, তাই

মাকোতো তার বিএমডব্লিউতে করে একটা পাস্তার দোকানে নিয়ে যায়। ওখানে আগেও কয়েকবার গেছিলো সে। অবশ্য, ইউকিহোকে কখনো সেখানে নেয়নি সে। নিভুনিভু আলোতে শিজুরুর মুখোমুখি বসে মাকোতো। পেছনের কথা ভবতে গিয়ে মাকোতো টের পায়, এর আগে কখনোই আলাদা করে শিজুরু তার সাথে বাইরে আসেনি।

ব্যাপারটা ভালো লেগেছিলো মাকোতোর কাছে। কেন যেন ওর সাথে বসে থাকাটাকেই ঠিক মনে হচ্ছিলো তার। ওর সাথে যখন থাকে, তখন মনে হয় কথা বলা বেশ সহজ হয়ে পড়ে। মাঝে মাঝে মনে হয় যেন ভালো বক্তাই হয়ে যায় সে। শিজুরুও কথায় কথায় হাসে এবং তাল মেলায়।

শিজুরুর বিভিন্ন কোম্পানির অভিজ্ঞতা নিয়ে বলার সময় হঠাৎ মাকোতোর মাথায় একটা আইডিয়া খেলে যায়। 'আচ্ছা, তুমি গলফ খেলতে চাচ্ছো কেন? ফিট থাকতে?' জিজ্ঞেস করলো মাকোতো।

'জানি না আসলে। মনে হলো কিছুটা পরিবর্তন করা দরকার। হয়তো নিজেকেই।'

'তোমার কি পরিবর্তিত হওয়ার কোনো প্রয়োজন ছিলো?'

'কিছু কিছু বিষয়ে মনে হয়েছিলো আসলেই পরিবর্তন করা দরকার, হ্যাঁ। মনে হচ্ছিলো কোনো তলানি খুঁজে পাচ্ছিলাম না একেবারে।'

হাসলো মাকোতো।

'তো আপনি কেন শুরু করতে এলেন?' জিজ্ঞেস করলো এবার শিজুরু।

'আমি?' উত্তর খোঁজার চেষ্টা করছে সে। তার স্ত্রী বলেছে এটা করতে–এই কথাটা বলতে চাচ্ছিলো না সে। 'আমার ক্ষেত্রে তেমন এক্সারসাইজ হচ্ছিলো না, তাই এখানে এলাম।'

মনে হলো শিজুরু এই উত্তরে সন্তুষ্ট হয়েছে। রেস্টুরেন্ট থেকে বের হওয়ার পরে বাড়িতে ছেড়ে আসার অফার করেছিলো মাকোতো। প্রথমে না করে দিয়েছিলো মেয়েটা, কিন্তু মনে হয়নি অসন্তুষ্ট হয়েছিলো জিজ্ঞেস করাতে। তাই মাকোতো আরেকটু চাপ দিতেই রাজি হয় সে। পুরো সময়টা ধরে শিজুরু একবারও তার বিবাহিত জীবন নিয়ে জিজ্ঞেস করেনি–মাকোতো জানে না সে আসলে ইচ্ছাকৃতভাবেই এড়িয়ে গেছে কি না। অথবা ইউকিহোর ব্যাপারেও কিছু বলেনি যে সে এসেছে কি না। শুধু গাড়িতে উঠে বসার পরে একবারের জন্য শিজুরু জিজ্ঞেস করেছিলো, 'আপনার স্ত্রী কি আজ বাইরে?' প্রশ্নটা করার সময় কোনো একটা কারণে তাকে কিছুটা নার্ভাস লাগছিলো।

'ও কাজ করে তো, তাই প্রায়ই বাইরে বাইরে থাকতে হয় তাকে,' মাথা দুলিয়ে বললো মাকোতো। এরপর মেয়েটা আর তেমন কিছু জিজ্ঞেস করেনি এ

বিষয়ে। ট্রেনের লাইনের পাশেই তার অ্যাপার্টমেন্ট। ছোট একটা জায়গা, তিনতলা বিল্ডিংয়ের মতো উঁচু।

'অনেক অনেক ধন্যবাদ। পরের সপ্তাহে দেখা হচ্ছে তবে,' গাড়ি থেকে নামতে নামতে বললো শিজুরু।

'আসলে এখনো ঠিক করিনি ওখানে যাবো কি না,' বললো মাকোতো। যদিও সেই সময়ে ধরেই রেখেছিলো যাবে সে।

'ওহ, আপনি তাহলে অনেক ব্যস্ত,' হতাশ সুরে বললো শিজুরু।

'তারপরেও আশা করি এমনিতেও দেখা হবে আমাদের। যদি মাঝেমধ্যে ফোন করি, তবে মাইন্ড করবে না তো?' মাকোতো ডিনার করার সময়েই নাম্বার নিয়েছিলো তার কাছ থেকে।

'আরে মাইন্ড কেন করবো!' মেয়েটা বললো। 'দারুণ, তাহলে দেখা হবে আবার। চললাম।'

'গুডনাইট।'

গাড়ি থেকে যখন নামছিলো শিজুরু, তখন হঠাৎ করে মাকোতোর ভেতরে একটা ঝড় বয়ে যায় তার হাতটা ধরার জন্য। মন চাইছিলো হাতটা ধরে কাছে টেনে সেখানেই চুমু বসিয়ে দিতে। কিন্তু সেসবই ছিলো কেবল তার কল্পনা। ও গাড়ি চালিয়ে আসার সময় রিয়ার ভিউতে দেখেছিলো মেয়েটা হাত নাড়ছে ওর দিকে।

মাকোতো রাতে বালিশে মুখ গুঁজে নিয়ে ভাবলো যে গলফ প্র্যাকটিস করতে গেলে আসলেই শিজুরি খুশি হবে কি না। ফোন করার জন্য তার মন উতলা হয়ে আছে যেন। কিন্তু সে রাতে আর ফোন করতে পারলো না। সপ্তাহে একবার ওর সাথে দেখা হবে–এটা ভাবতেই বুকে মোচড় দিয়ে উঠছে তার, যেন আবার যুবক বয়সে ফিরে গেছে সে। পরের শনিবারের জন্য যেন তর সইছে না আর।

পাশ ফিরতেই ওপাশের বিছানায় ইউকিহোর শ্বাস নেওয়ার শব্দ টের পেল সে। আর আজকে তাকে ঘুম থেকে জাগানোর প্রয়োজন মনে করলো না।

***

'মিটিংয়ের সময় হয়েছে,' ই-টিমের সদস্যদের বললো নারিতা।

জুলাই মাসের কোনো এক দিনের কথা। গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে বাইরে। এয়ার কন্ডিশনগুলো পুরো দমে চলছে, কিন্তু তারপরও নারিতা তার শার্টের হাতাদুটো গুটিয়ে কনুই পর্যন্ত উঠিয়ে রেখেছে।

'সেই এক্সপার্ট সিস্টেম নিয়ে কিছু তথ্য পেয়েছি সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট টিম থেকে,' সবাই যখন তার ডেস্কের সামনে পৌঁছালো, তখন বলে উঠলো নারিতা। অনেকগুলো প্রিন্ট করা কাগজ দেখা যাচ্ছে তার হাতে। 'সিস্টেম টিম বলেছে যে যদি সেই কপি করা কোম্পানি আমাদের এক্সপার্ট সিস্টেমের ভেতর কোনো অবৈধ

এক্সেস নেয়, তবে তার কিছু প্রমাণ থাকবে। তাই সেই বিষয়টা খতিয়ে দেখা শুরু করে তারা। আর অবশেষে তারা সেরকম কিছু জিনিসের মিল পেয়েছে সেখানে।'

'তার মানে সিস্টেমটা আসলেই চুরি করা হয়েছে,' সবচেয়ে সিনিয়র এক কর্মী বিড়বিড় করে উঠলো পাশ থেকে।

'গত নভেম্বরের দিকে কেউ একজন আমাদের ওয়ার্কস্টেশন ব্যবহার করে পুরো এক্সপার্ট সিস্টেমটাকে কপি করেছে। কপি করার রেকর্ড রয়ে গেছে তাদের কাছে, কিন্তু ঐ রেকর্ডটাকেও কেউ একজন ওভাররাইট করেছে। যার কারণেই এত দিন ধরতে না পেরে এখন পেরেছে তারা,' একটু গলা নামিয়ে বললো নারিতা।

'তার মানে আমাদের কোম্পানিরই কারো কাজ এটা?' অন্য সদস্যদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো মাকোতো।

'বলা যায়, হ্যাঁ,' কঠিন মুখ করে বললো নারিতা। 'ওরা বলেছে আরো একটু খতিয়ে দেখে বলবে যে পুলিশের কাছে বিষয়টা নিয়ে যাওয়ার মতো কি না। কারণ এখনো আমরা এটা প্রমাণ করতে পারবো না যে ওদেরটা কপি আর আমাদেরটা অরিজিনাল। আর এটা যে আমাদের, সেটা নিশ্চিত করতে হলে প্রত্যেকটা ডাটা বিশ্লেষণ করতে হবে, এমনকি শেষ বাইটটা পর্যন্ত। শেষমেশ বলা যায় যে এই হচ্ছে পুরো কাহিনি।'

একটা হাত তুললো ইয়ামানো। 'যদি কোম্পানির ভেতরের কেউ না হয়ে থাকে, তবে? কেউ কি আমরা ছুটিতে থাকার সময়ে আমাদের কোনো একটা ওয়ার্কস্টেশনে এসে কাজটা করতে পারে না?'

'তারপরেও তাদের আইডি আর পাসওয়ার্ড লাগবে,' বললো মাকোতো।

'আসলে এই পয়েন্টে বলতে গেলে বলতে হয় যে,' বলা শুরু করলো নারিতা, 'সিস্টেমের সবাই একদম নির্দিষ্ট কিছু সম্ভাবনা দেখছে। যে-ই কাজটা করে থাকুক না কেন, তার কম্পিউটারের দক্ষতা বেশ ভালো। বলা যায় প্রফেশনাল এ বিষয়ে। যেটা আমাদের সামনে দুটো সম্ভাবনার রাস্তা বের করে দিয়েছে। এক, ভেতরের কেউ চোরকে নিয়ে এসেছে। আরেকটা হলো, চোরের হাতে হয়তো কারো আইডি আর পাসওয়ার্ড পড়ে গেছে। আমরা এখানের কেউই জানি না যে ওসব জিনিস কতটা গুরুত্বপূর্ণ আমাদের জন্য, এমনকি আমি নিজেও না। কেউ হয়তো আমাদের অসাবধানতার সুযোগ নিয়েছে।'

মাকোতো অনুভব করার চেষ্টা করলো তার মানিব্যাগ পেছনের পকেটে রয়েছে কি না। ওটার ভেতরেই তার আইডি কার্ড। আইডির পেছনে কোন ওয়ার্কস্টেশনে সে কাজ করে এবং তার পাসওয়ার্ড কী তা লিখে রেখেছিলো সে। তার মনে পড়লো কোম্পানি থেকে বলা হয়েছিলো এমন জায়গায় এরকম তথ্য না লিখে রাখতে যেখান থেকে সহজেই কেউ খোঁজ পাবে। সুযোগ পেলেই সেগুলো মুছে ফেলবে বলে ভাবলো মাকোতো।

***

'আরে বাহ, তোজাইতেও এমন হয়?' কফি রাখা কাগজের কাপে চুমুক দিতে দিতে বললো শিজুরু।

'মানে অন্যান্য কোম্পানিতেও এমন হয় নাকি?' জিজ্ঞেস করলো মাকোতো।

'হয় তো, বেশ কিছু জায়গায়ই ইদানীং এমন হওয়ার খবর পাওয়া যাচ্ছে। লোকে বলে যে তথ্যই নাকি এখন টাকা। প্রায় সব কোম্পানির তথ্যই তো এখন কম্পিউটারের ভেতর রেখে দেয় তারা, যার কারণে অন্যান্য মানুষ সেই ইনফরমেশন চুরি করতে নামে। পুরো কোম্পানির সব তথ্য একটা সিঙ্গেল ফ্লপি ডিস্কের মধ্যে রাখতে পারবেন চাইলে। আর সেগুলো থেকে যেটা আপনি চান সেটা কিছু কি-ওয়ার্ড দিয়ে খুঁজেও পেতে পারবেন। ততটা সময়ও লাগবে না।'

'এবার বুঝলাম কেন এটা করে মানুষ।'

'আর তোজাইর ভেতরে তো একটা অভ্যন্তরীণ নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা রয়েছে, তাই না? চিন্তা করুন, তাদের মধ্য থেকে কেউ একজন বাইরের নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত। এরকম অনেকেই আছে এখনকার সময়ে। এর মাধ্যমে বাইরের কেউ অনায়াসে ভেতরের খবর জেনে যাচ্ছে, এটা তো আরো বেশি বিপজ্জনক। আসলে আমেরিকাতে কয়েক বছর ধরে এমনটাই হয়ে আসছে। এদেরকে হ্যাকার বলে ডাকে তারা। এরা অন্যদের কম্পিউটারে অ্যাক্সেস করে সব তথ্য হাতিয়ে নেয়।'

শিজুরুর জানার পরিধি দেখে অবাক হলো সে। ভেবে নিলো বিভিন্ন কোম্পানিতে কাজ করার ফলে এসব জেনেছে হয়তো মেয়েটা।

প্রায় পাঁচটা বাজতে চলেছে। হাতে থাকা খালি কাপটা ময়লার ঝুড়িতে ফেললো মাকোতো। লবিটা মানুষ দিয়ে ভরা। সবাই নিজেদের পালা আসার জন্য অপেক্ষা করছে। কোনো খালি সিট না পাওয়ায় দেয়ালের সাথে হেলান দিয়ে কথা বলছে তারা।

'সেদিনের পর আর চেষ্টা করেছিলে উন্নতি করার?' টপিক পালটানোর জন্য জিজ্ঞেস করলো মাকোতো।

মাথা ঝাঁকালো শিজুরু। 'নাহ, প্র্যাকটিসে আসার জন্যই বেশ অল্প সময় পাই আমি। আপনার?'

'সেদিনের সেই ক্লাসের পর আর ধরেও দেখিনি।'

'কিন্তু আপনার ট্যালেন্ট আছে এ বিষয়ে,' বললো সে। 'আমি প্রথমে শুরু করেছিলাম, অথচ আপনি এখন আমার থেকেও উঁচু লেভেলের জিনিস শিখছেন। আপনার সমান হতে পারবো বলে মনে হয় না।'

'ওরা বলেছে তুমি যদি একটু হালকাভাবে খেলো, তবে আরো দ্রুত উন্নতি করবে।'

'যদি আপনি আমার মন ভালো করার জন্য বলে থাকেন, তবে বলে দিচ্ছি ওতে কাজ হবে না, হুঁ,' হেসে বললো শিজুরু।

মাকোতো গলফ শেখা শুরু করার পর তিন মাস পার হয়ে গেছে। এরমধ্যে একদিনও অনুপস্থিত থাকেনি সে। এর অন্যতম কারণ হলো, ও যতটা ভেবেছিলো তার থেকেও বেশি আগ্রহ-জাগানিয়া খেলা হচ্ছে এই গলফ, যদিও তার আসল অনুপ্রেরণা হলো শিজুরুকে দেখা।

'প্র্যাকটিসের পরে কোথাও ঘুরতে যাবে?' জিজ্ঞেস করলো মাকোতো। এরমধ্যে ক্লাস শেষে একটু ঘুরতে যাওয়া তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে।

'যাওয়া যায়।'

'ইতালিয়ানে গেলে কেমন হয়?'

'নিশ্চয়ই,' হেসে বললো শিজুরু।

আশেপাশে একবার চোখ বুলিয়ে মাকোতো নরম গলায় বললো, 'আমি ভাবছিলাম যেদিন আমাদের প্র্যাকটিস থাকবে না, সেদিনও আমাদের দেখা হোক। মানে একটু কথা বলার জন্য, যাতে সময় নিয়ে ততটা চিন্তা করতে না হয়।'

মাকোতো নিশ্চিত যে এরকম করে বললে শিজুরু ভাববে না যে তাকে জোর করছে সে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কতটুকু দ্বিধা সে করতে পারে তা। প্র্যাকটিস না থাকা একটা দিনে দেখা করা মানে প্র্যাকটিস শেষে একসাথে খেয়ে বাসায় ফেরার থেকেও অনেক বড় কিছু।

'ভালোই হয়,' বললো মেয়েটা। বেশ স্বাভাবিক লাগলো তার বলার ধরন, তবে হতে পারে সে অভিনয় করছে। বেশ কিছুক্ষণ পরে একটা হাসি দেখা গেল তার মুখে।

'দারুণ! আচ্ছা, তাহলে একটা দিন ঠিক করে তোমাকে জানাবো আমি।'

'একটু আগে থেকে জানিয়ে রাখবেন যাতে কাজের সময়টা অদল-বদল করতে পারি।'

'ঠিক আছে।'

এই কথার আদান-প্রদানই আবার উজ্জ্বল দিনগুলোর কাছে ফিরিয়ে নিয়ে এলো মাকোতোকে।

জুলাইয়ের তৃতীয় শুক্রবার শিজুরুর সাথে ডেটে যাবে বলে ঠিক করলো মাকোতো। বেশ ভালোই সময় কাটাতে পারবে তারা, যেহেতু সপ্তাহের শুরুর দিন এটা। আর সেই সাথে কাজ থেকে আগে আগে ছুটি পাবে শিজুরু।

এই দিনটা ঠিক করার আরেকটা কারণ আছে: ইউকিহোর দোকানের জন্য মালামাল কিনতে এক সপ্তাহের জন্য ইতালি যাওয়ার কথা এই বৃহস্পতিবার। ইদানীং কয়েক মাস পরপর ইতালিতে যাওয়া-আসা করছে সে।

বুধবার দিন বাড়িতে ফেরার পর মাকোতো দেখলো ইউকিহো বসার ঘরে স্যুটকেস খুলে সব গোছগাছ করছে ট্রিপে যাওয়ার জন্য। 'হাই,' মাকোতো ভেতরে ঢুকতেই বললো ইউকিহো। কিন্তু তার চোখ পড়ে রইলো টেবিলের উপর থাকা ক্যালেন্ডারের দিকে।

'ডিনার?' জিজ্ঞেস করলো মাকোতো।

'সেদ্ধ মাংস রান্না করেছি। খেয়ে নাও তুমি। একটু ব্যস্ত আছি এখন।' এখনো পর্যন্ত মাকোতোর দিকে তাকায়নি সে।

মাকোতো কিছু না বলে সোজা বেডরুমে চলে এলো, এরপর ড্রেস চেঞ্জ করে একটা সোয়েট প্যান্ট আর টি-শার্ট জড়িয়ে নিলো গায়ে। ইউকিহোর মধ্যে কিছুটা পরিবর্তন এসেছে তা লক্ষ করেছে সে। কিছু দিন আগেও ভালো স্ত্রী না হতে পারার অপরাধে ওর সামনে কেঁদেছিলো সে। আর আজ বলছে, 'যাও, খেয়ে নাও।'

ওর দোকান একটু ভালো যাচ্ছে বলে নিজের ভেতর গুটিয়ে যাচ্ছে কি না কে জানে। *কিংবা এখন যেহেতু আর তার কাছে কিছু চাইছি না আমি, তাই হয়তো*, ভাবলো মাকোতো। আগে যেকোনো কিছু তার মতের বিরুদ্ধে গেলে খুব রাগ হতো তার, কিন্তু এখন খুব কমই গলা উঁচু করে কথা বলে সে। তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো ঘটনা না ঘটায় একপ্রকার খুশিই মাকোতো।

শিজুরু মাসাওয়ার সাথে পুনরায় দেখা হওয়ার কারণে তার সবকিছু বদলে গেছে। যেদিন তাদের দেখা হয়েছিলো, সেদিন থেকেই ইউকিহোর উপর থেকে তার আগ্রহ কমতে শুরু করেছে, আর এও চাচ্ছিলো যে ইউকিহোও যেন তার প্রতি কোনো আগ্রহ না দেখায়। *পরস্পর থেকে দূরে সরে যাওয়া বলতে লোকে হয়তো এটাকেই বোঝায়*, ভাবলো মাকোতো।

মাকোতো আবার বসার ঘরে গেলে ইউকিহো বললো, 'ওহ, ভুলেই গেছি বলতে, দেখেছ? নাতসুমি এখানে থাকবে আজ রাতে। আগামীকাল একসাথে এয়ারপোর্টে গেলে ভালো হবে আমাদের জন্য।'

'নাতসুমিটা কে?'

'ওর সাথে দেখা হয়নি তোমার? একদম শুরু থেকেই তো আমাদের দোকানে কাজ করতো মেয়েটা। এবার একসাথে ইতালি যাচ্ছি আমরা।'

'আচ্ছা, কোথায় ঘুমাবে সে?'

'গেস্ট রুম পরিষ্কার করেছি আমি।'

তার মানে সব সিদ্ধান্ত আগেই নেওয়া হয়ে গেছে, মাকোতো বলতে চাইলো, কিন্তু বললো না আর।

দশটা নাগাদ নাতসুমি এসে পৌঁছালো বাড়িতে। বিশের কিছু উপরে হবে তার বয়স। উজ্জ্বল চেহারা।

'আশা করি এমন বেশভূষায় যাচ্ছো না তুমি,' একটা লাল টি-শার্ট আর জিন্স পরা নাতসুমিকে দেখে বললো ইউকিহো।

'কাল সকালে স্যুট পরে নেবো আমি। এগুলো সব লাগেজে ভরে ফেলবো তখন।'

'মনে হয় না ওখানে টি-শার্ট বা জিন্সের কোনো প্রয়োজন পড়বে তোমার। ট্যুরে যাচ্ছি না আমরা। এখানেই রেখে যেও ওগুলো,' ইউকিহোর গলা রুক্ষ শোনালো কিছুটা। এর আগে ওর এমন স্বর কখনোই শোনেনি মাকোতো।

'আচ্ছা,' নরম সুরে বললো নাতসুমি।

ওরা দুজনে বসার ঘরে কথা শুরু করলে মাকোতো গিয়ে ঢুকলো গোসল করতে। গোসল থেকে বের হওয়ার পরে দেখলো ইউকিহো আর নাতসুমি ভিন্ন ভিন্ন রুমে চলে গেছে।

একটা গ্লাস আর এক বোতল স্কচ, সাথে ফ্রিজ থেকে কয়েক টুকরো বরফের বাটি নিয়ে টিভির সামনে বসলো মাকোতো। ততটা বিয়ার খাওয়ার মতো মানুষ না সে। তাই যখনই একা কিছু খেত, তখন এই স্কচই নিয়ে বসতো। এখন তো রাতের একটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে এটা।

দরজা খুলে বেরিয়ে এলো ইউকিহো। কিন্তু মাকোতো তাকালো না তার দিকে। খেলার খবরের উপরেই চোখ পড়ে রইলো তার।

'মাকোতো?' বলে উঠলো ইউকিহো। 'একটু সাউন্ড কমাবে? এত শব্দের কারণে নাতসুমি ঘুমাতে পারছে না।'

'ঐ পর্যন্ত যাচ্ছে নাকি শব্দ?'

'হ্যাঁ, যাচ্ছে। এর জন্যই এখানে এসে সাউন্ড কমাতে বলছি আমি।'

একটু খোঁচা মারার মতো লাগলো তার কথাটা। মাকোতো কিছুটা চোখ রাঙিয়ে রিমোট হাতে নিয়ে টিভির সাউন্ড কমিয়ে দিলো।

এখনো দাঁড়িয়ে আছে ইউকিহো। ও বুঝতে পারছে ইউকিহোর চোখগুলো তার উপরেই আছে। মানে কিছু একটা বলতে চাচ্ছে সে। হঠাৎ করেই মাথায় এলো ভাবনাটা; বোধহয় শিজুরুর সম্পর্কে কিছু বলতে চায়। কিন্তু তা তো অসম্ভব!

দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো ইউকিহো। 'ইশ, তুমি দেখছি জীবনকে বেশ উপভোগ করছো।'

'কী?' মাকোতো তাকালো ওর দিকে। 'এর মানে কী?'

'মানে, দেখো একবার নিজের দিকে তাকিয়ে। যা ইচ্ছা করছো, যখন ইচ্ছা করছো। স্কচ খাচ্ছো, টিভিতে খেলা দেখছো–'

'এতে কী সমস্যা?'

'সমস্যার কিছু নেই। বলছি আর কি, জীবনকে যেমন ইচ্ছা তেমন করেই উপভোগ করছো তুমি,' বেডরুমে যাওয়ার জন্য ঘোরার আগে বললো সে।

'এক মিনিট, কী বলতে চাচ্ছো ভালো করে বলো। যদি কিছু বলার থাকে তো বলে ফেলো।'

'আচ্ছে কথা বলো। নাতসুমি শুনে ফেলবে,' ভ্রু কুঁচকে বললো ইউকিয়ো।

'তুমিই শুরু করেছ। আমি শুধু জানতে চাচ্ছি কী বোঝাচ্ছো, এই-ই যা।'

'কিছুই না। ঐ কেমনটা বললাম,' ঘুরে ওর দিকে ফিরলো একবার ইউকিয়ো। 'আমি ভাবছিলাম যে তোমার আদৌ কোনো স্বপ্ন আছে কি না। কোনো উদ্দেশ্য, নাকি এরকম করেই সারাটা জীবন কাটিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে তোমার। কিছু না করার পরিবর্তে বসে বসে বুড়ো হয়ে যাওয়া, ব্যস।'

মাকোতো টের পেল তার পশম দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, চোয়াল শক্ত হচ্ছে। 'তোমার মনে হয় তোমার কোনো উদ্দেশ্য আছে?' অবজ্ঞার স্বরে বললো মাকোতো। 'তুমি শুধু একজন ব্যবসাদার-নারীর ভূমিকা পালন করছো, এই-ই যা।'

'একটা ব্যবসা চালাচ্ছি আমি।'

'কার ব্যবসা? আমি নিজে কিনে দিয়েছি ওটা।'

'তো আমি কি ভাড়া দিচ্ছি না? আর কার কথা বলছো তুমি? ওটা কেনার জন্যেও নিজের মায়ের থেকে টাকা এনেছ তুমি।'

মাকোতো তাকালো ওর দিকে। ফিরতি চাহনি দিলো তার স্ত্রীও।

'ঘুমাতে যাচ্ছি আমি, কাল সকালে তাড়াতাড়ি উঠতে হবে আমাকে,' বললো ইউকিয়ো। 'তুমি ঘুমাতে যাও। বেশ রাত হয়েছে। আর এত মদ খেও না।'

'আমাকে আমার মতো থাকতে দাও।'

'গুডনাইট।' বলেই বেডরুমের দিকে চলে গেল সে।

মাকোতো আবারো বসে পড়ে মদের বোতলটা হাতে নিলো। অনেকটা মদ গ্লাসে ঢেলে নিলো সে। বরফ গলে গেছে এরমধ্যে। পুরোটাই ঢকঢক করে গিলতে লাগলো সে। কেন যেন আগের থেকে একটু বেশিই কটু লাগলো ওটা।

যখন চোখ খুললো, তখন টের পেল তার মাথা ভার হয়ে আছে। একটু কপাল কুঁচকে চোখ কচলাতে লাগলো যাতে আবছা দেখা জিনিসগুলো স্পষ্ট হয়। দেখলো ইউকিয়ো ড্রেসারের সামনে বসে মেকআপ করছে।

ঘড়ির দিকে তাকালো সে। জেগে ওঠার সময় এটা, কিন্তু তার শরীর পুরোপুরি ছেড়ে দিয়েছে।

ইউকিয়োকে কিছু একটা বলবে ভাবলো সে, কিন্তু খুঁজে পেল না যে কী বলবে। কেন যেন তাকে এই মুহূর্তে বেশ দূরের কেউ মনে হচ্ছে।

আয়নার প্রতিবিম্বে থাকা মুখটার দিকে তাকিয়ে পলক ফেললো সে। ওর বউয়ের এক চোখের উপর তালি কেন?

'ওটা কীসের জন্য লাগিয়েছ?' জিজ্ঞেস করলো সে। 'তালি পরে আছো কেন তুমি?'

ধীরে ধীরে পেছনে ফিরলো ইউকিহো। তার মুখ দেখে মনে হচ্ছে মুখোশ পরে আছে সে। 'গতকাল রাতে হয়েছে।'

'হাঁহ?'

'তোমার মনে নেই কিছু?'

চুপ মেরে গেল মাকোতো। গতকাল রাতের কথা মনে করার চেষ্টা করলো সে। মনে পড়লো ইউকিহোর সাথে ঝগড়া করে মদ খেয়েছিলো। কিন্তু তারপরে কী হয়েছে তা আর মনে করতে পারছে না সে। একটু একটু মনে আছে, তা হলো বেশ ঘুম ঘুম পাচ্ছিলো তার। কিন্তু এরপরে বিছানা পর্যন্ত কী করে এলো তা মনে পড়ছে না। মাথাটা ভার হয়ে থাকার কারণে কোনো কিছু মনে করতে আরো বেশি কষ্ট হচ্ছে তার।

'আমি কি...কিছু করেছি?' জিজ্ঞেস করলো মাকোতো।

'আমি ঘুমিয়ে ছিলাম কাল রাতে, এরপর তুমি এসে আমার উপর থেকে কাঁথা সরিয়ে নিলে...' ঢোক গিলে আবার বলা শুরু করলো ইউকিহো। 'এরপর চেঁচামেচি করে আমার মুখে আঘাত করতে থাকলে।'

'কী?' তার চোখ বড় বড় হয়ে গেছে। 'নাহ, এসব করিনি আমি!'

'অবশ্যই করেছ! আমার মাথায়, মুখে...'

'এসবের কিছুই মনে নেই আমার!'

'মাতাল হয়ে ছিলে তুমি,' উঠে দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বললো সে।

'না, থামো!' বলে উঠলো সে। 'আমার সত্যিই কিছু মনে নেই।'

'ওহ? হাস্যকর কথা বলছো। কারণ আমি তো সারা জীবনেও ভুলতে পারবো না এটা।'

'ইউকিহো...' লম্বা একটা শ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করলো সে। মাথা ঘুরছে তার। 'যদি আমি আসলেই ওটা করে থাকি, তবে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আমি খুবই দুঃখিত...'

একটু থামলো ইউকিহো। মাথাটা কিছুটা ঝুঁকিয়ে এরপর বললো, 'পরের সপ্তাহের শনিবার আসবো আমি।' আর তারপর দরজা খুলে বেরিয়ে গেল সে।

আবারো বালিশে মাথা রাখলো মাকোতো। সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে গতকাল রাতে কী হয়েছিলো তা আবার মনে করার চেষ্টা করতে লাগলো, কিন্তু অন্ধকার ছাড়া কিছুই খুঁজে পেল না আর।

***

শিজুরুর হাতে থাকা গ্লাসের ভেতরের বরফগুলো টুংটাং শব্দ করে উঠলো। গালটা লাল হয়ে এলো শিজুরুর। 'আসলেই আনন্দের ছিলো। মানে সবকিছুই। কথা বলা, খাবার, সব,' বলে উঠলো সে। অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালো নিজে নিজেই।

'আমারও বেশ ভালো কেটেছে সময়টা,' বললো মাকোতো। 'অনেক দিন পরে এমন কোনো ভালো দিন কাটালাম আমি।' মেয়েটার মুখোমুখি দাঁড়ালো সে। 'আর এসব কিছুই তোমার কারণেই হয়েছে। থ্যাংক্স।' লোকজনের সামনে এরকম করে বলাটা কিছুটা উদ্ভট লাগলেও আজকে বার পুরো ভরা থাকায় তেমন কেউ শুনছে বলে মনে হলো না।

আকাসাকার এক হোটেল বারে এসেছে তারা। পাশের ফ্রেঞ্চ রেস্টুরেন্টেই কিছুক্ষণ আগে ডিনার করেছিলো তারা দুজন।

'না, না, আমারই থ্যাংক্স বলা উচিত আপনাকে,' জবাবে বললো সে। 'মনে হচ্ছে এত বছরের একটা হোঁচট একপলকেই কেটে গেল যেন।'

'কীসের হোঁচট?'

'তেমন কিছু না। আসলে আমার মাথায় একসাথে অনেক চিন্তাভাবনা চলে তো, তাই বলে ফেলেছি,' স্ট্র দিয়ে চুমুক দিতে দিতে বললো মেয়েটা।

'আমার ক্ষেত্রেও,' হাতে থাকা গ্লাসটা নাড়াতে নাড়াতে বললো মাকোতো। 'আমি সত্যিই অনেক খুশি তোমার সাথে আবার দেখা হয়েছে বলে। যদি ধার্মিক হতাম, তাহলে এর জন্য অন্তত সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ জানাতাম।'

এটাও একটা বেহায়ার মতো স্বীকারোক্তি ছিলো। হেসে মাথা নোয়ালো শিজুরু।

'আচ্ছা, একটা বিষয়ে তোমাকে বলার আছে আমার,' বললো মাকোতো।

শিজুরু ফের তাকালো মাকোতোর দিকে, চকচক করে উঠলো তার চোখদুটো।

'দুই বছর আগে আমার বিয়ে হয়েছিলো। কিন্তু বিয়ের আগের দিন একটা বিশাল সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম আমি। বলতে গেলে অনেক বড় একটা সিদ্ধান্ত ছিলো সেটা। আর তার জন্য একটা জায়গায় যেতে হয়েছিলো আমাকে।'

শিজুর ভ্রু তুলে তাকালো তার দিকে, হাসি উবে গেছে মুখ থেকে।

'কী হয়েছিলো সেদিন তা তোমার কাছে বলা উচিত আমার।'

'হুম।'

'শুধু আমার সাথে একটু একা থাকতে হবে কিছুক্ষণ।'

ধীরে ধীরে চোখ বড় হতে লাগলো শিজুরুর। ওদিকে মাকোতো তার ডান হাত বের করে খুলে রেখেছে। হাতের ভেতর হোটেলের একটা রুমের চাবি।

মাথা নিচু করে চুপচাপ বসে রইলো শিজুরু।

'যে জায়গায় আমি সেদিন গেছিলাম,' বলতে লাগলো সে, 'সেটা হলো পার্কসাইড হোটেল। যে হোটেলটায় তোমার সে রাতে থাকার কথা ছিলো।'

আবারো উপরে তাকালো মেয়েটা। এবার চোখ থেকে মণি ঠিকরে বেরিয়ে আসছে যেন।

'চলো, যাওয়া যাক,' বললো মাকোতো।

হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লো সে, চোখ মাকোতোর উপর থেকে সরলো না একদম।

রুমের সামনে আসতেই মাকোতো নিজের কাছে নিজে বলতে লাগলো যে যা হচ্ছে তা ঠিক হচ্ছে। *এর আগে যা হয়েছিলো সব ভুল ছিলো। আর আমি সবকিছু আবার ঠিক পথে নিয়ে আসছি।*

রুমের সামনে এসে দাঁড়ালো তারা, এরপর রুমের দরজায় চাবি ঢোকালো মাকোতো।

***

ক্লায়েন্টের নাম ইউকিহো তাকামিয়া। অপরূপ সুন্দরী সে, চাইলেই নায়িকা হতে পারতো। কিন্তু তার চেহারা আর দশটা ক্লায়েন্টের মতোই কালো হয়ে আছে।

'তো আপনার স্বামী আপনার কাছে ডিভোর্স চাচ্ছে, তাই তো?'

'জি।'

'কিন্তু কেন চাচ্ছে তা বলেনি সে, ঠিক? সে শুধু মনে করেছে আপনাদের ভেতরের অবস্থার আর কোনো উন্নতি হবে না?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার কোনো ধারণা আছে যে কেন সে এরকমটা করতে চাচ্ছে?'

ক্লায়েন্টটা কয়েক মুহূর্তের জন্য কিছু একটা ভাবলো মনে হলো। এরপর বললো, 'আমার মনে হয় আরেকটা মেয়ে জড়িত আছে এখানে। আ–আমি অন্য একজনকে দিয়ে খবরটা বের করিয়ে নিয়েছি।'

ব্যাগ থেকে কয়েকটা ছবি বের করলো সে। একজন পুরুষ আর নারীর বিভিন্ন জায়গায় যাওয়ার দৃশ্য দেখা যাচ্ছে ছবিগুলোতে। লোকটার চুলের কাট কোম্পানিতে চাকরি করলে যেমন দেওয়া হয় তেমন করে দেওয়া। পরনেও কোম্পানির ড্রেস। আর তরুণীর মাথার চুল বব কাট করা। দুজনকেই বেশ হাসিখুশি দেখাচ্ছে।

'আপনি কি আপনার স্বামীকে এই মেয়ের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছেন?'

'না, এখনো করিনি। মনে হলো আগে আপনার সাথে কথা বলে নেওয়া উচিত।'

'আচ্ছা, তো আপনি কি চাচ্ছেন ডিভোর্স নিতে?'

'জি। আমিও বুঝেছি যে আমাদের মধ্যে আর কিছু হবে না।'

'কিছু কি হয়েছে আপনাদের মধ্যে?'

'আমার মনে হয় যেদিন থেকে এই মেয়ের সাথে দেখা করা শুরু করেছে সে, সবকিছু সেদিন থেকেই শুরু হয়েছিলো। মাঝে মাঝে মারধোর করতো আমাকে, যদিও কেবল মদ পান করলেই তা করতো।'

'ইশ, বেশ বাজে তো বিষয়টা। আর কেউ জানে এ বিষয়ে? মানে সাক্ষীর কথা বলছি আমি। কেউ কি আছে যে এর পক্ষে সাক্ষ্য দিতে পারবে?'

'কাউকে বলিনি এ ব্যাপারে আমি। শুধু একবার [illegible] [illegible] সময় আমাদের এক কর্মী দেখেছিলো। ও রাতে থেকেছিলো বাড়িতে। আমার মনে হয় তার [illegible] কিছু মনে থাকবে।'

'ঠিক আছে।'

সবকিছু টুকে নিতে নিতে নারী উকিলটি ভাবলো যে এটার সমাধানের অনেকগুলো রাস্তা রয়েছে। আবারো একবার তাকালো ছবিগুলোর দিকে। সে জানে এরা কেমন ধরনের মানুষঃ দেখতে একদম নিখুঁত ভদ্রলোকের মতো, কিন্তু [illegible] উপর অমানুষিক অত্যাচার করে। তার সবচেয়ে অপছন্দের পুরুষ এরা।

'আসলে আ...আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না। আমার কেন যেন বিশ্বাস হচ্ছে না ও এমনটা করতে পারে। এর আগে বেশ সুন্দর ব্যবহার করতো সে আমার সঙ্গে।' আর তারপর ফর্সা হাতদুটো দিয়ে মুখ ঢেকে কান্না করতে শুরু করলো ইচকিয়ে

অধ্যায় দশ

গাড়ি রাখার জায়গায় এসে ভ্রুকুটি করে তাকালো ইমায়েদা। ডজনখানেক গাড়ি রাখার জায়গা আছে এখানে, অথচ সবগুলোতেই একটা না একটা গাড়ি রাখা। 'আমি আরো ভাবতাম শেয়ার মার্কেটে বুঝি বাজে অবস্থা চলছে,' নিজে নিজেই বিড়বিড় করলো সে।

একদম পেছনের দিকে খালি একটা জায়গা পেল ইমায়েদা। সেখানে তার হোন্ডা গাড়িটা রেখে গাড়ির ট্রাংক থেকে গলফের ব্যাগটা বের করলো। দুই বছর ধরে পড়ে থাকার কারণে ধুলোর আস্তর পড়ে আছে ওতে। তার এক সহকর্মীর উপদেশে গলফ ক্লাবে ঢুকেছিলো প্রথমে, এরপর কিছু দিনের জন্য ভালো লাগলেও ফ্রিল্যান্সে ঢোকার পর থেকে গলফের সরঞ্জামাদি ব্যাগেই থেকে যায়। এমন না যে খুব ব্যস্ত ছিলো সে। আসলে যাওয়ার মতো কোনো শক্ত কারণ খুঁজে পায়নি, তাই যায়নি। এছাড়া, গলফ জিনিসটা দলবেঁধে খেলার জিনিস—কোনো একলা মানুষের জন্য উপযুক্ত খেলা না।

ঈগল গলফ ড্রাইভিং রেঞ্জের মূল দরজা দিয়ে ঢুকতে নিলো সে। জায়গাটার সাজসজ্জা সব সময়ই তাকে দুই-তারকা হোটেলের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এসব ভাবতেই ভাবতেই কাঁধদুটো এলিয়ে দিয়ে ঢুকলো লবিতে। পুরো লবিতে গলফার দিয়ে ভরা, একেকজন একেক রকমের অবসাদ নিয়ে নিজেদের পালা আসার জন্য অপেক্ষা করছে। দশজন পর্যন্ত গুনতে সক্ষম হলো সে।

একবার ভাবলো এখন চলে গিয়ে পরে একদিন আসবে, তারপরেই বুঝলো এরকম ভিড় তাকে সপ্তাহের মাঝামাঝি ছাড়া সব সময়ই দেখতে হবে। যেটা সে করতে পারবে না। ভাগ্যে যা আছে তাই হবে ভেবে নিয়ে কাউন্টারে গিয়ে লিস্টে নিজের নামটা লিখিয়ে নিলো সে।

সোফাতে একটা ফাঁকা জায়গা পেয়ে নিশ্চিন্ত মনে টিভির সামনে বসলো। টিভিতে সুমো রেসলিং চলছে। গ্রীষ্মের সবচেয়ে বড় টুর্নামেন্ট। প্রথম দিকের খেলা, তাই কম শক্তিশালী পালোয়ানরা লড়াই করছে। আগে সুমো এরকম টিভিতে দেখানো হতো না। কিন্তু বেশ কিছু দিন হলো সুমো খেলাটা জনপ্রিয় হয়ে ওঠায় বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে দেখাচ্ছে এখন। পালোয়ানদেরকে সবার সামনে নিয়ে আসছে। আর এই খেলা সবার সামনে নিয়ে আসার জন্য যাদের বিশেষ কৃতিত্ব ছিলো তারা হলোঃ তাকাতোরিকি, উমিনোমাই আর ওয়াকাতাকা ব্রাদার্স। ওয়াকাতাকা ব্রাদার্সদের মধ্যে এক ভাই তাকাহানাডা এই কিছু দিন আগে তিন-তিনটা সানশো পুরস্কার পেয়ে ইতিহাসের সর্বকনিষ্ঠ পালোয়ান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। আর এটা অর্জন করেছে এই সর্বকনিষ্ঠ খেতাব ধরে রাখা ইওকোজুনা

শিওনোফুজিকে হারিয়ে। তাকাহানাডার আগে এই ইওকোজুনাই ইতিহাসের সর্বকনিষ্ঠ পালোয়ান হিসেবে সোনা জিতেছিলো। অবশ্য, আরো একজনের কাছে হেরেছে ইওকোজুনাই। নতুন আসা আরেক পালোয়ান তাকাতোরিকির কাছে হেরে তার ঠিক দুদিন বাদেই অবসর নিয়ে নেয় সে।

আসলেই সময়ের পরিবর্তন হচ্ছে, স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে মনে মনে ভাবলো ইমায়েদা। পুরো সপ্তাহ জুড়ে মিডিয়া প্রচার করে আসছিলো যে তরতর করে বাড়া দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাতে ধস নামতে শুরু করেছে। আর যারা যারা টাকা-পয়সা জড়ো করে শেয়ার বা জমি কিনেছিলো, তাদের অনেকেরই মাথায় হাত এখন। সবকিছু হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে দেখছে যেন তারা। ও নিজেও ভেবেছিলো এমন কিছু একটা হবে, তবে এত তাড়াতাড়ি হবে তা ভাবেনি। যেসব মানুষ ভ্যান গগের একটা সাধারণ মানের পেইন্টিং-এর জন্য পাঁচ বিলিয়ন ইয়েন খরচ করে, তাদের অবস্থা তো এমনই হওয়ারই কথা।

কিন্তু এই লবির আশেপাশে তাকিয়ে যেটুকু বোঝা যাচ্ছে তা হলো, এই তরুণীগুলো এখনো বাতাসের মতো টাকা উড়াচ্ছে। ঐতিহ্যগত দিক থেকে গলফ হলো পুরুষের খেলা, সেই সাথে সমাজের উচ্চস্তরের মানুষের বিনোদন। কিন্তু ইদানীং বেশ কিছু তরুণী চোখে পড়ছে এই গলফের সবুজ মাঠে। এমনকি আজকেও যারা তাদের পালা আসার জন্য অপেক্ষা করছে, তাদের অর্ধেকই নারী।

আর এজন্যই মূলত আবার গলফ ক্লাব ধরছি আমি, ভেবে শুষ্ক একটা হাসি দিলো সে। চার দিন আগে তার স্কুলের এক বন্ধু ফোন দিয়েছিলো তাকে। তার সেই বন্ধুটি দুটো মেয়ের সাথে গলফ খেলছে নিয়মিত। ইমায়েদাও খেলতে চায় কি না তা জিজ্ঞেস করে তার বন্ধু। হয়তো তাদের পরিকল্পনায় থাকা চতুর্থ ব্যক্তি কোনো কারণে সরে গেছে, ফলে তার বন্ধু জনের হিসাবটা ঠিকঠাক রাখতে আশেপাশে মানুষ খুঁজতে শুরু করেছে।

ইমায়েদার সেই ইনভাইটেশন গ্রহণ করতে কোনো সমস্যা ছিলো না। তার ব্যায়ামেরও দরকার ছিলো, আর তার উপর মেয়েদের সাথে দেখা করার সুযোগ কখনোই সে হাতছাড়া করে না। কিন্তু মূল সমস্যাটা হলো, গত কয়েক বছরে একবারের জন্যও সে গলফ ক্লাব ধরেনি। আজকের এই লবিতে আসার এটাই অন্যতম কারণ; শেখা কৌশলগুলো আরেকবার পরখ করে নেওয়া। সেই মেয়েদের সাথে তার গলফ ডেট আরো সপ্তাহ দুয়েক বাদে। আর সেজন্যই সে চাচ্ছে এখন একটু প্র্যাকটিস করে নিতে যাতে সে মূল খেলায় অন্তত কিছু পয়েন্ট হাতাতে পারে এবং লজ্জার হাত থেকে বাঁচতে পারে।

আধা ঘণ্টা সময় লাগলো তার নাম ডাকতে। লবিতে থাকা অন্যান্য মানুষের তুলনায় বেশ তাড়াতাড়িই হয়ে গেছে বলতে গেলে, ভাবলো সে। কাউন্টারে থাকা মেয়েটা তার হাতে কিছু কয়েন ধরিয়ে দিলো, যেগুলো দিয়ে বল মেশিন থেকে বল

বের করা যাবে। আর একটা কার্ড দিলো যেটাতে কোন স্টলে তাকে যেতে হবে তার নাম্বার রয়েছে। রেঞ্জ থেকে বেরিয়ে গেল সে।

প্রথম তলার একদম শেষ দিকে স্টলটা খুঁজে পেল সে। স্টলের পাশে থাকা মেশিনের ভেতর একটা কয়েন ঢোকাতেই দুটো ঝুড়িভরতি বল পেল সে। যা তার প্র্যাকটিস করার জন্য যথেষ্ট।

স্টলে ঢোকার আগে একটু হাত-পা ঝাঁকিয়ে নিলো ইমায়েদা। সিদ্ধান্ত নিলো প্রথমেই সাত নাম্বার আয়রন ক্লাবটা[১৭] হাতে নেবে। এখনো পর্যন্ত তার সবচেয়ে পছন্দের ক্লাব ওটা। প্রথমেই লম্বা শট নেবে না অবশ্যই, একদম মাপা কিছু শট নেবে। এই ভেবে ঢুকলো স্টলের ভেতর।

যদিও হারিয়ে যাওয়া সেই অভিজ্ঞতা ফিরে পেতে একটু সময় নিলো, কিন্তু সে অনুভব করলো যে ধীরে ধীরে তার মাংসপেশিতে আবার ফিরে আসছে পুরোনো দক্ষতা। বিশ রাউন্ডের পর ও শরীর ছেড়ে দিয়ে লম্বা শট নেওয়া শুরু করলো। তার শরীর বেশ সহজ হয়ে গেছে এতক্ষণে, আর বলগুলোকেও বেশ সুন্দর সুন্দর জায়গায় পড়তে দেখলো সে। সম্ভবত ১৬০ ইয়ার্ডস নয়তো ১৫০ ইয়ার্ডস হবে। এরমধ্যেই নিজের উপর আস্থা চলে এসেছে তার। লম্বা ছুটি নেওয়াতে তেমন একটা প্রভাব ফেলেনি যতটা সে ভয় পেয়েছিলো। যা কিছু সে শিখেছিলো, তার সবই ধীরে ধীরে মাথার মধ্যে ফিরে আসছে।

পাঁচ নাম্বার আয়রন ক্লাব দিয়ে কয়েকটা শট নেওয়ার পরেই তার খেয়াল হলো, কারো চোখ পড়ে আছে তার উপর। পাশের স্টলে থাকা এক লোক চেয়ারে বিশ্রাম নিতে নিতে তার শটগুলো দেখছে। ইমায়েদা কিছু মনে করলো না অবশ্য, কিন্তু কেন যেন এতে ফোকাস হারিয়ে যাচ্ছে বারবার।

ক্লাবের গ্রিপটা ভালো করে ধরার সময় একবার তাকালো লোকটার দিকে। অল্পবয়সি একজন লোক, সম্ভবত ত্রিশও পার হয়নি এখনো। আর কেন যেন বেশ চেনা চেনা লাগছে লোকটাকে। আরেকবার তাকালো ইমায়েদা। এবার সে নিশ্চিত, লোকটাকে এর আগে কোথাও দেখেছে সে, কিন্তু কোথায় তা মনে করতে পারছে না। সেই লোকটার তাকানোর ভঙ্গিতে বলা যায়, লোকটা ইমায়েদাকে চেনেনি।

এবার তিন নাম্বার ক্লাবটা দিয়ে প্র্যাকটিস করতে শুরু করলো সে। এর কিছুক্ষণ বাদেই বসা থেকে উঠে নিজ স্টলে গিয়ে বলে আঘাত করতে লাগলো লোকটা। বেশ ভালো খেলছে সে। আর ফর্মও দারুণ। প্রত্যেকটা আঘাতেই দুইশো ইয়ার্ডের বাইরে পাঠিয়ে দিচ্ছে বলগুলোকে।

লোকটা যখন একটু ডানে তাকালো, তখনই তার ঘাড়ের পাশে দুটো তিল দেখতে পেল সে। আর তখনই স্মৃতি ফিরে এলো তার মগজে।

মাকোতো তাকামিয়া, তোজাই অটোমোটিভ কোম্পানি।

হঠাৎই সবকিছু যেন খাপে খাপে মিলে গেল। এই মানুষটাকে এখানে দেখাটা কাকতালীয় কোনো বিষয় না। আর এই প্র্যাকটিস রেঞ্জের সম্পর্কে ও শুনেছেই তার তিন বছর আগে করা একটা চাকরির কারণে। আর ওখানেই প্রথম মাকোতো সম্পর্কে জেনেছিলো সে।

এই লোক আমাকে চেনার কথাও না।

ইমায়েদা ভাবতে লাগলো এই মধ্যবর্তী বছরগুলোতে মাকোতো কী করেছে তা নিয়ে। আর, এখনো সেই মেয়েটার সাথে সম্পর্ক আছে কি না কে জানে।

তার তিন নাম্বার ক্লাবটা বেশ ঝামেলা সৃষ্টি করলে একটু ব্রেক নেওয়ার কথা ভাবলো সে। ভেন্ডিং মেশিন থেকে কোমল পানীয় নিয়ে এসে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলো। মাকোতোর খেলা দেখছে আপাতত। পিচ শটে খেলছে সে, পঞ্চাশ ইয়ার্ডের মতো দূরত্বে বল ফেলার লক্ষ্যে আঘাত করছে। ক্লাব অর্ধেকটা তুলে বলে আঘাত করতেই মুহূর্তের মধ্যে উড়ে গেল বলটা। উড়ে গিয়ে একদম পঞ্চাশ ইয়ার্ডের পতাকার সামনে পড়লো। শটটা দারুণ ছিলো।

ঘুরে দাঁড়ালো মাকোতো, হয়তো টের পেয়েছে তাকে কেউ দেখছে। ইমায়েদা অন্য দিকে তাকিয়ে এক চুমুক পানীয় পান করলো, এরপরই দেখলো ডেকে থাকা ছায়াটা নড়ছে, অর্থাৎ মাকোতো এগিয়ে আসছে তার দিকে।

'ব্রাউনিং না ওগুলো?'

উপরে তাকালো ইমায়েদা। 'হাঁহ?'

'আপনার ক্লাবগুলো। ওগুলো ব্রাউনিংয়ের, তাই না?' গলফ ব্যাগটার দিকে ইশারা করে বললো মাকোতো।

'ওহ।' লোহার ক্লাবগুলোর উপরে খোদাই করা নামটার দিকে তাকালো ইমায়েদা। 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওগুলো ব্রাউনিংয়েরই। ভুলে গেছিলাম আমি।'

একপ্রকার তাড়না থেকেই কিনেছিলো সে ওগুলো। দোকানের মালিক বেশ করে বলেছিলো যে চমৎকার ক্লাব এগুলো, চিকন-চাকন শরীরের যে-কারো জন্য একদম নিখুঁত। ইমায়েদা অবশ্য ততটা কান দেয়নি ওতে। তখন কিনে ফেলেছিলো, কিন্তু এখন মনে পড়লো যে আসলে সেদিন এই ব্রাউনিং নামটা দেখে ভালো লেগে গেছিলো বলেই কিনেছিলো সে। পিস্তলের প্রতি তার এককালের সেই ঘোরের কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলো নামটা।

'কিছু মনে না করলে একটু দেখতে পারি?' জিজ্ঞেস করলো মাকোতো।

'না, না, দেখুন, সমস্যা নেই।'

পাঁচ নাম্বার আয়রনটা বের করে নিলো মাকোতো। 'বাহ,' বলে উঠলো সে 'আমার এক বন্ধুর হঠাৎ বেশ উন্নতি হয়েছে খেলার। সে-ও ব্রাউনিং ব্যবহার করে।'

'আপনার মনে হয় এতে ক্লাবের কোনো ভূমিকা আছে?'

'উম, কোনো কালেই তাকে সোজা মারতে দেখিনি আমি। আর ক্লাব পরিবর্তন করার পর থেকে একদম সোজা শট মারছে, তার মানে হয়তো ক্লাবের ভূমিকা থাকলেও থাকতে পারে। আমিও চিন্তা করছিলাম যে কোন ক্লাবটা আমার জন্য ভালো তা একটু খতিয়ে দেখবো।'

'আমি বলবো আপনি এমনিতেও দারুণ খেলছেন। মানে একটু আগের শটগুলো দেখে বলছি।'

'হয়তো এখানে ভালো করছি, কিন্তু মূল মাঠে না,' ক্লাবটা হালকা ঘুরিয়ে বললো মাকোতো। 'হুমম, গ্রিপটা আমারটার থেকে কিছুটা চিকন।'

'কয়েকটা বল মেরে দেখুন না?'

'কিছু মনে করবেন না আপনি?'

'আরে নাহ! যান, মারুন।'

গলফ ক্লাবটা নিয়ে নিজের স্টলে গিয়ে কয়েকটা বলে আঘাত করলো মাকোতো। একেকটা বল উড়ে উড়ে গিয়ে পড়লো একেক জায়গায়। একদম নিখুঁত ঘূর্ণি ছিলো সবগুলো বলেই।

'দারুণ খেলছেন। সবগুলো শটই চমৎকার ছিলো,' বললো ইমায়েদা। শুধু ভদ্রতার খাতিরে বলছে না সে।

'ক্লাবটা ধরতে ভালোই লাগছে,' বললো মাকোতো।

'যত ইচ্ছা খেলুন, সমস্যা নেই। এমনিতেও আমারগুলো দিয়ে প্র্যাকটিস করতে হতো।'

'সত্যি? অনেক ধন্যবাদ।'

মাকোতো ফের ক্লাব ঘোরানো শুরু করে দিলো স্টলে গিয়ে। খুব কমই লক্ষ্য মিস করছে সে। এটা তার হাতে থাকা ক্লাবের কোনো কারিশমা না, আসলে তার ফর্মটাই খাসা। এটা যে এক বছর ধরে প্র্যাকটিস করার ফল তা দেখলেই বোঝা যায়। সেই মেয়েটাও তার সাথে প্র্যাকটিস করতে আসতো। মনে করার চেষ্টা করলো ইমায়েদা। নাম মনে পড়তে কিছুটা সময় লাগলো তার: শিজুরু মিসাওয়া।

তিন বছর আগে টোকিও জেনারেল রিসার্চে কাজ করতো ইমায়েদা। প্রায় সতেরোটা অফিস নিয়ে গঠিত ছিলো এই প্রাইভেট ইনভেস্টিগেশন কোম্পানি। টোকিওর দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের মেগুরো অফিসে কাজ করতো ইমায়েদা।

যদিও পারিবারিক দ্বন্দ্বের কেসের সংখ্যা ভালোই ছিলো তাদের কাছে, তবে টোকিও জেনারেল রিসার্চে কর্পোরেট ক্লায়েন্টদের কেসের সংখ্যা ছিলো অস্বাভাবিক মাত্রায় বেশি। প্রায় কেসেই ওদেরকে অনুসন্ধান চালিয়ে দেখতে হতো যে বিভিন্ন কোম্পানির ব্যবস্থাপনায় কী চলছে, বা কোনো সম্ভাব্য বাণিজ্য কোম্পানি কত মুনাফা হাতিয়ে নিচ্ছে, অথবা কোনো নির্দিষ্ট কর্মী কি বাইরের কোনো কোম্পানির দালালের সাথে লুকিয়ে দেখাসাক্ষাৎ করছে কি না ইত্যাদি।

একবার তো ওদেরকে একটা নির্দিষ্ট কোম্পানির সিইও কার সাথে বিছানায় যাচ্ছে তা বের করতে বলা হয়। যখন বের করে দেয়, তখন দেখা যায় বোর্ডের চারটা মেয়ের সাথেই তার ঘনিষ্ঠতা রয়েছে।

এরকম হাজারো ভিন্ন ভিন্ন কেস থাকা সত্ত্বেও তোজাই অটোমোটিভ কোম্পানির একটা লোক ভিন্ন এক আবদার নিয়ে আসে তাদের কাছেঃ সে চায় আরেক কোম্পানির একটা প্রোডাক্ট সম্পর্কে তদন্ত করতে। কোম্পানির নাম মেমোরিক্স। আর ওদের যে প্রডাক্ট নিয়ে তদন্ত করাতে চাইছিলো তার নাম মেটালার্জি এক্সপার্ট সিস্টেম–ধাতুবিজ্ঞান নিয়ে বানানো একটা সফটওয়্যার। যেটা সেই বছরের আগের বছর মেমোরিক্স কোম্পানি বাজারে এনেছিলো।

লোকটা চেয়েছিলো ইমায়েদার টিম যেন এই সফটওয়্যার তৈরির ইতিহাস, এর সাথে যুক্ত থাকা প্রত্যেক প্রোগ্রামারের ব্যক্তিগত ইতিহাস আর সোশ্যাল সার্কেলে থাকা প্রত্যেকটা লোকের ইতিহাস খতিয়ে দেখে। ক্লায়েন্টটা অবশ্য এটা বলেনি যে কেন তার এত তথ্য লাগবে, কিন্তু তারা অস্পষ্ট কিছু ধারণা পেয়ে গেছিলো অবশ্য। অর্থাৎ, পরিষ্কার করে বলতে গেলে তারা সন্দেহ করছে ঐ মেমোরিক্স কোম্পানির সফটওয়্যার তোজাই অটোমোটিভ কোম্পানির কোনো সফটওয়্যার থেকে কোড চুরি করে নিয়ে বানানো হয়েছে। আর এটা প্রমাণ করার জন্য তাদের প্রামাণ্য দলিল লাগবে। তোজাইতে থাকা কোনো ব্যক্তির সাথে যদি ঐ মেমোরিক্স কোম্পানির সফটওয়্যারের কোনো সংযোগ পায়, তবেই কেল্লাফতে। আর এটাই চাচ্ছিলো তারা।

টোকিও জেনারেল রিসার্চের মেগুরো অফিসে বিশজনের মতো লোক ছিলো। ইমায়েদা সহ দশজনের মতো কর্মী ঐ কাজটায় নেমে পড়ে।

দুই সপ্তাহের মতো তদন্ত শেষে মেমোরিক্স সম্পর্কে যা জানার তার প্রায় সবকিছুই জেনে যায় তারা। ১৯৮৪ সালে কোম্পানিটা গঠন করা হয়েছে, আর এর মূল প্রোগ্রামার হিসেবে ছিলো কোম্পানির সিইও টোরু আনজাই। অস্থায়ী কর্মীসহ সব মিলিয়ে বারোজন সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ার নিয়োজিত ছিলো কোম্পানির বিভিন্ন উৎপাদনে ডেভেলপ করার জন্য।

অনেকগুলো প্রশ্ন উঠেছিলো সে সময় এই মেটালার্জি এক্সপার্ট সিস্টেমটা নিয়ে। তার মধ্যে অন্যতম ছিলো এটা যে ধাতুবিদ্যা সম্পর্কে এত সব তথ্য এবং কীভাবে ধাতুবিদ্যা কাজ করে তা কোথা থেকে সংগ্রহ করেছে মেমোরিক্স। স্বপক্ষে যে গল্পটা তারা বলেছিলো তা হলো, মধ্যম পর্যায়ের কিছু উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান থেকে কয়েকজন এসিস্ট্যান্ট তাদের সাহায্য করেছিলো প্রোগ্রামটা ডেভেলপ করতে। কিন্তু ইমায়েদার টিম যখন এ বিষয়ে তদন্ত করে, তখন তারা দেখে যে মেমোরিক্সের কাজ শেষ হওয়ার পরে তারা এসিস্ট্যান্ট এনেছিলো। সফটওয়্যার বানানোর পরে সেই এসিস্ট্যান্টদেরকে দিয়ে চেক করিয়েছিলো শুধু।

তবে এক্ষেত্রে সবচেয়ে সহজ ব্যাখ্যাটা হলো, আগের ক্লায়েন্টদেরকে যেসব কাজ তারা করে দিয়েছিলো, সেখান থেকেই এসব তথ্য নিয়েছে। মেমোরিক্স এর আগে বহু ক্লায়েন্টের সাথে কাজ করেছিলো, যার কারণে ওদের তথ্যে বিচরণ করার সুযোগ পেয়েছিলো তারা।

তারপরেও এই ব্যাখ্যা নিয়ে সমস্যার সৃষ্টি হয়। যখনই অন্য কোনো কোম্পানির সাথে কাজ করতো মেমোরিক্স, সেই কোম্পানিগুলো ওদের সাথে বিস্তারিতভাবে লিখিত কিছু চুক্তি করতো। ঐসব চুক্তিতে লেখা থাকতো যে তথ্যগুলো নিয়ে ঠিক কীভাবে কাজ করতে হবে। সেই সাথে যদি কোম্পানির কোনো কর্মী বাইরের কারো কাছে তথ্য পাচার করে, তবে তার শাস্তির কথাও লেখা থাকতো।

তোজাই অটোমোটিভ আর মেমোরিক্স কোম্পানির মাঝে না ছিলো কোনো সংযোগ, না ছিলো কোনো চুক্তি। যদি তোজাই কোম্পানি থেকে সফটওয়্যার চুরি করেও থাকে মেমোরিক্স, তাহলে তা কারো জানার কথা না। চোরকে ধরা সাধ্যের বাইরে ছিলো, তার উপর সফটওয়্যারটা কেবল তোজাই কোম্পানির ভেতরেই চালানো হতো, তাই আরো বেশি কষ্টসাধ্য ছিলো সেটা। কোনোভাবে যদি এটা প্রমাণও করা যেত যে আগের সফটওয়্যারের সাথে এর মিল রয়েছে, তাহলে মেমোরিক্স কাকতালীয় ঘটনা বলে চালিয়ে দিতো।

সেই তদন্ত চলাকালীন একজন লোক তাদের নজরে আসে: মেমোরিক্স কোম্পানির প্রধান প্রোগ্রামার ইউইচি আকিওশি। যে কিনা এই কোম্পানিতে ১৯৮৬ সালে জয়েন করেছে। তার জয়েন করার কিছু দিন বাদেই ঐ ধাতুবিজ্ঞান এক্সপার্ট সিস্টেমের প্রোগ্রাম তৈরি করা শুরু হয়, আর সেই বছরেই সম্পূর্ণ হয়ে যায় কাজ। এত দ্রুত হয়ে যাওয়ায় বিষয়টা অসঙ্গতিপূর্ণ ঠেকে। এরকম একটা সফটওয়্যারের জন্য কমপক্ষে তিন বছর লেগে থাকতে হয়। ইমায়েদার টিম এবার আরেকটা থিওরি দাঁড় করায়: এই প্রোগ্রামের সকল তথ্য আসে আকিওশির কাছ থেকে, মানে তার কোম্পানিতে জয়েন করার পর থেকেই।

সমস্যাটা হলো, লোকটার সম্পর্কে খুব অল্পই জানতো তারা।

আকিওশি টোকিওর উত্তর-পশ্চিমে একটা অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নিয়ে থাকলেও সেখানে স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে রেজিস্টার্ড ছিলো না। ইমায়েদার টিম সেই অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া দেওয়া কোম্পানির কাছে গিয়ে জানতে পারে যে টোকিওতে আসার আগে নাগোয়াতে ছিলো সে। নাগোয়ার সেই ঠিকানা নিয়ে নেয় তারা।

একজন তদন্ত কর্মকর্তা নাগোয়াতে চলে যায় খবর নেওয়ার জন্যে। গিয়ে লম্বা, সরু একটা বিল্ডিংয়ের খোঁজ পায়। স্থানীয় কেউই বলতে পারেনি যে আকিওশি নামে সেখানে কেউ থাকতো কি না। সিটি হলেও কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। ইউইচি আকিওশি নামের কারো নামে সেখানে কোনো ভুক্তিই নেই। আর নিজের

জামিনদার হিসেবে নাগোয়ার যে অধিবাসীর নাম-ঠিকানা দিয়ে আকিওশি বর্তমান অ্যাপার্টমেন্টটা নিয়েছিলো, ওখানে গিয়েও কাউকে পাওয়া যায়নি। পরিষ্কার বোঝা গেছিলো সেখানে নকল পরিচয় দিয়ে থাকতো সে। অন্য কোনো নাম ব্যবহার করে ওখানে থাকতো লোকটা।

তার আসল পরিচয় খুঁজে পাওয়ার জন্য ইমায়েদার টিম এবার অন্য পথ অবলম্বন করতে বাধ্য হয়: গোপনে নজরদারি শুরু করে তার উপর।

প্রথমে আকিওশির বর্তমান যে অ্যাপার্টমেন্ট রয়েছে সেখানে বাগ লাগায় তারা: একটা বসার ঘরে, আরেকটা তার ফোনে। মেইলবক্সে যেসব মেইল আসতো সেগুলোর সব খুলে দেখতো, শুধু রেজিস্টার্ড মেইল আর প্যাকেজগুলো বাদ দিয়ে। অনুসন্ধানের জন্য এ থেকে তেমন কোনো তথ্য হয়তো তারা পেত না, কিন্তু আকিওশি সম্পর্কে ধারণা ঠিকই পেত।

প্রথম দিকে তারা লক্ষ করে আকিওশি বিশেষত্বহীন জীবনযাপন করছে—অফিস থেকে বাড়ি আবার বাড়ি থেকে অফিস। কেউই তার সাথে দেখা করতে আসে না, আর ফোনেও তেমন কারো সাথে কথা বলে না। বস্তুত খুব কমই ফোন রিসিভ করতো সে।

'এই লোকের জীবনে আনন্দ কই? বন্ধুবান্ধব নেই নাকি?' ইমায়েদার এক পার্টনার ভ্যানের মনিটরে তাকিয়ে থাকার সময় বলে ওঠে। ভ্যানটাকে ক্লিনারদের ডেলিভারি ট্রাকে রূপান্তর করা হয়েছিলো যাতে ছদ্মবেশে থাকা যায়। ট্রাকের উপরে একটা ক্যামেরা আকিওশির জানালা বরাবর ফিট করে রাখা ছিলো।

'হয়তো কারো কাছ থেকে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে সে,' বলে ইমায়েদা। 'এর জন্যই খুব কম মানুষের সাথে যোগাযোগ রাখছে সে।'

'পালিয়ে বেড়ানো খুনি নাকি?' হেসে ফেললো তার পার্টনার।

'তাহলে তো ভালোই হতো,' ফিরতি হাসি দিয়েছিলো ইমায়েদা।

তাদের বুঝতে কিছুটা দেরি হলেও ধরতে পারে যে একজন রয়েছে যার সাথে নির্দিষ্ট কিছু সময়ে কথা বলে আকিওশি। ভ্যানে বসে তাকে মনিটরিং করার সময় ইলেকট্রনিক কিছু তরঙ্গের শব্দ শুনতে পায় তারা—একটা পেজার[১৮] বাজার শব্দ। ইমায়েদা নড়েচড়ে বসে ফিড শোনার চেষ্টা করে, ভাবে হয়তো আকিওশি কাউকে ফোন করবে।

তা না করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ে আকিওশি। ইমায়েদার পার্টনার দ্রুত গাড়ি স্টার্ট দিয়ে পেছন পেছন যেতে থাকে তার। কিছু সময় পরে একটা বারের পেছনে পাবলিক লাইন থেকে ফোন করে সে। ফোনে কথা বলার সময় তার মুখভঙ্গি একদম ভাবলেশহীন ছিলো, যদিও আশেপাশে খেয়াল রাখছিলো যাতে কেউ শুনে না ফেলে।

এই একই ঘটনা পরপর কয়েক দিন ঘটতে থাকে। পেজার বাজার পরপরই আকিওশি অ্যাপার্টমেন্টের বাইরে বেরিয়ে যায় একটা ফোন করতে। প্রথমে তাদের ধারণা হয়েছিলো যে হয়তো আকিওশি বুঝে গেছে তার ফোনে কেউ আড়ি পাতছে, কিন্তু তা হলে তো সেই ট্যাপটা সে নিজেই সরিয়ে নিতে পারতো। পরবর্তীতে তারা বুঝতে পারে আসলে পাবলিক ফোন দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোনো ফোন করা আকিওশির একটা অভ্যাস। একই ফোন যে বারবার ব্যবহার করতো এমন না। একবার বা দুইবার একটা বুথে গেলে পরের বার অন্য বুথে চলে যেত। এই ব্যাপারটা একদম পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মেনে চলতো সে।

সবচেয়ে বড় প্রশ্ন যেটা ছিলো তা হলোঃ আকিওশির পেজারে কে ফোন করতো?

ঐ রহস্যের উন্মোচন হওয়ার আগেই হঠাৎ তদন্ত আরেক দিকে মোড় নেয়।

এক বৃহস্পতিবার আকিওশি শিনজুকু যাওয়ার ট্রেনে চেপে বসে। অস্বাভাবিক একটা কাজ; কারণ তার উপর নজর রাখার পর এই প্রথম কোথাও যাচ্ছে সে। স্টেশনের পশ্চিম দিকের গেটের কাছে থাকা একটা ক্যাফেতে বসে আকিওশি। সেখানে একটা লোকের সাথে দেখা হয় তার। লোকটা বেশ চিকন এবং বেঁটে, বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। মুখটা দেখে তার মনে কী চলছে তা বোঝার কোনো উপায় ছিলো না। মনে হচ্ছিলো যেন কোনো *নোহ* মাস্ক[১৯] পরে আছে সে।

বেশ বড় একটা খাম রিসিভ করে আকিওশি। তারপর ছোট একটা খাম এগিয়ে দেয়। লোকটা সেটাকে ছিঁড়ে ফেলে কয়েকটা নোট বের করে গুনতে থাকে। এরপর পকেটে ভরে ফেলে সেগুলো। পকেটে ভরার আগে অবশ্য একটা স্লিপ এগিয়ে দিয়েছিলো আকিওশির কাছে।

হয়তো একটা রিসিপ্ট, ভাবে ইমায়েদা।

আরো কয়েক মিনিটের জন্য কথা বলে আকিওশি আর সেই লোক, দুজনেই উঠে দাঁড়ায়। সাথে ইমায়েদা আর তার পার্টনারও উঠে পড়ে। ইমায়েদা ছোটে আকিওশির পেছনে, আর তার পার্টনার ছোটে সেই লোকটার পেছনে। ইমায়েদাকে পুরোপুরি হতাশ করে দিয়ে সেদিন সোজা বাড়িতে গিয়ে ঢোকে আকিওশি।

ওদিকে তার পার্টনার জানতে পারে যে সেই লোকটা ছোটখাটো একটা প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সি চালায়। আর এই *ছোটখাটো* মানে হচ্ছে দুজন সদস্যের একটা এজেন্সি–সে এবং তার স্ত্রী।

যেটা প্রমাণ করে যে ইমায়েদার ঠিকঠাকই অনুমান করেছিলো। লোকটার মধ্যে একটা অন্য রকম বিষয় ছিলো, যার জন্য ইমায়েদার মনে হয়েছিলো তাদের জগতেরই মানুষ এ লোক।

ইমায়েদা জানতে চাচ্ছিলো যে আকিওশির একটা প্রাইভেট গোয়েন্দার কাছে যাওয়ার প্রয়োজন পড়লো কেন। যদি ঐ এজেন্সির সাথে টোকিও জেনারেল রিসার্চের

কোনো সংযোগ থেকে থাকে, তবে কিছু প্রশ্নের উত্তর পেলেই ইমায়েদা যা জানতে চাচ্ছে তা পরিষ্কার হয়ে যাবে। কিন্তু খবর নিয়ে জানা যায়, যে লোকটাকে আকিওশি নিয়োগ দিয়েছিলো, সে স্বাধীনভাবে নিজের কাজ করে থাকে। লোকটার সাথে অবশ্য কোনো রকমের কথা বলতে পারেনি তারা। কারণ লোকটা যদি একবার তাদের তদন্তের বিষয়ে আঁচ করে ফেলে, তবে সব শেষ হয়ে যাবে।

আকিওশির উপরে নজরদারি চালিয়ে রাখে তারা। আর পরের শনিবার আকিওশি তার পরের পদক্ষেপ নেয়।

ইমায়েদা আর তার পার্টনার যখন গাড়িতে বসে অ্যাপার্টমেন্টের দিকে নজর রাখছিলো, তখনই বের হয় আকিওশি। একটা জিন্স আর ঢোলাঢালা জামা পরেছিলো সে। তার কাঁধটা এত কুজো করে রাখা ছিলো যে ইমায়েদার মনে সন্দেহ হয় এটা কোনো সাধারণ ট্রিপ না।

কয়েকটা ট্রেন অদল-বদল করে শেষে শিমোকিতাজাওয়াতে নামে আকিওশি। টোকিওর এক ব্যস্ততম এলাকা ওটা। আশেপাশে বেশ সন্তর্পণে দেখে নেয় সে। কারো চোখ তার উপর আছে কি না তা পরখ করে নিলেও তাকে দেখে মনে হয়নি সে ধরতে পেরেছে যে তাকে নজরদারিতে রেখেছে কেউ। হাতে একটা নোটবুক ছিলো তার, ওটাতে চোখ বুলিয়ে নিয়ে স্টেশনের পাশের রাস্তাটা ধরে সে। *নিশ্চয়ই কারো বাসা খুঁজছে সে*, ভাবে ইমায়েদা।

শেষমেশ রাস্তার পাশে একটা তিনতলা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায় সে। দেখে মনে হচ্ছিলো খুব ছোট একটা অ্যাপার্টমেন্ট ওটা, সম্ভবত প্রত্যেক তলায় কেবল একজন বাসিন্দা থাকার মতো করেই বানানো হয়েছিলো। কিন্তু আকিওশি ভেতরে ঢোকেনি। তার পরিবর্তে রাস্তার পাশের একটা ক্যাফেতে ঢুকে পড়ে সে। কয়েক মুহূর্ত দ্বিধার মধ্যে থেকে ইমায়েদা তার পার্টনারকে ক্যাফের ভেতরে যেতে বলে, আর নিজে চলে যায় পাশের একটা বইয়ের দোকানে। ও ভাবছে যে হয়তো আকিওশি ঐ ক্যাফেতে কারো সাথে দেখা করতে গেছে।

প্রায় এক ঘণ্টা বাদে তার পার্টনার ক্যাফে থেকে একাই বেরিয়ে আসে।

'কারো সাথে দেখা করছে না সে,' তার পার্টনার জানায়। 'মনে হচ্ছে সে নিজেও নজরদারি করছে। ঐ বিল্ডিংয়ের ভেতর থেকে কারো আসার জন্য অপেক্ষা করছে সে।' রাস্তার পাশের সেই বিল্ডিংটার দিকে ইশারা করে বলে তার পার্টনার।

ইমায়েদার তখন মনে হচ্ছিলো, সেই প্রাইভেট গোয়েন্দাটা হয়তো আকিওশির জন্য বের করেছে যে কে থাকে সেই বিল্ডিংয়ে।

'তার মানে আমরাও এখন এই নজরদারিতে শামিল হলাম,' বলে ইমায়েদা। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ও তার পেফোনটা হাতে নেয় যাতে অফিসের কাউকে দিয়ে একটা গাড়ি আনিয়ে নিতে পারে।

গাড়ি আসার আগেই আকিওশি ক্যাফে থেকে বেরিয়ে পড়ে। বিল্ডিংয়ের দিকে তাকিয়ে ইমায়েদা দেখে যে এক তরুণী বাড়ি থেকে বের হয়েছে। দেখে মনে হচ্ছিলো স্টেশনের দিকে যাচ্ছে সে। ব্যাগভরতি গলফ ক্লাব তার হাতে। কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে মেয়েটাকে অনুসরণ করতে থাকে আকিওশি। ইমায়েদা আর তার পার্টনারও পেছন পেছন ছোটে।

মেয়েটা যাচ্ছিলো ঈগল গলফ ড্রাইভিং রেঞ্জের দিকেই। আকিওশি তাকে অনুসরণ করতে করতে ভেতরে ঢুকে পড়ে। ইমায়েদা আর তার পার্টনারও কালক্ষেপণ না করে ঢুকে পড়ে ওটার ভেতর। প্র্যাকটিস শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত আকিওশি মেয়েটার থেকে নজর সরায় না, এরপর প্র্যাকটিস শুরু হওয়ার পরে ডেস্ক থেকে ছোট বইয়ের মতো একটা পুস্তিকা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। সেদিন আর প্র্যাকটিস রেঞ্জে ফেরেনি সে। সেই মেয়েটার পরিচয় খুঁজে পেতে বেশ কিছুটা সময় লাগে তাদের। তার নাম ছিলো শিজুরু মিসাওয়া, অসংখ্য কর্মীবিশিষ্ট একটা এজেন্সির অস্থায়ী কর্মী হিসেবে কাজ করতো সে। তার কাজের ইতিহাস ঘাঁটতেই তারা দেখে যে এর আগে তোজাই অটোমোটিভ কোম্পানিতেও সে কাজ করেছিলো। অবশেষে তারা একটা সংযোগ খুঁজে পায়।

ওরা আবার নতুন করে নজরদারি করা শুরু করে আকিওশির উপরে। এই আশা নিয়ে যে কোনো না কোনো এক সময়ে মিস মিসাওয়ার সাথে সে কথা বলবে। কিন্তু তদন্ত ফের আরেকটা অপ্রত্যাশিত মোড় নিয়ে নেয় সে সময়।

বেশ কিছু দিন আকিওশি উল্লেখ করার মতো তেমন কিছুই করেনি। কিন্তু এক শনিবার হঠাৎ আবার সেই রেঞ্জে চলে যায় সে। শিজুরু কখন প্র্যাকটিস শুরু করবে তা জেনে নিয়েই গেছিলো সে। যাই হোক, আকিওশির ভেতর তার সাথে কথা বলার কোনো ইচ্ছাই দেখা যায়নি। নিরিবিলি বসে বই পড়ে এবং দেখতে থাকে সে।

আর সেই সময়েই একটা লোক এসে শিজুরুর পাশে বসে তার সাথে কথা বলতে থাকে। যেভাবে তারা বসেছিলো তাতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিলো সেই দুজন প্রেম করছে।

আর সম্ভবত এটাই দেখতে এসেছিলো আকিওশি। কারণ তাদের দুজনকে দেখামাত্রই আকিওশি রেঞ্জ ছেড়ে চলে যায়।

সেটাই ছিলো আকিওশির শিজুরুকে অনুসরণ করার শেষ দিন। এরপর নজরদারি চালানোর পুরো সময়টাতে আর কখনো আকিওশিকে ঈগল গলফ ড্রাইভিং রেঞ্জে আসতে দেখেনি তারা।

সেদিন শিজুরুর সাথে যে লোকটা ছিলো তার বিষয়ে খোঁজ নিতে নামে ইমায়েদার টিম। জানতে পারে তার নাম মাকোতো তাকামিয়া, তোজাই অটোমোটিভ পেটেন্ট লাইসেন্সিং ডিপার্টমেন্টের একজন কর্মী।

একদম সোনার হরিণ ধরে ফেলেছে ভেবে নিয়ে তারা শিজুরু আর তাকামিয়ার সম্পর্কের সাথে আকিওশির কোনো সংযোগ রয়েছে কি না তা খুঁজতে নেমে পড়ে। কিন্তু বাস্তবে সফটওয়্যার চুরির সাথে ঐ দুজনের সম্পর্কের কোনো মিলই খুঁজে পায় না তারা। যে জিনিসটা খুঁজে পেয়েছিলো তা হলো, মাকোতো তাকামিয়া বিবাহিত হয়েও প্রেম করছে।

এরপর, গোয়েন্দাদের পারিশ্রমিক দিতে দিতে ক্লায়েন্ট এর তদন্ত কাজই বন্ধ করে দেয়। যদিও টোকিও জেনারেল রিসার্চ সেই ক্লায়েন্টকে মোটা একটা ফাইল দিয়ে দেয়। ওরা অনুসন্ধানে যা যা খুঁজে পেয়েছিলো তা ছিলো ওখানে। কিন্তু সেটা কী কাজে আসবে তা অবশ্য বোঝা যাচ্ছিলো না। ইমায়েদা বাজি ধরে বলতে পারে, সেই কাগজগুলো শ্রেডারে ঢুকিয়ে কুচিকুচি করে কেটেছিলো লোকটা।

হঠাৎ টুং করে লোহা ভাঙার মতো একটা শব্দ হতেই বর্তমানে ফিরে এলো ইমায়েদা। উপরে তাকিয়ে দেখলো হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মাকোতো।

'হায় হায়...' হাতে থাকা ক্লাবটার দিকে তাকিয়ে আছে সে, চোয়াল ঝোলানো। ক্লাবের একদম নিচের অংশ ভেঙে গেছে।

'কী হয়েছে?' আশেপাশে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো ইমায়েদা। ক্লাবের মাথাটা মাকোতো যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলো সেখানে পড়ে আছে। আশেপাশে থাকা কয়েকজন গলফার তাদের খেলা থামিয়ে তাকিয়ে আছে এদিকেই। ইমায়েদা উঠে গিয়ে ক্লাবের মাথাটা তুলে নিলো হাতে।

'এইরে, ভীষণ দুঃখিত আমি। ভাঙলো কী করে বুঝলাম না,' মাথাছাড়া ক্লাবটা হাতে নিয়ে বললো মাকোতো। ফ্যাকাশে হয়ে গেছে তার মুখখানা।

'মনে হচ্ছে জং ধরেছে,' বললো ইমায়েদা। 'আসলে বছরের পর বছর ফেলে রেখেছিলাম ওগুলো।'

'বুঝতে পারছি না, অতটা জোরেও তো মারিনি আমি।'

'জানি, সমস্যা নেই। ইটস ওকে। এমনিতেও ভাঙার রাস্তাতেই ছিলো ওটা। যদি আমি ক্লাব চালাতাম, তাহলে আরো আগেই হয়তো এটা ভাঙতো। আপনি ব্যথা পাননি তো?'

'না, না, ঠিক আছি আমি। দেখুন, এটার ক্ষতিপূরণ দিতে পারলে আমার ভালো লাগতো। মানে আমার হাতেই যেহেতু ভেঙেছে আর কি।'

মাথা ঝাঁকালো ইমায়েদা। 'তার দরকার নেই। যেরকমটা বললাম, ক্লাবটার আয়ু অত বেশি ছিলো না।'

'না, না, দয়া করে নিন। জোর করছি আমি, প্লিজ। আর এমনিতেও আমার নিজের টাকা খরচ করতে হবে না। ইন্সুরেন্স করা আছে আমার।'

'ইন্সুরেন্স?'

'গলফারদের ইন্সুরেন্স। কয়েকটা ফর্ম ভরে দিলেই তারা রিপেয়ার করে দেবে।'

'এমনকি ক্লাব আপনার না হলেও?'

'তাই তো মনে হচ্ছে। দোকানে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেই হয়ে যাবে আশা করি।'

ভাঙা টুকরোটা হাতে করে নিয়ে লবির দিকে এগোতে লাগলো মাকোতো। পেছন পেছন আসছে ইমায়েদা। লবির এক কর্নারে দোকানটা। মাকোতো যেভাবে ভেতরে ঢুকে পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা কর্মীটার দিকে হাত নাড়লো, দেখে মনে হলো জায়গাটার সাথে বেশ পরিচিত সে। লোকটাকে ভাঙা ক্লাবটা দেখিয়ে কী হয়েছিলো তা বলতে লাগলো মাকোতো।

'হ্যাঁ, ইন্সুরেন্স এটার ক্ষতিপূরণ দিতে পারবে,' বললো লোকটা। 'আপনাকে শুধু কোন জায়গায় হয়েছে সে জায়গার বর্ণনা, সাথে এই ভাঙা ক্লাবটার কিছু ছবি দিতে হবে। আর রিপেয়ার শপের রিসিটটা লাগবে, ব্যস।' এরপর একটু এগিয়ে এসে ফিসফিস করে বললো, 'দেখুন, এই ক্লাব যে আপনার না, তা প্রমাণ করা সম্ভব না।' এরপর সরে গিয়ে জোরে বললো, 'আপনাকে একটা ফর্ম দেবো, তবে আগে ইন্সুরেন্স কোম্পানিকে একটা কল দিতে হবে আপনার।'

'দারুণ! ধন্যবাদ। আচ্ছা, কত দিন লাগবে রিপেয়ার হতে?'

'উমম, আমাদের একই সাইজের লাঠি খুঁজতে হবে প্রথমে, তার মানে দুই সপ্তাহের মতো লাগতে পারে।'

'দুই সপ্তাহ...' চিন্তামিশ্রিত চোখ নিয়ে একবার ইমায়েদার দিকে তাকালো মাকোতো। 'কোনো সমস্যা হবে?'

'না, না, ঠিক আছে, সমস্যা নেই,' হেসে বললো ইমায়েদা। দুই সপ্তাহ মানে তার সেই ডেটের পরে গিয়ে ঠেকবে, কিন্তু একটা ক্লাব না থাকায় তেমন কোনো সমস্যা হবে না। তাছাড়া, মাকোতোর উপর আর কিছু চাপাতে চাচ্ছে না সে।

ক্লাবটা ওখানে রেখে দিয়ে তারা বেরিয়ে পড়লো দোকান থেকে।

'এই, মাকোতো,' প্র্যাকটিস রেঞ্জের দিকে যেতে নিতেই কার যেন গলা শোনা গেল। ইমায়েদা ঘুরে তাকাতেই চোয়াল শক্ত হয়ে গেল তার। চিনতে পারলো মেয়েটাকে, শিজুরু মিসাওয়া। লম্বা গোছের একটা লোক তার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে, যদিও লোকটাকে চিনতে পারছে না সে।

'আরে হেই,' ওদেরকে উদ্দেশ করে বললো মাকোতো।

'প্র্যাকটিস শেষ?' জিজ্ঞেস করলো শিজুরু।

'প্রায় শেষ হয়ে যেত এতক্ষণে, যদি-না এই ভদ্রলোকের ক্লাবটা ভেঙে ফেলতাম।'

মাকোতো লোকটার ক্লাবের সাথে কী হয়েছে তা খুলে বললো শিজুরুর কাছে। শোনার কারণে ধীরে ধীরে কালো হয়ে এলো তার মুখটা।

'কী বাজে অবস্থা,' করুণার সুরে বললো শিজুর। 'আমার মনে হয় না এরপর অপরিচিত কাউকে আর কখনো ক্লাব ধার দেবেন আপনি।'

'না, না, তেমন কিছু না,' বললো ইমায়েদা। তারপর মাকোতোর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনার স্ত্রী?'

হালকা হেসে মাথা নাড়লো মাকোতো।

তার মানে প্রণয় শেষমেশ পরিণয়ে রূপ নিয়েছে, বিহ্বল হয়ে ভাবলো ইমায়েদা।

'ক্লাবের সেই ভেঙে যাওয়া মাথাটা কারো গায়ে গিয়ে পড়েনি তো আবার?' শিজুরুর পেছনে থাকা লোকটা বলে উঠলো।

'সৌভাগ্যবশত, কারো গায়েই গিয়ে পড়েনি ওটা। এই যে নিন আমার বিজনেস কার্ড।' মাকোতো পকেট থেকে ওয়ালেট বের করে সেখান থেকে একটা কার্ড এগিয়ে দিলো ইমায়েদার দিকে।

'ওহ, থ্যাংকস।' বলে নিজের পকেটে হাত ঢোকালো ইমায়েদা। এক মুহূর্তের জন্য দ্বিধায় পড়ে গেল কোন কার্ডটা মাকোতোকে দেবে ভেবে। অনেকগুলো কার্ড সে ব্যবহার করে, যার প্রত্যেকটাতে বিভিন্ন নাম এবং পেশা দেওয়া। দ্বিতীয়বার ভাবতেই তার আসল কার্ডটা দেবে বলে ঠিক করলো সে। ওদের সাথে ছদ্মনাম ব্যবহার করার কোনো মানে নেই। আর তাছাড়া, মাকোতো বা ঐ দুজনের যে-কেউ ভবিষ্যতে তাদের ক্লায়েন্ট হলেও হতে পারে।

'প্রাইভেট ডিটেকটিভ?' কৌতূহল নিয়ে কার্ডটা দেখে জিজ্ঞেস করলো মাকোতো।

'কখনো প্রয়োজন পড়লে বলবেন,' বললো ইমায়েদা।

'উউউহ...তার মানে আপনি কি কোন মানুষ কার সাথে প্রেম করছে এগুলোও বের করেন?' এবার শিজুরু জিজ্ঞেস করলো।

'অবশ্যই,' মাথা দোলালো ইমায়েদা। 'সম্ভবত সবচেয়ে বেশি ক্লায়েন্ট এটার ব্যাপারেই আসে আমাদের কাছে।'

হাসলো শিজুর, এরপর মাকোতোর দিকে ফিরে বললো, 'তাহলে তো কার্ডটা আমার কাছে রাখতে হয়।'

'ভালো বুদ্ধি,' হেসে বললো মাকোতো।

আসলেই ভালো বুদ্ধি, বলতে চেয়েছিলো ইমায়েদা। এরপর চোখ গেল শিজুরুর ফোলা পেটের দিকে। *কারণ এই সময়টাই সবচেয়ে বিপজ্জনক।*

***

পশ্চিম শিনজুকুর একটা চিপা গলির মুখে পাঁচতলা বিল্ডিংয়ের দুই তলায় ইমায়েদার অফিস, যা কিনা এখন তার বাসা হিসেবেও ব্যবহৃত হচ্ছে। এখানে একটা বাস স্টপও রয়েছে, ফলে স্টেশন থেকে পাঁচ মিনিটের মধ্যে তার অফিসে চলে আসতে

পারে যে-কেউ। কিন্তু তারপরও অনেক ক্লায়েন্ট উপযুক্ত মনে করে না। যখনই কোনো ক্লায়েন্টকে ঠিকানার ব্যাপারে বলে সে, তখনই ফোনের ওপাশে যে ক্লায়েন্ট বিরক্ত হচ্ছে তা বুঝতে পারে। কিন্তু তার এই ব্যবসাটা করা দরকার, তাই অতিরিক্ত কিছু এফোর্ট দিয়ে হলেও তাদেরকে আসার জন্য প্ররোচনা দিতে থাকে। তবুও বেশিরভাগ কলই তার কোনো উপকারে আসে না।

ও জানে যে স্টেশনের কাছাকাছি চলে যাওয়াটা ভালো হবে। কোনো প্রাইভেট গোয়েন্দার কাছে আসার সময় একজন ক্লায়েন্টের মাথায় অনেক কিছু চলে। একটা বাস ধরার কথা ভেবেও হয়তো তাদের মতের পরিবর্তন হতে পারে। অথচ মূল্যস্ফীতির কারণে বাসা ভাড়া আকাশে গিয়ে ঠেকেছে এখন। চোখের পলকে এই ছোট অফিসটার ভাড়া দেবে, সেই টাকা জোগাড় করা এখনো সম্ভব হয়ে ওঠেনি তার জন্য। বাসা ভাড়া বেড়ে যাওয়া মানে হচ্ছে তার সার্ভিসের ফি বেড়ে যাওয়া, যা কিনা তার উপর অতিরিক্ত চাপের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আলাদা হয়ে যাওয়ার পর থেকে তার একটাই লক্ষ ছিলো: সার্ভিস ফি পরিমাণমতো রাখবে, আর খেয়াল রাখবে যাতে তার ক্লায়েন্ট খুশি থাকে। কিন্তু দুটোকেই সমান তালে রাখাটা তার জন্য কঠিন হয়ে পড়ছে আজকাল।

জুন মাসের শেষ বুধবার একজন ক্লায়েন্ট ফোন করলো তার অফিসে: কাজুনারি শিনোজুকা। জানালার বাইরে গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছিলো, আর ইমায়েদা ধরেই নিয়েছিলো এ সময়ে আর কোনো কাস্টমারের দেখা সে পাবে না।

ফোনে কাজুনারির পরিচয় বলার পর থেকেই কেন যেন ইমায়েদার মনে হতে লাগলো সে তার ক্লায়েন্ট হতে চলেছে। বলার ভঙ্গিতে এরকম কিছু একটাই ছিলো তার। এর কিছুক্ষণ পরেই অফিসে কী করে আসতে হবে সেই বর্ণনা দিতে লাগলো সে।

ফোন কেটে দিয়ে ঘাড় চুলকাতে লাগলো ইমায়েদা–ভাবছে সে। কাজুনারি নির্দিষ্ট করে বলেনি কোন কারণে সে আসছে, আর সেটাই ইমায়েদাকে ভাবনায় ফেলে দিয়েছে। কী এমন কাজে কাজুনারি আসছে তার কাছে? সে জানে কাজুনারি সিঙ্গেল, অতএব প্রাপ্তবয়স্কদের যে সমস্যাগুলো নিয়ে লোকে আসে সেটা প্রথমেই বাদ হয়ে গেল লিস্ট থেকে। আবার লোকটার কথা শুনে তার কাছে কখনো মনেও হয়নি যে প্রেমিকার পেছনে গোয়েন্দা লাগানোর মতো লোক সে।

কাজুনারির সাথে ইমায়েদার প্রথম দেখা হয় সেই দিন, যেদিন মাকোতোর সাথে তার ড্রাইভিং রেঞ্জে দেখা হয়েছিলো। শিজুরু মিসাওয়ার পেছনে যে লম্বা লোকটা দাঁড়িয়ে ছিলো সেটাই কাজুনারি। সেদিন ঐ তিনজন একত্রে ডিনারে যায়। ইমায়েদা অবশ্য অতটা আগায়নি যাতে তাদের সাথে তাকে যেতে হয়, সে শুধু লবিতে বসেই কফি খেয়েছিলো। আর সেই সময়েই কাজুনারি তার বিজনেস কার্ডটা এগিয়ে দিয়েছিলো তার দিকে।

এরপরে অবশ্য আরো দুবার সেই ড্রাইভিং রেঞ্জে তাদের দেখা হয়েছিলো। সুদক্ষ একজন গলফার কাজুনারি। ইমায়েদার কাজ সম্পর্কে দুয়েকবার কথা উঠেছিলো সে সময়ে। যদিও সে বিষয়ে কাজুনারির তেমন আগ্রহ লক্ষ করেনি সে, কিন্তু মনে হচ্ছে সে সময়ে বপন করা বীজ এখন ফসল দিচ্ছে।

পকেট থেকে মার্লবোরো সিগারেটের প্যাকেট বের করে একটা মুখে নিলো ইমায়েদা। এরপর আগুন ধরালো ওতে। পাদুটো ডেস্কের উপর তুলে চেয়ারের সাথে হেলান দিয়ে লম্বা একটা টান দিলো সিগারেটটায়। এরপর অবশিষ্ট ধোঁয়া সিলিংয়ের দিকে মুখ করে ছেড়ে দিলো।

কাজুনারি শিনোজুকা কোনো সাধারণ কর্মচারী না। তার চাচার ফার্মাসিউটিক্যালসের পরবর্তী সিইও হওয়ার পথে সে। যার কারণে কর্পোরেট ইনভেস্টিগেশনের বিষয়টা মাথা থেকে ঝাড়তে পারলো না ইমায়েদা। আর এই সম্ভাবনাটা নিয়ে ভাবতেই হৃৎপিণ্ডটা যেন খাঁচা ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাচ্ছে তার। এরকম অনুভূতি অনেক দিন হলো পায়নি সে।

দুই বছর আগেই টোকিও জেনারেল রিসার্চ থেকে আলাদা হয়ে যায় ইমায়েদা। ঐ নগণ্য বেতনে কোম্পানির অতশত শর্ত পছন্দ হয়নি তার। আর অত বছর ধরে এই কাজ করার পরে ওর মনে হয়েছে এখন থেকে অনুসন্ধানের কাজ সে একাই করতে পারবে। যার কারণে যা করা দরকার ছিলো তাই করছে ও।

আর ব্যবসাও যে খারাপ যাচ্ছিলো এমন না, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভালোই যাচ্ছিলো। যথেষ্ট সাপোর্ট পেয়েছে সে নিজের জীবন নিজের মতো করে গুছিয়ে নেওয়ার জন্য। এমনকি কিছু সঞ্চয়ও করেছিলো যাতে মাসে অন্তত একবার গলফ কোর্সে যেতে পারে।

কিন্তু তাতে সন্তুষ্ট ছিলো না সে। অর্ধেকের বেশি কাজ ছিলো অন্যের প্রেমের বিষয়ে খতিয়ে দেখা নিয়ে। যেরকম কর্পোরেটভিত্তিক কাজ সে টোকিও জেনারেল রিসার্চে থাকতে পেত, সেরকম কিছু আসার কোনো নামই ছিলো না। যার মানে হলো, প্রায় অধিকাংশ সময়ই তাকে রাস্তায় রাস্তায় থাকতে হতো, দেয়ালের পেছন থেকে দেখতে হতো প্রেম আর বিশ্বাসঘাতকতার নাটক। এতে ও কিছু মনে করতো না ঠিকই, কিন্তু পুরোনো হয়ে যাচ্ছিলো বিষয়টা। কোনো রকম টেনশন কাজ করতো না ওতে।

ইমায়েদা একটা সময় ভেবেছিলো পুলিশ ফোর্সে জয়েন করবে। এজন্য পরীক্ষাও দিয়েছিলো। টিকে গেছিলো সে, এরপর একাডেমি থেকেও ডেকেছিলো। কিন্তু যখন দেখলো অপ্রয়োজনীয় অনেক নিয়মকানুন মানতে হচ্ছে, তখন নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ে। সেই সময়ে তার কাছে আজগুবি লেগেছিলো ওসব নিয়ম। তাই গ্র্যাজুয়েট না হয়েই ছেড়ে দেয়। আর এটাও তার বয়স বিশের ঘরে থাকার সময়ের কথা।

একটার পর একটা পার্ট-টাইম জব ধরতে ধরতে একদিন পত্রিকায় দেখে, টোকিও জেনারেল রিসার্চের জন্য লোক লাগবে। *যদি পুলিশ না হতে পারি, তবে অন্তত গোয়েন্দা তো হতে পারবো*, মজা করেই নিজেকে নিজে বলে ইন্টারভিউ দিতে চলে গেছিলো সে। সেদিনই চাকরি হয়ে যায় তার। কিন্তু শুরুর দিকে পার্ট-টাইম থেকে কিছুটা বেশি কাজ করতে হতো তাকে। ছয় মাসের মাথায় তাকে স্থায়ী কর্মী হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়।

প্রথম ইনভেস্টিগেশনেই ইমায়েদা বুঝে যায় ঐ কাজের জন্য সে কতটা ফিট। প্রাইভেট গোয়েন্দাদের কাজটা মুভি বা নাটকে যেমন রঙিন করে দেখানো হয়, বাস্তবে একেবারেই তেমনটা না। একই কাজের বারবার পুনরাবৃত্তি ঘটে এতে, এবং কাজটা একা করতে হয়। তাছাড়া, কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত কোনো কেসেই হাত দেওয়া যায় না। আর ক্লায়েন্টের গোপনীয়তাও রক্ষা করতে হয়। ইনভেস্টিগেশনের কোনো রকম প্রমাণ বা তথ্য যাতে ফাঁস না হয়, খেয়াল রাখতে হয় সেদিকেও। আর অবশেষে যখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা টানা কাজ শেষে যা বের করতে চাচ্ছিলো তা পেয়ে যেত, তখন মনে হতো এই তৃপ্তি অন্য কোথাও কখনো পায়নি সে।

কাজুনারির থেকে পাওয়া ফোনটার জন্য তার মনে হচ্ছে বহু দিন বাদে আবারো উত্তেজনামূলক কিছু পেতে যাচ্ছে সে। একটা শক্ত আভাস পাচ্ছে তার।

মাথাটা ঝাঁকিয়ে নিয়ে আবার একটা সিগারেট বের করলো সে। *আগ বাড়িয়ে এত ভাবতে যেও না। হয়তো কোনো মেয়েকেই আবার ফলো করার কাজ দেবে—ঐ সব সময়ের মতো যা পাও আর কি।*

দুটো বেজে বিশ মিনিটের মাথায় এলো কাজুনারি। উজ্জ্বল ধূসর রঙের একটা স্যুট পরেছে সে, চুলগুলো পরিপাটি করে সাজানো। যতটুকু এলোমেলো হয়ে আছে, ততটুকুও আবহাওয়ার কারণে হয়েছে। রেঞ্জে যেমন লাগছিলো তার চেয়েও চার-পাঁচ বছর বেশি বয়স্ক দেখাচ্ছে এখন। সেই সাথে বেশ মালদারও মনে হচ্ছে।

'অনেক দিন ড্রাইভিং রেঞ্জে দেখলাম না আপনাকে,' বসতে বসতে বললো কাজুনারি।

'হ্যাঁ, আসলে নির্দিষ্ট দিন ঠিক না করে যেতে পারি না আমি,' কফির কাপে কফি ঢালতে ঢালতে জবাব দিলো ইমায়েদা।

'মাঝেমধ্যে খেলা উচিত আমাদের,' বললো কাজুনারি। 'বেশ কিছু চমৎকার গলফ কোর্স আছে ওখানে।'

'দারুণ। যেদিন যাবেন অবশ্যই জানাবেন আমাকে।'

'আচ্ছা, জানাবো তবে। মাকোতোকেও সাথে করে নিয়ে নেবো আমি,' কফির কাপে একটু চুমুক দিয়ে বললো সে।

ইমায়েদা তার অঙ্গভঙ্গিতে কঠোরতার একটা আঁচ লক্ষ করলো, যেটা সব ক্লায়েন্টের মাঝেই সে পেয়ে থাকে।

কাজুনারি তার হাতের কাপটা নিচে নামিয়ে রাখলো। লম্বা একটা শ্বাস নিয়ে একটু থেমে বললো, 'একটা অদ্ভুত আবদার রয়েছে আমার।'

মাথা নাড়লো ইমায়েদা। 'চিন্তা করবেন না। এখানে যারা আসে তাদের প্রায় প্রত্যেকেই নিজেদের দাবিকে অদ্ভুত বলে ভাবে। কীভাবে সাহায্য করতে পারি আমি তা বলুন।'

'আসলে একটা নারীঘটিত বিষয় এটা,' বললো সে। 'সেটার উপরেই তদন্ত করতে চাচ্ছিলাম আর কি।'

'ঠিক আছে,' বললো ইমায়েদা। তার বুকের ভেতরে থাকা উত্তেজনা কিছুটা দমে গেল। 'সম্ভবত আপনার গার্লফ্রেন্ড?'

'উমম, আসলে তা না। সরাসরি কোনো যোগাযোগ নেই আমাদের মধ্যে। মানে সেরকমটা না আর কি।' পকেটের ভেতর হাত ঢুকিয়ে একটা ছবি বের করে টেবিলের উপর রাখলো সে। 'এই মেয়েটা।'

ছবিটা হাতে তুলে নিলো ইমায়েদা।

বিশাল বড় একটা বাড়ির সামনে দাঁড়ানো একটা মেয়ে। ছবিতে মেয়েটার পরনে সাদা পশমি কোট থেকে বোঝা যাচ্ছে কোনো এক শীতকালে তোলা হয়েছে ছবিটা। ঝলমলে একটা হাসি লেগে আছে তার ঠোঁটে, দেখে মনে হচ্ছে খুব সহজেই পেশাদার মডেল হতে পারতো সে।

'দেখতে বেশ আকর্ষণীয়,' বললো ইমায়েদা।

'আসলেই। আসলে আমার কাজিন প্রেম করছে তার সাথে।'

'কাজিন বলতে আপনার আংকেল, মানে কোম্পানির সিইওর ছেলেকে বোঝাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ, কোম্পানির এমডি সে এখন।'

'কত বয়স তার?'

'পঁয়তাল্লিশ।'

ওরকম একটা প্রতিষ্ঠানের এমডি হওয়ার জন্য পঁয়তাল্লিশ বছর খুব কম বয়স। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে কোম্পানির সিইও সবকিছু আগে থেকেই গুছিয়ে রাখতে চাচ্ছে।

'বিয়ে হয়েছে তার?'

'না, বর্তমানে না। ছয় বছর আগে জাপান বিমান দুর্ঘটনায় তার স্ত্রী মারা গেছিলো।'

'ওহ, খারাপ লাগলো শুনে। পরিবারের আর কোনো সদস্য হারিয়েছিলো সে?'

'না, তার স্ত্রী একাই ছিলো সেই বোর্ডে।'

'কোনো বাচ্চা-কাচ্চা আছে?'

'দুটো, একটা ছেলে আর একটা মেয়ে।'

ইমায়েদা আবার তাকালো ছবিটার দিকে। ডাগর ডাগর চোখ রয়েছে মেয়েটার।

'তো যা বলছিলাম, যদি আপনার কাজিনের স্ত্রী মারা গিয়ে থাকে, তবে তো এই মেয়ের সাথে সম্পর্কে জড়ানোতে কোনো বৈধ সমস্যা থাকার কথা না?'

'হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন। তাছাড়া, আমরা সকলেই চাই উপযুক্ত মেয়ে খুঁজে পাক সে।'

'তো,' ইমায়েদা টেবিলের উপরে থাকা ছবিটার উপর আঙুল রেখে বললো, 'আপনার মনে হচ্ছে না এই মেয়েটা উপযুক্ত। কোনো সমস্যা আছে মেয়েটার?'

কাজুনারি একটু ঝুঁকে এসে বললো, 'আসলে হ্যাঁ, একটু সমস্যা আছে।'

'কী সেটা? যদি কিছু মনে না করেন বলতে, তবে বলে ফেলুন।'

কাজুনারি দুহাত একটু ঘষে নিয়ে টেবিলের উপর রাখলো। 'আচ্ছা, প্রথমত আগে একবার বিয়ে হয়েছিলো তার। আর যার সাথে আগে বিয়ে হয়েছিলো সমস্যাটা সেখানেই।'

'কার সাথে হয়েছিলো?' জিজ্ঞেস করলো ইমায়েদা। তার গলার স্বর ধীরে ধীরে নরম হয়ে উঠছে।

'মাকোতো।'

লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল ইমায়েদা। 'মাকোতো তাকামিয়া?'

'হুম, তার প্রাক্তন স্ত্রী ঐ মেয়েটা।'

'আচ্ছা...' মাথা ঝাঁকিয়ে বললো ইমায়েদা। 'বেশ অবাক করা ঘটনা।'

'আসলেই তাই,' হেসে বললো কাজুনারি। 'আগেও বলেছি যে আমি আর মাকোতো কলেজ লাইফে ড্যান্স ক্লাবে ছিলাম। ছবিতে থাকা মেয়েটাও আমাদের ক্লাবে ছিলো। আর সেখান থেকেই তাদের মধ্যে পরিচয় হয়।'

'ডিভোর্স কবে হলো?'

'আটাশি সালে, মানে তিন বছর আগে।'

'শিজুকুর কারণেই?'

'অতটা বিস্তারিত জানি না আমি, কিন্তু ভালো একটা কারণ বলেছেন। হতে পারে এটার জন্যই হয়েছিলো,' বললো কাজুনারি। অস্পষ্ট এক হাসি লেগে আছে তার মুখে।

'তার মানে মাকোতোর প্রাক্তন স্ত্রী এখন আপনার চাচাতো ভাইয়ের সাথে প্রেম করছে। তাদের পরিচয় কি কোনো কাকতালীয় ঘটনা থেকে হয়েছিলো? মানে মাকোতোর প্রাক্তন স্ত্রী আর আপনার ভাইয়ের এমন কোনো জায়গায় পরিচয় হয়েছিলো যা আপনি জানেন না?'

'না, আমি এটাকে কোনো কাকতালীয় ঘটনা বলবো না। বলতে পারেন ওদের দুজনকে মেলানোর জন্য আমিই দায়ী ছিলাম।'

'তা কীভাবে?'

'এই মেয়ের দোকানে আমার কাজিনকে নিয়ে গেছিলাম, দক্ষিণ আওইয়ামাতে R&Y নামের একটা পোশাকের দোকান রয়েছে তার। মেয়েটা বলেছিলো তার আর তার মায়ের নাম *রেইকো* থেকেই দোকানের নাম দিয়েছে সে।'

ইউকিহো কারাশাওয়া ডিভোর্সের আগে কয়েকটা দোকান চালানো শুরু করেছিলো। যদিও কাজুনারি তাদের বিয়ের সময় ছিলো না, কিন্তু ডিভোর্সের কিছু দিন বাদেই একটা স্পেশাল সেলের ইনভাইটেশন পায় সে। যখন ইউকিহোকে জিজ্ঞেস করে যে কেন সে এই ইনভাইটেশন পাঠিয়েছে, তখন তার জবাব ছিলো, মাকোতো তাকে পাঠাতে বলেছে।

'আমার মনে হয় মাকোতো ভেবেছিলো আমি হয়তো মেয়েটাকে কিছুটা সাহায্য করতে পারবো তার ব্যবসায়। তখনো ইউকিহোর অবস্থার জন্য নিজেকে দায়ী মনে করতো মাকোতো, আর এজন্যই হয়তো চেয়েছিলো তাকে কিছুটা সাহায্য করতে।'

মাথা নাড়লো ইমায়েদা। যথেষ্ট সাধারণ একটা গল্প এটা। যখনই এ ধরনের গল্প শোনে, তখনই ওর মনে হয় এতে কিছু পুরুষের বোকার মতো ঔদার্য প্রকাশ পাচ্ছে।

এমনকি কিছু কিছু ডিভোর্সের ক্ষেত্রে স্ত্রীর দোষ থাকলেও প্রাক্তন স্বামী *নিজ* থেকে একটু হাত বাড়ানোর চেষ্টা করে–তা নিজেকে খানিকটা ছোট করে হলেও। কিন্তু অন্য দিকে স্ত্রীরা, তারা বিচ্ছেদ হয়ে যাওয়ার পরে আর কখনোই স্বামীর খোঁজ রাখে না।

'আমি নিজেও কিছুটা চিন্তায় ছিলাম যে ডিভোর্সের পরে কীরকম হালচাল যাচ্ছে তার তা নিয়ে। তাই ভাবলাম একবার যাওয়া দরকার, শুধু কেমন আছে তা দেখার জন্য। আর এই পুরো বিষয়টা আমি আমার কাজিনকে বলতেই সেও সাথে যাবে বলে জানায়। সে বলে যে তার কিছু পোশাক লাগবে যেগুলো ছুটির দিনে পরতে পারবে সে।'

'আর বাকিটুকু যেমনটা বললেন তেমনই তো হয়েছে, না?'

'হ্যাঁ, ওরকমই কিছু একটা।'

কাজুনারি বললো যে প্রথমে সে বুঝতেই পারেনি ইউকিহোর উপর আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে তার কাজিন, মানে ইয়াসুহারু। পরবর্তীতে ইয়াসুহারু তাকে বলে যে তার নাকি প্রথম দেখাতেই প্রেম হয়ে গেছে। এমনকি আরো বাড়িয়ে বলেছে যে ইউকিহো ছাড়া অন্য কারো সাথে নিজেকে কল্পনাও করতে পারছে না সে। 'আসলে আমার কাজিন কিছুটা একরোখা। একবার কোনো কিছু ভালো লেগে গেলে আর

সেটাকে ফেলতে পারে না। তাতে মানুষজন কী বললো, কী করলো তা গায়েও মাখে না। আমি আসলে প্রথমে জানতাম না এটা, কিন্তু পরবর্তীতে জানতে পারি যে আমার সাথে সেদিন সেই দোকানে যাওয়ার পরে নিজে থেকেই নিয়মিত যাতায়াত করতো সেখানে। বাসার কাজের মহিলা বললো, যতটা না কাপড় পরে, তার থেকে বেশিই কেনে সে।'

মৃদু হাসলো ইমায়েদা। 'বুঝে গেছি কাহিনি। তার মানে ইয়াসুহারু চাল চালে আর মেয়ের মন জিতে নেয়, তাই তো?'

'হ্যাঁ। আর আমার ধারণা, বিয়ের চিন্তাভাবনা করছে আমার কাজিন। মনে হচ্ছে মেয়েটাই দ্বিমত করছে একটু। আর আমার কাজিন ধরে নিয়েছে এটা তাদের বয়সের পার্থক্য আর তার দুটো বাচ্চা থাকার জন্যই করছে।'

'হ্যাঁ, এটা একটা কারণ হতে পারে। সাথে এটাও মনে রাখতে হবে যে একবার ধাক্কা খেয়েছে সে। কিছুটা পিছিয়ে যাওয়াটা তার ক্ষেত্রে স্বাভাবিক।'

'হ্যাঁ, তা মানা যায়।'

'তো–' হাতদুটো টানটান করে টেবিলের উপর রাখলো ইমায়েদা–'এই মেয়েটার কী বিষয়ে খোঁজ নিতে বলছেন আমাকে? এতক্ষণ শোনার পরে তো মনে হচ্ছে মেয়েটা সম্পর্কে বেশ ভালোই জানেন আপনি।'

'আপনার মনে হতে পারে তা, কিন্তু আসল কাহিনি এটা না। আসলে তার অনেক কিছুই আছে যেগুলো অনেক রহস্যময়।' ছবিটা হাতে নিলো কাজুনারি। 'জানেন তো, যদি এই বিয়েটা করে আমার কাজিন সুখে থাকে, একদম সত্যিই সুখে থাকে, তাহলে আমি বলবো তার বিয়েটা করা উচিত। হ্যাঁ, এটা ঠিক যে প্রথমে আমিও কিছুটা দ্বিধায় পড়ে গেছিলাম এটা ভেবে যে সে আমার বন্ধুর প্রাক্তন স্ত্রী, কিন্তু তা-ও মানিয়ে নিতে পারতাম। কিন্তু এটা...' ছবিটা ইমায়েদার দিকে ঘুরিয়ে দিলো কাজুনারি। 'এই মেয়েটাকে আমি যত বেশি দেখি, তত বেশিই অস্বাভাবিক অনুভূতি হতে থাকে আমার। ব্যাখ্যা করতে পারবো না কেমন সেই অনুভূতি। কেন যেন এই বিষয়টা মাথা থেকে ঝাড়তে পারি না যে কিছু একটা রয়েছে এই মেয়ের মধ্যে। তলানিতে অবশ্যই কোনো না কোনো অন্ধকার রয়েছে।'

'আমার মতে, প্রত্যেক নারীর মাঝেই খানিকটা অন্ধকার বিদ্যমান,' হেসেই বললো ইমায়েদা।

'এর থেকেও বেশি কিছু রয়েছে এখানে। যেভাবে সে হাসে, যেভাবে মানুষজনকে অভিভূত করে, সেগুলো দেখে ওকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বলে মনে হয়। কোনো ব্যথা বা গভীর মনঃকষ্ট দিয়ে সে কাছে টেনে নেয় মানুষকে। এমনকি আমার কাজিনও স্বীকার করেছে যে তার চেহারা তাকে আকর্ষণ করেনি, করেছে তার আচরণ, তার ভেতরে থাকা ভালো মানুষের রূপ।'

'আর আপনার মনে হচ্ছে ওটা তার অভিনয়?'

'আমি চাই এটাই বের করুন আপনি।'

'বেশ কঠিন কাজ। আপনি কি নিশ্চিত আর কিছু নেই আপনার কাছে, মানে আরো নির্দিষ্ট কিছু কারণ, যা দিয়ে এই মেয়েটিকে সন্দেহ করা যায়?'

কিছু বলার আগে এক মুহূর্তের জন্য মেঝের দিকে তাকিয়ে রইলো কাজুনারি। এরপর মুখ খুললো, 'আছে।'

'সেটা কী?'

'টাকা।'

'ওওওহ...' ইমায়েদা চেয়ারে হেলান দিয়ে লম্বা সময় ধরে তাকিয়ে রইলো কাজুনারির দিকে। 'আমি আরো ভাবছিলাম এই পয়েন্টটা কেন আসছে না এখনো। আপনার মনে হচ্ছে সে আপনার ভাইয়ের টাকার পেছনে ছুটছে?'

ইমায়েদাকে অবাক করে দিয়ে মাথা ঝাঁকালো কাজুনারি।

'আসলে মেয়েটার টাকাই আমার চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাকোতোও বলেছিলো যে তার এরকমটা হতো। দেখুন, আসলে এটা পরিষ্কার না যে এত টাকা তার কাছে কোত্থেকে আসে। ঐ বুটিকের দোকানগুলো যখন সে খুলেছিলো, তখন মাকোতো টাকা দিয়ে তাকে সাহায্য করেনি। এর আগে কিছু দিন শেয়ার মার্কেটে ছিলো ঠিকই, কিন্তু শেয়ারের কিছু টাকা দিয়ে অমন একটা জায়গায় দোকান নেওয়া...মানে একজন নতুন উদ্যোক্তা হয়ে এত দ্রুত উন্নতি করা...বিষয়টা অনেক কঠিন।'

'আর্থিকভাবে সচ্ছল পরিবার থেকে এসেছে নাকি?'

আবারো মাথা ঝাঁকালো কাজুনারি। 'আমার শোনামতে তো না। তার মা *চা পানের রীতি* শেখায়। ভদ্রমহিলার জীবন চলে সরকার থেকে পাওয়া কিছু টাকা আর ঐ চা পান করা শিখিয়ে।'

মাথা দোলালো ইমায়েদা। ধীরে ধীরে ইন্টারেস্টিং হচ্ছে বিষয়টা। 'আপনি নিজে নির্দিষ্ট কোনো কিছু সন্দেহ করেন? হয়তো কোনো পৃষ্ঠপোষক রয়েছে তার?'

'তা জানি না। তার এরকম কোনো গোপন পৃষ্ঠপোষক আছে তা কল্পনা করা কিছুটা কষ্টসাধ্য। মানে তার বিয়ের পরেও...তারপরও মনে হচ্ছে কিছু একটা আছে এতে। সবার অগোচরে নিশ্চয়ই কিছু একটা চলছে, আমি নিশ্চিত।'

'অগোচরে, হ্যাঁ,' কড়ে আঙুল দিয়ে নাকের ডগা চুলকে নিয়ে বললো ইমায়েদা।

'আরেকটা জিনিস আছে যেটাও ভাবাচ্ছে আমাকে।'

'কী?'

'তার কাছের লোকজনের ব্যাপারে,' ধীর গলায় বললো কাজুনারি। 'মানে তার সাথে যাদেরই ভালো সম্পর্ক ছিলো, তারাই কোনো না কোনোভাবে দুর্ভোগের সম্মুখীন হয়েছে।'

'হাঁহ?' চোখের পলক ফেলে তাকালো ইমায়েদা। 'আপনি সিরিয়াস?'

'অবশ্যই, মাকোতোই তার প্রমাণ। যদিও এখন শিজুরুকে বিয়ে করে সুখে আছে, কিন্তু তার ডিভোর্স কোনো দুর্ভোগ থেকে কম ছিলো না।'

'কিন্তু সে তো মাকোতোর নিজের ভুলের কারণে হয়েছিলো, না?'

'সবকিছু দেখে হ্যাঁ বলা যায়, কিন্তু পুরোপুরি নিশ্চিত করে বলা যায় না।'

'ঠিক আছে, তো আর কেউ কি দুর্ভোগের স্বীকার হয়েছে?'

'আমার প্রাক্তন প্রেমিকা,' চোয়াল শক্ত করে বললো কাজুনারি।

'আচ্ছা।' এক চুমুক কফি খেয়ে নিলো ইমায়েদা। হালকা ঠান্ডা হয়ে আছে। 'কী হয়েছিলো? মানে যদি কিছু মনে না করেন তো।'

'খুবই খারাপ কিছু। সবচেয়ে বাজে যে বিষয়টা একটা মেয়ের ক্ষেত্রে ঘটতে পারে তাই প্রায় হতে বসেছিলো। ঐ ঘটনার জন্যই আমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ হয়ে যায়,' কাজুনারি বলতে লাগলো। 'বলতে পারেন আমি নিজেও দুর্ভোগের শিকার হয়েছি এক্ষেত্রে।'

***

দোকান থেকে বেশ কিছুটা দূরেই গাড়ি পার্ক করলো ইমায়েদা। এর কারণ অবশ্য তার হোন্ডার গাড়িটা। কারণ কাজুনারির থেকে ধার করা দামি পোশাক আর ঘড়ি পরে এমন একটা গাড়ি থেকে নামলে বড় বেমানান লাগবে।

'আসলেই কিছু কিনে দেবে না তুমি আমাকে? হয়তো কম দামিও কিছু থাকতে পারে,' বললো এরি। তার সংগ্রহে থাকা সবচেয়ে ভালো ড্রেসটা পরে ইমায়েদার পাশাপাশি হাঁটছিলো সে।

'সবকিছুই দামি ওখানকার,' সে বললো তাকে। 'ওখানে সবকিছুর গলাকাটা দাম।'

'আর যদি সত্যি সত্যি কিছু চেয়ে বসি তখন?'

'তোমার নিজের কাছে টাকা আছে, সেগুলো দিয়ে কিনবে তাহলে।'

'তুমি যে একটা কিপটে, তা জানো তো?'

'এই যে সাথে করে নিয়ে এসেছি, এতেই খুশি থাকো।'

R&Y বুটিকের সামনে চলে এলো তারা। দোকানের সামনের অংশ পুরোটাই কাচ দিয়ে ঢাকা, সেই সাথে নারীদের পোশাকের ছবি দিয়ে সাজানো।

'ওয়াও!' বলে উঠলো এরি। 'দেখতে আসলেই দামি মনে হচ্ছে ওগুলো।'

'ভেতরে যাওয়ার পর যা বলবে বুঝেশুনে বলবে,' কনুই ধরে একটু টান মেরে বললো ইমায়েদা।

ওর অফিসের পাশের বারে কাজ করে এরি। দিনের বেলায় কী একটা প্রফেশনাল কোর্স করতে যেত সে, যদিও ইমায়েদা জানে না কী নিয়ে পড়ছে সে। যা জানে তা হলো মেয়েটা বিশ্বাসযোগ্য, এবং যেখানেই দম্পতি হিসেবে তাকে

যেতে হয়, সেখানে তাকে সাথে করে নিয়ে যেতে পারে সে। তাছাড়া, মেয়েটারও যে কাজটা ভালো লাগে তা বোঝা যায়। শত হলেও ছদ্মবেশে থাকাটা বেশ মজার।

দোকানের দরজাটা ঠেলে ভেতরে ঢুকলো ইমায়েদা। পারফিউমের তীব্র, চমৎকার একটা ঘ্রাণ নাকে এসে লাগলো তার।

'হ্যালো,' দোকানের পেছন থেকে একজন তরুণী এসে তাদের উদ্দেশ করে বললো। সাদা রঙের একটা পোশাক পরে আছে সে, আর মুখে বাঁধাই করা হাসি। ইউকিহো কারাশাওয়া না সে।

'জি, সুগাওয়ারা নামে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিলো।' সুগাওয়ারা, এরির আসল সারনেম। এটা ব্যবহার করার কারণ হলো, মাঝেমধ্যে সবার সামনে ছদ্মনামে সাড়া দিতে ভুলে যায় সে।

'কীভাবে সাহায্য করতে পারি আমি?' জিজ্ঞেস করলো তরুণীটি।

'আসলে ওর জন্য জামা লাগবে,' এরির দিকে নির্দেশ করে বললো ইমায়েদা। 'শরৎ বা গ্রীষ্মকালের জন্য কিছু ক্লাসি কাপড় দেখাবেন, আবার খুব বেশি স্টাইলিস্ট না হয়ে যায় যেন। মানে যেন চাইলে অফিসেও যেতে পারে সে ওরকম কিছু দেখাবেন। এ বছরই চাকরি নিয়েছে, তাই চাচ্ছি না অত বেশি নজরে পড়ুক।'

'বুঝতে পেরেছি,' বললো সাদা পোশাক পরা তরুণীটি। 'আমার মনে হয় কী বলছেন তা ধরতে পেরেছি আমি। একটু সময় দেবেন, আমি বের করে দেখাচ্ছি।'

যত দ্রুত সে পেছনে ফিরে খুঁজতে শুরু করলো, ঠিক তত দ্রুতই ইমায়েদার দিকে তাকালো এরি। আরেকজন মেয়ে দোকানের পেছন থেকে তাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো। ইমায়েদা ঘুরেই দেখলো ইউকিহো কারাশাওয়া তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। পোশাকগুলো হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে নিয়ে হাত নাড়ছিলো সে। বেশ মলিন একটা হাসি লেগে আছে তার মুখে, আর চোখে নরম এবং মাধুর্য-মেশানো চাহনি। একধরনের দ্যুতি ছড়িয়ে পড়ছে তার আশেপাশে। যদিও দোকানে আসা প্রত্যেকটা কাস্টমারের প্রয়োজন সম্পর্কে জানার যে আগ্রহ তার ভেতর খেয়াল করা যাচ্ছে তা বেশ প্রশংসনীয়।

'হ্যালো,' খুব মোলায়েম করে বললো সে, সাথে কিছুটা ঝুঁকলো। চোখদুটো তাদের উপর থেকে সরছে না।

নিঃশব্দে মাথা দোলালো ইমায়েদা।

'মি. সুগাওয়ারা? মি. শিনোজুকার কাছ থেকে আমাদের ব্যাপারে শুনেছেন আপনারা, না?'

'হ্যাঁ,' বললো ইমায়েদা। অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেওয়ার সময়ই তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো কীভাবে তাদের দোকান সম্পর্কে শুনেছে সে।

'আচ্ছা...আপনি কি কাজুনারি শিনোজুকার কাছ থেকে শুনেছেন নাকি?' একটা ভ্রু তুলে জিজ্ঞেস করলো ইউকিহো।

'জি,' জবাবে বললো ইমায়েদা। কিছুটা অবাক হলো এটা ভেবে যে কেন প্রথমেই তার প্রেমিক ইয়াসুহারুর নাম না নিয়ে কাজুনারির নামটা নিলো সে।

'আপনার স্ত্রীর জন্য কিছু কিনতে এসেছেন?' এরির দিকে একবার তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো মেয়েটা।

'না, না,' হেসে বললো ইমায়েদা। 'আমার ভাতিজির জন্য আসলে। ওর প্রথম চাকরি হয়েছে, তাই।'

'ওহ, বুঝতে পেরেছি। দুঃখিত,' বললো ইউকিহো। এখনো হাসছে। চোখের পাতাটা একটু দুলে উঠতেই কপালের উপর কিছু চুল এসে পড়লো তার। তর্জনী দিয়ে সেগুলোকে সরিয়ে দিলো।

হঠাৎ ইমায়েদার মনে হলো, এরকম মেয়েগুলোকে বিভিন্ন বিদেশি ছবিতে প্রায়ই এরকম করতে দেখতো সে।

যদি ঠিকঠাক মনে থাকে, তবে ইউকিহো কারাশাওয়ার বয়স মাত্র উনত্রিশ বছর। এত অল্প বয়সে কী করে নিজের ভেতর এতটা পরিশুদ্ধ ভাব আনলো মেয়েটা তাই ভাবছে ইমায়েদা। ও বুঝতে পারছে যে কেন ইয়াসুহারু এই মেয়ের প্রেমে পড়েছে। সে নিজে সেই সব পুরুষের সাথে একবার দেখা করতে চায় যাদের এরকম মেয়ের সাথে সাক্ষাৎ হওয়ার পরেও মনে কোনো রকম অনুভূতি আসে না।

সেই সাদা পোশাক পরা মেয়েটা তাদেরকে দেখানোর জন্য কিছু পোশাক নিয়ে এলো। এরিকে দেখাতে লাগলো সেগুলো, এরপর জিজ্ঞেস করলো কেমন লাগছে।

'যত সময় লাগে নাও,' বললো ইমায়েদা। 'এই যে এখানের এই ভদ্রমহিলার সাথে একবার কথা বলে যেটা ভালো মনে হয় সেটা ঠিক করো।'

এরি ইমায়েদার চারপাশটায় চোখ বোলালো একবার। কৌতূহলী একটা চাহনি খেলা করছে তার চোখে। *যেন আমি যা চাইবো তা তুমি দেবে?* তার চাহনিতে এটাই বোঝাচ্ছিলো।

'মি. শিনোজুকার দিনকাল কেমন যাচ্ছে এখন?' জিজ্ঞেস করলো ইউকিহো।

'ঐ সব সময়ের মতোই ব্যস্ত।'

'আচ্ছা, যদি কিছু মনে না করেন, তবে একটা প্রশ্ন করি?'

'অবশ্যই।'

'আপনি কীভাবে চেনেন তাকে?'

'আমরা বন্ধু আসলে। মাঝেমধ্যে গলফ খেলি একসাথে।'

'আহ, তাই বলুন,' মাথা দুলিয়ে বললো সে। তার চোখদুটো চলে গেল ইমায়েদার হাতে থাকা ঘড়ির দিকে। 'বেশ সুন্দর ঘড়ি আপনার।'

'ও, এটা?' আকুলতার সাথে ডান হাত দিয়ে ঘড়িটা খানিক ঢাকলো সে। 'গিফট ছিলো এটা।'

আবারো মাথা দোলালো ইউকিহো, তারপরেও ইমায়েদা বুঝতে পারলো তার হাসির মধ্যে কিছুটা পরিবর্তন এসেছে। মুহূর্তের মধ্যে তার মাথায় একটা ভাবনা এলো। মেয়েটা কি অনুমান করে ফেলেছে যে এটা কাজুনারির ঘড়ি? যদিও কাজুনারি বলে দিয়েছিলো যে এটা পরে ইউকিহোর সামনে সে কখনো যায়নি। তাহলে আর কী করে জানবে সে?

'বেশ ভালোই একটা দোকান চালাচ্ছেন এখানে,' বললো ইমায়েদা। 'দারুণ সব কালেকশন রয়েছে আপনার। বেশ জ্ঞানসম্পন্ন নারী-উদ্যোক্তা বলা যায় আপনাকে। বিশেষ করে এত অল্প বয়সে।'

'ধন্যবাদ। যদিও ক্লায়েন্টদের সাথে সাক্ষাৎ করার সময় এখনো কিছু সমস্যা হচ্ছে আমাদের।'

'বেশ বিনয় নিয়েই বলছেন আপনি।'

'না, না, আসলেই। এই দেখুন না, কোথায় আমার বিনয়? কফি খাবেন আপনি? ঠান্ডা কফি আর চা আছে আমাদের কাছে। অথব গরম কিছু, যদি চান আর কি।'

'অনেক ধন্যবাদ। আমি একটা কফি নেবো, গরম।'

'এক্ষুনি আনছি। ঐ ওখানে গিয়ে বসুন,' ইউকিহো দোকানের এককোনায় থাকা সোফার দিকে নির্দেশ করে বললো।

সোফায় গিয়ে বসলো ইমায়েদা। ইতালিয়ান স্টাইলে বানানো সোফাটা, ছোট ছোট পায়া সমেত। ওটার দ্বিগুণ সাইজের একটা টেবিল রাখা আছে পাশে। উপরের গ্লাসের ভেতর দিয়ে নেকলেস, ব্রেসলেট আর ওরকম জিনিসপাতি রাখা আছে যাতে কাস্টমার এসে দেখতে পারে। কোনো রকম প্রাইস-ট্যাগ দেখা গেল না, কিন্তু এগুলো যে বিক্রির জন্যই রাখা হয়েছে তা নিশ্চিত। এতে সন্দেহ নেই যে এগুলো এখানে রাখার একমাত্র কারণ হলো দোকানের এপাশটায় কোনো কাস্টমার রেস্ট নিতে এলে যেন তাদের চোখে পড়ে।

ইমায়েদা পকেট থেকে মার্লবোরোর প্যাকেট বের করে একটা সিগারেট মুখে নিলো। তাতে আগুন ধরানোর জন্য লাইটারটাও বের করলো সে। এই লাইটারও কাজুনারির কাছ থেকে ধার করা। আগুন ধরিয়ে লম্বা একটা টান দিলো ওতে। ধোঁয়ায় ভরে গেল তার ফুসফুস। টের পেল তার স্নায়ু শান্ত হচ্ছে ধীরে ধীরে। বুঝতেই পারেনি কতটা উত্তেজিত ছিলো সে। *আর তাও একটা নারীর জন্য।*

ও হতবাক হয়ে ভাবছে যে এরকম প্রাকৃতিক লাবণ্য আর মার্জিত ভাব কোথায় পেয়েছে মেয়েটা? এত উজ্জ্বল দীপ্তি ছড়ানোর কারণটাই বা কী?

হঠাৎ সেই দুই-তলা ভবনের অ্যাপার্টমেন্টের চিত্রটি ভেসে উঠলো ইমায়েদার মাথায়। ইওশিদা হাইটস। ১৯৫০-এর কোনো সময়ে হয়তো বিল্ডিংটা বানানো

হয়েছিলো। গত সপ্তাহে সেখানে একবার গেছিলো ইমায়েদা, ইউকিহোর অতীত সম্পর্কে হালকা খোঁজ নিতে।

কয়েকটা পুরোনো বাড়ি ছিলো আশেপাশে, বেশিরভাগই যুদ্ধের আগে বানানো বিল্ডিং। সেখানকার কারো কারো মনে ছিলো ইওশিদা হাইটসের ১০৩ নাম্বার ইউনিটে এই মা আর মেয়ের থাকার কথা।

তার মায়ের শেষ নাম নিশিমোতো। যার অর্থ, ইউকিহোর আসল নাম আসলে ইউকিহো নিশিমোতো।

ইউকিহোর বয়স যখন খুব অল্প, তখন তার বাবা মারা যায়। তার মা ফুমিও নিশিমোতোর সাথে একাই থাকতো সে। মহিলা কয়েকটা পার্ট-টাইম কাজ করতো পরিবার চালানোর জন্য। ইউকিহো যখন সিক্সথ গ্রেডে ছিলো, তখন ফুমিও গ্যাস পয়জনিংয়ের কারণে মারা যায়। অফিশিয়ালি ওটা একটা দুর্ঘটনা বলেই জেনেছিলো ইমায়েদা, কিন্তু সেখানকার এক মহিলা তাকে একটা গুজব সম্পর্কে বলে। মহিলার মতে, ওটা নাকি আত্মহত্যা ছিলো।

'সব রকমের ঔষধ খেয়ে ফেলেছিলো, বুঝলেন?' সেই মহিলা বলেছে তাকে। 'এছাড়াও আরো অনেক কিছু শোনা যাচ্ছিলো। বেশিরভাগই তার মৃত স্বামী এবং অন্যান্য বিষয় নিয়ে। তবে জানা যায়নি যে আসলে কী হয়েছিলো।'

বাড়িটা পর্যবেক্ষণ করার জন্য একটু কাছাকাছি চলে গেছিলো ইমায়েদা। ওটার পেছন দিকে কেউ জানালা খোলা রেখেই চলে গেছে। যার কারণে একটু ভালো করেই দেখতে পায় সে ভেতরটা। ইউনিটটা বেশ ছোট, কিচেনের পাশে ছোট্ট একটা রুম। একটা পুরোনো ড্রেসার আর বাঁশের কঞ্চি দিয়ে বানানো ঝুড়ি দেখতে পায় সে। দেখেই বোঝা যাচ্ছিলো বেশ বয়স সেগুলোর। রুমের মধ্যে ছোট্ট একটা টেবিল রাখা, যেটার উপরে একটা গ্লাস আর কয়েকটা ঔষধ রেখে গেছে কেউ। লোকজনের কাছ থেকে শুনেছে, সেখানে যে বাস করতো, সে নাকি ইওশিদা হাইটসের সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ বাসিন্দা।

ও কল্পনা করার চেষ্টা করছে যে এরকম একটা ছোট্ট রুমে স্কুলপড়ুয়া একটা মেয়ে আর তার ত্রিশোর্ধ্ব মা একসাথে বাস করছে। ছোট টেবিলটার উপরে স্কুলের হোমওয়ার্ক করছে বাচ্চা মেয়েটা। আর তার পেছনে তার মা কিছু একটা রান্না করছে...

হঠাৎ তার বুকটা মোচড় দিয়ে উঠলো। আরেকটা বিষয় শুনেছে সে, যেটা এইমাত্র মনে পড়লো। ইওশিদা হাইটসের আশেপাশের মানুষ তাকে এ বিষয়ে বলেছিলো। একটা খুনের কথা।

ফুমিওর মৃত্যুর ঠিক বছরখানেক আগে ঘটেছিলো সেই হত্যাকাণ্ড। ভিক্টিম একটা পনশপ চালাতো আর ফুমিওর সাথে মাঝেমধ্যে দেখা করতো। এজন্যই

ফুমিওকেও সন্দেহভাজনদের তালিকায় রাখা হয়েছিলো তখন। তবে গ্রেপ্তার করা হয়নি তাকে।

'কিন্তু পুলিশ যখন বারবার তাকে জেরা করতে আসছিলো, চারপাশে গুজব ছড়িয়ে পড়ে তখন। মানুষজন ভাবতে থাকে যে সেই হত্যার সাথে হয়তো জড়িয়ে আছে ফুমিও। শুনেছিলাম সেই ঘটনার পর চাকরি পেতে অনেক কষ্ট হচ্ছিলো তার। বেচারি,' সিগারেটের দোকান চালানো এক লোক বলেছিলো তাকে।

ইমায়েদা পরে লাইব্রেরিতে গিয়ে সেই হত্যার ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে পুরোনো নিউজপেপার ঘাঁটাঘাঁটি করতে শুরু করে। ফুমিওর মৃত্যুর এক বছর আগের ঘটনা, মানে ১৯৭৩ সালের। শরতের সময় ঘটেছিলো হত্যাকাণ্ডটি।

আর্টিকেল খুঁজে পেতে ততটা সময় লাগেনি। রিপোর্ট অনুযায়ী, মৃতদেহটি ওয়ে শহরের একটা নির্মাণাধীন বাড়ির ভেতর পাওয়া গেছিলো। ভিক্টিমকে কয়েকবার ছুরিকাঘাতের মাধ্যমে হত্যা করা হয়েছে, কিন্তু হত্যার সরঞ্জাম খুঁজে পাওয়া যায়নি। ভিক্টিম, মানে ইওসুকে কিরিহারা দুপুরের কিছু পরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর আর বাড়ি ফেরেনি বলে জানা যায়। লোকটার স্ত্রীই পুলিশ ডাকে। হালকা-পাতলা কিছু টাকা-পয়সা ভিক্টিম সব সময়ই সাথে রাখতো, কিন্তু সেদিন নাকি অনেকগুলো টাকা ব্যাংক থেকে তুলেছিলো লোকটা। যেটা প্রমাণ করে খুনি তাকে চিনতো। ইমায়েদা কেস সলভ হওয়ার মতো কোনো খবর খুঁজতে শুরু করে, কিন্তু একটাও খুঁজে পায় না। তার মানে সেই সিগারেট বিক্রেতার কথাই ঠিক ছিলো। খুনিকে ধরা যায়নি।

যেহেতু ফুমিও নিশিমোতো পনশপে নিয়মিত যাতায়াত করতো, সেহেতু ইমায়েদা বুঝতে পারে কেন পুলিশ তাকে এতবার জেরা করেছিলো। নিশিমোতো চাইলেই স্বাভাবিক ভঙ্গিতে ভিক্টিমের কাছাকাছি যেতে পারতো এবং ছুরি দিয়ে খুন করতে পারতো। কিন্তু মানুষ যেভাবে বলাবলি করছিলো, তাতে তার মনে হচ্ছিলো ফুমিও নিশিমোতোও এক্ষেত্রে একজন ভিক্টিম মাত্র।

বর্তমানে ফিরে এসে উপরে তাকাতেই দেখলো কেউ একজন আসছে তার দিকে। কফির ঘ্রাণ নাকের মধ্যে বাড়ি দিতে লাগলো তার। বিশ বছরের কিছু বেশি বয়স হবে–এমন একটা মেয়ে অ্যাপ্রোন পরা অবস্থায় তার সামনে এসেছে। হাতে কফির ট্রে। অ্যাপ্রোনের নিচে টাইট-ফিটিং টি-শার্ট পরা, যার উপর দিয়ে দেহের প্রত্যেকটা ভাঁজ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

'ধন্যবাদ।' কাপটা নেওয়ার জন্য হাত বাড়িয়ে দিলো সে। এরকম একটা জায়গায় থাকার কারণে তার মনে হলো কফিটাও বুঝি একটু দামি দামি ঘ্রাণ ছড়াচ্ছে। 'দোকান চালানোর জন্য সব সময় তিনজন করেই থাকেন আপনারা?'

'বেশিরভাগ সময়ই বলতে গেলে তিনজন থাকতে হয়,' বললো মেয়েটা। 'যদিও মিস কারাশাওয়া আমাদের আরেকটা বুটিকের দোকানে থাকেন মাঝেমধ্যে।'

'সেটা কোথায়?'

'ডাইকানায়ামাতে।'

ডাইকানায়ামা, টোকিও শহরের পশ্চিম দিকের আরেকটা ব্যস্ত এলাকা। 'দুটো দোকান? তাও তার মতো বয়সে?' বললো ইমায়েদা। 'বেশ দারুণ বিষয়টা।'

'আসলে আমরা বাচ্চাদের জন্য আরেকটা দোকান খুলছি সামনে, মানে আমাদের তিন নাম্বার দোকান হবে সেটা। জিউগাওকাতে খুলবো সেটা।'

'বাহ! নিশ্চয়ই মিস কারাশাওয়ার কোথাও সোনার ডিম পাড়া হাঁস রয়েছে, যেখানে থেকে সোনার ডিম পাচ্ছে সে।'

'উনি আসলেই বেশ পরিশ্রম করেন। আমি ভেবে পাই না কখন আসলে ঘুমান তিনি,' হালকা পেছনে তাকিয়ে ধীর গলায় বললো সে। 'এনজয়।' বলেই তাকে একা রেখে চলে গেল সে।

কফিতে চুমুক দিলো ইমায়েদা। তার অফিসের পাশের ক্যাফে থেকে বেশ ভালো এটা।

ইমায়েদার মনে হলো যতটুকু মিতব্যয়ী ইউকিহোকে দেখায়, তার থেকে ঢের বেশি মিতব্যয়ী সে। বেশিরভাগ ব্যবসায়ীই এমন। আর এই বিষয়টা ইওশিদা হাইটসে থাকতেই আয়ত্ত করে নিয়েছিলো সে।

তার মা মারা যাওয়ার পর তার নিকট আত্মীয় রেইকো কারাশাওয়া তার দায়িত্ব নেন। ইউকিহোর বাবার বোন ছিলেন তিনি।

তার পরের ট্রিপেই ইমায়েদা কারাশাওয়া হাউজে একবার ঢু মেরে আসে। ছোট একটা বাগান সমেত একদম নিখুঁত জাপানি স্টাইলের বাড়ি। দরজার সামনে সাইনবোর্ড টানানো দেখেই বোঝা যাচ্ছিলো ভেতরে *চা পানের রীতি* শেখানো হয়।

সেখানেই ইউকিহোর পালক মা তাকে *চা পানের রীতি*, *ফুল সাজানোর রীতি*-সহ বিভিন্ন রীতি শিখিয়েছিলেন, যা তার পরবর্তী জীবনে দরকার পড়তো। ইমায়েদা বুঝতে পারছে, এখানে থাকার সময়ই ইউকিহোর ভেতর নারীত্ব ফুটে উঠেছিলো।

যেহেতু রেইকো কারাশাওয়া জীবিত ছিলেন, তাই ইমায়েদা আশেপাশের মানুষকে প্রশ্ন করার বিষয়ে কিছুটা সতর্ক হয়ে নেয়। যদিও ইমায়েদার বুঝতে সমস্যা হলো না যে ইউকিহোর সেই কারাশাওয়া পরিবারে যাওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু ছিলো না। কারণ যারা তাকে চিনতো, তাদের অধিকাংশই এতটুকু বলতো যে 'বেশ নম্র স্বভাবের মেয়ে সে'।

কারো আসার কারণে ইমায়েদা উপরে তাকিয়ে দেখলো, এরি সুগাওয়ারা একটা কালো ভেলভেটের ড্রেস পরেছে। ড্রেসের পাড়টা এত উপরে যে তার পায়ের অনেকটা অংশই দেখা যাচ্ছে।

'আপনি নিশ্চিত যে এটা পরে অফিসে যেতে পারবেন আপনি?'

‘একটু বেশিই উপরে উঠে গেছে, হাঁহ?’

‘এটার মধ্যে দেখলে কেমন দেখায়?’ আরেকটা পোশাক দেখাতে নিয়ে বললো পাশে থাকা মহিলাটা। সাদা কলারের একটা নীল জ্যাকেট। ‘এটার সাথে হাঁটু পর্যন্ত পরা যায় এমন পোশাক বা স্কার্টও পরতে পারেন চাইলে।’

‘হুমমম...’ চিবুক ডলতে লাগলো এরি। ‘পছন্দ হয়েছে এটা...কিন্তু একই রকমের দেখতে আরেকটা আছে আমার।’

‘তাহলে দুটো একই রকমের নেওয়ার কোনো মানে হয় না,’ বললো ইমায়েদা। ঘড়ির দিকে তাকালো সে। ওদের যাওয়ার সময় হয়ে গেছে প্রায়।

‘আরেকবার আসতে পারবে তুমি?’ জিজ্ঞেস করলো এরি। ‘মানে ঠিক কীরকমটা আমার কাছে আছে সেটা মনে পড়ছে না আসলে।’ শেষমেশ এই লাইনটাই বলবে বলে প্র্যাকটিস করেছিলো সে।

‘আসা যাবে, কিন্তু এত কষ্ট করে আবার আসাটা বাজে লাগে আমার কাছে।’

‘দুঃখিত। আর ধন্যবাদ এত সুন্দর করে দেখানোর জন্য,’ মহিলাটাকে উদ্দেশ করে বললো এরি।

‘আরে না, না, দুঃখিত হওয়ার মতো কিছু নেই,’ মিষ্টি হাসি দিয়ে বললো মহিলাটা।

ইমায়েদা দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো এরির আগের পোশাক পরে নেওয়ার জন্য। আবারো দোকানের পেছন থেকে ওদের সামনে এলো ইউকিহো।

‘আপনার ভাতিজির জন্য কিছু পছন্দ হলো না?’

মাথা ঝাঁকালো সে। ‘ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আসলে পছন্দ করার বেলায় ঠিকঠাক মনস্থির করতে পারে না সে।’

‘চিন্তার কিছু নেই,’ বললো ইউকিহো। ‘ঠিকঠাক জিনিস পেতে একটু-আধটু ওরকম সমস্যা সবারই হয়।’

‘হয়তো তাই।’

‘আমি সব সময় ভাবতাম যে পোশাক বা জুয়েলারি কোনো ঢেকে রাখার মতো বিষয় না যে একটা মানুষ তার ভেতর লুকিয়ে রাখবে তার পছন্দের বিষয়গুলো। যার কারণে আমরা আমাদের কাস্টমারদের সাথে কথা বলে বোঝার চেষ্টা করি যে সে আসলে কী পছন্দ করে। যাতে তাদের ভেতরটা এবং বাইরেটা দুটোই আমরা ভালো করে বুঝতে পারি।’

‘বেশ ভালো উপায় এটা, বলতেই হবে।’

‘যে ভালোভাবেই ছোটবেলা থেকে বেড়ে উঠেছে, তাকে যেকোনো পোশাকেই ভালো মানাবে। অবশ্য...’ ইমায়েদার দিকে সরাসরি তাকালো ইউকিহো, এরপর বললো, ‘এর বিপরীতটাও হতে পারে।’

মাথা দুলিয়ে অন্য দিকে চোখ ঘোরালো ইমায়েদা। হতে পারে তার পরনের স্যুট তাকে মানায়নি। অথবা এরিকে দেখে অন্য রকম লাগছিলো।

পোশাক পালটানোর রুম থেকে বেরিয়ে এলো এরি। 'চলো, যাওয়া যাক,' বললো সে।

'আপনাদের এড্রেসটা যদি দিয়ে যেতেন, তবে কোনো সেল অফার থাকলে পোস্টকার্ডের মাধ্যমে জানিয়ে দিতে পারতাম আমরা,' একটা কাগজের টুকরো এরির দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো ইউকিহো। অপ্রত্যাশিত চাহনি দিলো এরি।

'তোমার এড্রেস দিয়ে দাও, সমস্যা নেই,' বললো ইমায়েদা। 'শুধু পোস্টকার্ড গেলে আমাকে জানিয়ে দিও।'

কাগজটা নিয়ে লেখা শুরু করলো এরি।

'আসলেই আপনার ঘড়িটা বেশ সুন্দর,' বললো ইউকিহো। তার চোখ ইমায়েদার কবজির দিকে।

'হ্যাঁ, দেখে মনে হচ্ছে আপনার বেশ পছন্দ হয়েছে।'

'কারটায়ার লিমিটেড এডিশন এটা। আসলে আরেকজন লোককে আমি চিনি যার কাছেও এমন একটা আছে।'

'বলার দরকার নেই আর,' জবাব দিলো ইমায়েদা।

'আশা করি আবার আসবেন আমাদের কাছে,' বললো ইউকিহো।

'অবশ্যই, বেশ দ্রুতই আসবো।'

বাইরে বেরিয়ে এসে এরিকে তার বাড়িতে পৌঁছে দিলো ইমায়েদা। আর পকেট থেকে দশ হাজার ইয়েন বের করে দিলো তাকে। 'কয়েকটা দামি কাপড় পরার জন্য খারাপ দিইনি, কী বলো?'

'মজা করছো? অত্যাচার ছিলো ওটা। পরের বার অবশ্যই কিছু কিনে দিতে হবে তোমাকে।'

'যদি পরের বার বলতে কিছু থাকে তবেই।' বলেই গাড়ি চালু করে দিলো ইমায়েদা। আজকের দেখা করার বিষয়টা তার ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে ছিলো না। ইউকিহোকে শুধু চোখের দেখা দেখতে চেয়েছিলো সে।

তার মনে হলো দ্বিতীয়বার ওখানে যাওয়াটা বিপজ্জনক হতে পারে। কারণ ইউকিহো এমন ধরনের মানুষ, যার থেকে দূরে থাকাটাই ভালো হবে। যতটুকু সে ভেবেছিলো তার থেকেও অনেক বেশি বিপজ্জনক মেয়েটা।

***

অফিসে এসেই কাজুনারিকে ফোন করলো সে।

'তো কেমন গেল?'

'আমার মনে হয় আপনি যা বলছিলেন তা ধরতে পেরেছি, মানে অল্প কিছু আর কি,' বললো ইমায়েদা।

'কীভাবে বুঝলেন?'

'আসলেই রহস্যময় কিছু একটা আছে ওর ভেতর।'

'বুঝেছেন তাহলে?'

'হ্যাঁ। তাছাড়া, অবিশ্বাস্য রকমের আকর্ষণীয় সে। এখন বুঝতে পারছি কেন আপনার কাজিন তার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন।'

কিছুক্ষণের জন্য দুজনেই চুপ মেরে রইলো।

'আসলে,' বলতে শুরু করলো ইমায়েদা, 'একটা জিনিস জিজ্ঞেস করার ছিলো আপনার কাছে। মানে, যে ঘড়িটা আমাকে ধার দিয়েছিলেন সে বিষয়ে।'

'কী হয়েছে সেটা নিয়ে?'

'আপনি কি নিশ্চিত ইউকিহোর সামনে ওটা পরেননি কখনো? অথবা ওটার কথা বলেননি কখনো?'

'আমার তো মনে হয় না এরকম কিছু করেছি। কিছু বলেছে সে?'

ইমায়েদা পুরো ঘটনাটা বললো কাজুনারির কাছে। পুরোটা শুনে নাক দিয়ে শব্দ করলো কাজুনারি।

'ওটা যে আমার তা সে জানলে কিছুটা অবাকই হবো আমি,' বললো সে। 'যদি-না...' হঠাৎ থেমে গেল তার গলা।

'যদি-না?'

'মনে হয় মাত্র একবার পরেছিলাম ওটা...যখন সে আমার আশেপাশে ছিলো তখন আর কি। তবে সেটা তার দেখার কথা না। আর যদিও বা দেখে থাকে, তবে যথেষ্ট অবাক হবো তার মনে আছে দেখে।'

'কোথায় হয়েছিলো সেটা?'

'তার বিয়ের রিসিপশনে।'

'তার রিসিপশনে ঘড়িটা পরে গেছিলেন আপনি? এত নিশ্চিত করে কীভাবে বলছেন যে সেটা আপনার হাতে দেখেনি সে?'

'মাকোতোর সাথে কিছুক্ষণ কথা বলেছিলাম আমি। তার কাছাকাছি যাওয়ার সুযোগ হয়নি। ঐ যখন নতুন দম্পতিরা মোম-টোম জ্বালানো টেবিলের দিকে এগিয়ে যায়, তখন গেছিলাম–মানে ঐ রিসিপশনে যা যা করে আর কি সে সময়ে। পুরো ঘরের আলো সেদিন নেভানো ছিলো, আর সেসবের মধ্যে ঘড়িটা কেন দেখবে বা মনে রাখবে তাই তো বুঝতে পারছি না আমি।'

'আচ্ছা, সমস্যা নেই। অতটা চিন্তা করার কোনো জিনিস না এটা।'

'আমারও মনে হয় না।'

ইমায়েদা খানিকক্ষণ মাথা দুলিয়ে হাতে ধরে রাখলো রিসিভারটা। কাজুনারিকে সুপুরুষ বলেই মনে হয় তার। যদি সে বলে থাকে ইউকিহো ঘড়িটা দেখেনি, তবে তাই বিশ্বাস করে নেবে ইমায়েদা।

'অনেক দুঃখিত আপনাকে এসবের মধ্যে ফেলে দিয়েছি বলে,' বললো কাজুনারি।

'এসব কিছুই আমার কাজের অংশ,' বললো ইমায়েদা। 'সত্যি বলতে, আমার নিজেরও কিছুটা আগ্রহ জন্মেছে তার ব্যাপারে। আবার অন্য কিছু ভেবে নেবেন না যেন। আমি তার প্রেমে পড়িনি। আমার শুধু...মনে হচ্ছে আসলেই সবার অগোচরে কিছু একটা হচ্ছে।'

ওপাশে চুপচাপ হয়ে রইলো কাজুনারি, কোনো সাড়াশব্দ নেই। কয়েক মুহূর্ত বাদে বললো, 'ধন্যবাদ। আর কিছু পেলে আমাকে জানাবেন দয়া করে।'

'অবশ্যই জানাবো।' বলেই ফোন রেখে দিলো ইমায়েদা।

তার দুই দিন বাদে একজনের সাথে দেখা করতে ওসাকাতে গেল ইমায়েদা। যার কথা সেই কারাশাওয়া বাড়ির পাশের একজনের কাছ থেকে জেনেছে সে।

ওখানে এক বেকারির মহিলা তাকে বলেছে যে তার একজনের সাথে কথা বলা উচিত। 'মিসেস মুতুকার মেয়ে। সেও সেইকা কলেজে পড়তো। হয়তো কারাশাওয়া মেয়েটা সম্পর্কে সে ভালো জানবে। আমার মনে হয় একই বয়স তাদের। সরি, এক্ষেত্রে নিশ্চিত না আমি।'

মেয়েটার নাম কুনিকো, সেই বেকারিতে প্রায়ই আসা-যাওয়া করে। সেই মহিলা আরো বলেছে যে মেয়েটা পেশায় ইন্টেরিয়র ডিজাইনার এবং শহরের বড় একটা রিয়েল এস্টেট এজেন্সিতে চাকরি করে।

টোকিওতে ফিরে গিয়ে সেই এজেন্সিতে খোঁজ লাগায় ইমায়েদা। কিছু সময় লাগে, কিন্তু শেষমেশ সেখান থেকে কুনিকোর নাম্বার জোগাড় করে ফোন করে সে। ফ্রিল্যান্সার রাইটার হিসেবে নারীদের নিয়ে একটা ফিচার লিখছে বলে নিজের পরিচয় দেয় ইমায়েদা।

'আসলে আমরা কিছু এলিট স্কুল থেকে পড়ুয়া নারীদের নিয়ে কাজ করছি যারা তাদের কাজের মাধ্যমে স্বনির্ভর হয়েছে। টোকিও আর ওসাকার আশেপাশের নারীদের নিয়ে কাজ করার সময় আপনার নামটা উঠে আসে আমাদের কাছে।'

কুনিকো অবাক হলেও কিছুটা নাখোশ হয়। জানতে চায় তার নাম কে বলেছে।

'সরি, তা বলা যাবে না। সোর্সের গোপনীয়তার বিষয় আর কি। আপনাকে জিজ্ঞেস করতে পারি যে কোন বছরে আপনি সেইকা থেকে গ্র্যাজুয়েট হয়েছেন?'

'১৯৮১।'

মনে মনে খুশি হয় ইমায়েদা। ইউকিহোও একই বছরে পাশ করেছে।

'আপনি কি মিস কারাশাওয়া নামের কাউকে চেনেন?'

'ইউকিহোর কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, চেনেন আপনি তাকে?'

'হ্যাঁ, যদিও একই ক্লাসে ছিলাম না আমরা কখনো। কিছু হয়েছে তার?'

ইমায়েদা বুঝতে পারে মেয়েটার গলায় সতর্কতার আভাস।

'হ্যাঁ, আসলে তার ইন্টারভিউটাও নিতে হতো আমাদের। শুনেছি কয়েকটা বুটিকশপ চালায় সে টোকিওতে।'

'ওহ, না, ওর ব্যাপারে জানা নেই কিছু।'

'যাই হোক,' বলে ইমায়েদা। 'ভাবছিলাম আপনার সাথে দেখা করবো একবার। সর্বোচ্চ ঘণ্টাখানেকের মতো সময় লাগবে আমার। আপনি যা করেন সে সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জিনিস জানা দরকার ছিলো আর কি। আপনার দৈনন্দিন জীবন কেমন যাচ্ছে, কী করেন–ঐ আর্টিকেলের জন্য সেসব দরকার। আপনার শিডিউলটা সে অনুযায়ী ঠিক করে বলুন।'

একটু দ্বিধাবোধ নিয়েই রাজি হয় কুনিকো।

***

কুনিকো যে অফিসে কাজ করে সেটা মূল ওসাকার একপাশের শহর সেনবার সাবওয়ে স্টেশন থেকে কয়েক মিনিটের পথ। পাইকারি বিক্রেতা আর আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য বিখ্যাত এই এলাকা। রাস্তার পাশে হোটেল দিয়ে একেবারে ঠাসা। এমনকি এই অর্থনৈতিক মন্দার সময়েও কোনো নারী বা পুরুষ উদ্যোক্তাকে দেখে মনে হচ্ছে না তাদের মাথায় বিনিয়োগ করা ছাড়া দ্বিতীয় কোনো চিন্তা আসছে।

যে কোম্পানিতে সে কাজ করে সেটা বেশ সফল বলা যায়। এস্টেট এজেন্সি কর্তৃক প্রদত্ত বিল্ডিংয়ের বিশ তলায় তার অফিস। ইমায়েদা বিল্ডিংয়ের নিচ তলার এক ক্যাফেতে বসে অপেক্ষা করতে লাগলো কুনিকোর আসার জন্য।

সাদা জ্যাকেট পরা অবস্থায় একটা মেয়ে যখন ক্যাফেতে ঢুকলো, তখন ঘড়িতে পাঁচটা বেজে এক মিনিট। চশমা পরে আছে সে, যদিও ফ্রেম কিছুটা বড় থাকায় তার চেহারার সাথে যাচ্ছে না। মেয়ে হিসেবে যথেষ্ট লম্বা সে। ইমায়েদা ফোনে কথা বলার সময় যেরকমটা কল্পনা করেছিলো, তেমনই লাগলো তাকে দেখতে। পাতলা দুটো পা-ও রয়েছে তার। বেশ আকর্ষণীয় বলা চলে।

ইমায়েদা উঠে গিয়ে নিজের বিজনেস কার্ডটা এগিয়ে দিলো। ওটাতে ফ্রিল্যান্সার হিসেবে পরিচয় রয়েছে তার। কার্ডে যে নাম দেওয়া আছে ওটা নকল নাম।

একটা দুধ চা অর্ডার দিলো কুনিকো।

'ধন্যবাদ এতটুকু সময় আমাকে দেওয়ার জন্য,' বললো ইমায়েদা।

'সমস্যা নেই, সময়টা আপনার কাজে লাগলেই হলো,' বললো কুনিকো। তার গলায় ওসাকার নিখুঁত টান রয়েছে।

'আমার তাতে কোনো সন্দেহ নেই যে সময়টা ভালোই কাজে দেবে আমার। এই প্রজেক্টের জন্য বেশ কয়েকজন মানুষের ইন্টারভিউ নিচ্ছি আমি।'

'সে বিষয়ে আসলে একটা প্রশ্ন ছিলো আমার,' বললো সে। 'আমার আসল নামটা কি আর্টিকেলে আসবে?'

'আমাদের স্বাভাবিক নিয়ম হচ্ছে ছদ্মনাম ব্যবহার করা, যদি-না আপনি আপনার আসল নাম ব্যবহার করতে চান।'

বেশ দ্রুত মাথা ঝাঁকালো সে। 'না, না, ছদ্মনামই ঠিক আছে।'

'আচ্ছা, শুরু করা যাক তবে।'

ইমায়েদা একটা নোটবুক আর কলম বের করে সেসব প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে লাগলো, যেসব সে আসলেই এরকম কোনো আর্টিকেল লিখলে করতো। কুনিকো প্রত্যেকটা প্রশ্নের বেশ সুন্দর জবাব দিচ্ছে। ওর জবাব শুনে ইমায়েদা কিছুটা অনুশোচনার মধ্যে পড়ে গেল। ফলে পরের প্রশ্নগুলোর জন্য আরেকটু বেশি মনোযোগ দেওয়া শুরু করলো সে। যার কারণে একজন ইন্টেরিয়র ডিজাইনার হওয়ার সুবিধা এবং এস্টেট এজেন্সিতে তার টিমের সাথে কাজ করাটা কতটুকু মূল্যবান তার সবটুকুই জেনে গেল ইমায়েদা। আসলেই ইন্টারেস্টিং ছিলো বিষয়টা।

প্রায় আধা ঘণ্টা কেটে যায় এসব করতে করতে। কিছুক্ষণ চুপ থেকে কুনিকো তার চা খেতে লাগলো।

ইমায়েদা আসলে ইউকিহোর ব্যাপারটা তোলার জন্য ভালো সময়ের অপেক্ষায় ছিলো। সেদিনই সে ফোনের ভেতর ইউকিহোর কথা তুলে মূল ভিতটা তৈরি করে দিয়েছিলো, কিন্তু সামনাসামনি কীভাবে তুলবে তা বুঝতে পারছিলো না।

আর তখনই কুনিকো জিজ্ঞেস করে বসলো, 'সেদিন বলেছিলেন আপনি নাকি মিস কারাশাওয়ার ব্যাপারেও খোঁজ করছেন?'

'হ্যাঁ,' বললো ইমায়েদা। কিছুটা অবাক যে হয়নি তা না।

'বুটিক শপ চালাচ্ছে সে?'

'হ্যাঁ, টোকিওর আওইয়ামাতে।'

'বাহ, ভালোই উন্নতি করেছে তাহলে,' বললো কুনিকো। তার চেহারাটা শক্ত হয়ে গেল হঠাৎ।

স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে এই মেয়েটার ভেতর ইউকিহোর প্রতি ততটা ভালোলাগা কাজ করে না। আর এটাই দরকার ছিলো–ইমায়েদা চাচ্ছিলো এমন কারো সাথে ইউকিহোর অতীত নিয়ে কথা বলতে যে কিনা রাখঢাক করে কথা বলবে না।

জ্যাকেটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে ইমায়েদা জিজ্ঞেস করলো সে সিগারেট ধরালে কুনিকো কিছু মনে করবে কি না। মাথা ঝাঁকালো কুনিকো।

মার্লবোরোর একটা সিগারেট মুখে নিয়ে আগুন ধরালো তাতে–এর মানে এটা দাঁড়ায় যে মূল ইন্টারভিউ ছেড়ে এখন স্বাভাবিক কথা বলছে তারা।

'আপনি তার কথা তুললেন দেখে একটু মজা পেয়েছি,' বললো ইমায়েদা। 'আসলে তার সম্পর্কে জানার ক্ষেত্রে আমাদের কিছু সমস্যা হচ্ছিলো।'

ভ্রু তুলে তাকালো কুনিকো। 'কীরকম সমস্যা?'

'তেমন কিছুও না,' বললো ইমায়েদা। 'আসলে কয়েকজনের সাথে তার ব্যাপারে কথা বলে দেখলাম তারা তেমন একটা পছন্দ করে না তাকে।'

'ওহ, কোন দিক দিয়ে পছন্দ করেনি তাকে?'

'মনে হয় এত অল্প বয়সে এতগুলো ব্যবসা চালাচ্ছে, হয়তো হিংসা করে তাকে লোকে। আর আমার মনে হয় কিছু মানুষকে বলির পাঁঠা করে সে তার আজকের জায়গায় গেছে। রাজ্য পরিচালনার মতো আর কি, হেহ,' কফিতে চুমুক দিয়ে বললো ইমায়েদা। 'জানেন, আমরা এদিক-সেদিক থেকে কিছু মন্তব্য শুনছি ওর ব্যাপারে। যেমন, "নিজের টাকার বিষয়ে সে খুব কঠোর", অথবা "নিজের লাভের জন্য যে-কাউকে ব্যবহার করতে সে পিছপা হয় না।"'

'বুঝেছি।'

'অবশ্য, আমরা তাকে নিয়েও একটা আর্টিকেল লিখবো, কিন্তু ভাবছি আসলেই কোনো খারাপ খবর না বেরিয়ে আসে। জানেন, এডিটরদের কেউ কেউ তো তার আর্টিকেল ছাপানোর ব্যাপারেই না করে দিয়ে। এখন আমিও ভেবে পাচ্ছি না কী করবো।'

'আমার মনে হয় উলটা-পালটা কিছু বেরিয়ে এলে ম্যাগাজিনের জন্য সেটা ভালো হবে না।'

'সেটাই,' কুনিকোর চেহারার দিকে একবার লক্ষ করে বললো সে। দেখে মনে হচ্ছে না তার ক্লাসমেট সম্পর্কে এমন সব মন্তব্য করায় সে অস্বস্তিতে ভুগছে। 'আপনি তো তার সাথে মিডল স্কুল আর হাই স্কুলে পড়েছিলেন, না?'

'হ্যাঁ।'

'তার সম্পর্কে বলার মতো কিছু মনে আছে আপনার? মানে তখন কি ওকে দেখে মনে হতো যে পরবর্তী জীবনে কোনো সমস্যায় জড়িয়ে পড়তে পারে? সমস্যা নেই, এসবের কিছুই আর্টিকেলে উঠবে না, কথা দিচ্ছি।'

'ততটা আসলে নিশ্চিত করে বলতে পারছি না,' কপাল কুঁচকে বললো কুনিকো। ঘড়ির দিকে তাকালো একবার। 'যেমনটা ফোনে বলেছি আপনাকে, আমরা এক ক্লাসে ছিলাম না। কিন্তু ওর সম্পর্কে জানতাম অবশ্যই। স্কুলের সবাই জানতো তার ব্যাপারে। ছোটখাটো সেলিব্রিটিই ছিলো সে সময়।'

'কী করে বলছেন তা?'

'ওটা আসলে...' কয়েকবার পলক ফেললো সে। 'দেখে মনে হতো আর কি। পাশের একটা স্কুলের কয়েকটা ছেলে তার নামে ফ্যান ক্লাবও খুলেছিলো।'

'ফ্যান ক্লাব?' হাসলো ইমায়েদা। যদিও ইউকিহোর সাথে দেখা হওয়ার পরে ততটা অবাক হয়নি।

'শুনেছি ভালো ছাত্রীও ছিলো সে। আমার এক বন্ধু তার ক্লাসে মিডল স্কুল থেকে পড়তো। তার কাছ থেকে শুনেছিলাম।'

'তার মানে ভালোই খ্যাতি ছিলো।'

'হ্যাঁ, তবে সরাসরি তার সম্পর্কে কিছু দেখা বা শোনা হয়নি। আমার মনে হয় না সামনাসামনি কখনো কথা বলেছি আমরা।'

'আপনার সেই বন্ধুটি কিছু বলেছে তার ব্যাপারে?'

'না, কখনোই কোনো খারাপ কিছু বলতো না সে ইউকিহোর ব্যাপারে। শুধু কতটা ভাগ্যবান হয়ে জন্মেছে এই টাইপ কথা বলতো আর কি।'

'সে কখনো খারাপ কিছু বলেনি...তাহলে অন্য কেউ?'

এক মুহূর্তের জন্য ভাবনায় পড়ে গেল কুনিকো।

'মিডল স্কুলে থাকতে ওর সম্পর্কে একটা অস্বাভাবিক গুজব ছড়িয়েছিলো,' খুব আস্তে করে বললো কুনিকো।

'কীরকম গুজব?'

মেয়েটা সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকালো ইমায়েদার দিকে। 'আপনি কসম কেটে বলেন তো এসব আর্টিকেলে দেবেন না?'

'কথা দিচ্ছি, দেবো না,' বললো সে।

একটু দম নিলো কুনিকো। 'শুনেছি সে নাকি তার অতীত নিয়ে মিথ্যা বলতো।'

'কীরকম?'

'সবাই বলতো সে নাকি খুবই দরিদ্র পরিবারে জন্মেছিলো, আর সেটা লুকিয়ে রেখে চলতো সব সময়।'

'তার আত্মীয় যে তাকে ছোটবেলায় পালতে এনেছিলো, কেবল সেজন্যেই যে লোকে এসব বলতো না তা কি আপনি নিশ্চিত?'

একটু কাছে সরে এলো কুনিকো। 'হ্যাঁ, ঐ ব্যাপারটা তো ছিলোই। কিন্তু আসল সমস্যাটা হয়েছিলো যে বাড়িতে সে জন্মেছিলো ওখানে। ওরা বলতো যে তার আসল মা নাকি পুরুষদের ঘরে এনে ওসব করে টাকা কামাতো।'

'বুঝতে পেরেছি,' বললো ইমায়েদা। বেশি যেন অবাক না হয়ে যায় সেদিকেও খেয়াল রাখলো। 'আপনি বলছেন যে কারো মিস্ট্রেস ছিলো সে?'

'কোনো একজনের না, অনেক মানুষের। আর হ্যাঁ...এটা গুজব ছিলো অবশ্যই,' যোগ করলো সে আগের কথার সাথে। 'তাছাড়া,' আবার বলতে লাগলো, 'সেই সব লোকদের মধ্যে একজন নাকি খুনও হয়েছিলো।'

এবার অবাক হওয়ার অভিনয় করলো ইমায়েদা। 'সত্যি?'

মাথা দোলালো সে। 'আর তার জন্যই ইউকিহোর মাকে পুলিশ জেরাও করেছিলো।'

সেই পনশপ মালিকের কথা বলছে নিশ্চয়ই, জ্বলন্ত সিগারেটের দিকে তাকিয়ে ভাবলো ইমায়েদা। তার মানে ফুমিও নিশিমোতো শুধু পনশপের একজন কাস্টমার ছিলো বলেই তাকে এত জেরা করেনি পুলিশ–যদি গুজব সত্যি হয়ে থাকে তো।

'দয়া করে কাউকে বলবেন না যে এসব আমি আপনাকে বলেছি।'

'বলবো না, ওয়াদা করছি।' ওর দিকে তাকিয়ে হাসলো ইমায়েদা। তারপর আবার চোখেমুখে সিরিয়াসনেস নিয়ে এলো। 'তারপরেও বেশ বড় একটা গুজব কিন্তু। তা এর জন্য তার কোনো সমস্যা হয়নি?'

'আমার দেখামতে তো না। মানে কথা ছড়িয়ে পড়েছিলো ঠিকই, কিন্তু তা বিভিন্ন সার্কেলের ভেতরেই থাকতো। আর তাছাড়া, সবাই জানতো এই গুজব কে ছড়িয়েছে।'

'তারাই যারা বলাবলি করতো?'

'হ্যাঁ। একটা মেয়ে ছিলো যার কোন আত্মীয় নাকি ইউকিহো *যেখানে বেড়ে* উঠেছিলো সেখানে থাকতো। আর সেখান থেকেই জেনেছিলো সে। আমার তার সাথে তেমন পরিচয় ছিলো না। আমি শুনেছি আমার এক ফ্রেন্ডের কাছ থেকে।'

'সেই মেয়েটাও কি সেইকাতে পড়তো?'

'আমাদের ক্লাসমেট ছিলো সে।'

'তার নাম কী ছিলো?'

'বলা উচিত হবে না মনে হচ্ছে।' টেবিলের নিচে তাকালো কুনিকো।

'অবশ্যই, অবশ্যই, দুঃখিত,' বললো ইমায়েদা। সিগারেটের ডগায় থাকা ছাইটা অ্যাশট্রেতে ফেললো। 'তারপরও তো বেশ বড় একটা গুজব। তো তার কি মনে হয়নি এটা ইউকিহোর কান অবধি পৌঁছাবে?'

'ওহ, ঐ মেয়েটা ইউকিহোর শত্রুই ছিলো তখন। ঐ মেয়ে নিজেই সবকিছুতে বেশি বেশি পেয়ে আসছিলো, তাই প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে নিয়েছিলো ইউকিহোকে।'

'শুনে মনে হচ্ছে কোনো ক্লাসিক গার্লস স্কুল স্টোরি শুনছি।'

হাসলো কুনিকো। 'পেছনের কথা ভেবে মনে হচ্ছে আসলেই এরকম কিছুই চলতো তখন।'

'তো শেষমেশ তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার কী হয়েছিলো?'

'শুনলে হাসবেন আসলে,' বললো কুনিকো। এরপর অনেকক্ষণ চুপ মেরে রইলো সে। বেশ কিছু মুহূর্ত কাটার পরে মুখ খুললো, 'একটা ঘটনা ঘটে সে সময়। ঘটনাই বলতে পারেন চাইলে। সে ঘটনাটা ঘটার পর তারা বন্ধু হয়ে যায়।'

'ঘটনা?'

চারপাশে তাকালো একবার কুনিকো। ওদের টেবিলের আশেপাশে কেউ বসে নেই। 'যে মেয়েটা এই গুজব ছড়িয়েছিলো, তাকে আক্রমণ করে বসে কারা যেন।'

কাছে এগিয়ে এলো ইমায়েদা। 'আক্রমণ বলতে কী বোঝাচ্ছেন?'

'আসলে কয়েক দিনের জন্য সে স্কুলে অনুপস্থিত ছিলো। আমাদের বলা হয়েছিলো গাড়ি দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে সে, কিন্তু পরবর্তীতে আমি শুনেছিলাম যে স্কুল থেকে বাড়ি যাওয়ার পথে আক্রমণের শিকার হয়েছিলো সে। আর সেই আঘাত থেকেই সেরে উঠতে বিশ্রাম নিচ্ছিলো।'

'কীরকম আক্রমণের শিকার হয়েছিলো সে আসলে? মানে যদি মনে করেন আমাকে বলা যাবে আর কি।'

মাথা ঝাঁকালো কুনিকো। 'আসলে বিস্তারিত তেমন জানি না আমি। কেউ কেউ বলতো তাকে ধর্ষণ করা হয়েছে, আবার কেউ বলতো সেরকম কিছু করেনি। যতটুকুই জানি তা হলো, খুব খারাপ কিছু ঘটেছিলো তার সাথে। যেখানে ঘটনাটা ঘটেছিলো, ওখানকারই কেউ একজন বলেছিলো যে পুলিশ নাকি আশেপাশে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলো তখন।'

কিছু একটা গেঁথে গেল ইমায়েদার মাথায়। ও নিশ্চিত এটা গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। 'আর এই ঘটনাই ইউকিহো আর সেই মেয়েটাকে বন্ধু বানিয়ে দিলো?'

মাথা দোলালো কুনিকো। 'ঘটনাটা ঘটার পর ইউকিহোই প্রথমে তাকে খুঁজে পায়। আর সে অসুস্থ থাকার সময় ইউকিহো কয়েকবার তাকে দেখতে গেছিলো। ওর জন্য স্কুলের নোটও দিয়ে এসেছিলো।'

মাথার মধ্যে চিন্তাগুলো সব দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দিয়েছে ইমায়েদার। শান্ত থাকার চেষ্টা করছে সে, কিন্তু তার চামড়া কুঁচকে যাচ্ছে উত্তেজনায়।

'ওকে যখন পায়, তখন কি ইউকিহো একা ছিলো?'

'না, শুনেছি এক বন্ধুর সাথে ছিলো সে।'

মাথা দুলিয়ে ঢোক গিললো ইমায়েদা। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে তার।

***

ওসাকার মূল কেন্দ্রে উমেদা স্টেশনের কাছে বিজনেস হোটেলে রাতটা কাটালো ইমায়েদা। কুনিকো মোতুকার ইন্টারভিউয়ের টেপ রেকর্ড শুনে শুনে নোট করছে সে। তার জ্যাকেটের পকেটে যে ছোট একটা রেকর্ডার ছিলো তা কুনিকো খেয়াল করেনি। আর এই পুরো সময়টা ধরেই সেটার রেকর্ড চালিয়ে রেখেছিলো ইমায়েদা।

কুনিকো হয়তো এখন থেকে প্রত্যেক সপ্তাহে ম্যাগাজিন কিনবে নিজের আর্টিকেলটা দেখার জন্য। মেয়েটার জন্য কিছুটা খারাপ লাগছে, তবে এই ভেবে ভালোও লাগছে যে অন্তত তাকে নতুন একটা স্বপ্ন দেখার সুযোগ তো করে দিয়েছে। বিছানার পাশের ফোনটা তুলে নিয়ে ডায়াল প্যাডে নাম্বার উঠাতে লাগলো সে।

তিনবার বাজতেই ফোন তুললো কাজুনারি।

'হ্যালো? মি. শিনোজুকা? ইমায়েদা বলছি। আমি ওসাকাতে আছি...হ্যাঁ। ফোন করেছি কারণ একজনের সাথে একটু দেখা করার দরকার ছিলো আমার। ভাবলাম আপনি তার নাম্বার বা ঠিকানা দিয়ে সাহায্য করতে পারবেন কি না।'

যে মেয়েটার সাথে সে দেখা করতে চাচ্ছে সে আর কেউ না, এরিকো কাওয়াশিমা।

***

ড্রায়ার থেকে শুকনো কাপড় বের করতে নিতেই দরজায় কড়া নড়ার শব্দ পেলো এরিকো। হাতভরতি কাপড় আর আন্ডারওয়্যার ঝুড়ির মধ্যে রাখলো সে।

বসার ঘরে মূল দরজার ইন্টারকমটা রাখা। ওটা তুললো সে। 'হ্যালো?'

'মিসেস টেজুকা? আমি মায়েদা বলছি। টোকিও থেকে এসেছি।'

'ওহ, দাঁড়ান, আসছি আমি।'

অ্যাপ্রোনটা খুলে নিয়ে দরজার দিকে যেতে লাগলো এরিকো। এই পুরোনো বাড়িটা কিছু দিন হলো তারা কিনেছে। মেঝেতে থাকা পাটাতনে পা পড়তেই ক্যাঁচক্যাঁচ করে ওঠা শব্দের সাথে অভ্যস্ত হচ্ছে সে ধীরে ধীরে। তার স্বামীকে বলেছিলো এটা ঠিক করতে, কিন্তু তার কাছে মনে হচ্ছে এটা ধীরে ধীরে ঠিক হয়ে যাবে।

চেইন লাগোয়া অবস্থাতেই দরজাটা খুললো সে। একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে বাইরে। শর্ট-স্লিভার শার্ট এবং তার উপর টাই পরে আছে সে। দেখে ত্রিশের কিছু উপরে মনে হচ্ছে লোকটার বয়স।

'দুঃখিত এরকম অবস্থায় আপনার কাছে আসার জন্য,' বলে উঠলো লোকটা। 'আপনার মা নিশ্চয়ই বলেছে যে আমি আসছি, তাই না?'

'হ্যাঁ, ফোন করে বলেছিলো।'

'ভালো, ভালো,' স্বস্তির হাসি দিয়ে বলে উঠলো লোকটা। একটা কার্ড এগিয়ে দিলো তার কাছে, যেটাতে লোকটার নাম লেখা কাজুরো মায়েদা, হার্ট-টু-হার্ট ম্যারেজ কাউন্সেলিং সেন্টারের একজন ইনভেস্টিগেটর।

কার্ডটা হাতে নিয়ে দরজাটা লাগিয়ে দিলো এরিকো। এরপর চেইন সরিয়ে নিয়ে আবার খুললো দরজাটা। তবুও লোকটাকে ভেতরে ঢুকতে দিতে কিছুটা অনিচ্ছুক সে। 'খুবই দুঃখিত, পুরো ঘর ময়লা হয়ে আছে আসলে।'

মাথা ঝাঁকালো মায়েদা। 'এখানেই ঠিক আছে, যদি আপনি কিছু মনে না করেন।' পকেট থেকে ছোট একটা নোটবুক বের করলো লোকটা।

আজ সকালেই তার মা তাকে ফোন করে বলেছিলো যে বাসায় একটা প্রতিষ্ঠান থেকে লোক আসবে। এই প্রতিষ্ঠান বিয়ের পূর্বে পাত্র বা পাত্রীর ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করে অপর পক্ষকে জানায়। এও জানা গেল যে প্রথমেই এরিকোর পরিবারের কাছে এসেছে লোকটা।

'লোকটা ইউকিহো সম্পর্কে জানতে চাচ্ছে আসলে,' তার মা ফোনের অপর পাশ থেকে বলেছিলো।

'ইউকিহো? কিন্তু তার তো ডিভোর্স হয়ে গেছে,' পাল্টা জবাবে বলেছিলো এরিকো।

'আর বেশি দিন হয়তো ডিভোর্সি হয়ে থাকতেও হবে না।' এরপর তার মা এও বললো যে কেউ একজন ইউকিহোকে বিয়ে করতে চায়, আর এজন্যই তার ব্যাপারে জানতে লোক পাঠিয়েছে। 'লোকটা ইউকিহোর কিছু পুরোনো বন্ধুর সাথে কথা বলতে চাচ্ছে। আমি তোমার ব্যাপারে বলে জানালাম যে তোমার বিয়ে হয়েছে, আর তুমি এখানে থাকো না। এরপরে সে জানতে চাইলো তুমি কোথায় থাকো। তাকে বললে কিছু মনে করবে না তো তুমি?'

'না, ঠিক আছে, বলে দাও।'

সেই সময়েই লোকটা তার মায়ের বাসায় ছিলো। তার মা ফোনে কিছুক্ষণ চুপ থেকে এরপর বলেছিলো, 'আচ্ছা, সে তবে আজকেই যাবে তোমার ওখানে।'

'আচ্ছা, আসুক, সমস্যা নেই।'

অন্য সময় হলে অপরিচিত কারো সাথে দেখা করার ব্যাপারে সোজা না করে দিতো সে। কিন্তু এবার একটা কারণে করেনি, আর তা হলো ইউকিহো কারাশাওয়া। বছরখানেক হবে তাদের মধ্যে কথা হয় না, আর এরিকো নিজেও জানতে চাচ্ছিলো তার পুরোনো বন্ধুটি এখন কী করছে।

কিন্তু তবুও ইনভেস্টিগেটরটা এরকম খোলাখুলি সব জিজ্ঞেস করছে দেখে কিছুটা অবাক হয়েছে সে। অথচ এরিকো সব সময় জেনে এসেছে যে এরকম খোঁজখবর নেওয়ার বিষয়গুলো খুব গোপনীয়তার সাথে করা হয়ে থাকে।

লোকটাকে সে বললো যে তার আর ইউকিহোর মধ্যে কী করে মিডল স্কুলে পরিচয় ঘটে, এবং একই কলেজে যাওয়া-আসা শুরু হয়। লোকটা সেসব নোট করতে থাকে তার ছোট খাতাটায়।

'আমি কি জানতে পারি যে কে আসলে ওকে বিয়ে করতে চাচ্ছে?' প্রশ্নপর্বের এক পর্যায়ে জিজ্ঞেস করে বসলো এরিকো।

অবাক হয়ে তাকালো মায়েদা, এরপর শুষ্ক একটা হাসি দিয়ে বললো, 'দুঃখিত, গোপনীয়তার স্বার্থে আপাতত বলা যাবে না।'

'আপাতত?'

'মানে, যদি সবকিছু ভালোভাবে হয়ে যায়, তাহলে এমনিতেই আপনারা জেনে যাবেন সে কে। কিন্তু এই মুহূর্তে তো আর বলা যাচ্ছে না যে ব্যাপারটা আদৌ...আমম...সেই পর্যন্ত গড়াবে কি না।'

'তার মানে আপনি বলছেন সেই লোকের হাতে আরো অপশন আছে?'

'ধরে নিন ওরকমই কিছু একটা।'

বোঝাই যাচ্ছে যে, যে লোক বিয়ে করতে চাচ্ছে সে খুব উঁচু স্তরের মানুষ। কারণ খুব কম মানুষই বিয়ের আগে যাচাই-বাছাই করতে লোক পাঠায়।

'আর এই বিষয়গুলো নিয়ে ইউকিহোর সাথে কথা বলা উচিত হবে না আমার, তাই তো?' জিজ্ঞেস করলো এরিকো।

'খুবই উপকার হবে যদি এসব নিজের ভেতরেই রেখে দেন,' বললো মায়েদা। 'অনেকেই এই যাচাই-বাছাই জিনিসটা ভালোভাবে নেয় না। যাই হোক, আপনার কি এখনো মিস কারাশাওয়ার সাথে কথা হয়?'

'আসলে না,' বললো সে। 'শুধু নতুন বছরে একে অপরকে কার্ড পাঠাই আমরা, এই-ই যা।'

'বুঝলাম। যদি কিছু মনে না করেন তবে একটা প্রশ্ন করি। কবে বিয়ে হয়েছে আপনার?'

'দুই বছর আগে।'

'আপনার বিয়েতে মিস কারাশাওয়া এসেছিলেন?'

মাথা ঝাঁকালো এরিকো। 'ছোটখাটো অনুষ্ঠান ছিলো আমাদের। বড় রিসিপশন করতে পারিনি। পারিবারিক অনুষ্ঠানের মতোই ছিলো সেটা। ওকে এমনি বলেছিলাম, কিন্তু কোনো ইনভাইটেশন কার্ড দিতে পারিনি। সে টোকিওতে চলে গেছিলো, আর সময়টাও ভালো ছিলো না। যার কারণে আমার মনে হয়নি...'

'সময়ের কথা দিয়ে কী বোঝালেন?' জিজ্ঞেস করলো মায়েদা। এরপরেই তার মাথায় আসতেই হালকা মাথা দোলালো সে। 'ওহ, বুঝেছি, তার তখন মাত্রই ডিভোর্স হয়েছে, না?'

'হ্যাঁ, নতুন বছরের কার্ডে লিখেছিলো সে এটা।'

যখন এ বিষয়ে শুনেছিলো এরিকো, তখন ফোন করে জানতে চেয়েছিলো। কিন্তু কাটা ঘায়ের কথা আর মনে করাতে চায়নি, যার কারণে এখনো তাদের মধ্যে কোনো কথা হয়নি। সে এখনো জানে না কী কারণে আসলে তার ডিভোর্স হয়েছে। শুধু প্রত্যেক নতুন বছরের কার্ডে ইউকিহো লিখতো: 'ফিরে যাচ্ছি সেখানে, যেখান থেকে সবকিছু শুরু হয়েছে...যেখান থেকে আবার শুরু করবো।'

কলেজে থাকা অবস্থায় প্রথম দুই বছর ইউকিহোর সাথে বেশ সময় কাটিয়েছিলো এরিকো, যেরকমটা মিডল এবং হাই স্কুলেও করেছিলো। শপিংয়ে, কনসার্টে একসাথেই যেত তারা। একজন আরেকজনের সাথে লেগেই থাকতো সব সময়। এরিকোর সাথে সেই ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর থেকে ইউকিহোর সাথে আরো জড়িয়ে পড়ে সে। সেই দিনের পর থেকে চেনে না জানে না এমন কারো সাথে ডেট করা ছেড়ে দেয় এরিকো, এমনকি নতুন বন্ধু বানাতেও ভয় পেত সে। প্রায় অনেক ক্ষেত্রেই ইউকিহো তার বাইরের জগতের সাথে মেলামেশার একমাত্র মাধ্যম হয়ে পড়ে তখন।

কিন্তু এভাবে সারা জীবন চলা সম্ভব না। আর এটা এরিকো ভালো করেই জানতো। ইউকিহোকে তার নিজের মতো জীবনযাপন করা থেকে থামাতে পারেনি সে। ওকে কিছু না বলেই ড্যান্স ক্লাবের মাকোতোর সাথে ডেট করা শুরু করে দেয় ইউকিহো। ঐ সময়ে দেখে এটাই মনে হয়েছিলো যে মাকোতোর সাথে আরো অনেক সময় পার করতে চায় সে।

ইউকিহো আর মাকোতোর এই মেলামেশা সে সময়ে এরিকোকে একটা নামই মনে করিয়ে দিচ্ছিলো যেটা সে মনে করতে চাইতো না–কাজুনারি শিনোজুকা। যখনই ওর কথা ভাবতো সে, তখনই অতল কোনো গহ্বরে ডুবে যেত তার মন।

দ্বিতীয় বর্ষের মাঝামাঝি ইউকিহোর সাথে সময় পার করা কিছুটা কমিয়ে দেয় এরিকো। প্রথম প্রথম ইউকিহোকে দ্বিধান্বিত দেখাতো, কিন্তু ধীরে ধীরে সেও দূরে সরে যেতে থাকে। হয়তো ইউকিহো ভেবেছিলো যে যদি যেরকম চলছে সেরকমটা চলতে থাকে, তাহলে হয়তো এরিকো নিজের পথ নিজে কোনোদিনও খুঁজে পাবে না। তাই সেও নিজ থেকে দূরত্ব বাড়িয়ে দেয়।

অবশ্যই তাদের মধ্যে তখনো বন্ধুত্ব ছিলো। একসাথে হলেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলতো, এছাড়াও মাঝেমধ্যে কথা বলার জন্য ফোনও করতো, কিন্তু তাও অন্য বন্ধুদের সাথে যেমন বলে তার থেকে বেশি না।

গ্র্যাজুয়েশনের পর তাদের মধ্যকার দূরত্ব আরো বেড়ে যায়। এরিকোর বাবা-মা তাকে একটা লোকাল ব্যাংকে চাকরির ব্যবস্থা করে দেয়, আর ইউকিহো চলে যায় টোকিওতে। ওখানেই মাকোতোকে বিয়ে করে।

'মিস ইউকিহোকে কেমন মানুষ বলে মনে হয় আপনার?' জিজ্ঞেস করলো মায়েদা। 'মানে আপনার অভিব্যক্তি হলেই হবে। সে কি নার্ভাস অথবা পিছু হটে যাওয়ার মতো মানুষ? সে কি গতিবিধি বুঝে চলে? সব সময় জিততে চায়? মানে ছোটখাটো বিষয়েও যা যা জানেন আর কি।'

'আমি বুঝতে পারছি না এরকম ছোট ছোট বিষয় যোগ করে একটা মানুষ সম্পর্কে আসলেই বোঝা যায় কি না।'

'তাহলে আপনি আপনার মতো করে বলতে পারেন আমাকে।'

'আচ্ছা...' একটু ভাবার জন্য থামলো এরিকো। 'বেশ শক্ত একজন মানুষ সে। ধরো-মারো-ছাড়ো প্রকৃতির মানুষ সে না। চুপচাপ থাকার মতো শক্ত। আপনি যখন তার আশেপাশে থাকবেন, আপনি নিজেও অনুভব করবেন তার ভেতরে কীরকম শক্তি উৎপন্ন হচ্ছে।'

'আর কিছু?'

'উমম, ওকে দেখলে মনে হয় সবকিছু জানে সে।'

'আচ্ছা,' চোখদুটো একটু বড় বড় করে বললো মায়েদা। 'এটা একটা ভালো গুণ যে সে অনেক কিছু জানে। ও কি অনেক জ্ঞানী?'

'না, তবে ও মানুষের সত্যিকার রূপ সম্পর্কে অনেক কিছু জানতো। সেই সাথে দুনিয়ার অন্ধকার দিক সম্পর্কেও। ওর সাথে কথা বলে অনেক সময় আমি...' পরের কথাটা বলার আগে দ্বিধায় ভুগলো সে। 'আমি অনেক কিছুই শিখেছি।'

'বুঝলাম। তারপরেও এই সবজান্তা মেয়েটা নিজের বিয়েটা টেকাতে পারেনি। এ নিয়ে আপনার অভিমত কী?' দ্রুত জিজ্ঞেস করলো মায়েদা।

স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে এই ইনভেস্টিগেটর এবং তার ক্লায়েন্ট জানতে চায় ইউকিহোর ডিভোর্স কেন হয়েছে। আর এই ডিভোর্সের পেছনে ওর নিজের দায় কতখানি।

কয়েক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে এরিকো বললো, 'আমার তো মনে হয় ওর আসলে বিয়েটা করাটাই ভুল হয়েছে।'

'কীভাবে?'

'ও আসলে পুরো ব্যাপারটায় এতটাই মগ্ন হয়ে ছিলো যে ভালো করে না ভেবেই হুটহাট বিয়ের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ব্যাপারটা ওর জন্য অস্বাভাবিক বটে। আমার তো মন হয় ও যদি সত্যিই ভেবে দেখতো, তবে এই বিয়ে করতোই না।'

'বলতে চাইছেন তার প্রাক্তন স্বামী তাকে বাধ্য করেছে বিয়ে করতে?'

'না, না, বাধ্য করেনি,' এরিকো বললো। সাবধানে শব্দচয়ন করছে এখন। 'আমার মনে হয় পরস্পরের অনুভূতির মাঝে ভারসাম্য এলে কেবল তখনই বিয়ে করা উচিত। আমার তো মনে হয় না ওদের সেটা ছিলো।'

'মানে মি. তাকামিয়া এই সম্পর্কের ব্যাপারে যতটা সিরিয়াস ছিলেন, মিস কারাশাওয়া ততটা ছিলেন না?'

'বুঝিয়ে বলাটা কষ্টকর,' ভ্রু কুঁচকে বললো এরিকো। 'কিন্তু আমি ঐ লোককে তার সত্যিকার ভালোবাসা বলতে নারাজ।'

'অদ্ভুত,' মায়েদা বললো। ওর চোখজোড়া হালকা স্ফীত হলো।

এসব বলার জন্য এখন অনুশোচনা হচ্ছে এরিকোর। 'দুঃখিত, এসবই কেবল আমার নিজস্ব মতামত। হয়তো যা বলছি তার কোনোটার সাথে আসল ঘটনা না-ও মিলতে পারে।'

চুপ হয়ে গেল মায়েদা। এরপরই মুখের ভাবভঙ্গি পরিবর্তিত হয়ে গেল তার। আগের হাসিটা মুখে এনে বললো, 'ঠিক আছে, সমস্যা নেই। আগেই বলেছি যে কেবল আপনার ব্যক্তিগত মতামতের প্রতিই আগ্রহী আমি। বুঝতে পারছি যে এসবে সরাসরি জড়িয়ে ছিলেন না আপনি।'

'তারপরেও আমার মনে হচ্ছে আমার এখন থামা দরকার। ওর কোনো সমস্যা হোক তা আমি চাই না। আমার মনে আপনি ওর বিষয়ে জানার জন্য আমার চেয়ে ভালো কাউকে খুঁজে পাবেন।'

ডোর নবের দিকে হাত বাড়াতে গেল এরিকো।

'আর একটা প্রশ্ন...' তর্জনী উঠিয়ে বললো মায়েদা। 'আরেকটা বিষয়ে জিজ্ঞেস করার ছিলো। যখন আপনারা মিডল স্কুলে ছিলেন, তখনকার একটা কথা।'

'আচ্ছা...' সাবধানে বললো এরিকো।

'আপনাদের মিডল স্কুলের শেষ বর্ষে একটা ঘটনা ঘটেছিলো, মানে যখন আপনাদেরই এক ক্লাসমেট দুর্বৃত্তদের হামলার শিকার হয়েছিলো আর কি। এটা কি সত্যি যে আপনি আর মিস কারাশাওয়াই প্রথম উদ্ধার করেন তাকে?'

এরিকো টের পেল তার চেহারা রক্তবর্ণ হয়ে উঠছে। 'ওটার সাথে এটার কী সম্পর্ক–'

'আমি শুধু বলছিলাম যে সে সময় মিস কারাশাওয়ার অভিব্যক্তিটা কেমন ছিলো তা মনে করতে পারছেন কি না। মানে এমন কিছু যা তার চরিত্রকে আরেকটু ভালোভাবে ফুটিয়ে তুলবে।'

লোকটা কথা শেষ করার আগেই মাথা ঝাঁকাতে শুরু করে দিয়েছে এরিকো। 'না, কিছুই মনে নেই আমার। দুঃখিত, আমার মনে হয় আমাদের এখানেই শেষ করা উচিত। আরো অনেক কাজ আছে আমার।'

স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছিলো তার পয়েন্ট সে বলে দিয়েছে। ইনভেস্টিগেটর দরজার সামনে থেকে কিছুটা পেছনে সরে এলো। 'বুঝতে পেরেছি। ধন্যবাদ আপনার মূল্যবান সময়টুকু দেওয়ার জন্য।'

কিছু না বলেই দরজাটা বন্ধ করে দিলো এরিকো। সে চাচ্ছিলো না লোকটা তাকে কাঁপা অবস্থায় দেখুক, তাই তার সামনে স্বাভাবিক থাকার শত চেষ্টা করছিলো সে।

হলে বিছানো মাদুরের উপরেই বসে পড়লো এরিকো। অন্ধকার সেই স্মৃতি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। এত বছর হয়ে গেছে ঘটনাটার, তবু কেন যেন অবিশ্বাস্যভাবে এখনো তার ভেতরের ক্ষতটা কাঁচা ঠেকলো তার কাছে। মনে হলো সেখানটায় কোনো ঔষধ লাগানো হয়নি। ও শুধু ভুলে গেছিলো ঘা-টার কথা।

মিয়াকো ফুজিমুরার কথা তুলে অর্ধেকটা ভুল ঐ লোকই করেছে। কিন্তু সত্যি বলতে, কেবল ইউকিহোর ব্যাপারে কথা বলার কারণেই পেছনের স্মৃতিগুলো একটা একটা করে মনে পড়ছে তার।

এরিকো নিশ্চিত না এগুলো আসলে কী, কিন্তু কোনো একটা নির্দিষ্ট সময় থেকে তার বন্ধুর ব্যাপারে কিছু জিনিস কল্পনা করতো সে। প্রথমে ভেবেছিলো হয়তো এসব জিনিস নিয়ে চিন্তা করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ায় করছে সে, কিন্তু এরপর ধীরে ধীরে তার সন্দেহ এবং ভয় দুটোই একটা গল্পে রূপ নেয়।

এই গল্পটা কাউকে বলেনি সে। ভাবতেও বিদঘুটে লাগে বিষয়টা, আর সে চায়ওনি কেউ জানুক যে এমনটা ভেবেছিলো সে। ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলো

অনেক, কিন্তু গল্পটা তার মাথায় এমনভাবে সেঁটে গেছিলো যে আর ভোলা সম্ভব হয়নি। ওরকম ভাবার জন্য নিজের প্রতি অনেক ঘৃণাও জন্মেছিলো তার। যখনই ইউকিহোর সব সময়ের করা আচরণ সম্পর্কে ভাবতো, তখনই ওকে নিয়ে অমনটা ভাবার জন্য নিজেকে পশু বলে মনে হতো।

কিন্তু তারপরও তার মস্তিষ্কের একটা অংশ সব সময়ই জপতে থাকতো গল্পটা, যেন কোনো মন্ত্র পড়ছে তার মগজটা। ওটা কি শুধুই তার কল্পনা ছিলো? সত্যের ছিটেফোঁটাও কি ছিলো না তাতে?

আর এটাই হলো ইউকিহোর থেকে ওর দূরত্ব বজায় রাখার আসল কারণ: যখনই বন্ধুর মুখটা দেখতো, তখনই ঐ সন্দেহ আর নিজের প্রতি ঘৃণা জগদ্দল পাথর হয়ে চেপে বসতো তার বুকে। আর এই ভার সে বইতে পারতো না।

এক হাত দিয়ে দেয়াল ধরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলো এরিকো। উপরে তাকাতেই লক্ষ করলো দরজা লক না করেই চলে এসেছে সে। উঠে দরজার কাছে গেল সে, এরপর নবে থাকা লকটা ঘুরিয়েই চেইনটা সজোরে টান দিয়ে লাগিয়ে দিলো।

অধ্যায় এগারো

গিনজায় ভিড়ের সামনে মুখ করে থাকা ক্যাফেটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ইমায়েদা। সন্ধ্যা ছয়টা বাজতে আর মাত্র তেরো মিনিট বাকি আছে। রাস্তায় বিভিন্ন দোকানদার আর অফিস-ফেরত কর্মীদের ঢল নেমেছে বাড়ি ফেরার তাগিদে। অল্পবয়সি এক দম্পতি তার সামনে সামনে হাঁটছে। দুজনের কারো বয়সই বিশের উপরে না। আরমানি ব্র্যান্ডের একটা গ্রীষ্মকালীন জ্যাকেট পরে আছে ছেলেটা। বিএমডব্লিউ থেকে তাদেরকে নামতে দেখেছিলো ইমায়েদা। *হয়তো অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো থাকার সময় কিনেছিলো ওটা*, মনে মনে ভাবলো সে। যদি এমন হতো যে যাদের গাড়ি চালানোর বয়স হয়নি, তারা দামি গাড়ি কিনতে পারবে না, তাহলে এর জন্য কখনোই চোখের জল ফেলতো না সে। কিন্তু গত দশকে এই সংখ্যা যে পরিমাণ বেড়েছে তা অতুলনীয়।

ক্যাফের নিচ তলায় একটা পেস্ট্রি শপ রয়েছে। সিঁড়িতে উঠতে উঠতে ঘড়ির দিকে তাকালো ইমায়েদা। পাঁচটা পঞ্চাশ বাজে। যে সময়ে আসতে চেয়েছিলো তার থেকে অল্প কিছু দেরি হয়ে গেছে তার আসতে। কারো ইন্টারভিউ নিতে এলে অবশ্যই পনেরো বা ত্রিশ মিনিট আগে ঐ জায়গায় যায় সে-ইমায়েদা এই বিষয়টাকে নিজের একটা পলিসিই বানিয়ে ফেলেছে। এতে করে সেই লোকটার চিন্তাভাবনা সম্পর্কে ভালো ধারণা পাওয়া যায়।

ক্যাফেতে উপস্থিত সবার দিকে একবার চোখ বোলালো সে, কিন্তু কাজুনারি শিনোজুকাকে দেখতে পেল না কোথাও। এরপর একটা সিট নিলো যেখান থেকে জানালা দিয়ে রাস্তাটা ভালো দেখা যায়। ক্যাফেটা অর্ধেকের মতো ভরা আছে মানুষ দিয়ে।

দক্ষিণ এশিয়ার বৈশিষ্ট্য সমেত একটা ওয়েটার এলো তার অর্ডার নেওয়ার জন্য। অনেক প্রতিষ্ঠানই মূল্যস্ফীতির এই সময়ে স্থানীয় মানুষদের থেকে বাইরের দেশের মানুষদের বেশি নিয়োগ দিচ্ছে। কারণ বাইরের দেশের মানুষদের পেছনে কম ব্যয় হয়। *জাপানি বাচ্চাদের পেছনে সময় নষ্ট করার চেয়ে অন্য কিছু করা আরো ভালো*, ভাবলো ইমায়েদা। একটা কফি অর্ডার করলো সে।

মার্লবোরো সিগারেটটা বের করে তাতে আগুন ধরাতে ধরাতে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো। কয়েক মিনিট আগের থেকেও এখন বেশি মানুষ হাঁটাহাঁটি করছে বলে মনে হলো তার কাছে। সে শুনেছে ব্যবসার টাকা-পয়সা নাকি বিনোদনের জন্য উড়াচ্ছে এখানকার মানুষ। হয়তো এখানে মিতব্যয়ী হওয়ার কথাটা তেমন ছড়ায়নি এখনো। অথবা, গিনজাতে থাকা অর্থের প্রদীপের শেষ আলোটুকু জ্বেলে নিচ্ছে এখানকার মানুষজন। এরপর অন্ধকারে ডুবে যাবে সব।

অনেকক্ষণ যাবৎ ভিড়ের মধ্যে তাকিয়ে থেকে শেষমেশ একটা লোকের উপর গিয়ে ইমায়েদার নজর পড়লো। লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে আসছে সে, হাতে ধূসর রঙের একটা জ্যাকেট ঝোলানো। ছয়টা বাজতে আর পাঁচ মিনিট বাকি। *মনে হয় ধনীরাও দেরিতে আসা পছন্দ করে না।*

ভেতরে ঢুকেই তার টেবিলের দিকে উদ্দেশ করে হাত নাড়লো কাজুনারি। একই সময়ে ওয়েটার ইমায়েদার কফি নিয়ে এলো। সিটে বসে নিজের জন্য একটা ঠান্ডা কফি অর্ডার করলো সে। 'বেশ গরম বাইরে, না?' হাত নেড়ে খানিকটা মুখে বাতাস করার ভঙ্গি করে বললো কাজুনারি।

'আসলেই অনেক,' সায় দিলো ইমায়েদাও।

'আপনি কি আপনার এসব কাজে গ্রীষ্মের কোনো ছুটি কাটান?'

'না, তেমন হয় না আর কি,' হাসি নিয়েই বললো ইমায়েদা। 'কাজ কিছুটা কম থাকলে ছুটি নেই আসলে আমি। তাছাড়া, গ্রীষ্মের সময়টা ইনভেস্টিগেট করার জন্য বেশ দারুণ সময়।'

'সেটা কীরকম?'

'পরকীয়া। ধরুন, একজন মহিলা আমাকে বললো তার স্বামী প্রেম করছে কি না সে বিষয়ে জানতে। তো আমি তাকে বলবো, আপনি এক কাজ করুন, আপনার স্বামীকে বলুন যে গ্রীষ্মের ছুটিতে আপনি বাবা-মায়ের সাথে দেখা করতে যাবেন। যদি আপনার স্বামী যেতে চায় আপনার সাথে, তাহলেও নেবেন না।'

'বুঝেছি। মানে যদি স্বামীর প্রেমিকা থাকে, তাহলে বাড়িতে বসে–'

'এই সময়টা হাতেনাতে ধরার জন্য বেশ ভালো একটা সুযোগ। ঐ স্ত্রী যখন বাবার বাড়িতে থাকবে, তখন আমি সেই স্বামী আর তার প্রেমিকার বিভিন্ন জায়গায় ঘোরার ছবি তুলে ফেলবো। বিশ্বাস রাখতে পারেন, সেই স্বামীর চিটিং ধরে ফেলার চান্স এক্ষেত্রে একদম একশো পার্সেন্ট।'

নীরবে হাসলো কাজুনারি। ক্যাফেতে আসার সময় চেহারায় যে কাঠিন্য ছিলো তা ধীরে ধীরে উবে যাচ্ছে।

এরমধ্যে ওয়েটার কাজুনারির ঠান্ডা কফি নিয়ে এলে তাতে চুমুক দিলো সে।

'তো কিছু বের করেছেন আপনি?' জিজ্ঞেস করলো সে। যেভাবে জিজ্ঞেস করলো তাতে মনে হলো এই প্রশ্নটা এখানে আসার পর থেকেই করার জন্য মুখিয়ে ছিলো সে।

'কিছু জিনিস খতিয়ে দেখছিলাম,' জবাব দিলো ইমায়েদা। 'যদিও ভয় হচ্ছে যে আপনি যতটুকু আশা করছেন, তার থেকে হয়তো কিছুটা কমই হয়ে যাবে আমার রিপোর্ট।'

ব্রিফকেস থেকে একটা ফাইল বের করে টেবিলের উপরে রাখলো ইমায়েদা। সঙ্গে সঙ্গে ফাইলটা খুলে ফেললো কাজুনারি।

ইমায়েদার বিশ্বাস সে ইউকিহো কারাশাওয়া সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য এতে রেখেছে; তার বেড়ে ওঠা, স্কুল জীবন এবং বর্তমান জীবন–সব রেখেছে এটার মধ্যে।

বেশ কিছুক্ষণ পর ফাইলের উপর থেকে মাথা তুললো কাজুনারি। 'ওর আসল মা যে আত্মহত্যা করেছিলো, এ বিষয়ে কোনো ধারণাই ছিলো না আমার।'

'খেয়াল করে দেখুন, ওখানে পুরোপুরি আত্মহত্যা লিখিনি আমি। যদিও ওটা বেশ শক্তিশালী একটা থিওরি ছিলো সে সময়, কিন্তু ওটাকে সমর্থন করার জন্য সম্পূর্ণ তথ্য ছিলো না।'

'তবুও যেভাবে জীবনযাপন করছিলো তা দেখার পরে সুইসাইড করাটা অস্বাভাবিক মনে হয় না।'

'না, তা আসলেই অস্বাভাবিক মনে হয় না।'

'বেশ অবাক করা ঘটনা বলতে গেলে,' বললো কাজুনারি। 'আবার না-ও হতে পারে।'

'মানে?'

'তার সবকিছু দেখলে মনে হয় কোনো ধনাঢ্য পরিবারে সে বেড়ে উঠেছে, কিন্তু হঠাৎ হঠাৎ তার মধ্যে আপনি এই আভিজাত্য বাদেও কিছু একটা দেখবেন। একটা স্বভাব, যা সে বর্মের মতো পরে আছে। আপনি কখনো বিড়াল পেলেছেন?'

মাথা ঝাঁকালো ইমায়েদা।

'আমি যখন ছোট ছিলাম, আমাদের চারটা বিড়ালের বাচ্চা ছিলো,' বলতে লাগলো কাজুনারি। 'স্বাভাবিক টাইপেরই ছিলো সবগুলো, ততটা মাধুর্যময় ছিলো না আর কি। চারজনকেই সমান নজরে দেখতাম আমরা। কিন্তু আমাদের সামনে তাদের একেকজনের স্বভাব ছিলো একেক রকম। অর্থাৎ, বাসায় আনার সময় যার বয়স যতটুকু ছিলো, তার আচরণ সেটার উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হতো। একটা বিড়ালের বাচ্চা জন্ম থেকে মানুষের কাছে লালিত-পালিত হলে পরবর্তীতে মানুষের নিরাপত্তা ছাড়া চলতে পারে না। তারা বিশ্বস্ত হয় এবং সহজেই মানুষের দ্বারা কাবু হয়ে পড়ে। কিন্তু কোনো বিড়ালকে যদি বড় অবস্থায় আপনি ঘরে আনেন, তারা হয়তো পোষ মানবে, কিন্তু তাদের সহজাত সতর্কতা ভেতরেই থেকে যাবে। তারা আপনার সাথে বাস করবে কারণ আপনি তাদের খাবার দিচ্ছেন, কিন্তু কখনোই পুরোপুরি নত হবে না আপনার কাছে। সতর্কতা অবলম্বন করেই আপনার পোষ মানবে। আমার মনে হয় ইউকিহো অনেকটা ওরকমই।'

'ইউকিহো আর যাই হোক, কোনো পোষা বিড়াল না।'

'আমি নিশ্চিত, ও যদি শোনে যে আমি তাকে বুনো বিড়ালের সাথে তুলনা করেছি, তবে যেকোনো বিড়ালের মতোই তার পশম দাঁড়িয়ে যাবে,' মুখের কোনা হালকা নরম করে বললো কাজুনারি।

'তা তো বটেই,' বললো ইমায়েদা। ইউকিহোর বিড়ালের মতো দেখতে চোখদুটোর কথা ভাবছে। 'যে গুণ তার মধ্যে আছে তা যে-কারো কাছে আকর্ষণীয় ঠেকবে।'

'তা যা বলেছেন। আর এরকম নারীরা ভয়ংকর হতে পারে, কী বলেন?'

'ঠিক ধরেছেন,' বললো ইমায়েদা। 'এখন মূল প্রসঙ্গে আসি। আপনি কি শেয়ারের ঘটনাটা পড়েছেন রিপোর্ট থেকে?'

'হালকা-পাতলা পড়লাম। অবাক হলাম তার ব্রোকার কে তা বের করেছেন দেখে।'

'তার ডিভোর্সের পরে কিছু কাগজপাতি ফেলে রেখে গেছিলো সে।'

'মাকোতোর বাসায়?' জিজ্ঞেস করলো কাজুনারি। কালো হয়ে গেছে হঠাৎ তার মুখটা। 'তাকে কী করে বুঝিয়েছেন এই ইনভেস্টিগেশনের ব্যাপারে?'

'বড়সড়ো আঘাত দিয়েই। আমি বলেছি যে কেউ একজন ইউকিহোকে বিয়ে করতে চায়, এবং সে তার অতীতের সবকিছু খতিয়ে দেখতে বলেছে। বলা উচিত হয়নি আমার?'

'না, না, ঠিক আছে। যদি তারা বিয়ে করে, তবে আগে-পরে এমনিতেও জানবে সে। তো এই সংবাদে তার প্রতিক্রিয়া কেমন ছিলো?'

'সে বলেছে যে সে আশা করে ইউকিহো যেন সঠিক মানুষটা খুঁজে পায়।'

'আপনি তাকে বলেননি যে যার সাথে বিয়ে হচ্ছে সে তার পরিচিত কেউ?'

'না, তা বলিনি, তবে আমার মনে হয় সে ধরতে পেরেছে যে এই তদন্তের পেছনে আপনি রয়েছেন। একদমই অপরিচিত কোনো মানুষ এসে তার সম্পর্কে খোঁজ করাটা অতিরিক্ত কাকতালীয় হয়ে যায়।'

'আমিই কোনো একসময় বলবো তবে ওকে,' বললো কাজুনারি। অর্ধেকটা যেন নিজেকেই শোনালো। ফাইলের দিকে ফের তাকিয়ে বললো, 'এটা দেখে বলতে হচ্ছে স্টক মার্কেটে বেশ ভালোই করেছিলো সে।'

'হ্যাঁ। যে ব্রোকারের সাথে কাজ করেছিলো, সে গত বসন্তেই অবসরে গেছে। তাই যতটুকু তার মনে ছিলো, তার উপর নির্ভর করেই লিখেছি আমি ওতে।'

কিছুটা দুর্ভাগ্য বলা যেতে পারে একে, ভাবলো ইমায়েদা। ব্রোকারটা যদি এখনো ফার্মে থাকতো, তবে হয়তো আরো বিস্তারিত তথ্য সে পেত। কিন্তু তাতে আবার একটা ক্লায়েন্ট নিয়ে এত সব কথাও জিজ্ঞেস করতে পারতো না।

'আমার মনে আছে গত বছরের দিকে নতুন শেয়ারহোল্ডাররাও বেশ ভালো করেছে। সে কি আসলেই দুই মিলিয়ন ইয়েন দিয়ে রিকার্ডোর শেয়ার কিনেছিলো?' জিজ্ঞেস করলো কাজুনারি।

'তার ব্রোকার স্পষ্ট করে বলেছিলো এটা।'

রিকার্ডো ইনক হলো একটা সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান। তারা ঘোষণা দেয় যে ক্লোরোফ্লুরোকার্বনের বিকল্প হিসেবে তারা নতুন একটা জিনিস আবিষ্কার করেছে। ১৯৮৭ সালের সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘ যখন ক্লোরোফ্লুরোকার্বন ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা দেয়, তখন প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যায় এই প্রতিষ্ঠান। এরপর ১৯৮৯ সালের হেলসিংকি ডিক্লারেশনে যখন বলা হয় যে এই শতকের ভেতরেই সকল প্রকার ক্লোরোফ্লুরোকার্বনের ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে হবে, তখন ঐ শেয়ারগুলোর পালে আরো জোরেশোরে হাওয়া লাগে।

ব্রোকারকে সে সময় যেটা অভিভূত করে তা হলো, ইউকিহো যখন রিকার্ডোর স্টক ক্রয় করে নেয়, তখনো ওদের রিসার্চের ব্যাপারে জনগণকে জানানো হয়নি। এমনকি পুরো ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে খুব কমসংখ্যক মানুষই জানতো রিকার্ডো এসব করছে। তারপর ওরা জনসমক্ষে ঘোষণা করার পরেই জানা যায় যে ক্লোরোফ্লুরোকার্বন আর প্যাসিফিক গ্লাস উৎপাদনকারী একটা কোম্পানির কিছুসংখ্যক কর্মীকে রিকার্ডো আগেই নিয়োগ দিয়ে রেখেছিলো ওদের রিসার্চে গতি আনতে।

'শুধু রিকার্ডোই না, অন্য আরো অনেক কোম্পানির ক্ষেত্রেও সে যেন আগে থেকেই সব বুঝে যেত,' বললো ইমায়েদা। 'এটা পরিষ্কার না যে কীসের উপর ভিত্তি করে মেয়েটা শেয়ার কিনতো, কিন্তু যে কটা কোম্পানির শেয়ার সে ক্রয় করেছে, প্রায় প্রত্যেকটাই হিট হয়ে যায়। ব্রোকার বলেছে তার সফলতা নাকি একদম নিখুঁতের কোটায়।'

'ভেতরের কাজকারবার নাকি?' জিজ্ঞেস করলো কাজুনারি, তার গলা নিচু হয়ে গেছে।

'এটা সেই ব্রোকারও সন্দেহ করেছিলো। সে জানতো ইউকিহোর স্বামী উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে, আর তাই সে ভেবেছিলো হয়তো সে-ই তাকে কোনো না কোনোভাবে বিভিন্ন কোম্পনির তথ্য বের করে দেয়। অবশ্য, ঐ ব্রোকার ইউকিহোকে কখনো এসব জিজ্ঞেস করেনি।'

'কোন ডিপার্টমেন্টে মাকোতো কাজ করতো আবার বলুন তো?'

'তোজাই অটোমোটিভ কোম্পানির পেটেন্ট লাইসেন্সিং ডিপার্টমেন্ট। একদম খাসা পদ, যেখান থেকে বিভিন্ন কোম্পানিতে চলা রিসার্চ এবং ডেভেলপমেন্ট সম্পর্কে জানার সুযোগ ছিলো ওর। কিন্তু যেসব রিসার্চ জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয়েছে কেবল সেগুলোই জানতে পারতো সে। যেসব প্রজেক্ট জনসমক্ষে আনা হয়নি, সেগুলো সম্পর্কে জানা ওর পক্ষে সম্ভব ছিলো না।'

'তার মানে আমাদের বিশ্বাস করে নিতে হবে যে ভালো কোম্পানির শেয়ার বাছাই করার ক্ষেত্রে মেয়েটার অসাধারণ দক্ষতা ছিলো?'

'উমম, তার একেবারে যে দক্ষতা ছিলো না তা না। অবশ্যই ছিলো। তার ব্রোকারের মতে, কোন সময় শেয়ার ছেড়ে দেবে এই ধারণাটাও তার ভেতর ছিলো। যখনই বুঝতো দাম কিছুটা বেড়ে যাবে, তখনই সেগুলোকে বিক্রি করে দিয়ে নতুন বিনিয়োগ করতো। এরকম ধারণা একজন অপেশাদারের ভেতর থাকার কথা না। আর যদি ধরে নেই ভাগ্য এখানে সহায় ছিলো, তবে বলতেই হয় যে কেবল ভাগ্যের উপর নির্ভর করে শেয়ার মার্কেটে এতটা লাভ করা যায় না।'

'এর মানে এটাই দাঁড়ায় যে হয় তার কাছে সুবিধাজনক তথ্য ছিলো, নয়তো এমন কারো সাথে ওঠাবসা ছিলো যার কাছে এসব থাকতো।'

'অনেকটা সেরকমই।' কাঁধ ঝাঁকালো ইমায়েদা। 'তবে ঐ যে বললাম, এসব কেবল আমার ধারণাই। নিশ্চিত করে কিছুই বলা সম্ভব না।'

কাজুনারি আবার চোখ ফিরিয়ে নিলো ফাইলের উপর। ভ্রুকুটি করে বললো, 'আরেকটা জিনিস ভাবাচ্ছে আমাকে।'

'কী?'

'এই রিপোর্ট অনুযায়ী, গত বছর ঘন ঘনই শেয়ার কেনাবেচা করেছে সে। এখনো করছে নাকি?'

'হ্যাঁ। যদিও আমার মনে হয় তার অধিকাংশ সময় সে দোকানের পেছনে ব্যয় করে। কিন্তু তবুও একদম হাত-পা ছেড়েই শেয়ারের ভেতর ডুবে আছে সে।'

মাথা ঝাঁকালো কাজুনারি। 'কিন্তু মাকোতোর কাছ থেকে যা শুনেছি তার সাথে তো মিলছে না।'

'তার ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে কিছু বলেছে সে?' জিজ্ঞেস করলো ইমায়েদা।

'ওদের বিয়ের পরে কী করে ইউকিহো শেয়ারের সাথে জড়িয়ে গেছিলো সেটুকু বলেছে। একটা সময় ব্যাপারটা খুব খারাপ পর্যায়ে চলে গেলে তাদের মধ্যে ঝগড়া হয় এ নিয়ে। এরপর ইউকিহো তার সব শেয়ার বিক্রি করে দিয়েছিলো। এখন মনে হচ্ছে, আসলেই করেছিলো কি না তা মাকোতো ভালো করে খেয়াল করেনি।'

'আমাকে ব্রোকার বলেছে যে মেয়েটা যখন থেকে শেয়ার মার্কেটে ঢুকেছে, তখন থেকে একবারের জন্যও কখনো থামেনি সে। সব বিষয় বিবেচনা করে তার এখনকার যে আর্থিক অবস্থা রয়েছে তা অনুমান করতে পারছি আমি,' বললো ইমায়েদা। 'শুধু বড় কিছু প্রশ্ন থেকে যায়।'

'প্রথমে বিনিয়োগ করার জন্য এত টাকা কোথায় পেয়েছিলো সেটা?'

'একদম। সঠিক ডকুমেন্ট ছাড়া যখন শুরু করেছিলো, তখন কত টাকা দিয়ে শুরু করেছিলো তা জানা যায়নি, কিন্তু ব্রোকার বলেছে আনুমানিক ভালো পরিমাণের একটা এমাউন্ট নিয়ে শুরু করেছিলো সে। মানে একজন গৃহিণীর কাছ থেকে যতটা আশা করতে পারেন তার থেকে অনেক বেশি।'

'কয়েক লাখ নাকি?'

'সম্ভবত তার থেকেও বেশি।'

হাতদুটো বুকে বেঁধে নিয়ে নাক দিয়ে শব্দ করে উঠলো কাজুনারি। 'মাকোতো বলেছে, ইউকিহো কত টাকা লুকিয়ে রেখেছিলো তার কোনো ধারণাই ছিলো না তার কাছে।'

মাথা দোলালো ইমায়েদা। 'আপনি তার পালক মায়ের কথা বলেছিলেন না, রেইকো কারাশাওয়া? তার কাছেও এত টাকা ছিলো না। পরিষ্কার করে বলতে গেলে কয়েক লাখ ইয়েন জোগাড় করাও তার পক্ষে কষ্টকর হয়ে যেত।'

'আর কোনো রাস্তা নেই যাতে নজর দিতে পারেন একটু?'

'পরিকল্পনা করছি সে বিষয়ে। শুধু কিছু সময় দরকার আমার।'

'ওটা কোনো সমস্যা না। যা দরকার তাই করুন। আর এই ফাইলটা কি রাখতে পারি আমার কাছে?'

'অবশ্যই। আমার কাছে কপি করা আছে একটা।'

কাজুনারি যে পাতলা ফাইল বক্স সাথে করে এনেছিলো তার মধ্যে ভরে নিলো ফাইলটা।

'ওহ, এটা ফেরত দেওয়া দরকার আপনাকে,' ব্রিফকেস থেকে কাগজের একটা ব্যাগ বের করতে নিয়ে বললো ইমায়েদা। সেটা থেকে একটা ঘড়ি বের করে টেবিলের উপর রাখলো সে। 'এটার খাপ কুরিয়ার করে দিয়েছি আমি, হয়তো কালকের মধ্যে পেয়ে যাবেন।'

'ঘড়িটাও তো সাথে পাঠিয়ে দিতে পারতেন।'

'নাহ, হারিয়ে গেলে পরে দায়বদ্ধ থাকতাম, তাই চাইনি একসাথে পাঠাতে। লিমিটেড কারটায়ার এডিশনের ঘড়ি যেহেতু।'

'তাই নাকি? গিফট ছিলো ওটা,' বললো কাজুনারি। জ্যাকেটের পকেটে ভরার আগে একবার তাকালো ওটার দিকে।

'আমি নিজেও জানতাম না,' বললো ইমায়েদা। 'যদি-না ইউকিহো বলতো।'

'আচ্ছা,' চোখ পিটপিট করে বললো কাজুনারি। 'ধরে নিচ্ছি তার লাইনে কাজ করতে হলে এসব জানতে হয়।'

'আমার মনে হয় এর থেকে একটু বেশি কিছুই আছে এখানে,' বললো ইমায়েদা। কথার প্রভাবটা পড়ার জন্য কিছুটা অপেক্ষা করছে সে।

'মানে?'

একটু সামনে এগিয়ে এসে টেবিলের উপর হাতদুটো একত্র করে রাখলো ইমায়েদা। 'আপনি বলেছিলেন না যে ইউকিহো আপনার কাজিনের প্রস্তাবে উৎসাহের সাথে জবাব দেয়নি, তাই না?'

'হ্যাঁ, তো?'

'আমার কাছে এর একটা কারণ জানা আছে।'

‘কী?’

‘খুব সহজ একটা কারণ,’ কাজুনারির চোখের দিকে তাকিয়ে বললো ইমায়েদা। ‘সে অন্য কারো প্রেমে পড়েছে।’

কিছু বলার আগে বেশ কয়েকবার মাথা দোলালো কাজুনারি। ‘আমি নিজেও এই বিষয়ে ভেবেছিলাম। কিন্তু কেন যেন মনে হচ্ছে আপনার কথার আলাদা একটা ভিত্তি আছে। আপনি কি জানেন লোকটা কে?’

‘হ্যাঁ।’

‘কে সে? আমার চেনা-পরিচিত কেউ? যদি মনে করে থাকেন বললে কোনো সমস্যা হবে, তাহলে বলা দরকার নেই আমাকে।’

‘আসলে সমস্যা কি সমস্যা না এটা নির্ভর করছে পুরোপুরি আপনার উপর,’ পাশের গ্লাস থেকে একটু পানি পান করে নিয়ে বললো ইমায়েদা। ‘কারণ সেই মানুষটা আপনি।’

ভ্রূদুটোকে যথেষ্ট কুঞ্চিত করে ব্যাঙ্গাত্মক একটা দৃষ্টি দিলো কাজুনারি। এরপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে হোহো করে হেসে বললো, ‘হাসালেন খুব।’

মাথা ঝাঁকালো ইমায়েদা। ‘আমি সিরিয়াস।’

ইমায়েদার গলায় এমন কিছু ছিলো যে চোখমুখ শক্ত হয়ে গেল কাজুনারির।

‘কী কারণে মনে হচ্ছে এটা আপনার?’ জিজ্ঞেস করলো সে।

‘যদি বলি যে আমার ধারণা থেকে এটা বলছি, তবে হাসবেন আপনি।’

‘না, হাসবো না আমি, কিন্তু বিশ্বাসও করবো না।’

‘আসলে এর থেকেও অনেক বেশি কিছু রয়েছে এখানে। প্রথমত, আমাদের কাছে ঘড়িটা রয়েছে। এর মালিক কে তা স্পষ্ট জানে ইউকিহো। যদিও ওটা দেখার জন্য খুব কম সময়ই পেয়েছে সে, কিন্তু সে মনে রেখেছে যেটা আপনি রাখেননি। আমার মনে হয় এটা সে করেছে কারণ আপনার প্রতি তার আগ্রহ ছিলো। আর আরেকটা বিষয় হলো, আমি যখন তাকে দেখতে গেলাম, সে জিজ্ঞেস করেছিলো তাদের দোকানের খবর আমাকে কে দিয়েছে। আমি জবাবে বলেছিলাম, শিনোজুকা। ওর দিক থেকে নামটা ইয়াসুহারু শিনোজুকা হিসেবেই ধরে নেওয়াটা বেশি স্বাভাবিক ছিলো। আপনার থেকে বয়সে বড় সে, কোম্পানিতেও বেশ নামডাক রয়েছে। আর তাছাড়া সবচেয়ে বড় পয়েন্ট হলো, প্রায় রোজই সেই দোকানে তার যাতায়াত রয়েছে।’

‘হয়তো তার নাম নিতে লজ্জা পাচ্ছিলো সে। বিয়ের কথা উঠবে, তাই।’

‘কিন্তু সেটা তার চরিত্রের সাথে যায় না। আপনি কতবার তার দোকানে গেছিলেন?’

‘দুইবার সম্ভবত।’

'শেষবার কবে গেছিলেন?' জবাব দিলো না কাজুনারি, তাই ইমায়েদাই বললো। 'কমপক্ষে বছরখানেক আগে, তাই তো?'

মাথা দোলালো কাজুনারি।

'তো শিনোজুকা নামটা শোনামাত্রই ইয়াসুহারু শিনোজুকার কথাই মাথায় আসা উচিত ছিলো তার, তাই না? যদি-না আপনার প্রতি তার কোনো ভালোলাগা থেকে থাকে। এছাড়া আর কোনো কারণ দেখছি না আপনার নামটা প্রথমে বলার। আপনি বলেছেন যে কলেজ লাইফ থেকেই আপনি ইউকিহোকে চিনতেন, তাই না?'

'হ্যাঁ, ড্যান্স ক্লাবে প্র্যাকটিসের সময় থেকে।'

'সে সময়ের কথা চিন্তা করুন একবার, কোনো কিছু মনে করার চেষ্টা করুন যাতে বুঝতে পারে। যেকোনো কিছু, যা দেখে মনে হতে পারে আপনার প্রতি তার অতিরিক্ত কোনো অনুভূতি ছিলো।'

'আপনি ওকে দেখতে গেছিলেন, না?' ভ্রুকুটি করে বললো কাজুনারি। 'এরিকো কাওয়াশিমাকে।'

'গেছিলাম, কিন্তু আপনার নাম আমি উল্লেখ করিনি। আর এমনভাবে দেখা করেছি যে এ বিষয়ে কোনো রকম সন্দেহ জাগবে না তার।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো কাজুনারি। 'কেমন আছে সে এখন?'

'দেখে তো ভালোই মনে হলো। দুই বছর হলো বিয়ে হয়েছে তার। একটা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানিতে চাকরি করে তার স্বামী। ম্যারেজ সার্ভিসের মাধ্যমে তাদের পরিচয় ঘটেছিলো।'

'শুনে ভালো লাগলো যে ও ভালো আছে,' বললো কাজুনারি। 'কিছু বলেছে সে?'

'তার মতে, মাকোতো ইউকিহোর জন্য ঠিক ছিলো না। যেটার মানে আমি ধরে নিয়েছি যে ইউকিহো অন্য কাউকে ভালোবাসতো।'

'আর তাই ধরে নিয়েছেন যে সেই অন্য কেউ আমি? হতেই পারে না।' মাথা ঝাঁকিয়ে হাসলো কাজুনারি।

'তারপরও,' বললো ইমায়েদা। 'দেখে মনে হলো সেও এটাই ভাবছে।'

'আমার সন্দেহ আছে তাতে,' বললো কাজুনারি। 'এক মিনিট, ও বলেনি এটা, নাকি বলেছে?'

'শব্দে তো বলেনি, তবে ভাবভঙ্গিতে অমনই বোঝা গেছে।'

'এত এত ধারণা করাটা বিপজ্জনক।'

'জানি আমি। এজন্যই রিপোর্টে এটা লিখিনি। কিন্তু এখানে যে এরকম কিছু একটা আছে তাতে সন্দেহ নেই আমার।'

ইমায়েদার এখনো মনে আছে ওর সাথে কথা বলার সময় এরিকোর মুখভঙ্গিগুলোর কথা। চিরকালের জন্য থেকে যাওয়া একটা গভীর, অনুতপ্ত দৃষ্টি

ছিলো তার চোখে। ইমায়েদা ধরে নিয়েছিলো, এরিকো কিছু একটা নিয়ে ভয় পাচ্ছিলো সে সময়ে। ও ভয় পাচ্ছিলো ইমায়েদা জিজ্ঞেস করে বসবে যে কাকে আসলে ইউকিহো কারাশাওয়া ভালোবেসেছিলো। যখনই এই বিষয়টা মাথায় খেলেছিলো ইমায়েদার, তখনই ধাঁধার কয়েকটা টুকরো একদম জায়গামতো বসে যায়।

লম্বা একটা শ্বাস ফেলে পাশে থাকা কফির গ্লাসটা তুলে নিয়ে এক ঢোকে অর্ধেকটা সাবাড় করে দিলো কাজুনারি। গ্লাসটা টেবিলে নামিয়ে রাখতেই গ্লাসে থাকা বরফগুলো হালকা টুংটুং করে উঠলো।

'আমি জানি না লোকটা কে, বা এরকম কোনো ধারণাও নেই আমার, কিন্তু আমি নিশ্চিত ওটা আমি ছিলাম না। কখনোই এ বিষয়ে আমার কাছে কনফেস করেনি সে। আর না তো কোনো ক্রিসমাস কার্ড বা বার্থডে গিফট দিয়েছিলো। আমার মনে আছে একটা জিনিসই সে আমাকে দিয়েছিলো, তাও ভ্যালেন্টাইন্স ডে-তে। একটা চকলেট দিয়েছিলো আসলে। পরে দেখলাম ড্যান্স ক্লাবের সবাইকেই একটা করে দিয়েছে সে।'

'হয়তো আপনার চকলেটটা স্পেশাল কোনো চকলেট ছিলো?'

'একটুও না।' মাথা ঝাঁকিয়ে না করে দিলো কাজুনারি।

মার্লবোরোর প্যাকেটটায় আঙুল ঢোকালো ইমায়েদা। একটা সিগারেটই অবশিষ্ট আছে ওতে। মুখে নিয়েই আগুন ধরালো ওটায়। বাঁ হাত দিয়ে খালি বাক্সটা দুমড়ে ফেললো। 'আরেকটা জিনিস আমি রিপোর্টে লিখিনি। তার মিডল স্কুলে থাকাকালীন একটা ঘটনা।'

'কী সেটা?'

'ধর্ষণ। আসলে পুরোপুরি পরিষ্কার না যে ওটা ধর্ষণ ছিলো কি না, কিন্তু ধর্ষণের কাছাকাছিই কিছু একটা হয়েছিলো।'

ইমায়েদা খুলে বললো কী করে ইউকিহো আর এরিকো তাদের ক্লাসমেটকে আহত অবস্থায় পেয়েছিলো সেদিন। সেই মেয়েটা যে একসময় ইউকিহোর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলো।

'তো এই ঘটনায় কী ভাবার আছে আপনার?' শক্ত গলাতেই বললো কাজুনারি।

'আপনার মনে হয় না কলেজে থাকতে আপনার সাথে যা ঘটেছিলো তার সাথে এটার অনেকখানি মিল রয়েছে?'

'মিললে কী হবে?' অসন্তোষ নিয়েই বললো এবার কাজুনারি।

'ঘটনাটা ঘটার মধ্য দিয়ে ইউকিহোর প্রতিদ্বন্দ্বী সরে গেছিলো সে সময়ে। যার ফলাফল নিঃসন্দেহে তার ভেতর রয়ে গেছিলো। আর একই জিনিস সে তার প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রেও যে করতে পারে তা যে-কেউ বুঝতে পারবে।'

কঠিন দৃষ্টিতে ইমায়েদার দিকে তাকালো কাজুনারি। দৃষ্টিটা ধীরে ধীরে একদৃষ্টিতে পরিণত হলো। 'আপনার কল্পনা দেখছি অনেক বেশি ডার্ক, ডিটেকটিভ। এরিকো তার বেস্ট ফ্রেন্ড ছিলো।'

'এরিকো অবশ্যই তা ভাবতো। ভাবছি, ইউকিহোও সেরকম ভাবতো কি না। সত্যি বলতে, আমার সেই মিডল স্কুলে ঘটে যাওয়া ঘটনার জন্যও তার উপর সন্দেহ হচ্ছে। আর ওটাই সব ব্যাখ্যা করে দেয় আসলে।'

কাজুনারি হাত জাগিয়ে বললো, 'অনেক কল্পনা হয়েছে। আমার ফ্যাক্টস লাগবে এক্ষেত্রে।'

মাথা দোলালো ইমায়েদা। 'অবশ্যই।'

কাজুনারি দাঁড়িয়ে গিয়ে টেবিলে থাকা বিলটা নেওয়ার জন্য হাত বাড়ালো, কিন্তু চটজলদি সেটার উপর হাত রাখলো ইমায়েদা। 'যদি আমি এতক্ষণ যা বললাম তা আমার কল্পনা না, বরং তার ঘটানো কোনো কাজ–এটা প্রমাণ করতে পারি, তবে আপনি কি আপনার কাজিনকে তা খুলে বলতে পারবেন?'

কাজুনারি তার আরেকটা হাত ব্যবহার করে ধীরে ধীরে ইমায়েদার হাতটা সরিয়ে দিয়ে বিলের খাতাটা হাতে নিলো। 'অবশ্যই,' বললো সে। 'প্রমাণ করুন আগে।'

'তবে তাই হোক।'

'পরের রিপোর্টে প্রমাণ দেখবো বলে আশা করছি আমি।'

বিল দিয়েই ক্যাফে থেকে চলে গেল কাজুনারি।

***

কাজুনারির সাথে দেখা হওয়ার দুদিন বাদে এরি সুগাওয়ারার ফোন এলো। অন্য একটা কেসের জন্য ছদ্মবেশে শিবুয়ার এক হোটেলে ছিলো ইমায়েদা। মধ্যরাতের কিছু পরে বাসার ফিরেছে সে। পোশাকাদি খুলে গোসলে ঢুকতে যাবে, এমন সময় ফোন এলো তার কাছে।

প্রথমেই এরি যে জিনিসটা বললো তা হলো সে দুশ্চিন্তায় আছে খুব। তার স্বরেই ইমায়েদা বুঝতে পারলো যে মজা করছে না মেয়েটা।

'আমার ফোনের আনসারিং মেশিনে বিভিন্ন ভয়েস ম্যাসেজ আসে যেখানে কোনো কথা না বলেই অপর পাশ থেকে ফোন কেটে দেয়। খুবই অদ্ভুত কাজ। তুমি করছো না তো, ইমায়েদা?'

'সরি, এরকম খামখেয়ালি মার্কা ফোন করার অভ্যাস নেই আমার। হয়তো তোমার সাথে বারে পরিচিত হওয়া কোনো লোক কল দিচ্ছে, কী বলো?'

'না, এরকম কিছুই না। আর আমার কাস্টমারদের নাম্বার দিই না আমি।'

'যে-কারো নাম্বার খুঁজে পাওয়া এখন খুব সহজ,' বললো ইমায়েদা। মেইলবক্স থেকে ফোনের বিল চুরি করে নাম্বার হাতাতে পারে যে-কেউ। সে নিজেও এটা

করেছে কয়েকবার। যদিও এটা এরিকে বলতে চাচ্ছে না এখন সে। মেয়েটা যে যথেষ্ট ভয় পেয়ে আছে তা বোঝাই যাচ্ছে।

'আরো একটা বিষয় আছে এখানে। হয়তো আমার অতিরিক্ত ভাবনাও হতে পারে,' গলা নামিয়ে বলতে লাগলো সে। 'কিন্তু আমার কেন যেন মনে হচ্ছে আমার অ্যাপার্টমেন্টে কেউ এসেছিলো।'

'কী?'

'মাত্রই যখন কাজের থেকে বাসায় ফিরলাম, মনে হলো দরজা খোলার সাথে সাথে কিছু একটা অস্বাভাবিক লাগলো। বিশেষ করে দেখলাম আমার জুতো পড়ে আছে একপাশে।'

'তোমার জুতো?'

'হ্যাঁ, আমার হাই হিল জোড়া। ঘরের একদম সামনেই রেখেছিলাম জুতো জোড়া। সেগুলোর একটা একপাশে পড়ে আছে। আমি আমার জুতো কখনো এভাবে ফেলে রেখে যাই না। যত তাড়াহুড়াই থাকুক না কেন, আমি সেগুলোকে জোড়ায় জোড়ায় রেখে যাই।'

'তো তোমার একটা জুতো পড়ে আছে দেখে তুমি এই মাঝরাতে আমাকে ফোন করেছ?'

'শুধু ওটা না। আমার ফোনেও কিছু অদ্ভুত জিনিস হচ্ছে।'

'কী হয়েছে?'

'আমার ফোন আমি সব সময় টেবিলের একটা নির্দিষ্ট স্থানে রাখি যাতে বিছানায় গেলে আমার বাম হাত দিয়ে নিতে পারি সেটা। কিন্তু কোনো একটা কারণে সেটা আজকে টেবিলের একদম কিনারে পেলাম।'

একটা চিন্তা খেলে গেল ইমায়েদার মাথায়, কিন্তু কিছু বললো না সে। 'আচ্ছা, শোনো, আমি আসছি ওখানে।'

'তুমি আসছো? এখন? আচ্ছা, ঠিক আছে।'

'চিন্তার কিছু নেই। ঠিকঠাক থাকবো আমি। আরেকটা কথা, আমি না যাওয়া পর্যন্ত এই ফোনটা আর ধোরো না, কেমন?'

'ঠিক আছে, কিন্তু এসব কেন?'

'এসে বলবো। আর আরো একটা বিষয়, আমি তোমার দরজায় কড়া নাড়বো। কিন্তু ওটা যে আমি, এটা নিশ্চিত না হওয়ার আগ পর্যন্ত দরজা খুলবে না।'

'আচ্ছা,' বললো এরি। তার স্বর এখন আরো ভীত শোনাচ্ছে।

***

মূল সড়ক থেকে এক গলি পরেই রাস্তার সাথে লাগোয়া এরির অ্যাপার্টমেন্ট। সামনে গাড়ি পার্ক করার মতো জায়গা আছে। বাইরের সিঁড়ি দিয়ে তড়িঘড়ি করে

উঠেই ইউনিট ২০৫-এ তার নাম বলে কড়া নাড়লো সে। দরজা খুলে ভ্রুকুটি করে তাকালো এরি তার দিকে। 'আচ্ছা, এবার বলতে হবে এসব কী আর কেন হচ্ছে।'

'তা তো জানি না আমি। হয়তো তোমার ব্রেন তোমার সাথে এরকম করছে।'

'না, এরকম কিছুই না।' মাথা ঝাঁকালো এরি। 'ফোন রাখার পরেও আমার এটাই মনে হচ্ছিলো। মনে হচ্ছিলো আমার অ্যাপার্টমেন্ট আর আমার নেই।'

তোমার মগজই তোমার সাথে খেলা করছে, ভাবলো ইমায়েদা। কিন্তু মুখে কিছু না বলে কাঁধ ঝাঁকিয়ে ভেতরে ঢুকলো সে।

তিন জোড়া জুতো হলওয়েতে রাখা। এক জোড়া স্নিকার্স, এক জোড়া পাম্পস, আর সেই হাই হিলস জুতো। জুতোগুলো একটু বেশিই উঁচু। এমনি এমনি একপাশে পড়ে যাওয়ার মতো না। ইমায়েদা জুতো খুলে ঘরের ভেতরে ঢুকলো এবার। ছোট একটা অ্যাপার্টমেন্ট, একটা ঘর আর একটা লাগোয়া বাথরুম। মাঝখানে একটা পর্দা লাগানোতে পুরো অ্যাপার্টমেন্টটা দেখতে পারলো না সে। পর্দার ওপাশে একটা খাট, একটা টেলিভিশন আর একটা টেবিল রাখা। টেবিলের উপরে রাখা এয়ার কন্ডিশনারটা দেখতে বেশ পুরোনো, হয়তো এখানে উঠার সময়েই অ্যাপার্টমেন্টের সাথেই পেয়েছিলো সে। ঠান্ডা বাতাস ঠিকই দিচ্ছে ওটা, কিন্তু ঘরঘর একটা শব্দ করে যাচ্ছে অনবরত।

'ফোন কোথায়?'

বিছানার দিকে ইশারা করলো এরি।

পাশেই বিছানার উপর বর্গাকার শেইপের চমৎকার একটা সাদা টেলিফোন রাখা। ইমায়েদা দেখলো তারবিহীন না এটা–হয়তো এত ছোট অ্যাপার্টমেন্টের জন্য অতটা প্রয়োজন নেই।

ব্যাগ থেকে কালো একটা জিনিস বের করলো ইমায়েদা। জিনিসটার মাথায় একটা অ্যান্টেনা লাগানো, আর সামনের দিকে ছোট একটা মিটার আর কয়েকটা সুইচ দেখা যাচ্ছে।

'কী ওটা? রেডিও নাকি?' জিজ্ঞেস করলো এরি।

'এই একটা খেলনা আর কি।' ইমায়েদা পাওয়ার সুইচে টিপ দিতেই ফ্রিকোয়েন্সি এডজাস্টমেন্ট ডায়াল চালু হতে শুরু করলো। ১০০ এমএইচজির কাছাকাছি যেতেই মিটার রিয়েক্ট করতে শুরু করলো এবার। আর সেই সময়েই জ্বলে উঠলো ওটায় থাকা লাইটটা। ওটাকে ফোনের আরো কাছাকাছি নিয়ে যেতে লাগলো ইমায়েদা, আবার দূরে সরিয়ে নিলো। মিটার দূরে যাওয়ার সাথে সাথে আলোটা কমে যাচ্ছে আর কাছে আসার সাথে সাথে বেড়ে যাচ্ছে।

সুইচ অফ করে দিলো সে। এরপর ফোনটা তুলে নিয়ে ওটার নিচের অংশ দেখে নিয়ে ছোট একটা টুলবক্স বের করলো তার ব্যাগ থেকে। একটা ছোট স্ক্রু

ড্রাইভার বের করে ফোনের নাটগুলো খুলতে লাগলো ইমায়েদা। যা ভেবেছিলো তাই হলো; স্ক্রুগুলো ততটা সময় নিলো না খুলতে।

কারণ কেউ একজন সম্প্রতি খুলেছে ওগুলো।

'আমার ফোন কি ভেঙে ফেলছো তুমি?'

'*ঠিক* করছি আমি।'

'কী?'

ইমায়েদা এড়িয়ে গেল তাকে। সবগুলো স্ক্রু খোলা হয়ে গেলে কভারটা আলতো করে সরিয়ে নিলো সেখান থেকে। একটা ছোট বোর্ডে বিভিন্ন সার্কিট দেখা যাচ্ছে। ফোনের জন্যই ওসব রাখা হয়েছিলো। ইমায়েদার চোখ চলে গেল ছোট একটা বক্সের দিকে যেটা বোর্ডের সাথে টেপ মেরে রাখা হয়েছে। দুই আঙুল দিয়ে চেপে ধরে ওটায় টান দিলো সে।

'তুমি কি জেনেশুনে ওটা টান দিয়ে বের করছো?'

আরেকটা স্ক্রু ড্রাইভার বের করে এবার সেই বক্সটা খুলতে নিলো ইমায়েদা। ভেতরে ছোট একটা মারকারি ব্যাটারি রাখা ওতে, যেটাকে স্ক্রু ড্রাইভারের মাথা দিয়ে খোঁচা মেরে বের করলো সে। 'কাজ হয়ে গেছে,' বললো সে।

'কী ওটা?' জিজ্ঞেস করলো এরি। গলায় ভয়ের ছাপ স্পষ্ট।

ভয় পাওয়ার মতো কিছু না। আড়ি পাতার মতো একটা বস্তু এটা–একটা বাগ,' পুনরায় ফোনের কভার লাগাতে লাগাতে বললো ইমায়েদা।

'কীহ?' চোখ বড় বড় হয়ে গেছে এরির। ছোট বক্সটা উঠিয়ে নিয়ে বললো, 'কোন হারামজাদা আমার ফোনে বাগ লাগাতে চাইবে?'

'আমিও সেটা জানতে চাই। তুমি কি নিশ্চিত যে কোনো লোক তোমার পেছনে লাগেনি?'

'একদম।'

আবার বাগ ডিটেক্টরটা চালু করে রুমের আশেপাশে ঘুরতে লাগলো ইমায়েদা। মিটার আর কোনো রিয়েক্ট করলো না।

'মনে হচ্ছে ততটা সিরিয়াস হয়ে তোমার কথা শুনতে চায়নি,' ব্যাগের মধ্যে বাগ ডিটেক্টর আর টুলসের বক্সটা ভরতে ভরতে বললো সে।

'না, এরা যথেষ্ট সিরিয়াসই। তুমি কী করে জানলে যে আমার ফোনে বাগ লাগানো হয়েছে?'

'পান করার মতো কিছু আছে তোমার ঘরে? বেশ গরম লাগছে আমার।'

'হ্যাঁ, আনছি।' ছোট রেফ্রিজারেটরের কাছে গিয়ে দুটো বিয়ার বের করলো মেয়েটা। একটা টেবিলের উপর রেখে আরেকটা খুলে ফেললো নিজের জন্য।

হাঁটু গেড়ে মেঝেতে বসে এক চুমুক পান করলো ইমায়েদা। মনে হলো কিছুটা সতেজ হয়েছে সে, যার মানে দাঁড়ায় এখন শরীর থেকে ঘাম ছাড়বে তার।

'আসলে পুরোনো অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছিলাম।' ইমায়েদা বিয়ারটা নামিয়ে রাখলো হাত থেকে। 'তুমি বলেছিলে যে তোমার মনে হচ্ছে কেউ একজন তোমার ঘরে এসেছিলো। আর ফোনের জায়গাও পরিবর্তিত হয়েছে। তার মানে কেউ একজন তোমার ফোনে কিছু একটা করেছে এটা বোঝা যায়, ঠিক?'

'হ্যাঁ, ব্যাপারটা তো সেরকমই মনে হচ্ছিলো।'

'এই ব্যাপারটা ধরার জন্য বিশেষ ধরনের প্রফেশনাল জ্ঞানের প্রয়োজন—এটাই বলতে মন চাইছিলো আর কি। যাই হোক, তুমি ঠিকই ধরেছ,' আরেক চুমুক বিয়ার খেয়ে বললো সে। 'তুমি আসলেও শিওর যে কে করতে পারে তার কোনো ধারণাই নেই তোমার?'

'নিশ্চিত আমি। কেউই করার নেই এমন,' বিছানার পাশে বসতে বসতে বললো এরি।

'যার মানে দাঁড়ায়,' বললো ইমায়েদা, 'ওরা আমার পেছনে লেগেছে।'

'তোমার পেছনে?'

'তুমি বলেছিলে ওরা তোমার ফোনে কিছু ম্যাসেজ রেখে গেছিলো যা দেখে দুশ্চিন্তা হচ্ছিলো তোমার, তাই না? তো তারপর তুমি কী করলে? তুমি আমাকে ফোন করলে। আর এটাই তোমাকে দিয়ে করাতে চেয়েছিলো তারা। অন্য কথায় বলতে গেলে, সেই ম্যাসেজগুলো পড়ার পরে প্রথমেই যাকে ফোন করবে তুমি, তাকেই ফোন করাতে চেয়েছিলো তারা।'

'তাতে তাদের কী আসবে যাবে?'

'তারা জানবে যে কার সাথে কথা বলছো তুমি, তোমার বন্ধু-বান্ধব কারা, প্রয়োজনের সময় কাদের ফোন করো ইত্যাদি।'

'বুঝতে পারছি না এসব জেনে কারো কী লাভ হতে পারে। মানে, আমাকে জিজ্ঞেস করলেই তো হতো। আমার ফোনে বাগ রাখার তো কোনো প্রয়োজন ছিলো না।'

'পরিষ্কারভাবে বললে, তারা আসলে তোমার ব্যাপারে জানতে চাচ্ছিলো তোমাকে না জানিয়ে। ফ্যাক্টস নিয়ে আলোচনা করা যাক। আমাদের পেছনে লাগা লোকটা কারো নাম এবং পরিচয় জানতে চাচ্ছে। তাদের একমাত্র লিড হচ্ছো তুমি। তাই তোমার কাছাকাছি বা পরিচিত যত মানুষ আছে তাদের সম্পর্কে জানতে চাচ্ছে তারা।' বিয়ার শেষ করে খালি বোতলটা হাতের মধ্যে মুচড়ে নিলো ইমায়েদা। 'তো এখন বলো, এমন কারা আছে যারা তোমাকে চেনে এবং আমাকে জানতে চায়?'

মেঝের দিকে তাকিয়ে যে হাত খালি ছিলো সে হাতের বুড়ো আঙুল মুখে নিয়ে ভাবতে লাগলো এরি। 'দক্ষিণ আওইয়ামার সেই বুটিক শপের মানুষগুলো?'

'দারুণ একটা গেস করেছ,' বললো ইমায়েদা। 'আমার মনে হয় তুমি ওদের ঠিকানাটা দিয়েছিলে। কিন্তু আমি কিছুই দিইনি। যদি আমার সম্পর্কে তারা জানতে চায়, তবে তোমার মাধ্যমে জানতে চাইবে।'

'কিন্তু ওরা কেন তোমাকে নিয়ে পড়বে? তোমার কি মনে হয় ওরা ধরে ফেলেছে যে তুমি একজন গোয়েন্দা?'

'ওদের জানতে চাওয়ার পেছনে অনেকগুলো কারণ আছে,' হেসেই বললো ইমায়েদা। 'কিন্তু সেগুলো একেকটা বিশাল কাহিনি।'

কাজুনারির ঘড়িটার কথা হঠাৎ মনে পড়লো ইমায়েদার। ইউকিহো নিশ্চয়ই জানতো ওটা কাজুনারির। আর তাছাড়া, সে অবশ্যই জানতে চাইবে যে এরকম একটা ঘড়ি পরে তার দোকানে কে গেল দেখা করতে। হয়তো এরি সুগাওয়ারাকে মূল হোতা ধরে নিয়ে ইমায়েদার লাইনেরই কাউকে সে নিয়োগ দিয়েছে ওর বিষয়ে খোঁজ লাগাতে।

এরির সাথে একটু আগে ফোনে কী কী কথা হয়েছিলো তা মনে করার চেষ্টা করলো সে। ওকে 'ইমায়েদা' বলে ডেকেছিলো এরি। যার কারণে ইমায়েদা যে এই অ্যাপার্টমেন্টের কাছাকাছি প্রাইভেট গোয়েন্দা সংস্থা চালায় তা বের করা ওদের জন্য সময়ের ব্যাপার মাত্র।

'কিন্তু আমি তো ওদের কোনো সঠিক ঠিকানা দেইনি। আমার মনে হলো ওরকম ধনী সেজে গিয়ে যদি এরকম "ইয়ামামোতো কো-অপ" নামের একটা অ্যাপার্টমেন্টের ঠিকানা দিই, তবে কেমন দেখায় না? যার কারণে অদল-বদল করে দিয়েছিলাম অনেক কিছু।'

'দিয়েছিলে আসলেই?'

'হ্যাঁ, মানে একজন প্রাইভেট গোয়েন্দার এসিস্ট্যান্ট যেহেতু, সেহেতু কিছু জিনিস তো আমারও জানা আছে।'

ইমায়েদা সেই দোকানে যাওয়ার কথা মনে করার চেষ্টা করলো। সেদিন কোন ভুলটা করেছিলো তারা?

'তুমি কি তোমার ওয়ালেট নিয়ে গেছিলে সেদিন?' জিজ্ঞেস করলো ইমায়েদা।

'হ্যাঁ, তা তো নিয়েছিলামই।'

'তোমার হ্যান্ডব্যাগে ছিলো ওটা তখন?'

'আহ...হাঁ।'

'সেদিন অনেক জামা-কাপড় চেঞ্জ করেছিলে তুমি, তো ব্যাগটা কোথায় রেখেছিলে?'

'উমমম...ড্রেসিং রুমেই হয়তো রেখেছিলাম।'

'তো সেখানে ফেলে রেখেই অন্যান্য জামা-কাপড়ের দিকে চলে গেছিলে বারবার?'

মাথা দোলালো এরি। ভ্রুকুটি করা শুরু করেছে সে।

'তোমার ওয়ালেটটা একবার দেখা পারবে?' বাম হাত বের করে পেতে রইলো ইমায়েদা।

'হেই, ওটায় টাকা আছে অনেক!'

'আরে রাখো তোমার টাকা! টাকা ছাড়া আর কী আছে তা দেখতে চাচ্ছি আমি।'

এরি বিছানার পাশের দেয়ালে ঝোলানো ব্যাগটার দিকে হাত বাড়ালো, সেখান থেকে বের করে আনলো ছোট কালো একটা ওয়ালেট। একপাশে চামড়ার গায়ে গুচি ব্র্যান্ডের লোগো দেখা যাচ্ছে।

'তোমার ওয়ালেটটা তো বেশ ভালোই।'

'বস গিফট দিয়েছিলো।'

'বারের? মানে ঐ গোঁফওয়ালা লোকটা?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওটাই।'

'বাহ, মজার তো!' বলে উঠলো ইমায়েদা। ওয়ালেটটা খুলে পকেট চেক করতে লাগলো কোনো রকম কার্ড আছে কি না তা দেখতে। এরির লাইসেন্স পেল সে, সাথে একটা স্থানীয় ডিপার্টমেন্ট স্টোরের সদস্য কার্ড আর হেয়ারড্রেসারের লয়ালটি কার্ডও পেল। বের করে একবার চোখ বোলালো ওতে। সেখানেই তার ঠিকানা লেখা আছে।

'তুমি বলতে চাচ্ছো কেউ একজন আমার ওয়ালেটে উঁকি মেরেছে?' জিজ্ঞেস করলো এরি।

'সম্ভব এটা করা। ষাট পার্সেন্ট নিশ্চয়তা দিতে পারবো আমি। হয়তো এর থেকেও কিছুটা বেশি।'

'নাহ, বিশ্বাস করি না আমি! মানুষ কি এমন করে নাকি? তার মানে কি ওরা আমাকে প্রথম থেকেই সন্দেহ করেছিলো?'

'হ্যাঁ।' ইমায়েদা নিশ্চিত ঘড়িটা নজরে আসার পরেই সন্দেহ করা শুরু করেছিলো ইউকিহো। এই মেয়ের পক্ষে কারো ওয়ালেট ঘেঁটে দেখাটা খুবই সম্ভব। কথাটা ভাবতেই সেই বিড়ালের মতো চোখগুলোর কথা মাথায় এলো ইমায়েদার।

'তাহলে কেন শেষে আমাকে আমার নাম আর ঠিকানা লিখতে বললো সে? নিশ্চয়ই কোনো পোস্টকার্ড পাঠানোর জন্য তা করেনি, তাই না?'

'হয়তো নিশ্চিত করে নিচ্ছিলো তথ্যগুলো।'

'নিশ্চিত করে নিচ্ছিলো? কী নিশ্চিত করে নিচ্ছিলো?'

'হয়তো ওরা দেখতে চাচ্ছিলো তুমি তোমার আসল নাম আর ঠিকানা লেখো কি না। যেটা তুমি করোনি।'

কিছুটা দুঃখী চেহারায় তাকালো এরি। 'নাম্বারে কিছুটা পরিবর্তন করেছিলাম আমি।'

'যার জন্যই সে বুঝতে পেরেছে আমরা পোশাক কিনতে যাইনি সেখানে।'

'সরি, এতটা চালাকি করা উচিত হয়নি আমার।'

'সমস্যা নেই, এমনিতেও সন্দেহ করেছিলো আমাদের।' ব্যাগটা নিয়ে দাঁড়িয়ে গেল ইমায়েদা। 'লক করার সময় ভালো করে খেয়াল রেখো। যদিও এখন জেনে গেছ যে যেভাবেই লক করো না কেন তোমার অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকতে কোনো পেশাদারের সমস্যা হবে না। যখন বাড়িতে থাকবে, তখন চেইন লাগিয়ে রাখবে, কেমন?'

'আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি।'

'আবার দেখা হবে,' স্নিকার পরতে পরতে বললো ইমায়েদা।

'ঠিকমতো থাকবে তো তুমি, ইমায়েদা? তুমি কি নিশ্চিত যে তারা কোনো রকম আক্রমণ করবে না?'

হাসলো ইমায়েদা। 'কী মনে হয় আমাকে তোমার? জেমস বন্ড? না, চিন্তার কিছু নেই। সর্বোচ্চ যা করতে পারে তা হলো, যমের মতো দেখতে কিছু খুনি লাগিয়ে দেবে আমার পেছনে।'

'কী?' দম ছেড়ে বললো এরি।

'গুডনাইট,' হেসে বললো ইমায়েদা। 'আর লক করতে ভুলো না যেন।'

বাইরে বেরিয়ে গিয়ে দরজাটা লাগিয়ে দিলো সে। কিন্তু তৎক্ষণাৎই চলে গেল না সে। যতক্ষণ পর্যন্ত না লক ঘুরলো এবং চেইন তোলার শব্দ না শুনলো, ততক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রইলো সেখানে, এরপর চলে গেল।

ভাবছি এবার কে আসবে?

আকাশের দিকে তাকালো ইমায়েদা। হালকা গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে, কিন্তু ভিজতে ততটা মন্দও লাগছে না তার।

পরের দিন এই গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি ভারী বর্ষণে রূপ নিলো। অন্তত গরম কমানোর জন্য এর প্রভাবটা দরকার ছিলো। ঘাম বের করে দেওয়া মধ্য আগস্টের সকালটা একটু সহনীয় হয়েছে শেষমেশ।

নয়টা বাজার কিছু পরে বিছানা ছেড়ে উঠলো ইমায়েদা। এরপর একটা টি-শার্ট আর জিন্স পরে নিলো সে। একটা ছাতা মাথার উপরে নিয়ে বোলেরো নামের ছোট একটা ক্যাফেতে ঢুকলো সে। যেটা কিনা তার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বের হয়েই যাবে রাস্তার ওপাশে।

কাঠের দরজাটায় একটা বেল লাগানো, সেটায় শব্দ করেই ভেতরে ঢুকলো সে। বোলেরো ক্যাফেটা বেশ ছোট, একটা কাউন্টার আর সাথে চারটা টেবিল।

কাউন্টারের ওপাশে থাকা টাকলা মালিকটা ইমায়েদাকে দেখে একটু মাথা নুইয়ে বাউ করলো।

পেছন দিকের একটা টেবিলে বসলো ইমায়েদা। সকালের নাস্তা করার জন্য বেশ দেরি হয়ে গেছে। আর যদি কোনো বড় গ্রুপ দোকানে ঢুকে পড়ে, তবে কাউন্টারে সরে যেতে হবে তাকে। অর্ডার দেওয়ার প্রয়োজন নেই তার। কয়েক মিনিটের মাথায় দোকানি তাকে হট ডগ মর্নিং সেট দিয়ে যাবে এসেঃ একটা গরম গরম কফি আর কুচিকুচি করে কাটা বাঁধাকপির মাঝে মোটাসোটা একটা সসেজ।

তার টেবিলের পাশে কিছু ভাঁজ করা নিউজ পেপার রাখা। ওগুলোর অনেকগুলো রেগুলার পেপার আর কিছু বিজনেস পেপার। কাউন্টারে থাকা লোকটা খেলার পাতাটা নিয়ে গেছে। *আসাহি শিমবান*[২০]-এ চোখ বোলালো সে একবার। হেলান দিয়ে যেই না পত্রিকাটা খুলতে যাবে, অমনি দরজায় সেই ঘণ্টা পড়ার শব্দ শুনলো। মাথা তুলে দেখলো একটা লোক ঢুকেছে।

দেখে মনে হচ্ছে ষাটের কাছাকাছি বয়স লোকটার। সাথে মাথায় সাদা সাদা চুল। আকারে বেশ বড়সড়ো, চওড়া কাঁধ যেন পরনের শার্টের ভেতর থেকেই মাপা যাচ্ছিলো। সাথে পেশিবহুল বাহু তো আছেই। অন্ততপক্ষে এক দশমিক সত্তর মিটার লম্বা সে। আর দাঁড়ালোও এমন টানটান হয়ে যে মনে হলো কোনো সামুরাই মুভির নায়ক।

এসবের থেকে যেটা ইমায়েদার বেশি নজর কাড়লো তা হলো লোকটা ঢুকেই সোজা ইমায়েদার দিকে তাকালো। এক মুহূর্তের জন্য ছিলো সময়টা। এরপরেই ভেতরে ঢুকে একটা সিট নিয়ে কাউন্টারের উদ্দেশে বললো, 'কফি, প্লিজ।'

পত্রিকায় মনোনিবেশ করলো ইমায়েদা। কিন্তু লোকটার বলা কথাগুলো...ইমায়েদা আবারো তাকালো লোকটার দিকে। গলায় ওরকম ওসাকার টান শুনে বেশ অবাক হয়েছে সে।

আর ঠিক তখনই লোকটাও তাকালো তার দিকে। এক মুহূর্তের জন্য দুজনের দৃষ্টি মিলে গেল।

কোনো রকমের হুমকি বা শত্রুতা ছিলো না লোকটার চোখে। অন্যদিকে, তার চোখ দেখে মনে হচ্ছিলো জীবনের কালো অধ্যায়গুলো দেখেছে সেগুলো। যেন মানুষের জীবনে যত রকমের সমস্যা আসতে পারে তার সবটুকু সাদরে গ্রহণ করেছে লোকটা।

যেই হোক না কেন, পুরোপুরি ঠান্ডা মাথার লোক সে, ভাবলো ইমায়েদা। মেরুদণ্ড বেয়ে শীতল একটা শিহরন খেলে গেল তার।

পত্রিকার *সমাজের অবস্থা* অংশটা পড়তে শুরু করলো ইমায়েদা। ১৮ চাকার একটা গাড়ির দুর্ঘটনার খবর থাকা সত্ত্বেও ইমায়েদার মনোযোগের মাত্র অর্ধেক পড়ে রয়েছে পত্রিকাতে।

দোকানের মালিক তার হট ডগ নিয়ে এসেছে এরমধ্যে। ইমায়েদা কিছু মাস্টার্ড আর সস মেখে নিলো সেটাতে কামড় বসানোর আগে। মাংসের টুকরোটা দাঁতে লাগতেই বেশ ভালোলাগা শুরু করলো তার। হট ডগটা অতটা শক্তও না যে খেতে কষ্ট হবে, আবার অতটা নরমও না যে প্রথম কামড়ের স্বাদটা পাবে না। যে স্থিতিস্থাপকতা ওটার মধ্যে ছিলো, ইমায়েদার মতে তা একটা ভালো হট ডগের মধ্যেই কেবল থাকে।

খাওয়ার মধ্যে আর লোকটার দিকে তাকাবে না বলে ঠিক করলো ইমায়েদা কারণ আবার চোখে চোখ পড়ে যাক তা চাচ্ছে না সে। শেষ কামড়টা দেওয়ার পর কফির কাপে চুমুক দেওয়ার আগে একবার কাউন্টারের দিকে তাকাতেই দেখলো লোকটা তার কফির কাপের দিকে মাথা নিচু করে তাকাচ্ছে।

আমার দিকেই তাকিয়ে ছিলো তাহলে!

কফি শেষ করে উঠে দাঁড়ালো ইমায়েদা। পকেটে হাত ঢুকিয়ে হাজার ইয়েনের একটা নোট বের করে বিলের খামে রেখে দিলো সে। দোকানের মালিক চুপচাপ বাকি চারশো পঞ্চাশ ইয়েন গুছিয়ে রাখলো কাউন্টারে। ঐ সময়টাতে খুব অল্পই নড়াচড়া করেছে লোকটা। নিজের কফিটাই খাচ্ছিলো কেবল। এরপর ঘড়ির কাঁটার মতো বেঁকে গেল সে, ইমায়েদার দিকে তাকালোও না।

ছাতা না খুলেই ক্যাফে থেকে বেরিয়ে এলো ইমায়েদা। দৌড়ে গিয়ে নিজ অ্যাপার্টমেন্টের সিঁড়িতে উঠতে লাগলো। ঢোকার আগে অবশ্য একবার পেছনে ফিরে দেখলো লোকটার কোনো হদিস নেই আর।

দেয়ালের পাশে সেট করা স্টেরিও সুইচ চাপলো ইমায়েদা, শুনতে পাচ্ছে সিডি প্লেয়ারটা কড়কড় আওয়াজ করে গান বাজানো শুরু করছে। এরপরেই হুইটনি হাউজটনের গান বেজে উঠলো ওটাতে।

গোসল করার জন্য শার্ট খুলে ফেললো সে। রাতে ঘুমুতে যাওয়ার আগে গোসল করার অভ্যাস তার, কিন্তু কাল রাতে করতে পারেনি আর আজকে চুলটুল সব এলোমেলো হয়ে আছে। প্যান্টটা খুলতে যাবে, অমনি দরজায় বেল বাজালো কেউ।

পরিচিত শব্দ, অথচ আজকে কেন যেন অন্য রকম লাগছে শব্দটা। সম্ভবত দরজার ওপাশে কে থাকতে পারে তা বুঝে যাওয়ার কারণে হচ্ছে এটা। আর যেই হোক না কেন, তার সাথে কথা বলতে চাচ্ছে না সে।

আবারো বাজলো বেলটা।

ইমায়েদা আবারো প্যান্ট পরে নিয়ে শার্টটা গায়ে জড়ালো। ভাবছে কখন আবার সুযোগ পাবে গোসল করার। মূল দরজার সামনে গিয়ে লক খুলে দরজাটা মেললো সে।

সেই ক্যাফের লোকটা দাঁড়িয়ে আছে, অসহ্য একটা হাসি লেগে আছে মুখে। তার বাম হাতে একটা ছাতা আর ডান হাতে একটা ব্যাগ।

পলক ফেললো না ইমায়েদা। 'জি?' জিজ্ঞেস করলো সে।

'মি. ইমায়েদা?' জিজ্ঞেস করলো লোকটা। বলার ভঙ্গিতে ওসাকার টান স্পষ্ট। 'মানে সাতোশি ইমায়েদা তো আপনিই, তাই না?'

'হ্যাঁ, আমিই।'

'কিছু প্রশ্ন করার ছিলো আপনাকে, যদি সময় থাকে আর কি আপনার হাতে।' লোকটার গলা বেশ গভীর, কথা বললে সরাসরি বুকের মধ্যে এসে লাগে। মুখের উপরে একটা দাগ রয়েছে, যেটা দেখলে মনে হয় বাটালি দ্বারা কেউ কেটে দিয়েছে একদম। অবশ্য, দাগটা দেখে মনে হলো ব্লেড দিয়েও কেউ করতে পারে কাজটা।

'সরি, আপনি কে?'

'আমার নাম সাসাগাকি। ওসাকা থেকে এসেছি।'

'আচ্ছা...বেশ দূর থেকে এসেছেন দেখছি, তাই আশাহত করতে দুঃখবোধ হচ্ছে, মি. সাসাগাকি। আসলে কাজে যাচ্ছিলাম আমি।'

'বেশিক্ষণ সময় নষ্ট করবো না আপনার,' বললো লোকটা। 'শুধু দুই-তিনটা প্রশ্ন, এই-ই যা।'

'অন্য কোনো এক দিন আসতে পারবেন? আসলে আজকে একটু তাড়া আছে আমার।'

'অতটা তাড়াও মনে হয় না আপনার আছে। এই একটু আগেই তো খুব আয়েশ করে পেপার পড়তে পড়তে সকালের নাস্তা করলেন,' বললো লোকটা। মুখের কোণে একটু হাসি ফুটে উঠলো।

'আমার সময় আমি কোথায় ব্যয় করবো তা জানা আপনার কাজ না। গুডবাই,' দরজা বন্ধ করতে করতে বললো ইমায়েদা। লোকটা ছাতা এগিয়ে দিয়ে বন্ধ করা থেকে থামালো দরজাটা।

'কাজের প্রতি আপনার আগ্রহ দেখলে প্রশংসাই করতে হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, এটাও আমার একটা কাজ।' ধূসর রঙের ট্রাউজারের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে বলে উঠলো লোকটা। এরপর পকেট থেকে পুলিশের একটা ব্যাজ বের করলো সে।

ইমায়েদা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে দরজার নবে ঢিল দিলো। 'পুলিশই যেহেতু আপনি, তাহলে আগে বলেননি কেন?'

'অনেক মানুষ আছে যারা চায় না আমরা দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে পরিচয় দেই, পাছে আশেপাশের মানুষ শুনে ফেলে তাই। এখন আপনাকে কিছু প্রশ্ন করতে পারি?'

'ভেতরে আসুন।' বাইরের কোনো ক্লায়েন্ট এলে যে চেয়ারটায় বসতে বলে, ওটা দেখিয়ে বললো ইমায়েদা। নিজে গিয়ে ডেস্কের ওপাশের চেয়ারে বসলো।

ক্লায়েন্টের চেয়ারটার উচ্চতা ইচ্ছে করেই একটু কম রেখেছিলো যাতে দরাদরির বিষয়ে কিছুটা সুবিধা পায়। যদিও আজকের এই আগন্তুকের ক্ষেত্রে সেই ট্রিক যে কাজে দেবে না তা ভালোই বুঝতে পারছে ইমারেদা।

একটা বিজনেস কার্ড চাইলেও লোকটা নেই বলে চালিয়ে দিলো। লোকটা যে মিথ্যা বলছে, কিন্তু এখনই তাকে মিথ্যাবাদী প্রমাণ করতে চাইলো না ইমারেদা। তার পরিবর্তে পুলিশের ব্যাজটা আবার দেখাতে বললো সে।

'যদি ওটা নকলও হয়, তবুও আমি দেখতে চাই আপনি ঠিক কতটুকু শ্রম ঢেলে ফেলেছেন,' বলে উঠলো ইমারেদা।

'যা কিছু ভাবার ভেবে নিন,' ইমারেদাকে ব্যাজটা দিতে দিতে বললো লোকটা।

ইমারেদা নাম আর ছবিটার দিকে তাকালো একবার।

'আশা করি পরীক্ষা করা হয়ে গেছে,' ব্যাজটা ফেরত নিয়ে বললো সাসাপাকি 'হোকিসাইচের গোয়েন্দা আমি। পূর্ব ওসাকার।'

'তার মানে এটা কোনো হত্যার তদন্ত?' জিজ্ঞেস করলো ইমারেদা। অবাক হয়েছে সে।

'চাইলে বলতে পারেন।'

'চাইলে বলতে পারেন মানে? আমার জানামতে তো কোনো মার্ডারের সঙ্গে আমি জড়িয়ে নেই।'

'আপনি জানেন না মানে তো এই না যে ঘটনাটা ঘটেনি।'

'আচ্ছা,' হাত উঁচু করে বললো ইমারেদা। 'তো কে মরেছে?'

হাসলো সাসাপাকি। গালের দাগটা অন্য রকম একটা প্যাটার্নে গিয়ে ঠেকলো হাসার কারণে। 'আগে আমার কিছু প্রশ্ন রয়েছে আপনার জন্য, মি. ইমারেদা। যদি কিছু মনে না করেন, তবে করবো সেগুলো। সোজাসাপটা উত্তর দিলে কৃতজ্ঞ হবো।'

চোখ ছোট করে গোয়েন্দার দিকে তাকালো ইমারেদা। লোকটা মৃদু দোল খাচ্ছে চেয়ারে বসে, কিন্তু চেহারার ভাবভঙ্গি একদম অবিচল।

'ঠিক আছে, করুন। কী চান আপনি?'

সাসাপাকি ছাতার মাথাটা মেঝেতে রেখে হাত দিয়ে বাঁটটার উপরে ভর দিলো। 'আমার বিশ্বাস দুই সপ্তাহ আগে আপনি ওসাকাতে গেছিলেন? ওই শহরের কিছু জায়গায়, ইকুনো ওয়ার্ডের আশেপাশের মানুষদের কাছে সম্ভবত, যদি আমি কোনো ভুল না করে থাকি।'

ইমারেদার মনে হলো তার টুঁটি চেপে ধরেছে কেউ। যখনই শুনেছে লোকটা ওসাকার, তখন থেকেই তার মনে খুঁতখুঁত করছিলো যে সেই ট্রিপ নিয়েই এই লোকের আগমন কি না।

'গেছিলেন?' আবারো জিজ্ঞেস করলো সাসাগাকি। যদিও তার বলার ভঙ্গিতে মনে হচ্ছিলো উত্তরটা জানে সে।

'হ্যাঁ, গেছিলাম,' স্বীকার করলো ইমায়েদা। 'ঠিক তথ্যই জেনেছেন।'

'যখন কোনো নির্দিষ্ট এলাকার ব্যাপারে কথা আসে, তখন কোন বাড়ির বিড়ালটা প্রেগন্যান্ট তাও বলে দিতে পারি আমি, সেই সাথে তার বাপ কোন বিড়ালটা তাও বের করতে সময় লাগে না,' বললো সাসাগাকি, নিঃশব্দ হাসি হাসছে এখন। ইমায়েদা কেবল তার ঠোঁটের ফাঁকাস্থান দিয়ে বাতাস বেরোনোর শব্দই শুনতে পাচ্ছে। কিছুক্ষণ বাদে হালকা হেসে আবার জিজ্ঞেস করলো সাসাগাকি, 'কীসের জন্য গেছিলেন সেখানে?'

মাথার ভেতর ঝড় বইছে ইমায়েদার, লোকটার প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে। 'কাজে গেছিলাম।'

'আর সেই কাজটা কী?'

এবার হাসলো ইমায়েদা, যাতে বোঝা যায় যে সে ভয় পাচ্ছে না। 'এটা বলবেন না যে আপনি এখনো জানেন না আমার কাজটা কী, ডিটেকটিভ।'

'বেশ চমৎকার একটা কাজ কিন্তু এটা,' শেলফে থাকা কেসের ফাইলগুলোর দিকে তাকিয়ে বললো সাসাগাকি। 'আমার পরিচিত এক বন্ধুও একই লাইনের কাজ করে ওসাকাতে। যদিও আপনাকে বলতে পারবো না কেমন যাচ্ছে তার ব্যবসা।'

'এজন্যই গেছিলাম আমি সেখানে, মানে কাজের জন্য আর কি।'

'তো ইউকিহো কারাশাওয়ার ব্যাপারে খোঁজ নেওয়াটা আপনার কাজ ছিলো?'

এবার মূল ফোকাসে আসা শুরু করেছে বিষয়গুলো, ভাবলো ইমায়েদা। সে ভেবে পাচ্ছে না তার কাছাকাছি কী করে এলো তারা, এরপরেই মনে পড়লো ফোনে লাগানো সেই বাগের কথা।

'যদি আপনি একটু খুলে বলেন যে কেন ইউকিহো কারাশাওয়ার অতীত আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ ঠেকলো, তবে খুব সমীহ করবো আপনাকে,' ইমায়েদার দিকে তাকিয়ে নির্জীব সুরে বললো সাসাগাকি।

'যদি আপনার এই লাইনের এক বন্ধু থেকে থাকে, তবে তো আপনার জানার কথা যে আমার ক্লায়েন্ট সম্পর্কে আমি কিছু বলতে পারবো না।'

'তার মানে কেউ আপনাকে নিয়োগ দিয়েছে ইউকিহোর অতীত ঘেঁটে দেখতে?'

'ঠিক ধরেছেন,' বললো ইমায়েদা। তার ভাবনায় এলো কেন গোয়েন্দা ইউকিহো কারাশাওয়াকে তার প্রথম নামে ডাকলো, কেন মিস কারাশাওয়া ডাকলো না। হয়তো গোয়েন্দারা এভাবেই বলে থাকে, নয়তো এই দুজন খুব ক্লোজ। অথবা অন্য কোনো ব্যাপার আছে এখানে...

'বিয়ে নিয়ে কিছু নাকি?' হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসলো সাসাগাকি।

'হাঁহ?'

'শুনেছি কেউ একজন প্রপোজ করেছে তাকে। এতে বোঝা যাচ্ছে যে তার অতীতটা একবার দেখতে চাইবে তারা।'

'কী বলছেন এসব?'

'বিয়ে।' অদ্ভুত হাসি দিলো সাসাগাকি। ডেস্কের উপরে থাকা অ্যাশট্রের দিকে নজর পড়তেই বললো, 'কিছু মনে না করলে একটা সিগারেট ধরাতে পারি?'

'সমস্যা নেই,' জবাব দিলো ইমায়েদা।

শার্টের পকেট থেকে হাই-লাইটের প্যাকেটটা বের করলো সাসাগাকি। প্যাকেটটা দুই দিকে ভাঁজ হয়ে গেছে, যার কারণে যে সিগারেটটা বের করলো সে তাতেও দুটো ভাঁজ পড়েছে। পরিচিত একটা ম্যাচ থেকে আগুন ধরালো সে-রাস্তার ওপাশে থাকা সেই বোলেরোর ম্যাচ ওটা।

মুখ থেকে অনেকগুলো ধোঁয়া বের করলো গোয়েন্দা, যার মানে দাঁড়ায় গোয়েন্দার কোনো তাড়া নেই এই মুহূর্তে। একটু পাক খেয়ে ধোঁয়াগুলো সিলিংয়ের দিকে উঠে বাতাসে মিশে গেল।

পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে সে আসলে ইমায়েদাকে ভাবতে সময় দিচ্ছে। কয়েকটা তাসের কার্ড সে মেরে দিয়েছে এরমধ্যে, এখন অপেক্ষা করছে ইমায়েদা কোন কার্ডটা ফেলে তার জন্য। ক্যাফেতে বসে দেখা দেওয়ার মানে ছিলো ইমায়েদা যে কারো নজরে আছে তা জানান দেওয়া। ভালো করে বলতে গেলে এটা জানান দেওয়া যে তার হাতে ভালো মাধ্যম রয়েছে। গোয়েন্দার চেহারা নিঃসাড় হয়ে আছে এই মুহূর্তে, কিন্তু চোখের ভেতর একধরনের ধূর্ততা কাজ করছে।

ইমায়েদার খুব ইচ্ছা করছে জানতে যে কোন মাধ্যমটা তার হাতে রয়েছে আসলে। ইউকিহো কারাশাওয়ার পেছনে কোনো হোমিসাইড গোয়েন্দা কেন লাগবে? যদিও এখনো সে বলেনি যে সে ইউকিহোর পেছনেই লেগেছে। যে জিনিসটা সে এই মুহূর্তে বুঝতে পারছে তা হলো, এই লোকটা ইউকিহোর ব্যাপারে বেশ ভালো করেই জানে।

'আমিও মিস কারাশাওয়ার বিয়ের ব্যাপারটা শুনেছি,' কয়েক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে বললো ইমায়েদা। 'কিন্তু সেটা আমার ইনভেস্টিগেশনের অন্তর্ভুক্ত ছিলো কি না তা বলা আমার পক্ষে সম্ভব না।'

স্বস্তিদায়ক মাথা দোলালো সাসাগাকি। আঙুলের ফাঁকে সিগারেটের ফিল্টারটা দুলছে। এরপরই আস্তে করে টোকা দিয়ে ছাইটা অ্যাশট্রেতে ফেললো সে। 'মি. ইমায়েদা,' বললো সে, 'আপনার কি মারিওর কথা মনে আছে?'

'এক্সকিউজ মি?'

‘*সুপার মারিও ব্রোস*, কয়েক বছর আগের বেস্ট সেলার পণ্য। ঐ বাচ্চাদের গেমসগুলোর মধ্যে একটা। যদিও অনেক প্রাপ্তবয়স্ককেও খেলতে দেখেছি সে সময়।’

‘ওহ, নিনটেন্ডোর গেম। হ্যাঁ, মনে আছে তো।’

‘আসলে, সেই সময়ে এক লোক ওটার নকল কপি ওসাকাতে বিক্রি করার চেষ্টা করেছিলো। কয়েকটা পাইরেটেড এডিশন বের করেছিলো তারা, এবং সেটা বাজারে এনেছিলো। তারা হয়তো আরো কয়েকটা বানাতো, কিন্তু তার আগেই তাদের প্রত্যেককে সময়মতো পুলিশ ধরে ফেলে, সেই সাথে পাইরেটেড সবগুলো কপিই বাজেয়াপ্ত করে। কিন্তু পুলিশ এটা খুঁজে পায়নি যে সে সময় কে আসলে এই পাইরেসির কাজটা করেছিলো।’

‘ভেগে গেছে?’

‘পুলিশও তাই ভেবেছিলো। এখনো তাই ভাবছে।’ ভাঁজ করা ব্যাগটা খুলে একটা প্রচারপত্র বের করলো সাসাগাকি। প্রচারপত্রের ভাঁজটা খুলে টেবিলের উপর ইমায়েদাকে দেখানোর জন্য রাখলো সে। একদম নিচে ‘*এই লোককে কোথাও দেখেছেন?*’ শিরোনামের নিচে একটা পঞ্চাশের মতো বয়সের লোকের ছবি দেওয়া। চুলগুলো পেছনে গুটিয়ে রেখেছে লোকটা। তার নিচে নামের জায়গায় লেখা: ইসামু মাতসুরা।

‘কেসের কারণেই জিজ্ঞেস করছি, আপনি কি এই লোকটাকে দেখেছেন কখনো?’

‘দুঃখিত, একে কোথাও দেখিনি আমি।’

‘আমারও মনে হয় না দেখেছেন আপনি,’ কাগজটা ভাঁজ করে ফের পকেটে ভরতে ভরতে বললো সাসাগাকি।

‘তো আপনি এই মাতসুরা নামের লোকটার পেছনে লেগেছেন?’

‘কথার প্রেক্ষিতে ধরতে পারেন।’

‘মানে কী?’ সাসাগাকির চোখের দিকে তাকালো ইমায়েদা। কিন্তু সাসাগাকি পরিচিত একটা হাসি দিলো।

আচমকা ইমায়েদা ধরতে পারলো, সাসাগাকি *সুপার মারিও ব্রোস*-এর কথা তোলার সময় থেকেই কেন ওর খুঁতখুঁত লাগছিলো। হোমিসাইডের কোনো গোয়েন্দা একটা পাইরেটেড গেম নিয়ে কেন পড়ে থাকবে? তার মানে, সে যে বললো পুলিশ ‘ভাবছে’ মাতসুরা পালিয়ে গেছে, এই কথার অর্থ হলো মাতসুরা মরে গেছে। এই গোয়েন্দার কথা শুনে মনে হচ্ছে সেও তাই বিশ্বাস করে। আর সে মাতসুরাকে খুঁজতে আসেনি, এসেছে তার মৃতদেহ খুঁজতে, নয়তো যে খুন করেছে তাকে।

‘এই লোকটার সাথে কি ইউকিহো কারাশাওয়ার কোনো সংযোগ রয়েছে?’

‘সরাসরি তো কিছু নেই। অন্তত আমার জানামতে।’

মাথা ঝাঁকালো ইমায়েদা। 'আচ্ছা, আমি দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ছি। এসবের সাথে আমার কী সম্পর্ক? আমাকে কেন বলছেন এসব?'

'সেই সময়ে আরেকটা লোক ছিলো যে কিনা মাতসুরার এই নিখোঁজ হওয়ার সময়ে গায়েব হয়ে যায়,' বললো সে। 'সেই গেম নকল করার পেছনে সেই লোকটারও হাত থাকার সম্ভাবনা অনেক। আর...' থামলো গোয়েন্দা। বলার জন্য সঠিক শব্দ খুঁজতে লাগলো সে। 'আর সে সম্ভবত ইউকিহোর আশেপাশেই আছে।'

'তার আশেপাশে বলতে?' জিজ্ঞেস করলো ইমায়েদা। 'মানে কী এটার?'

'যেরকমটা শুনেছেন। কোথাও লুকিয়ে আছে সে। কখনো কুচো চিংড়ির নাম শুনেছেন?'

'মানে চিংড়ির কথা বলছেন, ঐ সমুদ্রে থাকে যেগুলো?'

'হ্যাঁ, কুচো চিংড়ি বসবাস করার জন্য ছোট গর্ত করে পানির তলে। কিন্তু প্রায় সময়ই তার কিছুক্ষণ পরেই আরেকটা প্রাণী এসে সেই গর্তে বাসা বাঁধে-গোবি নামের একটা মাছ। গোবি মাছটা যে কোনো ধরনের বিনিময়মূল্য ছাড়াই চিংড়ির বাসায় থাকে তা না। চিংড়ির সেই গর্তে থাকার বিনিময়ে একটা অদ্ভুত কাজ করে সে। কোনো শত্রুর আগমন ঘটলে গর্তের মুখে বসে তার লেজ নাড়িয়ে চিংড়িকে সংকেত দেয় যে শত্রু আসছে। জীববিজ্ঞানীরা একে মিথোজীবিতা বা দুটি আলাদা জীবের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন।'

'সোজাসুজি বলুন তো,' নিজের বাম হাতটাকে এগিয়ে দিয়ে বললো সে। 'আপনি কি বলতে চাচ্ছেন কোনো একটা লোক ইউকিহো কারাশাওয়ার সাথে মিলেমিশে কাজ করছে?' যদি বিষয়টা তা হয়েও থাকে, তবে এর ডালপালা অনেক দূরে ছড়াবে নিঃসন্দেহে-কিন্তু ইমায়েদার এটা বিশ্বাস হচ্ছে না। এক মাসেরও বেশি হয়েছে ইউকিহোর খোঁজখবর রাখছে সে, কিন্তু কখনোই অন্য কোনো সহযোগীকে দেখেনি।

হাসলো সাসাগাকি। 'এটা একটা থিওরি মাত্র,' বললো সে। 'এর কোনো প্রমাণ নেই।'

'নিশ্চয়ই কিছু জিনিসের উপর ভিত্তি করে বলছেন এসব?'

'একজন গোয়েন্দার চতুর অনুমান বলতে পারেন। এটা এমন কোনো ঘোড়া না যার উপর বাজি ধরা যাবে।'

মিথ্যা বলছে সে, ভাবলো ইমায়েদা। *যথেষ্ট পোক্ত প্রমাণ আছে তার কাছে। এতটাই পোক্ত যে ওটা সেই ওসাকা থেকে এই টোকিওতে এনে ছেড়েছে তাকে।*

সাসাগাকি আবার ব্যাগটা খুলে একটা ছবি বের করে আনলো। 'এই লোকটার ব্যাপারে কী বলবেন? একে দেখেছেন কখনো?'

ডেস্কের উপরে ছবিটা রাখতেই ইমায়েদা ঝুঁকলো ওটা নিতে। ছবিতে লোকটা সরাসরি ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে আছে। দেখে মনে হচ্ছে ড্রাইভিং লাইসেন্স করার

জন্য যেরকম ছবি তুলতে হয় সেরকম কোনো ছবি এটা। ত্রিশের আশেপাশে বয়স লোকটার, চিবুকটা বেশ দেখতে। মুখটা চেনা চেনা লাগছে। ইমায়েদা মুখে চিন্তার কোনো ছাপ না দেখিয়ে মনে করার চেষ্টা করলো কোথায় দেখেছে লোকটাকে। মুখ দেখে মনে রাখার বিষয়টা তার পুরোনো অভ্যাস, কিন্তু এতে কিছুটা সময় লাগে। আরো কয়েক মুহূর্ত ছবিটার দিকে তাকিয়ে থেকে ধোঁয়াশা পরিষ্কার হলো তার। সে বুঝে গেছে কার দিকে তাকিয়ে আছে সেঃ তার ছদ্মনাম কী, পেশা কী, কোথায় থাকে, সব মনে পড়ে গেছে। প্রায় চিৎকার করে ফেলছিলো সে, কারণ অপ্রত্যাশিত ছিলো বিষয়টা, কিন্তু নিজেকে থামালো কোনোমতে।

'এই লোকটাই কি ইউকিহো কারাশাওয়ার সাথে কাজ করে?' জিজ্ঞেস করলো সে। গলার স্বর যেন স্বাভাবিকই থাকে সেদিকে নজর দিলো ভালো করে।

'হয়তো,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো সাসাগাকি। 'দেখেছেন একে?'

'হয়তো,' জবাব দিলো ইমায়েদা। 'আবার না-ও হতে পারে।' ছবিটা তুলে কাছে নিয়ে দেখলো আরেকবার। 'আমার পাশের ঘরে ছবিটা নিলে কিছু মনে করবেন আপনি? মানে আমার ফাইলগুলো একটু চেক করতাম।'

'কী পাবেন বলে মনে করছেন?'

'এখনই আবার ফেরত দিয়ে দিচ্ছি, একটু দাঁড়ান,' সাসাগাকির জবাবের জন্য অপেক্ষা না করে উঠে পড়লো ইমায়েদা। দ্রুত পাশের রুমটায় গিয়ে দরজা লক করে দিলো সে।

এই রুমটা সাধারণত তার বেড রুম হওয়ার কথা, কিন্তু মাঝেমধ্যে এটাকে এক রঙের ছবি বানানোর রুম হিসেবেও ব্যবহার করে সে। ভেতরে গিয়ে পোলারয়েডের একটা ক্যামেরা বের করলো শেলফ থেকে। এরপর সাসাগাকির কাছ থেকে পাওয়া ছবিটা মেঝেতে রেখে হাঁটু গেড়ে বসলো। ক্যামেরার ভিউফাইন্ডারের দিকে চোখ রেখে ছবিটার দিকে তাক করলো সে। লেন্স এডজাস্ট করতে কিছুটা সময় লাগবে।

ঠিকঠাক উঁচুতে রেখে শাটার চাপলো ইমায়েদা। সাথে সাথে পুরো ঘরে ফ্লাশ জ্বলে উঠলো।

ছবিটা বের করে ক্যামেরাটা ফের শেলফে রেখে দিলো সে। নতুন ছবিটা কাঁপা কাঁপা হাতে নিয়ে আরেক হাত দিয়ে মোটা একটা ফাইল বের করলো। ঐ ফাইলটার মধ্যে ইউকিহো কারাশাওয়ার ইনভেস্টিগেশনের সকল ছবি রাখা আছে। দ্রুত চেক করতে লাগলো সেটা, যাতে এমন কিছু না থাকে যেটা সাসাগাকি দেখলে সে সমস্যায় পড়তে পারে।

ঘড়ির দিকে তাকালো একবার সে, যাতে শেষ কাগজটা পর্যন্ত দেখার সময় পায়। দারুণ ছবি এসেছে, পুরোনো ছবিটায় যে ময়লাগুলো লেগে ছিলো সেগুলোও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

ডেস্কের ড্রয়ারে নতুন ছবিটা রেখে ফাইল আর পুরোনো অরিজিনাল ছবিটা নিয়ে যে রুমে গোয়েন্দাটা বসে ছিলো সেখানে চলে এলো সে।

'সরি, আমার বুঝতে ভুল হয়েছে,' ফাইলটা টেবিলের উপর রেখে বললো সে। 'চেহারাটা চেনা চেনা লাগছিলো, কিন্তু ফাইল দেখতে গিয়ে বুঝলাম, না, আসলে দেখিনি আগে।'

'কীসের ফাইল এটা?' জিজ্ঞেস করলো সাসাগাকি।

'ইউকিহো কারাশাওয়ার ব্যাপারে যা যা পেয়েছি। যদিও তত বেশি ছবি নেই এখানে।'

'একবার দেখতে পারি?'

'দেখুন। কিন্তু সেগুলোর ব্যাপারে ততটা খোলাখুলি বলতে পারবো না।'

প্রত্যেকটা ছবি আলাদা আলাদা করে বের করে মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগলো সাসাগাকি। ইউকিহো কারাশাওয়া যেখানে বেড়ে উঠেছে সেই জায়গার আশেপাশের রাস্তাঘাটের ছবি রাখা আছে ওখানে। আর কিছু আছে তার ব্রোকারের ছবি, যেগুলো সে ঐ ব্রোকারকে না জানিয়েই তুলেছিলো।

সবগুলো ছবি দেখা শেষ হলে মাথা তুলে গোয়েন্দা বললো, 'দুর্দান্ত কিছু ছবি আছে এখানে।'

'দেখুন পছন্দ হয় কি না।'

'ভাবছিলাম কেউ বিয়ে করার জন্য তার পেছনে ইনভেস্টিগেটর লাগালে সে তার ব্যাংকে যাওয়ার ছবি কেন তুলবে।'

'এর উত্তর আপনাকে কল্পনা করে নিতে হবে।'

ব্যাংকের ছবিগুলো তোলার কারণ ছিলো সেখানে কিছু ফিক্সড ডিপোজিট বক্স রয়েছে ইউকিহোর। একদিন তার পেছন পেছন যেতে যেতে এটা আবিষ্কার করে সে। ভেতরে ঢোকা আর বাইরে বের হওয়ার ছবি তোলার কারণ হলো, সে চাচ্ছিলো যে ভেতরে ঢোকার আগে এবং ভেতর থেকে বের হওয়ার পরে তার মধ্যে কোনো পরিবর্তন হয়েছে কি না তা দেখতে। উদাহরণ হিসেবে বলতে গেলে, ধরা যাক ইউকিহো ব্যাংকের ভেতরে খালি গলায় গেল এবং বেরিয়ে এলো নেকলেস পরা অবস্থায়। এর মানে এই দাঁড়াবে যে সে ঐ ডিপোজিট লকারে নেকলেস রেখে এসেছে। এটা কারো উপর নজর রাখার সবচেয়ে প্রাচীন পন্থা।

'আরো একটা জিনিস ভাবছিলাম আমি। আসলে আমাকে একটু সাহায্য করতে পারবেন কি না সেটা জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছিলাম,' বললো সাসাগাকি।

'কী?'

'যদি কখনো আপনার তদন্তে এই লোকটাকে দেখতে বা শুনতে পান–' হাতে থাকা ছবিটা তুলে ধরলো সাসাগাকি–'তবে আমাকে একটু বলবেন। যত তাড়াতাড়ি পারেন আর কি।'

ইমায়েদা একবার ছবিটার দিকে, আরেকবার সাসাগাকির কাটা মুখটার দিকে তাকালো। 'আচ্ছা, কিন্তু একটা কথা আমার জানা দরকার।'

'কী?'

'তার নাম কী? আর শেষ কোথায় ছিলো সে?'

এই প্রথমবারের মতো গোয়েন্দার মুখে দ্বিধা দেখতে পেল ইমায়েদা।

'যদি তাকে খুঁজে পান, তবে আপনাকে আমি সেই পরিমাণ তথ্য দেবো যা আপনি কোনোদিন আশাও করেননি।'

'যা এখন দরকার তা হলো লোকটার নাম এবং তার ঠিকানা।'

এক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকার পর মাথা দোলালো সাসাগাকি। এরপর ছোট একটা মেমো প্যাড বের করে ডেস্কের উপর রেখে কিছু একটা লিখতে লাগলো সে। এরপরে ইমায়েদার দিকে বাড়িয়ে দিলো সেটা। ইমায়েদা পড়লো:

রিও কিরিহারা
লিমিটলেস
২-৪২-১২ নিহোনবাসি, চুও ওয়ার্ড,
ওসাকা

'লিমিটলেস কী? কোনো কোম্পানি?'

'একটা কম্পিউটারের দোকান। সেখানকার ম্যানেজার ছিলো রিও।'

সাসাগাকি তার নিজের নাম এবং নাম্বার লিখলো আরেকটা কাগজ বের করে।

'আপনার সময় নষ্ট করার জন্য দুঃখিত,' বললো গোয়েন্দা। 'আমার মনে হয় আপনি বলেছিলেন আপনার কাজ আছে।'

'সমস্যা নেই,' জবাব দিলো ইমায়েদা। 'যদিও আমিও একটা বিষয় ভাবছিলাম। আপনি কী করে জানলেন আমি ইউকিহো কারাশাওয়াকে ইনভেস্টিগেট করছিলাম?'

হাসলো সাসাগাকি। 'আমি নিশ্চিত পরের বার নড়াচড়া করলেই আপনি সেটা বুঝে যাবেন।'

'নড়াচড়া মানে? বলতে চাচ্ছেন এই আশেপাশে হাঁটাচলা করা বা রেডিও শুনলে বুঝে যাবো?' ইমায়েদা হাত দিয়ে এমন একটা ভঙ্গি করলো যেন তার ওয়্যারটেপ ডিটেক্টরের ডায়াল ঘোরাচ্ছে।

'রেডিও? আপনি কী বলছেন বুঝতে পারছি না।' এবার সত্যি সত্যি দ্বিধান্বিত হয়ে গেল সাসাগাকি।

'কিছু না। যা বলেছি ভুলে যান।'

সাসাগাকি উঠে দরজার দিকে এগোতে লাগলো। ছাতাটাকে লাঠি হিসেবে ব্যবহার করে ঠকঠক শব্দ করে এগিয়ে গেল সে। দরজাটা খুলবে, এমন সময়

পেছন ফিরে তাকালো। 'যদিও এটা আপনার আমার থেকে শোনার প্রয়োজন নেই, কিন্তু তারপরও বলি। যে লোকটা ইউকিহোর পেছনে আপনাকে তদন্ত করতে লাগিয়েছে, তাকে পেলে একটা উপদেশ দিতাম।'

'কী?'

ঠোঁটদুটো হাসিতে পরিণত হলো সাসাগাকির। 'ঐ মেয়েটার থেকে যেন একশো হাত দূরে থাকে। ইউকিহো কারাশাওয়া মানেই হলো একটা উৎকট ঝামেলা।'

'চিন্তা করবেন না,' বললো ইমায়েদা। 'সে জানে এটা।'

স্বস্তির সাথে মাথা দুলিয়ে বেরিয়ে গেল সাসাগাকি।

***

কোনো কমিউনিটি কলেজের এক গ্রুপ মেয়ে এসে দুটো টেবিল জুড়ে বসেছে। ইমায়েদা ভেবেছিলো জায়গাটা পরিবর্তন করে অন্য কোথাও গিয়ে বসবে, কিন্তু যার সাথে দেখা করতে এসেছে, সে হয়তো এতক্ষণে তার অফিস থেকে বের হয়ে গেছে। তাই তুলনামূলক কম শব্দ যায় এমন একটা টেবিলে গিয়ে বসলো সে। ভেবেছিলো যেহেতু বেলা দেড়টা বাজে, সেহেতু তেমন একটা ভিড় থাকবে না ক্যাফেতে। কিন্তু তাকে ভুল ভেবেছিলো সে।

জায়গাটায় লাঞ্চের পরে ক্লাস শেষ হওয়ার কারণে বেশি ভিড় থাকে। সামনে থেকে মনে রাখবে বলে ঠিক করে রাখলো ইমায়েদা।

কফির কাপে কয়েক চুমুক দিতেই তার কলিগকে ভেতরে ঢুকতে দেখলো সে। আগে যখন একসাথে চাকরি করতো, তখনকার চেয়ে হিতোশি মাসুদাকে একটু বেশিই চিকন লাগছে। পরনে শর্ট-স্লিভড শার্ট আর গলায় আকাশি রঙের টাই ঝুলছে। হাতে বড়সড়ো একটা খাম।

ইমায়েদাকে দেখতে পেয়েই টেবিলের দিকে এগোতে লাগলো মাসুদা।

'অনেক দিন পরে দেখা,' সামনাসামনি বসতে বসতে বললো সে। কিন্তু ওয়েটার তার অর্ডার নিতে এলে বললো, 'না, ধন্যবাদ। এখনই যেতে হবে আমাকে আবার।'

'আগের মতোই ব্যস্ততায় আছো দেখছি,' বললো ইমায়েদা।

কাঁধ ঝাঁকালো মাসুদা। বোঝাই যাচ্ছে বাজে একটা মুডে আছে সে এই মুহূর্তে। বাদামি রঙের খামটা টেবিলের উপর রাখলো। 'এটাই চেয়েছিলে তুমি?'

ইমায়েদা খামটা হাতে নিয়ে কন্টেন্টগুলো পর্যবেক্ষণ করতে লাগলো একবার। গুনে দেখলো বিশটার মতো কাগজ রয়েছে ওতে। কাগজগুলো দেখে লম্বা করে মাথা দোলালো। সবকিছু পরিচিত লাগছে। এখানকার কিছু কিছু শিট তো সে নিজেই লিখেছে।

'এটাই, ধন্যবাদ তোমাকে।'

'দেখো,' কাছে সরে এসে বললো মাসুদা। 'আমার আসলে বলা উচিত না, তবুও বলছি, এরকম আর করতে বোলো না আমাকে। তুমি তো জানোই অফিসের বাইরে ডকুমেন্ট শেয়ার করার নিয়ম কী।'

'জানি আমি, সরি। এই শেষবারই করতে হচ্ছে। আর হবে না, কথা দিলাম।'

দাঁড়িয়ে গেল মাসুদা, কিন্তু তৎক্ষণাৎই চলে গেল না। 'যাক গে, এগুলো কেন লাগবে এখন তোমার?' ইমায়েদার দিকে মাথা নিচু করে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো সে। 'অনেক আগের না-মেলা কোনো ধাঁধার সমাধান পেয়েছ নাকি?'

'না, না। শুধু একটা জিনিস চেক করার দরকার ছিলো, এই-ই যা।'

'আচ্ছা, যাক গে,' চলে যেতে যেতে বললো মাসুদা। পরিষ্কার বোঝা গেল যে সে ইমায়েদাকে বিশ্বাস করেনি। আর এও পরিষ্কার বোঝা গেল যে যেখানে নাক গলিয়ে লাভ নেই, সেখানে নাক গলানোর কোনো ইচ্ছাও ওর নেই।

পুনরায় ডকুমেন্টের দিকে তাকানোর আগে মাসুদার যাওয়ার অপেক্ষা করলো ইমায়েদা। তিন বছর আগের স্মৃতি সব যেন এসে ধাক্কা দিলো তাকে। কাগজগুলো সেই তোজাই অটোমোটিভ কোম্পানির ইনভেস্টিগেশনের কপি। ওটারই তদন্ত তারা করেছিলো, কিন্তু সেই ডাটা চোর ইউইচি আকিওশিকে ধরতে ব্যর্থ হয়েছিলো সে সময়। তার আসল নাম বের করতে পারেনি তারা, অথবা কী কাজ করে সে আসলে এবং কোথা থেকে এসেছে তার কিছুই জানতে পারেনি।

এজন্যেই সেদিন অবাক হয়েছিলো ইমায়েদা, যখন সাসাগাকি আকিওশির ছবি বের করে রিও কিরিহারা বলে পরিচয় করালো।

আকিওশির প্রোফাইল ঘেঁটে দেখা যায়, আকিওশি যে সময়টায় মেমোরিক্সে জয়েন করে, সে সময়েই রিও ওসাকা থেকে উধাও হয়ে যায়। ইমায়েদা প্রথমে ভেবেছিলো হয়তো এটা কাকতালীয় কোনো ঘটনা। ওর লাইনের কাজের একটা সমস্যা হলো, এই ধরনের কাজগুলো যত বেশি করে ওরা, পুরোনো কোনো কেসের মানুষকে নতুন করে পেয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ততই বেড়ে যায়। তাও এমন এক পরিস্থিতিতে যার সাথে নতুন কেসের কোনো সম্পর্কই নেই।

তারপরও অন্যান্য সবকিছু বিবেচনা করে সে বুঝলো যে বিষয়টাকে আর সম্পর্কহীন বলা যায় না। অন্যথায় বলতে গেলে বলা যায়, তোজাই অটোমোটিভ কোম্পানির ইনভেস্টিগেশন আর তার নিজস্ব ইনভেস্টিগেশন কোনো না কোনো তলানিতে গিয়ে একই শেকড়ের গোড়ায় রূপান্তরিত হয়েছে।

এটা ভাবার একটা কারণ হলো, শিনোজুকা অন্য কোনো প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটরকে না দিয়ে তাকে কেসটা দিয়েছে কারণ গলফ ড্রাইভিং রেঞ্জে মাকোতোর সাথে তার পরিচয় হয়েছিলো। আর সে নিজে ঐ নির্দিষ্ট রেঞ্জে গেছিলো এই কারণেই যে তিন বছর আগে আকিওশিকে ওখানেই যেতে দেখেছিলো সে। আর সে সময়েই প্রথম মাকোতোকে দেখে সে, আকিওশি যাকে অনুসরণ করতো

তার সাথে, মানে শিজুরু মিসাওয়ার সাথে প্রেম করা অবস্থায়। তবে ইমায়েদা তখন এটা জানতো না যে ইউকিহো ঐ সময় মাকোতোর স্ত্রী ছিলো।

ডিটেকটিভ সাসাগাকি বলেছে যে সম্ভবত রিও কিরিহারা আর ইউকিহো কারাশাওয়া একসাথে মিলে কাজ করছে। আর ইমায়েদা এই বিষয়টাকে শুধু একটা তত্ত্ব বা অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়া বলে মনে করছে না। তাই সে সিদ্ধান্ত নেয় যে তিন বছর আগের সেই ইনভেস্টিগেশনটা আবার খুলে দেখবে। বোঝার চেষ্টা করবে যে ঠিক কোন পয়েন্টে রিও আর মিস কারাশাওয়ার গুপ্তসংযোগ রয়েছে।

আর এই ব্যাপারটা বোঝার জন্য অত গভীর চিন্তারও প্রয়োজন নেই: রিও আর ইউকিহোর সংযোগটা খুবই সুস্পষ্ট। ইউকিহোর স্বামী তোজাই অটোমোটিভে পেটেন্ট লাইসেন্সিং ডিপার্টমেন্টে কাজ করতো। স্বাভাবিকভাবেই কোম্পানির ব্যক্তিগত তথ্যে অবাধ বিচরণ ছিলো তার। তার কাছে আইডি এবং পাসওয়ার্ড দুটোই ছিলো, যার মাধ্যমে কোম্পানির টপ সিক্রেট ডাটাতে এক্সেস করা যেত। আর ইমায়েদা নিশ্চিত এই দায়িত্বটা মাকোতো যথেষ্ট সিরিয়াসলিই নিয়েছিলো। কিন্তু নিজের স্ত্রীকে কি সন্দেহ করা সম্ভব ছিলো তার পক্ষে? তার স্ত্রী কি কোনোভাবে সেই পাসওয়ার্ড আর আইডি নিয়ে গোপন তথ্যে ঢুকে পড়েছিলো?

তিন বছর আগে ইমায়েদা আর তার টিম আকিওশি আর মাকোতোর মধ্যে সংযোগ খুঁজেছিলো কিন্তু কিছুই পায়নি। আর কেন পায়নি সেটা এখন পরিষ্কার: কারণ তাদের যাকে খোঁজা উচিত ছিলো সে হলো ইউকিহো।

এই পয়েন্টে আরেকটা যে বিষয় ইমায়েদার মাথায় এলো তা হলো, কেন আকিওশি কিংবা রিওর শিজুরুর প্রতি আগ্রহ ছিলো? কেবল মাকোতোর সাথে সম্পর্ক ছিলো বলে?

এমন কি হতে পারে যে ইউকিহো গিয়ে তাকে বলেছে তার স্বামীর পেছনে গোয়েন্দাগিরি করতে? কিন্তু সেটাই বা কেন করবে মেয়েটা? এর থেকে কোনো প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটরের কাছে যাওয়াটা বেশি মানানসই হবে। আরেকটা বিষয় হলো, রিও যদি মাকোতোকে ইনভেস্টিগেট করতে এসে থাকে, তবে শিজুরুকে কেন অনুসরণ করতো? এর মানে তো এই-ই বোঝায় যে সে আগে থেকেই জানতো মাকোতোর সাথে শিজুরুর সম্পর্ক রয়েছে। তাহলে যদি জানতোই তারা, তবে ইনভেস্টিগেশন চালিয়ে গেল কেন?

রিপোর্টের দিকে আরেকবার চোখ বোলাতেই আরেকটা জিনিস মাথায় এলো ইমায়েদার। রিও প্রথম যখন শিজুরুর পেছন পেছন ঈগল গলফ ড্রাইভিং রেঞ্জে এসেছিলো, তখন এপ্রিল মাস চলছিলো। কিন্তু সেদিন মাকোতো সেখানে ছিলো না। তার দুই সপ্তাহ পরে আরেকবার ড্রাইভিং রেঞ্জে আসে রিও। আর সেবারই প্রথম ইমায়েদার টিম মাকোতোকে প্রেম করা অবস্থায় দেখতে পায়।

আর তাদের জানামতে, সেবারই শেষবারের মতো রেঞ্জে গেছিলো রিও। তখন ইমায়েদার টিম মাকোতো আর শিজুরুর প্রেমের বিষয়ে ইনভেস্টিগেট করছিলো। আর আগস্টের দিকে যখন সেই কেস উঠিয়ে নেওয়া হয়, সেই সময়ে দুজনে প্রেমে একেবারে হাবুডুবু খাচ্ছিলো।

এটাই কেন যেন অস্বাভাবিক লাগছে ইমায়েদার কাছে। যদি ইউকিহো আর রিওর মধ্যে যোগাযোগ থেকে থাকে, আর রিও জেনে থাকে যে ইউকিহোর স্বামী আরেকটা মেয়ের সাথে প্রেম করছে, তাহলে ইউকিহো কেন প্রতিক্রিয়া দেখালো না এতে? তার তো তবে জানার কথা সবকিছু।

কফিতে চুমুক দিলো ইমায়েদা। আরেকবার কাজুনারির সাথে এই গিনজাতে কফি খাওয়ার কথা মনে করলো সে। *নাকি ইউকিহো নিজেই চাচ্ছিলো না এই পরকীয়া ভেঙে যাক?* ইমায়েদা ভাবলো। *হয়তো ডিভোর্স নিতেই চাচ্ছিলো সে।*

এই ভাবনাটা কয়েকটা পয়েন্টে ঠিক মনে হচ্ছিলো। এরিকো কাওয়াশিমার মতে মাকোতো কখনোই ইউকিহোর সত্যিকার ভালোবাসা ছিলো না। তার স্বামী আরেকটা মেয়ের প্রেমে পড়ে গেছে, এটার দেখার পর কি সে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো যে সে অপেক্ষা করবে পছন্দ প্রেমে পরিণত হওয়ার জন্য?

না, মাথা ঝাঁকিয়ে ভাবলো ইমায়েদা। ইউকিহো অমন মেয়ে না যে এরকম জিনিস হতে দেবে। কিন্তু এটা কি হতে পারে যে এই শিজুরুর সাথে দেখা হওয়া এবং এই সবকিছু হওয়া, এগুলো সবই ইউকিহোর পরিকল্পনা ছিলো?

বেশ ভয়ানক চিন্তা এটা। এই চিন্তাটা ইউকিহো বাদে অন্য কোনো নারী হলে সে ভাবতো কি না সন্দেহ আছে। তার মধ্যে এমন কিছু একটা আছে যে খুব ছোট্ট সম্ভাবনাকেও ইমায়েদা ছাড়তে পারছে না।

কিন্তু তারপরও কারো হৃদয় নিয়ন্ত্রণ করা যায় কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে ওর। শিজুরু মিসাওয়া যতই বিশ্ব সুন্দরী হোক না কেন, তবুও প্রথম দেখাতে প্রেম হবে এই গ্যারান্টি কেউ দিতে পারবে না। তবে কারো ভেতর যদি ওর প্রতি আগে থেকেই অনুভূতি থেকে থাকে, তবে ঐ অনুভূতি বাড়ার জন্য অপেক্ষা করা যায়। আর হয়তো এটাই ইউকিহো করেছে।

কফি শপ থেকে উঠে বেরিয়ে গেল ইমায়েদা। সামনেই পেল একটা পে ফোনের দোকান। তোজাই অটোমোটিভে ডায়াল করে মাকোতো তাকামিয়াকে চাইলো সে।

কয়েক মিনিট পরে মাকোতো এসে ফোন ধরলো।

'হ্যালো, ইমায়েদা বলছি। সরি, কাজের সময় ফোন করলাম, কিন্তু আশা করছি কিছু প্রশ্ন করতে পারবো আপনাকে।'

অপর পাশে কিছুটা দ্বিধান্বিত মনে হলো মাকোতোকে। হয়তো কাজের সময় কোনো প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটরের ফোন আসাটাকে ভালো চোখে দেখছে না।

'কীসের প্রশ্ন?'

'আসলে, আরো ভালো হতো যদি দেখা করতে পারতাম,' ইমায়েদা বললো। লোকটা কীভাবে তার স্ত্রীর প্রেমে পড়েছে তা ফোনে জিজ্ঞেস করাটা ঠিক হবে না। 'আজ বা কাল বিকেলে সময় আছে আপনার হাতে?'

'কালকে হবে।'

'আচ্ছা। আমি আবার ফোন দিয়ে কখন দেখা করবো তা বলে দেবো।'

'আচ্ছা। ওহ, এক মিনিট, একটা জিনিস আপনাকে বলার ছিলো।'

'কী?'

'কিছু দিন আগে একজন পুলিশ দেখা করতে এসেছিলো আমার সাথে,' গলা নামিয়ে বলতে লাগলো মাকোতো। 'বেশ বয়স্ক একজন লোক, ওসাকা থেকে।'

'কী বলেছে?'

'জিজ্ঞেস করছিলো যে কেউ কি আমার প্রাক্তন স্ত্রীকে নিয়ে প্রশ্ন করছে কি না ইদানীং। আমি আপনার নাম বলে দিই। আশা করি সবকিছু ঠিক আছে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, চিন্তার কিছু নেই।'

'আশা করি কোন সমস্যায় ফেলে দিইনি আপনাকে।'

'আরে নাহ, সমস্যা নেই। আপনি এটা বলুন যে আপনি কি তাকে আমার কাজটার জন্য কী কী করেছি তাও বলেছেন?'

মাকোতো বললো সে তাও বলেছে।

'আচ্ছা, মাথায় থাকলো তবে ওটা,' ফোন রাখার আগে জবাব দিলো ইমায়েদা।

ইমায়েদা ভাবেওনি যে সাসাগাকি মাকোতোর কাছ থেকে তার সম্পর্কে ধারণা নেবে। *তার জন্য হয়তো এটা সহজ*, ভাবলো ইমায়েদা। অবশ্যই এর ফলে আরেকটা চিন্তা মাথায় এসে উঁকি দিয়েছে। যদি পুলিশ এরির ফোনে বাগ লাগিয়ে না থাকে, তবে কে করেছে এ কাজ?

রাতে বাসায় ফিরতে বেশ দেরি হলো ইমায়েদার। আরেকটা কাজের পেছনে সারা দুপুর কাটাতে হয়েছে তাকে, এরপরে এরি যে বারে কাজ করে সেখানে থেমেছিলো সে অনেক দিন বাদে।

'এখন যখনই বাসায় থাকি দরজায় চেইন লাগিয়ে রাখি,' বললো এরি। সে আরো বললো যে সেদিনের পর থেকে আর তেমন অস্বাভাবিক কিছু দেখেনি সে ঘরে।

বাড়িতে আসার সময় তার বাসার সামনেই একটা সাদা ভ্যান গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে ইমায়েদা। সিঁড়িতে উঠার সময় হালকা দুলে দুলে উঠতে লাগলো সে, পা ভারী হয়ে আছে। দরজার সামনে এসে পকেট হাতিয়ে চাবি খুঁজতে গিয়েই টের পেল হলরুমে বিশাল একটা কার্ট রাখা আছে। যার উপরে আছে কার্ডবোর্ডের

বক্স। বক্সটা অনেক বড়, এতটাই বড় যে একটা আস্ত ওয়াশিং মেশিন রাখা যাবে ওতে। একবার ভাবলো কে ওটা রেখে গেছে ওখানে, তারপর ছেড়ে দিলো ভাবনা। তার প্রতিবেশীরা ততটা ভালো না, আজেবাজে যা কিছু আছে সব হলওয়েতে রেখে যায়। অনেক দিন আগেই অভিযোগ করা বন্ধ করে দিয়েছে ইমায়েদা। এত সব অভিযোগ শুনে রাখাও সম্ভব না।

চাবি বের করে দরজা খুললো সে। খিল ধরে টান দিতেই টের পেল স্বাভাবিকের থেকে কিছুটা ঢিলে ওটা। এক মুহূর্ত থেমে থাকলো সে; বিভিন্ন চিন্তা উঁকি দিচ্ছে তার মাথায়।

দরজা খুললো ইমায়েদা, আলো জ্বালিয়ে ঘরের চারপাশে তাকালো। কিছুই এদিক-সেদিক হয়নি ঘরের। যেরকমটা তার রুম ধুলো দিয়ে ভরা থাকে তেমনই ভরে আছে। ময়লা কাপড়ের গন্ধ ঢাকার জন্য যে ফ্রেশনারটা ব্যবহার করে ওটার ঘ্রাণ ছড়িয়ে আছে আশেপাশে।

চেয়ারে হাতের জিনিসপত্র রেখে টয়লেটের দিকে এগোলো সে। মাথা বেশ ঝিমঝিম করছে তার, সাথে ঘুমও পাচ্ছে কিছুটা। বাথরুমের লাইট জ্বালাতেই টের পেল ভেতরের ফ্যান আগে থেকেই চালু করা। *আহ, বিদ্যুৎ নষ্ট হলো কতগুলো*, মনে মনে ভাবলো। দুলতে দুলতেই প্যান্টের চেইন খুলে নিয়ে ভেতরে ঢুকলো সে। টয়লেটের ঢাকনা নিচে নামানো, যেটা কিছুটা অদ্ভুত ঠেকলো তার কাছে। ব্যাচেলর জীবনের এই এত বছরে একবারও টয়লেটের ঢাকনা নিচে নামায়নি ইমায়েদা। দরজা বন্ধ করে ঢাকনা উপরে তুলতেই টনক নড়লো তার মাথায়।

কীসের মধ্যে আছে তা না জেনেও বুঝতে পারলো বড় কোনো বিপদের সম্মুখীন হচ্ছে সে। দ্রুত টয়লেটের ঢাকনাটা নামিয়ে দিয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করলো।

কিন্তু তার শরীর মানলো না। শ্বাস নিতেও পারছে না যেন সে।

বাথরুমের চারপাশটা ঘুরছে। টের পেল তার শরীর কোনো কিছুর সাথে ধাক্কা খেলো, কিন্তু কোনো ব্যথা পেল না। হাত-পা মেলতে চাইলেও একটা আঙুলও নড়াতে পারলো না সে। এরপরই তার মনে হলো তার পাশে কেউ একজন দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু নিশ্চিত করে বলতে পারছে না। *হয়তো সবই আমার কল্পনা।*

এরপরেই সব অতল অন্ধকারে তলিয়ে গেল।

অধ্যায় বারো

বর্ষা চলে গেছে সেই কবে, কিন্তু এখনো এই সেপ্টেম্বরেও ঝিরিঝিরি বৃষ্টি হয়েই চলেছে, ছোট ছোট ফোঁটা পড়ে রাতের আকাশটাকে আরো পরিষ্কার করে দিচ্ছে যেন। নোরিকো কুরিহারা টোকিওর উত্তর-পশ্চিম দিকের নেরিমা স্টেশনের বিভিন্ন দোকান টপকে এগিয়ে যাচ্ছে। ছাউনির কারণে অন্তত স্টেশন থেকে তার বাসায় যাওয়ার দশ মিনিটের রাস্তায় সে আর ভিজবে না।

একটা ইলেকট্রনিক দোকানের পাশ দিয়ে যেতেই কোনো একটা সাউন্ড বক্স থেকে চাগে এবং আস্কার *সে ইয়েস* গানটা বেজে উঠলো। একটা জনপ্রিয় টিভি সিরিজের থিম সং ওটা। তার এক সহকর্মী সেদিন বিলাপ করে বলেছিলো শো-টা নাকি শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু নোরিকোর এতে কিছু যায় আসে না। খুব কমই টিভি দেখে সে।

দোকানের পরে আর মাথার উপর কোনো ছাউনি না থাকায় নীল আর ধূসররঙা একটা রুমাল বের করে মাথায় রাখলো সে। আর কিছু দূর এগিয়ে গিয়েই একটা দোকানে ঢুকে টোফু আর পেঁয়াজ কিনলো। একটা ছাতাও কিনতে চেয়েছিলো, কিন্তু দাম দেখে আর ধরেনি।

ট্রেনের রাস্তার ঠিক পাশেই তার অ্যাপার্টমেন্ট। দুটো বেডরুম, আশি হাজার ইয়েন দিতে হয় ওটার জন্য। ও যদি একা থাকতো, তবে ছোট কোনো জায়গাতেই হয়ে যেত, কিন্তু একজন পুরুষ থাকার কথা ছিলো তার সাথে। বস্তুত কয়েকবার থেকেও ছিলো এসে, কিন্তু যখন সবকিছু শেষ হয়ে গেল তাদের মধ্যে, তখন একা হয়ে গেল সে। বড় একটা অ্যাপার্টমেন্টেই থেকে গেল সে। অন্য কোথাও যাওয়ার ইচ্ছা নেই আপাতত।

আমার তো এখানে আসাই উচিত হয়নি।

তার অ্যাপার্টমেন্টের দেয়ালের গায়ে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ার কারণে ওটার রঙ দেখতে কাদার মতো লাগছে। বাইরের সিঁড়ির দিকে যেতে লাগলো সে, একটু সতর্ক থাকলো যাতে তার কাপড়ে ময়লা না পড়ে দেয়াল থেকে। দুইতলা বাড়িটাতে প্রত্যেক ফ্লোরে চারটা করে ইউনিট রয়েছে। প্রথম তলার একদম শেষের দিকে নোরিকোর ঘর।

দরজা আনলক করে ভেতরে ঢুকলো সে। মৃদু অন্ধকার হয়ে আছে ঘরটা, যেমনটা সব সময় থাকে। রান্নাঘরে কোনো আলো জ্বলছে না, বসার ঘরের ওপাশেও না।

'ফিরেছি আমি,' রান্নাঘরের লাইট জ্বালাতে নিয়ে বললো সে। বাইরে এলোপাথাড়ি নোংরা জুতো দুটো পড়ে থাকতে দেখেই বুঝেছিলো, সে এসেছে। ঐ নোংরা জুতো ছাড়া লোকটা আর কোনো জুতো পরে না।

বসার ঘর পেরিয়ে গিয়ে দরজাটা খুললো সে। ঐ রুমটাও অন্ধকার হয়ে আছে। শুধু জানালার পাশে কম্পিউটারের স্ক্রিন থেকে নিস্তেজ একটা আলো বেরোচ্ছে। সেখানেই বসে আছে সে, পায়ের উপর পা তুলে।

'হেই,' তার পেছন থেকে বললো নোরিকো।

কিবোর্ডের উপর চলমান হাতটা থেমে গেল। ঘাড়টা ঘুরিয়ে বুকশেলফে থাকা এলার্ম-ঘড়িটার দিকে তাকালো সে, এরপর নোরিকোর দিকে ঘুরে বললো, 'দেরি হয়েছে তোমার।'

'বস আটকে রেখেছিলো। অনেক ক্ষুধা লেগেছে না তোমার? দাঁড়াও, কিছু একটা করে আনছি। টোফু চলবে?'

'যা কিছু হোক একটা করো।'

'আচ্ছা, এক্ষুনি করে দিচ্ছি।'

'নোরিকো।'

দরজার পাশ থেকে ফিরে তাকালো নোরিকো। লোকটা দাঁড়ালো বসা থেকে, এরপর এগিয়ে এলো ওর কাছে। তালুটা রাখলো নোরিকোর ঘাড়ে। 'ভিজে গেছ দেখছি।'

'কিছুটা, সমস্যা নেই ওতে।'

মনে হলো কিছুই শুনলো না লোকটা। হাতটা ঘাড় থেকে কাঁধে নেমে গেল। সোয়েটারের উপর থেকেও নোরিকো যেন লোকটার হাতের তীব্রতা অনুভব করতে পারছে। জড়িয়ে ধরলো সে। কানের নিচে আলতো চুমু দিচ্ছে। লোকটা জানে কোথায় নোরিকো আনন্দ পায়। ওর জিহ্বাটা এসব কাজে বেশ পটু। নোরিকোর মনে হলো শিরদাঁড়া বেয়ে ঠান্ডা একটা স্রোত নেমে গেল তার।

'দাঁ...দাঁড়াতে পারছি না আমি,' বললো নোরিকো।

কোনো জবাব দিলো না লোকটা। নোরিকো বসতে নিলে হাত শক্ত করে ফেললো, যাতে মেয়েটা দাঁড়িয়েই থাকতে পারে। এরপর তাকে ঘুরিয়ে দিলো বিপরীত দিকে। স্কার্টটা উপরে তুলে মোজা আর প্যান্টি হাত দিয়ে হাঁটু পর্যন্ত নামিয়ে দিলো সে, বাকিটা পা দিয়ে নিয়ে গেল একদম মেঝে পর্যন্ত।

তার কোমরে হাত থাকার কারণে বসতেও পারছিলো না নোরিকো, তাই একটু এগিয়ে গিয়ে দরজার নবটা ধরলো সে। নবের হ্যান্ডেলটা ক্রিক করে একটু ঘুরে গেল।

ডান হাত কোমরে রেখেই মৃদু আঘাত করতে লাগলো লোকটা। নোরিকোর শরীর জুড়ে অনুভূতির ফোয়ারা বয়ে যাচ্ছে। মাথাটা পেছনে হেলিয়ে দিলো সে।

শুনতে পেল এক ঝটকায় ট্রাউজার আর আন্ডারওয়্যার খুলে ফেলার শব্দ। টের পেল একটা শক্ত এবং গরম কিছুর ছোঁয়া। এরপরেই চাপ অনুভব করলো, সাথে একটা তীক্ষ্ণ বেদনা। দাঁতগুলো এক করে সহ্য করলো সে। এভাবেই এসব করতে পছন্দ করে লোকটা।

পুরোটা ভেতরে ঢুকলেও ব্যথা কমলো না নোরিকোর। এরপরই ধাক্কার গতি বাড়ালো লোকটা, আর ব্যথাও বাড়তে লাগলো সাথে সাথে। প্রচণ্ড ব্যথা লাগছে। তারপর দাঁতে দাঁত চাপতেই হঠাৎ একটা আনন্দ এসে ধাক্কা দিলো নোরিকোকে। সাথে সাথে ব্যথা উধাও হয়ে গেল। যেন মনে হলো শক্ত বস্তুটা সেখানে কখনো ছিলোই না।

এবার তার সোয়েটার আর ব্রা খুলে ফেলে স্তনে চাপ দিতে লাগলো লোকটা। নিপল নিয়ে খেলা করছে তার আঙুলগুলো। লোকটার শ্বাসের শব্দ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে নোরিকো, ঘাড়ের কাছে অনুভব করছে গরম হাওয়া।

অর্গাজম খুব ধীরে সুস্থেই হলো, অনেক দূরে বাজ পড়ার মতো করে। টানটান হয়ে গেল নোরিকোর হাত-পা। লোকটার গতি এবার আরো বেশি হয়ে গেছে, প্রত্যেকটা ধাক্কাতেই দুলে দুলে উঠছে নোরিকো। এরপরই বিজলি চমকে উঠলো যেন তার ভেতরে। শরীরটা থরথর করে কাঁপতেই কেঁদে উঠলো সে। শরীরের ব্যালেন্স হারিয়ে ফেললো কিছুটা।

দরজার নবটা ছেড়ে দিলো নোরিকো। আর দাঁড়াতে পারছে না সে। পা দুটো অনবরত কেঁপে চলেছে।

লোকটা তার পুরুষাঙ্গ নোরিকোর ভেতর থেকে বের করলে নিচে শুয়ে পড়লো সে, হাত-পা ছুঁড়ে দিলো চারপাশে। প্রতিধ্বনিত একটা শব্দ বেজে চলেছে তার মাথায়।

তার পেছনে ট্রাউজার আর আন্ডারওয়্যার তুলে নিলো লোকটা। এখনো বেশ শক্ত হয়ে আছে তার পুরুষাঙ্গ, কিন্তু ইরেকশন হওয়ার পরেও পোশাক পরতে দ্বিধা করলো না সে। সেগুলো পরে নিয়েই যেন কিছুই হয়নি এমনভাবে গিয়ে বসলো কম্পিউটারের সামনে। পায়ের উপর পা তুলে ধীরে ধীরে টাইপিং করতে শুরু করলো।

ধীরে ধীরে উঠলো নোরিকো, ব্রা তুলে নিয়ে জড়িয়ে নিলো গায়ে, এরপর সোয়েটার। প্যান্টি আর মোজা তুলে নিলো হাতে।

'আমি ডিনার নিয়ে আসছি তাড়াতাড়ি,' দেয়াল ধরে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললো সে।

লোকটার নাম ইউইচি আকিওশি। অন্তত এটাই বলেছে লোকটা তাকে।

ওর সাথে তার প্রথম দেখা হয়েছিলো এই বছরের মে মাসের এক রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে। অ্যাপার্টমেন্টের দিকে ফিরছিলো সে, এমন সময় রাস্তায় কুণ্ডিত অবস্থায়

দেখে ওকে। হ্যাংলা-পাতলা গড়নের একটা লোক, দেখে মনে হচ্ছিলো বয়স ত্রিশের মতো হবে। পরনে কালো একটা ডেনিম জিন্স আর গায়ে লেদার জ্যাকেট।

'ঠিক আছেন আপনি?' ওর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে নোরিকো।

মুখ গোমড়া করে তাকায় লোকটা। কপালের ঘামের সাথে কিছু চুল লেপটে ছিলো তার। ডান হাত রাখা ছিলো পেটের উপর। আরেকটা হাত দিয়ে নোরিকোকে চলে যেতে ইশারা করে সে। 'ঠিক আছি আমি,' কর্কশ স্বরে বলে ওঠে। কিন্তু তাকে দেখে মনে হচ্ছিলো না সে ঠিক আছে।

'অ্যাম্বুলেন্স ডাকবো আপনার জন্য?'

লোকটা আবারো হাত ঝাঁকালো, এবার অবশ্য সাথে মাথাও ঝুলে পড়লো।

'আগেও কি এরকম হয়েছে আপনার?' জিজ্ঞেস করলো নোরিকো।

কোনো জবাব দেয়নি লোকটা।

নোরিকো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বলে উঠলো, 'এক সেকেন্ড দাঁড়ান।' এরপরই তার অ্যাপার্টমেন্টে চলে যায় সে। বড় একটা মগ দেখে কেটলি থেকে গরম পানি নেয়, ঠান্ডা করার জন্য কল থেকে কিছুটা ঠান্ডা পানি মিশিয়ে নিয়ে বেরিয়ে আসে। 'নিন, পানিটুকু খান,' মুখের সামনে পানির মগটা ধরে বললো নোরিকো। 'আপনার পেটের মধ্যে জীবাণু থাকলে তা চলে যাবে।'

লোকটা অবশ্য মগটা নেওয়ার জন্য হাত বাড়ায়নি। পরিবর্তে লোকটা যা বললো তাতে অবাক না হয়ে পারেনি মেয়েটা।

'আপনার কাছে কোনো বুজ আছে?'

'কী?'

'বুজ, মানে মদ। হুইস্কি থাকলে ভালো হতো। যদি তা খেতে পারি, তবে এই ব্যথা চলে যাবে। এর আগে এরকম করে সেরেছি।'

'মজা করবেন না,' বলে উঠলো সে। 'ওতে আপনার পেটের আরো বাজে অবস্থা হবে। নিন, এই পানিটা খেয়ে নিন আগে।' আবারো মগটা এগিয়ে দিলো সে লোকটার দিকে।

লোকটা ভ্রুকুটি করে মগটার দিকে তাকিয়ে ছিলো কিছুক্ষণ। এরপরে শেষমেশ হাত বাড়িয়ে দিলো ওটা নেওয়ার জন্য। চুমুক দিয়ে গরম পানি খেতে থাকলো।

'পুরোটা খান। পেট পরিষ্কার হয়ে যাবে।'

ভ্রুকুটি অবস্থাতেই রয়ে যায় লোকটার কপাল, কিন্তু মুখে কিছু না বলে পুরোটা ঢকঢক করে খেয়ে নিলো সে।

'বমি বমি লাগছে?'

'কিছুটা।'

'বমি করতে হবে আপনাকে। করতে পারবেন?'

লোকটা ধীরে ধীরে পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। এরপর পেটে হাত দিয়ে হাঁটতে শুরু করে যেতে নিলো বিল্ডিংয়ের পেছন দিকটায়।

'আরে এখানেই করুন। এটা এমন কিছু না যে আগে কখনো দেখিনি আমি,' বলে উঠলো নোরিকো। কিন্তু লোকটা তাকে পুরোপুরি উপেক্ষা করে অ্যাপার্টমেন্টের আড়ালে হারিয়ে গেল।

কিছুক্ষণের জন্য তার দেখা পাচ্ছিলো না নোরিকো, যদিও বমির শব্দ শুনছিলো সে। মনে হচ্ছিলো লোকটাকে রেখে যাওয়া ঠিক হবে না, তাই ওখানেই দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাকলো।

যখন ফিরলো, দেখে মনে হলো কিছুটা উন্নতি হয়েছে লোকটার। রাস্তার পাশের একটা ময়লার ঝুড়ির উপরে বসে পড়লো সে।

'ভালো লাগছে এখন?' জিজ্ঞেস করলো নোরিকো।

'হ্যাঁ, কিছুটা।'

ভ্রূকুটি করা অবস্থায় থেকেই লোকটা এক পায়ের উপর আরেক পা তুলে পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা বের করলো। এরপর একটা সিগারেট মুখে নিয়ে ম্যাচের কাঠি দিয়ে আগুন ধরালো তাতে।

এক ঝটকায় ওর মুখ থেকে সিগারেটটা নিয়ে নিলো নোরিকো। লোকটা তাকালো ওর দিকে, ম্যাচবক্সটা তখনো হাতেই ধরা। ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে তার চোখদুটো।

'আপনি কি জানেন আপনি যখন সিগারেট খান, তখন আপনার পেটে স্বাভাবিকের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি এসিড উৎপন্ন হয়? এর জন্যই মানুষ খাবার শেষে সিগারেট খেতে চায়। কিন্তু খালি পেটে সিগারেট খেলে পেটে এসিডের পরিমাণ বেড়ে যায়, আর এতে করে আলসার হতে পারে আপনার।'

নোরিকো সিগারেটটা দুই টুকরো করে ফেলে। এরপরই কোথায় ফেলবে তা খুঁজতে গিয়ে টের পেল, ময়লার ঝুড়ির উপরেই বসে আছে লোকটা।

'দাঁড়াতে পারবেন আপনি?'

লোকটা উঠে দাঁড়াতেই ময়লার ঝুড়িতে সিগারেটটা ফেলে হাত বাড়িয়ে দিলো সে, 'বক্সটা দেখি।'

'কীসের বক্স?'

'যেটাতে সিগারেট রাখা আছে।'

হেসে উঠলো লোকটা। এরপর জ্যাকেটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে প্যাকেটটা বের করে আনলো। মুখটা বন্ধ করে এগিয়ে দিলো ওটা।

'এখন বসতে পারেন।'

আগের ভঙ্গিতে ফিরে গিয়ে লোকটা এবার তাকালো ওর দিকে, চোখে আগ্রহ। 'আপনি ডাক্তার?'

'পুরোপুরি না।' হেসে উঠলো নোরিকো। 'যদিও আন্দাজটা ততটা দূর দিয়েও যায়নি। আমি একটা হাসপাতালের ফার্মাসিস্ট।'

'আহ, এর জন্যই তো বলি।'

'এখানেই আশেপাশে থাকেন আপনি?'

'এই কাছেই।'

'যেতে পারবেন বলে মনে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। আমি একদম ঠিকঠাক হয়ে গেছি আবার,' ময়লার ঝুড়িটার উপর থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললো লোকটা।

'যখন সময় পাবেন, তখন একবার ডাক্তারের কাছে চেক-আপের জন্য যাবেন। গ্যাস্ট্রাইটিস মারাত্মক একটা রোগ।'

'আশেপাশে আছে কোনো হাসপাতাল?'

পলক ফেললো নোরিকো, বোঝেনি প্রথমে। 'হিকারিগাওকাতে জেনারেল হাসপাতাল আছে। বেশ কাছেই ওটা।'

লোকটা মাথা ঝাঁকাতে শুরু করলো। 'মানে আপনি যে হাসপাতালে কাজ করেন সেটা কি কাছপিঠে কোথাও?'

'ওহ, ওটা ইমপেরিয়াল ইউনিভার্সিটি হসপিটাল, ওগিকুবোর পশ্চিম দিকে।'

'আচ্ছা।' বলেই লোকটা উঠে হাঁটতে শুরু করলো। এরপর কয়েক কদম এগিয়ে গিয়ে পেছনে ফিরে বললো, 'ধন্যবাদ।'

'আপনার যত্ন নেবেন,' জবাব দিলো নোরিকো। আবারো লোকটা হাত উঁচু করে ঝাঁকিয়ে বিদায় জানালো, তারপর একদম অন্ধকারে ডুবে গেল।

আবার কখনো লোকটার দেখা পাবে তা ভাবেনি নোরিকো। তবুও তার পরদিন কাজে যাওয়ার পরে লোকটার কথাই বারবার মনে পড়তে থাকে তার। নোরিকো আসলেই আশা করেনি যে লোকটা তার হাসপাতালে আসবে কখনো, কিন্তু তারপরও বারবার ওয়েটিং রুমের দিকে তার চোখ চলে যাচ্ছিলো। আর প্রত্যেক পুরুষ রোগীর পেট ব্যথার ঔষধ দিতে গিয়ে লোকটার চিন্তাই ঘুরছিলো মাথায়।

লোকটা হাসপাতালে দেখা না দিলেও পরবর্তীতে তাদের দেখা হয়। সেদিনের ঘটনার পর এক সপ্তাহ বাদে সেই জায়গাতেই তাদের দেখা হয় যেখানে তাদের প্রথম দেখা হয়েছিলো।

বিকেলের শিফট শেষ করে বাড়ি ফেরার সময় লোকটাকে ময়লার ঝুড়িতে বসা অবস্থায় দেখতে পায় নোরিকো। রাত এগারোটা বাজে তখন, তাই অন্ধকারে প্রথমে চিনতে পারেনি নোরিকো লোকটাকে। অপরিচিত কেউ তার অ্যাপার্টমেন্টের সামনে বসে আছে, বিষয়টা কেমন যেন ছমছমে ঠেকতেই দ্রুত পাশ কাটিয়ে চলে যায় নোরিকো। এমন সময়ই পেছন থেকে পরিচিত স্বর শুনতে পায় সে, 'হাসপাতালে অনেক খাটায় বুঝি আপনাকে তারা।'

ঘুরে দাঁড়ায় নোরিকো। 'আপনি! এখানে কী করছেন?'

'এই আপনার জন্যই বসেছিলাম। ভাবলাম সেদিনের জন্য ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।'

'কতক্ষণ ধরে বসেছিলেন?'

'ভুলে গেছি,' ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো লোকটা। 'মনে হয় ছয়টা নাগাদ এসেছিলাম এখানে।'

'ছয়টা?' হালকা বড় হয়ে গেল নোরিকোর চোখ। 'এখানে পাঁচ ঘন্টা ধরে বসেছিলেন আপনি?'

'আপনাকে আগের বার ছয়টা বাজে দেখেছিলাম, তাই ভাবলাম ছয়টাই বুঝি...'

'আচ্ছা, আসলে বিকেলের শিফটে কাজ করছি এই সপ্তাহে।'

'বলার দরকার নেই।' লোকটা দাঁড়িয়ে গেল। 'যাক, যেহেতু চলে এসেছেন, চলুন কিছু খাওয়া যাক।'

ভ্রূকুটি করে তাকালো নোরিকো। 'এত রাতে কোনো কিছু খোলা আছে নাকি?'

'এখান থেকে বিশ মিনিটের দূরত্ব শিনজুকু।'

'অতটা দূরে যেতে চাচ্ছি না। ক্লান্ত আসলে।'

'এহহে...তবে তো বাজে হয়ে গেল,' হাত নাড়িয়ে বললো লোকটা। 'কী আর করা। তাহলে অন্য কোনো দিন।'

হাত নেড়েই চলে যেতে নিলো লোকটা। কয়েক কদম যাওয়ার পরেই ডাক দিলো নোরিকো, 'দাঁড়ান।'

ঘুরে দাঁড়ালো লোকটাও।

'এই নিচেই ডেনি'স নামের একটা দোকান রয়েছে।'

খানিক বাদে লোকটা বিয়ারে চুমুক দিতে দিতে বললো যে অন্তত পাঁচ বছর বাদে সে ডেনি'স-এ ঢুকেছে। তার সামনে প্লেটে সসেজ, মুরগি ইত্যাদি সাজানো আছে। জাপানিজ একটা খাবার অর্ডার দিয়েছে নোরিকো।

আর সেই সময়েই লোকটা বললো যে তার নাম ইউইচি আকিওশি এবং সে মেমোরিক্সে কাজ করে। ওটা একটা কম্পিউটার সফটওয়্যার কোম্পানি, যেটা তার কার্ডে লেখা ছিলো।

'আসলে আমরা অন্যান্য কোম্পানির থেকে অর্ডার নিয়ে সফটওয়্যার বানিয়ে দিই যাতে তারা তাদের কম্পিউটারে সেসব চালাতে পারে।' এটাই তার কাজ সম্পর্কে বলা একমাত্র কথা। এর বাইরে কখনো তার কাজের সম্পর্কে বলেনি সে।

নোরিকোর কাজ সম্পর্কে তার ভেতর আগ্রহ দেখা দেয় সেদিন। ও কাই করতো তার সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চায় সে। কখন কোন শিফট হয়, বেতন কত, বোনাস আর কীরকম ডিউটি পালন করতে হয় ইত্যাদি। নোরিকো

[illegible] শুনতে শুনতে লোকটা বিরক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু হলো তার উল্টোটা। তার চোখের মধ্যে আগ্রহ দেখতে পায় নোরিকো।

এর আগেও চেষ্টা করেছে সে, কিন্তু সেসব সময়ে ও শুধু শুনে গেছে। কারণ ও জানতো না পুরুষ মানুষ কী শুনতে পছন্দ করে। ছোটখাটো সামাজিক কথাবার্তা কখনোই বলতে পারে না সে। কিন্তু আকিওশিকে দেখে মনে হতো ওর কোনো কথা শোনার আগ্রহ নেই। নোরিকো যাই বলতো, তাই আগ্রহ নিয়ে শুনতো সে।

'আবার দেখা হবে তবে,' সেদিন যাওয়ার সময় এটাই বলেছিলো লোকটা।

এর তিন দিন বাদে ওকে দেখা করতে বলে আকিওশি। এবার শিনজুকুতেই আবার দেখা হয়। একটা বারে বসে মদ গেলার সময় নোরিকো টের পায় সেই একই উত্তাপ যে আবার দিচ্ছে তাকে। অনেক প্রশ্ন দেখতে পায় আকিওশির ভেতর। জানতে চায় তার বেড়ে ওঠা কোথায়, কীভাবে বেড়ে উঠেছে, কোন স্কুলে পড়তো ইত্যাদি সব।

'আপনি কোথায় থাকেন?' জিজ্ঞেস করে নোরিকো।

'নির্দিষ্ট কোনো জায়গা তো নেই।'

তখন মনে হয়েছিলো প্রশ্ন জিনিসটা পছন্দ করে না সে। নোরিকোও আর চাপ দেয়নি। যতটুকু জানতে পারে তা হচ্ছে জাপানের পশ্চিমের কোথাও থেকে—সম্ভবত ওসাকা থেকে এসেছে সে। আর ওসাকার বিষয়টা তার কথা বলার ভঙ্গি দেখে আন্দাজ করেছে নোরিকো।

সেদিন রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে আকিওশি নোরিকোর বাসা পর্যন্ত ছাড়তে আসে। আর এই পুরো পথটা সে এটা ভেবে কাটিয়ে দেয় যে তাকে কি রাতটা কাটাতে বলবে নাকি বিদায় জানিয়ে দেবে? যতই বাড়ির কাছে যাচ্ছিলো তারা, ততই নোরিকোর মাথার এই প্যাঁচাল বাড়তে থাকে।

আকিওশিই সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে তাকে। অ্যাপার্টমেন্টের আগে একটা ভেন্ডিং মেশিনের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে সে।

'তৃষ্ণা পেয়েছে?' জিজ্ঞেস করে নোরিকো।

'একটু কফি খেতে ইচ্ছা করলো,' স্লটে কয়েন ঢোকাতে ঢোকাতে বললো আকিওশি। ডিসপ্লের দিকে তাকিয়ে বাটন চাপ দেওয়ার জন্য হাত বাড়ালো।

'দাঁড়ান,' বলে উঠলো নোরিকো। 'আমি কফি বানিয়ে দিতে পারবো আপনাকে।'

মাঝপথেই থেমে গেল তার হাত। দেখে মনে হচ্ছে না কোনো রকম অবাক হয়েছে, শুধু মাথা দুলিয়ে কয়েন ফেরত পাওয়ার লিভারে চাপ দিলো। টুং করে শব্দ করে চলে এলো কয়েনটা। কোনো কথা না বলে সেটা পকেটে পুরে ফেললো সে।

ভেতরে গিয়ে আকিওশি সন্তর্পণে দেখতে থাকলো তার অ্যাপার্টমেন্টটা। নোরিকো কফি বানাতে গিয়ে ভাবছে যে তার এক্স-বয়ফ্রেন্ডের কিছু না দেখে ফেলে সে।

দেখে মনে হলো কফিটা আয়েশ করেই খেয়েছে লোকটা। এরপর আকার জায়গাটা কত সুন্দর করে গোছগাছ করে রেখেছে নোরিকো সে নিয়ে বেশ প্রশংসা করলো খানিকক্ষণ।

'ওহ, তবে শেষ পরিষ্কার করেছি যে দেরি হয়েছে।'

'এর জন্যই তবে ময়লা দেখছি অ্যাশট্রেতে?'

পাণ্ডুর মুখ করে নোরিকো বললো, 'কীসের অ্যাশট্রে?'

'আপনার বুকশেলফের উপরে।'

'নাহ,' জবাব দিলো নোরিকো। 'ওটায় ময়লা পড়েছে কারণ আমি স্মোক করি না তাই।'

হাসলো আকিওশি।

'আমাদের ব্রেকআপ হয়েছে দুই বছর আগে।'

'জিজ্ঞেস করিনি এটা।'

'আচ্ছা...সরি।'

দাঁড়িয়ে গেল আকিওশি। নোরিকোও উঠলো তাকে এগিয়ে দেওয়ার জন্য, কিন্তু কিছু বুঝে ওঠার আগেই আকিওশির হাত চলে গেল নোরিকোকে ধরার জন্য, তারপর মেয়েটাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ধরে ফেললো শক্ত করে।

নোরিকোও ছাড়লো না। যখন আকিওশি *ঠোঁটটা* বাড়িয়ে দিলো তার *ঠোঁটের* দিকে, নোরিকোও এগিয়ে গেল। চোখদুটো বন্ধ করে উষ্ণতা নিতে থাকলো।

***

মাথার উপরে থাকা প্রজেক্টরের আলোতে প্রেজেন্টারের চেহারাটা হালকা দেখা যাচ্ছে। বিদেশি ওইএম ডিপার্টমেন্টের কর্মী সে, একজন শাখা প্রধান। ত্রিশের *কোঠাতেই একজন* প্রধান হয়ে গেছে।

'আমার মনে হয় ইউনাইটেড স্টেটস ফুড অ্যান্ড ড্রাগ এডমিনিস্ট্রেশন আমাদের হাইপারলিপিডেমিয়া ঔষধ মেভ্যালনকে অনুমোদন দিয়ে দেবে। যে পরিমাণ বিলিপত্র আমরা ছড়িয়ে দিয়েছি ইউএসের বাজারে তাতে এটা ভাবা অস্বাভাবিক না।'

একটু নার্ভাস দেখাচ্ছে লোকটাকে, ভাবলো কাজুমারি। লোকটার নিচের *ঠোঁটটা* জিভ দিয়ে ভিজিয়ে নেওয়ার দৃশ্যটা দেখলো সে, আর সাথে রুমে থাকা অন্যান্য মানুষের চেহারার দিকেও একবার নজর বোলালো।

নিমোজুকো ফার্মাসিউটিক্যালসের টোকিওতে থাকা মূল শাখায় রুম নাম্বার ৫০১-এ একটা কনফারেন্স রাখা হয়েছে আজ। ওদের নতুন প্রডাক্টগুলোকে বিদেশে

রপ্তানি করা নিয়ে ডাকা হয়েছে এই মিটিংটা। সতেরোজন উপস্থিত আছে এখানে, বেশিরভাগই সেলস ডিপার্টমেন্টের, তবে রিসার্চ ডিপার্টমেন্টের শাখা প্রধান আর ম্যানুফ্যাকচার ডিপার্টমেন্টের আরেক প্রধানকেও দেখলো সে। রুমের ভেতর সবচেয়ে ক্ষমতাসীন ব্যক্তি যে আছে সে হলো ম্যানেজিং ডিরেক্টর ইয়াসুহারু। ইংরেজি বর্ণ 'সি'-এর মতো দেখতে ডেস্কটার একদম মাঝখানে বসে আছে সে, চোখ দিয়ে কথা বলা লোকটাকে গিলে খাচ্ছে যেন। প্রত্যেকটা শব্দ মনোযোগ দিয়ে শুনছে, একটা অক্ষরও যেন কোনো দিকে ছুটে না যায় সেদিকে লক্ষ রাখছে খুব করে। কাজুনারির কাছে এটাকে একটা শো ছাড়া কিছুই মনে হলো না, যদিও ইয়াসুহারুর এটা করতেই হবে। কারণ সে জানে লোকে তার সম্পর্কে কী বলে–কীভাবে সে তার বাবার লেজ ধরে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে এসব আর কি। আর এরকম একটা মিটিংয়ে সামান্য কটা হাই তোলার কারণেও যে বিপদে পড়তে পারে সে তাও জানে।

পুরো ঘর নীরব হয়ে থাকার কিছু পরে কথা বলে উঠলো ইয়াসুহারু।

'স্টারমেয়ার কোম্পানির সাথে যে লাইসেন্সিং এগ্রিমেন্ট করার কথা ছিলো আমাদের, ওটা তো দুই সপ্তাহ পিছিয়ে গেল। অথচ গত মিটিংয়েই ওটা করার ডেট নির্ধারণ করা হয়েছিলো। পিছিয়ে যাওয়ার কারণটা কী?' চোখ তুলে তাকালো সে। প্রেজেন্টারের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো। তার চশমার প্রান্তটায় লাইটের আলো পড়তেই জ্বলজ্বল করে উঠলো কিছুটা।

প্রেজেন্টারের সামনে থেকে একটা বেঁটে লোক বলে উঠলো, 'আসলে আমাদের রপ্তানি প্রক্রিয়ায় কিছু জটিলতা দেখা দিয়েছে।' তার স্বর ভাঙা ভাঙা শোনাচ্ছে।

'বেইস পাউডারের জন্য যে প্রক্রিয়া আমরা মানি সেটা মানতে সমস্যা কোথায়? এমনটা করেই তো ইউরোপে পণ্য পাঠাই আমরা।'

'হ্যাঁ, আসলে বেইস পাউডারের হ্যান্ডেলিংয়ের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কিছু ব্যাপার থাকার কারণে অমনটা হয়। কিন্তু এখানে কিছু একটা ভুল বোঝাবুঝি–'

'এই প্রথম এই ব্যাপারে শুনছি আমি। কোনো রিপোর্ট দেওয়া হয়েছিলো আমাকে?' ডেস্কের সামনে থাকা ফাইলটা খুললো ইয়াসুহারু। বোর্ডের অন্য সদস্যরা এরকম মিটিংয়ে ব্যক্তিগত ফাইল আনেনি। কাজুনারির মতে একমাত্র ইয়াসুহারুই এনেছে কেবল।

বেঁটে লোকটা তার পাশে থাকা এক লোক আর প্রেজেন্টারের সাথে কিছু নিয়ে কথা বলে আবার ফিরলো ইয়াসুহারুর দিকে।

'সব ধরনের ডকুমেন্ট আপনার কাছে পাঠিয়ে দেবো তবে আমরা।'

'তাই করুন।' আবার ফাইলের দিকে চোখ চলে গেল ইয়াসুহারুর। 'আচ্ছা, মেভ্যালনের কথা বাদ দিন, অ্যান্টিবায়োটিক আর ডায়াবেটিস মেডিসিনের কী অবস্থা? এফডিএ-র কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠানো দরকার ছিলো না এরমধ্যে?'

'ওয়ানান আর গ্লুকোজ, দুটোই ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের মধ্যে আছে। পরের মাসের শুরুতে আমরা রিপোর্ট পাবো বলে আশা করছি।'

'যাক, যত দ্রুত সম্ভব সেসব করতে হবে আমাদের,' বললো ইয়াসুহারু। 'শুনলাম আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী কিছু কোম্পানি নাকি আরো অনেকগুলো বিদেশি পণ্য উৎপাদনের অধিকার নেওয়ার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। আমাদের পেছনে পড়ে যাওয়াটা ঠিক হবে না।'

'অবশ্যই,' বললো প্রেজেন্টার। আশেপাশের কয়েকজনও মাথা দোলালো।

দেড় ঘন্টার মতো চললো মিটিংটা। কাজুনারি মাথার মধ্যে সব ঠিক করে নিচ্ছিলো, এমন সময় ইয়াসুহারু এসে তার কানে ফিসফিস করে বললো, 'পনেরো মিনিটের মধ্যে আমার অফিসে এসো। কিছু একটা নিয়ে কথা বলার আছে।'

'আচ্ছা, আসবো,' ধীর গলায় জবাব দিলো কাজুনারি। যাই থাকুক না কেন, ওটা যে ব্যবসা-কেন্দ্রীক না তা ওর স্বরেই বুঝতে পেরেছে কাজুনারি। এর মানে দাঁড়ায় যে এরমধ্যেই তাদের উদ্দেশে তাদের বাবাদের বলা 'কোম্পানির ভেতরে কোনো ব্যক্তিগত আলাপ চলবে না' নামক রুলস ভেঙে দিয়েছে তারা।

কাজুনারি পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা বিভাগে থাকা তার নিজের সিটে চলে গেল। ওখানে সে একজন ডেপুটি ডিরেক্টর হিসেবে আছে—এই পদটা তার নিজের সুবিধার জন্যই তৈরি করা হয়েছিলো। গত বছর নাগাদও সে ছিলো জেনারেল ম্যানেজমেন্ট, অ্যাকাউন্টিং আর হিউম্যান রিসোর্স ডিপার্টমেন্টে। একজন শিনোজুকা সদস্যের জন্য ওসব দায়িত্বকে কোর্স হিসেবে গোনা হয়। কিন্তু প্রশাসনের ব্যক্তিদের সাথে কাজ করার থেকে বরং একদম মূলে থাকা কর্মীদের সাথে কাজ করতেই বেশি ভালো লাগে কাজুনারির। একবার আবেদনও করেছিলো সে বিষয়ে। কিন্তু বছরখানেক বাদে সে বুঝেছিলো যে শিনোজুকা পরিবারের কোনো সদস্যের জন্য ওটা করা অসম্ভব।

তার ডেস্কের পাশেই একটা ব্ল্যাকবোর্ড টাইপের প্ল্যাকার্ড রয়েছে যেটাতে ওর এখনকার পদবি লেখার কথা। '২০১' লেখাটা মুছে দিয়ে 'জেন. ম্যানেজমেন্ট' লিখলো সে। এরপরই উঠে গেল চেয়ার থেকে।

দরজায় কড়া নাড়তেই ভেতর থেকে খুব ধীর একটা শব্দ এলো, 'ভেতরে এসো।'

ভেতরে ঢুকলো কাজুনারি। দেখলো ইয়াসুহারু নিজের ডেস্কে বসে বই পড়ছে।

'হেই, সরি এভাবে ডাকার জন্য,' উপরে তাকিয়ে বললো ইয়াসুহারু।

'সমস্যা নেই।' চারপাশে একবার তাকালো কাজুনারি। অফিসে তারা দুজনেই আছে। তেমন বড়ও না রুমটা; একটা ডেস্ক, ক্যাবিনেট আর ছোট একটা মিটিং প্লেস রয়েছে।

ফিক করে হাসলো ইয়াসুহারু। 'ওভারসিজ ডিপার্টমেন্টের ঐ লোকগুলোর চেহারা দেখেছ তুমি? বাজি ধরে বলতে পারি যে ওরা ভাবেনি আমি লাইসেন্সিং এগ্রিমেন্টের তারিখগুলো মনে রাখবো।'

'সহমত।'

মাথা ঝাঁকালো ইয়াসুহারু। 'ওরা কী করছে তা একবার ভাবো। দেরির বিষয়টা তাদের ডিরেক্ট সুপারভাইজারকে জানালো না পর্যন্ত!'

'আমি নিশ্চিত পরের বার আর ভুল করবে না তারা এ বিষয়ে।'

'তাই হোক, এই আশাই করি। তবে যাই হোক, আমার তোমাকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত, কাজুনারি।'

'না, না, তার দরকার নেই,' হাত ঝাঁকিয়ে বললো কাজুনারি।

কাজুনারিই এই দেরি হওয়ার বিষয়টা বলেছিলো ইয়াসুহারুকে। আর সে নিজে এটা শুনেছিলো এক লোকের কাছ থেকে যে কিনা তার সাথেই এই কোম্পানিতে ঢুকেছিলো আর এখন ওইএম বিভাগে কাজ করছে। বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট থেকে তথ্য এনে ইয়াসুহারুকে দেওয়াটাও ওর কাজের মধ্যেই পড়ে। কাজটা যে সে খুশি হয়ে করে তা না, কিন্তু এই আদেশটা সোজা কোম্পানির সিইও, মানে ইয়াসুহারুর বাবার কাছ থেকে এসেছে।

'কিছু একটা নিয়ে বলতে চাচ্ছিলে তুমি?' জিজ্ঞেস করলো কাজুনারি।

মাথা ঝাঁকালো ইয়াসুহারু। 'অতটা সিরিয়াস কিছু না। কাজের ব্যাপারে কিছু বলবো না আসলে।'

কিছু একটা অনুমান করেই কাজুনারি পেটের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠলো, আর এতেই সে টের পেল তার ডান হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে।

'চলো, বসা যাক।' চেয়ার ছেড়ে সোফার দিকে এগোচ্ছে ইয়াসুহারু।

কাজুনারি অপেক্ষা করতে লাগলো ইয়াসুহারুর বসার, এরপর গিয়ে যোগ দিলো।

'এগুলো পড়ছিলাম আসলে, দেখো,' টেবিলের উপর পড়ে থাকা একটা বই দেখিয়ে বললো ইয়াসুহারু।

কভারে লেখা আছে: *বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আদবকায়দা*।

'আমার কি এখন কাউকে বিয়ের অভিনন্দন জানাতে হবে?' মজা করেই বললো কাজুনারি।

'আরে নাহ! সেরকম কোনো অনুষ্ঠান না এটা।'

'কেউ কি তবে মারা গেছে?'

'এখনো না, তবে যাবে।'

'কে? জানতে পারি?'

'কথাটা গোপন রাখলে বলতে পারি। ওর মা।'

'সরি? ওর মানে, কার?' জিজ্ঞেস করলো কাজুনারি। যদিও সে জানে উত্তরটা।

'ইউকিহো,' বললো ইয়াসুহারু। সাথে সাথে তার চোখমুখ লাল হয়ে গেল।

'কী হয়েছে ইউকিহোর মায়ের?'

'গতকাল ফোন করলো ইউকিহো, বললো ওসাকায় নিজ বাড়িতে নাকি পড়ে গেছে মহিলা।'

'পড়লো কীভাবে?'

'ব্রেইনে নাকি রক্তক্ষরণ হয়েছে। গতকাল সকালে নাকি এটা জেনেছে সে। তার একজন স্টুডেন্ট সকালে *চা পানের রীতি*-র ক্লাস নিতে এসে দেখে বাগানে পড়ে আছে ইউকিহোর মা।'

'হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে তাকে?'

'সেই সময়েই নিয়ে গেছিলো। ইউকিহো যখন আমাকে ফোন করে, সেখানেই ছিলো সে।'

'বুঝলাম,' বললো কাজুনারি। 'কী অবস্থা এখন তার?' যদিও এটার উত্তরও তার জানা ছিলো। যদি ভালো হওয়ার কোনো রাস্তা থাকতো ইউকিহোর মায়ের, তাহলে এখানে বসে ইয়াসুহারু অনুষ্ঠানের নিয়মকানুন শিখতো না।

হালকা মাথা ঝাঁকিয়ে তাকালো ইয়াসুহারু। 'কিছুক্ষণ আগেও ফোন করেছিলাম। এখনো জ্ঞান ফেরেনি নাকি। ডাক্তারও আশা দেখছে না। ইউকিহো বলেছে, হয়তো সময় এসে গেছে তার মায়ের। এরকম অসহায় আর কখনো দেখিনি ওকে।'

'তার মায়ের বয়স কত?'

'সত্তরের মতো মনে হয়। উনি ইউকিহোর পালক মা, তাই বয়সের এত পার্থক্য।'

মাথা দোলালো কাজুনারি। এসবই জানে সে।

'তো এটা কেন পড়ছেন, বস?' টেবিলে থাকা বইটার দিকে নির্দেশ করে বললো কাজুনারি।

'আরে বস বলে ডেকো না আমাকে। অন্তত যখন ব্যক্তিগত আলাপ করছি তখন না।' কিছুটা ক্রুদ্ধ দেখালো তার চেহারাটা।

'আসলে বুঝতে পারছি না ইউকিহোর মায়ের শোকসভা নিয়ে তোমার এত উদ্বেগ কেন।'

'মানে যে মানুষটা মারা যাবে তার মৃত্যুর আগে আমার চিন্তা করা দরকার নেই?'

মাথা ঝাঁকালো কাজুনারি। 'না, আমার মনে হয় এটা তোমার চিন্তা করার মতো কোনো বিষয় না।'

'কেন না?'

'আমি জানি তুমি তাকে প্রপোজ করেছ, কিন্তু সে কি তার প্রত্যুত্তরে কোনো জবাব দিয়েছে? এটাই অন্যতম একটা কারণ।' যথাযথ শব্দ খুঁজে নেওয়ার জন্য একটু থামলো কাজুনারি, তারপর আবার বলা শুরু করলো, 'তুমি একজন অপরিচিত, আসলেই। আমি যা বলতে চাচ্ছি তা হলো, কারো মায়ের মৃত্যুতে শিনোজুকা ফার্মাসিউটিক্যালসের জেনারেল ম্যানেজারের এমন কিছু হয়ে যাবে না যে সে এর জন্য আচার-অনুষ্ঠানের নিয়মকানুন পড়া শুরু করে দেবে।'

একটু এগিয়ে এসে সোফায় হেলান দিয়ে সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে তাচ্ছিল্যভরা একটা হাসি দিলো ইয়াসুহারু। এরপর আবার নিচে তাকিয়ে বললো, 'অপরিচিত বলাটা একটু বেশিই হয়ে যায়। সে হয়তো হ্যাঁ বলেনি, কিন্তু না-ও তো বলেনি। যদি কোনো সুযোগ না থাকতো হ্যাঁ বলার, তাহলে সে সময়েই আমাকে না করে দিতো।'

'আর যদি হ্যাঁ বলার কোনো সুযোগ থাকতো সে সময়, তাহলে তখনই বলে দিতো তোমাকে।'

আবারো মাথা ঝাঁকালো ইয়াসুহারু। 'তুমি এসব বলছো কারণ প্রথমত, তুমি এখনো তরুণ আছো। দ্বিতীয়ত, তুমি এখনো অবিবাহিত। সে আর আমি জানি বিবাহিত মানে কী। আর এজন্য যখন আবার একটা ঘর পাতানোর সুযোগ আসে, তখন ধীরে সুস্থে সব দেখতে হয়। আর যখন দুজনের কেউ একজন বিপত্নীক হয়, তখন তো কথাটা আরো বেশি করে সত্য হয়ে যায়।'

'তা ঠিক বলেছ।'

'আরো আছে,' আঙুল তুলে যোগ করলো ইয়াসুহারু। 'যদি আমরা অপরিচিতই হতাম, তাহলে সে প্রথমেই আমাকে বলতো না তার মায়ের খবরটা। আমার মনে হয় এরকম কঠিন মুহূর্তে তার আমাকে মনে করাটাও একটা উত্তর।'

আর এটাই ইয়াসুহারুর ফুরফুরে মেজাজের কারণ, ভাবলো কাজুনারি।

'যাক গে, আমার মনে হয় কারো কঠিন মুহূর্তে আমাদের একটু হাত বাড়িয়ে দেওয়াটা উচিত। সমাজের একজন সদস্য বলে না, বরং একজন মানুষ হিসেবে করা উচিত কাজটা।'

'তার মানে এটাই তাহলে? মানে কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে সে? এর জন্যই ফোন করেছিলো?'

'তুমি তো জানো সে কীরকম শক্ত প্রকৃতির। কান্নাকাটি করা বা তাকে বাঁচাতে যেতে হবে, এমন কিছুই বলেনি সে। শুধু ফোন করে এটা জানাতে চেয়েছিলো যে কী ঘটেছে। তবুও এটা বুঝতে ততটা অসুবিধা হয় না যে সে আসলে কঠিন সময় পার করছে। ওসাকা তার বাড়ি হতে পারে ঠিকই, কিন্তু সেখানে তার পরিচিত কেউ নেই এখন আর। যদি তার মা মারা যায়, তবে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সকল প্রকার কাজ

তাকে একা সামলাতে হবে। আর এটাও হয়তো একটা উদ্বেগের কারণ হতে পারে ইউকিহিরো কায়াশাওয়ার জন্য।'

'দেখো, এটাই হয়ে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায়,' চচাতো ভাইয়ের চোখের দিকে তাকিয়ে বললো কাজুনারি। 'অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করাই হয় শোক পালন করার জন্য...যার কারণে আগে থেকেই সবকিছু প্রস্তুত করে রাখা থাকে। তাকে যা করতে হবে তা হলো, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পালন করতে যারা সাহায্য করে তাদেরকে ফোন দিতে হবে। এরপর পেশাদারদের হাতেই ছেড়ে দেবে সেসব। ওকে শুধু তাদের কথা অনুযায়ী কিছু কাজ করতে হবে আর অনুষ্ঠান শেষে তাদেরকে টাকা ধরিয়ে দেবে, ব্যস। আর যদি মাঝখানে একটু-আধটু সময় পায়, তাহলে ছবির সামনে বসে দুদণ্ড কেঁদে নেবে। ততটাও আহামরি কিছু না এটা।'

ভ্রু নাচিয়ে তাকালো ইয়াসুহারু। 'হিম হয়ে যাওয়ার মতো কথা বললে একেবারে। আমি আরো ভাবলাম ইউকিহিরোর জন্য কিছুটা চিন্তা হবে তোমার, যেহেতু একই ক্যাম্পাসে ছিলে তোমরা।'

'তার স্কুলের মেয়েরা আমাদের ড্যান্স ক্লাবে প্রশিক্ষণ নিতো, এই-ই যা।'

'আরো বিস্তারিত বলো, বিস্তারিত। তুমিই আমার সাথে তার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলে কিন্তু।' লম্বা দৃষ্টি দিলো ইয়াসুহারু।

কাজুনারি প্রায় বলেই ফেলছিলো যে সেজন্য তার নিজের ভেতর কতটা অনুতাপ কাজ করছে।

'যাই হোক,' পায়ের উপর পা তুলে একটু ঝুঁকে বললো ইয়াসুহারু, 'হয়তো এটা আগেভাগে তৈরি হয়ে থাকার মতো কিছু না, তবুও তার মায়ের কিছু হয়ে যেতে পারে ভেবে তৈরি হতে চেয়েছিলাম আমি। অবশ্য, তুমি যা বলেছ তাও আমার মাথায় আছে। আমি এও জানি না যে তার মা মারা গেলে আমি ওসাকাতে যেতে পারবো কি না। আর সেজন্যই কথা বলতে চাচ্ছিলাম আর কি।' ধীরে ধীরে নিজের আঙুলটা কাজুনারির দিকে নিয়ে এলো সে। 'পরিস্থিতি বিবেচনা করে ভাবছি, তুমি একবার আমার হয়ে যাবে কি না। তুমি ভালো করেই চেনো জায়গাটা। আর ইউকিহিরোও তোমাকে চেনে।'

কাজুনারি ইয়াসুহারুর বলা শেষ হওয়ার আগেই ভ্রূকুটি করে তাকালো। 'এটা করতে বোলো না আমাকে।'

'কেন না?'

'কারণ কোম্পানির কাজ আর ব্যক্তিগত কাজ মিলেমিশে একাকার হয়ে যাবে। মানুষ বলাবলি করতে শুরু করবে যে আমি তোমার পার্সোনাল সেক্রেটারি।'

'বোর্ডের একজন সদস্যকে সাহায্য করা ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনা বিভাগের অফিশিয়াল ডিউটির মধ্যেই পড়ে।'

'এটার সাথে শিনোজুকা ফার্মাসিউটিক্যালসের সম্পর্ক কী?'

'কী আসে যায় তাতে? যা ম্যাটার করে তা হলো, কে তোমাকে যেতে বলছে,' রুক্ষ কণ্ঠে বললো ইয়াসুহারু। এরপর হালকা হেসে কাজুনারির দিকে তাকিয়ে বললো, 'বলেছো?'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো কাজুনারি। *এখন আবারো বসের মতো আচরণ করছে সে।*

***

ডেস্কে ফিরে ফোন তুলে নিলো কাজুনারি। অন্য হাত দিয়ে ডেস্কের ড্রয়ারটা খুলে সেখান থেকে শিডিউল করা খাতাটা বের করলো। ঠিকানার পেজটা বের করেই প্রথম পেজ উলটে দেখলো সে। ইমায়েদার নাম্বার খুঁজে পেতেই তা উঠাতে লাগলো ফোনে। নাম্বার ঠিক আছে কি না চেক করে রিসিভার কানে ধরে অপেক্ষা করতে লাগলো। কয়েকবার বাজলো ফোনটা। হাতের আঙুল দিয়ে ডেস্কের উপর টোকা দিতে লাগলো বারবার।

ছয়বারের মতো ফোনটা বাজার পর থেমে গেল। *আবার না, প্লিজ!* ভাবলো কাজুনারি। ইমায়েদার আনসারিং মেশিন ছয়বার রিং হওয়ার পরেই অটোমেটিক উঠে যায়। অন্য পাশ থেকে একটা মহিলার রেকর্ড করা স্বর বললো যে ঘরে কেউ নেই। ও যেন তার নাম, নাম্বার আর একটা ছোট ম্যাসেজ রেখে যায়।

বিপ করে শব্দটা শোনার আগেই রেখে দিলো কাজুনারি। এত জোরে গালি দিলো যে সামনে থাকা একটা মেয়ে কর্মচারী মাথা তুলে তাকালো একবার।

কী সমস্যা তোমার, ইমায়েদা?

আগস্টের মাঝামাঝি একটা সময়ে ইমায়েদার সাথে শেষ দেখা হয়েছিলো তার। প্রায় এক মাসের উপরে হয়ে গেছে, অথচ আর কোনো খবরই পাচ্ছে না সে। কয়েকবার ফোন করেছে কাজুনারি, কিন্তু ইমায়েদার কোনো খোঁজ পায়নি। ওর আনসারিং মেশিনে দুইবার ম্যাসেজও রেখেছিলো যে তাকে যেন ফোন করে, কিন্তু তারপরও কোনো হদিস মেলেনি।

কাজুনারি ধরে নিয়েছে হয়তো কোনো জায়গায় ছুটি কাটাতে গেছে সে। তবে কোনো প্রাইভেট গোয়েন্দা সংস্থা চালানোর পন্থা এটা না। বস্তুত কাজুনারি যখন তাকে কাজটা দেয়, তখন বলেই নিয়েছিলো যে বেশ ঘনঘন রিপোর্ট করতে হবে।

অথবা, ভাবলো কাজুনারি, *হয়তো ইউকিহো কারাশাওয়াকে অনুসরণ করতে গিয়ে ওসাকাতে গেছে সে। এটাও একটা সম্ভাবনা মাত্র। কিন্তু তার রিপোর্ট দরকার এক্ষেত্রেও।*

ডেস্কের শেষ দিকে একটা কাগজ রাখার জায়গায় চোখে পড়লো কাজুনারির। দুই দিন আগে হওয়া একটা মিটিংয়ের খসড়া রাখা আছে ওখানে। মিটিংটা ছিলো একটা কম্পিউটার সিস্টেম নিয়ে যা কিনা স্বয়ংক্রিয়ভাবে কোনো রাসায়নিকের ভেতর কী কী উপাদান আছে এবং কী পরিমাণে আছে তা নির্ণয় করে দিতে পারবে। কাজুনারির নিজেরও বেশ আগ্রহ ছিলো ওতে, কিন্তু এই মুহূর্তে শুধু চোখ

ঘুমিয়ে গেলো। কারণ তার মাথা ভারি হয়ে আছে ইয়াসুহারু আর ইউকিহোর [illegible] চিন্তা নিয়ে।

[illegible] দিয়ে ভাবনার কারণে এখন সত্যিই [illegible] না। [illegible] পাওয়ার পরে সত্যিই তেমন [illegible]। আর এটাই ভুল ছিলো তার।

[illegible] ইয়াসুহারুর সাথে ইউকিহোর দেখা হওয়ার [illegible] কথা। [illegible] এমন কিছুই ছিলো না যে বলা যাবে সে [illegible]। [illegible] খারাপ ছিলো সেদিন। এমনকি ইউকিহো [illegible] তার সাথে কথা বলছিলো, তখন বিনম্র স্বরে জবাব দিচ্ছিলো সে। কিন্তু একপর্যায়ে কাজুনারি বুঝতে পারে যে ইয়াসুহারু আসলে কী অভিনয়টাই না করেছিলো সেদিন।

তার প্রেমে পড়াটা অবশ্যই খারাপ কিছু ছিলো না। একজন পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সি লোকের দুটো বাচ্চাকে নিয়ে বাকিটা জীবন একা থাকার কোনো মানে হয় না। *আবার বিয়ে করো*, ভাবলো সে। *তবে সঠিক মানুষটাকে।*

আর ইউকিহো মোটেও সেই সঠিক মানুষটা না।

কাজুনারি কখনো এটা বের করতে পারেনি যে ঠিক কী কারণে সে ইউকিহোকে পছন্দ করে না। যেমনটা সেই প্রাইভেট গোয়েন্দাকে বলেছিলোঃ ইউকিহো যেখানেই যায়, সেখানেই রহস্যজনকভাবে টাকার খেলা চলতে থাকে। যদিও ওর মনে হয় তার মস্তিষ্ক আর কোনো কিছু না পেয়ে এটাকেই তুলে ধরেছে। বাস্তবতা হলো, এই অপছন্দের শুরুটা বোধহয় সেই ড্যান্স ক্লাব থেকেই হয়েছিলো। আর ওখানেই সে প্রথম দেখে ইউকিহোকে।

কাজুনারি চাচ্ছে না তার চাচাতো ভাইয়ের সাথে মেয়েটার বিয়ে হোক, কিন্তু এই বিষয়টা ইয়াসুহারুকে বোঝাতে হলে ভালো একটা কারণ তাকে দেখাতে হবে। সে চাইলেই বলতে পারে যে 'মেয়েটা বিপজ্জনক। ওকে বিয়ে কোরো না', কিন্তু খুব ভালো করেই জানে যে এতে করে সে এই তর্কে জিততে পারবে না। উঁহু, এতে ইয়াসুহারুর মেজাজ আরো খারাপ হয়ে যাবে।

এর জন্যই কাজুনারির ইমায়েদাকে প্রয়োজন। অন্তত মাড়ি খুঁড়ে কেউটের মতো কিছু একটা বের করার জন্য। তার এমন একজনকে দরকার যে ইউকিহোর ব্যাপারে আসল সত্যটা তুলে ধরবে।

কাজুনারির মাথায় ইয়াসুহারুর আবদারটা ঘুরছে এখন। ওকে হয়তো যেতে হতে পারে ইউকিহোর কাছে, প্রয়োজনের সময় সাহায্য করতে হতে পারে।

হাস্যকর কথা বটে, নিজে নিজেই বললো কাজুনারি। আরেকটা জিনিস মনে পড়লো ওর। ইমায়েদার সেই কথাঃ ইউকিহো ইয়াসুহারুকে ভালোবাসে না কারণ সে অন্য আরেকজনকে ভালোবাসে।

আমাকে।

'হাস্যকর কথা বটে,' মনের কথাটা এবার চাপা স্বরে বলে উঠলো সে।

***

'তিন-চার দিনের জন্য একটু যেতে হবে আমাকে,' এক সন্ধ্যায় নোরিকো গোসল থেকে বের হওয়ার পরে বললো আকিওশি।

'কোথায় যাচ্ছো তুমি?'

'রিসার্চের কাজে।'

ড্রেসারের সামনে থামলো নোরিকো। 'কোথায় যাচ্ছো তা বলবে না আমাকে?'

আকিওশি একটু দ্বিধা নিয়ে বললো, 'ওসাকায়।'

'হাঁহ? ওসাকায় যাবে?'

'কালকে রওয়ানা দেবো আমি।'

'থামো।' ড্রেসার থেকে বেরিয়ে মুখোমুখি দাঁড়ালো সে। 'আমিও যেতে চাই তোমার সাথে।'

'তোমার কাজ নেই?'

'কয়েক দিনের ছুটি নিয়ে নেবো। গত বছরের পরে এক দিনেরও ছুটি নেইনি আমি।'

'ছুটি কাটাতে যাচ্ছি না।'

'জানি আমি। তোমার কাজের মধ্যে আসবো না, কেমন? তোমার কাজের সময় এদিক-সেদিক ঘুরে দেখবো।'

ভ্রুদুটো কুঁচকে একবার তাকালো আকিওশি। নোরিকো বুঝেছে তার আবদারের পরে একটু পিছু হটেছে আকিওশি। সাধারণত এরকম আগ বাড়িয়ে কিছু করে না সে, কিন্তু যখনই ওসাকার নাম শুনলো, তার মনে হলো তাকে যেতে হবে। এর একটা কারণ হলো, নোরিকো দেখতে চাচ্ছিলো কোন জায়গা থেকে আকিওশি এসেছে। কখনোই তার পরিবার নিয়ে কিছু বলেনি সে, আর এটাই সুযোগ সেসব জানার।

'ট্যুরে যাচ্ছি না আমি। যেকোনো সময় আমার কাজের শিডিউলে পরিবর্তন হতে পারে। সত্যি বলতে, আমি এও জানি না যে কখন ফিরতে পারবো।'

'সমস্যা নেই তাতে,' বললো নোরিকো।

'ঠিক আছে,' আকিওশি মেনে নিলো শেষমেশ। 'যা ইচ্ছা হয় করো।'

আকিওশি যখন কম্পিউটারের দিকে ঘুরে গেল, নোরিকোর বুকের মধ্যে গিয়ে লাগলো সেটা। বেশ বড় একটা পদক্ষেপ নিয়ে ফেলেছে সে। এরপরে আর পেছনে ফিরে তাকানোর সুযোগ নেই। এমন না যে কিছুই না করাটা একটা অপশন ছিলো। যদি এরকম চলতে থাকে, তাহলে তাদের আলাদা হতে খুব বেশি একটা সময়

লাগবে না। আর এটা চাচ্ছে না সে। যদিও মাত্র দুই মাস হয়েছে তাদের সম্পর্কের, কিন্তু নোরিকো গভীর প্রেমে জড়িয়ে গেছে এরমধ্যেই।

আকিওশির চাকরি চলে যাওয়ার পর থেকে একসাথে থাকা শুরু করে তারা। লোকটা সরাসরি কোনো উত্তর দেয়নি যে কেন চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছে। শুধু বলেছিলো একটু অবসর সময় লাগবে, ব্যস।

'সঞ্চয় আছে আমার, তাই না খেয়ে মরবো না, অন্তত বেশ কয়েক দিনের জন্য তো না-ই। এরপরে কী করবো সে বিষয়ে ভাবার জন্য সময় পাবো আমি।'

আকিওশি এমন মানুষ না যে কারো কাছে সাহায্যের জন্য হাত পাতবে। তারপরও তার দুঃখ লেগেছিলো এটা ভেবে যে এত বড় একটা সিদ্ধান্তের ব্যাপারে তাকে একবার জিজ্ঞেসও করেনি সে, অথবা কোনো উপদেশও চায়নি। ও শুধু আকিওশির জীবনের একটা নগণ্য অংশ না, বরং অবিচ্ছেদ্য অংশ হতে চায়।

একসাথে থাকার পরিকল্পনাটা নোরিকোরই। প্রথম প্রথম এর প্রতি তেমন একটা আগ্রহ দেখা যায়নি আকিওশির ভেতর, কিন্তু সপ্তাহখানিকের মাথায় তার মত পরিবর্তিত হয়ে যায়। তার পার্থিব সম্পত্তি বলতে ছিলো কেবল একটা কম্পিউটার আর ছয়টা কার্ডবোর্ডের বাক্স।

তারপর নোরিকো তার স্বপ্ন সম্পর্কে জানতে পারে। তার ভালোবাসার মানুষটার সাথে সে থাকছে। যেই সময় ঘুম থেকে উঠছে, সে সময় বিছানায় তার মানুষটিকে দেখতে পাচ্ছে। ও চায় এই সুখের অনুভূতি যেন আজীবন থাকে। বিয়ে করাটা কোনো ইস্যু না, এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে সে। এমন না যে সে বিয়ে করতে চায় না–করলে ভালোই হবে। ও আসলে চাচ্ছে না যে যা এখন পাচ্ছে, সেই জিনিসটা হারিয়ে যাক।

কিন্তু বেশ কিছু দিন হলো তার মাথায় একটা জিনিস বিঁধে আছে। এক রাতে হয়েছিলো ঘটনাটা, যখন সেক্স করছিলো তখন। স্বাভাবিকের মতোই চিকন মাদুরটার উপর ছিলো দুজনেই। নোরিকো দুবার চরম সীমায় পৌঁছে গেছিলো আর আকিওশি একবার–ওদের স্বাভাবিক প্যাটার্ন।

কখনোই কনডম ব্যবহার করেনি তারা, এমনকি প্রথমবারেও না। সে অনেক জোরে জোরে চাপ দিয়ে তারপর একটা সময় পুরুষাঙ্গ বের করে ফেলতো, এরপর বীর্য ফেলে দিতো টিস্যুতে। এ নিয়ে তেমন কোনো সমস্যা ছিলো না নোরিকোর, কিন্তু সেদিন রাতে সে আসলে জানে না কীসের জন্য তার ভেতর সন্দেহটা জেগেছিলো। হয়তো সেই চাহনিটার জন্যই যেটা আকিওশির চোখে দেখেছিলো সে।

তার দুই পায়ের মাঝখানে স্পর্শ করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলো নোরিকো।

'বাদ দাও,' পিঠটা ওর দিকে ঘুরিয়ে বলেছিলো আকিওশি।

নোরিকো উঠে গিয়ে ওর দিকে তাকালো। 'তোমার অর্গাজম হয়নি, তাই না?'

কিছুই বললো না লোকটা। তার মুখভঙ্গিতে পরিবর্তন হয়নি। শুধু চোখটা বন্ধ করে ফেলেছে।

নোরিকো মাদুর ছেড়ে উঠে ময়লার ঝুড়ির কাছে চলে গেল।

'বাদ দিতে বলেছি আমি!'

ও ঘুরে তাকিয়ে দেখলো, উঠে বসেছে সে।

'এমনটা কেন করছো তুমি?' গর্জে উঠলো আকিওশি।

'তোমার অর্গাজম হলো না কেন?'

চিবুকটা চুলকালো সে, কিন্তু কিছুই বললো না।

'এরকম কবে থেকে হচ্ছে?'

এবারও কোনো জবাব নেই।

দম ছাড়লো নোরিকো। 'এক মিনিট, তোমার কি কখনোই অর্গাজম হয়নি?'

'কী দরকার তা দিয়ে?'

'দরকার আছে!' বললো সে। উলঙ্গ হয়ে তার সামনে বসলো। 'অনেক দরকার আছে আমার। এটা কি আমার জন্য হচ্ছে? মানে আমার সাথে অর্গাজম হচ্ছে না তোমার?'

'না, ওরকম কিছু না।'

'তাহলে কী? খুলে বলো আমাকে।'

নোরিকো বুঝতে পারছে তার মুখটা লাল হয়ে যাচ্ছে। এত দিন বোকা বানানো হয়েছে তাকে। হতাশা, দুর্ভাগ্য আর বিব্রতকর অনুভূতি মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে ওর ভেতর। ওদের আগের সেক্সগুলোর কথা মনে করতেই তার ইচ্ছা হলো হাত দিয়ে মুখটা ঢেকে ফেলতে।

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মাথা ঝাঁকালো আকিওশি। 'আসলে তোমার কোনো সমস্যা নেই।'

'তাহলে কী?'

'কোনো মেয়ের সাথেই অর্গাজম হয় না আমার। চাইলেও পারি না।'

'ইরেক্টাইল ডিজফাংশন জাতীয় কিছু?'

'এখানেই সমস্যা। তোমরা মেডিক্যালের মানুষজন সবকিছুকে রোগ হিসেবে দেখো।'

'আমি বিশ্বাস করি না তোমার কথা। এটা নিয়ে কোনো মজা করবে না বলে দিলাম।'

'মজা করছি না আমি। সত্যিটাই বললাম।'

'কোনো ডাক্তার দেখিয়েছ?'

'নাহ।'

'কেন না?'

'কারণ আমার মনে হয়নি এটা এমন কোনো কিছু যেটা ঠিক করতে হবে।'

'অবশ্যই ঠিক করতে হবে!'

'দেখো, এটা আমার ব্যক্তিগত বিষয়, আর এটা নিয়েই সন্তুষ্ট আছি আমি। তাই এ বিষয়টা আমার উপরেই ছেড়ে দাও।' আবার পেছনে ঘুরে গেল সে।

ও ভেবেছিলো যদি এমনটাই হয়ে থাকে, তবে তারা হয়তো আর কখনো সেক্স করবে না। কিন্তু তার তিন দিন বাদেই আকিওশি তার উপর এসে পড়ে। নোরিকো ওকে তাই করতে দেয় যা সে করতে চেয়েছিলো। *যদি তার অর্গাজম না হয়, তবে আমারও হবে না*, ভাবে নোরিকো। কিন্তু ওটা তো আর এরকম শৃঙ্খলা মেনে হয় না। সবকিছু হয়ে যাওয়ার পরে তৃপ্তিটা বেশিক্ষণ টেকেনি, কোনো শান্তির ঘুমও হয়নি। যা হয়েছে তা হলো বিব্রতকর অনুভূতি আর একরাশ বেদনা।

'সব ঠিক হয়ে যাবে,' নোরিকোর চুলে হাত বোলাতে বোলাতে বলেছিলো লোকটা।

একবার আকিওশি নোরিকোকে বলেছিলো যে তার হাত আর মুখ ব্যবহার করে দেখতে। নোরিকো তাই করেছিলো। জিহ্বা আর হাতের আঙুল দিয়ে কাজ চালিয়েছিলো। কিন্তু তার ইরেকশন হলেও অর্গাজমের কোনো চিহ্ন ছিলো না।

'অনেক হয়েছে, থামো এবার। দুঃখিত আমি,' আকিওশি বলেছিলো।

'না, দুঃখ তো আমার লাগা উচিত।'

মাথা ঝাঁকালো আকিওশি। 'এখানে আসলে তোমার দোষ নেই।'

'কেন কাজ করছে না এটা?'

চুপ করে রইলো সে। নোরিকোর হাতের দিকে তাকালো। তখনো তার পুরুষাঙ্গ ধরে আছে মেয়েটা। হঠাৎ আকিওশি বলে উঠলো, 'অনেক ছোট।'

'কীহ?'

'তোমার হাত। খুব ছোট।'

নিজের হাতের দিকে তাকালো নোরিকো। মাথার ভেতরে চলছে অন্য কোনো মেয়ের চিন্তা, যে তার পুরুষাঙ্গটা ধরেছে ওর আগে। এমন কোনো মেয়ে যে তাকে অর্গাজমের স্বাদ দিতে পারে, যার সাথে তার তুলনা করা হলো এইমাত্র।

ওর হাতের মধ্যে থাকা অবস্থাতেই নিস্তেজ হয়ে গেল অঙ্গটা।

এরপর আকিওশি যা বললো, তা শুনে কয়েক দিন বেশ চিন্তিত ছিলো নোরিকো।

আকিওশি ওর কাছে কিছু সায়ানাইড চাইলো।

'একটা উপন্যাসের জন্য লাগবে আর কি,' বললো সে। 'ভাবলাম এদিক-সেদিক ঘুরে না বেড়িয়ে একটা রহস্য উপন্যাস লিখে ফেলি। সায়ানাইড ব্যবহার করতে চাচ্ছিলাম আর কি উপন্যাসে। কিন্তু কখনোই দেখিনি সায়ানাইড দেখতে

কেমন। তো ভাবলাম তুমি আনতে পারো কি না। আমার মনে হয় এত বড় একটা হাসপাতালে থাকার কথা।'

'আমাকে একটু চেক করে দেখতে হবে। আছে কি নেই তা জানি না।' আকিওশি বই লিখছে এটা বিশ্বাস হচ্ছে না ওর। তবে ও জানে যে হাসপাতালে কিছুটা পটাশিয়াম সায়ানাইড রাখা আছে স্টোরেজে। অবশ্যই কোনো মেডিসিনে ব্যবহারের জন্য না। মেডিকেল ইউনিভার্সিটি হওয়ার কারণে সব ধরনের বিষই ওদের হাসপাতালে আছে যাতে রিসার্চের সময় কাজে লাগাতে পারে। কিন্তু খুব কমসংখ্যক মানুষই স্টোরেজের কাছে যেতে পারে।

'শুধু দেখবে, না?'

'কিছু সময়ের জন্য সাথেও রাখতে হবে।'

'আমার মনে হয় না এটা কোনো ভালো আইডিয়া। সায়ানাইড নিয়ে কথা বলছি আমরা।'

'আমি এখনো ঠিক করিনি যে ঠিক কী কাজে ব্যবহার করবো আমি। প্রথমে দেখতে হবে আমাকে। যদি পারো তো কিছুটা নিয়ে এসো। অবশ্য, যদি না চাও বা না পারো, তবে দরকার নেই। অন্য রাস্তা ঠিক করা আছে আমার।'

'কীরকম রাস্তা?'

'আগের চাকরিটার সুবাদে অনেক কোম্পানির সাথে আমার যোগাযোগ আছে। নিশ্চিত করে বলতে পারি, ওদের কারো কাছে বললে আমাকে সায়ানাইড এনে দিতে পারবে।'

নোরিকো ভেবেছিলো না করে দেবে সেই মুহূর্তেই, কিন্তু অন্য রাস্তার কথা শুনে কিছুটা থামলো সে। যদি অবিশ্বস্ত কেউ ওকে সায়ানাইড এনে দেয় তো? কিছু একটা হয়ে গেলে তখন কী হবে?

মাথা ঝাঁকালো সে। 'খুব বাজে আইডিয়া।'

তারপর আগস্টের মাঝামাঝি একটা দিনে সে ছোট একটা বোতলে পটাশিয়াম সায়ানাইড এনে দিলো আকিওশিকে।

'কথা দাও যে এগুলো কোথাও ব্যবহার করবে না তুমি।'

'কথা দিচ্ছি। এ নিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই তোমার,' বোতলটা হাতে নিয়ে বললো আকিওশি।

'দাও, আমি খুলে দিচ্ছি ঢাকনাটা। গ্লাসের উপর থেকেই দেখে নাও তুমি।'

কোনো জবাব দেয়নি সে। বোতলের ভেতরের পাউডারগুলো দেখে অসাড় হয়ে পড়েছিলো যেন।

'প্রাণনাশের জন্য কী পরিমাণ ডোজ নিতে হয়?'

'দুইশো থেকে তিনশো মিলিগ্রামের মতো।'

'তো এই জিনিসটা আমি শুধু দেখে কী করে বুঝবো?'

'ভেবে নাও ছোট একটা চা-চামচের চার ভাগের এক ভাগ।'

'বেশ শক্তিশালী মনে হচ্ছে। পানিতে মেশাতে হয়, তাই না?'

'মেশালেই মিশে যাবে। তবে কেউ যদি কোনো জুস বা ওরকম কোনো কিছুতে মেশাতে চায়, তবে চা-চামচের চার ভাগের এক ভাগের একটু বেশি দিতে হবে তাতে।'

'সেটা কেন?'

'কারণ ভিক্টিম প্রথম চুমুকেই অস্বাভাবিক কিছু স্বাদ পাবে। লোকে বলে যে খুবই কটু স্বাদ নাকি ওটার। অবশ্য, আমি কখনো টেস্ট করিনি।'

'তার মানে ততটুকু পরিমাণই ঢালতে হবে গ্লাসে যাতে প্রথম চুমুকেই মারা যায়? তো যদি তত বেশিই খারাপ লাগে খেতে, তবে কি ভিক্টিম ছুঁড়ে ফেলবে না মুখ থেকে?'

'কটু একটা গন্ধও নাকি আছে এটার। ভালো ঘ্রাণশক্তি যার আছে, সে খাওয়ার আগেই টের পেয়ে যেতে পারে।'

'বাদামের মতো গন্ধ না এটার?'

'হ্যাঁ, তবে যে বাদামের কথা তুমি ভাবছো সেই বাদাম না। ওটার গন্ধ বাদামের ফলের মতো। আমরা তো কেবল বিচি খাই।'

'একটা বইতে পড়েছিলাম যে একজন নাকি দ্রবণের সাথে সায়ানাইড মিশিয়ে স্টাম্পের সাথে লাগিয়ে দিয়েছিলো...'

মাথা ঝাঁকালো নোরিকো। 'অবাস্তব ব্যাপার। প্রাণনাশের জন্য এর থেকে অনেক বেশি ডোজ লাগবে।'

'লিপস্টিকের সাথে মেশালে কেমন হয়?'

'ওতেও মরবে না। সায়ানাইড একটা ক্ষারীয় পদার্থ, যার কারণে চামড়ায় কালশিটে দাগ পড়বে। আর ওতে তার পেটের মধ্যেও ঢুকবে না বিষ, তাই মরার সম্ভাবনা নেই।'

'কীভাবে?'

'সায়ানাইড নিজে কিন্তু নিষ্ক্রিয় পদার্থ, যার কারণে কাজ করতে হলে ওটাকে আগে তোমার পেটের মধ্যে যেতে হবে। আর একবার গেলে সেখানে থাকা এসিডের সাথে বিক্রিয়া করলেই সায়ানাইড গ্যাস উৎপন্ন হবে। আর এটাই মূলত বিষ।'

'তার মানে শুধু গ্যাস দিয়েও কাউকে মারা সম্ভব, তাই না?'

'হ্যাঁ, তা পারা যায় বটে। তবে এখানে সমস্যা আছে। হত্যাকারীর নিজে মরে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বেশি। সায়ানাইড গ্যাস চামড়া ভেদ করেও চলে যেতে পারে। যার কারণে শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্ষেত্রে বেশি করে সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়।'

'তবে তো বেশ জটিল বিষয়। ভাবছি আরো কিছু সময় দেওয়া দরকার এটার পেছনে,' বললো আকিওশি।

এর পরের দুদিন সে কম্পিউটারের সামনে বসে বসে ভাবছিলো ওটা নিয়ে।

'ধরো, ভিক্টিমের বাড়িতে ঢোকার কিছু রাস্তা জানা আছে তোমার, বিশেষ করে বাথরুমে যাওয়ার জন্য,' এক রাতে ডিনার করার সময় বলে উঠলো আকিওশি। 'এখন ধরো সে যখন বাড়িতে নেই, তুমি গিয়ে বাথরুমে ঢুকে টয়লেটের ভেতর পটাশিয়াম সায়ানাইড আর সালফিউরিক এসিড রেখে ঢাকনা লাগিয়ে এলে। তো বলো, এবার কি তুমি নিজে মরে যাওয়ার আগেই সেখান থেকে বের হতে পারবে?'

'মনে তো হচ্ছে পারা যাবে,' বললো নোরিকো।

'তো ভিক্টিম বাড়িতে এলো এরপর। বাথরুমে গেল। তার অজান্তে তার টয়লেটের ভেতরে মরণব্যাধি সায়ানাইড গ্যাস দিয়ে ভরে আছে। ঢাকনাটা খুলতেই গ্যাস বের হলো সেখান থেকে। আর যেই ভিক্টিম শ্বাস নিলো সে সময়...কেমন লাগছে শুনতে?'

একটু ভেবে সম্মতি জানালো নোরিকো। শুনতে ভালোই ঠেকছে তার কাছে। 'এটা যেহেতু একটা উপন্যাস, সেহেতু ভালোই শোনাচ্ছে। যদি প্রত্যেকটা বিষয়ে বাস্তবতা নিয়ে আসার চেষ্টা করো, তবে কখনোই দৃশ্যগুলো মেলাতে পারবে না।'

আকিওশিকে দেখে সন্তুষ্ট মনে হলো না। হাতে থাকা চপস্টিক নামিয়ে রেখে নোটপ্যাড আর কলম বের করলো সে।

'অর্ধেক অঙ্ক করে ফেলে রাখতে চাই না আমি। যদি এতে কোনো সমস্যা থেকে থাকে, তবে আমি চাই তুমি আমাকে সেটা খুলে বলবে। এজন্যই তোমার কাছে আসি আমি বারবার।'

নোরিকোর মনে হলো কেউ কষে একটা থাপ্পড় লাগিয়েছে তার মুখে। 'এমন না যে ওটাতে কোনো সমস্যা আছে। আমার মনে হয় তুমি যে প্রক্রিয়াটা বলছো তা কাজ করবে। আমার কথা হলো, বাস্তবে করতে গেলে এরকম শতভাগ নিশ্চিত হয়ে করা যায় না।'

'কেন না?'

'কারণ একটা টয়লেটের ঢাকনা পুরোপুরিভাবে কখনোই লাগে না। টয়লেটের ভেতরে সায়ানাইড গ্যাস বেড়ে যেতে পারে, এরপর তা বাইরে বেরিয়ে যাবে। এমনকি বাথরুমের দরজা ভেদ করেও বাইরে চলে যেতে পারে বিষের গন্ধ। আর এতে করে ভিক্টিম আগেই কিছু একটা আঁচ করতে পারবে, ফলে ভেতরে ঢুকবে না। *আঁচ পাওয়া* শব্দটা হয়তো মানাচ্ছে না এখানে, বরং *শ্বাস নেওয়া* বলি। যদি ভিক্টিম শ্বাস নেয়, তবে বিষক্রিয়া দেখা দিতে পারে। অবশ্য, যদি সেই পরিমাণ বিষ তার ফুসফুসে আদৌ যায় আর কি...'

'মানে বলতে চাচ্ছো, যতটুকু গ্যাস বাইরে বেরোবে, সেগুলো একজনের মৃত্যুর জন্য যথেষ্ট না, তাই তো?'

'হ্যাঁ, যদি হত্যাকারী দুর্ভাগা হয়ে থাকে তবে।'

'আহ, ঠিকই বলছো তুমি। ততটা নিরাপদ কোনো পরিকল্পনা ঠেকছে না এটা,' বুকের উপর হাত বেঁধে নিয়ে বললো আকিওশি। 'টয়লেটের ঢাকনা ভালো করে লেগে থাকে সেজন্য কিছু একটা করতে হবে।'

'এক্ষেত্রে, টয়লেটের ফ্যান কাজে আসতে পারে,' বললো নোরিকো।

'বাথরুমের ভেতরের ফ্যান?'

'যদি ধরে নেই যে ভিক্টিম যে বাড়িতে থাকে, সে বাড়ির বাথরুমে এমন ফ্যান আছে, তবে বাইরে গ্যাস ছড়িয়ে যাওয়া থেকে বাঁচাবে ওটা।'

কয়েক মুহূর্তের জন্য চুপচাপ ভাবলো আকিওশি, এরপরই তাকালো নোরিকোর দিকে।

'ভালো, বেশ ভালো। এটাই করবো আমি। ধন্যবাদ তোমাকে।'

'উপন্যাসের জন্য শুভকামনা রইলো,' বললো নোরিকো। আকিওশি কতটা সাহায্য চেয়েছিলো, তখন যে চিন্তাটা তার মাথায় এসেছিলো সেটা ধীরে ধীরে উবে গিয়ে কৃতজ্ঞতায় রূপ নিলো।

তার সপ্তাহখানেক বাদে একদিন বাসায় ফিরে নোরিকো দেখলো যে আকিওশি ঘরে নেই। ভেবেছিলো হয়তো কোথাও খেতে-টেতে গেছে, কিন্তু সেদিন আর বাসায় ফেরেনি আকিওশি। এমনকি ট্রেন বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরেও না। আর কোনো ফোনও আসেনি তার কাছ থেকে। নোরিকোর চিন্তা হতে শুরু করে এই ভেবে যে তার কিছু হয়েছে কি না। আর তাকে খুঁজে পাওয়ার কোনো রাস্তাও নেই ওর কাছে। আকিওশির কোনো বন্ধুর সাথে তার পরিচয় নেই, এমনকি নোরিকো এটাও জানে না যে কোথায় গিয়ে খুঁজবে তাকে। ও আকিওশি পরিবারেরও কাউকে চেনে না, যাকে চেনে সে হলো কম্পিউটারের সামনে বসে থাকা একটা লোক।

ভোর রাতের দিকে ফিরলো আকিওশি। নোরিকো তখনো জেগে ছিলো। কাজ থেকে এসে মেকআপ পর্যন্ত খোলেনি সে, এমনকি কিছু খায়ওনি পর্যন্ত।

'কোথায় ছিলে তুমি?' আকিওশি দরজা দিয়ে ভেতরে ঢোকার সাথে সাথে জিজ্ঞেস করলো নোরিকো।

'উপন্যাসের জন্য রিসার্চ করছিলাম। সরি, কোনো পে ফোন পাইনি যে কল করে বলবো তোমাকে।'

'চিন্তা হচ্ছিলো আমার।'

জিন্স আর সাদা টি-শার্ট পরে ছিলো আকিওশি। চামড়ার ব্যাগটা কম্পিউটারের পাশে রেখে বসে পড়লো সে। এরপর শার্টটা খুলে ফেললো। চামড়ার উপর ঘাম জমে ছিলো তার।

'গোসল করতে হবে আমাকে।'

'দাঁড়াও, আমি বাথটাব ঠিক করে দিচ্ছি।'

'নাহ, গোসলই ঠিক আছে।' বলেই টি-শার্টটা হাতে করে নিয়ে বাথরুমের দিকে এগিয়ে গেল সে।

ওদিকে দরজার কাছে আকিওশির জুতো ঠিক করতে গিয়ে নোরিকো দেখলো সেগুলোতে ভয়ংকর রকমের ময়লা লেগে রয়েছে। দেখে মনে হলো পাহাড়ে চড়েছে বুঝি ওগুলো পরে।

তার কেন যেন মনে হচ্ছিলো আকিওশি তাকে বলবে কোথায় গেছিলো সে, আর তার মধ্যে এমন কিছু একটা ছিলো যে নোরিকো নিজেও জিজ্ঞেস করতে পারছিলো না। তবে একটা ব্যাপারে নিশ্চিত নোরিকো। তা হলো: আকিওশি কোনো উপন্যাসের রিসার্চ করছে না।

একটা চিন্তা মাথায় এলো তার। তখনো গোসলের শব্দ শুনছিলো সে। দ্রুত গিয়ে ডাফেল ব্যাগটা খুললো নোরিকো।

একদম উপরের দিকে কিছু ফাইল দেখতে পেল সে, যেমনটা ক্যাবিনেটে থাকে মূলত সেরকম কিছু ফাইল। ওখান থেকে বড়সড়ো একটা বের করলো, কিন্তু খালি ছিলো ওটা। অন্যান্য সবগুলো ফাইলই খালি। শুধু একটা ফাইলের উপরে স্টিকার দিয়ে *ইমায়েদা গোয়েন্দা সংস্থা* লেখা দেখতে পেল।

কোনো গোয়েন্দা সংস্থার ফাইল দিয়ে আকিওশি কী করবে...তাও খালি? *হয়তো ভেতরে যা-তা রেখে দিয়েছে সে।*

ব্যাগের বাকি সবকিছুই একবার করে দেখে নিলো নোরিকো। একেবারে নিচে যে জিনিসটা আছে, ওটা দেখে থ মেরে গেল একদম। এক বোতল পটাশিয়াম সায়ানাইড।

সাবধানে তুললো সেটা। ভেতরে সাদা পাউডার দেখা যাচ্ছিলো, কিন্তু সে যতটুকু দিয়েছিলো তার অর্ধেকটা রয়েছে সেখানে।

বুক আটকে গেল তার, পেটও মোচড় দিয়ে উঠলো। হার্ট বিট নিজের কানেই যেন শুনতে পাচ্ছে।

পানির কল বন্ধ হয়ে যাওয়ার শব্দ শুনতে পেল সে। দ্রুত বোতল আর ফাইলগুলো ব্যাগে রেখে দিয়ে চেইন লাগিয়ে দিলো ওটার।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে আকিওশি কিছু বললো না। শুধু জানালার পাশে গিয়ে বসে বাইরের দৃশ্য দেখতে লাগলো। ওর চেহারায় চরম কাঠিন্য আর গভীরতা লক্ষ করলো নোরিকো, যেটা এর আগে কখনোই দেখেনি সে।

ও চাইলেই তাকে জিজ্ঞেস করতে পারে যে কোথায় ছিলো সে, আর সে-ও কিছু না কিছু একটা বলবে–যেটা অবশ্যই মিথ্যা। কিন্তু সে সায়ানাইড কী কাজে ব্যবহার করেছে? এই প্রশ্নটাই তখন নোরিকোর পেটে মোচড় ধরিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিলো।

তার যোগাযোগ রয়েছে? কিন্তু এই ধরনের মানুষরা তো কখনোই ক্লায়েন্টের নাম বলে না। এমনকি পুলিশ জিজ্ঞেস করলেও না।

একটা সম্ভাবনার কথা মাথায় এলো ইমায়েদার। 'মি. ইমায়েদার কি কিছু হয়েছে?'

'ওটা নিয়েও কিছু কথা বলার ছিলো আপনার সাথে,' বললো গোয়েন্দা। 'আমরা কি দেখা করতে পারি?' এবার কিছুটা জোরে শোনালো তার আওয়াজ। প্রশ্নটা অনেকখানি আদেশের মতো লাগলো।

'এই মুহূর্তে কোথা থেকে বলছেন?'

'রাস্তার পাশ থেকে। আমি সাত-তলা সাদা বাড়িটার দিকেই তাকিয়ে আছি। ওখানেই তো আপনি আছেন, নাকি?'

'হ্যাঁ। ভেতরে যান, রিসিপশনিস্টকে বলুন কাজুনারি শিনোজুকার সাথে কথা বলতে চান আপনি। আপনার অপেক্ষায় থাকবে তারা। আমি বলে দিচ্ছি এক্ষুনি।'

'ঠিক আছে, আসছি আমি।'

'আমিও আছি এখানে।'

ফোন রেখে দিলো কাজুনারি, এরপর রিসিভারটা আবার তুলে রিসিপশনিস্টের কাছে ফোন দিয়ে সাসাগাকি নামের লোকটাকে সাত তলার রুমটা দেখাতে বললো। এই রুমটাতেই বোর্ডের সদস্যরা পরিচিত মানুষজনের সাথে মিটিং করে থাকে।

***

সাসাগাকির শরীরটা তার বয়সের সাথে ঠিক খাপ খাচ্ছে না। ছোট করে ছাঁটা চুলগুলো সাদা হয়ে আছে। দরজায় কড়া নাড়তেই উঠে দাঁড়ালো কাজুনারি, এরপর দাঁড়িয়েই রইলো। ভ্যাপসা গরম থাকা সত্ত্বেও বাদামি রঙের একটা স্যুট আর টাই পরে আছে সে।

'ধন্যবাদ দেখা দেওয়ার জন্য,' বিজনেস কার্ডটা এগিয়ে দিতে দিতে বললো গোয়েন্দা।

কাজুনারি ওটার দিকে তাকিয়ে পলক ফেললো একবার। কিছুটা খালি খালি লাগছে ওটাকে। শুধু তার নাম–জুনজো সাসাগাকি–আর একটা ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার দেওয়া। ঠিকানার জায়গায় লেখাঃ ইয়াও সিটি, ওসাকা। কোনো পুলিশের অন্তর্ভুক্তি বা শিরোনাম নেই সেখানে।

'অফিশিয়াল জিনিসপাতি বিজনেস কার্ডে রাখি না আমি,' একটু হেসে বললো লোকটা, ফলে চেহারায় থাকা দাগটা আরো স্পষ্ট হয়ে দেখা দিলো। 'এর আগে একজন আমার কার্ড নিয়ে গেছিলো। তারপর সেই কার্ড দিয়ে পুলিশ সাজার চেষ্টা করেছিলো সে।'

নীরবে শুনলো কাজুনারি। এরকম করে একটা বিজনেস কার্ড কাজে লাগানো যায় তা কখনো ভাবেনি সে। তার মনে হলো এমন এক পৃথিবীতে উঁকি দিচ্ছে যা তার পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

'তবে এটাও ব্যবহার করি আমি।' সাসাগাকি পকেটে হাত ঢুকিয়ে তার ব্যাজটা বের করে ধরলো কাজুনারির সামনে।

একবার ওটার দিকে তাকিয়ে সোফায় বসার জন্য ইশারা করলো কাজুনারি। 'চলুন, বসা যাক।'

মাথা দুলিয়ে বসলো গোয়েন্দা। বসার সময় কিছুটা কুঁচকে গেল তার চোখমুখ, বয়সের ছাপটা যে তার উপর পড়েছে তা টের পেল হাড়ে হাড়ে। তার বসার সাথে সাথে টোকা পড়লো দরজায়, ট্রে-তে করে দু-কাপ চা নিয়ে ঢুকলো একজন মহিলা। টেবিলের উপর ট্রে-টা রেখে একবার মাথা নত করে ফিরে গেল আবার।

'দারুণ অফিস আপনাদের,' কাপটা নিতে গিয়ে বললো সাসাগাকি। 'দুর্দান্ত কোম্পানিগুলোর দুর্দান্ত সব রিসিপশন থাকে।'

'ধন্যবাদ,' বললো কাজুনারি। যদিও তার নিজের কাছে এই রিসিপশনটা অনাড়ম্বর লাগে। বিশেষ একটা বস্তু ছাড়া বাকি সব রুমে যে সোফা বা টেবিল রয়েছে সেগুলোই এখানে আছে। অন্যান্য রুমের সাথে পার্থক্য শুধু এতটুকু যে এটা সাউন্ডপ্রুফ রুম। ভেতরের কোনো শব্দ বাইরে যায় না।

'তো,' সাসাগাকির দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো কাজুনারি, 'কীসের জন্য দেখা করতে চেয়েছিলেন?'

মাথা দুলিয়ে হাতের কাপটা নামিয়ে রাখলো সাসাগাকি। 'আমি বুঝতে পেরেছি যে মি. ইমায়েদাকে দিয়ে আপনি কিছু একটা করাচ্ছিলেন।'

কাজুনারি টের পেল তার চোয়াল শক্ত হচ্ছে।

'আমি বুঝতে পারছি আপনার শঙ্কার কারণ,' বললো সাসাগাকি। 'কিন্তু আমি চাই আপনি সত্যটা জানুন। আপনার জানা উচিত যে মি. ইমায়েদা আমাকে আপনার কথা বলেনি। তার পরিবর্তে সে নিজেই এখন নিখোঁজ অবস্থায় আছে।'

'কী?' বলে উঠলো কাজুনারি। 'আসলেই?'

'জি।'

'কবে থেকে?'

'উমমম...' মাথা চুলকালো সাসাগাকি। 'ওটা ঠিক পরিষ্কার না। যতটুকু আমি জানি তা হলো, গত মাসের বিশ তারিখের মধ্যে সে মি. তাকামিয়াকে ফোন করে জানতে চেয়েছিলো তার সাথে দেখা করতে পারবে কি না। তাকামিয়া তাকে পরের দিন দেখা করতে বলে। ইমায়েদাও বলে যে দেখা করার আগে ফোন করবে সে। কিন্তু আর কোনো ফোন যায়নি তাকামিয়ার কাছে।'

'তার মানে গত মাসের বিশ তারিখের পর আর কেউ তার কাছ থেকে কোনো খবর পায়নি?'

'ঠিক ধরেছেন।'

বুকের উপর হাতদুটো বেঁধে নিয়ে মনে মনেই ঘোঁৎ ঘোঁৎ করা শুরু করলো কাজুনারি। 'নিখোঁজ হলো কেন সে?'

'ওটা খুঁজতেও নেমেছি আমি। বলতে গেলে বেশি দিন হয়নি আমার সাথে তার দেখা হয়েছে,' বললো সাসাগাকি। 'একটা তদন্তের ব্যাপারে তার সাথে কথা বলার জন্য আমি তাকে ফোন করেছিলাম। কিন্তু যতবারই করি না কেন, কেউই ফোন তুলছিলো না। তাই আমি টোকিও এসে তার অফিসে চলে যাই।'

'কেউ ছিলো না সেখানে?'

মাথা দোলালো সাসাগাকি। 'বেশ কয়েকটা মেইলও দেখেছিলাম তার মেইলবক্সে। তারপর মনে হলো তার ইউনিটটা দেখা দরকার আমার।'

'কী পেলেন সেখানে?' একটু এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলো কাজুনারি।

'তেমন কিছুই না। কোনো রকম দুর্ঘটনা বা কসরতের কোনো চিহ্ন পাইনি সেখানে। স্থানীয়দের বলে এসেছি তার দেখা পেলে জানাতে, কিন্তু মনে হয় না তাকে খোঁজার জন্য ততটা খাটবে তারা।'

'লুকিয়ে আছে না তো আবার?'

'সম্ভাবনা আছে। তবে আমার মনে হয় না অমন কিছু হয়েছে।'

'কেন না?'

'আমার কেন যেন মনে হচ্ছে তার কিছু একটা হয়েছে।'

ঢোক গিললো কাজুনারি। মুখের ভেতরে শুকনো অনুভব করলো সে। হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপে চুমুক দিলো একবার। 'সে কি কোনো বিপজ্জনক কিছুর সাথে জড়িয়ে গেছিলো?'

'সেটাই তো প্রশ্ন।' পকেটে হাত ঢোকালো সাসাগাকি। 'স্মোক করলে কোনো সমস্যা হবে?'

'না, সমস্যা নেই, করুন।' টেবিলের এককোনা থেকে স্টিলের অ্যাশট্রের বাটিটা গোয়েন্দার দিকে এগিয়ে দিলো কাজুনারি।

সাসাগাকি একটা হাই-লাইট সিগারেট বের করলো প্যাকেট থেকে। *এগুলো এখন আর তেমন একটা দেখা যায় না*, নীল-সাদা রঙের প্যাকেটটা দেখে ভাবলো কাজুনারি।

মুখ থেকে একরাশ সাদা ধোঁয়া বের করে দিলো গোয়েন্দা।

'মি. ইমায়েদা শেষ যে কেসটা নিয়ে কাজ করছিলেন সেটা নির্দিষ্ট একজন নারীকে নিয়ে ছিলো। আমার মনে হয় না সেই নারীটি কে তা আপনাকে বলতে হবে।'

গোয়েন্দার মুখ থেকে বন্ধুত্বপূর্ণ হাসিটা উবে গেছে। কাজুনারি কিছুটা শিউরে উঠলো ওরকম তীক্ষ্ণ, সরীসৃপের মতো চোখ দেখে।

মিথ্যা বলে আর কোনো লাভ হবে না, ভাবলো সে। অথবা হয়তো এই গোয়েন্দার চাহনিটাই তাকে সত্য বলতে বাধ্য করছে। হালকা মাথা দোলালো কাজুনারি। 'জি, আমি জানি সে কে।'

আবার মাথা নাড়ালো সাসাগাকি।

'আর আপনিই সেই ব্যক্তি যে মিস ইউকিহো কারাশাওয়ার উপর ইনভেস্টিগেশন চালাচ্ছিলেন?'

'আপনি বলেছেন আপনি আমার নাম তাকামিয়ার কাছ থেকে শুনেছেন,' প্রশ্নটা এড়িয়ে বললো কাজুনারি। 'এখানে সংযোগটা বুঝতে পারছি না।'

'ততটাও কঠিন কিছু না এটা,' জবাব দিলো গোয়েন্দা। 'বিশেষ করে অপ্রাসঙ্গিক তো অবশ্যই না।'

'হ্যাঁ, কিন্তু তবুও ভাবাচ্ছে বিষয়টা...'

'এতটাই যে আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছেন না?'

চোখে চোখ রেখে মাথা দোলালো কাজুনারি। আবারো মনে হলো কোনো লেজারের দিকে তাকিয়েছে সে। কিন্তু তবুও এটা পরিষ্কার হলো তার কাছে যে গোয়েন্দা এই যুদ্ধটা সহজে জিততে পারবে না।

সাসাগাকি মৃদু হেসে লম্বা একটা টান দিলো সিগারেটে। 'অনেকগুলো কারণে আমার নিজেরও আগ্রহ রয়েছে ইউকিহো কারাশাওয়ার উপর। যার কারণে তার উপর যখন অন্য কারো নজর পড়ে, সাথে সাথে আমি বুঝতে পেরে যাই। স্বভাবতই, আমার কৌতূহল জাগে লোকটা কে তার সম্পর্কে জানার। ফলে আমি ইউকিহো কারাশাওয়ার প্রাক্তন স্বামী মি. তাকামিয়ার কাছে চলে যাই। সেখান থেকেই জানতে পারি, আবার বিয়ে হতে যাচ্ছে ইউকিহোর। আর সেজন্যই সেই বরপক্ষ তার উপর ইনভেস্টিগেশন চালাচ্ছে। মি. তাকামিয়াই আমাকে ইমায়েদার নাম বলেছে।'

'তারপর?'

একটা ছোট ঝুলির মতো ব্যাগ হাঁটুর উপর রাখলো সাসাগাকি। আঁকড়া খুলে সেখান থেকে একটা ট্যাপ রেকর্ডার বের করলো সে। পরিচিত একটা হাসি হেসে টেবিলের উপর রাখলো সেটা। এরপর প্লে বাটন চাপলো।

বিপ করে একটা শব্দ হতেই কারো স্বর শুনতে পেল কাজুনারি—ভালোমতো বোঝার জন্য যথেষ্ট স্পষ্ট সেই স্বর।

'হাই, শিনোজুকা বলছি। ইউকিহোর তদন্তের ব্যাপারে কথা বলার ছিলো। কেমন যাচ্ছে তা একটু ফোন করা জানাবেন আমাকে।'

স্টপ বাটনে চাপ দিয়ে আবার ব্যাগের মধ্যে রেকর্ডারটা রেখে দিলো সাসাগাকি।

'গতকাল ইমায়েদার আনসারিং মেশিন থেকে এনেছি এটা আমি। তো বলুন, যে শিনোজুকা এইমাত্র ফোনে কথা বললো সেটা কি আপনি?'

'হ্যাঁ। এ মাসের শুরুর দিকে বলেছিলাম আমি,' দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো কাজুনারি। একবার ভেবেছিলো তর্ক করবে, কিন্তু পরবর্তীতে বুঝলো এর কোনো মানে হয় না এখন আর।

'আচ্ছা। তো এরপরে আমি মি. তাকামিয়াকে ফোন করে আপনার কথা জিজ্ঞেস করি।'

'আর সে আপনাকে সব খুলে বলে?'

'যতটুকু বলেছে তা যথেষ্ট ছিলো আমার জন্য। যেমনটা বলছিলাম আর কি, মি. ইমায়েদাকে কাজটা কে দিয়েছে তা বের করা অতটা কঠিন ছিলো না।'

'বলুন তাহলে কী বলতে চাচ্ছেন।'

'আবার জিজ্ঞেস করছি তবে, আপনিই কি সেই লোক যে ইউকিহো কারাশাওয়ার উপর তদন্ত করিয়েছিলেন?'

'জি।'

'কে বিয়ে করতে চাচ্ছে তাকে?'

'আমার এক আত্মীয়। কিন্তু ইউকিহো এখনো তাকে কোনো উত্তর দেয়নি।'

'আপনার সেই আত্মীয়ের নামটা বলা যাবে?' নোটবুক বের করতে করতে জিজ্ঞেস করলো সাসাগাকি।

'জানতেই হবে এটা?'

'এটাই আসলে আমাদের কাজ, অর্থাৎ এই লাইনের কাজ আর কি। বিভিন্ন মানুষকে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করি আমরা। যদি বলতে না চান তবে সমস্যা নেই। কিছু যাবে আসবে না তাতে আমার। আরো অনেক মানুষ আছে যাদেরকে প্রশ্ন করে এটা বের করে ফেলা যাবে যে কে আসলে ইউকিহো কারাশাওয়াকে বিয়ে করতে চেয়েছে।'

ভ্রু কুঁচকে তাকালো কাজুনারি। আরো বাজে অবস্থার সৃষ্টি হবে তাতে, আর গোয়েন্দাও বিষয়টা জানে। 'তার নাম ইয়াসুহারু। আমার চাচাতো ভাই।'

নামটা হিজিবিজি করে লিখলো সাসাগাকি। 'ধরে নিচ্ছি সে ইয়াসুহারু শিনোজুকা। আর এই কোম্পানিতে সে কোনো কাজ করে?'

কাজুনারি তাকে বললো যে এই কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর সে। 'কিছু জিনিস আমার মাথায় ঢুকছে না। যদি কিছু মনে না করেন তবে বলি?'

'না, কিছুই মনে করবো না। তবে কিছু বিষয় আছে যেগুলো শেয়ার করা যাবে না।'

'আপনি বলেছেন ইউকিহো কারাশাওয়ার উপর আপনার কোনো একটা কারণে আগ্রহ আছে। সেই কারণগুলো কি আমাকে বলতে পারবেন?'

শুষ্ক একটা হাসি খেলে গেল সাসাগাকির মুখে। 'দুর্ভাগ্যবশত, যে কথাগুলো আমি শেয়ার করতে পারবো না এটা সেগুলোর একটা।'

'গোপনীয়তার জন্য?'

'সত্যি বলতে, আসলে আমি এখনো প্রস্তুত নই সেসব নিয়ে কথা বলতে। মানে অনেক কিছুই এখনো অজানা। শুধু এটুকু বলি, প্রত্যেকটা বিষয়ই সেই আঠারো বছর আগে ঘটা একটা ঘটনার দিকেই চলে যাচ্ছে বারবার।'

'আঠারো বছর আগে?' মাথা ঝাঁকালো কাজুনারি। সে সময়ে চলা কোনো তদন্তের কথা মনে করতে লাগলো সে। 'আপনি কি অন্তত কেসটা কী নিয়ে ছিলো তা বলতে পারবেন?'

কিছুক্ষণ সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগলো সাসাগাকি। তারপর পলক ফেলে বললো, 'হত্যা।'

লম্বা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কাজুনারি জিজ্ঞেস করলো, 'কে মারা গেছিলো?'

'মাফ করবেন, ওটার উত্তর দিতে পারবো না,' হাতদুটো এক করে বললো সাসাগাকি।

'কিন্তু সে...মানে ইউকিহো কি জড়িত ছিলো?'

'ধরে নিন সেই কেসটা সম্পর্কে বোঝার জন্য ও একটা গুরুত্বপূর্ণ চাবিকাঠি।'

'এক মিনিট,' বললো কাজুনারি। 'এত আগের একটা কেস...তদন্তের জন্য নির্ধারিত সময় তো পেরিয়ে গেছে, তাই না?'

'সত্যি বলতে, হ্যাঁ।'

'কিন্তু আপনি এখনো এই কেসের দায়িত্বে আছেন?'

সিগারেটের প্যাকেটে হাত ঢুকিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো আরেকটা সিগারট বের করলো গোয়েন্দা। কাজুনারির মনে নেই কখন আগের সিগারেটটা ফেলেছিলো সে। 'বেশ লম্বা কাহিনি, আর গল্পটার শেষ এখনো হয়নি। তাছাড়া, যেখান থেকে সবকিছু শুরু হয়েছিলো, আমি সেখানে ফিরে না গেলে এর শেষ হবেও না।'

'তবুও শুনতে চাই।'

'আজকে না,' একটা হাসি দিয়েই বললো সাসাগাকি। 'এর একটা কারণ হলো, আঠারো বছর আগের কাহিনি এটা, অনেকটা বিশাল গল্পের মতোই। সেটা বলতে গেলে এখানে অনেকক্ষণ বসে থাকতে হবে আমাদের।'

'অন্য কোনো সময়ে তবে?'

'অবশ্যই,' সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে চোখে চোখ রেখে বললো গোয়েন্দা। 'অন্য যেদিন আমাদের হাতে সময় থাকবে।'

কাজুনারি নিজের চায়ের কাপের দিকে ঝুঁকতেই খেয়াল করলো, দুজনের কাপই খালি পড়ে আছে। 'আরেকবার আনাবো চা?

'না, থাক। যদি কিছু মনে না করেন, তবে আরেকটা প্রশ্ন করতাম আপনাকে।'

'বলুন?'

'আপনি কি আমাকে আসল কারণটা বলতে পারবেন যে কেন আপনি মি. ইমায়েদাকে দিয়ে ইউকিহো কারাশাওয়ার উপর ইনভেস্টিগেশন চালিয়েছিলেন?'

'আপনি তো জেনেই গেলেন এর উত্তর। মানে, ততটা অস্বাভাবিক কিছু তো না এটা। আমাদের মতো অনেক মানুষই তাদের হবু স্ত্রীদের উপর ইনভেস্টিগেশন চালায় আমার জানামতে।'

'আমি জানি ওরা তা করে। যেটা বুঝতে পারছি না সেটা হলো, আপনি কেন? যদি বরের বাবা-মা হতো আমি বুঝতাম বিষয়টা, কিন্তু আমি কখনো শুনিনি চাচাতো ভাই এই কাজটা করছে। আর অন্য একটা কারণেও ব্যাপারটা বেশ অদ্ভুত। তার প্রাক্তন স্বামীর বন্ধু আপনি। তারও আগে গেলে দেখা যাবে আপনারা কলেজে একই ড্যান্স ক্লাবে ছিলেন। আপনার তো ইনভেস্টিগেটরের কাছে যাওয়ার আগে এমনিতেই অনেক কিছু জানার কথা। কিন্তু তারপরও আপনি গেলেন।

'এটা একটা ভাবার কারণ বটে,' গোয়েন্দা বলা থামালো না। 'কিন্তু সত্যি বলতে, এসব একসাথে মেলালে আপনার প্রতি আমার কৌতূহল বেড়ে যায়। এই রেকর্ডটা আমি ইমায়েদার মেশিনে পেয়েছি। আপনি যেভাবে মেয়েটার নামটা বলেছেন, আমার শিরদাঁড়া বেয়ে কাঁপুনি নেমে গেছিলো শুনে। আগেই বলে নিই এটা একটা অনুমান মাত্র, তবে আপনার গলা শুনে সে সময় আমার মনে হয়েছিলো, "এই লোকটা ইউকিহো কারাশাওয়াকে ভয় পায়।" আর এই বিষয়টাই আমি জানতে চাই যে কেন আপনি ভয় করেন ওকে।' দ্বিতীয় সিগারেটটাও ফেলে দিলো গোয়েন্দা। একটু ঝুঁকে দুহাত টেবিলের উপর রাখলো। 'আমি চাই আপনি আমাকে সত্যটা বলুন। ঠিক কী কারণে আপনি ইমায়েদাকে নিয়োগ করেছিলেন ইউকিহো কারাশাওয়ার উপর তদন্ত করতে?'

সাসাগাকির হাবভাবে কিছুটা পরিবর্তন এসেছে তা খেয়াল করেছে কাজুনারি। কর্তৃত্বের চিহ্নটা সেখানে এখনো থাকলেও হুমকির মতো ঠেকছে না। তার চেয়ে বরং মনে হচ্ছে যেন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে সে। *লোকটা হয়তো এরকম মুখ করেই সন্দেহভাজনদের প্রশ্ন করে*, ভাবলো কাজুনারি। পরক্ষণেই বুঝতে পারলো যে কেবল এই প্রশ্নটা করার জন্যই গোয়েন্দাটা এসেছে আজকে। কে আসলে ইউকিহোকে বিয়ে করতে চায় তাতে কিছুই যায় আসে না তার। ও কেবল জানতে চায় কেন সে ইউকিহোর উপর তদন্ত করছে।

হাসলো সে। 'ভুল গাছে চড়বেন না, গোয়েন্দা। আমি সত্যিটা আগেই বলেছি। আমার কাজিনের জন্যই আমি খতিয়ে দেখছিলাম তার ব্যাপারে। যদি আমার কাজিন তাকে বিয়ে না করতো, তবে সে কীরকম মেয়ে বা কেমন মানুষ তা দেখার বিন্দুমাত্র আগ্রহও আমার থাকতো না।'

'বুঝলাম।'

'যদিও একটা বিষয়ে আপনি ঠিক বলেছেন,' বলা থামালো না কাজুনারি।

'আর সেটা কী?'

'আসলেই আমি ওকে ভয় পাই।'

'আহ...' আবার সোফায় হেলান দিলো সাসাগাকি, এরপর চোখে চোখ রেখে বললো, 'আর সেটা কেন?'

'কারণটা অস্পষ্ট। এটা অনেকটা নিজের মনের থেকে হচ্ছে বলতে পারেন।'

'কোনো সমস্যা নেই,' শুষ্ক হাসি দিয়ে বললো সাসাগাকি। 'আমার জীবনটাই তো টিকে আছে এই অস্পষ্ট মতবাদের মধ্যে।'

এরপর ইমায়েদার কাছে যেমন করে সব ব্যাখ্যা করেছিলো, ঠিক একই রকম করে সাসাগাকির কাছে সব খুলে বললো কাজুনারি। বললো যে কারো না কারো উপস্থিতি আঁচ করতে পারছে সে ইউকিহোর পেছনে। এমন কারো যার অনেক টাকা আছে। তারপর যে বা যারাই তার সাথে ছিলো, তাদের দুর্ভোগের শিকার হতে হয়েছে ইত্যাদিও বললো। যদিও তার বলার ভঙ্গিটা বেশ হাস্যকর শোনাচ্ছিলো, কিন্তু প্রত্যেকটা শব্দ বেশ মনোযোগ দিয়ে শুনলো সাসাগাকি। চোখমুখ কঠিন করে তিন নাম্বার সিগারেটটা ফুঁকতে ফুঁকতে শুনছে সে।

'বুঝতে পেরেছি,' কাজুনারির বলা শেষ হলেই বলে উঠলো সাসাগাকি। 'ধন্যবাদ এসব শেয়ার করার জন্য।' সিগারেট নামিয়ে রেখে মাথাটা হালকা নোয়ালো সে।

'আমি নিশ্চিত আপনি ভাবছেন যে কেবল কল্পনা থেকেই এসব বলছি আমি।'

'একদমই না,' হাত নাড়িয়ে বললো সাসাগাকি। 'সত্যি বলতে, আমি আসলে অবাকই হয়েছি আপনি এরকম করে ভাবতে পেরেছেন দেখে। এত কম বয়সে এরকম কল্পনা করাটাও অনেক বড় গুণ।'

'তার মানে...আপনি বলতে চাচ্ছেন আমি ঠিক ধরেছি?'

'আমিও অমনটাই মনে করি,' মাথা দুলিয়ে বললো সাসাগাকি। 'আমার মনে হয় আপনি ইউকিহো কারাশাওয়ার আসল রূপটা দেখতে পাচ্ছেন। কিছু মানুষ আছে যারা আপনার চোখে ভ্রম তৈরি করে, বিশেষ করে ওর মতো কেউ। আমি নিজেও অনেক দিন তার বেলায় অন্ধ ছিলাম।'

'এর মানে তার সম্পর্কে আমার ধারণা সত্যি?'

'যতদূর জানি আর কি,' জবাব দিলো সাসাগাকি। 'তার সাথে মিশলে কখনোই ভালো কিছু হয় না, এটা নিশ্চিত। আর আমার আঠারো বছরের অভিজ্ঞতা আছে এ ব্যাপারে।'

'তাহলে আপনাকে একবার আমার কাজিনের সাথে দেখা করাতে হয়।'

'আমিও চাচ্ছিলাম তার সাথে দেখা করতে এবং সতর্ক করতে। কিন্তু আমার মনে হয় না সে শুনবে। আপনিই একমাত্র ব্যক্তি যার সাথে এতটা খোলাখুলি কথা বলেছি এ বিষয়ে।'

'আমি যা চেয়েছিলাম তা হলো, ওর ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া। আর ইমায়েদাকে নিয়োগ দেওয়ার কারণ এটাই,' বললো কাজুনারি। 'তার ইনভেস্টিগেশন থেকে কিছু জানতে পেরেছিলেন আপনি?'

'সত্যি বলতে, তেমন কিছু না। শুধু তার শেয়ার সম্পর্কে কিছু তথ্য। ইমায়েদা মাত্র শুরু করছিলো সে সময়ে।'

কাজুনারি ততক্ষণে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। ইমায়েদা যে বলেছিলো ইউকিহোর তার প্রতি আবেগ রয়েছে, এটা সাসাগাকিকে বলা থেকে বিরত থাকবে সে।

'উমমম,' ধীর গলায় বললো সাসাগাকি। 'এগুলো তো সব অনুমান। আমার মনে হয় ইমায়েদা কিছু একটা পেয়েছিলো বটে।'

'তার সহচর থাকার প্রমাণ?'

মাথা দোলালো গোয়েন্দা। 'গতকাল যখন ইমায়েদার বাড়ি খুঁজে দেখছিলাম, তখন তার কোনো ফাইলে ইউকিহো কারাশাওয়া সম্পর্কে কোনো তথ্য পাইনি আমি। এমনকি একটা ছবি পর্যন্তও না।'

'কী?' চোখ বড় বড় হয়ে গেল কাজুনারির। 'তার মানে–'

'কেউ একজন ঐ তদন্তটাকে ভয় পাচ্ছিলো। আর ইমায়েদার নিখোঁজের পেছনে সেই লোকটার হাত আছে বলে মনে হয়।'

মাথা ঝাঁকালো কাজুনারি। এখন আর অতিরঞ্জিত লাগছে না বিষয়টা। যদিও কিছুটা অবাস্তব ঠেকছে এখনো। 'আর আপনি তা বিশ্বাস করেছেন?' বিড়বিড় করে বললো সে। 'আপনার বিশ্বাস হয় কেউ অতটা বাড়াবাড়ি করবে?'

'তো আপনি মনে করেন যে ইউকিহো খারাপ, কিন্তু অতটাও খারাপ না?'

'ইমায়েদার নিখোঁজ হওয়াটা কি কাকতালীয় হতে পারে না? হয়তো কোনো কাজে আটকা পড়ে আছে সে।'

'মিলছে না ওতে,' আত্মবিশ্বাসের সাথে বললো গোয়েন্দা। 'ইমায়েদা দুটো পত্রিকা রাখতো বাসায়। যখন পত্রিকাওয়ালাদের সাথে আমি কথা বললাম, ওরা জানালো যে গত মাসের একুশ তারিখে একটা লোক ফোন করে বলে দিয়েছিলো যে আর পত্রিকা না দিতে। কারণ সে ট্যুরে যাবে।'

'তবেই লোকটা যে ইউকিহোও হতে পারে।'

'হতে পারে, সত্য। কিন্তু আপনাকে না বলে তার ট্যুরে যাওয়ার কোনো কারণ দেখি না। তাই আমার মনে হয় না এটা করেছে সে,' মাথা ঝাঁকিয়ে বললো কাজুনারি। 'আমার মনে হয় যে-ই তার নিখোঁজ হওয়ার পিছে দায়ী, সে ইউকিহোর জীবনের খুব ছোট ছোট ব্যাপারও চলমান রেখেছিলো যাতে সবার মনোযোগ সেদিকেই থাকে। যদি পত্রিকাগুলো তার দরজার সামনে পড়ে পড়ে জমা হতো, তাহলে খুব বেশি একটা দেরি লাগতো না তার প্রতিবেশীদের সন্দেহ হতে।'

'কিন্তু আপনি যা বলছেন তা যদি সত্য হয়ে থাকে, তবে তো যে এই কাজটা করেছে সে একজন ধূর্ত ক্রিমিনাল। মানে, আমাদের ধরে নিতে হবে ইউকিহো এতদিনে মারা গেছে, নাকি?'

সাসাগাকির মুখটা আবেগহীন রইলো। 'আমার মনে হয় তার এত দিনে বেঁচে থাকার সম্ভাবনাটা বেশ ক্ষীণ।'

নিঃশ্বাস ছাড়লো কাজুনারি। এই কথোপকথনটা স্নায়ুতে বেশ চাপ দিচ্ছে তার। হৃৎপিণ্ড জোরে জোরে ওঠানামা করছে।

'কিন্তু তারপরও নিশ্চিত করে বলা যায় না যে, যে লোক পত্রিকাওয়ালাদের ফোন করেছিলো, তার সাথে ইউকিহোর কোনো সংযোগ রয়েছে,' বললো কাজুনারি। এরপর মনে মনে ভাবলো, *যাকে এক্সপোজ করতে চাচ্ছি, সেই মেয়েটাকে ডিফেন্ড করছি কেন?* কারণটা সম্ভবত এই যে ইউকিহোর উপর অন্য যেকোনো দোষ সে চাপাতে পারলেও খুন...বেশিই হয়ে যায়।

জ্যাকেটের অন্য পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা ছবি বের করলো সাসাগাকি। 'এই লোকটাকে কখনো দেখেছেন আপনি?'

'দেখি একটু?' ছবিটা হাতে নিলো কাজুনারি।

ছবিতে একটা লোকের হ্যাংলা-পাতলা মুখ দেখা যাচ্ছে। বেশ চওড়া কাঁধ আর যথেষ্ট তীক্ষ্ণ চোখ, যার সাথে তার পরনের কালো জ্যাকেটটা একদম মানিয়ে গেছে। লোকটাকে এর আগে কখনো দেখেনি কাজুনারি। সেরকমই বললো গোয়েন্দাকে সে।

'বুঝলাম। বাজে হলো ব্যাপারটা।'

'কে এটা?'

'একজন লোক যাকে খুঁজে চলেছি আমি। আচ্ছা, যে বিজনেস কার্ডটা আপনাকে দিয়েছিলাম সেটা একটু দেবেন?'

গোয়েন্দার বিজনেস কার্ডটা এগিয়ে দিলো কাজুনারি। গোয়েন্দা সেটা নিয়ে তার উল্টো পাশে একটা নাম লিখলো: রিও কিরিহারা।

'কে এ?'

'একজন অশরীরী।'

'এক্সকিউজ মি?'

'মি. শিনোজুকা, আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাবো যদি আপনি এই নামটা আর ছবির মুখটা মনে রাখতে পারেন। যদি কোথাও লোকটাকে দেখে বা শুনে থাকেন, তবে অবশ্যই আমাকে বলবেন।'

'তা নাহয় বুঝলাম, কিন্তু ওকে আমার দেখার সম্ভাবনা তো কম। তাছাড়া, আপনি পুলিশ। ওয়ান্টেড পোস্টার লাগিয়ে দিলে পাওয়াটা আরো সহজ হতো না,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো কাজুনারি।

'আমি পারতাম, যদি কোনো রকম চার্জ থাকতো তার নামে। আর তাছাড়া, একটা জায়গার কথা আমি জানি যেখানে তাকে দেখা যাবে...আপনার পরিচিত জায়গা সেটা।'

'কোথায়?'

'ইউকিহো কারাশাওয়ার কাছাকাছি।' জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজালো সাসাগাকি। 'কখনো গোবি মাছ আর চিংড়ির কাহিনি শুনেছেন?'

'সরি? চিংড়ি?' পলক ফেললো কাজুনারি।

'থাক, দরকার নেই ওসবের। যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু বলছি, ইউকিহো কারাশাওয়া আর রিও কিরিহারার মধ্যে যা আছে তাকে জীববিজ্ঞানীরা মিথোজীবিতা বলে থাকে। একজন আরেকজনকে ছাড়া বাঁচতে পারে না। পরস্পরের জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে তারা।'

***

জানালার ওপাশে সব চালের কল আর ফার্ম হাউজ। মাঝেমধ্যে আবার বিভিন্ন বিলবোর্ড এসেও বাধা দিচ্ছে। একেবারেই একঘেয়ে দৃশ্য। নোরিকোর এর থেকে রাস্তাঘাট বা বাড়িঘর দেখতেই বেশি ভালো লাগে। কিন্তু যেখানে যেখানে এরকম কোনো দৃশ্য দেখার সম্ভাবনা ছিলো, সেখানেই বুলেট ট্রেনের শব্দের কারণে দেয়াল টেনে দেওয়া হয়েছে।

জানালার পাশে হাত রেখে ওতে ভর দিয়ে তার পাশের সিটে তাকালো নোরিকো। পাশেই ভাবলেশহীন হয়ে বসে আছে আকিওশি, চোখ বন্ধ। *না ঘুমিয়ে কোনো একটা বিষয় নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করছে*, ভাবলো নোরিকো। ফের জানালার দিকে তাকালো সে, পেটের মধ্যে ভারী একটা অনুভূতি নিয়ে তাকিয়ে রইলো সেদিকে। *এই ট্রিপে আসাটা উচিত হয়নি।* এরপরেও এটাই সম্ভবত তার শেষ সুযোগ আকিওশিকে ভালো করে জেনে নেওয়ার। ও নিজেও বিশ্বাস করতে পারেনি যে এত দিন একসাথে থেকেও ওর সম্পর্কে কতটা কম জানে সে। এমন না যে ওর জানার আগ্রহ ছিলো না। আসলে ও সব সময় এটাই ভাবতো যে যা অতীত তা অতীত। যার কদর করা দরকার তা হলো বর্তমান। আর এই মুহূর্তে এই লোকটা তার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

ধীরে ধীরে বাইরের দৃশ্যগুলো পরিবর্তিত হতে শুরু করলো। আইচি এলাকা দেখা যাচ্ছে, টয়োটার গর্বিত শহর। গাড়ি উৎপাদন করা প্রতিষ্ঠানগুলোর বিলবোর্ডের সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়তে শুরু করেছে।

নিজের শহরের কথা মনে পড়ে গেল নোরিকোর। জাপানের উত্তর প্রদেশের নিগাতা শহর থেকে এসেছে সে। ওখানেও তার বাড়ির পাশে এরকম একটা অটোমোবাইল কোম্পানি রয়েছে। নোরিকো যখন প্রথমবার টোকিওতে আসে, তখন তার বয়স ছিলো আঠারো। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া ছাড়া আর কোনো পরিকল্পনা তার ছিলো না। সে ফার্মাসিস্ট হতে চায়নি; প্রথম যে প্রোগ্রামটা থেকে তাকে ডেকেছিলো সেটাতেই চলে গেছিলো। এরপর গ্র্যাজুয়েশন শেষ করে এক বন্ধুর উপদেশে চাকরিটা নেয় সে।

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হওয়ার পরের পাঁচটা বছরই ভালো ছিলো। ছয় বছরের মাথায় তার একটা প্রেমিক জোটে। তার থেকে বেশ বয়স ছিলো মানুষটার–পঁয়ত্রিশ বছরের একজন লোক। একই হাসপাতালে কাজ করতো তারা। এতটা সিরিয়াস ছিলো যে নোরিকো বিয়ের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলো। কিন্তু সমস্যাটা হলো ঐ লোকের স্ত্রী ও সন্তান ছিলো। ও বলেছিলো যে স্ত্রীকে ডিভোর্স দেবে সে। নোরিকোও বিশ্বাস করেছিলো তার কথা। আর সেজন্যই বর্তমানে যে অ্যাপার্টমেন্টে আছে, সেই অ্যাপার্টমেন্টটা নিয়েছিলো তখন। লোকটা যেন তার বউকে ছেড়ে দিয়ে উঠতে পারে সেজন্যই নিয়েছিলো। চেয়েছিলো এমন একটা জায়গায় তাকে রাখতে যাতে ঘর ছেড়ে এলেও কিছুটা শান্তিতে থাকতে পারে সে।

কিন্তু যখনই ভবিষ্যতের বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু করলো, তখনই এটা-ওটা নিয়ে বাহানা দিতে শুরু করে সে। সন্তানদের নিয়ে চিন্তিত ছিলো মানুষটা, আর স্ত্রীর খোরপোশের অ্যামাউন্টটাও বেশ বড়সড়োই ছিলো। তাই বলতো যে একটু ধীরে সুস্থে কাজটা করতে হবে। প্রত্যেকটা শব্দই নোরিকোর বুকে আঘাত হয়ে ধরা দেয় তখন। ওর পারিবারিক সমস্যার কথা শোনার জন্য বিছানা ভাগাভাগি করছে না সে।

বিচ্ছেদটা নেমে এলো অকস্মাৎ। একদিন সকালবেলা হাসপাতালে কাজ করতে গিয়ে দেখে, লোকটা নেই। অন্য একটা নার্সকে যখন জিজ্ঞেস করে, সেই নার্স জানায় সেদিনের আগের দিনই নাকি চাকরি ছেড়ে দিয়েছে লোকটা। 'রোগীদের থেকে টাকা আত্মসাৎ করতো সে,' চাপা গলায় বলেছিলো সেই নার্স। মহিলার চোখগুলো উত্তেজনায় যেন চকচক করছিলো সেদিন। নোরিকো তখন একটা কথাই ভাবছিলো; যদি এই নার্স লোকটা আর তার সম্পর্কে জানতো, ঐ চোখদুটো আর কতটা উজ্জ্বলভাবে চমকাতো।

'আত্মসাৎ বলতে?' জিজ্ঞেস করলো নোরিকো।

'সে রোগীদের বিলের রেকর্ড মুছে দিতো। এরপর ঘটনা এমনভাবে সাজাতো যেন বিল নেওয়ার সময় কোনো একটা ভুল হয়েছে। তারপর সে ঐ টাকাগুলো নিয়ে নিজের পকেটে ভরতো। কিছু দিন যাওয়ার পর যখন পেশেন্টরা আগের ডিউ পেমেন্টের নোটিফিকেশন পেতে থাকলো, তখন ধরা খেয়ে গেল সে।'

নোরিকো খেয়াল করলো মেয়েটার ঠোঁটদুটোতে হাসির একটা ভাব দেখা যাচ্ছে। অথচ তার নিজের পৃথিবী ভেঙে পড়ছে। দুঃস্বপ্নের মতো লাগছে সবকিছু। 'কত টাকা নিয়েছে সে?' নার্সটাকে জিজ্ঞেস করলো নোরিকো।

'দুই মিলিয়ন ইয়েনের মতো। মানে আমি যা শুনেছি আর কি।'

'এত টাকা? এত টাকা দিয়ে করবেটা কী!'

'কাউকে বলতে শুনলাম, সে নাকি সেই টাকা দিয়ে তার অ্যাপার্টমেন্টের ঋণ পরিশোধ করবে। তুমি তো জানোই যে হুট করে মূল্যস্ফীতি বেড়ে যাওয়ার সময় সে একটা অ্যাপার্টমেন্ট কিনেছিলো,' বললো সে। তখন চোখ চকচক করছিলো তার।

স্পষ্টতই, হাসপাতাল তার বিরুদ্ধে কোনো চার্জ আনেনি। ও হাসপাতালকে তাদের টাকা ফেরত দিলেই তারা খুশি। একবার টাকা পেয়ে গেলে ওরা পুরো ব্যাপারটাকে লুকিয়ে ফেলবে। ওরা চাচ্ছিলো না এই কথা বাইরে বেরিয়ে যাক।

পরের কিছু দিন নোরিকো কোনো খবর পায়নি তার কাছ থেকে। কাজে মনোযোগ বসাতে পারছিলো না দেখে সহকর্মীরা কিছু একটা সন্দেহ করেছিলো তাকে নিয়ে। একবার ভাবলো ওর বাসায় কল দেবে, কিন্তু তার পরিবর্তে অন্য কেউ ফোনটা তুলে ফেললে কী হবে এটা ভেবেই আর ফোন দেয়নি।

এক রাতে তার ফোনটা বেজে ওঠে। ও জানতো কে কল করেছে, যদিও তার গলার স্বর সেদিন কিছুটা চাপা আর চিকন শোনাচ্ছিলো।

'কেমন যাচ্ছে তোমার দিনকাল?' জানতে চায় সে।

'ভালো না,' বলে নোরিকো।

'হুম, আমিই তাই ভেবেছি।'

নোরিকো ফোনের ওপাশে তার ব্যথামাখা হাসিটা টের পাচ্ছিলো।

'হয়তো শুনে ফেলেছ এরমধ্যে, আমি আর যাচ্ছি না ঐ হাসপাতালে।'

'টাকাগুলো দিয়ে কী করবে?'

'পরিশোধ করবো। অনেকগুলো কিস্তিতে। ওরা আমাকে সেই সুযোগ দিয়েছে।'

'সব পরিশোধ করতে পারবে?'

'না পারলেও করতে হবে, এমনকি অ্যাপার্টমেন্ট বিক্রি করে হলেও দিতে হবে আমাকে। আর কোনো রাস্তা খোলা নেই।'

'দুই মিলিয়ন ইয়েন, তাই না?'

'চব্বিশ লাখ আসলে।'

'আমি কোনো সাহায্য করবো?'

'কী বলতে চাচ্ছো?'

'আমার কিছু সঞ্চয় আছে। সেখান থেকে দুই মিলিয়ন দেওয়া যাবে।'

'আমি জানি না–'

'না, বলছিলাম কি, তুমি ঋণ পরিশোধ করতে থাকলে, এরপর ছেড়ে এলে তোমার–' বউকে, এটাই বলতে নিয়েছিলো সে, কিন্তু ওপাশ থেকেই তার কথায় ব্যাঘাত ঘটালো মানুষটা।

'না, পারবো না আমি।'

নোরিকো নিঃশ্বাস ছেড়ে বললো, 'কী পারবে না?'

'তোমার সাহায্য নিতে পারবো না। আমার নিজেকেই এটা করতে হবে।'

'কিন্তু–'

'আমার স্ত্রী আর আমি, দুজনে মিলে তার বাবার কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে জায়গাটা কিনেছিলাম।'

'কত টাকা?'

'দশ মিলিয়ন।'

পেটের মধ্যে মোচড় মেরে উঠলো নোরিকোর। বগলের তলা থেকে কয়েক ফোঁটা ঘাম ঝরে পড়লো।

'যদি আমাকে ডিভোর্স নিতেই হয়, তাহলে এটার বিষয়ে আগে কিছু একটা করতে হবে আমাকে।'

'কিন্তু এর আগে তো কখনোই এটার ব্যাপারে বলোনি তুমি।'

'বললে কী হতো?'

'তোমার স্ত্রী কী ভাবছে এসব নিয়ে?'

'তোমার কী আসে যায় তাতে?' অসন্তুষ্ট হয়ে বললো সে।

'আসে যায়। সে কি রাগ করে আছে?'

নোরিকো মনে মনে আশা করছিলো যে ওর স্ত্রী এতটাই রেগে থাকবে যে হয়তো সে-ই তাকে ডিভোর্স দিয়ে দেবে। কিন্তু লোকটার জবাব নোরিকোকে অবাক করে দেয় সে সময়।

'হেহ! সে আরো ক্ষমা চেয়েছে আমার কাছে।'

'তোমার কাছে? কেন?'

'আসলে প্রথম দিকে সে-ই এই ফ্ল্যাটটা কিনতে চেয়েছিলো। আমি প্রথম প্রথম একটু-আধটু না করেছিলাম। ভেবেছিলাম টাকাগুলো পরিশোধ করতে বেশ কষ্ট হয়ে যাবে আমাদের। আর ঐ কারণেই এখন এই পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছি আমরা।'

'ওহ...'

'সে এখন একটা পার্ট টাইম চাকরিতে ঢুকেছে ঋণ পরিশোধ করবে বলে।'

কী নিখুঁত একটা বউ।

'তো,' বেশ কিছুক্ষণ বাদে বললো নোরিকো, 'আমাদের মধ্যে খুব শীঘ্রই তাহলে আর কিছু হচ্ছে না।'

কিছুক্ষণের জন্য চুপ মেরে ছিলো ওপাশ থেকে। 'এই ব্যাপারটা থামাবে, প্লিজ?'

'কোনটা?'

'এই যে রাগ করার যে ভানটা করো সেটা। সত্যটা আমি যতটা জানি, তুমিও ততটাই জানো।'

'কীসের সত্য?'

'যে আমি কখনোই ডিভোর্স পাবো না। ওটা ব্যস খেলার একটা অংশ ছিলো মাত্র।'

নির্বাক হয়ে গেল নোরিকো। প্রচণ্ড রাগ হচ্ছিলো তার, বলতে ইচ্ছা করছিলো যে কতটা সিরিয়াস ছিলো সে এই সম্পর্কটা নিয়ে। কিন্তু ও জানতো কথাগুলো বললে ঠিক কতটা করুণ শোনাবে। তার আত্মসম্মান তাকে একটা কথাও বলতে দেয়নি–আর ফোনের অপর পাশে থাকা লোকটাও তখন এটাই চাইছিলো।

এরপরেই ফোনের ওপাশ থেকে আরেকটা গলার শব্দ শুনতে পেল নোরিকো। গলাটা জিজ্ঞেস করলো যে এত রাতে কার সাথে কথা বলছে সে। হয়তো তার স্ত্রী ছিলো ওটা।

'এক ফ্রেন্ড কল করেছে। এত রাতে করেছে কারণ তারা চিন্তা করছিলো,' ফোনের ওপাশ থেকেই তার স্ত্রীকে বললো লোকটা। এর কিছুক্ষণ বাদেই ফের কথা বলে উঠলো, আরো নিচু শোনাচ্ছিলো তার গলা। 'ঠিক আছে, যাক গে। কথা তবে ওটাই আর কি।'

মানে? বলতে চেয়েছিলো নোরিকো। কিন্তু শূন্যতা এমন করে তাকে গ্রাস করেছিলো যে কথা বলার শক্তি পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছিলো সে। যখন লোকটা দেখলো যে তার কাজ শেষ, তখন কোনো কিছু না বলেই রেখে দিয়েছিলো ফোনটা। ওটাই শেষ কথা ছিলো ওদের। এরপর আর কখনো দেখেনি তাকে। অ্যাপার্টমেন্টে লোকটার যা যা ছিলো সবকিছু ফেলে দিয়েছিলো নোরিকো। তার টুথব্রাশ, রেজার ব্লেড, শেভিং ক্রিম, কনডম–সব। যেটা ফেলতে ভুলে গেছিলো তা হলো অ্যাশট্রেটা। ওটার ভেতর ময়লা জমতে লাগলো, তার হৃদয়ের ক্ষতে নতুন গজানো টিস্যুর মতো। নোরিকো এরপরে বেশ কিছু দিন কারো সাথেই প্রেম করেনি। এমন না যে একা থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো সে। ও আসলে চাচ্ছিলো বিয়ে করতে। একটা সঠিক মানুষ চাচ্ছিলো, যার সাথে বাচ্চা নিতে পারবে, নিরিবিলি একটা জীবন কাটাতে পারবে।

হাসপাতালের সেই লোকটার সাথে ব্রেকআপ করার বছরখানেক বাদে একটা ঘটকালি প্রতিষ্ঠানের সেবা নিয়েছিলো সে। তাদের বানানো নতুন কম্পিউটার সিস্টেম নাকি পার্টনার বাছাই করে দিতে সাহায্য করতে পারে। সেও সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো যে যদি লাইফ পার্টনার খুঁজতেই হয়, তবে রোমান্স জিনিসটা তার খাতা থেকে বাদ দিতে হবে। অনেক হয়েছে রোমান্স।

মধ্যবয়সি একটা নারী নম্রভাবে হেসে তাকে প্রশ্ন করতে করতে কম্পিউটারে টাইপ করছিলো। মাঝে মাঝে নোরিকোর দিকে তাকাচ্ছিলো যাতে সে আবার দুশ্চিন্তা না করে। ও সঠিক মানুষটাই খুঁজে দেবে, এমন ভাব ছিলো তার মুখে। তারপর নোরিকোর পছন্দ অনুযায়ী বিভিন্ন লোককে দেখাতে শুরু করে। ছয়জনকে খুঁজে পায় তারা, যার মাঝে পাঁচজনের সাথে দেখা করে নোরিকো। এরা এমন ধরনের লোক যাদের প্রথমবার দেখলেই মন মরে যাবে। একদম মোহবিহীন। একজনের তো ছবি অনুযায়ী চেহারাই মিলছিলো না। এক লোক অবিবাহিত বলে রেজিস্টার করেছিলো সেই প্রোগ্রামে, কিন্তু পরে দেখা গেল সেই লোকের একটা বাচ্চাও আছে।

একজন লোকের সাথে অবশ্য প্রথমবারের পরে আরো দুবার ডেটে গেছিলো সে। চল্লিশের কিছু উপরে ছিলো লোকটা, কিন্তু যথেষ্ট সিরিয়াস ছিলো, আর নোরিকোও মাথার ভেতর বিয়ের জাল বোনা শুরু করেছিলো আবারো। তিন নাম্বার ডেটের সময়ই জানতে পারে যে লোকটা তার মায়ের সাথে থাকে, এবং তার মায়ের স্মৃতি লোপ পাওয়ার রোগ আছে। যার কারণে সেই রেজিস্টারে সে মেডিকেল বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে এমন কাউকে চাচ্ছে বলে জানিয়েছিলো।

'অনেক অনেক শুভকামনা রইলো আপনার জন্য।' বলে চলে এসেছিলো নোরিকো। লোকটা বোকা বানাচ্ছিলো তাকে। শুধু তাকেই না, সব মেয়েকেই।

ছয়বারের পাল্লা শেষে সেই ঘটকালি প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি বাতিল করে দেয় নোরিকো। বুঝতে পারে, তার জীবনের অনেকগুলো মাস শুধুশুধুই নষ্ট করেছে।

আর তার ছয় মাস বাদেই আকিওশির সাথে দেখা হয় তার।

***

ওসাকায় যেতে যেতে প্রায় সন্ধ্যা নেমে এলো। হোটেলে চেক-ইন করে নোরিকোকে শহর ঘোরাতে নিয়ে গেল আকিওশি। প্রথমে যদিও নোরিকোকে এখানে নিয়ে আসতে দ্বিধা করেছিলো, কিন্তু এই মুহূর্তে বেশ ভালো ব্যবহারই করছে সে। কে জানে, হয়তো অনেক দিন বাদে নিজের এলাকায় আসার কারণেই এমনটা করছে।

দুজনে হাঁটতে হাঁটতে শহরের নিচের দিকে বিখ্যাত দোতোনবোরি দুর্গে গিয়ে শিকের ভেতর অক্টোপাস ঢুকিয়ে বানানো 'তাকোয়াকি' খেলো–স্থানীয় বিখ্যাত খাবার নাকি এটা। এটাই তাদের ট্রিপ হিসেবে প্রথম কোথাও আসা। আর সামনে

কী হতে যাচ্ছে তা নিয়ে মনে অস্বস্তি থাকলেও খুশি খুশি লাগছে নোরিকোর। দেশের এপাশটায় এই প্রথম আসা হলো তার।

'তুমি যেখানটাতে বেড়ে উঠেছ, সে জায়গাটা কি এখান থেকে আরো দূরে?' বিয়ার খেতে খেতে জিজ্ঞেস করলো নোরিকো।

'ট্রেনে করে গেলে এখান থেকে পাঁচটা স্টেশন বাদেই।'

'তবে তো কাছেই।'

'ওসাকা টোকিওর মতো এত আঁকাবাঁকা না,' জানালার বাইরে তাকিয়ে বললো আকিওশি। নিয়ন আলোতে গ্লাইকো চকলেটের সাইন দেখা যাচ্ছে ওখানে।

নোরিকো খানিকক্ষণ দ্বিধা করে এরপর বললো, 'আমাকে নিয়ে যাবে?'

ওর দিকে তাকালো আকিওশি। দুই ভ্রুর ঠিক মাঝখানে একটা ভাঁজ।

'আমি চাচ্ছিলাম তোমার বেড়ে ওঠার শহরটা একটু দেখতে।'

'আমার মনে হয় ঘোরাঘুরি অনেক হয়েছে আমাদের।'

'কিন্তু–'

'আমার কাজ আছে, তা করতে হবে,' অন্য দিকে তাকিয়ে বললো আকিওশি। দেখেই বোঝা যাচ্ছে তার মুড ঠিক নেই।

'দুঃখিত...' মাথা হেঁট করে বললো নোরিকো। নীরবে বাকি বিয়ারটুকু খেলো তারা। নোরিকো দুর্গের ভেতর থেকে দেখলো কী করে ব্যস্ত মানুষগুলো ব্রিজের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে। আটটা বাজতে আর কয়েক মিনিট বাকি। আর এরমধ্যেই ওসাকা শহরটা তার যৌবনে পদার্পণ করতে শুরু করেছে যেন।

'বাজে একটা জায়গা,' অকস্মাৎ বলে উঠলো আকিওশি।

নোরিকো তাকালো আকিওশির দিকে। এখনো জানালার বাইরে তাকিয়ে আছে সে।

'নীরস একটা শহর। ধুলোবালিতে ভরপুর। এমনকি শহরের মানুষগুলোও বাজে। কিন্তু তাদের চোখগুলো বেশ তীক্ষ্ণ। ওটা এমন একটা শহর যেখানের কেউই কখনো নিজেরটা ছাড়া কারোটা ভাবে না, কখনোই না।' হাতে থাকা বিয়ারটা শেষ করলো আকিওশি। 'তবুও যেতে চাও সেখানে?'

'হ্যাঁ।'

এক মুহূর্তের জন্য ভাবলো আকিওশি, এরপর বিয়ারটা হাত থেকে নামিয়ে রেখে পকেটে হাত ঢোকালো। বের করে আনলো দশ হাজার ইয়েনের একটা বিল। 'কিছু মনে না করলে বিলটা পে করে আসবে?'

বিলটা নিয়ে ক্যাশ রেজিস্টারের কাছে চলে গেল নোরিকো।

***

বাইরে একটা ক্যাব দাঁড় করিয়ে রেখেছে আকিওশি। ড্রাইভারকে কোথায় যাবে তা বলে দিয়েছে সে, কিন্তু নামগুলো সবই অপরিচিত ঠেকলো নোরিকোর কাছে।

তারপরেও তার মুখ থেকে ওসাকার টান শুনতে ভালো লাগছে ওর। এখানে আসার সাথে সাথে স্থানীয় সুর চলে এসেছে আকিওশির গলায়। নোরিকো কখনোই এরকম করে বলতে শোনেনি তাকে। ট্যাক্সির ভেতর খুব কম কথা বললো আকিওশি। পুরোটা সময় জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলো সে। নোরিকো ভাবলো, হয়তো আকিওশির মনে তার নেওয়া সিদ্ধান্তটা নিয়ে কিছুটা ক্ষোভ কাজ করছে।

একটা চিকন অন্ধকার গলির ভেতরে ঢুকলো ট্যাক্সিটা। ড্রাইভারটাকে কোন দিক থেকে কোন দিকে যেতে হবে তার প্রত্যেকটা দিকনির্দেশনা দিতে লাগলো আকিওশি। এরপরই একটা পার্কের সামনে এসে থামলো ওরা।

গাড়ি থেকে বের হওয়ার পরে পার্কের ভেতর ঢুকলো আকিওশি। নোরিকোও পেছন পেছন গেল। পার্কটা বেশ বড়, বেসবল খেলার জন্য যথেষ্ট জায়গা আছে ওখানটায়। সাথে আছে সুইং, জাঙ্গল জিম আর স্যান্ডবক্স।

'ছোটবেলায় এখানে খুব খেলতাম আমরা।'

'বেসবল?'

'হ্যাঁ। ডজবলও খেলতাম। মাঝে মাঝে ফুটবলও।'

'সে সময়ের কোনো ছবি আছে তোমার কাছে?'

'নাহ।'

'ওহ, ধ্যাৎ, ছবি থাকলে ভালো হতো।'

'এর চেয়ে বড় কোনো মাঠ আর ছিলো না, তাই এটাই আমাদের কাছে সবকিছু ছিলো। এই পার্ক আর ঐ...' পার্কের অন্য পাশে হাত জাগিয়ে দেখালো আকিওশি।

দেখার জন্য ঘুরলো নোরিকো। তাদের ঠিক পেছনেই একটা পুরোনো বিল্ডিং দেখলো সে। 'ঐ বাড়ি?'

'ওখানেও খেলতাম আমরা প্রায় সময়।'

'ওরকম একটা জায়গায় কী ধরনের খেলা খেলতে তোমরা?'

'টাইম টানেল।'

'কীভাবে?'

'যখন ছোট ছিলাম, তখনো বাড়িটা পুরোপুরি বানানো শেষ হয়নি। অর্ধেকের মতো কাজ শেষ করে প্রজেক্টটা বাতিল করে দেয় তারা। তাই আশেপাশের ছেলেপেলে আর ইঁদুর-বিড়ালই থাকতো ওটার মধ্যে।'

'বিপজ্জনক ছিলো না?'

'বিপজ্জনক না হলে কি আর খেলতাম?' হেসে বললো আকিওশি। কিন্তু খুব দ্রুতই হাসিটা উবে গেল তার মুখ থেকে। ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে আবার তাকালো বাড়িটার দিকে। 'একদিন একটা ছেলে ওখানে একটা লাশ খুঁজে পায়। একজন লোকের লাশ। হত্যা করা হয়েছিলো তাকে।'

বুকের মধ্যে তীক্ষ্ণ একটা ব্যথা টের পেল নোরিকো। 'লোকটাকে চিনতে?'

'হালকা-পাতলা,' বললো সে। 'কেউই তেমন একটা পছন্দ করতো না তাকে। মনে হয় সে পনশপ চালাতো বলেই। তবে আমিও তাকে পছন্দ করতাম না খুব একটা। আমার সন্দেহ আছে, লোকটা খুন হওয়ায় আদৌ কেউ অবাক হয়েছিলো কি না। আর তারপর শহরের প্রায় সবাই সন্দেহভাজনের তালিকায় পড়ে গেল।' বিল্ডিংয়ের একপাশে নির্দেশ করলো সে। 'ঐ আর্টওয়ার্কটা দেখো।'

আবছা অন্ধকারে সেদিকে তির্যক দৃষ্টি দিলো নোরিকো। ছবিটা বুঝতে কষ্ট হচ্ছে, কারণ অনেক কিছুই মুছে গেছে, কিন্তু অবয়ব দেখে বোঝা গেল যে ওখানে একটা পুরুষ আর নারীর সঙ্গমরত অবস্থার ছবি আঁকা হয়েছিলো। দেয়ালে আঁকা নগণ্য এক ছবি, যার ভেতর শিল্পের কোনো ছোঁয়া পাচ্ছে না সে।

'হত্যাকাণ্ডের পর পুরো বাড়িটা নিষিদ্ধ জায়গা হয়ে পড়ে। এরপর কেউ একজন এসে জায়গাটা ভাড়া নেয়। পুরোটা প্লাস্টিক কভার দিয়ে ঢেকে নিয়ে বাকি কাজ সারতে থাকে তারা। এই ছবিটা তখন ঢাকা পড়ে থাকে। কিন্তু পরবর্তীতে যখন কনস্ট্রাকশনের কাজ শেষ হয় আর প্লাস্টিকের কভারটা সরানো হয়, তখন এই আর্টটা দেখে ফেলে সবাই।'

পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা সিগারেট বের করলো আকিওশি। এরপরে রেস্টুরেন্ট থেকে আনা ম্যাচটা দিয়ে আগুন ধরালো ওতে। 'এর কিছু দিন পরে ছায়ার মতোই লোকজনের আনাগোনা দেখা যায় এখানে। ওরা একটা নির্দিষ্ট সময়ে এমনভাবে যাওয়া-আসা করতো যাতে কেউ দেখে না ফেলে। প্রথমে আমি কিছুই বুঝিনি। অন্য বাচ্চারাও জানতো না কী হচ্ছে। বড়রাও বলতো না আমাদের কাছে। কিন্তু শেষমেশ আমাদের একজন একটা তথ্য জোগাড় করে। এই জায়গাটায় নাকি পুরুষরা মহিলাদের কিনে নেয়, বলেছিলো সে। দশ হাজার ইয়েন দিলেই যা বলতো তাই করতো তারা, এমনকি এই পেইন্টিং-এ যা দেখাচ্ছে তাও। প্রথমে বিশ্বাস হয়নি আমার। ঐ সময়ে দশ হাজার ইয়েন মানে অনেক কিছু। তাছাড়া, একজন নারী এরকম একটা কাজ করতে পারে তা কল্পনাও করিনি তখন।' শুকনো একটা হাসি হাসলো আকিওশি, মুখ দিয়ে ধোঁয়া বের করলো। 'আমার মনে হয় আমি তখন বেশ সাদাসিধা ছিলাম। ইলিমেন্টারিতে পড়তাম তখন, আর কিইবা বুঝবো বলো।'

'আমার মনে হয় আমি যদি ইলিমেন্টারিতে থাকতে এরকম কোনো কিছু শুনতাম, তাহলে তব্দা খেয়ে যেতাম।'

'আমার অবশ্য মনে হয় না আমি অতটাও বিস্মিত হয়েছিলাম। কিন্তু একটা জিনিস শিখেছি আমি ওটা থেকে। পৃথিবীর সবচেয়ে দামি শিক্ষাটাই পাই সে সময়ে।' আরেকবার সিগারেটে টান দিলো আকিওশি, এরপরে ফিল্টারটা ছুঁড়ে মারলো মাটিতে, যদিও অর্ধেকের মতো খাওয়া হয়েছিলো ওটার। পা দিয়ে পিষে

আগুনটা নিভিয়ে দিলো সে। 'যাক গে, আমার মনে হয় না এসবে তোমার কিছু আসে যায়।'

'আকিওশি,' বললো নোরিকো। 'যে লোকটা ঐ কাজটা করেছিলো, তাকে ধরতে পেরেছিলো ওরা?'

'কোন লোকের কী কাজ?'

'ঐ যে হত্যাকাণ্ডটা, ওটার কথা বললাম।'

'ওহ, ওটা,' মাথা ঝাঁকিয়ে বললো আকিওশি। 'তেমন কিছু জানি না ওটার ব্যাপারে।' বলেই হাঁটা ধরলো সে। 'চলো, যাওয়া যাক।'

'কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

'এই রাস্তার নিচেই সাবওয়ে স্টেশন আছে একটা।'

চিকন একটা গলি দিয়ে আবছা অন্ধকারে পাশাপাশি হাঁটছে ওরা। রাস্তার পাশে বেশ ঘন করে তোলা হয়েছে বাড়িগুলো। পুরোনো ধাঁচের বাড়ি, দরজাগুলো একদম রাস্তার সাথে। কয়েক মিনিট হাঁটার পরে হঠাৎ থামলো আকিওশি। রাস্তার অন্য পাশের একটা বাড়ির দিকে তাকিয়ে আছে সে। ঐ জায়গাটায় ওটাই বেশ বড় একটা বাড়ি, জাপানিজ স্টাইলের দ্বিতল ভবন। লোহার একটা শাটার দেখে বোঝা যাচ্ছিলো প্রথম তলায় কোনো ধরনের ব্যবসা চালায় তারা। উপরের তলায় তাকালো নোরিকো। ওখানে একটা সাইনবোর্ডে লেখা রয়েছে: কিরিহারা পনশপ। লেখাটা মুছে গেছে প্রায়।

'চেনো এ জায়গাটা?'

'খানিকটা,' বললো আকিওশি। 'অল্প খানিকটা।'

পনশপটা থেকে দশ মিটারের মতো সামনে এগিয়েছে, অমনি একটা গাট্টাগোট্টা মহিলাকে কোনো একটা বাড়ি থেকে বের হতে দেখলো তারা। পঞ্চাশের কিছু উপরে হবে তার বয়স। বাড়িটার সামনে ছোট ছোট পটে কিছু চারা গাছ দেখা গেল, অর্ধেকের বেশি অবশ্য রাস্তাতেই পড়ে রয়েছে। মহিলার গায়ে জীর্ণ একটা টি-শার্ট, আর অন্য হাতে একটা পানি দেওয়ার পাত্র। ওরা পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় তাকালো সে, খুব দ্রুত পর্যবেক্ষণ করলো নোরিকোকে। তার চাহনিটা এমন মানুষদের মতো যারা চোখে চোখ পড়লেও লজ্জা পায় না।

এরপরই আকিওশির দিকে তাকালো মহিলাটা, তারপর অস্বাভাবিক আচরণ করে বসলো। চারা গাছগুলোয় পানি দেওয়া বন্ধ করে দাঁড়িয়ে গেল হঠাৎ।

'রিও?' আকিওশির দিকে সরাসরি তাকিয়ে বলে উঠলো সে।

আকিওশি সেদিকে তাকালো না পর্যন্ত। যেন মহিলাটার কথা কানেও যায়নি তার। তার চলার গতি বাড়লো না, শুধু সোজা হাঁটতে লাগলো সে। নোরিকোর তাকে অনুসরণ করা ছাড়া আর কোনো গতি রইলো না। মহিলাটার পাশ দিয়ে হেঁটে গেল তারা, যে কিনা এখনো তাকিয়ে আছে আকিওশির দিকে। 'একদম ওর

মতোই দেখতে মনে হচ্ছে,' মহিলাটার বলা শেষ কথাটা শুনলো নোরিকো। এটাও আকিওশি শুনেছে বলে মনে হলো না তার। কিন্তু মহিলাটার বলা 'রিও' নামটা মাথায় আটকে রইলো। টের পেল, নামটা বড় থেকে আরো বড় আকার ধারণ করে মাথায় বাড়ি দিচ্ছে।

***

দ্বিতীয় দিনটা নোরিকোকে একাই কাটাতে হবে ওসাকাতে। সকালের নাস্তা শেষ করে আকিওশি চলে গেছে এই বলে যে তার রিসার্চের কাজ আছে এবং রাতের আগে ফিরবে না। নোরিকো হোটেলে বসে সময়টা কাটাতে চাইছে না, তাই সিদ্ধান্ত নিলো শহরের কেন্দ্রে একটু ঘুরে বেড়াবে, ঐ দুর্গের আশেপাশে যেখানটায় তারা ডিনার করেছিলো সেখানে। কিছু দামি দামি কাপড়ের দোকান পাশ কাটিয়ে গেল সে, যেরকমটা টোকিও বা গিনজায় দেখা যায়, কিন্তু ওসাকায় এরকম থাকবে ভাবেনি সে। কারণ এখানে ফ্যান্সি দোকানগুলোর সামনেও কম্পিউটার গেম বা ছোটখাটো বৈঠকখানার মতো দেখা যায়। ততটা গুরুত্ব তারা এসব ক্ষেত্রে দেয় না। তাদের জন্য ব্যবসা মানে ব্যবসা। এর বাইরে অত সাজসজ্জার কিছু নেই।

কিছু শপিং করার পরেও অনেকটা সময় রইলো তার হাতে। তার ইচ্ছা জাগতে শুরু করেছে সেই জায়গাটাতে যাওয়ার যেখানটাতে ডিনারের পরে গেছিলো তারা। সেই পার্কের কাছে, বিশেষ করে সেই পনশপের কাছে। শহরের মূল স্টেশন থেকে সাবওয়ে স্টেশন ধরলো সে। এখনো তার মনে আছে দোকানের নামগুলো, সেই সাথে যে রাস্তা দিয়ে ফিরেছিলো হোটেলে সেটাও। ও বেশ নিশ্চিত যে একবার সেখানে গেলে রাস্তাগুলো চিনতে পারবে।

টিকেট কেনার পরে একটা চিন্তা এলো তার মাথায়। স্টেশনের পাশে ছোট একটা দোকানে ঢুকে ব্যবহার করার পরে ফেলে দেওয়া যায় এমন একটা ক্যামেরা কিনলো সে।

গন্তব্যে পৌঁছানোর পরে রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগলো সে, গত রাতে যেদিক দিয়ে গেছিলো সেদিক দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চালাতে লাগলো। দিনের বেলায় দেখতে সম্পূর্ণ আলাদা লাগছে এলাকাটা। কয়েকটা দোকানপাট খোলা অবস্থায় আছে, লোকজন এখানে-ওখানে হাঁটা-চলা ছাড়াও ভিড় করছে। বিভিন্ন দোকানে বা কারখানায় কর্মরত লোকগুলোর চোখে একধরনের শক্তি দেখতে পেল সে। এই চোখগুলো ব্যবসায়ীদের চোখের মতো না। বরং চোখের মালিকেরা প্রত্যেকেই একটা জিনিস খুঁজছে: দুর্বলতা। কেউ কারো থেকে সতর্ক থাকায় কম যাচ্ছে না। একদম তেমনটাই দেখলো নোরিকো, যেমনটা আকিওশি তাকে বলেছিলো। ধীরপায়ে হাঁটছে সে, এখানে-সেখানে দুয়েকটা ছবি তুলছে মাঝেমধ্যে। আকিওশির নিজ এলাকার ছবি যেন তার কাছে থাকে, সেজন্যই এটা করছে। ও জানে যে এটা কখনো বলতে পারবে না তার কাছে।

পনশপের কাছে পৌঁছাতেই খেয়াল করলো, বন্ধ হয়ে আছে ওটা। বস্তুত বেশ কিছু দিন ধরেই বন্ধ হয়ে আছে বলে মনে হলো। রাতের বেলা খেয়াল করেনি এটা, কিন্তু দিনের বেলায় দেখতেই বোঝা গেল যে বেশ অনেক দিন হয়েছে ওটা পরিত্যক্ত অবস্থায় আছে। একটা ছবি তুললো সে। পার্কের পাশে থাকা সেই পুরোনো বিল্ডিংয়ের কাছে এলো এরপর। কয়েকটা বাচ্চা ফুটবল খেলছে তার পাশেই। তাদের চিৎকার-চেঁচামেচি করার বেশ কয়েকটা ছবি নিলো। দেয়ালে থাকা সেই পেইন্টিংটারও ছবি নিলো সে। হাঁটতে হাঁটতে বিল্ডিংয়ের সামনে চলে এলো নোরিকো। দেখে মনে হচ্ছে না এখন আর সেরকম কোনো ব্যবসা এখানে চলে। অন্যান্য বাড়ির মতো একই রকম পরিত্যক্ত হয়েই আছে এটা, যেমনটা অর্থনৈতিক মন্দার সময় অনেক বিল্ডিংয়ের ক্ষেত্রে ঘটেছিলো। আবার রাস্তায় চলে এসে হোটেলে যাওয়ার জন্য একটা ট্যাক্সি নিলো সে।

রাত এগারোটার পরে আকিওশি ফিরলো হোটেলে। দেখে মনে হলো বেশ ক্লান্ত এবং বাজে রকমের মুডে আছে সে।

'কাজ শেষ হয়েছে তোমার?' কিছুটা ভয়ে ভয়েই জিজ্ঞেস করলো নোরিকো।

বিছানার উপর নিজেকে ছুঁড়ে মেরে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো আকিওশি। 'হয়েছে,' বললো সে। 'সবকিছুই শেষ হয়েছে।'

নোরিকো প্রায় বলে ফেলতে নিয়েছিলো যে 'ভালো', কিন্তু আকিওশির গলায় এমন কিছু ছিলো যেটা তার বলার ভাষা কেড়ে নিলো একদম। শেষমেশ কিছুই বললো না সে। চুপচাপ শুয়ে পড়লো শুধু।

***

বিছানায় এপাশ-ওপাশ করতে লাগলো কাজুনারি। কয়েক রাত ধরে এমনিতেই চিন্তায় ঘুম আসছিলো না তার, এখন আবার সাসাগাকির সাথে কথা বলার বিষয়টা ঘুরছে মাথায়। পুরো বিষয়টাই ছিলো জোর করে বিশ্বাস করার মতো। আর যখন সে করলো এবং বাস্তবতার মুখোমুখি হলো, তখন তার মনে হলো কেউ বুঝি কয়েক টন ইট দিয়ে তাকে ধাক্কা দিয়েছে।

যদিও সে 'হত্যা' শব্দটা উল্লেখ করেনি, কিন্তু সাসাগাকি স্পষ্ট করে বলেছে যে ইমায়েদাকে হয়তো এতক্ষণে মেরে ফেলা হয়েছে। সে সময় সাসাগাকির বলা প্রত্যেকটা কথা কাজুনারি এমনভাবে শুনছিলো যেন সেগুলো অন্য কারো গল্প, তার নিজের না–অনেকটা টিভিতে বা বইতে যেরকমটা দেখে বা পড়ে সে। যদিও সে জানতো যে এরকম কোনো কর্মকাণ্ড সরাসরি তার আশেপাশে থাকা লোকদের উপর ভয়ানক প্রভাব ফেলে। কিন্তু শিনোজুকা ফার্মাসিউটিক্যালসের মিটিং রুমে বসে ওসব শোনার সময় তেমন কিছু মনে হয়নি। যার কারণে যখন সাসাগাকি তাকেও সতর্ক থাকতে বলেছিলো, তখন ততটা চিন্তিত ছিলো না সে। কারণ তার মনে হচ্ছিলো কোনো গল্প শুনছে সে।

কিন্তু যখন লাইট অফ করে একাকী রুমে এলো, বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে চোখ বন্ধ করলো, তখনই উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তা তাকে এমনভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে চেপে ধরলো যে মনে হচ্ছিলো ঠান্ডা ঘাম বের হচ্ছে তার শরীর দিয়ে। ও জানতো ইউকিহো বিপজ্জনক মানুষ। কিন্তু কল্পনাও করেনি যে ইমায়েদাকে ইউকিহোর পেছনে লেলিয়ে দিয়ে তার সর্বনাশ ডেকে আনবে সে। কাজুনারি এ নিয়ে একশোবারের মতো চিন্তা করেছে যে ইউকিহো আসলে কে।

আর সেই লোকটা, রিও কিরিহারা।

সাসাগাকি তেমন খোলাসা করে কিছুই বলেনি লোকটা সম্পর্কে। শুধু এতটুকু বলেছে যে তার সাথে ইউকিহোর মেলামেশা রয়েছে। কোথায় থাকে, কী করে তার কিছুই বলেনি, এমনকি গত বিশ বছর ধরে খুঁজেও লোকটাকে বের করতে পারেনি সাসাগাকি। *পুরো দুইটা দশক।* কাজুনারি বুঝতে পারছে না এত আগে ওসাকাতে এমন কী হয়েছিলো যেটা তার নিজের ব্যক্তিগত জীবনে এত বছর পরে এসে প্রভাব ফেলবে। চোখ খুললো সে, অন্ধকারের দিকে দৃষ্টি ছুঁড়ে দিয়ে এসির রিমোটটা হাতড়ে নিয়ে চালু করলো। ঠান্ডা বাতাস ঘরে ছড়িয়ে পড়তেই দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো একটা। আর তখনই ফোন বেজে উঠলো তার। উঠে বাতিটা জ্বালালো। ঘড়িতে দেখলো রাত একটা বাজে। এক মুহূর্তের জন্য মনে হলো তার বাবা-মায়ের সাথে খারাপ কিছু ঘটলো কি না–কারণ নতুন অ্যাপার্টমেন্টটা কেনার পরে গত বছরই শহরের মূল কেন্দ্রে চলে এসেছে সে। কেশে গলা পরিষ্কার করে ফোনটা তুললো।

'হ্যালো?'

'কাজুনারি, এত রাতে ফোন করার জন্য দুঃখিত।' ইয়াসুহারু ফোন করেছে।

একটা শঙ্কা ছেয়ে গেল কাজুনারির উপর। 'কিছু কি হয়েছে?'

'হ্যাঁ...সেদিন যেটা বলেছিলাম তোমাকে। একটা ফোন পেলাম এইমাত্র, ইউকিহোর কাছ থেকে।' ফোনের ওপাশ থেকে চাপা শোনালো ইয়াসুহারুর গলা। আর সেটা গভীর রাতে ফোন করেছে বলে না।

'ওর মা...?'

'মারা গেছে। অজ্ঞান অবস্থাতেই।'

'শুনে কষ্ট লাগলো,' বলার দরকার বলেই বললো কাজুনারি।

'কালকে ফ্রি আছো না তুমি?' জিজ্ঞেস করলো ইয়াসুহারু। যদিও এটা কোনো প্রশ্ন ছিলো বলে মনে হচ্ছে না।

'এখনো চাচ্ছো আমি যেন ওসাকাতে যাই?'

'হ্যাঁ, আমি একদমই ফ্রি নেই। স্লটারমেয়ার থেকে কিছু লোক আসবে কাল, আর আমার তাদের সাথে দেখা করতে হবে।'

'আমারও তো মিটিংয়ে থাকতে হবে।'

'আর দরকার নেই। যত দ্রুত পারো ট্রেনে চেপে পড়ো, বুঝেছ? সৌভাগ্য যে আজকে শুক্রবার। রাতে হয়তো গেস্টদের নিয়ে ডিনারে যেতে হতে পারে আমাকে, তাই আমি শনিবার যাবো ওখানে।'

'বসকে কী বলবো তবে?'

'আমি বলে নেবো কালকে। তার এই শরীর নিয়ে এত রাতে ফোন ধরতে পারবে না।' সিইও, মানে ইয়াসুহারুর বাবা সোসুকে শহরের পশ্চিম দিকে সেটাগায়ার আবাসিক এলাকায় থাকেন। আগের স্ত্রী বেঁচে থাকতে ইয়াসুহারু তার কাছাকাছিই থাকতো।

'তার সাথে ইউকিহোর দেখা করিয়েছ?' জিজ্ঞেস করলো কাজুনারি। খেয়াল রাখলো যাতে বেশি নাক না গলিয়ে ফেলে এই ব্যাপারে।

'এখনো না। কিন্তু সে বুঝেছে যে সম্ভাব্য একটা স্ত্রী আমি পেয়ে গেছি। তুমি তো জানোই সে কেমন। হয়তো তার পঁয়তাল্লিশ বছরের ছেলে কাকে বিয়ে করছে এটা নিয়ে ভাবার মতো সময়ও নেই তার কাছে।'

বাইরের মানুষের কাছে সোসুকে শিনোজুকা খুব ভালো এবং নম্র মানুষ হিসেবেই পরিচিত। তার ছেলে বা কাজুনারির ব্যক্তিগত কোনো বিষয়ে তেমন নিয়ন্ত্রণ করতে দেখা যায়নি তাকে। কিন্তু কাজুনারি অনেক আগেই বুঝেছিলো যে তার চাচা আসলে একজন পুরোদস্তুর কোম্পানি ম্যান। ব্যবসার বাইরের কিছু নিয়ে তেমন কোনো মাথাব্যথা নেই তার। তার ছেলে দ্বিতীয় বিয়েটা কাকে করতে যাচ্ছে এ ব্যাপারে তিনি মাথা ঘামাবেন না–যদি-না তার ছেলে পরিবার বা কোম্পানির নাম ডোবানোর মতো কোনো কাজ না করে।

'তো, ধন্যবাদ তোমাকে এটা করার জন্য,' বললো ইয়াসুহারু।

কাজুনারি চাচ্ছিলো না ইউকিহোকে নিয়ে আর কিছু করতে, কিন্তু মাথায় কিছু আসছিলোও না যেটা বলে না করে দেবে। 'ওসাকার কোথায় যেতে হবে আমাকে?'

'তোমাকে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা আর তার মায়ের বাসার ঠিকানা ফ্যাক্সে পাঠিয়ে দিচ্ছি আমি। তোমার ফ্যাক্স নাম্বার আর ফোন নাম্বার তো একই, না?'

'হ্যাঁ।'

'ওকে, রাখছি তবে। ফ্যাক্সটা পাওয়ার পরে একবার একটু ফোন কোরো। রিং শুনলেই বুঝতে পারবো পেয়েছ ওটা।'

'আচ্ছা।'

বিছানা ছেড়ে উঠলো কাজুনারি। বুকশেলফে থাকা কাচের দরজাগুলোর দিকে তাকালো সে। ওগুলোর পেছনে রেমি মার্টিনের একটা মদের বোতল আর গ্লাস রয়েছে। গ্লাসটা বের করে তাতে ঢাললো কিছুটা, পর মুহূর্তেই চালান করে দিলো পেটে।

ব্র্যান্ডিটা জিহ্বায় গিয়ে লাগলো সরাসরি। সাথে সাথে ঘ্রাণ, স্বাদ আর অ্যালকোহলের তীব্রতা একসাথে টের পেল যেন। রগগুলো সব খাড়া হয়ে গেল তার, স্নায়ুও কাঁপতে শুরু করেছে। যেদিন থেকে ইয়াসুহারু ইউকিহোর প্রতি অনুভূতি নিয়ে তার কাছে এসেছে, সেদিন থেকেই একটা চিন্তা মাথায় খেলছিলো কাজুনারির–তার চাচা সোসুকের সাথে বিষয়টা নিয়ে আলাপ করবে কি না। কিন্তু ইয়াসুহারুর বিয়ে থামানোর জন্য যে যুক্তি তার প্রয়োজন সেই যুক্তি কোনো অস্পষ্ট ধারণার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠলে হবে না। এদিকে ইয়াসুহারুকে ইতোমধ্যেই পরিবারের সবচেয়ে ক্ষমতাধর আসনে বসানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। কাজুনারি যদি ওসব কথা তার চাচাকে বলতে যায়, তিনি নির্ঘাত ওকে বলবেন ইয়াসুহারুকে বাদ দিয়ে নিজের জীবনের দিকে তাকাতে, নিজেকে নিয়ে ভাবতে। তাছাড়া, ইয়াসুহারুর বাবা সম্প্রতি সিইও পদে ভূষিত হয়েছেন। তাই ভাইয়ের ছেলের ব্যাপারে চিন্তা করা ছাড়াও তার আরো অনেক কাজ আছে।

***

দুপুরের কিছু আগে ওসাকায় পৌঁছালো কাজুনারি। এক মুহূর্তের জন্য স্টেশনের সামনে দাঁড়াতেই বাতাসের আর্দ্রতা আর চামড়ায় গরমের আঁচ টের পেল সে। যদিও সেপ্টেম্বরের শেষ সময় চলছে, তবুও সে বুঝলো পিঠ বেয়ে ঘাম নেমে যাচ্ছে তার। টোকিওর থেকে এখানে বেশি গরম লাগে।

সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে টিকেট গেট পার করলো সে। মূল এক্সিট গেটটা তার সামনেই রয়েছে, আর তার ওপাশে দাঁড় করানো আছে একটা ট্যাক্সি। সারি করে রাখা ট্যাক্সিগুলোর প্রথমটার দিকে এগোতেই তার নাম শুনতে পেল সে। একটু থেমে আশেপাশে ভালো করে তাকাতেই দেখলো, বিশ-ত্রিশের মাঝামাঝি বয়সি একটা মেয়ে ডাকছে তাকে। গাঢ় নীল রঙের একটা স্যুট পরে আছে সে, আর তার নিচে টি-শার্ট। চুলগুলো লম্বা করে বিনুনি করেছে।

'লম্বা জার্নি করে আসার জন্য ধন্যবাদ।' বেশ কায়দা করে কুর্নিশ করলো মেয়েটা, যার ফলে তার বিনুনিটা ঘোড়দৌড়ে থাকা ঘোড়ার লেজের মতো লাফিয়ে উঠলো।

এর আগেও মেয়েটাকে দেখেছে কাজুনারি। দক্ষিণ আওইয়ামার সেই বুটিক শপটাতে কাজ করতো সে। 'আগেই বলে নিচ্ছি আমি খুবই দুঃখিত, কিন্তু আপনার নামটা যেন কী?'

'নাতসুমি,' বিজনেস কার্ড এগিয়ে দিয়ে জবাব দিলো সে।

'আপনি কী করে জানলেন আমি আসবো?'

'মিস কারাশাওয়া বলেছেন। এও বলেছেন যে আপনি হয়তো দুপুরের কিছু আগেই এসে পৌঁছাবেন। কিন্তু অনেক ট্রাফিক থাকায় কিছুটা লেট হয়েছে আমার, দুঃখিত।'

'না, না, সমস্যা নেই। তা ইউকিহো কোথায়?'

'অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পরিচালনা যারা করছে, তাদের সাথে কথা বলছেন তিনি। আমাকে পাঠিয়েছেন আপনাকে সরাসরি সেখানে নিয়ে যাওয়ার জন্য।'

'চলুন তাহলে।'

হয়তো আমি ট্রেনে থাকাকালীন ইয়াসুহারুই বলেছে ইউকিহোকে। কাজুনারি যেন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে ইয়াসুহারু কীভাবে বলেছিলো কথাগুলো: 'আমার সবচেয়ে দক্ষ মানুষটাকে তোমার কাছে পাঠালাম। ওকে কিছু বলতে আবার দ্বিধাবোধ কোরো না।'

'হঠাৎ করেই হয়ে গেল না সব কিছু?' ট্যাক্সি ছাড়ার একটু পরই বললো কাজুনারি।

মাথা দোলালো নাতসুমি। 'আমরা জানতাম যে পরিস্থিতি খারাপ, যার কারণে গতকাল এখানে এসেছি আমি। কিন্তু কল্পনায়ও ভাবিনি যে এত তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে।'

'কখন মারা গেছেন?'

'কাল রাত নয়টার দিকে হাসপাতাল থেকে ফোন পাই আমরা। তার অবস্থা আরো শোচনীয় পর্যায়ে চলে গেছিলো বলে হাসপাতাল থেকে জানানো হয়। আমরা যেতে যেতেই মারা যান তিনি।'

'ইউকিহোর কী অবস্থা?'

'ভালো না,' ভ্রূদুটো হালকা কুঁচকে বললো নাতসুমি। 'উনি তো অমন টাইপের মানুষও না যে দুঃখপ্রকাশ করে একটু হালকা হবেন, কিন্তু অনেকক্ষণ মুখ চেপে বসেছিলেন তার মায়ের বেডে। এতটা বিধ্বস্ত কখনো দেখিনি তাকে।'

'তবে তো কাল রাতে সে ঘুমায়নি ততটা।'

'আমার মনে হয় একদমই ঘুমাননি। মাঝে একবার ঘুম থেকে উঠে হলরুমের দিকে যেতে নিয়ে দেখি তার রুমে আলো জ্বলছে এবং ভেতর থেকে শব্দও আসছে। মনে হলো কাঁদছেন।'

ইউকিহো কারাশাওয়ার অতীত বা বর্তমান যাই হয়ে থাকুক না কেন, এই মুহূর্তের বিষাদটা সত্যি। যদি ইমায়েদার কথা সত্যি হয়, তবে রেইকো কারাশাওয়া ইউকিহোকে যে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন সেটা স্বাভাবিক অবস্থায় কখনোই পেত না ইউকিহো।

নাতসুমি নির্দিষ্ট করে বিভিন্ন রাস্তা বলে দিচ্ছে ড্রাইভারকে, যেটা শুনে কাজুনারির মনে হলো নাতসুমি এই আশেপাশের এলাকাতেই থাকে। কারণ তার বলার ভঙ্গিতেও ওসাকার টান রয়েছে। যে কারণে কাজুনারি বুঝলো যে এত কর্মী থাকতে কেন ইউকিহো এই মেয়েটাকেই তার বিপদের সময় পাশে রেখেছে।

পুরোনো মন্দিরের পাশ দিয়ে নিরিবিলি একটা জায়গায় এসে থামলো তারা। কাজুনারি ভাড়া মিটিয়ে দিতে যেতেই নাতসুমি না করলো।

'আমাকে বলা হয়েছে কোনো পরিস্থিতিতেই যেন আপনাকে ভাড়া না দিতে হয়,' হেসে বললো মেয়েটা।

ইউকিহোর মায়ের বাড়িটা একদম খাঁটি জাপানিজ স্টাইলের বাড়ি, সাথে দারুণ একটা গেটও রয়েছে। কাজুনারি কল্পনা করলো ইউকিহো ছোটবেলায় স্কুলে যাওয়ার সময় তার মায়ের দিকে হাত নেড়ে বিদায় জানাচ্ছে। বেশ দারুণ লাগলো ভাবনাটা। আরো কিছুক্ষণ ভাবনাটা মাথায় ধরে রাখতে চাইলো সে, কিন্তু কেন, তা জানে না।

ছোট্ট একটা ইন্টারকম ঝুলছে গেটের পাশে। নাতসুমি বাটনটা চাপতেই চটজলদি তুলে নিলো ইউকিহো।

'মি. শিনোজুকাকে নিয়ে এসেছি আমি।'

'ভেতরে নিয়ে এসো। দরজা খোলাই আছে।'

কাজুনারির দিকে তাকালো নাতসুমি। 'চলুন, ভেতরে যাই।' ওকে অনুসরণ করে ভেতরে ঢুকলো কাজুনারি। কাঠের দরজাটা বেশ সুন্দর করে সাজানো হয়েছে। কাজুনারির মনে পড়ছে না এরকম কোনো বাড়ির মধ্যে সে ঢুকেছিলো কি না।

হলওয়ে পর্যন্ত নাতসুমির পেছন পেছন গেল কাজুনারি। বিভিন্ন বিষয় খতিয়ে দেখছে সে। প্রত্যেকটা জিনিসই নিখুঁত। এমনকি তার পায়েব তলায় যে পাটাতন রয়েছে সেটার থেকে যে দ্যুতি ছড়াচ্ছে তাও বছরের পর বছর হাত দিয়ে ঘষামাজার ফলেই হয়েছে। এমনকি দেয়ালের সাথে লাগোয়া কাঠের থামগুলোর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। কাজুনারির মনে হচ্ছে রেইকো কারাশাওয়ার ব্যাপারে তার আগ্রহ বাড়ছে। কারণ তিনিই ইউকিহোকে লালনপালন করে বড় করেছেন। তার ভেতরে কী ছিলো তা দেখতে ইচ্ছা করছে কেন যেন।

উপর তলা থেকে কথার শব্দ শুনতে পাচ্ছে সে। হলওয়ের একটা স্লাইডিং দরজার সামনে এসে থামলো নাতসুমি।

'মিস কারাশাওয়া?'

'ভেতরে এসো,' দরজার ওপাশ থেকে বলে উঠলো একটা গলা।

নাতসুমি দরজাটা একপাশে ঠেলতেই কাজুনারি শুনলো ইউকিহো বলছে, 'উনাকে ভেতরে নিয়ে এসো।'

নাতসুমি হাতের ইশারা দিয়ে দেখাতেই ভেতরে ঢুকলো কাজুনারি। রুমের ভেতরে পশ্চিমা আর জাপানিজ স্টাইলের আসবাব দিয়ে ছড়ানো। তাতামি মাদুর বিছানো আছে মেঝেতে, কিন্তু তার উপর বিছানো আছে একটা কার্পেট, যার উপর একটা টেবিল আর দুটো সোফা রাখা। একজন মহিলা আর একজন পুরুষ বসে

আছে সেখানে, আর তাদের সামনেই বসে আছে ইউকিহো। কাজুনারি ঢুকতেই দাঁড়িয়ে পড়লো সে।

'এত দূর কষ্ট করে আসার জন্য ধন্যবাদ,' মাথাটা নুইয়ে কুর্নিশ করে বললো সে। গাঢ় ধূসর রঙের একটা ড্রেস পরে আছে মেয়েটা, আর দেখতে গতবারের চেয়েও বেশি চিকন দেখাচ্ছে–শোকাহত একজন মানুষের চেহারা যেমন হয় আর কি। কিন্তু তবুও তার মুখে হালকা মেকআপ দেখা যাচ্ছে। চেহারায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে চিন্তার ছাপ। এত কিছুর পরেও একটা মোহ এখনো বিদ্যমান ওর মাঝে। *খাঁটি সৌন্দর্য কখনোই ঢাকা পড়ে না।*

'তোমার মায়ের জন্য দুঃখিত,' কাজুনারি বললো।

মাথা দোলালো মেয়েটা, কিন্তু কিছু বলে থাকলেও তা ওর কান পর্যন্ত এলো না। ইউকিহো সেই যুগলের দিকে ঘুরে কাজুনারিকে একজন বিজনেস এসোসিয়েট বলে পরিচয় করিয়ে দিলো। আর নাতসুমি আগেই বলেছিলো, এই যুগল মূলত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কাজ করতে এসেছে।

'খুবই ভালো লাগছে আপনাকে দেখে,' ওকে বললো ইউকিহো। 'ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলেছি আমরা, কিন্তু কেউই সিদ্ধান্তে আসতে পারিনি যে কী করবো।'

'ভয়ে আছি যে আমার নিজেরও এ বিষয়ে তেমন অভিজ্ঞতা নেই,' বললো কাজুনারি।

'সবারই একই অবস্থা, তবুও দুটো মাথা সব সময় একটার থেকে ভালো হয়।'

'তাহলে আমার মাথা আজকে নাহয় তোমার কাছেই থাকলো।'

আরো দুঘণ্টা চললো এই সভা। কাজুনারি বুঝলো তারা পুনরুজ্জীবন[১১] আর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া একই জায়গায় করবে। আর সেই সাত-তলা বিল্ডিংটা এখান থেকে গাড়িতে যেতে দশ মিনিটের মতো সময় লাগে।

সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে গেলে ঐ যুগল আর নাতসুমি চলে গেল সেই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার স্থানে। ইউকিহো বাড়িতে থেকে যায় টোকিও থেকে কীসের যেন প্যাকেজ আসবে তার জন্য।

'কীসের অপেক্ষা করছো তুমি?' ওরা চলে গেলে জিজ্ঞেস করলো কাজুনারি।

'শোকের পোশাকের জন্য,' বললো ইউকিহো। 'আমার দোকানেরই একটা মেয়েকে দিয়ে আনাচ্ছি। এতক্ষণে হয়তো স্টেশনে চলেও এসেছে সে।' ঘড়ির দিকে তাকালো সে।

'স্কুলের কাউকে বলেছ?'

'না, বলবো না। খুব কমই দেখা হয় ওদের সাথে।'

'ড্যান্স ক্লাবের কারো সাথেও না?' জিজ্ঞেস করলো কাজুনারি।

এক মুহূর্তের জন্য চোখ বড় বড় হয়ে গেল ইউকিহোর। মনে হলো একদম মূল জায়গাতে আঘাত করেছে সে। কিন্তু চটজলদি চেহারা থেকে মুছে গেল সেই ভঙ্গিটা। 'নাহ, কারো প্রয়োজন নেই আসার।'

'আচ্ছা।' ট্রেনে বসে নোটবুকে কিছু পয়েন্ট লিখেছিলো কাজুনারি। সেগুলোর একটা মনে মনে কেটে দিলো এইমাত্র।

'আহহা!' হঠাৎ বলে উঠলো ইউকিহো। 'আপনাকে চায়ের কথা বলতে ভুলে গেছিলাম। ঠান্ডা কিছু খাবেন? কফি?'

হাত নাড়লো কাজুনারি। 'আরে, চিন্তা করতে হবে না ওসব নিয়ে।'

'না, না, সমস্যা নেই। বিয়ারও আছে, যদি চান তো।'

'চা-ই ঠিক আছে। ঠান্ডা কিছু থাকলে দিও।'

'আচ্ছা, উলঙ[২২] নিয়ে আসছি তবে আমি।'

একা হওয়ার পরে একটু উঠে দাঁড়ালো কাজুনারি, চারপাশে একবার চোখ বোলালো। যদিও অধিকাংশ আসবাবই পশ্চিমা স্টাইলের, কিন্তু এককোনায় একটা চায়ের বাক্স দেখতে পেল সে। ও ডিজাইনার না হলেও তার মনে হলো সবকিছু একদম ঠিকঠাকই আছে।

একপাশের দেয়ালে কাঠের লাগোয়া বুকশেলফ দেখলো সে যেগুলোতে বিভিন্ন ধরনের বই রাখা। *চা পানের রীতি* এবং *ফুল সাজানোর রীতি*-র বইয়ের মাঝে কিছু পুরোনো টেক্সটবুক এবং একটা পিয়ানোর বই দেখলো। আবারো সে কল্পনা করলো ইউকিহো ঘরে আছে, টেবিলে বসে পড়ছে। এমন সময় ওর হঠাৎ পিয়ানো বাজাতে ইচ্ছা করলো, কিন্তু ঘরে কোনো পিয়ানো নেই।

ঘরের বিপরীত পাশে একটা স্লাইডিং দরজা দেখতেই সেদিকে এগিয়ে গেল কাজুনারি। দরজাটা খুলে দেখলো চারপাশে কাচের দেয়াল দিয়ে ঘেরা ছোট একটা ঘর। সানরুম বলে এটাকে। কিছু পুরোনো ম্যাগাজিনের বই এককোনায় রাখা। সানরুমের ভেতরে ঢুকে বাগানের দিকে তাকালো কাজুনারি। তত বড়ও না বাগানটা, কিন্তু কয়েকটা প্যাঁচানো গাছ আর বিভিন্ন পাথরের ছোট ছোট কারুশিল্প বাগানটাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ একটা চেহারা দিয়েছে। বিশুদ্ধ জাপানিজ বাগান যাকে বলে। মনে হলো যেন গাছের তলায় ঘাসগুলো কার্পেট দিয়ে বানানো হয়েছে। ওগুলো শুকিয়ে আছে একদম। ছোট ছোট পটে কিছু গাছ লাগানো হয়েছে ঘরের পাশ দিয়ে, সবগুলোই ক্যাকটাস–যেগুলো বলের মতো গোল হয়ে থাকে ওগুলো। অসংখ্য কাঁটা ফুটে আছে ওগুলোতে।

'খুবই বাজে হয়ে আছে, না? তেমন কিছুই করতে পারিনি ওটার,' পেছন থেকে গলার আওয়াজ শুনতে পেল সে। একটা ট্রে-তে চা নিয়ে এসেছে ইউকিহো।

'ততটাও বাজে না,' বললো কাজুনারি। 'বেশ ভালো কিছু কারুশিল্প রয়েছে তোমাদের।'

'ওগুলোর যত্ন নেওয়ার জন্য আর কেউই রইলো না।' চায়ের পাত্র টেবিলে নামিয়ে রাখলো ইউকিহো।

'বাড়িটা নিয়ে কী করবে সিদ্ধান্ত নিয়েছ?'

'এখনো না।' মেয়েটা দুঃখের হাসি দিলো একটু। 'যদিও এমন করে রেখেও দেবো না। আবার কাউকে সবকিছু নষ্টও করতে দেবো না।' একটু এগিয়ে গিয়ে স্লাইডিং দরজার যে জায়গাটাতে দাগ ছিলো সেখানে হাত বোলাতে বোলাতে বললো সে। এরপরে কাজুনারির দিকে এমন করে তাকালো যেন এই প্রথম সে খেয়াল করেছে কাজুনারি দাঁড়িয়ে আছে ওখানে। 'ধন্যবাদ এখানে আসার জন্য। আমি ভেবেছিলাম আপনি হয়তো আসবেন না।'

'কেন মনে হয়েছিলো যে আসবো না?'

'মানে...' মাথা নিচু করে মাটির দিকে তাকালো সে। এরপর যখন আবার চোখ তুললো, তখন চোখদুটো লাল হয়ে আছে, পানি টলটল করছে। 'মানে...আমি জানি যে আপনি আমাকে পছন্দ করেন না।'

কাজুনারির ভাবনায় নাড়া দিলো কিছু একটা। 'তোমাকে পছন্দ না করার পেছনে এমন কী কারণ থাকতে পারে?'

'তা জানি না। হয়তো আমার উপর আপনার একটা ক্ষোভ রয়েছে। কারণ মাকোতোকে ডিভোর্স দিয়েছিলাম, তাই। অথবা, অন্য কোনো কারণ আছে। শুধু বুঝতে পারি যে আপনি পছন্দ করেন না আমাকে। আমাকে এড়িয়ে যেতে চান সব সময়।'

'এগুলো সবই তোমার কল্পনা মাত্র,' হালকা হেসে বললো কাজুনারি।

'সত্যি সত্যি বলছেন এটা?' এক পা সামনে এগিয়ে এসে বললো সে। বেশ কাছাকাছি চলে এসেছে এখন।

'সত্যি বলছি। তোমাকে অপছন্দ করার কোনো কারণ নেই আমার কাছে।'

'যাক, শুনে ভালো লাগলো,' চোখ বন্ধ করে বললো ইউকিহো। একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো।

ইউকিহো তার কাছাকাছি আসাতে নিজেকে অরক্ষিত মনে হচ্ছে কাজুনারির। মেয়েটা এতটাই কাছে চলে এসেছে যে কাজুনারি তার চামড়ায় ইউকিহোর শ্বাস-প্রশ্বাসের গরম বাতাস টের পাচ্ছে। চোখ খুললো মেয়েটা। চোখের লাল আভাটা চলে গেছে। সেখানে এবার দেখা যাচ্ছে গাঢ় বাদামি রঙের দুটো সুবিশাল গর্ত। এতটাই গভীর যে মনে হলো টুপ করে সেখানে পড়ে যাবে সে। অন্য দিকে তাকিয়ে এক পা পিছিয়ে গেল কাজুনারি। বেশ কাছে চলে এসেছিলো মেয়েটা, এতটাই যে সে ইউকিহোর হাতের স্পর্শ টের পাচ্ছিলো যেন।

'তো,' বাগানের দিকে তাকিয়ে বললো কাজুনারি, 'তোমার মা ক্যাকটাস পছন্দ করতেন, না?'

'হ্যাঁ, যদিও ওগুলো এখানে অত ভালো মানায় না। উনি মানুষকে গিফট হিসেবে দিয়ে দিতেন ওগুলো।'

'তা ওগুলো দিয়ে এখন কী করবে?'

'ভালো প্রশ্ন। ততটা যত্ন করতে হয় না ওগুলোর, তবে ওখানে ফেলে রাখবো না আমি।'

'আমি নিশ্চিত ওদের জন্য ঠিকই একটা ঘরের ব্যবস্থা করবে তুমি।'

'আপনি নেবেন নাকি, মি. শিনোজুকা?'

'না, থাক।'

হাসলো ইউকিহো। তারপর বাগানের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে মৃদু কণ্ঠে বললো, 'ওরা এখন মাতৃহারা ছোট ছোট কিছু দুঃখী সন্তান।' কাঁধদুটো কিছুটা ঝাঁকুনি দিয়ে উঠলো তার। এরপরই পুরো শরীর কাঁপতে লাগলো। কাজুনারি শুনতে পেল কাঁদছে সে। 'আমারও আর কেউ রইলো না,' হেঁচকির সাথে বলে উঠলো ইউকিহো।

পেছন থেকে কাজুনারির মনের মধ্যেও হাহাকার করে উঠলো কিছুটা। ও এগিয়ে এসে হাত রাখলো তার কাঁধে। ইউকিহোর ধবধবে সাদা হাতটাও এসে পড়লো তার হাতের উপর। বেশ ঠান্ডা হয়ে আছে হাতটা। কাঁধের কাঁপুনিটা ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে।

আর ঠিক তখনই একটা অনুভূতি টের পেল কাজুনারি। এ এক অবর্ণনীয় আবেগের তাড়না, যেটা এই এক মুহূর্ত আগে পর্যন্ত আটকে রাখা হয়েছিলো। অনুভূতিটা কাজুনারির নিজের কাছেই যেন অজানা লাগছে। ওটা ধীরে ধীরে বাড়ছে, প্ররোচনা দিচ্ছে তাকে। তার চোখ চলে গেল ইউকিহোর মসৃণ, ধবধবে সাদা ঘাড়টার দিকে।

যখনই সে ভাবলো তার শেষ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাটাও বুঝি ভেঙে গেল এবার, ঠিক তখনই ফোন বেজে উঠলো ঘরের। কাঁধের থেকে হাত সরিয়ে নিলো কাজুনারি। ওদিকে ইউকিহোর আঙুলগুলোকেও নিচে নেমে যেতে দেখলো সে।

কয়েক সেকেন্ড ওখানেই বসে থেকে এরপর উঠে টেবিলের কাছে চলে গেল ইউকিহো। 'হ্যালো? জুনকো? চলে এসেছ? অনেক অনেক ধন্যবাদ তোমাকে। ট্যাক্সি পাঠাবো তোমার জন্য?'

কাজুনারি শুধু একপাশে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলো ইউকিহোর নির্দেশনাগুলো।

***

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুষ্ঠান পাঁচ তলায় হচ্ছে। এলিভেটরের বাইরে স্টুডিওর মতো দেখতে ছোট্ট একটা জায়গা। একপাশে একটা পূজা পাঠ করার মতো বেদিও আছে। ফোল্ডিং চেয়ারগুলো সাজিয়ে রাখা হয়েছে বেশ সুন্দর করে।

টোকিও থেকে আনা সেই মেয়েটা শোকের পোশাক নিয়ে ইউকিহোর আর মাতসুমিরা আগেই সেখানে পৌঁছে গেছিলো। মাতসুমি অবশ্য চেক করে নিয়েছে এরমধ্যে।

'আমি গিয়ে চেক করে আসি।' বলেই তার কাপড় যে হ্যাঙ্গারে ঝোলানো ছিলো সেটা হাতে নিয়ে ড্রেসিং রুমের দিকে চলে গেল ইউকিহো।

একটা ফোল্ডিং চেয়ার নিয়ে সেখানে বসে বেদির দিকে তাকালো কাজুনারি। মাঝখানে ইউকিহোকে বলতে শুনেছিলো যে যত টাকাই লাগে লাগুক, তবে একটা বেদির ব্যবস্থা যেন করা হয়। ও এজন্যই বেশ তীক্ষ্ণ চোখে দেখছে যে অন্যান্য বেদির তুলনায় এতে বিশেষ কী আছে।

ইউকিহোর মায়ের বাসার ঘটনার কথা মনে পড়তেই তার শিরদাঁড়া বেয়ে শীতল একটা স্রোত নেমে গেল। যদি ফোনটা না বাজতো, তাহলে হয়তো ইউকিহোকে জাপটে ধরতো সে। আর কে জানে এরপরে কী হতো? সে এটাও বুঝতে পারছে না মেয়েটাকে ধরার এই প্ররোচনাটা ওর ভেতর এলো কোত্থেকে। কীভাবে সে নিজের সমস্ত দৃঢ়তাকে বুড়ো আঙুল দেখালো? অথচ এত দিন ধরে ও নিজেই বলে আসছিলো যে ইউকিহো একজন খারাপ মানুষ।

ও মনে মনে ঠিক করে নিলো যে আর হড়কাবে না সে। মাথা থেকে ইউকিহোর চিন্তাটা সরাতে চাইলো। কিন্তু মস্তিষ্কের কোনো একটা জায়গা থেকে হঠাৎ ফিসফিস করে বললো, যদি ওকে নিয়ে তার এত দিনের সব ধারণাই ভুল হয়ে থাকে, তবে? সেই কাঁপুনি বা কান্না, কোনোটাই লোক দেখানো ছিলো না, এ ব্যাপারে সে নিশ্চিত। এই মানুষটাকে দেখে মনে হয়েছে তার মধ্যে আবেগ অনুভব করার শক্তি আছে, সেই সাথে আছে অকৃত্রিম আবেগকে বুঝতে পারার শক্তিও। কাজুনারি ভেতরে ভেতরে স্বীকার করতে বাধ্য হলো, ইউকিহোকে এত দিন ধরে সে যা ভেবে আসছে আর সামান্য ক্যাকটাসের দুঃখে মেয়েটাকে চোখের সামনে যেভাবে কাঁদতে দেখেছে, তাতে মনে হচ্ছে ওরা সম্পূর্ণ ভিন্ন দুজন মানুষ।

হয়তো এই ক্রন্দনরত মেয়েটাই আসল ইউকিহো। আর তার মাথায় যে ইউকিহো আছে সেটা হয়তো একটা ভুল ধারণা, যেটা বছরের পর বছর ধরে বেড়ে চলেছিলো। হতে পারে মাকোতো বা তার ভাই ইয়াসুহারু আসল ইউকিহোকেই দেখে আসছিলো এত দিন, যে ইউকিহোকে আজকের আগে সে কখনোই দেখেনি।

চোখের কোণে কিছু একটা একটা নড়ার দৃশ্য টের পেল কাজুনারি। চোখ তুলে দেখলো, ইউকিহো শোকের গাউনটা পরে আলো ছড়াতে ছড়াতে আসছে ওরই দিকে।

কালো গোলাপ, ভাবলো কাজুনারি। *হ্যাঁ, ও আসলেই তাই।* এতটা প্রাণবন্ত এবং গুণবতী মেয়ে এর আগে দেখেনি কাজুনারি। কালো পোশাকটা ওর এই দুটো দিককেই যেন আরো বাড়িয়ে দিচ্ছিলো। যখন ইউকিহোও টের পেল কাজুনারি তার

দিকে তাকিয়ে আছে, একটা মৃদু হাসি খেলে গেল তার মুখে। কিন্তু চোখগুলো তখনো জলে ভেজা, যেন কালো ফুলের পাপড়িতে থাকা কয়েক ফোঁটা শিশিরবিন্দু।

হলের ঠিক পেছন দিকটায় রিসিপশনের জায়গায় চলে গেল ইউকিহো। অন্য কয়েকজন মহিলার সাথে কিছু কথা সেরে নিচ্ছিলো সে। এরা অন্য গেস্টদের আতিথেয়তা করবে। দূর থেকেই দেখতে লাগলো কাজুনারি। পুনরুজ্জীবনের আচারের সময়ই আসতে দেখা গেল মানুষজনকে। এদের বেশিরভাগই মধ্যবয়স্ক মহিলা। এরা হয়তো রেইকো কারাশাওয়ার শিক্ষার্থী ছিলো, আন্দাজ করলো কাজুনারি। একের পর এক এসে দাঁড়াচ্ছে বেদির উপরে থাকা রেইকো কারাশাওয়ার ছবির সামনে। হাতদুটো একত্র করে কাঁদছে সবাই।

যারা যারা ইউকিহোকে চিনতো, তারা তারা গিয়ে কুশল বিনিময় করছে ওর সাথে। তার মায়ের সাথে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনার কথা বলছে। আর প্রত্যেকবারই গল্প বলার মাঝখানে থেমে থেমে চোখ মুছছে প্রত্যেকে। কিন্তু ইউকিহো তাদের প্রত্যেকের কথা শুনছে, তাদেরকে অন্য কোথাও যাওয়ার জন্য তাড়াও দিচ্ছে না। দেখে কাজুনারি ঠিক করতে পারছে না যে কে কাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে আসলে।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কীভাবে সম্পন্ন হবে তা নিয়ে নাতসুমির সাথে কথা বলার পরে কাজুনারি দেখলো যে ওর আর করার মতো তেমন কিছুই নেই। খাবার আর বিয়ার রাখার রুমটা প্রায় পাশাপাশি। কিন্তু সেখানে দাঁড়িয়ে থাকাটা খাপছাড়া লাগছিলো ওর।

উদ্দেশ্যহীনভাবে কিছুক্ষণ হাঁটাচলা করার পরে বাইরে সিঁড়ির কাছে একটা কফির মেশিন দেখতে পেল সে। ততটা তৃষ্ণা লাগেনি তার, কিন্তু তবুও পকেটে হাত ঢুকিয়ে কিছু টাকা গচ্ছা দিতে অনীহা করলো না। কফি কেনার সময়ই সে মেয়েদের গলার আওয়াজ টের পেল–ইউকিহোর কর্মীরা কথা বলছে। সিঁড়ির ওপাশের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে তারা।

'একদম ঠিক সময়ে সবকিছু হয়ে গেল তাহলে,' বললো নাতসুমি। 'মানে উনি চলে গেছেন তা অবশ্যই দুঃখের, কিন্তু এরপরও।'

'না, তা বুঝেছি আমি। উনি যদি অনেক দিন ধরে অজ্ঞান হয়েই পড়ে থাকতেন, তাহলে সবকিছু আরো কঠিন হয়ে পড়তো,' স্বীকার করে নিলো জুনকো।

'এক মুহূর্তের জন্য আমার মনে হয়েছিলো, জিউগাওকাতে দোকানটা উদ্বোধন করতে দেরি হয়ে যাবে হয়তো।'

'ভাবছি, মা না মরলে বস কী করতেন?'

'ওহ, আর কী করতেন? দোকান উদ্বোধন করার দিন থেকে পরের দিনই আবার ওসাকায় চলে আসতেন। সত্যি বলতে, এটারই ভয় পাচ্ছিলাম আমি।

আমাদের নিয়মিত কাস্টমারগুলো এসে তাকে দেখতে না পেলে কী হবে ভাবা যায়?'

'একদম কানের কাছ দিয়ে গুলি গেছে, কী বলো?'

'হয়তো। যাক গে, ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি শেষ হয়েছে এতে সবার জন্যই ভালো হয়েছে। কারো জন্য আজীবন কোমায় থাকাটাও অনেক কষ্টের। সত্তর বছর বয়স হয়েছিলো না তার?' জিজ্ঞেস করলো নাতসুমি। 'মানে, আমি তো বসকে প্রায় জিজ্ঞেস করেই ফেলেছিলাম যে লাইফ সাপোর্ট সরিয়ে নেওয়া যায় কি না...'

'নাতসুমি!'

মেয়েদুটোর হাসার শব্দ শুনলো কাজুনারি। এক হাতে কফি নিয়ে ধীরপায়ে দরজার পাশ থেকে সরে গেল সে। আবারো অনুষ্ঠানের রুমে ঢুকে রিসিপশনের টেবিলের উপর কাপটা রাখলো। ঐ সময় নাতসুমি যে লাইফ সাপোর্ট সরিয়ে নেওয়ার কথা বলছিলো সেটাই মাথায় ঘুরছে এখন। *না, ওটা নিয়ে ভেবো না*, নিজের কাছেই বললো কাজুনারি। কিন্তু তবুও বারবার চিন্তাটা ফিরে আসতে লাগলো তার মাথায়।

নাতসুমি ওসাকা আসার পরপরই রেইকো কারাশাওয়া মারা যান। যখন হাসপাতাল থেকে ফোন আসে, তখন ইউকিহোর সাথেই ছিলো সে, যেটা ইউকিহোর জন্য একটা অ্যালিবাই। কিন্তু হয়তো সে নাতসুমিকে এখানে ডেকেছিলো যেন তার অ্যালিবাই হতে পারে সে। হয়তো ইউকিহো এখানে থেকে সবার কাছে নিষ্পাপ হিসেবে তুলে ধরেছে নিজেকে, আর ওদিকে কেউ একজন তার হয়ে হাসপাতালে গিয়ে তার মায়ের লাইফ সাপোর্ট খুলে দিয়েছে।

হাস্যকর, ভাবলো কাজুনারি। কিন্তু চিন্তাটা সরে গেল না তার মাথা থেকে। হঠাৎ মাথায় এসে ধাক্কা দিলো গোয়েন্দা সাসাগাকির লেখা সেই নামটা: রিও কিরিহারা। নাতসুমি বলেছিলো সেই রাতে সে ইউকিহোর ঘর থেকে শব্দ শুনেছিলো। ও ভেবেছিলো ইউকিহো কাঁদছে, কিন্তু এটা কি হতে পারে না যে সে হয়তো ঐ কাজটা সারার জন্য কারো সাথে যোগাযোগ করছিলো তখন?

ইউকিহোর দিকে তাকালো সে। একজন বৃদ্ধ মহিলার সাথে কথা বলছে মেয়েটা, হালকা মাথা দোলাচ্ছে সেই সাথে। নিজের মাথাটাকে ঝাঁকিয়ে আরেক কাপ কফি আনতে গেল কাজুনারি।

রাত দশটা বাজতেই দর্শনার্থীর সংখ্যা কমে এলো অনেকটা, তাই ইউকিহো তার কর্মীদেরকে হোটেলে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে দিলো।

'আপনি কী করবেন, বস?' জিজ্ঞেস করলো নাতসুমি।

'এখানে রাতটা থাকবো আমি। শত হলেও পুনরুজ্জীবনের অনুষ্ঠান।' হলরুমের একপাশে শোকার্তদের জন্য রুমের ব্যবস্থা রয়েছে।

'একা একা থাকতে পারবেন?'

'ভালোবাসায়,' কাজুনারির চোখে চোখ রেখে বললো ইউকিহো। 'আমি জানি না আসলে কী করে একজন পুরুষকে ভালোবাসতে হয়।'

অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে নিলো কাজুনারি। 'আমি আসলে জানি না এর কোনো সঠিক মাপকাঠি আছে কি না।'

ঘরের বাতাস আরো ভারী হচ্ছে। গলায় থাকা টাইটা ঢিলা করলো কাজুনারি, দম নিতে চাচ্ছে প্রাণভরে। 'আমার যাওয়া উচিত,' আচমকা দাঁড়িয়ে গিয়ে বললো সে।

'ওহ, এত রাত অবধি আপনাকে আটকে রাখার জন্য দুঃখিত,' বললো সে।

কাজুনারি মাথা দুলিয়েই অন্য দিকে ফিরে তাকালো। 'কালকে দেখা হচ্ছে তবে।'

'ধন্যবাদ।'

দরজার নবে হাত রাখতেই সে টের পেল তার পেছনে কেউ এসে দাঁড়িয়েছে। ওটা যে ইউকিহো তা বোঝার জন্য পেছনে তাকাতে হলো না। টের পেল ওর পেছনে হাত রেখেছে সে।

'ভয় হচ্ছে ভীষণ,' ফিসফিসিয়ে বললো মেয়েটা। 'একা থাকতে ভয় লাগে আমার।'

কাজুনারির মনে হলো এইমাত্র তার হৃৎপিণ্ডে চাপ দিলো কেউ একজন। ইউকিহোর দিকে ঘুরে তাকানোর ইচ্ছাটা ঢেউয়ের গতিতে আঘাত করলো ওকে। আর তখনই তার মাথার ভেতর একটা সতর্কবার্তা জ্বলে উঠলো: *যদি ওর চোখের দিকে তাকাও, তাহলেই সব শেষ।* দরজা খুললো কাজুনারি। তারপর আর ফিরে না তাকিয়ে শুধু বললো, 'গুডনাইট।'

মনে হলো যেন ইউকিহো এতক্ষণ জাদু করে রেখেছিলো তার উপর। আর যেই না ঐ শব্দগুলো সে বললো, অমনি সিগারেটের ধোঁয়ার মতো করে উবে গেল সব। তার জায়গায় মেয়েটার স্বর শুনতে পেল। এই স্বর স্থির এবং নির্বিকার, ঠিক আগের মতো।

'গুড নাইট।'

রুম থেকে বের হওয়ার পর পেছনে দরজা লাগানোর শব্দ শুনলো সে। আর সেই সময়েই অবশেষে পেছনে ফিরলো কাজুনারি। শুনতে পেল দরজার নবে থাকা ছোট বাটনের শব্দটা, যেটা ঘুমানোর আগে রুম লক করার জন্য দেওয়া হয়।

কাজুনারি এক মুহূর্তের জন্য তাকিয়ে রইলো দরজাটার দিকে।

আসলেই কি তুমি একা?

হাঁটতে শুরু করলো সে। খালি করিডর জুড়ে ঠক ঠক করে বাজতে লাগলো তার প্রত্যেকটা পদধ্বনি।

অধ্যায় তেরো

বাস থেকে নামার সাথে সাথে ঠান্ডা একটা বাতাস এসে আছড়ে পড়লো সাসাগাকির কোটে। গতকাল পর্যন্ত বেশ গরম ছিলো। আজকে হঠাৎ সকাল থেকে রাস্তাঘাটে শীতল একটা আবহাওয়া বিরাজ করছে। আর নয়তো ওসাকার থেকে টোকিও বেশ ঠান্ডা এলাকা হওয়ায় তার এমন মনে হচ্ছে। পরিচিত রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে গন্তব্যে পৌঁছে থামলো সে, একবার ঘড়ির দিকে তাকালো। বিকাল চারটা বাজে, একদম সময়মতো এসেছে। ও চাইলে আগেই আসতে পারতো, কিন্তু তাকে কিছু জিনিস কিনতে একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে ঢুকতে হয়েছিলো। জিনিসগুলো তার হাতেই আছে এখন।

সিঁড়ি বেয়ে দ্বিতীয় তলায় উঠলো সে, ডান পায়ের হাঁটুতে একটা ব্যথা টের পেল। বেশ কয়েক বছর আগে থেকেই ব্যথাটা শুরু হয়েছিলো তার–যদিও নির্দিষ্ট দিনক্ষণ মনে নেই। তবে এই রকম ঠান্ডার একটা মৌসুমেই যে শুরু হয়েছিলো তা মনে আছে।

দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো সে। ওখানে দরজার উপরে বড় করে লেখা রয়েছেঃ ইমায়েদা গোয়েন্দা সংস্থা। চমকাচ্ছে প্লেটটা, মনে হচ্ছে দুয়েক দিনের ভেতর পরিষ্কার করা হয়েছে। সম্ভবত যারা জানে না তাদেরকে জানানোর জন্য যে ব্যবসাটা এখনো চলছে।

ডোরবেল বাজাতেই সাসাগাকি টের পেল ভেতরে নড়ছে কেউ, হয়তো পিপহোল দিয়ে দেখছে তাকে। দরজা খোলার শব্দ পেল সে, এরপরই দেখলো এরি সুগাওয়ারা দরজাটা খুলে সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

'হেই,' মেয়েটা বললো। 'ভেবেছিলাম সময়মতো আসতেই পারবেন না।'

'লাইনটা ঐ দোকানের বাহির পর্যন্ত ছিলো,' হাতের জিনিসগুলো একটু তুলে ধরে বললো সাসাগাকি।

'আরে বাহ! পেয়েছেন তাহলে আপনি!' ব্যাগটা সাসাগাকির হাত থেকে নিয়ে সেখানেই খুলে ফেললো সে। 'উমমম...বেশ সুন্দর দেখতে একটা চেরি পাই এনেছেন।'

'চেরি পাই দিয়ে কী হবে?'

'এটাই তো এখন ট্রেন্ড। *টুইন পিকস*-এর কারণে।'

'এর মানে কী তাই তো বুঝতে পারছি না,' বললো সাসাগাকি। 'কিন্তু মাসখানেক আগে না টিরামিসু ট্রেন্ড ছিলো? ওটা পরিবর্তন হলো কবে?'

'ট্রেন্ড নিয়ে অত চাপ নেওয়ার দরকার নেই আপনার। ওসব আমার কাজ। যাক, প্রথমে পাই দিয়ে শুরু করবো। আপনি খাবেন কিছুটা? কফি দিচ্ছি সাথে।'

'কফিই নেবো।'

'ঠিক আছে,' কিচেনের দিকে যেতে যেতে বললো এরি।

কোটটা খুলে ফেললো সাসাগাকি। আগের থেকে খুব অল্প কিছুই পরিবর্তন করা হয়েছে জায়গাটায়। ইস্পাতের শেলফ আর ক্যাবিনেট আগের জায়গাতেই আছে। যে পার্থক্যটা এখন দেখা যাচ্ছে তা হলো এককোনায় একটা টেলিভিশন আর কিছু হাবিজাবি জিনিসপাতি। যেগুলোর সবটাই এরির আনা।

'এবার কত দিন থাকবেন এখানে?' জিজ্ঞেস করলো এরি।

'তিন অথবা চার দিন। কাজ বাদ দিয়ে এর বেশি ছুটি কাটাতে পারবো না।'

'এত অল্প কদিনের ভেতর কী কাজই বা করতে পারবেন?'

'যতটুকু সময় আছে তার ভেতরেই করতে হবে এখন। উপায় নেই আর।'

সেভেন স্টারের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরালো সাসাগাকি। পুড়ে যাওয়া ম্যাচটা ধরে ইমায়েদার টেবিলের উপরে থাকা অ্যাশট্রেতে ছুঁড়ে মারলো। টেবিলের তলাটা বেশ সুন্দর করে পরিষ্কার করা হয়েছে। যদি ইমায়েদা দরজা দিয়ে আবার ফিরে আসে, তবে সাথে সাথেই কাজে লেগে যেতে পারবে। শুধু ডেস্কে থাকা ক্যালেন্ডারটা গত বছরের আগস্ট মাসের পাতায় উলটে রয়েছে–ঐ মাসেই ইমায়েদা নিখোঁজ হয়েছিলো। বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় যে ইমায়েদার নিখোঁজ হওয়ার পর এক বছর পেরিয়ে গেছে।

হালকা পা দুলিয়ে একটু তাল দিতে লাগলো সাসাগাকি। ওদিকে চেরি পাই নিয়ে কী কী যেন করছে এরি। সব সময়ই ওকে বেশ উৎফুল্ল দেখালেও সাসাগাকি জানে ভেতরে ভেতরে বেশ কষ্ট পাচ্ছে মেয়েটা, আর এই জিনিসটা ওকেও অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছে। মেয়েটা হয়তো বাস্তবতা মনে করে মেনে নিয়েছে যে ইমায়েদা মারা গেছে, কিন্তু তবুও লোকটা কোনো একদিন ফিরে আসবে সেই অপেক্ষা করছে। সাসাগাকির সাথে এরির দেখা হওয়ার পরও প্রায় এক বছর হয়ে গেছে। ও এসেছিলো দেখতে যে কোনো কিছু পরিবর্তিত হয়েছে কি না। তখন এই অ্যাপার্টমেন্টে এরিকে দেখতে পায় সে।

প্রথমে তো মেয়েটা বেশ সতর্কতার সাথে দেখছিলো ওকে, কিন্তু পরে যখন সাসাগাকি বললো যে সে একজন গোয়েন্দা এবং ইমায়েদা নিখোঁজ হওয়ার আগে তার সাথে পরিচয় হয়েছিলো, তাতেই কিছুটা শান্ত হয়েছিলো সে।

যদিও এরি কখনো বলেনি, তবুও সাসাগাকি ধরে নিয়েছে যে এরির সাথে ইমায়েদার প্রণয়ের সম্পর্ক ছিলো। আকুল হয়ে আছে সে ইমায়েদাকে খোঁজার জন্য। এমনকি নিজের অ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে এখানে চলে এসেছে মেয়েটা–যদি কোনো রকমের সংযোগ পায় ইমায়েদার নিখোঁজ হওয়ার সাথে, তাই। মেইল চেক করা, যাদেরকে ইমায়েদা চিনতো তাদের সবার সাথে কথা বলা ইত্যাদি সব করে সে। সৌভাগ্যবশত, বাড়ির মালিক এতে আপত্তি করেনি। ভাড়াটিয়া নিখোঁজ

থাকার কারণে ভাড়া না পাওয়ার চেয়ে বরং অন্য কেউ বাসায় থেকে নিয়মিত ভাড়া পরিশোধ করাটাই তার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এরির সাথে দেখা হওয়ার পর সাসাগাকি ঠিক করে নিয়েছিলো যে যেবারই টোকিওতে আসবে, সেবারই একবার দেখা করে যাবে এখানে। বেশ উপকারী এই মেয়েটা। শহরের কোন কোন জায়গায় তাড়াতাড়ি যেতে পারবে বা কোন ট্রেন্ডটা এখন চলছে, এসব বিষয়ে ওকে ছোটখাটো টিপস দেয় সে। ভালো কথোপকথনও চালাতে পারে। আর সাসাগাকি নিজেও ওর সাথে কথা বলাটা উপভোগ করে।

একটা ট্রে-তে করে দুটো মগ আর দুটো ছোট প্লেটে করে দুই পিস কাটা পাই নিয়ে এসেছে এরি। ইমায়েদার স্টিলের টেবিলটার উপর রাখলো ওগুলো।

'নিন, খেয়ে ফেলুন,' মগটা এগিয়ে দিয়ে বললো এরি।

'ধন্যবাদ।' হালকা হেসে চুমুক দিলো সে। *ঠান্ডা দূর করার জন্য গরম গরম কফির উপরে আর কিছুই হতে পারে না*, ভাবলো সে।

ইমায়েদার চেয়ারে বসে পড়ে পাইতে একটা কামড় বসালো এরি। প্রবল উৎসাহের সাথে চিবাতে লাগলো সে, একই সাথে বুড়ো আঙুল বের করে থাম্বস আপ দিলো সাসাগাকির উদ্দেশে।

'তো বলার মতো কিছু হলো?' জিজ্ঞেস করলো সাসাগাকি। এই প্রশ্নটা সে প্রত্যেকবারই এরিকে করে যাতে তার সাহস বা উদ্দীপনা কিছুটা হলেও বাড়ে।

কালো মেঘে ছেয়ে গেল এরির মুখটা। কাটাচামচটা প্লেটের পাশে রেখে এক চুমুক কফি মুখে দিলো সে। 'দুর্ভাগ্যবশত, তেমন কিছুই হয়নি। খুব কমই চিঠি পাই এখন। দুয়েকটা যা-ও ফোন আসে, তা-ও আবার নতুন কাস্টমারদের কাছ থেকে তদন্তের জন্য আসে।' ইমায়েদার ফোন চালু রেখেছে সে। এরিই সেসবের বিল দেয়।

'তার মানে অফিসেও কেউ আর তেমন একটা আসছে না?'

'না। বছরের শুরুর দিকে বেশ কিছু ফোন এসেছিলো যদিও, কিন্তু এখন সেই দীপ্তি নিভে গেছে।' ডেস্কের ড্রয়ারটার দিকে হাত বাড়ালো এরি, এরপর সেখান থেকে একটা নোটবুক বের করে আনলো। 'গ্রীষ্মের দিকে একটা পেয়েছিলাম, এরপর সেপ্টেম্বরে আরেকটা। দুটোই মহিলা ছিলো। গ্রীষ্মের ওটা ছিলো রিপিটার।'

'মানে?'

'মানে সে এর আগেও ইমায়েদার সাহায্য নিয়েছিলো। তার নাম কাওয়াকামি। ইমায়েদা হাসপাতালে আছে কিছু দিনের জন্য–এটা শুনে বেশ হতাশ হয় সে। পরে খতিয়ে দেখলাম, বছর দুয়েক আগে তার স্বামী চিটিং করছিলো কি না সে বিষয়ে তদন্ত করতে দিয়েছিলো এই মহিলা। সে সময়ে তেমন কোনো প্রমাণ পায়নি ইমায়েদা, তাই হয়তো মহিলা তদন্ত আর চালায়নি। সম্ভবত তার স্বামী আবারো কুকর্ম শুরু করেছে।' উপরে তাকালো এরি, চোখে উৎফুল্লতার আভা।

এর আগেও সাসাগাকি বুঝতে পেরেছিলো যে কেন ইমায়েদার সাথে ঐ মেয়েটা কাজ করতো। ওর আসলে অন্যদের গোপন ব্যাপারে বেশ আগ্রহ রয়েছে আর এই মুহূর্তে ওর মুখে যে হাসিটা লেগে আছে তা সেটারই প্রমাণ দেয়।

'আর সেপ্টেম্বরে যে এসেছিলো সে? সেও কি দ্বিতীয়বার এসেছিলো?'

'না, তার দ্বিতীয়বার ছিলো না। সে জানতে চেয়েছিলো যে কেউ এখানে এসে কোনো অনুরোধ করেছিলো কি না।'

'মানে কী?'

'মানে...' নোটবুক থেকে মাথা তুলে তাকালো এরি। 'সে এসে জিজ্ঞেস করেছিলো যে আকিওশি নামের কেউ কয়েকমাসেক আগে এসে কোনো তদন্তের জন্য বলেছিলো কি না।'

ভ্রূ কুঁচকে তাকালো সাসাগাকি। আকিওশি নামটা পরিচিত ঠেকলো তার কাছে, কিন্তু কোথায় শুনেছে তা মনে করতে পারছে না। 'অদ্ভুত প্রশ্ন ছিলো তো!'

'ততটাও অস্বাভাবিক না,' হেসে বললো এরি। 'ওটার ব্যাপারে আমি শুনেছিলাম ইমায়েদার কাছ থেকে। কিছু কিছু পুরুষ এসে যাকে তাকেই জিজ্ঞেস করতো যে তাদের স্ত্রীরা তাদের উপর চোখ রাখতে বলেছে কি না। আমার মনে হয় ঐ মহিলা ওরকম মানুষদের মতোই কেউ। হয়তো কোনো প্রমাণ পেয়েছিলো যে তার স্বামী ইমায়েদাকে চোখ রাখতে বলেছে তার উপর, অথবা তার স্বামী যে এজেন্সিতে এসেছিলো তা দেখে ফেলেছে।'

'শুনে তো মনে হচ্ছে তুমি বেশ নিশ্চিত এ ব্যাপারে।'

'ওসব বোঝার জন্য একধরনের অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা আছে আমার,' বললো সে। 'তাছাড়া, আমি যখন বললাম যে আমি খুঁজে দেখে আপনাকে জানাবো, তখন সে তার বাড়ির ঠিকানা দিলো না আমাকে, তবে কাজের ঠিকানাটা দিয়েছে; সন্দেহজনক, কী বলেন? ও চাচ্ছিলো না তার স্বামী ফোনটা ধরুক, তাই বাসার ঠিকানা দেয়নি।'

'ঐ মহিলার নাম কী?'

'ও বলেছিলো তার নাম কুরিহারা। আমার মনে হয় এটা তার বানানো নাম; কাজের জন্য ব্যবহার করেছে সে। অনেকেই এমনটা করে আজকাল।'

মাথা দোলালো সাসাগাকি। 'বাহ! আমি হতবাক হয়ে গেলাম, এরি। ভালোই গোয়েন্দাগিরি করতে পারো দেখছি। বেশ ভালো একজন গোয়েন্দা পুলিশ হতে পারতে তুমি।'

হেসে মাথা ঝাঁকালো এরি। 'তাহলে আমার করা এরপরের অনুমানগুলোও আমি বলছি আপনাকে, দাঁড়ান। এই কুরিহারা নামের মেয়েটা ইমপেরিয়াল হাসপাতালের একজন ফার্মাসিস্ট, বুঝলেন? তো সে একজন ডাক্তারের সাথেই

নিশ্চয়ই প্রেম করছে? আর যার সাথে প্রেম করছে, সে নির্ঘাত বিবাহিত। আমার তাই মনে হয়। ডাবল বাটপারি!'

'আমার মনে হয় অনুমান করতে করতে এবার ফ্যান্টাসিতে ঢুকে গেছ তুমি,' বললো সাসাগাকি। ভ্রুদুটো কুঁচকে একই সাথে হেসে ফেললো।

***

সাসাগাকির সন্ধ্যা সাতটা বেজে গেল শিনজুকুর হোটেলে পৌঁছাতে পৌঁছাতে। বেশ ম্যাড়ম্যাড়ে জায়গাটা, হালকা আলো জ্বলছে। লবি বললেও বুঝি বেশি বলা হয়ে যায় ওটাকে। একটা ডেস্ক রেখে দিয়ে সেটাকে রিসিপশন হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। একজন মধ্যবয়স্ক পুরুষ কপালে ভাঁজ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার ওপাশে। দেখে মনে হয় না আতিথেয়তার কোনো বালাই আছে তার মাঝে। এমন না যে এই জায়গাটাই ওর প্রথম পছন্দ, কিন্তু এছাড়া তার হাতে কোনো রাস্তাও নেই কারণ টোকিওতে আরো কিছু দিন থাকতে হবে ওকে। সত্যি বলতে, এটাও কিছুটা কষ্টকর হয়ে যাচ্ছে তার জন্যে। কিন্তু সেই ক্যাপসুল হোটেলগুলো একদমই সহ্য হয় না ওর। এই বুড়ো শরীরে একটা কোয়ার্টার সাইজ রুম ভাগাভাগি করাটা আসলেই কঠিন: ঘুমাতে যাওয়ার সময় যতটা না ক্লান্ত থাকে, উঠার পর তার থেকেও বেশিই ক্লান্ত লাগে। এমনকি এই জাতীয় রুমগুলো যদি খালিও থাকে, এরপরেও প্রাইভেট রুমই ওর বেশি পছন্দ।

চেক-ইন করতেই শুনলো, ওর জন্য নাকি ম্যাসেজ এসেছে একটা। রিসিপশনিস্ট একটা সাদা খাম এগিয়ে দিলো তার দিকে। সাসাগাকি খামটা খুলে ভেতরে নজর দিলো। একটা কাগজে লেখা রয়েছে: '৩০৮ নাম্বার রুমে আসুন।'

কপাল কুঁচকে তাকালো সাসাগাকি, ভাবছে কে হতে পারে। তার রুম নাম্বার ৩২১। সেই ফ্লোরেরই কেউ হয়তো তার জন্য ম্যাসেজটা ছেড়ে গেছে।

৩০৮ নাম্বার রুমের সামনে এসে দাঁড়ালো সাসাগাকি। এক মুহূর্তের জন্য দ্বিধা নিয়ে দরজায় কড়া নাড়লো। দ্রুত ভেতর থেকে নড়াচড়ার শব্দ শুনতে পেল এরপর। দরজাটা খুলতেই চোয়াল ঝুলে গেল তার।

সামনেই হিসাশি কোগা দাঁড়িয়ে আছে।

'আরে বাহ, ঠিক সময়ে এসেছেন দেখছি,' তার সাবেক অধস্তন অফিসার বললো।

'কী?' খানিকটা তোতলাচ্ছে সাসাগাকি। 'তুমি এখানে কী করছো?'

'এই এটা-সেটা। আপনার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। খেয়েছেন কিছু?'

'না।'

'বেশ বেশ। চলুন, খেয়ে আসা যাক কিছু। আপনার জিনিসপাতি আমার রুমে রাখতে পারেন।' সাসাগাকির হাত থেকে জিনিসগুলো রেখে আলমারি থেকে একটা জ্যাকেট আর কোট বের করলো কোগা। 'ডিনারে কী খাবেন?'

‘ফ্রেঞ্চ বাদে যেকোনো কিছু,’ জবাব দিলো সাসাগাকি।

রাস্তার পাশের একটা জায়গায় যেখানে জাপানিজ ফুড সার্ভ করা হয় সেখানে গেল তারা। প্রত্যেক টেবিলে চারজন বসা যায় এমন করে চেয়ার রাখা আছে তাতে। একটা টেবিল ঠিক করে মুখোমুখি বসলো দুজনে। কোগা বললো যে টোকিওতে থাকার সময় মাঝেমধ্যেই এখানে আসতো সে। স্টু আর সাশিমি খেয়ে দেখার জন্য বললো। কিছু বিয়ার অর্ডার করলো সে, তারপর সাসাগাকির মগে ঢেলে দিলো। সাসাগাকিও বোতল থেকে কোগার মগে ঢালতে নিলে সে না করে দিয়ে নিজের মগে নিজেই ঢাললো।

কোগার উদ্দেশে টোস্ট করার পর মুখ খুললো সাসাগাকি। ‘তো বলো, কাহিনি কী?’

‘টোকিও পুলিশ হেডকোয়ার্টারে একটা মিটিং ছিলো। মূলত বিভাগীয় প্রধানেরই যাওয়ার কথা, কিন্তু তার কিছু কাজ থাকায় আমাকে পাঠিয়েছে।’

‘বাহ, বেশ এগিয়ে যাচ্ছো দেখি। অভিনন্দন,’ বললো সাসাগাকি, হাতে থাকা চপস্টিকের মাথাটা ঢুকিয়ে দিলো টুনা মাছটার একদম পেট বরাবর। দেখতে যতটা ভালো দেখাচ্ছে, খেতেও ঠিক ততটাই সুস্বাদু।

একসময় সাসাগাকির অধস্তন অফিসার ছিলো কোগা, আর এখন সে ওসাকার হোমিসাইডের প্রধান। ওখানকার অনেকেই ভাবে যে কোগা এমন একজন চাটুকার যার আবার পরীক্ষায় ভালো করার প্রবণতা আছে। কিন্তু সত্যটা হলো, কোগা কখনোই দায়িত্ব এড়িয়ে যায় না। পুলিশ স্টেশনের আর দশজনের মতোই কঠোর পরিশ্রম করে সে। আর সেই সাথে ঐ পরীক্ষাগুলোর জন্য অন্যরা সবাই মিলে যতটা শ্রম দেয়, কোগা একাই দেয় তার চেয়ে বেশি।

‘আমার এখনো খারাপ অবস্থা চলছে,’ বললো সাসাগাকি। ‘আমি নিশ্চিত এখানে বসে এই চর্বিযুক্ত খাবার খাওয়ার থেকে তোমার আরো অনেক ভালো কিছু করার আছে। আর ঐ বালের হোটেলের কথা তো নাই বা তুললাম।’

হাসলো কোগা। ‘আসলেই বালের একটা হোটেল ওটা। উঠলেন কেন ওটায়?’

‘যার উত্তর জানো সে বিষয়ে প্রশ্ন করাটা বোকামি। আমি ছুটি কাটাতে আসিনি এখানে।’

‘এটাই তো সমস্যা,’ বললো কোগা। ‘যদি ছুটি কাটাতেই আসতেন, তাহলে কিছু বলতাম না এ ব্যাপারে। কিন্তু যখন আমার মনে পড়ে কীসের জন্য আপনি এখানে আসেন, বিশ্বাস করুন, আমার খুব কষ্ট হয় হাসতে। আপনার স্ত্রীও বেশ দুশ্চিন্তা করেন এ নিয়ে।’

‘তো কাতসুকোই তোমাকে পাঠিয়েছে তবে? সে তোমাকে কী ভাবে, বলো তো? ওর বার্তাবাহক?’

'আরে না, উনি বলেননি আমাকে এখানে আসতে। আমরা এটা-ওটা নিয়ে কথা বলছিলাম, তখন এসব বলেছেন, এই-ই যা।

'ঐ একই হলো। ও তোমাকে হুকুম দিয়েছে–এটা স্বীকার করো। নাকি ওরি দিয়েছে?'

'সবাই দুশ্চিন্তা করছে আপনাকে নিয়ে–আপাতত এটা বলাটাই নিরাপদ।'

'চমৎকার!' ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠলো সাসাগাকি।

কোগা আর সাসাগাকি একসাথে কাজ করা ছাড়াও নতুন একটা সম্পর্কে জড়িয়েছে। সাসাগাকির স্ত্রীর ভাইয়ের মেয়ে ওরির সাথে বিয়ে হয়েছে কোগার। অবশ্য, ওটা একটা কাকতালীয় বিষয় ছিলো। মূলত ওরি আর কোগা দুজনেই প্রথমে না জেনে প্রেম করেছিলো, তারপর বিয়ে। কিন্তু সাসাগাকির সন্দেহ হয় যে এর পেছনে তার স্ত্রী কাতসুকোরও হাত ছিলো। ওদের বিয়ারের বোতল খালি হয়ে গেলে জাপানি মদ অর্ডার দিলো কোগা। স্টু খেতে শুরু করলো সাসাগাকি। ওতে থাকা মিসোর ফ্লেভারটা টোকিওর নিজস্বতা হলেও বেশ ভালোই লাগলো তার কাছে।

মদ চলে এলে কোগা সাসাগাকির মগে ঢালতে ঢালতে বললো, 'তো বলুন, এখনো সেই পুরোনো কেসটা নিয়েই পড়ে আছেন?'

'ঐ কেস আমার ঘুম হারাম করে দিয়েছে।'

'এটাই কেন? আরো তো অনেক কেসই সমাধান করা যায়নি। আর এটা সমাধান না হওয়ার মতোই একটা কেস বলে মনে হয়। হতে পারে সেই লোকটা, যে ট্রাফিক এক্সিডেন্টে মারা গেছিলো, সে-ই হয়তো আসল খুনি ছিলো? ডিপার্টমেন্টের বাকিরাও তো একমত ছিলো এই ব্যাপারে।'

'টেরাসাকি করেনি ঐ কাজ,' কাপ নামিয়ে রেখে জোর গলায় বললো সাসাগাকি। সেই বাড়িটার ভেতর পনশপের মালিকের লাশ খুঁজে পাওয়ার পর বিশ বছর পেরিয়ে গেলেও ওর প্রত্যেকের নাম স্পষ্ট মনে আছে। 'আমরা টেরাসাকির বাসায় অসংখ্যবার খুঁজেছি। কোথাও কিরিহারার সেই এক মিলিয়ন ইয়েনের চিহ্নও পাইনি। আর আমার এটাও মনে হয় না ঐ টাকা সে কোথাও লুকিয়ে রেখেছে। টেরাসাকি ঋণে জর্জরিত ছিলো। যদি অতগুলো টাকা তার হাতে যেত, তাহলে সেগুলোকে যত দ্রুত সম্ভব কাজে লাগাতো সে। আর এতেই আমার মনে হয় টাকাটা তার হাতে যায়নি। আর এটা ভাবলেই বুঝে যাই যে খুনটাও সে করেনি।'

মাথা দোলালো কোগা। 'আপনার প্রাথমিক ধারণার সাথে একমত আমি–আসলেই। যার কারণে টেরাসাকি মরার পরেও আমি আপনার সাথে ঘুরঘুর করতাম। কিন্তু এরপর দেখলাম, আমাদের রাস্তাটা গোল হয়ে ঘুরেই চলেছে, আর বিশটা বছর ধরে সেই রাস্তাতেই আপনি বৃত্তাকারে ঘুরে যাচ্ছেন।'

'আমি জানি এই কেস তার সময়সীমা পার করে ফেলেছে। কিন্তু এটা সমাধান না করে আমিও মরছি না। কোনো না কোনো উপায়ে এর সমাধান করেই ছাড়বো আমি।'

কোগা চাইলো সাসাগাকির মগে আরো মদ ঢালতে, কিন্তু সাসাগাকি ছোঁ মেরে তার হাত থেকে বোতলটা নিয়ে নিজের মগে ঢালার আগে কোগার মগে ঢেলে দিলো। 'তুমি ঠিকই বলেছ। আসলেই আরো অনেক কেস আছে যেগুলোর কোনো সমাধান হয়নি। এর থেকে আরো অনেক বড় বড় কেস, অনেক নৃশংস কেস আছে, যেখানে অপরাধীর মাথার চুলেরও হদিস পাইনি আমরা। আর সেগুলোর কোনোটা নিয়েই আমি সন্তুষ্ট না। কিন্তু এই পনব্রোকারের কেসটা আলাদা। আমাদের হাতে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আমরা তা ছেড়ে দিয়েছি, আর আমাদের ভুলের কারণেই মানুষকে অনেক ভোগান্তি পোহাতে হয়েছে। সেই মানুষদের...যাদের কোনো সম্পর্কই ছিলো না পনব্রোকারের সাথে।'

'মানে? কী বলতে চাচ্ছেন?'

'মানে আমাদের এই কেসটাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দেওয়া উচিত ছিলো। আর যেহেতু আমরা তা করতে পারিনি, তাই সেটা এখন আস্ত একটা শয়তানের ফুলে পরিণত হয়েছে,' ভ্রুকুটি করে বললো সাসাগাকি, সেই সাথে কিছুটা মদ ঢাললো নিজের মগে।

কোগা টাইটা একটু ঢিলে করে শার্টের কলারের বোতামটা খুললো। 'আপনি কি ইউকিহো কারাশাওয়ার কথা বলছেন?'

জ্যাকেটের পকেটে হাত ঢোকালো সাসাগাকি। একটা ভাঁজ করা কাগজ বের করে টেবিলের উপর রাখলো।

'কী এটা?'

'খুলে দেখো।'

কোগা ভাঁজ খুললো কাগজটার। তার মোটা ভ্রুতে বেশ তীক্ষ্ণ একটা ভাঁজ পড়লো সাথে সাথে। 'R&Y Osaka Now Opening? মানে কী এটার?'

'ইউকিহো কারাশাওয়ার দোকান। বেশ বড় বিষয় এটা। শেষমেশ ওসাকাতে তারা তাদের শাখা খুলেছে, শিনসাইবাশির কাছে। আর ভালো করে দেখো, এই বছরের ক্রিসমাস অনুষ্ঠানের সময় উদ্বোধন করবে তারা।'

'এটাই কি তবে শয়তানের সেই ফুল?' কাগজটা ফের ভাঁজ করে সাসাগাকির দিকে এগিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলো কোগা।

'এটা আর ফুল নেই, ফলে রূপ নিয়েছে বলতে পারো।'

'মনে করিয়ে দিন তো কখন থেকে আপনি ইউকিহো কারাশাওয়াকে সন্দেহ করতে শুরু করেছিলেন? সে যখন ইউকিহো নিশিমোতো ছিলো, তখন থেকেই নাকি?'

'হ্যাঁ, নিশিমোতো যখন ছিলো। তোমার হয়তো মনে আছে যে ইওসুকে কিরিহারা মারা যাওয়ার বছরখানেক বাদেই ফুমিও নিশিমোতো মারা যায়। সে সময় থেকেই সন্দেহ জেগেছিলো আমার।'

'যেটা কিনা একটা দুর্ঘটনা হিসেবে নেওয়া হয়েছিলো। যদিও আপনি নিজে কখনোই ওতে বিশ্বাস করেননি।'

'ভিক্টিম জাপানি মদ খেয়েছিলো, যেটা সে এর আগে কখনোই খায়নি। আবার স্বাভাবিক সময়ের থেকে পাঁচগুণ বেশি ঘুমের ঔষধও নিয়েছিলো সে। না, এটা কোনোভাবেই দুর্ঘটনা নয়। দুর্ভাগ্যবশত, আমি ওটার দায়িত্বে ছিলাম না, তাই জানি না কী করে ওটা হ্যান্ডেল করা হয়েছিলো।'

'আত্মহত্যার একটা কথা উঠেছিলো না তখন?' পায়ের উপর পা তুলে জিজ্ঞেস করলো কোগা।

'ইউকিহোর জবানবন্দির উপর নির্ভর করে এই আত্মহত্যার বিষয়টি ভাবা হয়েছিলো। ও বলেছিলো যে তার মা ঠান্ডা লাগলে হালকা-পাতলা মদ খেত।'

'ইলিমেন্টারি স্কুলে পড়া কোনো মেয়ে তার মায়ের মৃত্যু নিয়ে মিথ্যা বলবে, এটা অধিকাংশ মানুষই বিশ্বাস করবে না।'

'ও ছাড়া আর কেউ বলেনি যে ফুমিওর ঠান্ডা লেগেছিলো।'

'কিন্তু ওটাই বা কেন করলো সে? ওটা সুইসাইড নাকি দুর্ঘটনা, তাতে ইউকিহোর কি আসে যায়? কোনো রকম জীবনবিমা তো করা ছিলো না। আর ওরকম চিন্তাভাবনা কোন বাচ্চাই বা করে?' হঠাৎ চোখ বড় বড় করে তাকালো কোগা। 'এক মিনিট, আপনি আবার এটা ভাবছেন না তো যে ইউকিহো তার নিজের মাকে খুন করেছে?'

কথাটা হালকা হাসির ছলেই বললো কোগা, কিন্তু সাসাগাকি হাসলো না। 'নাহ, অত দূরেও ভাবছি না আমি। কিন্তু ঐ মৃত্যুতে তার হাত আছে।'

'তা কীভাবে?'

'তার মা যে আত্মহত্যা করার কথা ভাবছে, এই ব্যাপারটা এড়িয়ে যাওয়ার মাধ্যমে।'

'আপনার মনে হয় ইউকিহো চাচ্ছিলো তার মা যেন মরে যায়?'

'ইউকিহো রেইকো কারাশাওয়ার বাড়িতে উঠার ক্ষেত্রে তেমন দেরি করেনি। তারা হয়তো এটা নিয়ে আলোচনাও করেছিলো এর আগে। হয়তো ইউকিহো আগেই চেয়েছিলো রেইকো কারাশাওয়ার বাড়িতে চলে যেতে, কিন্তু ফুমিও নিশিমোতো, মানে তার আসল মা বাধা দিচ্ছিলো।'

'আপনার মনে হয় ও তার মাকে এভাবে মরতে দেবে?'

'হ্যাঁ, আমার তাই মনে হয়। আর সুইসাইডের বিষয়টা ঢাকার জন্য তার কাছে কারণ ছিলো; ব্যাপারটা দুর্ঘটনা হলে মানুষের সমবেদনা পাবে সে। কিন্তু যদি

সুইসাইড করেছে বলে কথা ছড়াতো, তাহলে মানুষের কথার তীর তার দিকেও ছুটতো। ফলে দুটোর কোনটা বেছে নেবে তার উত্তর একদম সহজ ছিলো ওর জন্য।'

'দেখুন, আপনি যা বলছেন তার একটা ভিত্তি ঠিকই আছে। কিন্তু এসবই অতিরঞ্জিত লাগছে। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন কী বলছি আমি।' এরপর আরো দুই বোতল মদ অর্ডার দিলো কোগা।

'ইউকিহোর প্রত্যেকটা পদক্ষেপ অনুসরণ করে এসব মিলিয়ে দেখতে আমার অনেকটা সময় চলে যায়–এই, এটা তো খেতে বেশ ভালোই! কী এটা?' তার চপস্টিকের মাঝখানে ধরে রাখা ভাজা এক টুকরো খাবারের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো সাসাগাকি।

'আপনার কী মনে হয়, এটা কী হতে পারে?' হেসে বললো কোগা।

'আরে, জানি না দেখেই তো জিজ্ঞেস করলাম। এর আগে এরকম স্বাদ তো পাইনি কখনো।'

'নাটো এটা।'

'কী, ঐ পচা শিমের বিচিগুলো? এখানে এসব খায় মানুষ?'

'ধরতে পেরেছেন,' বললো কোগা। 'আমি নিশ্চিত এটার নাম আগে জানলে আপনি খেতেনই না।'

হাসলো সাসাগাকি। 'এভাবে রান্না করলে তো অতটা আঠালো থাকে না দেখছি,' মুখ ভরে আরেকবার নেওয়ার সময় বললো। 'খেতে আসলেই ভালো।'

'দেখেছেন? এর মানে দাঁড়ায় যে কোনো কিছু সম্পর্কে আগে থেকে কোনো ধারণা রাখা উচিত না। মানে চেষ্টা করার আগ পর্যন্ত আপনি জানবেনই না যে সেগুলো ভালো কি মন্দ।'

'তা যা বলেছ,' একটুখানি মদ গিলে বললো সাসাগাকি। তার পায়ের আঙুল পর্যন্ত গরম হয়ে গেছে তা টের পেল। 'পূর্ব ধারণার কথা বলায় মাথায় এলো, এর কারণেই তো এই কেসে ধরা খেয়েছি আমি। আর যখনই আমার মাথায় এলো যে ইউকিহো সাধারণ কোনো বাচ্চা না, তারপরেই আমি আবার সেই পনব্রোকারের হত্যার ঘটনাটা খতিয়ে দেখি। আর খতিয়ে দেখতেই বুঝতে পারি, কিছু একটা নজর এড়িয়ে গেছিলো আমার।'

'কী?' জিজ্ঞেস করলো কোগা, চোখে সিরিয়াস চাহনি।

ফিরতি চাহনি দিলো সাসাগাকিও। 'পায়ের ছাপ।'

'পায়ের ছাপ?'

'হ্যাঁ, যেখানে লাশ খুঁজে পাওয়া গেছিলো সেখানের পায়ের ছাপ। ধুলো দিয়ে ভরা ছিলো জায়গাটা, মনে আছে? তো সেখানে অনেক পায়ের ছাপ ছিলো। কিন্তু সে সময় অতটা মনোযোগ দেওয়া হয়নি ওগুলোতে। তোমার মনে আছে কেন?'

'এগারো বছর। এসব বোঝার জন্য যথেষ্ট বয়স।' সেভেন স্টারের প্যাকেটটা খুললো সাসাগাকি। পকেটে হাত দিয়ে ম্যাচটা খুঁজছে।

লাইটার বের করে আগুন জ্বালালো কোগা। 'আমি অবশ্য নিশ্চিত না,' সাসাগাকির সিগারেটে আগুন ধরাতে ধরাতে বললো। দামি লাইটারটা জ্বালানোর সময় যে ক্লিক করে শব্দ হয় ওটা শুনতে দারুণ।

সাসাগাকি ধন্যবাদের খাতিরে হালকা মাথা দোলালো, এরপর মুখ থেকে ধোঁয়া বের করে কোগার হাতের দিকে তাকালো সে। 'ডানহিল নাকি?'

'কার্টিয়ার।'

'মনে আছে টেরাসাকির গাড়িতে আমরা একটা ডানহিল লাইটার খুঁজে পেয়েছিলাম?'

'ঐ যেটা দেখে ভেবেছিলাম যে পনব্রোকারের লাইটার হতে পারে, তাই না? আমার জানামতে ওটার কোনো ব্যাখ্যা আর পাইনি আমরা।'

'ওটা আমারই থিওরি ছিলো যে লাইটারটা কিরিহারার হতে পারে। কিন্তু টেরাসাকি হত্যাকারী ছিলো না। আমার মনে হয় হত্যাকারী চেয়েছিলো আমরা অমনটা ভাবি, তাই ঐ লাইটারটা রেখেছিলো সেখানে, অথবা তার কাছে বিক্রি করে দিয়েছিলো।'

'আর আপনার মতে ওটা ইউকিহের কাজ?'

'হওয়ার অনেক সম্ভাবনা রয়েছে। আমি বলবো কাকতালীয়ভাবে টেরাসাকির কাছে একই রকমের লাইটার থাকার থেকে ওটা হওয়াই বেশি সম্ভব।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো কোগা, আর তারপর সেটা কিছুটা তিক্ততায় রূপ নিলো। 'দেখুন, আপনার ভাবনাটার প্রশংসা করছি আমি। হয়তো আসলেই ইউকিহো এসবের পেছনে ছিলো। এটা সত্য যে সে বাচ্চা হওয়ার কারণে আমরাও অনেক বিষয় এড়িয়ে গেছি বা চোখে পড়লেও তেমন গ্রাহ্য করিনি। কিন্তু কোনো প্রমাণ ছাড়া এটাও অন্যান্য সব থিওরির মতো একটা থিওরি মাত্র। আপনার কাছে কি কোনো প্রমাণ আছে যে ইউকিহোই এই কাজগুলো করেছে?'

সিগারেটে লম্বা একটা টান দিলো সাসাগাকি। এরপর ধোঁয়াগুলো বের করতেই কোগার মাথার উপর দিয়ে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল সেগুলো। 'বলতে বাধ্য হচ্ছি, নেই। আসলেই কোনো প্রমাণ নেই আমার কাছে।'

'তবে আমার মনে হয় আপনার উচিত পুরো বিষয়টাকে গোড়া থেকে ভাবা। আর শুনে কষ্ট পাবেন জানি, তবুও বলছি, এই কেসের ফাইল তুলে নিয়েছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। যদি আপনি মূল হত্যাকারীকে ধরেও থাকেন, তবুও আমাদের কিছু করার থাকবে না।'

'জানি।'

'তাহলে?'

'তাহলে শোনো,' সিগারেট ছুঁড়ে মেরে বললো সাসাগাকি। চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিলো কেউ আছে কি না আশেপাশে তা দেখতে। 'কে পনব্রোকারকে মেরেছে-কেসটা এখন এর থেকেও বেশি কিছু হয়ে গেছে। আমি শুধু ইউকিহো কারাশাওয়ার পেছনেই লাগিনি।'

'আর কার পেছনে লেগেছেন তাহলে?' তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো কোগা।

'আমি ওদের দুজনের পেছনেই ছুটছি।' মৃদু একটা হাসি খেলে গেল সাসাগাকির মুখে। 'গোবি আর চিংড়িটা, দুটোর পেছনেই।'

***

ইমপেরিয়াল হাসপাতালে সকাল নয়টা বাজেই প্রথম পেশেন্টকে কনসালটেশনের জন্য ভর্তি করা হয়। তারপরও প্রথম প্রেসক্রিপশনটা হাতে পেতে দেরি হয়ে যায় খানিকটা।

যখনই একজন রোগী আসে, তখনই দুজন ফার্মাসিস্ট একসাথে কাজে লেগে পড়ে। একজন মেডিসিনের ব্যাপারটা দেখে, আরেকজন ভুলটুল রয়ে গেল কি না তা দেখে। সবকিছু চেক করা হয়ে গেলে সিল করা প্যাকেজটায় ছাপ মেরে দেয় ওরা। তার উপর আবার মাঝেমধ্যে বহির্বিভাগের পেশেন্টদের আবদারও রাখতে হয়। জরুরি মেডিসিন ডেলিভারি, গাড়ি থেমে কার্ট নামানো ইত্যাদি ইত্যাদি। আজকে নোরিকো আর তার সহকর্মী ছাড়াও আরেকটা লোক রয়েছে ফার্মেসিতে: একজন লোক যে কি না এখন এককোনায় কম্পিউটারের সামনে বসে আছে। মেডিকেল ডিপার্টমেন্টের তরুণ এক প্রফেসর সে। দুই বছর ধরে ইমপেরিয়াল হাসপাতাল তাদের প্রত্যেকটা কম্পিউটারের সাথে বিভিন্ন রিসার্চের সুবিধা দিয়ে আসছে। এরমধ্যে সবচেয়ে বড় সংযোগ হলো তাদের অফিসের সাথে একটা ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির সরাসরি অনলাইনভিত্তিক সংযোগ। যখনই কোনো না কোনো ঔষধ সম্পর্কে তাদের জানার প্রয়োজন পড়তো, তখনই শুধু তথ্যগুলো চেক করতো তারা। যে-কেউই আইডি নাম্বার আর পাসকোড দিয়ে এটা ব্যবহার করতে পারে। নোরিকোর কাছে দুটো আছে, কিন্তু সে কখনোই এসব ব্যবহার করেনি। যখনই কোনো কিছু জানার দরকার পড়তো, ফার্মাসিউটিক্যালের কোনো লোককে ডেকে নিতো সে। আর এভাবেই চলে আসছিলো তাদের কাজ। অন্যান্য ফার্মাসিস্টরাও একই কাজ করে।

যে অ্যাসিস্টেন্ট প্রফেসরটা কম্পিউটারে কাজ করছে, সে ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির সাথে একটা যৌথ প্রজেক্টে সংযুক্ত হয়েছে। নোরিকো জানে যে ওদের সিস্টেমটা এই লোকের ভালোই কাজে দেবে-যদিও সিস্টেমটা পুরোপুরি নিখুঁত না। কয়েকজন টেকনিশিয়ানকে কিছু দিন আগে ডাক্তারদের সাথে একটা বিষয়ে কথা বলতে শুনেছে সে: সম্প্রতি নাকি ওদের সিস্টেম হ্যাক করার চেষ্টা করেছে কেউ।

নোরিকো পুরোপুরি নিশ্চিত না যে এর মানে আসলে কী, কিন্তু শুনে মনে হয়েছে ভালো কিছু হয়নি। আর ঐ ঘটনার কারণে বিশ্বাসটাই নড়বড়ে হয়ে গেছে সবার।

দুপুরের খাবারের পরে আন্তঃবিভাগের রোগীদের নিয়মিত ডোজগুলো নেওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করলো সে। তারপর ওরা যে ড্রাগগুলো নিচ্ছে তার ব্যাপারে ডাক্তার আর নার্সদের সাথে কথাও বললো। এরপরে আবার ফার্মেসিতে ফিরে গেল। খুব তাড়াতাড়িই পাঁচটা বেজে গেল যেন। ও বেরিয়ে যেতে নিচ্ছিলো, এমন সময় তার এক সহকর্মী ডাক দিলো তাকে। ওকে নাকি ফোন করেছে কেউ। বুকটা ধক করে উঠলো নোরিকোর।

'জি?' রিসিভারটা তুলে নিয়ে বললো। কর্কশ শোনালো তার কণ্ঠটা।

'নোরিকো? নোরিকো কুরিহারা বলছেন?' একটা লোকের গলা শোনা গেল। কিন্তু যার গলা সে আশা করছিলো তারটা না। লোকটার গলার স্বরটা খানিকটা ক্ষীণ, যেটাকে অসুস্থতা ভেবে নিলো নোরিকো। যদিও কিছুটা চেনা চেনা লাগছে।

'জি, বলুন?' জবাব দিলো নোরিকো।

'ভাবছি, আমাকে মনে আছে কি না আপনার। আমি ফুজি বলছি, তামোৎসু ফুজি।'

'মি. ফুজি?' মনে আছে তার।

সেই ঘটকালি সেবা নেওয়ার মধ্যে যে ছয়জনকে সে দেখেছিলো, তাদের একজন এই লোক। এর মায়েরই ডিমেনশিয়া ছিলো।

'ওহ,' বললো নোরিকো। 'কেমন আছেন আপনি?'

'ভালো, ভালো। আপনিও ভালো আছেন মনে হচ্ছে।'

'জি, আমম...কোনো প্রয়োজন ছিলো?'

'ওহ, আসলে হাসপাতালের কাছ থেকেই ফোন করলাম আমি। এই কিছুক্ষণ আগে পার হওয়ার সময় আপনাকে দেখলাম। খাওয়াদাওয়া ঠিকঠাকমতো করছেন আপনি? কিছুটা রোগা-পাতলা দেখালো।'

বলেই হাসলো সে। হাসি শুনে নোরিকোর শিরদাঁড়া বেয়ে ঠান্ডা স্রোত নেমে গেল যেন।

'ভাবছিলাম একটু দেখা করতে পারি কি না আমরা,' বললো ফুজি। 'চা খাওয়া যাবে?'

চোখ পাকালো নোরিকো। *কী, আবারো ডেটে যেতে চায় সে?*

'খুবই দুঃখিত, আজকে আমার একটু তাড়া আছে।'

'বেশিক্ষণ লাগবে না। আসলে একটা জিনিস নিয়ে কথা বলার ছিলো আপনার সাথে। অল্প কিছুক্ষণ সময় বের করতে পারবেন? এই আধা ঘন্টার মতো।'

নোরিকো ইচ্ছা করেই জোরে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। 'আসলেই আমার হাতে তেমন সময় নেই। আমার হাতে আপনার সাথে ফোনে কথা বলার মতোও সময় নেই। আমি রাখছি এখন।'

'না, না, প্লিজ, এক মিনিট। অন্তত একটা প্রশ্নের উত্তর দেবেন? শুধু একটা? এখনো কি আপনি সেই লোকটার সাথে আছেন?'

'কীহ?'

'শুধু এটুকুর উত্তর দিলেই হবে। যদি ঐ লোকটার সাথে আপনি এখনো থেকে থাকেন, তবে আপনাকে জরুরি একটা কথা বলা দরকার এই ব্যাপারে।'

নোরিকো হাত দিয়ে মুখটা ঢেকে নিয়ে রিসিভারটা মুখের আরো কাছে টেনে নিয়ে বললো, 'কী বলতে চাচ্ছেন আপনি?'

'ওটাই সামনাসামনি বলতে চাচ্ছি আর কি।'

দ্বিধার মধ্যে পড়ে গেল সে, কিন্তু ফুজি তার কৌতূহল বাড়িয়ে দিয়েছে। 'ঠিক আছে, কোথায় আসবো আমি?'

ফুজি তাকে বললো যে হাসপাতাল থেকে খানিক হেঁটে গেলে ওগিকুবো স্টেশনের কাছে যে ক্যাফে রয়েছে সেখানে আসতে।

সেখানে গিয়ে নোরিকো দেখলো পেছনের একটা টেবিলে বসে আছে সে। অনেক চিকন হয়ে গেছে। তার পতঙ্গের চোখের মতো চোখদুটো ওকে ম্যান্টিসের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। ধূসর রঙের একটা স্যুট পরে আছে সে, জ্যাকেটটা চেয়ারের পেছনে রাখা।

'অনেক দিন পরে দেখা,' সামনাসামনি বসতে বসতে বললো নোরিকো।

'খুবই দুঃখিত এমন হুট করে ডাকার জন্য।'

'কী জন্য ডেকেছেন তা বলুন।'

'আগে কিছু খেয়ে নেওয়া যাক।'

'তার দরকার নেই। তাড়াতাড়ি যেতে হবে আমাকে। প্লিজ, যা বলার জলদি বলুন।'

'কথাগুলো আসলে অতটাও সহজ না।' ওয়েটারকে ডেকে দুধ চা অর্ডার করলো ফুজি। তারপর নোরিকোর দিকে তাকিয়ে হেসে বললো, 'আপনি চা খেতে পছন্দ করতেন না?'

নোরিকোর মনে নেই শেষবারের ডেটে সে কী অর্ডার দিয়েছিলো। কিন্তু ফুজির তা মনে আছে, আর সেই ব্যাপারটাই অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছে তাকে।

'আপনার মায়ের কী অবস্থা?' জিজ্ঞেস করলো নোরিকো, যাতে তাড়াতাড়ি কথায় আসতে পারে তারা।

কালো হয়ে গেল লোকটার মুখ, এরপর মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, 'কয়েক মাস আগে মারা গেছে।'

'ওহ, শুনে খারাপ লাগলো। তার অসুস্থতার কারণেই?'

'না, একটা দুর্ঘটনা ঘটেছিলো। শ্বাস আটকে গেছিলো তার।'

'ইশ, ব্যাপারটা মারাত্মক। যদিও খাবার খেতে গিয়ে শ্বাস আটকানোটা প্রায়ই শোনা যায়।'

'আসলে খাবার না...তুলা।'

'তুলা?'

'তার উপর থেকে দুমিনিটের জন্য চোখ সরিয়েছিলাম। তারপরেই দেখি পাশে থাকা তুলার বালিশ থেকে তুলা খাওয়া শুরু করেছে। কেন অমনটা করলো বুঝিতে পারিনি আমি। যখন ভেতর থেকে সব বের করলাম, তখন দেখি যে একটা সফটবলের সমান হয়ে গেছে ওটা। ভাবা যায়?'

মাথা ঝাঁকালো নোরিকো। *না, আমার আসলে বিশ্বাস হচ্ছে না যে এসব আমাকে বলছেন আপনি।*

'মনমরা হয়ে ছিলাম। বেশ কিছু দিন ভাবতেও পারছিলাম না যে কী করবো। কিন্তু এরপর একদিন মনে হলো, একধরনের মুক্তি পেয়েছি আমি। জানেন, এরপর আমি ভাবলাম যে আমাকে আর তার দেখাশোনা করার জন্য চিন্তা করতে হবে না।' দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো সে।

নোরিকো বুঝলো কেমন অনুভব করছে লোকটা। বয়স্ক আত্মীয়দের দেখাশোনা করতে গিয়ে পরিবারগুলোর অবস্থা কতটা শোচনীয় হতে পারে তা ভালোই জানা আছে ওর। কিন্তু তারপরও এসব তাকে কেন বলছে তার কারণ খুঁজে পেল না নোরিকো।

ওয়েটার এসে দুধ চা দিয়ে গেল টেবিলে। এক চুমুক দিতেই ভ্রু দুলিয়ে হাসলো ফুজি। 'অনেক দিন পর আপনাকে চা খেতে দেখলাম।'

টেবিলের দিকে চোখ নামিয়ে নিলো নোরিকো।

'মায়ের মৃত্যুর পরে আরেকটা চিন্তা মাথায় এসেছিলো আমার, যদিও আসাটা হয়তো ঠিক হয়নি,' বলতে লাগলো সে। 'আমার মাথায় আবার প্রেম করার চিন্তা আসে সে সময়। অন্য কারো সাথে না, কেবল আপনার সাথেই।'

'অনেক দিন হয়ে গেছে সেসবের।'

'কিন্তু আমি আপনাকে ভুলিনি। আর আপনার অ্যাপার্টমেন্টেও গেছিলাম আমি, মায়ের মৃত্যুর মাসখানেক বাদে। আর সে সময়ই আমি জানতে পারি যে আপনি আরেকজনের সাথে থাকছেন। কিছুটা ধাক্কার মতো ছিলো বিষয়টা। কিন্তু আরো অবাক হলাম যখন লোকটাকে আপনার সাথে দেখলাম।'

ভ্রু কুঁচকে তাকালো নোরিকো। 'অবাক হলেন? কেন?'

'কারণ আমি এর আগেও লোকটাকে দেখেছি।'

'অসম্ভব!'

'সত্যিই। তার নাম মনে নেই আমার, তবে চেহারা স্পষ্ট মনে আছে।'

'কোথায় দেখেছিলেন?'

'এখানে একটু কথা আছে। আমি ওর সাথে দেখা করিনি, কিন্তু তাকে দেখেছি। এই হাসপাতালেই এবং আপনার অ্যাপার্টমেন্টের কাছে।'

'কীহ!'

'গত বছরের এপ্রিলের সময়কার কথা। সত্যি বলতে, সে সময় আপনার মোহে পড়ে গেছিলাম। ফলে বিভিন্ন সময়ে হাসপাতালে যেতাম আপনাকে দেখতে, অথবা আপনার অ্যাপার্টমেন্টের আশেপাশে ঘুরঘুর করতে।'

'কোনো ধারণাই ছিলো না আমার এ ব্যাপারে।' মাথা ঝাঁকালো নোরিকো। বিষয়টা ভাবতেই ঘাড়ের কাছে থাকা কিছু লোম দাঁড়িয়ে গেল তার।

'কিন্তু একমাত্র আমিই যে আপনাকে দেখতে আসতাম তা না,' নোরিকোর প্রতিক্রিয়ার দিকে না তাকিয়ে বলতে লাগলো সে। 'সেও আপনাকে দেখতে আসতো। জানি শুনতে হাস্যকর শোনাবে, তবুও বলছি, লোকটাকে দেখলে কেন যেন আমার খারাপ মনে হতো। একবার ভেবেও ছিলাম আপনাকে বলবো বিষয়টা। কিন্তু কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম, তার উপর মায়ের ঐ অবস্থা। ফলে তেমন একটা সময় ছিলো না আমার হাতে, তাই সরিয়ে রেখেছিলাম বিষয়টা।'

'আপনি নিশ্চিত ওটা সে-ই ছিলো?'

'সে-ই যে আপনার সাথে এখন থাকছে।'

'অসম্ভব,' মাথা ঝাঁকিয়ে বললো নোরিকো। মুখটা টানটান হয়ে আছে তার, মনে হলো যেন প্লাস্টার মাস্ক পরে আছে সে। 'নিশ্চয়ই কোথাও ভুল হচ্ছে আপনার।'

'আমি নিশ্চিত যে আমি ঠিক দেখেছি। একবার দেখা মুখ কখনো ভুলি না আমি। ও-ই সেই লোক যাকে গত বছর দেখেছিলাম আমি,' আত্মবিশ্বাসের সাথে বললো ফুজি।

চায়ের কাপটা হাতে নিলো নোরিকো, কিন্তু মনে হলো না চা খাওয়ার অবস্থায় আছে সে। চিন্তার ঝড় বয়ে চলেছে মাথায়। 'অবশ্য, আপনার আশেপাশে ঘুরতো বলেই যে সে খারাপ হয়ে যায় এমন না। হয়তো আমার মতোই ছিলো সে, আপনার প্রেমে পড়ে গেছিলো, বুঝলেন তো। কিন্তু ঐ যেরকমটা বললাম, ওকে দেখলে কেন যেন একটা খারাপ ভাইব পেতাম। আর আপনাদের দুজনকে একসাথে দেখা–এই বিষয়টাও কেমন যেন দুশ্চিন্তার জন্ম দিচ্ছিলো আমার ভেতর। জানি এসবের কিছুতেই আমার নাক গলানো উচিত না। কিন্তু সেদিন আপনাকে দেখার পরে আমার মনে হলো কথাগুলো আপনাকে বলা উচিত।'

এই মুহূর্তে নোরিকোর মনোযোগ নেই লোকটার কথায়। তার কথাগুলোর মানে পরিষ্কার: আকিওশির সাথে ব্রেকআপ করে তার সাথে যেন প্রেম করে সে। কিন্তু

এসবের কিছুতেই তার ন্যূনতম আগ্রহ নেই। শুধু হাস্যকর যুক্তির কারণেই যে এমনটা হলো তেমন না, নোরিকো এখন ঐ মানসিক পরিস্থিতিতেই নেই।

ক্যাফে থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় নোরিকো কী বলেছিলো তার কিছুই মনে নেই তার। যখন সম্বিত ফিরে পেল, তখন রাস্তায় হাঁটছে সে। *এপ্রিল মাস*, এটাই তো বললো ফুজি। গত বছরের এপ্রিল মাস। এর কোনো মানে হয় না। মে মাসের আগে আকিওশির সাথে তার দেখাই হয়নি, আর তাদের দেখা হওয়াটা আকস্মিক ছিলো—না কি এটা সে নিজে ভাবছে?

আসলেই কি সবকিছু আকস্মিকভাবে হয়েছিলো? সেই রাতের কথা মনে পড়লো তার। পেটের ব্যথায় মরে যাচ্ছিলো আকিওশি। সে কি তার আসার জন্য অপেক্ষা করছিলো তবে? এই পুরো বিষয়টাই কি তবে অভিনয় ছিলো?

কেন?

যদি আকিওশির কোন উদ্দেশ্য থেকেও থাকে, তবে তাকেই কেন বেছে নিলো? ও তো দেখতে এতটাও সুন্দর না যে আকিওশি তার চেহারা দেখে প্রেমে পড়ে যাবে। তাই আরো কিছু চিন্তা তার মাথায় ঢোকাতে লাগলো নোরিকো। এটা কি এর জন্য যে সে একজন ফার্মাসিস্ট ছিলো? ত্রিশের উপরে অবিবাহিত থাকার কারণে? নাকি একা জীবনযাপন করার কারণে? নাকি ইমপেরিয়াল হাসপাতালে কাজ করার কারণে?

একটা চিন্তা মাথায় আসতেই দম ছাড়লো নোরিকো। সেই ঘটকালির প্রতিষ্ঠানে সে তার সব রকম ডিটেইলস দিয়ে দিয়েছিলো। যে-কেউ সেটাতে চোখ বোলালে তার সম্পর্কে জেনে যেতে পারতো। হয়তো আকিওশির হাতে কোনোভাবে তাদের সেই তথ্য চলে গেছিলো। সে না কম্পিউটারের একটা কোম্পানিতে কাজ করতো? সেই ঘটকালি প্রতিষ্ঠানের সাথে মেমোরিক্স যুক্ত ছিলো না তো আবার?

নোরিকো উপরের দিকে তাকাতেই দেখলো তার অ্যাপার্টমেন্টের কাছে চলে এসেছে সে। একটু কাঁপা কাঁপা অবস্থায় সিঁড়ি বেয়ে নিজের ইউনিটের সামনে এসে দাঁড়ালো। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলো, ফুজির বলা কথাগুলো কানে বাজছে এখনো। *যদি সত্যটা জেনে ফেলি, তবে এতে ভয়ের কিছুই নেই*, অন্ধকার অ্যাপার্টমেন্টের দিকে তাকিয়ে আপনমনেই বললো সে।

অধ্যায় চৌদ্দ

হাতুড়ি দিয়ে ঘন্টা বাজানোর মতো শব্দ টের পেল সে মাথার ভেতর: ডিং, ডিং, ডিং। এরপরেই অট্টহাসির শব্দ শুনতে পেল। আর তাতেই জেগে উঠলো সে। পর্দার ফাঁক দিয়ে সূর্যের সরু একটু আলো এসে দেয়ালে থাকা ওয়ালপেপারগুলোর গায়ে পড়ছে।

মাথা বালিশে রেখেই ঘাড়টা ঘুরিয়ে ঘড়ির দিকে তাকালো মিকা শিনোজুকা। লন্ডনে থাকতেই তার বাবা তাকে ঘড়িটা কিনে দিয়েছিলো। সাতটা ত্রিশে এলার্ম সেট করে রেখেছিলো সে। ওটা বেজে ওঠার এক মিনিট আগেই উঠে পড়েছে ঘুম থেকে। আর কিছুক্ষণ যদি শুয়ে থাকে, তবে বেশ সুন্দর একটা সুরে বেজে উঠবে ওটা, আর ভেতর থেকে একটা পুতুলের মতো বস্তু বের হয়ে নাচতে শুরু করে দেবে। হাত বাড়িয়ে এলার্মটা বন্ধ করলো সে। বিছানা ছেড়ে উঠে পর্দাটা সরিয়ে দিলো। বড় জানালাটা দিয়ে সূর্যের আলো ঠিকরে ঢুকে পড়লো ভেতরে, আলোকিত করে দিলো তার রুমের প্রত্যেকটা কোনা। ড্রেসারের আয়নায় নিজেকে একবার দেখলো সে—পায়জামায় ভাঁজ পড়ে আছে, চুলগুলো এলোমেলো, মুখ বিবর্ণ হয়ে আছে।

'ডিং' শব্দটা আবার বাজলো তার মাথায়। এরপরই কারো গলার আওয়াজ শুনলো সে, ভালোভাবে বোঝা যাচ্ছে না যদিও। ওরা কী নিয়ে কথা বলছে তা জানা আছে ওর, যদিও এরপরই তার আগ্রহ কমে গেল বিষয়টায়।

জানালার কাছে চলে গেল মিকা, বড় লনটার দিকে তাকালো। ঘাসগুলো এখনো সবুজই আছে, তবে ধূসর হচ্ছে ধীরে ধীরে। যেমনটা সে ভেবেছিলো; তার বাবা ইউকিহোকে গলফ খেলা শেখাচ্ছে।

গলফ ক্লাবটা দুহাতে ধরে দাঁড়িয়ে আছে ইউকিহো। এরপরই তার বাবা ইউকিহোর পেছন থেকে তাকে জড়িয়ে ধরার মতো করে হাতদুটো ধরেছে। অনেকটা কমেডি রুটিনের মতো যেখানে একজনের হয়ে অন্যজনে হাত নাড়ায়। তার বাবা ইউকিহোর কানে কানে কী যেন বললো, তারপর দুজনেই একসাথে ক্লাবটা চালালো। বলটা সজোরে আঘাত পাওয়ার কারণে প্রথমে উপরে উঠে এরপর নামতে লাগলো ধীরে ধীরে। দেখে মনে হলো তার বাবার ঠোঁটটা বুঝি ইউকিহোর ঘাড় ছুঁয়ে যাচ্ছে—এতটাই কাছাকাছি আছে সে। বস্তুত, দেখে মনে হচ্ছে এর আগেও ইচ্ছা করেই দুয়েকবার ঠোঁট ছুঁইয়েছে সে।

কয়েকবার দুজনে একসাথে ক্লাব চালানোর পরে তার বাবা কিছুটা পেছনে চলে গেলে ইউকিহো একাই চালালো ক্লাবটা। *ডিং।* দুয়েকবার বলে লাগলেও বেশিরভাগ সময়ই মিস করলো সে। এরপরই লাজুক চেহারা নিয়ে মিকার বাবার দিকে

তাকাচ্ছে, আর তার বাবা আরো কিছু উপদেশ দিচ্ছে তাকে। এরপর আবার সেই কমেডি রুটিনের মতো করে শুরু থেকে খেলতে থাকে দুজনে। একেকদিন করে প্রায় আধা ঘণ্টা চলে এই খেলা।

গত এক সপ্তাহ ধরে প্রায় প্রত্যেক দিনই এরকমটা চলে আসছে। মিকার বুঝে আসে না ইউকিহো নিজ থেকে পদাক খেলার প্রতি আগ্রহ দেখিয়েছে, নাকি তার বাবাই তাকে ঠেলেঠুলে দিয়ে গেছে। তবে বোঝা যাচ্ছিলো যে এই দুজন নিজেদের সর্বোচ্চটা দিয়ে এমন কিছু একটা খুঁজে চলেছে যাতে দম্পতি হিসেবে কিছুটা বিনোদন পেতে পারে তারা।

যদিও মিকার মা যখন একবার বলেছিলো সে-ও শিখতে চায় খেলাটা, তখন তার বাবা মুখের উপর না করে দিয়েছিলো।

জানালার পাশ থেকে সরে এসে ড্রেসারের সামনে দাঁড়ালো মিকা, নিজের পনেরো বছর বয়সি শরীরটার দিকে তাকালো। বেশ পাতলা সে, নারীসুলভ কোনো ভাঁজ শরীরে পড়েনি এখনো। হাত-পাগুলো বেশ লম্বা, আর কাঁধটাও বেশ চোখা হয়ে বেরিয়ে আছে। মাথার ভেতরে কল্পনার চোখ দিয়ে নিজেকে ইউকিহোর মতো শরীরে দেখতে লাগলো সে। কেবল একবার ইউকিহোকে উলঙ্গ দেখেছিলো সে। ঐ সময় ভুল করে বাথরুমের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়েছিলো। ভেবেছিলো ভেতরে কেউ নেই। গোসল সেরে মাত্র বেরিয়েছিলো ইউকিহো কোনো টাওয়েল বা সেরকম কিছুই গায়ে জড়ানো ছিলো না তার।

একদম নিখুঁত একটা শরীর তার। এতটাই যে মিকার মনে হয়েছিলো কোনো কম্পিউটারে তৈরি করা হয়েছে বুঝি তার শরীরটা। কুমাররা মাটি দিয়ে কিছু বানানোর সময় তাতে যে মায়া অনুভব করা যায়, সেই একই মায়া আছে ওর মাঝেও। তার বুকের উপরে থাকা মাংসপিণ্ডটা তখনো বেশ শক্ত ছিলো, আর গোলাপি সাদা চামড়ার উপরে ফোঁটায় ফোঁটায় জমে ছিলো জলকণা। যতটুকু চর্বি তার শরীরে ছিলো তা যেন তার শরীরটাকে সুন্দর আকৃতি দেওয়ার জন্যই ছিলো। হাঁ করে তাকিয়ে ছিলো মিকা। ঐ কয়েকটা মুহূর্তেই ইউকিহোর শরীরটা ওর মাথার ভেতর গেঁথে যায় পুরোপুরি।

ইউকিহো স্বাভাবিকভাবেই নিয়েছিলো বিষয়টা। রাগ বা অসন্তুষ্টির কোনো চিহ্ন তার চেহারায় ছিলো না।

'হ্যালো, মিকা,' বলেছিলো সে। 'গোসলে যাচ্ছো?' হেসে হেসে কথা বলছিলো সে, নিজেকে আবৃত করার কোনো চেষ্টা তার মধ্যে ছিলো না।

মিকাই আর ধৈর্য রাখতে পারেনি। ঘুরে চলে আসে কোনো কিছু না বলে। দৌড়ে তার রুমে ঢুকে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে সে। হৃৎপিণ্ডটা আরেকটু হলেই খাঁচা ছেড়ে বেরিয়ে আসছিলো সেদিন।

পেছনের বিব্রতকর এই পরিস্থিতির কথা মনে করে ভ্রু কুঁচকালো মিকা। আয়নায় থাকা প্রতিবিম্বটাও তাই করে উঠলো। চিরুনি তুলে নিয়ে মাথায় আঁচড় দিতে শুরু করলো সে, আর চিরুনিটা আটকে যাওয়ার আগ পর্যন্ত দিতেই থাকলো। জোরে টান দিয়ে ওটা বের করার চেষ্টা করলো সে, সফলও হলো, তবে দুচারটা চুলের জান চলে গেল তাতে।

দরজার কড়া নাড়ার শব্দ শুনতে পেল সে। 'মিকা? উঠেছ তুমি? গুড মর্নিং।'

জবাব দিলো না মিকা, তিনবার কড়া নাড়ার পরে তায়েকোর মুখটা ভেতরে ঢুকতে দেখলো সে। 'ওহ, জেগেই আছো দেখছি।' বলেই ভেতরে ঢুকলো সে। এরপর চটজলদি বিছানা গোছাতে শুরু করে দিলো।

মিকা তাকালো তার দিকে। পুরোনো মুভিতে যেরকম কাজের বুয়া দেখা যায় ঠিক সেরকমই সে: মোটা শরীর, কোমরে বড় একটা অ্যাপ্রোন গোঁজা, সোয়েটারের হাতা গোটানো, চুলগুলো খোঁপা করে বাঁধা।

'আরো ঘুমাতে চেয়েছিলাম, কিন্তু শব্দের কারণে পারিনি।'

'শব্দ?' কৌতূহলী চোখে চেয়ে বললো তায়েকো। এরপর মাথা দোলালো। 'ওহ, তোমার বাবা। হ্যাঁ, আজকাল বেশ সকাল সকালই উঠছেন তিনি।'

'ফালতু লাগে। কেন এত সকালে উঠবে মানুষ?'

'আসলে দুজনেই খুব ব্যস্ত তারা, জানো তো। আর এই সময়টাতেই কেবল একসাথে থাকতে পারে। আর তাছাড়া, ব্যায়াম করা শরীরের পক্ষে ভালো।'

'কই, মা বেঁচে থাকতে তো কখনো এমন দেখিনি তাকে।'

'সময়ের সাথে সাথে মানুষ পরিবর্তিত হয়, মিকা।'

'পরিবর্তন? কীভাবে? মানে অল্পবয়সি মেয়েদের বিয়ে করে? মায়ের থেকে দশ বছরের ছোট সে।'

'মিকা, তোমার বাবার ততটাও বয়স হয়নি। উনি তো আর সারা জীবন একা থাকতে পারবেন না, তাই না? তোমার বিয়ে হলে তুমি চলে যাবে। তোমার ভাইও ছেড়ে যাবে একটা সময় পরে।'

'ফালতু কথা বোলো না। প্রথমে বলছো বুড়িয়ে গেলে পরিবর্তিত হয়ে যায় মানুষ, আবার বলছো এখনো তার বয়স কম।'

ভ্রু কুঁচকে তাকালো তায়েকো। 'নিচে এসো তাড়াতাড়ি। সকালের নাস্তা রেডি করা হয়ে গেছে। তোমার বাবা বলেছেন, তুমি যদি এরকম লেট করতে থাকো, তবে আর সকালবেলা নামিয়ে দিয়ে আসবেন না।'

ফিক করে হাসলো মিকা। 'আমি জানি এটা কার বুদ্ধিতে করেছে সে।'

তায়েকো কিছু না বলে চলে যেতে নিলো, কিন্তু দরজা পুরোপুরি লাগানোর আগে মিকা থামালো তাকে। 'তুমি তো আমার পক্ষে, না?' জিজ্ঞেস করলো সে।

এক মুহূর্তের জন্য তাকিয়ে থেকে হেসে দিলো তায়েকো। 'আমি সন্ধ্যার পরেই, সোনামণি।' বলেই দরজাটা বন্ধ করে দিলো সে।

***

মিকা স্কুলের জন্য রেডি হয়ে নিচে নামতেই দেখলো সকালের খাবারের জন্য সবাই বসে পড়েছে টেবিলে। তার বাবা আর ইউকিহো তার মুখোমুখি বসেছে, অন্য দিকে তার ছোট ভাই মাসাহিরো বসেছে ইউকিহোর পাশে। পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ে সে।

'আমি যে কী করছি তার কিছুই বুঝতে পারছি না,' বলতে লাগলো ইউকিহো। 'অন্তত ড্রাইভারটা ঠিকমতো চালানো শিখতে হবে, নইলে তো কোর্সে গিয়ে খেলার সময় ঝামেলা পাকিয়ে ফেলবো।'

'আরে অত চিন্তার কিছু নেই। দেখে যতটা কঠিন মনে হয়, ততটাও কঠিন না। আর তুমি বলেছ অন্তত, কিন্তু সত্যিটা হলো, ড্রাইভার চালানোটাই সবচেয়ে কঠিন। ওটাকে বাগে আনতে পারলে পানির মতো সহজে খেলতে পারবে। প্রথম যেটা করতে হবে তা হলো, একবার গলফ মাঠে গিয়ে চেষ্টা করে দেখতে হবে।'

'জানি না, বেশ টেনশন হচ্ছে,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো ইউকিহো। মিকার দিকে তাকালো সে এরপর। 'আরে মিকা যে! গুড মর্নিং।'

মিকা কোনো জবাব না দিয়ে বসে পড়লো চেয়ারে। তার বাবা তার দিকে আগুন চোখে তাকিয়ে বললো, 'গুড মর্নিং।'

বিড়বিড় করে মিকা এবার জবাব দিলো, 'গুড মর্নিং।' হ্যাম, ডিম, সালাদ ইত্যাদি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে টেবিলের উপর।

'এক মিনিট দাঁড়াও, মিকা, তোমার স্যুপ নিয়ে আসছি আমি,' কিচেন থেকে বলে উঠলো তায়েকো। শুনে মনে হলো কোনো কিছু নিয়ে বেশ ব্যস্ত আছে সে।

কাটাচামচটা হাত থেকে নামিয়ে রেখে দাঁড়িয়ে গেল ইউকিহো। 'সমস্যা নেই, আমি নিয়ে আসছি।'

'স্যুপ লাগবে না আমার,' সামনে থেকে রুটি নিয়ে এক কামড় বসিয়ে দিয়ে বললো মিকা। এরপর মাসাহিরোর সামনে থেকে দুধের গ্লাসটা ছোঁ মেরে নিয়ে এক ঢোক গিললো সে।

'এই, ওটা আমার!'

'কিপ্টামি করবি না।' নিজের কাটাচামচটি তুলে নিয়ে মাংসে ঢোকালো মিকা। এরমধ্যেই স্যুপ নিয়ে এলো ইউকিহো। 'বলেছিলাম তো লাগবে না আমার,' মাথা না তুলেই বললো সে।

'কেউ তোমার জন্য কিছু করলে তাকে এভাবে বলতে হয় না,' বলে উঠলো তার বাবা।

'সমস্যা নেই,' স্বামীকে উদ্দেশ করে বললো ইউকিহো। একটা নীরবতা নেমে এলো টেবিলে।

খাবারের কোনো স্বাদই পাচ্ছে না মিকা। তায়েকোর বানানো মাংস বা ডিম কোনোটাতেই না। অথচ ওগুলো তার পছন্দের খাবার ছিলো এককালে। কিন্তু এখন খেতেও কেমন যেন ভালো লাগে না আর। পেটের উপরে বুকের নিচটায় ব্যথা করে বেশ।

'তো, কোনো প্ল্যান আছে আজ রাতে?' কফিতে চুমুক দিয়ে ইউকিহোকে উদ্দেশ করে জিজ্ঞেস করলো তার বাবা।

'বিশেষ কিছু তো নেই।'

'তাহলে আজ রাতে ডিনারে যাওয়া যাক, আমরা চারজন আর কি। ইওতসুইয়াতে আমার এক বন্ধু ইতালিয়ান রেস্টুরেন্ট খুলেছে। বেশ কদিন ধরেই যেতে বলছিলো সেখানে।'

'ইতালিয়ান? ভালোই তো হলো তবে।'

'তোমরাও যাবে বাচ্চারা। কোনো শো-টো দেখতে চাইলে ভিসিআর আছে, তাতে দেখতে পারবে।'

'দারুণ,' বললো মাসাহিরো। 'তাহলে স্ন্যাক কমিয়ে খাবো আজকে।'

আড়চোখে মাসাহিরোর দিকে তাকালো মিকা। 'আমি যাবো না।' বুঝতে পারলো টেবিলের অপর পাশ থেকে দুই জোড়া চোখ তার দিকে তাকিয়ে আছে।

'কেন না?' জিজ্ঞেস করলো তার বাবা। 'তোমার রাতে কাজ আছে নাকি? আজকে তো কোনো পিয়ানো লেসনও নেই যে সেখানে যাবে। টিউটরও আসবে না।'

'যেতে চাচ্ছি না। এটা কি বাধ্যতামূলক নাকি?'

'কেন যেতে চাচ্ছো না?'

'তাতে কী আসে যায়?'

'আসে যায়। দেখো, যদি তোমার কিছু বলার থাকে তো খুলে বলো, আমি শুনতে চাই...'

'এই...' বলে উঠলো ইউকিহো। 'আসলে হয়তো আজকে যাওয়াটা ভালো হবে না। এইমাত্র মনে পড়লো, কিছু কাজ করতে হবে আমাকে।' তার বাবা চোখ তুলে তাকালো ইউকিহোর দিকে, এরপর চুপ মেরে গেল।

ইউকিহো ওর পক্ষ নিয়ে কথা বলায় মেজাজ বিগড়ে গেছে মিকার। হাতের চামচটা ছুঁড়ে মেরে দাঁড়িয়ে গেল সে। 'যেতে হবে আমাকে।'

'মিকা!'

বাবাকে এড়িয়ে গিয়ে ব্যাগ আর জ্যাকেটটা নিয়ে হলরুমের দিকে চলে এলো মিকা। জুতো পরছিলো, এমন সময়ে তার পেছনে এসে দাঁড়ালো ইউকিহো আর তায়েকো।

'এত তাড়াহুড়ো করো না, গাড়ির নিচে পড়বে,' বললো তায়েকো।

একটু ঝুঁকে নিচে রাখা জ্যাকেটটা তুলে নিলো ইউকিহো। কোনো উচ্চবাচ্য না করে ছোঁ মেরে ওটা নিয়ে নিলো মিকা। হাতার মধ্য দিয়ে হাত ঢুকিয়ে ফেলেছে, এমন সময় ইউকিহো তায়েকোকে উদ্দেশ করে বললো, 'নীল সোয়েটারটা খুব সুন্দর। দেখতে বেশ কিউট লাগে।'

'আসলেই খুব কিউট লাগে,' তায়েকোও স্বীকার করলো। 'আজকাল ওরা স্কুল ড্রেসগুলোকে বেশ স্টাইলিশ করে বানাচ্ছে। আমাদের সময়ে তো এমন একটা দেওয়া হতো যেটা পছন্দ না করলেও পরতে হতো আমাদের।'

মিকা টের পেল বুকের ভেতর থাকা রাগটা বাড়ছে তার, যদিও সে জানে না কেন। সোয়েটারটা খুলে ফেললো সে। ইউকিহো আর তায়েকোকে বোকা বানিয়ে দিয়ে রালফ লরেনের সোয়েটারটার উল টেনে টেনে বের করে ওটাকে ছুঁড়ে ফেললো মেঝেতে।

'মিকা! কী করছো তুমি?' জিজ্ঞেস করলো তায়েকো।

'আর পরবো না ওটা আমি।'

'ঠান্ডা লেগে যাবে তোমার।'

'লাগুক গে।'

তার বাবা পেছন থেকে এসে জিজ্ঞেস করলো, 'আবার কী হলো তোমার?'

'কিছু না, গেলাম আমি।'

'থামো, মিকা!' বলে উঠলো তায়েকো।

পেছন থেকে রাশভারি কণ্ঠে তার বাবা বলে উঠলো, 'যেতে দাও।'

***

দুই পাশে ছোট ছোট গাছ দিয়ে ঘেরা লম্বা রাস্তাটা একেবারে গেট পর্যন্ত চলে গেছে। এই জায়গাটা মিকার সবথেকে প্রিয় একটা জায়গা। মাঝে মাঝে এ রাস্তাটায় পড়িমরি করে হাঁটে সে। গাছ দেখে, ফুল দেখে, ঋতু পরিবর্তন হয়েছে কি না তাও দেখে। কিন্তু আজকে কেন যেন তার মনে হচ্ছে মুক্তি আর তার মাঝখানে বেশ দূরত্ব তৈরি হয়েছে।

মিকা বলতে পারছে না কোন জিনিসটা তাকে এত ভাবাচ্ছে। প্রত্যেকবার যখন ইউকিহোর সাথে মেজাজ খারাপ হয় তার, তখন একটা আওয়াজ ভেতর থেকে তাকে উদ্দেশ করে বলে, 'তুমি কি পাগল হয়ে গেছ?' আর সে এর জবাবে বলে, 'না। আমি জানি না। আমার শুধু রাগ হচ্ছে অনেক।'

ইউকিহোর সাথে তার প্রথম দেখা হয় গত বসন্তে, যখন তার বাবা তাকে আর তার ভাইকে দক্ষিণ আওইয়ামাতে ইউকিহোর বুটিক শপে নিয়ে গেছিলো। তার মনে আছে দরজা দিয়ে একজন মহিলাকে আসতে দেখে সে ভেবেছিলো, 'ওয়াও, কত সুন্দর!' তার বাবা ইউকিহোকে উদ্দেশ করে বলে যে তার বাচ্চাদের জন্য কিছু কাপড়চোপড় লাগবে, আর সাথে সাথেই ইউকিহো তার কর্মীদের আদেশ করে একটার পর একটা কাপড় দেখাতে। অন্য আর কোনো কাস্টমার সে সময় ছিলো না দোকানে। মনে হচ্ছিলো কোনো প্রাইভেট বুটিকে ঢুকেছে তারা। ইউকিহো তাদেরকে ফ্যাশন মডেলের মতো করে একটার পর একটা পোশাক পরিয়ে আয়নার সামনে দেখিয়েই যাচ্ছিলো। মাসাহিরো আধা ঘণ্টা বাদে হাল ছেড়ে দিয়ে বলে যে সে ক্লান্ত হয়ে গেছে পোশাক পালটাতে পালটাতে।

কিন্তু মিকার মনে হয়েছিলো তার স্বপ্ন সত্যি হয়ে গেছে। অথবা হতো, যদি ওর মাথায় এটা না আসতো যে কে এই ইউকিহো আর তার বাবার সাথেই বা তার কী সম্পর্ক। একটা পার্টি ড্রেস পিক করার সময়ই মিকার সন্দেহ হতে শুরু করে যে ইউকিহো শুধু তার বাবা না, হয়তো তাদের সবার সাথেই কোনো একটা সম্পর্ক স্থাপন করতে চলেছে।

'তোমরা তো পারিবারিকভাবেই বিভিন্ন পার্টিতে যাওয়া-আসা করো, তাই না, ইয়াসুহারু?' বলেছিলো ইউকিহো। 'এই ড্রেসটা নিয়ে যাও ওর জন্যে। এতে করে অন্য পরিবারগুলোর চেয়ে বেশি সম্মান পাবে তোমরা।'

ইউকিহো যে তার বাবাকে ইয়াসুহারু বলে ডাকলো সেটা মিকার পছন্দ হয়নি। শুনে মনে হচ্ছে যেন ওরা খুব কাছের বন্ধু। এছাড়া, ওর মাধ্যমে অন্য পরিবারগুলোর সম্মান আদায়ের ব্যাপারে যা বললো সেটাও পছন্দ হয়নি তার। তবে যে জিনিসটা তাকে বেশি পীড়া দিচ্ছিলো তা হলো, পরের কোনো পারিবারিক পার্টিতে হয়তো ইউকিহো তাদের সাথেই থাকবে।

এরপরেই আলোচনা চলে যায় ওরা কী কিনবে সেদিকে। মিকা পছন্দ করতে পারছিলো না। সত্যি বলতে, ও সবগুলোই নিতে চাচ্ছিলো। 'তুমি বেছে দাও, বাবা,' বলে ওঠে সে। 'যেকোনোটা হলেই হবে আমার।'

'আমার জন্য তো এই কাজ ভীষণ কঠিন,' তার বাবা অভিযোগ করে বসে। তারপরও কিছু পোশাক বেছে নেয় সে। পোশাকগুলো বেশ দামি ছিলো। ছোট বাচ্চাদের লম্বা স্কার্টওয়ালা ড্রেস–তার মা যেরকমটা পছন্দ করতো, অনেকটা সেরকম। মিকার মা কখনোই তাকে পুতুলের বাইরে কিছু ভাবেনি, আর এজন্য সব সময়ই বিভিন্ন পোশাক পরিয়ে দিতে পছন্দ করতো সে। বাবার যে সেগুলো মনে আছে এখনো, এটা দেখে ভালো লাগলো তার।

বাছাই করার পর তার বাবা ঘুরে ইউকিহোকে জিজ্ঞেস করে যে সে কী ভাবছে। বুকে হাত বেঁধে দাঁড়ায় ইউকিহো। 'আমার মনে হয় আরেকটু উজ্জ্বল কিছুতে ওকে আরো বেশি ভালো মানাবে, আরো বেশি সতেজ দেখাবে।'

'সত্যি? তুমি কোনটা দেখতে বলো তবে?' মিকার বাবা জিজ্ঞেস করলো।

'উমম...' বললো ইউকিহো। এরপর কয়েকটা পোশাকের দিকে আঙুল উঁচিয়ে দেখালো। সেখানের সবগুলো পোশাকই ছিলো টাইট-ফিটিং, সাথে ছোট স্কার্ট।

'মিডল স্কুলে পড়ে সে এখনো,' বাবা বললো। 'এগুলো একটু বেশিই হয়ে যায় না ওর জন্য?'

হাসলো ইউকিহো। 'হাহ, সে তোমার ধারণার থেকেও অনেক বড় হয়ে গেছে।'

'তা তো জানতাম না,' মাথা চুলকে বললো তার বাবা। এরপরে মিকাকে জিজ্ঞেস করলো সে কী ভাবছে।

মিকা তার বাবার উপরে সিদ্ধান্তের ভার ছেড়ে দিলে ইয়াসুহারু ইউকিহোর দেখানো পোশাকগুলো থেকে একটা কিনে নেয়। সাথে এও বলে যে যদি খারাপ দেখায়, তবে এর দায়ভার ইউকিহোর।

'চিন্তার কিছু নেই।' বলেই মিকার দিকে তাকিয়ে হাসে ইউকিহো। 'তোমাকে আর পুতুল হয়ে থাকতে হবে না, সোনা।'

মিকার মনে হয়েছিলো শব্দগুলো বুঝি কোনো জুতো, যেগুলো পরে তার হৃদয়ে কেউ জোরে জোরে আঘাত করছে, ভুলিয়ে দিতে চাইছে তার মায়ের স্মৃতি। পেছনের এই কথা ভাবতেই মনে হলো সেই থেকেই ইউকিহোকে ঘৃণা করে সে। এরপরে একদিন তার বাবা তাদেরকে নিয়ে ইউকিহোর সাথে খেতে যায়। পরে আবার লং ড্রাইভেও গেছিলো তারা। মিকা ভাবতে থাকে যে ইউকিহোর সাথে থাকলে তার বাবা বেশ হাসিখুশি থাকে। অন্যদিকে, তার মায়ের সঙ্গে যখন কোনো ট্রিপে যেত ওরা, তখন চুপচাপ হয়ে থাকতো বাবা। মনে হতো যেন তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে সবকিছু করছে। অথচ ইউকিহোর সাথে থাকলে কথা বলা থামায় না পর্যন্ত। সব সময় জানতে চায় ইউকিহো কী ভাবছে, সেই সাথে ইউকিহো যা বলে তাই করে। মিকার কাছে তার বাবাকে কাপুরুষ মনে হতে থাকে।

জুলাই মাসের কোনো এক দিন তার বাবা তাদেরকে ব্যাপারটা জানায়। কোনো আলোচনা বা অভিমত নেওয়ার চেষ্টা করেনি। স্রেফ জানিয়ে দিয়েছেঃ ইউকিহোকে বিয়ে করতে যাচ্ছে সে। খবরটা শুনে মাসাহিরোর কোনো প্রতিক্রিয়া ছিলো না। ছেলেটা না তো খুশি হয়েছিলো, আর না তো দুশ্চিন্তা করছিলো। মিকার মনে হয়েছে এটা আসলে তার কাছে বড় কোনো বিষয় না। কারণ মা যখন মারা যায়, ওর বয়স তখন মাত্র চার।

মিকা সত্যিটাই বলে দেয় সে সময়। বলে দেয় তার একমাত্র মা সে-ই যে কিনা সাত বছর আগে মারা গেছে।

'তা ঠিক আছে,' তার বাবা তাকে উদ্দেশ করে বলে। 'আমি বলছি না তোমার মাকে ভুলে যেতে। শুধু বলছি যে নতুন একজন মানুষ আমাদের সাথে এসে থাকবে, পরিবারের নতুন একজন সদস্য হিসেবে।'

চুপ করে ছিলো মিকা, কিন্তু ভেতরে ভেতরে চিৎকার করে বলতে থাকে, *ও এই পরিবারের কেউ না!*

এই জগদ্দল পাথরটা মিকার বুকের মধ্যে একবার চেপে বসার পর থেকে আর যেতেই চায়নি। সবকিছু এরপর এমনভাবে হতে থাকে, যেভাবে মিকা কখনো চায়নি। তার বাবা ইউকিহোর পাশে গিয়ে দাঁড়ালে সে ঘৃণা করতে শুরু করে তার বাবাকেও। সে ইতোমধ্যেই ছোট হয়ে গেছে তার মেয়ের চোখে। একজন কাপুরুষ...আর এর সব দায়ভার ইউকিহোর।

যদি কেউ তাকে জিজ্ঞেস করে যে ইউকিহোর কোন জিনিসটা সে অপছন্দ করে, মিকার পক্ষে সেটার নাম বলাটা কঠিন হয়ে পড়বে। এ কেবলই একটা অনুভূতি, অনেকটা পেটের মধ্যে দলা-পাকানো কোনো মাংসপিণ্ডের মতো। হ্যাঁ, অস্বীকার করার কোনো অবকাশ নেই যে ইউকিহো দেখতে সুন্দরী এবং স্মার্ট। এদিক দিয়ে মিকা তাকে সম্মান করে। বুদ্ধিমান ব্যবসায়ী সে। তার সমবয়সি আর কোনো মহিলা এরকম দুই দুটো বুটিক শপ চালায় কি না মিকার জানা নেই। কিন্তু যখনই তার আশেপাশে ইউকিহো থাকে, তখনই একধরনের অনুভূতি কাজ করে তার মাঝে। ভেতর থেকে কেমন যেন একটা অনুভূতি জাগে যে এখন তটস্থ থাকতে হবে তাকে। কিছু একটা রয়েছে এই ইউকিহোর মধ্যে...একধরনের আবরণ, যেটা এর আগে কখনোই টের পায়নি সে। ও যেন অনেকটা সূর্যের মতো, তার বাবাসহ সব কর্মী তাকে ঘিরে ঘোরে, কিন্তু কোনো রকম উষ্ণতা সে ছড়ায় না। যা ছড়ায় তা হলো অশান্তি।

মিকা স্বীকার করে যে এই ভাবনাগুলো তার কল্পনা ছাড়া আর কিছুই না। কিন্তু এসব যদি ভ্রম হয়েও থাকে, তবুও তার পক্ষে একজন ছিলো। সে হলো তার বাবার চাচাতো ভাই কাজুনারি শিনোজুকা। বাবা বিয়ের ঘোষণা দেওয়ার পর থেকেই একবার-দুবার করে বাসায় আসে কাজুনারি। ওদের আত্মীয়দের মধ্যে কেবল কাজুনারিই এই বিয়ের বিপক্ষে ছিলো।

'তুমি জানো না সে কীরকম মানুষ,' কাজুনারিকে একবার বলতে শুনে ফেলেছিলো মিকা। 'এতটুকু বলতে পারি যে সে এমন মানুষদের কাতারে পড়ে না যারা সবার প্রথমে পরিবারের ভালোর কথা চিন্তা করে।' বেশ সিরিয়াস হয়েই কথাগুলো বলেছিলো সে। কিন্তু বাবা তার কথায় কান দেয়নি। আর সময়ের সাথে

সাথে কাজুনারিকে এড়িয়ে যেতে শুরু করে সে। মিকা কয়েকবার দেখেছে কাজুনারি ফোন করলে বাবা বাড়িতে না থাকার ভান করে।

এর মাসখানেক বাদেই বিয়ের অনুষ্ঠান হয়। তেমন আহামরি কোনো অনুষ্ঠান ছিলো না, আর রিসিপশনও ছিলো অনেক পুরোনো আমলের মতো। কিন্তু ওদের দুইজনকে দেখে সুখী মনে হয়েছিলো–উপস্থিত আর সবার মতোই। একমাত্র মিকা বাদে। সে মনমরা হয়ে এই হৃদয়বিদারক ঘটনাটা দেখতে থাকে। এ এমন এক ভুল যার কখনো প্রায়শ্চিত্ত হবে না।

আর তারপর থেকে তারা তাদের নতুন মায়ের সাথে থাকতে শুরু করে। বাইরে থেকে দেখলে মনে হতো কোনো পরিবর্তনই হয়নি শিনোজুকা পরিবারের। কিন্তু মিকা টের পেতে শুরু করে যে বিভিন্ন জায়গায় পরিবর্তন হচ্ছে। তার আসল মায়ের একটার পর একটা স্মৃতি যেন সরিয়ে ফেলা হচ্ছিলো। ওদের দৈনন্দিন জীবনেরও পরিবর্তন হচ্ছিলো ধীরে ধীরে। আর সবচেয়ে বাজে যেটা ছিলো তা হলো, ওদের বাবাই পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছিলো।

তার আসল মা ফুল পছন্দ করতো। দরজার পাশে, হলঘরে, রুমের কোনায় কোনায় মৌসুমি ফুল এনে রাখতো সে। এখনো সেখানে ফুল আছে, আর সেগুলো তার মায়ের রাখা ফুলের থেকেও বড় এবং সুন্দর–চোখ জুড়িয়ে যায় দেখলে এমন। কিন্তু সেগুলোর একটাও আসল ফুল না। ওগুলো কাপড় দিয়ে বানানো কৃত্রিম ফুল।

এই পরিবারটাও ওরকমই হয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে, ভাবলো মিকা। *পরিণত হচ্ছে একটা কৃত্রিম ফুলে।*

***

উরায়াসুতে তোজাই সাবওয়ে থেকে নেমে কাসাইবাশি স্ট্রিট ধরে টোকিওর দিকে হাঁটা ধরলো সাসাগাকি। একটু এগিয়ে বামে যেতেই পুরোনো এডোগাওয়া নদীটা পড়লো তার সামনে। সরু রাস্তাটার মুখেই সাদা রঙের নিখুঁত, বর্গাকার বাড়িটা দেখলো, যেটার সামনে সাইনবোর্ড দিয়ে বড় করে লেখাঃ S H RESIN। কোনো পাহারাদার না থাকায় গলির ভেতরে গেল সাসাগাকি। গাড়ির রাখার জায়গায় যেখানে ট্রাক রাখা আছে সেই স্থানটা পার করে ভেতরে ঢুকলো সে। ডানে তাকাতেই দেখলো ছোট্ট একটা রিসিপশনের সামনে একজন চল্লিশ বছর বয়স্ক নারী কিছু একটা লিখছে। সাসাগাকিকে দেখতে পেয়ে মাথা তুলে ভ্রু কুঁচকালো মহিলা। বিজনেস কার্ডটা এগিয়ে দিলো সাসাগাকি, বললো কাজুনারি শিনোজুকার সাথে দেখা করতে চায় সে। কার্ডটা দেখার পরেও মহিলার চেহারার কোনো পরিবর্তন হলো না।

'ডিরেক্টর স্যারের সাথে দেখা করার জন্য কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়েছিলেন?' জিজ্ঞেস করলো সে।

'ডিরেক্টর?'

'কাজুনারি শিনোজুকা। আমাদের ডিরেক্টর তিনি।'

'ওহ, আচ্ছা। হ্যাঁ, ফোন করেছিলাম আসার আগে।'

'দাঁড়ান একটু।' পাশ থেকে ফোন তুলে কাকে যেন ডায়াল করলো সে। কয়েক সেকেন্ড বাদে কী যেন বলাবলি সেরে রিসিভার নামিয়ে তাকালো সাসাগাকির দিকে। 'তিনি বলেছেন সরাসরি তার অফিসে চলে যেতে।'

'আচ্ছা। কোথায় সেটা?'

'তিন তলায়।' বলেই আবারো লেখায় মনোযোগ দিলো সে।

সাসাগাকি ভালো করে তাকিয়ে দেখলো নতুন বছরের শুভেচ্ছা কার্ড লিখছে মহিলা। ডেস্কের পাশে ব্যক্তিগত অ্যাড্রেস বুক দেখে মনে হলো না কোম্পানির পক্ষ থেকে লিখছে সে।

'তিন তলার কোথায়?' জিজ্ঞেস করলো সাসাগাকি।

কিছুটা বিরক্ত দেখালো এবার মহিলাকে। কলমের ডগা দিয়ে ইশারা করে বললো, 'এলিভেটর ওদিকে। হল দিয়ে সোজা হাঁটতে থাকবেন, তারপর একসময় দরজায় লাগানো *ডিরেক্টরের অফিস* নামক সাইন দেখতে পাবেন।'

'আচ্ছা, ধন্যবাদ,' বললো সাসাগাকি। ততক্ষণে কার্ড লিখতে আবার ব্যস্ত হয়ে পড়েছে মহিলা।

সাসাগাকি তিন তলায় উঠে দেখলো একটা বর্গাকার হলওয়ে রয়েছে, যার দুদিকেই বিভিন্ন অফিস রুমের দরজা। প্রত্যেকটা দরজায় লাগানো নেমপ্লেট দেখে হাঁটছে। প্রথম কর্নারে যেতেই পেল রুমটা। নক করলো সে।

'চলে আসুন,' ভেতর থেকে গলার আওয়াজ পেল সাসাগাকি। দরজায় ধাক্কা দিয়ে ভেতরে ঢুকলো সে।

মাত্রই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে কাজুনারি। তার পেছনেই বিশাল একটা জানালা। বাদামি রঙের স্যুট পরে আছে সে। 'আপনাকে দেখে ভালো লাগলো। প্রায় অনেক দিন কেটে গেছে,' উষ্ণ হাসি দিয়ে বললো কাজুনারি। 'দুঃখিত, তেমন দেখাসাক্ষাৎ করতে পারিনি বলে। ভালো যাচ্ছে আপনার দিনকাল?'

'যাচ্ছে আর কি।'

কাজুনারি রুমের মাঝখানে একটা সোফার দিকে ইশারা করে নিজে একটা আরামকেদারা নিয়ে মুখোমুখি বসলো। 'আমাদের দেখা হওয়ার পর কত দিন হয়েছে যেন?' জিজ্ঞেস করলো সে।

'গত বছরের সেপ্টেম্বরে দেখা হয়েছিলো। শিনোজুকা ফার্মাসিউটিক্যালসে বসে।'

'ওহ, হ্যাঁ, হ্যাঁ,' বললো কাজুনারি। 'বিশ্বাসই হচ্ছে না এক বছরের উপরে হয়ে গেছে।'

'আমি আসলে প্রথমে ঐ ফার্মাসিউটিক্যালে কল দিয়েছিলাম। তারাই এখানে আসতে বললো আমাকে।'

'ওহ, আচ্ছা, আচ্ছা। আসলে আপনার সাথে দেখা করার কিছু পরপরই সেখান থেকে চলে এসেছিলাম,' নিচের দিকে তাকিয়ে বললো কাজুনারি।

দেখে মনে হচ্ছে কিছু একটা বলতে চায় সে, কিন্তু বলছে না কোনো কারণে। 'তো আপনি এখন ডিরেক্টর?' যতটুকু সম্ভব উষ্ণতা নিয়েই বললো সাসাগাকি। 'ভালোই প্রমোশন হয়েছে তবে। মানে এই বয়সে এত দূর।'

চোখ উঠিয়ে তাকালো কাজুনারি, শুষ্ক একটা হাসি খেলে গেল মুখে। 'দেখে কি তাই মনে হচ্ছে?'

'ভুল বলেছি?'

কোনো কিছু না বলে উঠে নিজের ডেস্কের কাছে গেল কাজুনারি। ফোনটা হাতে নিয়ে বললো, 'দুটো কফি দিয়ে যাবেন। হ্যাঁ, এখনই।' ফোনটা নামিয়ে রেখে সাসাগাকির দিকে ফিরলো সে। 'আপনাকে ফোনে বলেছিলাম যে আমার চাচাতো ভাই বিয়ে করে ফেলেছে।'

'অক্টোবরে, না?' বললো সাসাগাকি। 'বড় করেই তো হয়েছিলো মনে হয়।'

'আসলে অত বড় করে করেনি। একটা চার্চে ছোটখাটো অনুষ্ঠান আর শহরের একটা রেস্টুরেন্টে বসে রিসিপশন হয়েছিলো। যেহেতু দুজনেরই দ্বিতীয় বিয়ে ছিলো, তাই আমার মনে হয় অতটা জাঁকজমকপূর্ণ করে করতে চায়নি তারা। আর তার উপর আমার ভাইয়ের ছেলেমেয়েরাও ছিলো যেহেতু।'

'আপনি গেছিলেন?'

'যেহেতু আত্মীয়, তাই যেতে হয়েছে।' আর কিছু বলার আগে আবার আরাম কেদারাটায় বসলো সে। 'তবে আমার সন্দেহ নেই যে উপায় থাকলে আমাকে হয়তো ইনভাইটই করতো না।'

'আপনার আপত্তির বিষয়টা কখনোই তুলে নেননি আপনি, তাই না?'

মাথা দোলালো কাজুনারি। পুরো বসন্ত জুড়ে সাসাগাকি কাজুনারির সাথে ফোনে আলাপ করেছে। দুজনেরই এখানে লাভ ছিলো: কাজুনারি চাচ্ছিলো ইউকিহো সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে, আর সাসাগাকি জানতে চাচ্ছিলো রিও কিরিহারার সম্পর্কে। এখনো পর্যন্ত দুজনেই ব্যর্থ হয়েছে এক্ষেত্রে।

'একমাত্র আপনি আর আমিই জানি তার সম্পর্কে। আর কী ঘটেছে তা জেনেও কিছু করতে পারছি না আমরা,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো কাজুনারি। 'আমার ভাইয়ের চোখদুটো খুলতে পারছি না আমি।'

'কাজটা শুরু থেকেই কঠিন ছিলো। ঐ মেয়ে আপনার ভাইকেই যে প্রথম বোকা বানিয়েছে তা তো না,' বললো সাসাগাকি। 'আমাকেও বানিয়েছে।'

'উনিশ বছর আগে, না?'

'হ্যাঁ।' একটা সিগারেট বের করলো সাসাগাকি। 'সমস্যা হবে?'

'আরে না, না।' স্ফটিকের একটা অ্যাশট্রে এগিয়ে দিলো কাজুনারি। 'গোয়েন্দা, আমি চাই আপনি আমাকে পুরো গল্পটা আজকে বলবেন। পুরো দুই দশকের গল্প।'

'সেজন্যই এসেছি আজকে,' সিগারেট জ্বালিয়ে নিয়ে বললো সাসাগাকি। তখনই দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শুনতে পেল তারা–কফি এসে গেছে। উঠে গিয়ে কফিটা নিয়ে এলো কাজুনারি।

মোটা মগটার থেকে এক চুমুক কফি খেয়ে বলা শুরু করলো সাসাগাকি। পরিত্যক্ত বাড়িতে পাওয়া লাশের কাহিনি দিয়েই শুরু করলো সে। এরপরে সন্দেহভাজনদের তালিকা, তাদাও টেরাসাকির গাড়ি দুর্ঘটনা, যেটা কেসের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিলো। যেখানে যতটুকু বলা দরকার ততটুকুই বললো। খুব মনোযোগ দিয়ে হাতে কফির মগ ধরা অবস্থায় শুনছে কাজুনারিও, কিন্তু বেশিক্ষণ সেরকম না থেকে মগ নামিয়ে রেখে বুকে হাত বাঁধলো। যখন গল্পে ইউকিহো নিশিমোতোর অংশটুকু এলো, পায়ের উপর পা তুলে লম্বা একটা শ্বাস নিলো কাজুনারি।

'আসলে সেই পনব্রোকারের হত্যার সাথেই সবকিছু বেশ ভালোভাবে জড়িয়ে আছে,' কফিতে চুমুক দিতে দিতে বললো সাসাগাকি। ততক্ষণে প্রায় ঠান্ডা হয়ে গেছে কফিটা।

'তার মানে কেসটা অমীমাংসিত থেকে গেল?'

'সাথে সাথেই যে অমীমাংসিত ঘোষণা করা হয়েছে এমন না। নতুন কোনো সাক্ষী বা তথ্যের অভাবে একটা স্বাভাবিক অনুভূতি আসে যে আর বুঝি কিছু হবে না, আর তা থেকেই সরিয়ে রাখা হয়েছে কেসটা।'

'কিন্তু আপনি হাল ছাড়েননি, না?'

'সত্যি বলতে, আমিও প্রায় ছাড়তে বসেছিলাম।' মগটা নিচে নামিয়ে রেখে গল্পের পরের অংশটুকু বলতে শুরু করলো সাসাগাকি।

টেরাসাকির অপরাধের কোনো পরিষ্কার আলামত না পাওয়ায় এবং নতুন কোনো তথ্যও হাতে না আসায় টাস্ক ফোর্স নিস্তেজ হয়ে আসছিলো। এমনকি দলের সদস্যরা পর্যন্ত আলাদা হয়ে যাচ্ছিলো একে একে। আর পরিস্থিতিও খারাপের পথে চলে যাচ্ছিলো দিন দিন। তেলের দাম বৃদ্ধি, চুরি-ছিনতাই, অগ্নিসংযোগ, কিডন্যাপিং ইত্যাদি সবকিছু বেড়ে যাচ্ছিলো। ওসাকা পুলিশের জন্য কেবল একটা হত্যাকাণ্ডের পিছে ফোর্স লাগিয়ে রাখাটা কষ্টকর হয়ে যাচ্ছিলো সে সময়। বিশেষ করে তখন, যখন ধরে নেওয়া হয়েছিলো যে হত্যাকারী নিজেই মারা গেছে দুর্ঘটনায়। সাসাগাকি নিজেও ভেবে নিয়েছিলো আর বুঝি কোনো পথ খোলা নেই। তার ক্যারিয়ারের তৃতীয় অসমাপ্ত কেস হতে চলেছে এটা। প্রত্যেকটার অবশ্য আলাদা আলাদা কারণ ছিলো। কিছু কিছু কেস ছিলো যেগুলো এতটাই বিশৃঙ্খল যে

বলার ভাষা নেই, তবুও সপ্তাহখানেকের মধ্যে সমাধান করা হয়ে গেছিলো। আবার কিছু কেস আছে যেগুলো প্রথমে খুব সহজ মনে হয়, কিন্তু ধীরে ধীরে আর কোনো পথ খুঁজে পাওয়া যায় না এবং অতল গহ্বরে হারিয়ে যায় সবকিছু। এই কিরিহারা কেসটাও অমন ছিলো।

টেরাসাকির মৃত্যুর এক মাস বাদে একদিন সাসাগাকি গোয়েন্দাদের লেখা নোটগুলো পড়ছিলো। কিছু পাবে এই আশায় না, বরং একঘেয়েমি দূর করতে। মোটা মোটা ফাইলের প্রত্যেকটা পাতা একের পর এক উলটে যাচ্ছিলো সে, কিন্তু কিছুই পাচ্ছিলো না। ঠিক এমন সময় তার আঙুল এক জায়গায় আটকে যায়। যে ছেলেটা লাশ খুঁজে পেয়েছিলো, তার জবানবন্দির একটা পাতায় চোখ পড়ে তার।

বাচ্চাটার নাম মিচিহিরো কিকুচি। সে সময় তার বয়স ছিলো নয় বছর। লাশের ব্যাপারে ছেলেটা যাকে প্রথম বলে সে ছিলো তারই বড় ভাই, পঞ্চম শ্রেণির এক ছাত্র। সেই বড় ভাই চলে যায় ঐ বাড়িটায়, দেখতে চেয়েছিলো যে ছেলেটা আসলে সত্য বলছে কি না। এরপরে লাশ দেখে নিয়ে তাদের মাকে ঘটনাটা বলে তারা। ঐ মহিলাই পরবর্তীতে পুলিশকে ফোন দিয়েছিলো। রিপোর্টটা মূলত সে কী বলেছে তার উপরেই ছিলো। রিপোর্টে যে বিষয়গুলো ছিলো সেগুলোর সাথে বেশ পরিচিত সাসাগাকি। ছেলেগুলো 'টাইম টানেল' নামের একটা খেলা খেলছিলো তখন। খেলার মাঝে পরিত্যক্ত বিল্ডিংয়ের নালির ভেতর দিয়ে হামাগুড়ি দিচ্ছিলো তারা, এবং কালক্রমে মিচিহিরো অন্যদের থেকে আলাদা হয়ে যায়। কিছুক্ষণ এদিক-সেদিক হামাগুড়ি দেওয়ার পরে একটা অন্ধকার রুম দেখতে পায় যেখানে একজন মানুষ সোফার উপর শুয়ে আছে। কৌতূহলবশত একটু ভালো করে তাকিয়ে রক্ত দেখতে পায় সে। আশ্চর্যের বিষয় হলো এর পরে যা ঘটে তা।

'বাচ্চাটা ভয় পায়,' রিপোর্টে বলা ছিলো। 'তারপর চলে যেতে নেয়, কিন্তু দরজার কাছে পাথরের একটা ব্লক থাকায় তার খুলতে কষ্ট হচ্ছিলো দরজাটা।'

এই জিনিসটাই অদ্ভুত লাগে সাসাগাকির। সে ক্রাইম সিনের কথা ভাবে, বিশেষ করে দরজার কথা মনে করার চেষ্টা করে। তার মনে পড়ে ভেতরের দিকে খুলতে হতো দরজাটা। তাই সম্ভাবনা ছিলো যে হত্যাকারী সেখানে একটা পাথর রেখে দিয়েছে যাতে লাশ খুঁজে পেতে কিছুটা দেরি হয়। কিন্তু সমস্যাটা হলো, এরপর সে নিজে কীভাবে বন্ধ দরজা দিয়ে বের হবে? সাসাগাকি এরপর চলে যায় সেটা পরখ করতে। যে অফিসার এই রিপোর্ট লিখেছিলো তার নাম ছিলো কোসাকা, লোকাল থানার পুলিশ। রিপোর্টের ব্যাপারে বিস্তারিতই মনে ছিলো কোসাকার। কিন্তু তার দেওয়া ব্যাখ্যাটা শুনে মনে হলো এখানে আরো কিছু আছে।

'আসলে জবানবন্দির ঐ অংশটুকু ঘোলাটে ছিলো,' ভ্রু কুঁচকে বলেছিলো কোসাকা। 'ছেলেটার ভালোমতো মনে নেই—এটাই বলেছে সে। আসলে পাথরটা কি দরজার এত কাছে ছিলো যে খোলাই যেত না, নাকি কিছুটা ফাঁক করে একজন

মানুষ বের হওয়া যেত, তার কিছুই নির্দিষ্ট করে বলতে পারেনি সে। মনে করতে পারছিলো না ছেলেটা। পরে যখন আমরা জানলাম যে হত্যাকারী দরজা দিয়েই বেরিয়ে গেছিলো, তখন ওটা নিয়ে আর ভাবিনি।'

এই ব্যাপারে ফরেনসিকের রিপোর্ট খতিয়ে দেখে সাসাগাকি, কিন্তু এই বিষয়টা নিয়ে তেমন করে কিছু বলা হয়নি। কারণ যেহেতু যেই ছেলেটা লাশটা দেখেছিলো, সে দরজার কাছ থেকে পাথরটা সরিয়েই বের হয়েছিলো। সাসাগাকি নিজেও তখন এই বিষয়টা নিয়ে আর মাথা ঘামায়নি।

আর তারপর পরের বছর ইউকিহোর মায়ের মৃত্যুতে ইউকিহোর জড়িয়ে থাকার বিষয়টা সন্দেহ করেছিলো সে। এই বিষয়টাই ব্লক রাখার অবস্থানটাকে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে; কারণ হত্যাকারী আসলে ঐটুকু ফাঁক দিয়ে শরীর গলিয়ে বেরিয়ে যেতে পারবে কি না এটা নির্ভর করছে তার শরীর আসলে কতটুকু তার উপর। আর এক্ষেত্রে ইউকিহোর পক্ষে অনায়াসে বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিলো।

সাসাগাকি সিদ্ধান্ত নেয় সেই মিচিহিরো নামক ছেলেটার সাথে দেখা করবে। আর দেখা করার পরে যা ঘটে তাতে অবাক না হয়ে পারে না সাসাগাকি। এর একটা কারণ, ছেলেটা গত বছর যেরকম করে বলেছিলো, তার থেকেও আরো ভালো করে বর্ণনা দেয় তাকে। এর কারণ আছে অবশ্য। একটা নয় বছরের বাচ্চার পক্ষে লাশ খুঁজে পাওয়ার সময়ের অত বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া সম্ভব না। কিন্তু বছরখানেক বাদে সে কিছুটা বুঝতে শিখেছিলো, তাই বলতো পেরেছিলো।

সাসাগাকি দরজা দিয়ে কী দেখেছিলো এবং কীভাবে বের হয়েছিলো তার সম্পূর্ণ তথ্য বলতে বলে তাকে।

'আসলে প্রথমে তো খুলতেই পারিনি আমি,' ছেলেটা বলে তাকে। 'পরে নিচে তাকাতেই দেখি, একটা পাথরের ব্লক রাখা ওখানে, দরজার ঠিক নিচে।'

'তুমি নিশ্চিত এ বিষয়ে?'

ছেলেটা জোরে মাথা নাড়ায়।

'এর আগে কেন বলোনি এ কথা? এটা কি এইমাত্র মনে পড়েছে এমন কিছু?'

'না, এর আগে প্রথম দিকে বলেছিলাম এটা। কিন্তু পুলিশ বলছিলো যে আমি নাকি ঠিক বলছি না, ফলে নিজেই বিভ্রান্ত হয়ে যাই। কিন্তু পরে যখন মনে পড়ে, তখন বুঝতে পারি যে হ্যাঁ, আমি দরজাটা একটুও খুলতে পারিনি।'

দাঁত কটমট করেছিলো তখন সাসাগাকি। এই বিষয়টা এক বছর আগে জানতে পারলে আরো গুরুত্বপূর্ণ জবানবন্দি হতো এটা, যদি সেই প্রশ্নকারী অফিসারটা ছেলেটার ভেতর থেকে সুন্দর করে বের করতে পারতো কথাগুলো। সাসাগাকি তার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার সাথে দ্রুত কথা বলে এ বিষয়ে। কিন্তু তার বসের প্রতিক্রিয়া ছিলো উদাসীন। তার ভাষ্যমতে, ছেলেটার জবানবন্দির উপরে

বিশ্বাস করা উচিত হবে না। তার উপর, এক বছর আগের ঘটনার জবানবন্দির উপর অতটা ভরসা করাও যায় না।

এই কেস শুরু হওয়ার সময় সাসাগাকির বস যে ছিলো, ঐ সময়ের কিছু দিন আগেই সে বদলি হয়ে যায়। আর বদলিতে যে আসে সে বেশ উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলো। অর্ধ-পরিত্যক্ত কোনো কেস নিয়ে সময় নষ্ট করায় তার কোনো আগ্রহ ছিলো না। তার চেয়ে সে বরং নতুন কোনো কেসের সমাধান করে নাম কামাতেই বেশি পছন্দ করতো।

সাসাগাকি নিজ থেকেই কেসের ব্যাপারে তদন্ত চালাতে থাকে। একটা পথ তার সামনে খুলে গেছিলো যার ভেতর দিয়ে সে এবার হাঁটতে পারবে। যে-ই ইওসুকে কিরিহারাকে মেরে থাকুক না কেন, তার পক্ষে দরজা দিয়ে বের হওয়া অসম্ভব ছিলো। আর যে কয়টা জানালা রুমের ভেতর ছিলো, তার সবগুলোই ছিলো ভেতর থেকে লাগানো। কোনো জানালাই ভাঙা ছিলো না, এমনকি বিল্ডিংয়ের ভেতর কোনো গর্তও ছিলো না যে বের হতে পারবে। আর এই পুরো বিষয়টা একটা জিনিসই বলছিলো: যেই নালি দিয়ে ছেলেগুলো খেলছিলো, সেই একই নালি দিয়ে বেরিয়েছে হত্যাকারী। একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের জন্য কখনোই ঐ নালিতে জায়গা হবে না, আর তারা আটকে থাকার ঝুঁকিও নেবে না কারণ দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সুযোগ ছিলো। অন্যদিকে, যে বাচ্চা ঐ নালিতে আগেও খেলাধুলা করেছে...

ইউকিহোর প্রতি দৃষ্টি ধীরে ধীরে বাড়ছিলো সাসাগাকির। প্রথমে সে এটা প্রমাণ করতে লেগে পড়ে যে সেই নালিতে সে অন্য বাচ্চাদের সাথে খেলাধুলা করতো কি না, কিন্তু কেউই তাকে দেখেনি বলে জানায়। এমনকি তার বন্ধু-বান্ধবীদের জিজ্ঞেস করার পরে জানতে পারে যে তারা কখনোই সেদিকটায় ইউকিহোকে যেতে দেখেনি। 'কোনো মেয়ে ওখানে খেলতে যায় না,' সেখানকার একটা ছেলে বলে তাকে। 'জায়গাটা যথেষ্ট নোংরা আর মরা ইঁদুর-টিঁদুর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে। ফলে যে-কারোরই জামা-কাপড় ময়লা হয়ে যাবে।'

সাসাগাকি ইউকিহো সম্পর্কে যতটুকু জানে তাতে তার মনে হয়নি ঐ পরিত্যক্ত বাড়িতে মেয়েটা আদৌ সময় কাটিয়েছে। সেখানকার আরেকটা বাচ্চা, যে ওখানে সব সময় খেলাধুলা করতো, সে আরেকটা কথা বলে। মাঝে মাঝে নাকি সে ভাবতো যে যদি কোনো মেয়ে নালির মধ্যে ঢুকে পড়ে, তো আদৌ সামলাতে পারবে কি না। তার মতে, ওখানে কিছু কিছু জায়গায় খাড়া হয়ে নেমে গেছে নালিটা, যেখানে কেবল হাত ব্যবহার করেই কয়েক মিটারের মতো পথ পাড়ি দিতে হয়। এর মানে হলো যথেষ্ট শক্তিশালী হাত না থাকলে বা আত্মবিশ্বাস না থাকলে কাজটা সম্ভব হবে না।

সাসাগাকি ছেলেটাকে সেই বাড়িতে নিয়ে গিয়ে যে রুমে লাশ পাওয়া গেছিলো সেই রুম থেকে নালি দিয়ে বাইরে বের হতে বলে। ও গিয়ে বাইরে দাঁড়ানোর পনেরো মিনিট পরে বিল্ডিংয়ের একপাশের নালির মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ছেলেটাকে। 'হ্যাঁ, বেশ কঠিন ছিলো কাজটা,' ছেলেটা বলে ওঠে। 'একটা জায়গা আছে যেখানে প্রায় অনেকখানি অংশ আপনাকে বেয়ে উপরে উঠতে হবে। আমার মনে হয় না একটা মেয়ে ওটা করতে পারবে।' সাসাগাকি এই পর্যায়ে ছেলেটার কথা মেনে নেয়। হ্যাঁ, সে সময় ইলিমেন্টারি স্কুলে ছেলেদের মতো শক্তিশালী মেয়েরাও ছিলো, কিন্তু ইউকিহো নিশিমোতো সেসব মেয়েদের মধ্যে পড়তো না। ও নিজেও কল্পনা করতে পারছিলো না বানরের মতো একটা নালির মধ্যে সে হামাগুড়ি দিচ্ছে। শেষমেশ সে ধরেই নিয়েছিলো যে একটা এগারো বছর বয়সি বাচ্চাকে খুনি হিসেবে বিবেচনা করাটা তার কল্পনা ছিলো, আর সেই ছেলেটার দেওয়া জবানবন্দিও মিথ্যা ছিলো।

'আমিও একমত। ইউকিহো কারাশাওয়া তেমন মেয়ে না যে কোনো বিল্ডিংয়ের নালির মধ্য দিয়ে হামাগুড়ি দেবে,' বললো কাজুনারি।

অবাক হলো সাসাগাকি। ভাবছে, সে কি আসলে অভ্যাসবশত ইউকিহোকে তার কলেজের নাম ধরে ডাকলো, নাকি বর্তমানে ওর নামের শেষে কাজুনারি পদবিটা আছে বলেই ডাকতে ইচ্ছা হচ্ছে না তার।

'আমি এরপর আর কোনো দিশা পাইনি।'

'কিন্তু আপনি তো এরপরেও উত্তর পেয়েছিলেন, তাই না?

'ভাগে ভাগে,' স্বীকার করলো সাসাগাকি। 'বারবার পেছন থেকে শুরু করছিলাম, তাও সবগুলো পূর্বকল্পিত ধারণা ধূলিসাৎ করে দিয়ে। আর তখনই একটা বিষয় নজরে আসে আমার, যেটা এর আগে আসেনি।'

'আর সেটা?'

'আসলে জিনিসটা খুব সোজা,' বললো সাসাগাকি। 'আপনি জানেন যে একটা মেয়ে নালি বেয়ে উপরে উঠতে পারবে না। তার মানে হলো, যে সেই নালি ব্যবহার করে রুম থেকে বেরিয়ে গেছে সে একটা ছেলে।'

'একটা ছেলে...' বললো কাজুনারি। বুঝে নেওয়ার জন্য কিছুক্ষণ থামলো সে। 'এটা বলবেন না যে রিও কিরিহারা তার নিজের বাবাকে খুন করেছে।'

'হ্যাঁ,' বললো সাসাগাকি। 'এটাই বোঝাচ্ছি আমি।'

এমনি এমনি চূড়ান্ত অবস্থানে পৌঁছায়নি সাসাগাকি। ঐ পনশপে যাওয়ার পর একদিন কোনো একটা কারণে রিওর প্রতি কিছুটা সন্দেহ জেগেছিলো তার।

সেদিন ও পনশপে গেছিলো ইওসুকে কিরিহারার ব্যাপারে মাতসুরার সাথে কথা বলতে। সহজ প্রশ্ন করতে থাকে সে, মাতসুরাও সেগুলোকে ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে জবাব

দিতে থাকে যাতে সাসাগাকির কাজ সহজ না হয়। তদন্ত চলার প্রায় এক বছর চলছিলো তখন, তাই একটা হাসির বস্তুতেই পরিণত হয়ে গেছিলো কেসটা।

'ডিটেকটিভ,' একটা পর্যায়ে বলে ওঠে মাতসুরা, 'আমার মনে হয় আমাদেরকে নিংড়ে যা বের করার, তার সবই বের করে নিয়েছেন এত দিনে। এখন আর কিছুই নেই আপনাকে দেওয়ার মতো।'

মাথা নাড়ে সাসাগাকি। তখনই একটা বই তার নজর কাড়ে। বইটা তুলে জিজ্ঞেস করে, 'কী এটা?'

'রিওর বই এটা,' মাতসুরা বলে। 'মনে হয় ফেলে গেছে।'

'খুব পড়াশোনা করে নাকি ছেলেটা?'

'হ্যাঁ, ভালোই পড়ে। লাইব্রেরিতে যায় প্রায়ই।'

'লাইব্রেরি?'

মাথা দোলালো মাতসুরা, পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিলো লাইব্রেরির সাথে এর কী সম্পর্ক থাকতে পারে তা নিয়ে খানিকটা অবাক হয়েছে সে। সাসাগাকি রেখে দেয় বইটা, হৃৎপিণ্ড দৌড়াচ্ছিলো সে সময়। বইটার নাম ছিলো *গন উইদ দ্য উইন্ড*। এই বইটাই ফুমিও নিশিমোতোর সাথে দেখা করতে গিয়ে ইউকিহোকে পড়তে দেখেছিলো সে। একদিক থেকে ভাবলে ব্যাপারটা কাকতালীয়। একই বয়সের দুজন বাচ্চা একই বই পড়তেই পারে। এমন না যে একই সময়ে পড়ছে তারা। ইউকিহো সেটা পড়েছিলো বছরখানেক আগে।

কিন্তু বিষয়টা সাসাগাকির মাথা থেকে যায়নি এরপর। একবার লাইব্রেরিতে যায় সে। ইওসুকে কিরিহারা যে বাড়িতে মারা যায়, তার থেকে দুইশো মিটার উত্তরে একটা ধূসর রঙের বাড়িতে ছিলো লাইব্রেরিটা। সেখানকার লাইব্রেরিয়ানকে ইউকিহোর ছবি দেখায় সে; একটা অল্পবয়সি তরুণীর ছবি, যেটা দেখে মনে হচ্ছিলো কয়েক বছর আগেও বুঝি বেশ পড়াশোনা করতো মেয়েটা। লাইব্রেরিয়ান মহিলাটা মাথা দুলিয়েছিলো ছবি দেখে।

'ওহ, এখানে প্রায়ই আসা-যাওয়া করতো সে। ওকে মনে রাখার কারণ হচ্ছে, সে অনেক বই নিয়ে যেত এখান থেকে।'

'একাই আসতো?'

'হ্যাঁ, সব সময় একাই আসতো।' এরপর ভ্রু কুঁচকায় মহিলা। 'এক মিনিট, আসলে না, মাঝে মাঝে একটা ছেলেকে সাথে করে আনতো সে। সহপাঠী মনে হয়। একই বয়সেরই দেখতে লাগতো দুজনকে।'

সাসাগাকি দ্রুত আরেকটা ছবি বের করে, এবারেরটা রিও কিরিহারার ছবি। ছবিটার দিকে আঙুল দেখিয়ে ইশারা করে জিজ্ঞেস করে, 'এই ছেলেটাই নাকি?'

লাইব্রেরিয়ান চশমার ভেতর থেকে চোখ ছোট করে দেখে। 'দেখতে তো ওর মতোই লাগছে অনেকটা, তবে নিশ্চিত করে বলা মুশকিল।'

'সব সময় একসাথেই থাকতো তারা?'

'না, সব সময় না। মাঝেমধ্যে। তবে প্রায়ই একই বইয়ের জন্য আসতো তারা। আর আমার মনে আছে, কাগজ কেটে খেলতো দুজনেই।'

'মানে?'

'ছেলেটা কেঁচি দিয়ে কাগজ কেটে বিভিন্ন ধরনের আকৃতি বানিয়ে মেয়েটাকে দিতো। আমার মনে আছে এ নিয়ে তাদের সাথে কথা বলতাম আমি; কারণ কাগজের ছোট ছোট টুকরো এদিক-সেদিক পড়ে থাকতো। কিন্তু দুঃখিত, ছবির ছেলেটাই সেই ছেলে কি না তা নিশ্চিত করে বলতে পারছি না আসলে।'

সেদিন যথেষ্ট প্রমাণ সেই লাইব্রেরিয়ান তাকে দিয়েছিলো। তার মনে পড়ে যায় রিওর রুমে কাগজ কেটে বানানো বিভিন্ন জিনিস দেখার কথা। তার মানে, ইউকিহো আর রিও লাইব্রেরিতে দেখাসাক্ষাৎ করে। এবং হত্যার সময়ও একে-অপরকে চিনতো তারা। আর এটাই তার মাথায় পুরো বিষয়টা সাজানোর জন্য যথেষ্ট ছিলো। সাসাগাকির কাছে এবার তদন্তের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার মতো তথ্য ছিলো। রিও চাইলে সহজেই সেই নালি দিয়ে যাতায়াত করতে পারতো। আর তার ক্লাসেরই এক ছেলের কাছ থেকে সে শুনেছিলো যে রিও নাকি প্রায়ই ওদের সাথে সেখানে খেলাধুলা করতো। সেই ছেলেটার মতে, বাড়িটার সম্পর্কে সেখানকার সবার থেকে ভালো জানতো রিও। বাকি থাকে শুধু রিওর অ্যালিবাই। তাতে বলা হয়েছে, হত্যার সময় অনুযায়ী রিও তার মা ইয়েকো এবং মাতসুরার সাথে ঘরেই ছিলো। কিন্তু হয়তো ওরা তাকে রক্ষা করার জন্য মিথ্যা বলেছে। আর এই সম্ভাবনাটার কথা টাস্ক ফোর্সের আর কোনো সদস্যই ভাবেনি কখনো।

কিন্তু যে সমস্যাটা থেকে যায় সেটা হলো খুনের মোটিভ।

এমন কী কারণ থাকতে পারে যার জন্য একটা ছেলে তার বাবাকে হত্যা করবে? তবে এই বিষয়টা কিন্তু বিশ্বের ইতিহাসে আগেও হয়েছে, যদিও স্বাভাবিক কিছু না। এর পেছনে বিশ্বাসযোগ্য কাহিনি থাকতে হবে, আর সাসাগাকি তা আজ পর্যন্ত খুঁজে পায়নি। এই দুজনের সম্পর্কের মাঝে কোনো ফাটল খুঁজে বের করতে পারেনি তারা। অপর দিকে বলতে গেলে, যে কয়টা জবানবন্দি তাদের কাছে ছিলো, সেগুলোর প্রত্যেকটাই ইওসুকে কিরিহারার যে ছেলের প্রতি ভালোবাসা ছিলো তা প্রকাশ করে। আর তার ছেলেও পালটা ভালোবাসতো তাকে।

সাসাগাকি দিনের পর দিন এদিক-সেদিক ঘুরে প্রশ্নই করতে থাকে শুধু। আর একটা পর্যায়ে গিয়ে তার মনে হতে থাকে, এসব আসলে কেবল তার মাথার ভেতরেই চলছে। *আঁধারের মাঝে দীর্ঘসময় ঘোরাফেরা করুন, এমন অনেক কিছুই দেখবেন যা আসলে নেই।*

'যদি আমি এই রিও থিওরির বিষয়টা কাউকে বলতাম, তাহলে তারা ভাবতো আমার মাথাটা গেছে, তারপর কেস থেকে অব্যাহতি দিয়ে একটা লম্বা ছুটি কাটাতে

কোথাও পাঠিয়ে দিতে,' হেসে বললো সাসাগাকি। একমতাবে বললো যে মনে হলো কথাটার অর্ধেকটা মজা করে বলা, বাকিটা সিরিয়াস।

'তো আপনি কোনো মোটিভ খুঁজে পাননি?' জিজ্ঞেস করলো কাজুনারি।

মাথা ঝাঁকালো গোয়েন্দা। 'সেই সময়ে পাইনি কিছুই। শুধু টাকার জন্য রিও তার বাবাকে খুন করবে, এই বিষয়টা ভাবাটা একটু বেশিই হয়ে যেত।'

'যেহেতু সেই সময় উল্লেখ করলেন, তার মানে ধরে নিতে পারি যে এরপরে আপনি খুঁজে পেয়েছিলেন?' খানিকটা এগিয়ে এসে বললো কাজুনারি।

হাত নেড়ে কথাটা উড়িয়ে দিলো সাসাগাকি। 'ধৈর্য ধরুন, বলছি সবই। শুধু ঘটনার ক্রমানুসারে বলতে দিন। তো মূল কথা হচ্ছে আমার একান্ত যে তদন্ত ছিলো সেটাও একটা পয়েন্টে গিয়ে নাই হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিলো, কিন্তু রিও আর ইউকিহোর উপর নজর অব্যাহত রাখলাম আমি। এমন না যে তাদের উপর নজরদারি করছিলাম, মানে মাঝেমধ্যে গিয়ে এটা-সেটা জিজ্ঞেস করতাম যে তারা কী করছে, কোন স্কুলে যাচ্ছে ইত্যাদি। অর্থাৎ, চেষ্টা করতাম সাধারণ একটা ধারণা আমার মাথায় রাখতে। আমি নিশ্চিত ছিলাম যে কোনো না কোনো সময় দুজনকে একসাথে দেখতে পাবো।'

'পেয়েছিলেন?'

লম্বা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো সাসাগাকি। 'বেশ লম্বা সময়ে লাগে তার জন্য। ব্যাপারটাকে যেভাবেই দেখা হোক না কেন, তাদেরকে দেখলে মনে হতো একদমই অপরিচিত তারা।'

'কিন্তু কিছু হয়েছিলো কি?'

'মিডল স্কুলের শেষ বর্ষে এসে।' সাসাগাকি তার আঙুলটা সিগারেটের প্যাকেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দেখলো খালি ওটা। কাজুনারি এগিয়ে এসে টেবিলের উপর থাকা স্ফটিকের প্যাকেটটা খুললো। কানায় কানায় ভরা প্যাকেটটা। সাসাগাকি হালকা মাথা দুলিয়ে সেখান থেকে নিলো একটা।

'এটা কি ঐ ইউকিহোর সহপাঠীর উপর হামলা হওয়ার সাথে সংযুক্ত কিছু?' সাসাগাকির সিগারেটে আগুন ধরাতে নিয়ে জিজ্ঞেস করলো কাজুনারি।

গোয়েন্দা তাকালো তার দিকে। 'আপনি জানেন এ বিষয়ে?'

'ইমায়েদার কাছ থেকে শুনেছিলাম।'

তারপর ইমায়েদার কাছ থেকে যা যা শুনেছে সব সাসাগাকির নিকট খুলে বললো কাজুনারি। মিডল স্কুলে থাকার সময় সেই মেয়েটার ধর্ষণ, এরপর ভিক্টিমকে ইউকিহোর খুঁজে পাওয়া। তার নিজের অভিজ্ঞতাও শেয়ার করলো। আর এটাও বললো যে ইমায়েদাও ইউকিহোর জড়িয়ে থাকার বিষয়ে সন্দেহ করেছিলো।

'তাহলে তো প্রাইভেট গোয়েন্দা হিসেবে ভালোই ছিলো সে। সত্যিই অবাক হচ্ছি যে এতটা গভীরে চলে গেছিলো লোকটা। হ্যাঁ, সেই ঘটনাটাও একটা প্রশ্নবিদ্ধ

ঘটনা ছিলো বটে। তবে আমি ইমায়েদার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে একটু ব্যতিক্রম কিছু ভাবছিলাম। কুকর্মকারীকে তো ধরা যায়ইনি, কিন্তু সন্দেহভাজনের মধ্যে আরেকজন ছিলো–একই ক্লাসের আরেক শিক্ষার্থী। যদিও তার অ্যালিবাই ছিলো এবং সন্দেহের তালিকা থেকে মুক্তিও পেয়েছিলো। কিন্তু সমস্যাটা হলো এই সাসপেক্টের পরিচয় এবং কার জবানবন্দিতে তার অ্যালিবাই ঠিক করা হয়েছিলো তা।' মুখভরা ধোঁয়া ছাড়লো সাসাগাকি। সচরাচর যেরকম সিগারেট সে খায় তার থেকে এটার স্বাদ অনেক ভালো। 'সন্দেহের তালিকায় যার নাম ছিলো সে হলো ফুমিহিকো কিকুচি, ইওসুকে কিরিহারার লাশ খুঁজে পাওয়া ছেলেটার বড় ভাই। আর তার অ্যালিবাই দিয়েছিলো আর কেউ না, স্বয়ং রিও কিরিহারা।'

চোয়াল ঝুলে গেল কাজুনারির।

'অদ্ভুত, না?' বললো সাসাগাকি। 'এটাকে কাকতালীয় বলে চালিয়ে দিতে আমার বাঁধলো বেশ।'

'কিন্তু এর কী মানে দাঁড়ায়?'

'ঘটনাটা ঘটার বছরখানেক বাদে ফুমিহিকোর কাছ থেকেই শুনেছিলাম আমি কাহিনিটা। সেই পরিবারে বিভিন্ন সময়ে যাতায়াত করার কারণে কিকুচি ভাই দুটোর খবর জানতাম ভালো করেই। এরকমই একবার খবর নিতে যাওয়ার পরে কথাটা তোলে সে।

'যখন ঘটনাটা ঘটে, তখন ফুমিহিকো থিয়েটারে মুভি দেখছিলো। প্রথমে কোনো প্রমাণ ছিলো না তার কাছে, কিন্তু এরপর রিও আসে তাকে বাঁচাতে। থিয়েটারের সামনের দিকে একটা বুকশপ ছিলো। রিওর দাবি সে তার এক বন্ধুর সাথে ওখানেই ছিলো তখন, আর ফুমিহিকোকে থিয়েটারের ভেতর যেতে দেখেছে সে। কর্মরত অফিসার সেই বন্ধুর সাথে তার জবানবন্দি মেলানোর পরে ঘোষণা দেয় যে রিওর দাবি সত্যি ছিলো।'

'তার মানে সে ছুটে যায় হাত থেকে।'

'হ্যাঁ। ফুমিহিকো ভেবেছিলো সে ভাগ্যবানদের মধ্যে একজন। কিন্তু এর কিছু দিন বাদেই রিওর কাছ থেকে তার কাছে একটা ফোন আসে, এবং রিও বলে যে ওর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত তার। এও বলে যে সে যেন উলটা-পালটা কিছু না করে।'

'এর দ্বারা কী বোঝাতে চেয়েছিলো?'

'তার কিছু দিন আগে ফুমিহিকো একটা ছবি পায়। তার মতে, ওটা রিওর মা এবং সেই পনশপে কাজ করা এক কর্মীর প্রণয়ঘটিত কোনো ছবি। বলেছিলো সেগুলো রিওকে নাকি দেখিয়েছে সে।'

'তার মানে ইওসুকের স্ত্রী আর সেই কর্মীর মধ্যে কিছু একটা চলছিলো?'

'তাই তো মনে হচ্ছে।' অ্যাশট্রেতে ছাই ফেললো সাসাগাকি। 'রিও ফুমিহিকোকে সেই ছবিটা দিতে বলে এবং তার বাবার হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে কাউকে কোনো কিছু যাতে না বলে সে প্রতিশ্রুতি নিয়ে নেয়।'

'নিজেদের মধ্যে চুক্তি করেছে তবে?'

'সেরকমই। কিন্তু ফুমিহিকো বিষয়টা নিয়ে পরে অনেক ভাবে। আর ভাবতে গিয়েই তার মনে হয়, ব্যাপারটা এতটা সহজ না। যার কারণে সে আমার কাছে এসে সব বলে দেয়।' সাসাগাকির এখনো মনে আছে ছেলেটার ব্রণভরতি মুখটার কথা।

'কঠিনের কী ছিলো ওখানে?'

'কারণ ওর মনে হয়েছিলো মিডল স্কুলের সেই ঘটনাটা সেটাপ ছিলো।' সিগারেটের আগুনটা একেবারে আঙুলের কাছে এসে পরার পরেও আরেকটা টান দিলো সাসাগাকি। 'দেখুন, ফুমিহিকো সন্দেহের তালিকায় ছিলো কারণ তার কাছে থাকা একটা চাবির রিং সেই ঘটনাস্থলে পাওয়া গেছিলো। কিন্তু সে বলে যে সে কোনোদিন ওখানে যায়নি, আর চাবির রিংটাও এমন না যে হুটহাট খুলে পড়ে যাবে।'

'তো রিও চাবির রিংটা চুরি করে ঘটনাস্থলে ফেলে দিয়ে আসে?'

'এটাই ফুমিহিকো ভেবেছিলো। আর এতেই সেই ঘটনার অপরাধী হিসেবে রিওকে ভাবা যায়। সে হয়তো আসলেই ফুমিহিকোকে সেই থিয়েটারের ভেতর ঢুকতে দেখেছিলো এবং পরবর্তীতে নিজেও থিয়েটারে গিয়ে সেই রিংটা সরিয়ে ফেলে। এরপরে তাকে যা করতে হয়েছে তা হলো, মিথ্যা প্রমাণটা জায়গামতো রেখে আসা।'

'কিন্তু রিও কি জানতো যে সেদিন ফুমিহিকো মুভি দেখতে যাবে?' একদম মূল প্রশ্নটাই করেছে কাজুনারি।

'এখানেই তো সমস্যাটা বাঁধে,' আঙুল তুলে জবাব দিলো সাসাগাকি। 'ফুমিহিকোর মতে, সে কখনোই রিওকে বলেনি যে সে মুভি দেখতে যাবে।'

'তাহলে তো ঘটনাটা রিও ইচ্ছা করে ঘটিয়েছে এটা বলাও অসম্ভব।'

'স্বীকার করছি। আর এখানেই ফুমিহিকোর অনুমান ধরা খেয়ে যায়।'

তারপরও আমার মনে হয় এর সাথে কোনো না কোনো সংযোগ আছে রিওর, ফুমিহিকো বলেছিলো তাকে।

'আমি ওটা নিয়ে যখন আরো ঘাঁটতে থাকি, তখনই ঘটনাটার সাথে ইউকিহোর জড়িয়ে থাকার বিষয়টা টের পাই। আর সেই কারণেই আবার কিছু প্রশ্ন নিয়ে ফুমিহিকোর কাছে যেতে হয় আমাকে।'

'কীরকম প্রশ্ন?'

'মূলত জানতে চাইছিলাম সেদিন কেন সে মুভি দেখতে গেছিলো। জানতে পারি, সেই মুভির টিকেটগুলো আসলে একটা গিফট ছিলো। ফুমিহিকোর মা একটা কেকের দোকানে কাজ করতো সে সময়। আর তার এক কাস্টমার তাকে দিয়েছিলো সেগুলো। আরো মজার ব্যাপার হচ্ছে, টিকেটগুলো ছিলো *রকি* মুভির। এই মুভির প্রতি তার আগে বহুবার আগ্রহ দেখিয়েছিলো ফুমিহিকো, আর সেই টিকেটগুলোর লাস্ট ডেট সেদিনই ছিলো। তাকে সেই রাতেই মুভি দেখতে হতো, নইলে দেখার সুযোগটাও ছাড়তে হতো।'

অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মাথা দোলাতে থাকলো কাজুনারি। 'আপনি কি এটা বের করতে পেরেছেন সেই কাস্টমার আসলে কে ছিলো?'

'নাম পাইনি কোনো। তবে ফুমিহিকোর মা তাকে বলেছে ওটা একটা মেয়ে ছিলো। তার ছেলের বয়সিই, এবং ভালো পোশাক পরা ছিলো।'

'ইউকিহো।'

কঠোর একটা হাসি দিলো সাসাগাকি। 'যদি এটা ধরে নিই যে রিও আর ইউকিহো মিলে সেই ঘটনাটা ফুমিহিকোর ঘাড়ে চাপানোর মাধ্যমে রিওর মা এবং সেই কর্মীর মাঝে থাকা সম্পর্কটা ধামাচাপা দিতে চেয়েছিলো, তবে সবকিছুই খাপে খাপে মিলে যায়। যদিও সেক্ষেত্রে মিস ফুজিমুরার সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনাটা অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার পরিচয় দেয়।'

'মানছি কাজটা নিষ্ঠুর ছিলো, কিন্তু এই ফুজিমুরা মেয়েটাকে বাছাই করাটা একদম কাকতালীয় ছিলো না।'

ভ্রু তুলে তাকালো সাসাগাকি। 'কীভাবে?'

'ঐ মেয়েটাকে টার্গেট করার ভালো কারণ ছিলো ওদের হাতে–এটাও ইমায়েদা বলেছে আমাকে।'

ইমায়েদা তাকে বলেছিলো, যে মেয়েটার উপর আক্রমণ হয়, সে ইউকিহোর ক্লাসের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলো। কিন্তু সেই ঘটনাটার পরে ইউকিহোর অধীনে চলে আসে মেয়েটা।

'এরকম কিছু আমি শুনিনি,' মুখটা খানিক বাঁকিয়ে বললো সাসাগাকি। 'তার মানে ওরা এক ঢিলে দুই পাখি মারার পরিকল্পনা করেছিলো।' কাজুনারির দিকে তাকালো সে। 'আর এখন যা বলবো তা বলতেই ঘিন্না লাগছে আমার। তবে কলেজে থাকা অবস্থায় আপনার সেই মেয়ে বন্ধুটার সাথে যা হয়েছিলো সেটাও কোনো কাকতালীয় বিষয় ছিলো না।'

'আপনার মনে হয় সেটাও ইউকিহোর পরিকল্পনা ছিলো?'

'হওয়ার সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেবো না আমি।'

'ইমায়েদাও এটা বলেছিলো। কিন্তু কেন সে এমনটা করবে?'

'সম্ভবত ওর ধারণা ছিলো যে ধর্ষণ করা বা ওরকম পর্যায়ে নিয়ে গেলে কারো বিশ্বাস ভেঙে দেওয়াটা সহজ হবে।'

মাথা ঝাঁকালো কাজুনারি। 'একজন মানুষের জন্য এটা অনেক অনেক বড় একটা অভিযোগ। এমনকি সে যদি ইউকিহোও হয়, তাও।'

'জানি আমি। কিন্তু যদি আমার কথা ঠিক হয়, তবে এতে করে রিওর বাবার হত্যাকাণ্ডের পেছনে একটা মোটিভ খুঁজে পাওয়া যায়।'

কাজুনারির চোখ বড় বড় হয়ে গেল। কিছু একটা বলতে যাবে, অমনি ডেস্কে থাকা ফোনটা বেজে উঠলো। দম ধরে উঠে ফোনটা ধরলো সে। চাপা কণ্ঠে কী যেন বলেই দ্রুত ফিরে এলো আবার। 'উঠার জন্য দুঃখিত।'

'সময় আছে তো আপনার হাতে, তাই না?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সমস্যা নেই। কাজের কোনো ফোন ছিলো না আসলে ওটা। একটা ব্যাপার দেখছিলাম। সেখান থেকেই ফোনটা এসেছে,' বললো কাজুনারি। এরপর এক মুহূর্তের জন্য দ্বিধান্বিত থেকে যোগ করলো, 'যখন আপনি এলেন, তখন আমার প্রমোশনের জন্য আমাকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন, তাই না? আসলে এটা একটা ডিমোশন ছিলো। আপনি কি ইউনিক্স নামের ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির কথা জানেন?'

'শুনেছি নামটা।'

'আসলে গত বছরের দিকে কিছু অদ্ভুত ঘটনা ঘটতে শুরু করে। আমাদের কোম্পানি আর ইউনিক্সের মধ্যে কিছু ক্ষেত্রে বেশ প্রতিযোগিতা চলছিলো। আর সে সময়ে কিছু জিনিস সামনে আসে। আমরা জানতে পারি যে শিনোজুকা ফার্মাসিউটিক্যালসের ভেতরের কিছু খবর লিক করছে কেউ।'

'কীভাবে বের করলেন বিষয়টা?'

'ইউনিক্সেরই ভেতরের একজন বলেছে আমাদের। অবশ্য, সেই কোম্পানি এই সব অভিযোগ মিথ্যা বলে দাবি করেছে।' চিকন একটা হাসি দিলো কাজুনারি।

'আমার মনে হয় রিসার্চের ক্ষেত্রে এসব হয়ই,' বললো গোয়েন্দা। 'কিন্তু তার সাথে আপনার সম্পর্ক কী?'

'তথ্য অনুযায়ী, সেই লিক আমি করেছি বলে দাবি করা হয়েছে।'

চোখ বড় বড় হয়ে গেল সাসাগাকির। 'বিশ্বাসযোগ্য বলে তো মনে হচ্ছে না বিষয়টা।'

'হওয়া উচিতও না। কারণ এরকম কিছুই করিনি আমি,' মাথা ঝাঁকিয়ে জবাব দিলো কাজুনারি।

'আমার কোনো ধারণাই নেই কী করে হয়েছিলো এটা। আর এই ইনফরমেশনই বা কে দিয়েছিলো তারও কোনো হদিস মেলেনি। ফোন এবং ইমেইল দিয়ে কথাবার্তা বলেছে তারা। কিন্তু তথ্য যে লিক হয়েছে এটা ঠিক ছিলো।

যখন আমাদের ল্যাবের লোকেরা সেই ইনফরমেশন পাঠানো লোকটার ম্যাটেরিয়ালস চেক করে, তখন তাদের চোখমুখ নীল হয়ে গেছিলো একদম।'

'কিন্তু আপনি তো ইনফরমেশন লিক করেননি।'

'অবশ্যই না। দুর্ভাগ্যবশত, কেউ একজন এমনভাবে কাজটা করেছে যেন মনে হয় আমিই করেছি।'

'কোনো আইডিয়া আছে কে করতে পারে এমন কাজ?'

'না,' দ্রুত জবাব দিলো কাজুনারি।

'বুঝতে পেরেছি। তারপরও এই একটা কারণের জন্য ডিমোশন হওয়াটা কেমন যেন।'

'বোর্ড মেম্বাররাও বিশ্বাস করেনি কাজটা আমার ছিলো। কিন্তু কোম্পানির কোনো না কোনো ব্যবস্থা নিতেই হতো। আর কিছু মানুষ ভাবছিলো, যেহেতু আমার জন্য ফাঁদ পাতা হয়েছে, সেহেতু আমাকে সরিয়ে দিলে বড় কোনো বিপদের সম্মুখীন আর হতে হবে না।'

বোকার মতো শুনে যেতে লাগলো সাসাগাকি।

'আরেকটা বিষয়,' বললো কাজুনারি। 'বোর্ড মেম্বারদের মধ্যে অন্তত একজনের চাওয়া ছিলো আমাকে যেন এসবের থেকে দূরে রাখা হয়।'

ভ্রু তুলে তাকালো সাসাগাকি।

'আমার কাজিন, ইয়াসুহারু।'

'ওহ...'

'তার বিয়ে ভাঙতে সক্রিয় একজন নিন্দুককে সরিয়ে দেওয়ার মোক্ষম সুযোগ ছিলো সেটা। এই সরিয়ে রাখার বিষয়টা অস্থায়ী ছিলো, কিন্তু কে জানে এই অস্থায়ী দিয়ে কত দিন বোঝাচ্ছে আসলে।'

'আর এটাই খতিয়ে দেখছেন আপনি?'

কঠিন মুখ করে তাকালো কাজুনারি। 'আমার জানা দরকার কী করে তথ্য বাইরে গেল।'

'কিছু জানতে পেরেছেন এখনো?'

'কিছুটা,' জবাব দিলো কাজুনারি। 'যে-ই কাজটা করুক না কেন, সে আমাদের কম্পিউটারে এক্সেস করেছে। আমাদের বেশ আধুনিক সিস্টেম রয়েছে। অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক, উভয় নেটওয়ার্কের সাথেই কানেক্ট করা থাকে আমাদের কম্পিউটারগুলো। ফলে কোম্পানির ভেতরে বা বাইরে আমরা তথ্য আদান-প্রদান করতে পারি। আর এই নেটওয়ার্কের মাধ্যমেই হ্যাকার আমাদের সিস্টেমের ভেতর ঢুকে পড়েছে।'

যদিও এসব বিষয় সাসাগাকির মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে, তবুও শোনা থামাচ্ছে না সে।

গোয়েন্দার চেহারার দিকে তাকিয়ে হাসলো কাজুনারি। 'এটা অতটাও জটিল কিছু না। মূলত, হ্যাকার একটা ফোনের লাইন ব্যবহার করে আমাদের কম্পিউটার সিস্টেমের মধ্যে ঢুকে পড়ে। যতদূর জানতে পেরেছি, এই এক্সেস এসেছে ইমপেরিয়াল ইউনিভার্সিটি হাসপাতাল থেকে। প্রথমে সে ইমপেরিয়ালের সিস্টেমে ঢুকে পড়ে, এরপর সেটা ব্যবহার করেই আমাদের সিস্টেমের মধ্যে ঢুকে যায়। কিন্তু এটা বের করা কঠিন হয়ে পড়েছে যে ইমপেরিয়াল ইউনিভার্সিটি হাসপাতালের ঠিক কোন জায়গা থেকে মূলত সে অ্যাক্সেস করেছে।'

হাসপাতালের নামটা বেশ পরিচিত পরিচিত লাগলো সাসাগাকির কাছে। প্রথমে ধরতে পারলো না সে, কিন্তু এরপরেই মনে পড়লো এই কদিন আগে এরি সুগাওয়ারার সাথে কথা বলার সময় সে বলেছিলো যে ইমপেরিয়াল হাসপাতাল থেকে একটা মেয়ে দেখা করতে এসেছিলো ইমায়েদার অফিসে।

'কোনো ফার্মাসিস্ট কি এক্সেস করতে পারে ঐ কম্পিউটারে?' জিজ্ঞেস করলো সাসাগাকি।

'হ্যাঁ, সেও পারবে,' বললো কাজুনারি। 'যদিও আমাদের কম্পিউটার এই বাইরের কোম্পানিগুলোর সাথে কানেক্টেড, কিন্তু চাইলেই আমাদের সব তথ্য তারা দেখতে পারবে না। সিস্টেমের ভেতর এদিক-সেদিক বিভিন্ন দেয়াল তৈরি করে দেওয়া হয়েছে, যাতে গুরুত্বপূর্ণ কোনো তথ্য বাইরে না ছড়িয়ে পড়ে। এর মানে দাঁড়ায়, আমাদের অপরাধী এ বিষয়ে বেশ দক্ষ এবং একদম প্রফেশনালদের মতো কাজ করে।'

'প্রফেশনাল কোনো হ্যাকার নাকি?' সাসাগাকির মাথায় কিছুটা টনক নড়লো। কম্পিউটারের বিষয়ে অন্তত একজন প্রফেশনালকে সে চেনে। ও ভাবছে, যে ব্যক্তি কাজুনারিকে ফাঁদে ফেলেছে এবং যে ব্যক্তি ইমায়েদার অফিসে গেছে, তাদের মধ্যে কোনো সংযোগ আছে কি না। কিন্তু আবার কাকতালীয়ও হতে পারে ব্যাপারটা।

'কোনো সমস্যা?' জিজ্ঞেস করলো কাজুনারি, চোখে কৌতূহল।

'না।' হাত নাড়িয়ে না করে দিলো সাসাগাকা। 'কিছুই হয়নি।'

'সরি, ফোন কলটার কারণে কথা অন্য দিকে চলে গেছে।' নড়েচড়ে বসলো কাজুনারি। 'প্লিজ, যেটা বলছিলেন সেটা বলে যান।'

'আচ্ছা, কোথায় ছিলাম যেন?'

'খুনের উদ্দেশ্য নিয়ে কথা বলছিলেন।'

'ওহ, হ্যাঁ,' লম্বা একটা শ্বাস নিয়ে বললো সাসাগাকি।

***

শনিবারের বিকালবেলাটা বেশ সতেজ লাগে। প্রশান্তির এক বুদবুদ যেন ওকে পুরো পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন করে চারপাশ থেকে ঘিরে রাখে। ঘরে বসে গান শুনছে মিকা, ম্যাগাজিন উলটে-পালটে দেখছে। সবকিছুতে পরিবর্তন আসার আগে এটাই

করতো সে। টেবিলে একটা খালি চায়ের কাপ আর পিরিচে কিছু বিস্কুট পড়ে আছে। তায়েকো এসে বিশ মিনিট আগে তাকে দিয়ে গেছে এসব।

'একটু বাইরে যাচ্ছি, মিকা,' বলেছিলো তায়েকো। 'বাড়ির দায়িত্বে তুমিই আছো।'

'দরজায় তো তালা মেরেই যাবে, না?'

'অবশ্যই।'

'ঠিক আছে। কারণ তুমি বেল বাজালেও আমি খুলতাম না ভেতর থেকে,' কম্বলটা মুড়ি দিয়ে ম্যাগাজিন খুলতে খুলতে বলেছিলো মিকা।

পুরো বাড়িতে একা সে। তার বাবা চলে গেছে গলফ খেলতে, আর ইউকিহো চলে গেছে কাজে। মাসাহিরো তার দাদুবাড়ি গেছে রাতে থাকবে বলে। মায়ের মৃত্যুর পরে মিকা প্রায়ই বাড়িতে বসে তার নিজস্ব ডিভাইসগুলো নিয়ে পড়ে থাকতো। প্রথম প্রথম কিছুটা একাকিত্ব অনুভব করলেও ইদানীং এটা করতেই বেশি ভালো লাগছে তার, বিশেষ করে যখন ইউকিহো আশেপাশে থাকে তখন। প্লেয়ারে নতুন একটা সিডি ভরতে যাবে, এমন সময় হলওয়েতে ফোন বাজার শব্দ শুনলো সে। কলটা তার বন্ধুদের হলে ভালোই লাগবে, কিন্তু তাদের মধ্যে থেকে কেউ করেছে কি না সন্দেহ আছে। বাড়িতে তিনটা লাইন রয়েছে; একটা তার বাবার, একটা ইউকিহোর, আরেকটা বাড়ির সবার জন্য। বেশ কিছু দিন ধরে সে তার বাবাকে বলছে যে তাকে আলাদা একটা লাইন করে দিতে, কিন্তু এ বিষয়ে তেমন কিছুই করছে না সে।

হলওয়েতে গিয়ে মিকা দেয়ালে থাকা তারবিহীন ফোনটা তুলে বললো, 'শিনোজুকা রেসিডেন্স।'

'হ্যালো? মিকা শিনোজুকা আছে?' পুরুষ মানুষের গলার আওয়াজ শোনা গেল।

'আমিই বলছি,' বললো মিকা।

'আপনার জন্য মিস তোমোকো হিশিকাওয়ার কাছ থেকে একটা ওভারনাইট ডেলিভারি ছিলো। ওটা কি এখন নিয়ে আসলে কোনো সমস্যা হবে?'

অদ্ভুত তো, ভাবলো মিকা। এর আগে ডেলিভারি করা লোকগুলো কখনোই আগেভাগে ফোন দিতো না। অবশ্য, এর আগে এরকম ওভারনাইট ডেলিভারি সে রিসিভও করেনি। তবে মিকা অতটা ভাবলো না বিষয়টা নিয়ে। আসলে তার বন্ধু তোমোকোর পাঠানো পার্সেলের উত্তেজনায় এসব ভাবার অবকাশই পেল না সে। তোমোকোর বাবার নাগোয়াতে বদলি হয়ে যাওয়ার পর তার সাথে আর দেখা হয়নি ওর।

'সমস্যা নেই,' বললো মিকা।

ডেলিভারির লোকটা বললো যে সে এক্ষুনি আসছে। এর কিছুক্ষণ পরই বেজে উঠলো ডোরবেল। বসার ঘরে অপেক্ষা করতে থাকা মিকা ইন্টারকমটা হাতে তুলে

নিলো। সিকিউরিটি ক্যামেরায় দেখা যাচ্ছে ডেলিভারি করার পোশাক পরা একটা লোক। কমলা রাখার যে বাক্সগুলো থাকে, ঠিক তেমন সাইজের একটা বাক্স তার হাতে।

'জি?' ইন্টারকমে বলে উঠলো মিকা।

'মিস শিনোজুকার জন্য প্যাকেজ এসেছে।'

'ভেতরে আসুন।' বলেই বাটন প্রেস করে গেটটা খুলে দিলো সে। এরপরে মূল দরজার কাছে গিয়ে দরজাটা খুলে দিলো। লোকটা বাক্স নিয়ে দাঁড়িয়েই ছিলো সেখানে।

'কোথায় রাখবো এটা?' জিজ্ঞেস করলো লোকটা। 'অনেক ভারী।'

'এখানেই রাখুন, সমস্যা নেই,' দরজার কাছেই ইশারা করে বললো মিকা।

বাক্সটা নামিয়ে রাখলো ডেলিভারি ম্যান। কালো চশমা পরে আছে সে। আর আছে একটা ক্যাপ, যেটা কপালের অর্ধেক পর্যন্ত ঢেকে দিয়েছে। 'এখানে একটা স্বাক্ষর দিতে পারবেন?' একটা কাগজ আর কলম এগিয়ে দিলো লোকটা।

'কোথায় স্বাক্ষর করতে হবে?' কাগজটার দিকে একটু ঝুঁকে বললো মিকা।

'এই এখানে,' এক পা এগিয়ে এসে বললো লোকটা। মিকা স্বাক্ষর দেওয়ার জন্য কাগজটার উপর কলম ধরেছে, অমনি হঠাৎ নাই হয়ে গেল কাগজটা।

'হাঁহ?' সে বলতে নিলো, আর আচমকা আলতো একটা চাপ অনুভব করলো তার মুখে। হাঁ করে দম নিতে যাবে, অমনি দেখলো পুরো পৃথিবী ঘুরছে। সব যেন অন্ধকার হয়ে গেল।

মনে হচ্ছিলো সময় যেন থমকে আছে। একটা শব্দ বাজছে তার কানে, কিন্তু সেটা ভালোভাবে শোনার জন্য তার যতটুকু জেগে থাকা দরকার, ততটুকু সে জেগে নেই। বারবার অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে সব, অনেকটা রেডিওর সাউন্ডের মতো। কোনো রকম নড়াচড়া করতে পারছে না সে। নিজের হাত-পাকে আর নিজের মনে হচ্ছে না। সবকিছু কেমন যেন স্বপ্ন এবং অবাস্তব লাগছে তার কাছে, শুধু সারা শরীরের ব্যথা ছাড়া।

ব্যথাটা সত্যি সত্যি লাগছে। একটু সময় লাগলো বুঝতে যে ব্যথাটা তার শরীরের ভেতরে কোনো একটা নির্দিষ্ট জায়গা থেকে হচ্ছে। এতটাই তীব্র যে পুরো শরীর অসাড় হয়ে পড়ছে তাতে। একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে। চেহারা দেখতে পাচ্ছে সে। তার উপর নিঃশ্বাস ফেলছে লোকটা। গরম এবং দ্রুত নিঃশ্বাস। *ধর্ষণ করা হচ্ছে আমাকে*, মস্তিষ্কের একটা অংশ এটাই বলছে। আরেকটা অংশ বলছে যে কোনো হরর মুভি খুব কাছ থেকে দেখছে সে। অন্য একটা অংশ বলছে যে কেন এরকম ছেড়ে দিয়েছে সে, কেন কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে না।

এরপরই ভয় জাপটে ধরলো তাকে। ভয়টা অনেকটা বড় কোনো গর্তে পড়ে যাওয়ার মতো, যেখানে তলানিতে কী আছে তা জানা নেই। ভয়টা হলো, কতক্ষণ এই জাহান্নাম চলবে তার কোনো ঠিক নেই।

তার মনে নেই কখন শেষ হয় এই অত্যাচার। জ্ঞান হারায় সে একটা পর্যায়ে।

আর তারপর প্রথমেই দৃষ্টি ফেরে তার। অনেকগুলো ফুলের টবকে এক লাইনে দেখতে পাচ্ছে। ক্যাকটাসের টব–যেরকমটা ইউকিহো ওসাকা থেকে নিয়ে এসেছিলো সেরকম। এরপরই শোনার ক্ষমতা ফিরে পেল সে। আশেপাশে থাকা একটা গাড়ি ছুটে যাওয়ার শব্দ শুনলো। প্রথমবারের মতো টের পেল সে বাইরে আছে, তাদের বাগানে। শুয়ে আছে ঘাসের উপর। তার বাবা গলফ খেলার জন্য যে জালি লাগিয়েছিলো সেগুলো দেখতে পাচ্ছে।

উঠে বসলো মিকা। সারা শরীরে তীব্র ব্যথা। শরীরের এখানে-সেখানে কাটা, থেতলানো, সাথে তলপেটের কাছে তীব্র ব্যথা। মনে হচ্ছে তার ভেতর থেকে কিছু একটা টেনেহিঁচড়ে বের করে আনা হয়েছে। ঠান্ডা লাগছে তার। আর তখনই টের পেল প্রায় উলঙ্গ হয়ে আছে সে। পরনে যা আছে তা হলো ছেঁড়া-ফাটা জামা। মস্তিষ্কের আরেকটা অংশ ভাবছে তার নতুন জামাটা ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। এখনো স্কার্ট পরে আছে ঠিকই, তবে না দেখেই বুঝতে পারছে যে তার প্যান্টিটা নেই ওখানে। দূরে তাকাতেই লাল বর্ণ ধারণ করা আকাশটা দেখতে পেল। 'মিকা!' কারো গলার আওয়াজ ভেসে আসছে। ধীরে ধীরে ঘুরে তাকাতেই দেখলো ইউকিহো এগিয়ে আসছে তার দিকে। তাকিয়ে রইলো মিকা, গভীর স্বপ্নের মাঝে ডুবে গেল যেন। কিছুই আর সত্যি মনে হলো না এরপর, একদম কিছুই না।

***

মূল দরজাটা খুলতে কিছুটা কষ্ট হলো নোরিকোর। এক হাতে দোকান থেকে আনা জিনিসপত্র, আরেক হাতে পানির বোতল এবং চাল থাকায় বেশ কষ্ট হচ্ছিলো খুলতে। *বাড়িতে এসেছি আমি*, এটা বলা থেকে অনেক কষ্টে বিরত থাকলো সে। ফ্রিজের সামনে ব্যাগগুলো রেখে পেছনের দরজাটা খুললো। অন্ধকার হয়ে আছে, ভেতরের বাতাসও ঠান্ডা। কোনায় সাদা কম্পিউটারের কেসটা আবছা আলোতে হালকা দেখা যাচ্ছে। মনিটরের সেই আলোটা মিস করে সে, সিপিউর ফ্যানের ঘরঘর করা শব্দটাও।

নোরিকো আবার ফিরে এলো রান্নাঘরে, এসে ফ্রিজের ভেতর শাকসবজি ইত্যাদি রাখতে লাগলো। ফ্রিজটা বন্ধ করার আগে একটা বিয়ারের বোতল বের করে রাখলো সে। বসার ঘরে আসার পথে টিভির সুইচটা চালু করে দিয়ে হিটারটাও চালালো। ঘরের এককোনায় একটা বোলের মধ্যে ফেলে রাখা কম্বলটা উঠিয়ে পাদুটো ঢেকে নিয়ে রুমটা গরম হওয়ার অপেক্ষা করছে। টিভিতে একটা গেম শো চালু হলো যেখানে কমেডিয়ানরা পরস্পরের সাথে প্রতিযোগিতা করছে।

সবচেয়ে কম স্কোর করা লোকটাকে ব্রিজ থেকে বাঞ্জি জাম্প দিতে হবে। এটা এমন কোনো শো না যেটা দেখার জন্য নোরিকো উতলা হয়ে থাকতো, কিন্তু আজকাল এটা দেখতে ভালোই লাগে তার। এমনিতেও যথেষ্ট বিষয় রয়েছে তার ভাবার জন্য। এই ঠান্ডার মধ্যে একা একটা অ্যাপার্টমেন্টে বসে বসে এছাড়া আর কিছুই করার নেই তার।

বিয়ারের মুখটা খুলে মুখে ঢাললো কিছুটা, টের পেল ঠান্ডা রেশটা গলা দিয়ে পেট পর্যন্ত নেমে গেল। শরীর ঝাঁকুনি দিয়ে উঠলো তার। ভালোই লাগছে। শীতের সময়ে ফ্রিজে বিয়ার রাখার ব্যবস্থা সব সময়ই করতো নোরিকো। আকিওশি ঠান্ডার মধ্যে বিয়ার খেতে পছন্দ করতো। বলতো যে ওটা নাকি তাকে ভাবতে সাহায্য করতো। নিজের হাঁটুদুটোকে জড়িয়ে ধরলো নোরিকো। *ডিনার করা উচিত আমার*, ভাবলো সে। বিশেষ কিছুই নেই অবশ্য। শুধু দোকান থেকে যা এনেছিলো সেগুলোকে গরম করতে হবে তাকে। কিন্তু এটাও এই মুহূর্তে বেশ কষ্টের কাজ বলে মনে হচ্ছে। জড়তা জেঁকে বসেছে তার উপর। এমনকি ক্ষুধাও লাগছে না। টেলিভিশনের ভলিউম বাড়িয়ে দিলো সে। নীরবতা যেন ঘরের ঠান্ডাটা আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে। হিটারের একটু কাছে চেপে এলো সে। *আমি জানি আমার সমস্যাটা আসলে কী। আমার একাকিত্ব।*

এর আগে অবশ্য একা থাকতেই তার ভালো লাগতো, অন্যান্য মানুষের চাপ থেকে মুক্ত হতে চাইতো তখন। সেই ঘটকালি প্রতিষ্ঠানের সেবার বিষয়টা বাতিল করে দেওয়ার পরে হাঁফ ছেড়েছিলো সে। এখন বুঝতে পারছে যে একজনের সাথে জড়িয়ে পড়ার পরে আর পেছনের সেই সময়ে ফেরার কোনো উপায় থাকে না। বিষয়টা আর ঠিক আগের মতো নেই। আরেকবার বিয়ারে চুমুক দিয়ে আকিওশির ব্যাপারে না ভাবার সিদ্ধান্ত নিলো, কিন্তু চোখদুটো বন্ধ করতেই ভেসে উঠলো সেই চেহারা, সেই কম্পিউটারের সামনে বসে থাকার দৃশ্য। বিয়ার শেষ হয়ে গেছে তার। খালি বোতলটা হাতের মধ্যে মুচড়ে নিয়ে টেবিলের উপর আরো কয়েকটার সাথে রাখলো সে–একটা গতকালের, আরেকটা পরশু দিনের। ঘর পরিষ্কার রাখার প্রয়াসটা এখন আর তার মধ্যে নেই। *কিছু একটা মাইক্রোওয়েভে দেবো*, ভাবলো সে। *এখন এটাই কেবল করতে পারি।*

উঠে দাঁড়াতে যাবে, এমন সময় কলিংবেল বেজে উঠলো। দরজা খুলতেই দেখলো একজন বৃদ্ধ কোট পরে দাঁড়িয়ে আছে দরজার সামনে। বেশ চওড়া কাঁধ, সাথে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। নোরিকোর বুঝতে বাকি রইলো না লোকটার কী কাজ থাকতে পারে, আর এতেই বাজে একটা অনুভূতি মোচড় মেরে উঠলো তার পেটে।

'নোরিকো কুরিহারা?' জিজ্ঞেস করলো লোকটা। ওসাকার টান রয়েছে লোকটার বলার ভঙ্গিতে।

'জি?'

'আমার নাম সাসাগাকি।' একটা বিজনেস কার্ড এগিয়ে দিলো লোকটা, যাতে কেবল তার নাম আর নাম্বার রয়েছে। 'গত বসন্তের আগ পর্যন্ত ওসাকা পুলিশের গোয়েন্দা ব্রাঞ্চে ছিলাম।'

মাথা দোলালো নোরিকো, অবাক হয়নি লোকটার উত্তরে।

'কিছু প্রশ্ন করতে চাই আপনাকে, যদি কিছু মনে না করেন।'

'এখন?'

'যদি কোনো সমস্যা না থাকে, তবে নিচের ক্যাফেটায় যাওয়া যাবে একটু?'

ভ্রূ কুঁচকে তাকালো নোরিকো। তার যেতে ইচ্ছা করছে না, আবার কোনো অপরিচিত মানুষকে ভেতরেও ডাকতে ইচ্ছা করছে না।

'আমি কি জানতে পারি কীসের জন্য এসব করছেন?' জিজ্ঞেস করলো নোরিকো।

'অনেক কিছুর জন্যই আসলে। এমনকি আপনার ইমায়েদা গোয়েন্দা সংস্থাতে যাওয়ার সাথেও সম্পৃক্ত বিষয়টা।'

হাঁ হয়ে গেল নোরিকোর মুখ।

'তার মানে আপনি শিনজুকুতে থাকা ইমায়েদার অফিসে গেছিলেন? এটাই প্রথমে যাচাই করে দেখতে চেয়েছিলাম,' স্বাভাবিক একটা হাসি দিয়ে বললো গোয়েন্দা।

এবার অস্বস্তি বাড়তে লাগলো নোরিকোর, কিন্তু তবুও একটা আশার সঞ্চার ঘটলো মনে। হয়তো এই লোকটা জেনে থাকবে আকিওশি কোথায় চলে গেছে। কয়েক মুহূর্ত দ্বিধায় থাকার পর সে দরজাটা খুলে বললো, 'ভেতরে এসেই কথা বলা যাক?'

'শিওর আপনি?'

'সমস্যা নেই, শুধু অগোছালো করে রাখার জন্য মাফ করবেন।'

ভেতরে ঢুকলো গোয়েন্দা। বৃদ্ধ বৃদ্ধ একটা গন্ধ বের হচ্ছে লোকটার গা থেকে। নোরিকো সেপ্টেম্বরের দিকে ইমায়েদা গোয়েন্দা সংস্থাতে গেছিলো, আকিওশির একদম নাই হয়ে যাওয়ার দুই সপ্তাহ বাদে। কোনো রকম দুর্ঘটনা যে হয়েছে তা না, এটা জানতো সে। তার কাছে থাকা চাবিগুলো একটা খামে করে মেইলবক্সে রেখে চলে গেছিলো। অনেক কিছুই ফেলে রেখে গেছিলো সে। তার রেখে যাওয়া সবচেয়ে বড় সম্পত্তিটা হলো কম্পিউটারটা, কিন্তু নোরিকো জানতো না ওটা কী করে ব্যবহার করতে হয়। অনেকবার নিজের সাথে তর্ক করার পরে এক জার্নালিস্ট বন্ধুকে ডেকে আনে সে যে কম্পিউটারের বিষয়ে ভালো বুঝতো। তাকে ডেকে আনার কারণ ছিলো কম্পিউটারে কোনো কিছু আছে কি না তা দেখা। কিন্তু কিছুই খুঁজে পায়নি সে। সেই বন্ধুর মতে, কম্পিউটারের ভেতর থাকা হার্ড ডিস্ক ডিলিট করে দেওয়া হয়েছে এবং ফ্লপি ডিস্কও শূন্য হয়ে আছে।

আকিওশি কোথায় যেতে পারে তা নিয়ে অনেক ভেবেছে নোরিকো। একটা জিনিসই তার মনে ছিলো, তা হলো সেই রাতে দেখা ফাইলগুলোর ভেতরে থাকা একটা নামঃ ইমায়েদা গোয়েন্দা সংস্থা। ফোনবুকে নজর বোলাতেই পেয়ে যায় সেটা। এর পরের দিনই চলে যায় শিনজুকুতে। যদিও সেই শেষ আশাটুকুও হারিয়ে যায়। সেখানে থাকা তরুণী বলে যে আকিওশি নামের কোনো রেকর্ড তাদের কাছে নেই। যার কারণে এই গোয়েন্দার সেই এজেন্সি থেকে ঘুরে এসে আবার তার কাছে আসাটা আশ্চর্যজনক মনে হচ্ছে তার কাছে।

সাসাগাকি যখন শুনলো যে ও এমন এক লোকের খোঁজে ওখানে গেছিলো যার সাথে এখানে একত্রে থাকতো, তখন কিছুটা অবাক হয়ে গেল।

'শুনে উদ্ভট লাগছে যে এজেন্সির থেকে একটা ফাঁকা ফাইল নিয়ে আসবে সে,' নোরিকোর বলা শেষ হলে বললো সাসাগাকি। 'আর আপনার কোনো ধারণাই নেই যে সে কোথায় যেতে পারে? তার পরিবার বা বন্ধুদের সাথে কোনো যোগাযোগ করেছিলেন?'

মাথা ঝাঁকালো নোরিকো। 'করতে পারিনি। তাদের কাউকেই চিনতাম না আমি। তার সম্পর্কে অতটা বিস্তারিত কিছু জানিও না।'

'ইন্টারেস্টিং,' একটু পেছনের দিকে হেলে বললো সাসাগাকি।

'উম, আমি কি জিজ্ঞেস করতে পারি আপনি কীসের তদন্ত করছেন, মি. সাসাগাকি?'

এক মিনিটের জন্য দ্বিধায় পড়ে গেল গোয়েন্দা। 'হয়তো বিষয়টা আপনার কাছে অবাক করার মতো লাগতে পারে, তবুও বলছি, মি. ইমায়েদাও নিখোঁজ হয়েছেন।'

'কী?'

'হ্যাঁ, বেশ লম্বা গল্প অবশ্য এটা। আমিও খোঁজার চেষ্টা করছি কোথায় গেছে সে, কিন্তু ভাগ্য সহায় হচ্ছে না। যার কারণেই এখানে এসেছি আমি, খড়ের গাদার মধ্যে সুচ খুঁজে যাচ্ছি।'

'বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা, মি. ইমায়েদা কবে নিখোঁজ হয়েছিলেন?'

'গত গ্রীষ্মে, আগস্টের দিকে।'

নোরিকো একটু ভাবতেই জোরে শ্বাস নিলো সে। সেই সময়েই এক রাতে আকিওশি বেরিয়েছিলো, সায়ানাইড সাথে করে নিয়ে। আর সেদিন রাতেই ইমায়েদা গোয়েন্দা সংস্থা নামক খালি ফাইলটা নিয়ে ফিরেছিলো।

'কিছু হয়েছে?' জিজ্ঞেস করলো গোয়েন্দা। তার চোখ পিটপিট করছে।

'না, তেমন কিছু না।' মাথা ঝাঁকালো নোরিকো।

'এই লোকটাকে কোথাও দেখেছেন?' একটা ছবি বের করে নোরিকোর সামনে ধরলো সাসাগাকি।

নোরিকো ছবিটা হাতে নিয়ে দেখতেই প্রায় চিৎকার দিয়ে উঠছিলো। দেখতে অনেক তরুণ দেখাচ্ছে যদিও, তবু কোনো সন্দেহ নেই এটাই ইউইচি আকিওশি।

'দেখেছেন?' জিজ্ঞেস করলো সাসাগাকি।

নোরিকো চেষ্টা করতে লাগলো যাতে তার হৃৎপিণ্ড খাঁচা থেকে বেরিয়ে না চলে আসে। মস্তিষ্কের প্রত্যেকটা নিউরন দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়ে দৌড়াচ্ছে। ওর কি সত্যিটা বলা উচিত? একজন প্রাক্তন গোয়েন্দা অফিসার কেন এই ছবি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে? কোনো ক্রাইমের সাথে কি জড়িত ছিলো আকিওশি? সে কি ইমায়েদাকে মেরে ফেলেছে? না...

'সরি, চিনি না একে,' ছবিটা ফেরত দিয়ে বললো সে। তার আঙুলগুলো যে কাঁপছে তা টের পেল। গালও লাল হয়ে গেছে। অনেকক্ষণ তার চেহারার দিকে তাকিয়ে রইলো সাসাগাকি, মনে হচ্ছিলো ভেতরটা দেখে নিচ্ছে একদম। নোরিকো অন্য দিকে মাথা ঘুরিয়ে নিলো।

'আচ্ছা। তবে তো আমার দুর্ভাগ্য,' ছবিটা সরিয়ে নিয়ে নরম সুরে বললো সাসাগাকি। 'আমার মনে হয় আমার চলে যাওয়া উচিত।' দাঁড়িয়ে পড়লো সে। এক মুহূর্ত বাদেই আবার বললো, 'আসলে, ভাবছিলাম আপনি কি আমাকে মি. আকিওশির কোনো জিনিসপত্র দেখাতে পারবেন? যেকোনো কিছু, যেটা দ্বারা আমি তাকে খুঁজে পেতে পারি?'

'মানে?'

'কিছু একটা, যা সে ফেলে গেছে, যদি কিছু মনে না করেন আর কি।'

'না, তাতে কিছু মনে করার নেই।' নোরিকো সাসাগাকিকে পেছনের রুমে থাকা কম্পিউটারটা দেখালো।

'এটা তার কম্পিউটার?'

'হ্যাঁ। উপন্যাস লেখার জন্য ব্যবহার করতো সে এটা।'

'উপন্যাস?' ডেস্কের উপরে থাকা কম্পিউটারের দিকে তাকিয়ে বললো সাসাগাকি।

'আপনার কাছে তার কোনো ছবি নেই?'

'না, দুঃখিত। কোনো ছবি নেই আমার কাছে।'

'ছোট কোনো ছবি হলেও চলবে। শুধু মুখটা একটু দেখা দরকার ছিলো আমার।'

'না, আসলে তার কোনো ছবিই নেই আমার কাছে। কখনো তুলিনি।' সত্যিটাই বলছে নোরিকো। নোরিকো অনেকবার চেয়েছিলো নিজেদের একটা ছবি তুলে রাখতে, কিন্তু আকিওশি না করে দিয়েছিলো বারবার।

মাথা দোলালো সাসাগাকি, কিন্তু স্পষ্ট বোঝা গেল সন্দেহ উঁকি দিয়েছে তার মনে। ঢোক গিললো নোরিকো।

'আপনার কাছে কি তার হাতে লেখা কিছু আছে? কোনো মেমো বা রোজনামচা?'

'আমার মনে হয় না আছে। এরকম কোনো কিছুই ও ফেলে যায়নি।'

'আচ্ছা,' আরেকবার রুমটার দিকে তাকিয়ে বললো সাসাগাকি। এরপরই নোরিকোর দিকে তাকিয়ে হাসি দিলো একটা। 'আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত।'

'আমিও দুঃখিত আপনাকে তেমন সাহায্য করতে পারলাম না বলে।'

সাসাগাকি যখন জুতো পরতে লাগলো, তখন পাশেই দাঁড়িয়ে রইলো নোরিকো। সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে সে। গোয়েন্দাটা আকিওশির ব্যাপারে অবশ্যই কিছু জিনিস জানে, আর এটা যে কী তাই নোরিকোর জানতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু তার ভয় হচ্ছে, যদি সে বলে দেয় সেই ছবিতে থাকা লোকটাকে ও চেনে, তবে হয়তো নিজ হাতেই আকিওশিকে জেলে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়ে যাবে। যদি কোনোদিন তার সাথে আর দেখা না-ও হয়, তবুও এটা করতে পারবে না সে।

জুতো পরা শেষে দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকালো সাসাগাকি। 'ধন্যবাদ সময় দেওয়ার জন্য।'

'আরে না, না, তার দরকার নেই,' বললো নোরিকো। বলতে গিয়ে গলায় শ্বাস আটকে গেল কিছুটা।

ঠিক সেই সময়েই সাসাগাকির দৃষ্টি গিয়ে তার পেছনে থাকা রুমের ভেতর পড়লো, কিছু একটার দিকে তাকিয়ে আছে। 'ওটা কী?' ছোট একটা শেলফের দিকে আঙুল তুলে দেখালো সে। 'কোনো ছবির অ্যালবাম?'

'ওহ, ওটা?'

শেলফের উপরে থাকা ছোট প্লাস্টিক অ্যালবামটার দিকে তাকালো নোরিকো। ছবিগুলো ডেভেলপ করার সময় ক্যামেরার দোকান থেকে কমদামি জিনিসটা দিয়েছিলো তাকে।

'ওটাতে কিছু নেই,' বললো সে। 'গত বছর ওসাকায় গিয়ে বানিয়ে নিয়েছিলাম ওটা।'

'ওসাকা?' বললো সাসাগাকি, চোখমুখে আত্মবিশ্বাস ফিরে এসেছে যেন। 'ওটা যদি একবার দেখি তো কিছু মনে করবেন?'

'না, না, দেখুন। কিন্তু কোনো মানুষের ছবি নেই ওতে,' অ্যালবামটা এগিয়ে দিয়ে বললো নোরিকো।

ওসাকার পথেঘাটে যত ছবি সে তুলেছিলো সব সেখানে রয়েছে: অদ্ভুত অদ্ভুত বিল্ডিং আর বাড়িঘর। তেমন আহামরি কিছু না। তোলার পরে কাউকেই দেখায়নি সে ওগুলো, এমনকি আকিওশিকেও না।

ছবিগুলো দেখার পরে পরিষ্কার প্রতিক্রিয়া দেখা গেল সাসাগাকির মুখে। চোখ বড় বড় হয়ে আছে, চোয়াল ঝুলে গেছে অর্ধেকটা।

'কোনো সমস্যা আছে ওখানে?' জিজ্ঞেস করলো নোরিকো। ভয়ে আছে যে আবার আকিওশির কোনো ছবি রয়ে গেল কি না।

সাসাগাকি চটজলদি কোনো জবাব দিলো না, কিন্তু ছবিগুলো একটার পর একটা দেখতে লাগলো শুধু। এরপর অ্যালবামটা ওর দিকে ফিরিয়ে দিয়ে একটা নির্দিষ্ট পেজ খুললো।

'এই পনশপটার ছবি কেন তুলেছিলেন আপনি?'

'ওহ, জানি না। তেমন নির্দিষ্ট কোনো কারণ ছিলো না।'

'আর এই বিল্ডিংটা। এটা কেন তুলেছেন?'

'কেন জিজ্ঞেস করছেন বলুন তো?' জিজ্ঞেস করলো সে, গলা কাঁপছে তার।

সাসাগাকি পকেটে হাত ঢুকিয়ে সেই ছবিটা বের করলো যেটাতে আকিওশি ছিলো। 'একটা কথা বলছি, দাঁড়ান। আপনার তোলা এই ছবির সাইনবোর্ডে "কিরিহারা পনশপ" লেখা রয়েছে, তাই না? আর ছবির এই লোকটার আসল নাম এটাই: রিও কিরিহারা।'

***

পায়ের আঙুলগুলো বরফের মতো ঠান্ডা হয়ে গেছে বলে মনে হলো মিকার। যতই বিছানায় পড়ে থাকুক না কেন, ওগুলো গরমই হচ্ছে না একেবারে। বালিশের তলে মাথা দিয়ে বিড়ালের মতো কুঁচকে গেল সে। দাঁত ঠকঠক করতে লাগলো তার, সারা শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে। চোখ বন্ধ করে ঘুমাতে চাইলো। কিন্তু চোখদুটো বন্ধ করতেই সেই লোকটাকে দেখতে পেল সে, যেন আক্রমণ করতে এগিয়ে আসছে তার দিকে। তীব্র ভয়ের চোটে চোখ খুলে ফেললো মিকা। এই ঠান্ডার মধ্যেও ঘেমে গেছে, আর হৃৎপিণ্ড এত জোরে লাফাচ্ছে যে মনে হচ্ছে এই বুঝি ফেটে যাবে।

ভাবলো আর কতক্ষণ এভাবে শুয়ে থাকবে সে। ঘুম আসবে কি না তা-ও ভাবলো একবার। ও চাচ্ছে না এটা বিশ্বাস করতে যে আজ যা ঘটেছে সেগুলো সত্যি। আজকের দিনটাকে একটা স্বাভাবিক দিনের মতোই ভাবতে চায় সে-গতকাল বা তার আগের দিনের মতো করে। কিন্তু কোনো স্বপ্ন ছিলো না ওটা। আর তলপেটের ব্যথাটাই এর প্রমাণ।

সবকিছু আমার উপর ছেড়ে দাও। এসব নিয়ে ভাবতে হবে না তোমাকে, মিকা। এখনো ইউকিহোর বলা কথাগুলো কানে বাজছে তার। মিকার মনে পড়ে না কোথা থেকে উদিত হয়েছিলো ইউকিহো সে সময়। তার এটাও মনে নেই যে সে সময়ে কী বলেছিলো সে তাকে। সম্ভবত কিছুই বলেনি। কিন্তু তবুও কেমন করে যেন ইউকিহো সব বুঝে গেল এবং জানতো কী করতে হবে। তাকে পোশাক

পরিয়েই বিএমডব্লিউতে উঠিয়ে নেয় সে। গাড়ি চালাতে চালাতেই কাকে যেন ফোন করেছিলো, কিন্তু কী নিয়ে কথা বলছিলো তা শোনেনি মিকা। হয়তো ইউকিহো দ্রুত কথা বলছিলো, নয়তো তার মস্তিষ্ক ধীরে চলছিলো বলে ধরতে পারেনি। শুধু একটা কথাই শুনেছিলো সে যেটা ইউকিহো বারবার বলছিলোঃ 'কথাটা গোপন রেখো।'

ইউকিহো তাকে সরাসরি হাসপাতালে নিয়ে সম্মুখ দরজা দিয়ে না ঢুকে বরং পেছনের দরজা দিয়ে ঢোকে। সেই সময়ে মিকার মাথায় বিষয়টা খেলেনি। সে সময় ওর মাথায় আসলে কিছুই ছিলো না।

ও এটাও বলতে পারে না যে এরপর কোনো ডাক্তার তাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলো কি না। সে শুধু তার বিছানায় শুয়ে ছিলো, চোখ বন্ধ করা অবস্থায়। তার ঘণ্টাখানেক বাদে বাড়িতে ফেরে তারা। 'ডাক্তার বলেছে তুমি ঠিক আছো। আর দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই,' গাড়ি চালাতে চালাতেই ইউকিহো বলে তাকে। মিকার মনে নেই সে এর বিপরীতে কী জবাব দিয়েছিলো, অথবা কোনো জবাব দিয়েছিলো কি না তাও মনে নেই। ইউকিহোকে একবারও পুলিশের কথা বলতে দেখা যায়নি। মিকাকে বিস্তারিত জিজ্ঞেসও করেনি সে। দেখে বোঝা গেছিলো যে বিস্তারিত জানাটা তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ কিছু না। এর জন্য অবশ্য মিকা তার প্রতি কৃতজ্ঞ। তার মনে হয়নি ঐ সময়ে সে বিষয়টা বলতে পারতো। মানুষ জেনে গেলে কী হবে এই ভয়ে ছিলো সে। বাড়িতে ঢোকার সময় তার বাবার গাড়ি পার্ক করা দেখতে পেয়ে হৃৎপিণ্ড থমকে গেছিলো তার। বাবাকে কী বলবে সে?

'বাবাকে বলবে যে তোমার একটু ঠান্ডা ঠান্ডা লাগছিলো, তাই তোমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেছিলাম আমি,' ইউকিহো এমনভাবে কথাটা বলে যে মনে হয় তার বাবার কাছে মিথ্যা বলাটা কোনো বিষয়ই না। হয়তো সেদিন যে ঘটনাটা ঘটে গেছে, তার তুলনায় ওটা আসলেই কোনো বিষয় না। 'তোমার রুমেই তায়েকোকে দিয়ে ডিনার পাঠিয়ে দেবো আমি।'

সেই সময়েই মিকা বুঝতে পারে যে যা ঘটেছে তা কেবল তাদের মধ্যেই গোপনীয় থাকতে পারে–না, থাকবে। এরকম একটা গোপন বিষয় এমন কারো সাথে তাকে শেয়ার করতে হয়েছে যাকে পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করে সে।

তার বাবার সামনে ইউকিহোর অভিনয়টা চমৎকার ছিলো। ইয়াসুহারুর চোখেমুখে চিন্তার ছাপ পড়ার আগ পর্যন্ত সে হাসপাতালের বিষয়টা তোলেইনি। 'চিন্তার কিছু নেই, কিছু ঔষধ নিয়ে এসেছি আমরা।'

মিকার চেহারায় বিষাদের ছাপ থাকার পরেও ইয়াসুহারুকে তেমন চিন্তিত দেখায়নি। অন্য দিকে কিছুটা খুশি খুশি দেখাচ্ছিলো তাকে যে মিকা তার প্রধান শত্রুকে দিয়ে নিজের যত্ন করিয়ে নিচ্ছে। ও তার নিজের রুমেই চলে আসে এরপর। তায়েকো খাবার নিয়ে আসে তার রুমে। খাবারটা টেবিলের উপর রাখার

সময় ভয়ে ছিলো মিকা। তায়েকো চলে যাওয়ার পর হালকা একটু স্যুপ আর ক্যাসেরোল খায় সে। কিন্তু সেগুলোও বমি বমি ভাব বাড়িয়ে দিচ্ছিলো তার। এরপর বিছানাতেই পড়ে থাকে সে, গুটিসুটি মেরে। সেই থেকে এখনো সেরকমই আছে সে। রাত যত বাড়তে লাগলো, ভয়ও ততই বাড়তে থাকলো তার। ঘরের সব বাতি নিভিয়ে রেখেছে সে। অন্ধকারে ভয় হয় তার, তবুও আলোতে নিজের শরীরটাকে দেখার চাইতে সেই ভয় অনেক কম। তার মনে হচ্ছে কেউ তাকে দেখছে। কোনো পাথরের নিচে লুকিয়ে থাকতে ইচ্ছা করছে তার, অনেকটা ছোট মাছের পোনার মতো। ভাবলো এখন কয়টা বাজে, এবং কতটুকু সময় আর বাকি আছে সূর্য উঠার। আরো ভাবলো যে এখন থেকে প্রত্যেকটা রাতই কি এমন হবে কি না। একটা উদ্বেগের রেশ তার হাড় হিম করে চলে গেল যেন। বুড়ো আঙুলে কামড় বসালো সে। আর ঠিক সেই সময়েই শুনতে পেল দরজায় কারো কড়া নাড়ার শব্দ।

জমে গেল মিকা, কম্বলের তলা থেকেই দরজার দিকে মাথা ঘোরালো। অন্ধকারের মধ্য দিয়েই দেখলো দরজাটা সরে যাচ্ছে। কেউ একজন ঘরের ভেতর ঢুকছে। মেঝেতে গড়িয়ে থাকা গাউনটা দেখলো সে।

'কে?' কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো মিকা।

'ভাবলাম, হয়তো জেগে আছো তুমি,' জবাব দিলো ইউকিহো।

অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলো মিকা। যে মানুষটা তার গোপন বিষয় জানে, ও জানে না তার সামনে কেমন আচরণ করতে হয়। শুনতে পেল ইউকিহো কাছে এগিয়ে আসছে। চোখের কোনা দিয়ে একবার তাকালো মিকা। বিছানার একেবারে কাছে চলে এসেছে মহিলা।

'চলে যান,' বললো সে। 'আমাকে একা থাকতে দিন।'

কোনো জবাব দিলো না ইউকিহো। নিঃশব্দে গাউনের বোতামগুলো খুললো সে। রুপালি রঙের কাপড়টা মেঝেতে পড়ে গেল ইউকিহোকে পুরো নগ্ন অবস্থায় রেখে। মিকা কিছু বলে ওঠার আগেই ওর কম্বলের তলায় গিয়ে ঢুকলো সে। মিকা একবার সরে যেতে চাইলো, কিন্তু মহিলা চেপে ধরলো তাকে। দেখতে যতটা না শক্তিশালী সে, তার থেকে বেশি শক্তিশালী লাগলো মিকার কাছে।

বিছানার উপরে মিকার পাদুটোকে ছড়িয়ে দিয়ে হালকা চাপ দিতে লাগলো ইউকিহো। তার বুকের মাংসপিণ্ড গিয়ে ঠেকলো একেবারে মিকার বুকের কাছে।

'থামুন!' কর্কশ স্বরে বলে উঠলো মিকা।

'এরকম করেই করেছিলো সে?' জিজ্ঞেস করলো ইউকিহো। 'এরকম করেই চাপ দিয়েছিলো তোমার উপর?'

অন্য দিকে ফিরে তাকালো মিকা। টের পেল মহিলার আঙুল তার গালে চাপ দিচ্ছে, সোজা করতে চাচ্ছে মুখটা

'অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিও না। এদিকে তাকাও, আমার মুখের দিকে।'

তার মস্তিষ্ক ভয়ে চিৎকার দিচ্ছিলো বারবার, তবুও তাকালো ইউকিহোর দিকে। ডাগর চোখদুটো তাকিয়ে আছে ওর দিকেই। মহিলার মুখটা এতটাই কাছে যে গরম বাতাস টের পাচ্ছে সে।

'ঘুমানোর চেষ্টা করলেই সেই মুখটার কথা মনে পড়ে তোমার, না?' বললো ইউকিহো। 'চোখ বন্ধ করতে ভয় পাচ্ছো তুমি। এমনকি স্বপ্ন দেখতেও ভয় পাচ্ছো, তাই না?'

মাথা দোলালো মিকা।

'আমি চাই আমার মুখের দিকে তাকাও তুমি। তোমার যদি সেই লোকটার মুখ মনে থাকে, তবে আমি বলবো তার পরিবর্তে তুমি আমার মুখটা দেখো। আমি চাই তুমি মনে করো যে আমি করছি তোমার সাথে ওগুলো।' মিকার দুই পা ফাঁক করে কাঁধ ধরে চাপ দিলো ইউকিহো। 'নাকি আমার চেহারার জায়গায় সেই লোকটার চেহারা দেখতে চাচ্ছো?'

মাথা ঝাঁকালো মিকা।

হাসলো ইউকিহো। 'জানতাম। সমস্যা নেই। ঠিক হয়ে যাবে তুমি। আমি তোমাকে রক্ষা করবো।' মিকার চিবুকটায় হাত বোলালো সে। হাতটাকে ধীরে ধীরে এদিক-সেদিক নাড়াতে লাগলো, যেন মনে হচ্ছে চামড়ার স্পর্শ ভালো লাগছে তার। 'আসলে আমার সাথেও ঘটেছে এটা। আরো অনেক অনেক খারাপভাবে।'

মিকা এতটাই অবাই হলো যে প্রায় চিৎকার দিয়ে ফেলছিলো। ইউকিহো চটজলদি একটা আঙুল চেপে ধরলো তার ঠোঁটে। 'তোমার থেকেও অল্প বয়স ছিলো তখন আমার। বাচ্চা ছিলাম। কিন্তু মাঝে মাঝে শয়তানরা বাচ্চাদের কাছেও আসে। অনেক অনেক শয়তান।'

'না...' ফিসফিস করে বললো মিকা।

'তোমার দিকে তাকালেই সেই পুরোনো আমার কথা মনে পড়ে যায়।' ধীরে ধীরে নিজের দেহটা মিকার শরীরের উপর ছেড়ে দিলো ইউকিহো। তার দেহের উষ্ণতা মিকার দেহের সাথে মিশে গেল যেন। ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে মহিলা। 'ব্যাপারটা খুবই দুঃখজনক। খুবই খুবই দুঃখজনক।'

আর ঠিক তখনই মনের অতল গহ্বরে একটা অনুভূতি টের পেল সে। মনে হলো এই মুহূর্তটার আগ পর্যন্ত ওটা হারিয়ে গেছিলো, আর এই মুহূর্ত আসার সাথে সাথেই পুনরায় ফিরে এসেছে ওটা। আর সেই অনুভূতিটার সাথে একটা দুঃখ এসে ভাসিয়ে দিতে লাগলো তাকে।

আর তারপরেই ইউকিহোর আলিঙ্গনের মধ্যে থেকে শিশুর মতো ঝরঝর করে কেঁদে দিলো সে।

***

ডিসেম্বরের মাঝামাঝি এক রবিবার সাসাগাকি কাজুনারির গাড়িতে চেপে বসলো তার চাচাতো ভাই ইয়াসুহারুর সাথে দেখা করার জন্যে। আবারো ওসাকা থেকে টোকিও এসেছে সে।

'আপনি নিশ্চিত আমাদের সাথে দেখা করবে সে?' গাড়িতে বসে জিজ্ঞেস করলো সাসাগাকি।

'অন্তত বাড়ি থেকে লাথি মেরে বের করে দেবে না, এটুকু বলতে পারি।'

'যদি বাড়িতে থাকে তবে।'

'ওটা নিয়ে চিন্তার কিছু নেই। বেশ ভালো তথ্য পাই আমি আমার ইনফর্ম্যান্ট থেকে।'

'আপনার ইনফর্ম্যান্ট?'

'সেই বাড়ির কাজের বুয়া।'

দুপুর দুটোর কিছু পরপরই গেস্ট গেটের পাশে গাড়ি রাখার জায়গায় মার্সিডিজটা রাখলো কাজুনারি। 'এসব জায়গা থেকে বাড়িটা আসলে কত বড় তা মাপাটা খুব মুশকিল,' গেটের দিকে উঁকি দিয়ে বললো সাসাগাকি। উঁচু দেয়ালগুলোর ওপাশে কেবল বড় গাছগুলো দেখতে পাচ্ছে সে। গেটের পাশে থাকা ইন্টারকমে চাপ দিলো কাজুনারি। দ্রুতই জবাব এলো।

'হ্যালো, কাজুনারি। আপনি এসেছেন দেখে ভালো লাগলো,' মধ্যবয়সি এক মহিলার কণ্ঠ শোনা গেল। সে হয়তো সিকিউরিটি ক্যামেরার মাধ্যমে তাদেরকে দেখছে।

'হ্যালো, তায়েকো। ইয়াসুহারু কি বাড়িতে আছে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখানেই আছে। দাঁড়ান, দেখছি।' কয়েক মিনিট বাদে স্পিকারে আবারো চড়চড় শব্দ হলো। 'উনি বাগানের দিকে যেতে বলেছেন।'

'আচ্ছা।' ক্লিক করে একটা শব্দ হতেই খুলে গেল দরজাটা। কাজুনারির পেছন পেছন যেতে লাগলো সাসাগাকি। বাড়িটায় যাওয়ার পথে ছোট ছোট পাথর ফেলে রাখা হয়েছে। সাসাগাকির মনে হলো কোনো পুরোনো আমলের হলিউড মুভিতে পা রেখেছে সে। বাড়ির সামনে থেকে দুজন নারী কাছে আসতে লাগলো। কাজুনারির বলা ছাড়াই সাসাগাকি জানে এই দুজনের পরিচয় কী: একজন ইয়াসুহারুর মেয়ে মিকা, আরেকজন তার স্ত্রী ইউকিহো।

'কী বলবো?'

'আমার বিষয়ে যেকোনো কিছু বললেই হবে,' বললো সাসাগাকি।

পথটা ধীরে ধীরে অতিক্রম করতে লাগলো তারা। বাড়ির পথটার ঠিক মাঝবরাবর এসে চারজনই থামলো। ইউকিহো মৃদু হেসে ওদের দিকে তাকিয়ে মাথা দোলালো একবার।

'হ্যালো,' কাজুনারিই বলে উঠলো প্রথমে।

'অনেক দিন পর দেখা। কেমন আছো, কাজুনারি?' জিজ্ঞেস করলো ইউকিহো।

'চলছে। তোমাকেও তো দেখে ভালো আছো বলে মনে হচ্ছে।'

একটু হেসে মাথা দোলালো সে।

'ওসাকাতে তোমার নতুন দোকান খুলবে সামনে, তাই না? কেমন যাচ্ছে ওটা?'

'তেমন ভালো না, তবে এসব জিনিস কখনোই ভালো যায় না। ভাবছি, আমার মতোই আরো কয়েকজন যদি থাকতো। তার জন্যই আসলে একটা মিটিংয়ে যাচ্ছিলাম এখন।'

'আমার পক্ষ থেকে শুভকামনা।' এরপর মেয়েটার দিকে ফিরে তাকালো কাজুনারি। 'তোমার কী অবস্থা, মিকা?'

মেয়েটা হেসে নাথা নাড়লো শুধু। সাসাগাকির কাছে কেমন যেন উদাস ঠেকলো মেয়েটাকে। এর আগে সে কাজুনারির কাছ থেকে শুনেছিলো যে ইউকিহোর সাথে তেমন ভালো সম্পর্ক নেই তার, কিন্তু চোখের সামনে যা দেখছে তাতে সেসবের কোনো চিহ্ন খুঁজে পাচ্ছে না।

'আমি ভাবলাম ক্রিসমাস যেহেতু সামনে, তাই মিকার জন্য কিছু ড্রেস এনে দেবো,' বললো ইউকিহো।

'চমৎকার,' বললো কাজুনারি।

'এটা কি তোমার ফ্রেন্ড?' জিজ্ঞেস করলো ইউকিহো। সাসাগাকির দিকে চোখ পড়েছে তার।

'ওহ, দুঃখিত, বলতে ভুলে গেছিলাম। ইনি হচ্ছেন মি. সাসাকি। আমাদের কোম্পানিতে বছরের পর বছর সাহায্য করে আসছিলেন তিনি,' কোনো রকম দ্বিধা না রেখেই বললো কাজুনারি।

সাসাগাকি মাথা ঝুঁকিয়ে বললো, 'হ্যালো।' উপরে তাকাতেই ইউকিহোর চোখে চোখ পড়লো তার।

প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পরও সাসাগাকি কয়েকবার দেখেছে তাকে, কিন্তু কখনোই এরকম মুখোমুখি হয়নি। অনেকগুলো বছর আগে সেই ওসাকাতে মেয়েটার নিজের বাসাতেই শেষ দেখা হয়েছিলো তাদের। সামনে থাকা এই প্রাপ্তবয়স্ক মেয়েটার মধ্যেও সেই ছোট বাচ্চাটার চোখ দেখতে পেল সাসাগাকি। সেই একই চাহনি এখনো রয়ে গেছে তার। *মনে আছে আমাকে, ইউকিহো নিশিমোতো? উনিশ বছর ধরে তোমাকে খুঁজে চলেছি আমি। এতটাই খুঁজেছি যে আমার স্বপ্নেও দেখতাম তোমাকে। কিন্তু আমার সন্দেহ হয় আমার মতো এক বৃদ্ধকে তুমি মনে রেখেছ কি না। কারণ আমি সেই অসংখ্য মূর্খদের একজন, যাদেরকে বোকা বানিয়ে গেছ তুমি আজীবন।*

হাসলো ইউকিহো। 'আপনি কি ওসাকায় থাকেন?'

'জি।' একটু লাল হয়ে গেল সাসাগাকি।

'আমারও তাই মনে হলো। আমার নতুন দোকানটা শিনসাইবাশিতে খুলবো। একবার আসতে হবে কিন্তু আপনাকে।' ব্যাগ থেকে একটা পোস্টকার্ড বের করলো সে-দোকানের ইনভাইটেশন কার্ড।

'ধন্যবাদ,' বললো সাসাগাকি। 'ওখানে থাকা আত্মীয়দের বলে দেবো আমি।'

'আপনার কথার টানেই বুঝেছি আপনি ওসাকার,' বৃদ্ধ গোয়েন্দার চোখের দিকে তাকিয়ে বললো ইউকিহো। 'ছোট ছোট কত বিষয় যে মানুষের কতশত স্মৃতি মনে করিয়ে দিতে পারে...' ঠোঁটদুটোতে হাসি ফুটে উঠলো তার। এরপর কাজুনারিকে উদ্দেশ করে বললো, 'যদি ইয়াসুহারুর সাথে দেখা করতে এসে থাকো, তবে বাগানের দিকে চলে যাও। ওখানেই আছে সে। আজকে কোর্সে ভালো স্কোর করতে পারেনি, তাই সারা দিনই প্র্যাকটিস করে যাচ্ছে।'

'ওর সময় নষ্ট করবো না আমরা।'

'নিজের বাড়ির মতোই মনে কোরো।' বলেই মিকাকে নিয়ে চলে যেতে লাগলো ইউকিহো।

সাসাগাকি আর কাজুনারি পথ ছেড়ে একপাশে দাঁড়ালো। ওরা তাদেরকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলো দুজন। ইউকিহোর যাওয়ার পথের দিকে তাকালো সাসাগাকি। কে জানে, হয়তো সে এখনো মনে রেখেছে তাকে।

ইয়াসুহারুকে বাগানের মধ্যে গলফ বলে আঘাত করতে দেখলো তারা। কাজুনারি যখন তার কাছে গেল, তখন ক্লাবটা রেখে হাসি দিলো একটা। চাচাতো ভাইকে ক্ষমতাহীন একটা জায়গায় বদলি করে দেওয়ার পরেও কোনো রকম অনুশোচনার ছাপ নেই চেহারায়। কিন্তু যখন সাসাগাকিকে পরিচয় করিয়ে দিলো কাজুনারি, তখন চিন্তার ছাপ পড়লো তার মুখে।

'ওসাকার একজন সাবেক গোয়েন্দা অফিসার? আচ্ছা,' সাসাগাকির দিকে তাকিয়ে বললো সে।

'উনার কিছু বলার আছে। আমি চাই তুমি শুনবে,' বললো কাজুনারি।

এবার হাসিটা পুরোপুরি উবে গেল ইয়াসুহারুর মুখ থেকে। 'চলো, ভেতরে গিয়ে কথা বলা যাক।'

'না, এখানেই ঠিক আছে। অনেক গরম পড়েছে আজ, আর আমরাও চলে যাবো তাড়াতাড়ি।'

'সত্যি?' ওদের চেহারার দিকে তাকালো ইয়াসুহারু। 'ঠিক আছে তাহলে, তায়েকোকে কিছু আনতে বলি।'

বাগানের একপাশে সাদা রঙের একটা টেবিল এবং চারটা চেয়ার রাখা, গরমের দিনে ব্রিটিশরা যেমন করে থাকে অনেকটা তেমন। কাজের বুয়া দুধ চা দিয়ে গেলে ওরা সেখানে চা খেতে বসলো। তবে কাজুনারি কথা বলতে শুরু করতেই চা পানের স্বস্তিটা উধাও হয়ে গেল ইয়াসুহারুর মুখ থেকে। ভ্রু কুঁচকে, চোয়াল ঝুলিয়ে ইউকিহো নিশিমোতোর একটার পর একটা কৃতকর্মের কথা শুনে যেতে লাগলো সে। সবই বললো ওরা, ছোট ছোট যতগুলো টুকরো গল্পে জোড়া লাগানো যায় তার সবটুকুই লাগাতে থাকলো। গল্পে রিওর নামও এলো কয়েকবার। মাঝপথে টেবিলে চাপড় দিয়ে উঠে পড়লো ইয়াসুহারু।

'হাস্যকর,' ব্যঙ্গ করে বললো সে। 'আমি আরো ভাবছিলাম কী নিয়ে আর কথা বলবে...কিন্তু এটা, এটা তো সবকিছুকে ছাড়িয়ে গেছে, কাজুনারি।'

'দয়া করে পুরোটা শোনো।'

'যথেষ্ট শুনেছি! তোমার হাতে দেখছি এতটাই অফুরন্ত সময় যে ময়লা না থাকা সত্ত্বেও ময়লার সন্ধানে মাটি খুঁড়ছো তুমি। তো সেই সময়টা কোম্পানির সমস্যা সমাধানে ব্যয় করছো না কেন?'

'আসলে, ওটার ব্যাপারেও কথা বলার আছে আমার,' ইয়াসুহারুর পেছন থেকে বলে উঠলো কাজুনারি। 'আমি জানি কে আমার জন্য ফাঁদটা পেতেছিলো।'

ইয়াসুহারু আশেপাশে তাকালো, বাঁকা হাসি তার মুখে। 'বোলো না যে এটাও ইউকিহোরেই কাজ।'

'তুমি কি সেই হ্যাকার সম্পর্কে কিছু শুনেছ যে শিনোজুকা ফার্মাসিউটিক্যালসের কম্পিউটার নেটওয়ার্কে এক্সেস নিয়েছিলো? আমরা জেনেছি যে সেই হ্যাকার আসলে ইমপেরিয়াল ইউনিভার্সিটি হাসপাতালের একটা কম্পিউটার ব্যবহার করে এটা করেছিলো। আর সেখানকার এক ফার্মাসিস্টের সাথে এই রিও কিরিহারার সম্পর্ক ছিলো সে সময়।'

এটা শোনার পরে চোখটা একটু বড় হলো ইয়াসুহারুর। এরপরে যেটা বললো সেটা সাসাগাকি বুঝলো না ঠিকই, তবে মনে হলো 'তাতে কী হয়েছে?' জাতীয় কিছু বলেছে।

পকেট থেকে একটা ছবি বের করলো গোয়েন্দা। 'এটা একটু দেখবেন?'

'কী এটা? কোনো বিল্ডিং?'

'এটাই সেই ওসাকার পনশপ যেখানে বিশ বছর আগে হত্যাকাণ্ডটা ঘটে। সেই ফার্মাসিস্টই এই ছবিটা তুলেছে। মেয়েটা তখন রিও কিরিহারার সাথে ওসাকায় ছিলো।'

'তো?'

'আমি তাকে জিজ্ঞেস করি যে ঠিক কোন সময়ে গেছিলো তারা। ও জানায় যে তিন দিনের ট্রিপে গেছিলো ওরা দুজন–গত বছরের ১৮ই সেপ্টেম্বর থেকে ২০শে সেপ্টেম্বর। আমার মনে হয় এই তারিখগুলো আপনার কাছেও বেশ গুরুত্বপূর্ণ।'

ইয়াসুহারুর মনে পড়তে কয়েক মুহূর্ত সময় লাগলো, কিন্তু শেষমেশ তার মনে পড়লো। আর যখন পড়লো, তখন খাবি খেয়ে গেল যেন সে কিছুটা।

'ঠিক ধরেছেন,' বললো সাসাগাকি। '১৯শে সেপ্টেম্বর রেইকো কারাশাওয়া মারা যান। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বুঝতেই পারেনি যে কেন হঠাৎ করে তার শ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। আর এতে একটা ব্যাখ্যাই দেওয়া যায় কেবল...'

'হাস্যকর,' ছবিটা একপাশে সরিয়ে বললো ইয়াসুহারু। 'কাজুনারি, আমি চাই এই বৃদ্ধ পাগলটাকে নিয়ে এক্ষুনি এখান থেকে বিদেয় হবে তুমি। আরেকবার এ বিষয় নিয়ে কোনো কথা বলেছ তো ঐদিনই আমার কোম্পানিতে তোমার শেষ দিন হবে। তোমার জানা দরকার যে তোমার বাবা আর বোর্ড মেম্বারদের মধ্যে নেই।' মাটিতে পড়ে থাকা গলফ বলটা পা দিয়ে তুলে নেটের দিকে ছুঁড়ে মারলো সে। ওটা গিয়ে নেট যে লোহার খাম্বাগুলোর সাথে লাগানো ছিলো সেগুলোর একটাতে লেগে চলে গেল চত্বরে থাকা টবগুলোর কাছে। কিছু একটা ভাঙার শব্দ শোনা গেল। সেদিকে তাকালো না পর্যন্ত ইয়াসুহারু। চত্বরের ওদিক দিয়ে গিয়ে স্লাইডিং দরজাটা খুলে ভেতরে ঢুকে গেল সে।

দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো কাজুনারি। সাসাগাকির দিকে তাকিয়ে শুষ্ক একটা হাসি দিয়ে বললো, 'বাহ, চমৎকার হলো বিষয়টা।'

'মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছে সে ইউকিহোর প্রতি। আর এটাই ইউকিহোর সবচেয়ে বড় অস্ত্র।'

'ও এই মুহূর্তে রাগের কারণে সহজভাবে ভাবতে পারছে না। কিন্তু যখন ঠান্ডা হবে, তখন আমাদের কথার মানে পরিষ্কার হয়ে যাবে তার কাছে। আমাদের কেবল একটু অপেক্ষা করতে হবে, এই-ই যা।'

'যদি আদৌ সেই মোক্ষম সময়টা আসে কোনোদিন।'

দুজনে উঠে চলে যাবে, এমন সময় তায়েকো এসে বললো, 'কী হলো? আমি শব্দ শুনলাম কীসের যেন?'

কাঁধ ঝাঁকালো কাজুনারি। 'ইয়াসুহারু একটা গলফ বল ছুঁড়ে মেরেছে। আর ওটাই গিয়ে কিছু একটার সাথে লেগেছে মনে হলো।'

'কেউ ব্যথা পেয়েছে?'

'একটা টবে লেগেছে হয়তো, কোনো মানুষের গায়ে লাগেনি।'

বুয়া চত্বরের দিকে ঘুরে গেল, কোন গাছে লেগেছে তা খুঁজে দেখছে।

'বাপরে, এ তো তার ক্যাকটাস!'

'ইউকিহোর ক্যাকটাস?'

'হ্যাঁ, সেই ওসাকা থেকে নিয়ে এসেছে সে এগুলো। আহারে, টবগুলো একেবারে ভেঙে গেছে।'

কাজুনারি এগিয়ে গেল তায়েকোর কাছে। 'ক্যাকটাসের খুব যত্ন নেয় নাকি?'

'নাহ, তবে তার মা নিতো।'

'ওহ, আচ্ছা, আচ্ছা। তার মায়ের সৎকারের সময় এরকম কিছু একটা বলেছিলো সে।'

কাজুনারি প্রায় চলে আসছিলো ওখান থেকে, এমন সময় পেছন থেকে বুয়াকে বলতে শুনলো, 'এগুলো কী?'

সে দেখলো বুয়াটা ভাঙা টবের দিকে হাত বাড়িয়ে কিছু একটা বের করে আনলো। 'দেখুন কী পেয়েছি,' বললো সে।

বুয়ার হাতে থাকা জিনিসটার দিকে তাকিয়ে পরীক্ষা করে দেখলো কাজুনারি। 'দেখে তো মনে হচ্ছে কোনো কাচের টুকরো।'

'টবের একদম নিচের দিকে রাখা ছিলো। হয়তো ময়লার সাথে মিশে ছিলো এত দিন,' মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললো সে। এরপর সেটা ভাঙা টবটার উপর রেখে দিলো।

'কী হচ্ছে এখানে?' এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলো সাসাগাকি।

'তেমন কিছু না। এই ভাঙা টবের ভেতরে একটা কাচের টুকরো পাওয়া গেছে,' ভাঙা টবটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললো কাজুনারি।

তাকালো সাসাগাকি। এক টুকরো বাঁকা কাচের টুকরোর দিকে চোখ পড়ে রইলো তার। দেখে মনে হচ্ছে কোনো সানগ্লাসের লেন্স। একদম মাঝামাঝি করে ভাঙা হয়েছে ওটা। জিনিসটা বেশ সতর্কতার সাথে তুললো সে। একটু পরেই রক্তের দাগ দেখতে পেল ওতে। মুহূর্তের মধ্যে স্মৃতি এসে হানা দিলো তার মাথায়। ধীরে ধীরে ভাঙা কাচের টুকরোটা রূপ নিলো আস্ত একটা ছবিতে।

'আপনি এইমাত্র বললেন না এগুলো সে ওসাকা থেকে নিয়ে এসেছে?' দ্রুত স্বরে জিজ্ঞেস করলো সাসাগাকি।

'হ্যাঁ, তার মায়ের বাড়ি থেকে এনেছিলো সে।'

'বাগানের ভেতর ছিলো এগুলো?'

'হ্যাঁ, বাড়ির চারপাশে সারি করে রাখা ছিলো। কোনো সমস্যা হয়েছে নাকি, গোয়েন্দা?' ওর অস্বাভাবিক আচরণ দেখে জিজ্ঞেস করলো কাজুনারি।

'হয়তো,' আকাশের দিকে কাচের টুকরোটা তুলে ধরে বললো সাসাগাকি। একধরনের সবুজ আভা আছে ওতে।

***

রাত এগারোটার মতো বাজে এখন। সারাটা দিন ওসাকার R&Y দোকানটা উদ্বোধন করার সব কাজ সেরেছে তারা। ইউকিহোর পেছন পেছন ঘুরছে নাতসুমি।

পুরো জায়গাটা চূড়ান্তভাবে দেখছে তারা। ফ্লোর এবং মজুদের জন্য যে জায়গা এখানে রাখা হয়েছে তা টোকিওতে থাকা সবগুলো দোকানের থেকেই বেশ বড়। ওদের পিআর ক্যাম্পেইনকে এবার সর্বোচ্চ চাপ দিয়ে এই আউটপুট বের করেছে তারা। এখন শুধুই অপেক্ষার পালা।

'আমার মনে হয় নিরানব্বই শতাংশ কাজ শেষ এখানে,' দেখা শেষ হওয়ার পর বললো ইউকিহো।

'শুধু নিরানব্বই?' জিজ্ঞেস করলো নাতসুমি। 'আপনি বলছেন এখনো নিখুঁত হয়নি?'

'না, কিন্তু সেটা আগামীকাল দেখা যাবে,' স্মিত হেসে বললো ইউকিহো। 'এখন একটু জিরিয়ে নেওয়া দরকার আমাদের। আজকে রাতটায় হালকা-পাতলা ড্রিংকস খাওয়া যেতে পারে।'

'অনুষ্ঠান তো কাল, তাই না?'

'একদম।'

সাড়ে এগারোটা নাগাদ একটা লাল রঙের জাগুয়ারে চেপে বসলো দুজনে। প্যাসেঞ্জার সিটে বসে লম্বা একটা শ্বাস নিলো ইউকিহো। 'আমাদের সেরাটা দিতে হবে। তবে আমি একটা দিকে নিশ্চিতঃ তুমি ভালোই করবে।'

'আশা করছি,' একটু চিন্তিত গলায় বললো নাতসুমি। ওসাকার এই দোকানটার ডিরেক্টর ইন চার্জ হবে সে।

'আত্মবিশ্বাস হারিও না। তুমিই নাম্বার ওয়ান, বুঝলে?' নাতসুমির কাঁধে হালকা ঝাঁকুনি দিলো ইউকিহো।

'বুঝেছি,' ওর দিকে তাকিয়ে বললো নাতসুমি। 'কিন্তু সত্যি বলতে, আমার ভয় করছে কিছুটা। আসলে বুঝতে পারছি না আপনার মতো করে সামলাতে পারবো কি না। আপনি কি কখনো ভয় পান না?'

ইউকিহো সরাসরি ঘুরে তাকালো ওর দিকে। 'নাতসুমি? কীভাবে প্রত্যেক দিন একটা নির্দিষ্ট সময়ে সূর্য ওঠে আর অস্ত যায় তা দেখেছ তো? ঠিক একই রকম করে আমাদের জীবনেও দিন এবং রাত আসে। কিছু মানুষের পুরো জীবনটাই সূর্যের আলোয় উজ্জ্বল থাকে, আর কিছু মানুষ আছে যাদেরকে জীবনটা পাড়ি দিতে হয় ঘন কালো অন্ধকারের ভেতর দিয়ে। যখন মানুষ ভয়ের কথা বলে, তখন আসলে তারা তাদের সেই সূর্যটা অস্ত যাওয়ার ভয় পায় বলেই বলে। যে আলোটাকে তারা ভালোবাসে সেটা চলে যাবে বলেই ভয় পায়। এজন্যই তুমি ভয় পাচ্ছো, তাই না?'

এক মুহূর্তের জন্য চুপ থেকে ভাবলো নাতসুমি। এরপর হালকা মাথা দোলালো।

'আমার জীবনে কখনোই সূর্যের আলো ছিলো না,' ইউকিহো বললো।

'হতেই পারে না,' হেসে জবাব দিলো নাতসুমি। 'বস, যতটুকু আমি জানি তা হলো, আপনি নিজেই একটা সূর্য।'

মাথা ঝাঁকালো ইউকিহো। তার চোখের মধ্যে কেমন যেন একটা ব্যগ্রতা লক্ষ করতেই হাসিটা উবে গেল নাতসুমির।

'নাহ, আমার মাথার উপরে কখনোই কোনো সূর্য ছিলো না। সব সময়ই রাতের মতো ছিলো সব। কিন্তু আবার গাঢ় অন্ধকারও ছিলো না। সূর্যের জায়গায় আমার কাছে অন্য কিছু ছিলো। হয়তো অতটা উজ্জ্বল না, কিন্তু আমার জন্য যথেষ্ট। এতটাই যথেষ্ট যে আমি সেই রাতের মাঝে থেকেও দিনের মতো করে জীবন পার করে দিচ্ছি। বুঝতে পারছো তুমি? এমন কিছু নিয়ে তোমার ভয় পাওয়া উচিত না যেটা কোনোদিন তোমার ছিলোই না।'

'তো সূর্যের পরিবর্তে আপনার আকাশে কী ছিলো তবে?'

'বর্ণনা করাটা বেশ কঠিন। হয়তো কোনো একদিন বুঝে যাবে তুমি,' বললো ইউকিহো। ঘাড় ঘুরিয়ে রাস্তার দিকে চোখ নিয়ে বললো, 'চলো, যাওয়া যাক।'

গাড়ি চালু করলো নাতসুমি।

ইওদয়াবাশির স্কাই ওসাকা হোটেলে উঠেছে ইউকিহো। আর নাতসুমি একটা অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া করে ফেলেছে এরমধ্যে। ওসাকার উত্তর দিকের টেনমাতে তার অ্যাপার্টমেন্ট।

'এখানে রাত মাত্র শুরু হলো, তাই না?' জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বললো ইউকিহো।

'শহরের দিকে নাইটক্লাবের অভাব হবে না, এটা নিশ্চিত করে বলতে পারি। আগে বেশ যাওয়া-আসা করতাম আমি,' বললো নাতসুমি, এরপরই ইউকিহোকে হাসতে শুনলো সে। 'কী?'

'টের পেলাম, তুমি তোমার স্থানীয় সুরে কথা বললে এইমাত্র,' বললো সে।

'ওহ, সরি, সরি। আসলে এটা—'

'আরে সমস্যা নেই। তুমি ওসাকাতেই আছো, অতএব তোমাকে স্থানীয়দের মতো করেই কথা বলতে হবে। আমারও উচিত এখানে আসার পরে নিজের আসল রূপটার কাছে ফিরে যাওয়া।'

'আমার মনে হয় ওটাতে মানাবেও আপনাকে।'

'সত্যি?' হেসে ফেললো ইউকিহো। হোটেলের সামনে এসে থামলো গাড়িটা। নেমে পড়লো ইউকিহো।

'কাল দেখা হচ্ছে তবে, বস।'

'অবশ্যই। যদি রাতে কিছু হয়, তবে কোনো রকম দ্বিধা না করে আমাকে ফোন করবে।'

'কিছুই হবে না। তারপরও যদি হয়, তবে ফোন করবো আমি।'

'নাতসুমি?' ডান হাতটা বাড়িয়ে দিলো ইউকিহো। 'চলো, এই কাজটা ঠিকঠাক সেরে ফেলি তবে,' একদম নিখুঁত ওসাকার সুরে বললো সে।

হাত মিলিয়েই হেসে দিলো নাতসুমি।

***

মধ্যরাত পার হয়েছে। আর যখনই ইয়েকো কিরিহারা ভাবলো যে দোকান গুটিয়ে নেবে, তখনই পুরোনো কাঠের দরজাটায় টোকা পড়লো। একজন বৃদ্ধ ধূসর রঙের একটা কোট পরে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। যখন ভালো করে দেখলো কে ওটা, তখন মুখে জোর করে ফুটিয়ে রাখা হাসিটা উবে গেল। একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো সে।

'মি. সাসাগাকি...আমি আরো ভাবলাম ঈশ্বর বুঝি এত রাতে কোনো আশীর্বাদ পাঠিয়েছে আমার জন্য।'

'এভাবে বলবেন না,' জবাব দিলো সাসাগাকি। 'আমি হলাম গিয়ে আপনার সৌভাগ্যের কবজ।' গলার মাফলার আর কোটটা দেয়ালে ঝুলিয়ে কাউন্টারের পাশে বসলো সাসাগাকি। কোটের নিচে বাদামি রঙের কোঁচকানো স্যুট পরে আছে সে। হয়তো এখন আর ও গোয়েন্দা নেই, কিন্তু তবুও সেরকম করেই পোশাক পরে লোকটা।

ইয়েকো একটা গ্লাস রাখলো তার সামনে, বড় একটা বিয়ারের বোতল খুলে ঢাললো তাতে। এটাই সাসাগাকি তার দোকানে এসে খায়। চুমুক দিলো গোয়েন্দা, পাশে থাকা কিছু খাবার থেকে এক কামড় বসালো। 'ব্যবসা কেমন যাচ্ছে? বছরের শেষ দিককার পার্টি-সার্টি তো আসছে সামনে।'

'ব্যবসা কেমন চলছে তা তো দেখতেই পাচ্ছেন। বছরখানেক আগের মন্দার ব্যাপারটা তো জানেনেই। আমি আসলে অর্থনৈতিক মন্দা এর আগে কখনো দেখিওনি।'

ইয়েকো নিজে একটা গ্লাস নিয়ে এসে বিয়ার ঢেলে নিলো। এক চুমুকেই অর্ধেকটা সাবাড় করে দিলো সে।

'দেখছি, বয়স ততটা কাবু করতে পারেনি আপনাকে,' বোতলের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললো সাসাগাকি। ইয়েকোর পুরো গ্লাস ভরে দিলো।

কৃতজ্ঞতায় হালকা মাথা দোলালো ইয়েকো। 'এখন কেবল এটাই আছে আমার।'

'কত বছর হলো শুরু করেছেন এই ব্যবসা?'

'অনেক দিনই তো হলো,' হাত গুনে গুনে বললো ইয়েকো। 'চৌদ্দ বছর, মনে হয়। হ্যাঁ...এই সামনের ফেব্রুয়ারিতে চৌদ্দ হবে।'

'বেশ লম্বা সময় তবে। মনে হচ্ছে আপনার জীবনের লক্ষ্য পেয়ে গেছেন অবশেষে।'

হাসলো ইয়েকো। 'হয়তো। এর আগে যে কফির দোকানটা দিয়েছিলাম সেটা তিন বছর টিকেছিলো মাত্র।'

'পনশপটা আর চালাননি?'

'নাহ, ওটাকে ঘৃণা করতাম আমি। আমার জন্য উপযুক্ত ছিলো না কখনোই।'

কিন্তু তারপরও প্রায় তেরো বছর একজন পনব্রোকারের সাথে সংসার করেছে সে। তার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল ছিলো ওটা। তার উচিত ছিলো উত্তর শিনচির সেই বারে থেকে যাওয়া। হয়তো এত দিনে ওটার মালিকও হয়ে যেত সে। ব্যবসাটা আবার বেশ চলে ওদিকটায়। তার স্বামী মারা যাওয়ার পরে মাতসুরা অবশ্য কিছু দিন চালিয়েছিলো পনশপটা। কিন্তু এর কিছু দিন বাদেই একটা পারিবারিক মিটিংয়ে দোকানটা ইওসুকের চাচাতো ভাইকে দিয়ে দেওয়া হয়। কিরিহারা পরিবারের বংশগত ব্যবসা এটা। ওদের অনেক আত্মীয়ই শহরের বিভিন্ন জায়গায় একই নাম দিয়ে ব্যবসা চালাচ্ছিলো। শুধু ইওসুকে মরে গেছে বলেই তার বিধবা স্ত্রী দোকান নিয়ে যা খুশি তা করতে পারতো না।

এর কিছু দিন বাদে মাতসুরাও চলে যায়। ইয়েকোর ভাসুরের মতে, মাতসুরা নাকি যাওয়ার সময় কিছু টাকা-পয়সা নিয়ে চলে গেছিলো, কিন্তু তেমন বড় অঙ্কের না। সত্যি বলতে, সেসবে কোনো রকম তোয়াক্কা করেনি মহিলা। সেই দোকান আর বাড়ি তাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে উয়েহোনমাচিতে একটা ক্যাফে খোলার জন্য কিছু টাকা নিয়ে চলে যায় সে। ঐ সময়ের আগ পর্যন্ত ইয়েকো এটাও জানতো না যে পনশপটা যে জমিতে ছিলো সেটা ইওসুকের কেনা ছিলো না। সে তার বড় ভাইয়ের থেকে ভাড়া নিয়েছিলো ওটা।

ক্যাফে প্রথম ছয় মাস বেশ ভালোই যাচ্ছিলো। কিন্তু এরপরই মানুষের সমাগম কমতে থাকে। মহিলা কারণটা বুঝতে পারছিলো না। অনেক নতুন নতুন মেনু তৈরি, ক্যাফেটা নতুন করে সাজানো ইত্যাদি সবকিছুই করেছিলো সে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি। দ্রুত কিছু কর্মচারীকেও ছাঁটাই করতে হয়, ফলে সার্ভিস আরো মন্থর হয়ে আসে। যে কয়জন মানুষ আসতো, তাদেরও সংখ্যা কমে যেতে থাকে। তিন বছরের মাথায় ক্যাফেটাই বন্ধ হয়ে যায়। তার দোকান বন্ধ করার কিছু দিনের মাথাতেই *স্পেস ইনভেডারস* গেমের বন্যা বইতে শুরু করে। বাচ্চারা দলে দলে ভিড় করতে থাকে আশেপাশের ক্যাফেতে। আর মহিলা একে দুর্ভাগ্য হিসেবেই নেয়।

যদিও পায়ের তলায় মাটি খুঁজে পেয়েছিলো সে। তার পুরোনো এক বন্ধু তাকে জানায় যে টেনোজিতে একটা দোকান বিক্রি হবে। শর্তগুলো বেশ সহনশীল থাকায় দ্রুত নিয়ে নেয় সে। আর সেই দোকানটাই এখনকার এই বার। যখনই ভাবে যে এটা না হলে কী হতো তার, তখনই শরীরের সব লোম দাঁড়িয়ে যায়।

'আপনার ছেলের কী খবর? এখনো জানেন না কিছু?' জিজ্ঞেস করলো সাসাগাকি।

খানিক অস্পষ্ট হেসে মাথা ঝাঁকালো ইয়েকো। 'রিওর ব্যাপারে আশা ছেড়ে দিয়েছি আমি বহু আগেই।'

'কত বয়স হবে এখন তার? ত্রিশ?'

'ওরকমই হবে হয়তো। সত্যি বলতে, আমার মনে নেই।'

ইয়েকোর এই বারের বয়স যখন চার বছর, তখন থেকেই প্রায়ই সাসাগাকি আসে এখানে। ইয়েকো জানে যে তার স্বামীর হত্যাকাণ্ডের কেসের প্রথম সারির একজন গোয়েন্দা সে, কিন্তু খুব কমই কথা বলতো সে এ বিষয়ে। তবে কখনোই রিওর কথা জিজ্ঞেস করতে ভুলতো না।

তার শ্বশুরবাড়ির লোকজনের সাথে মিডল স্কুল পর্যন্ত থেকেছিলো রিও। সে সময়ে এটা তার জন্য আশীর্বাদই ছিলো বলতে গেলে। কারণ নতুন ক্যাফে চালু করছিলো তখন, আর তাই বাচ্চাকে দেখে রাখার মতো সময় বা পরিস্থিতি কোনোটাই ছিলো না তার হাতে। যখন এই বারটা নিলো সেই সময়ের দিকে, রিও তার দাদাবাড়ি ছেড়ে মায়ের সাথে এসে থাকা শুরু করে। কিন্তু এতে করে কিছুই পরিবর্তিত হয়নি।

অনেক রাত অবধি ইয়েকোকে জাগতে হতো কাস্টমার সামলানোর জন্য। এরপর এসে গভীর ঘুম দিতো, উঠতো দুপুরবেলা। এরপরে হালকা-পাতলা কিছু খেত, গোসল করতো, মুখে প্রসাধনী লাগাতো। তারপর আবার দোকান খুলে বসতো। এরমধ্যে কোনোদিনই সে তার ছেলের জন্য ব্রেকফাস্ট বানায়নি। আর রাতের খাবার হিসেবে দোকান থেকে কিছু একটা এনে চালিয়ে দিতো। দিনে বোধহয় এক ঘণ্টা বা তারও কম সময়ের জন্য দেখা হতো মা-ছেলের।

রাতের পর রাত বাইরে কাটাতে শুরু করলো রিও। যখনই কোথায় ছিলো বলে জিজ্ঞেস করতো, তখনই ঝাপসা ঝাপসা জবাব দিতো সেগুলোর। কিন্তু কখনোই পুলিশ বা স্কুল থেকে কোনো অভিযোগ না আসায় তেমন একটা মনোযোগ দেয়নি সে। প্রতিদিন এতটাই ক্লান্ত থাকতো যে ছেলের কথা ভাবার আর সময় হতো না তার।

স্কুলের গ্র্যাজুয়েশনের দিন সকালবেলা অন্যান্য দিনের মতোই রেডি হয়েছিলো রিও। সেদিন জেগে ছিলো ইয়েকো, ফুটন পরা ছিলো গায়ে। তার ছেলে অন্য দিন কোনো কথা না বলেই চলে যেত, কিন্তু সেদিন দরজার কাছে গিয়ে থামে সে।

'আমি যাচ্ছি, মা।'

'হ্যাঁ...আবার দেখা হবে,' ঘুম-ঘুম চোখে বলে ইয়েকো।

আর ওটাই ওদের শেষ কথোপকথন। এর কয়েক ঘণ্টা বাদে তার ড্রেসারের সামনে একটা নোট দেখতে পায় সে। ওখানে লেখা ছিলোঃ 'আমি আর ফিরছি না, মা।'

তার কথাই সত্যি হয়। আর কখনোই ফেরেনি রিও। যদি চাইতো, তবে হয়তো রিও কোথায় আছে তা জানতে পারতো, কিন্তু কখনোই চেষ্টা করেনি সে। ও একা ছিলো এটা সত্যি, কিন্তু যা হয়েছে তাকে অনিবার্য হিসেবেই মেনে নিয়েছে মহিলা। কোনোদিনই সত্যিকারের মায়ের মতো ছিলো না সে। আর রিও-ও কোনোদিন তাকে মায়ের মতো দেখতো না। ইয়েকো প্রথম থেকেই নিশ্চিত ছিলো যে তার মাতৃস্নেহের মধ্যে কোনো একটা ঘাটতি রয়েছে। সে জন্ম দিয়েছিলো এই জন্যে না যে তার একটা বাচ্চা লাগতো, বরং সে জন্ম দিয়েছিলো এই জন্য যে তার কাছে অ্যাবোরশন করার মতো কোনো ভালো কারণ ছিলো না।

ইওসুকের সাথেও তার বিয়ে হয়েছিলো এমনই কারণে। ও ভেবেছিলো হয়তো এতে তার আর কাজ করতে হবে না। যদিও একজন মা আর স্ত্রীর যে এতটা দায়বদ্ধতা রয়েছে তা তার কল্পনার বাইরে ছিলো। সেসবের কিছুই হতে চায়নি সে তখন আর। ও শুধু একজন নারী হতে চেয়েছিলো, শুধুই একজন নারী।

রিও চলে যাওয়ার তিন মাস বাদে এক আমদানিকারকের সাথে তার সম্পর্ক হয়। তার একাকিত্ব দূর করে দিয়েছিলো লোকটা। যে নারী সে হতে চেয়েছিলো, সেই নারী হওয়ার জন্য স্বাধীন করে দিয়েছিলো সে তাকে। দুই বছরের মতো একসাথে ছিলো তারা। আর তারপর একদিন লোকটা তার অন্য পরিবারের কাছে ফিরে যায়। বিবাহিত ছিলো সে, সাকাই শহরে একটা বাড়িও ছিলো।

অন্য পুরুষদের সাথেও এরপরে সম্পর্কে জড়িয়েছিলো ইয়েকো, কিন্তু সবার সাথেই বিচ্ছেদ হয়ে যায়। এখন পুরোপুরি একা সে। সময় ভালোই কাটে, শুধু মাঝেমধ্যে কোনো কাস্টমার না থাকলে একা একা লাগে। তখন রিওর কথা মনে পড়ে তার, যদিও নিজেকে রিওর কথা ভাবতে শতবার বারণ করেছে সে। ও জানে যে এই ভাবার অধিকারও তার নেই।

সেভেন স্টারের একটা সিগারেট তুলে মুখে নিলো সাসাগাকি। ইয়েকো একটা লাইটার বের করে আগুন ধরালো ওতে। 'আপনি কি জানেন আপনার স্বামী নিহত হওয়ার পরে কত বছর পার হয়েছে?' একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলো গোয়েন্দা।

'বিশ বছরের মতো মনে হয়।'

'উনিশ, আসলে। অনেকটা সময় কিন্তু, কী বলেন?'

'হুম। আমিও বুড়িয়ে গেছি, আর আপনিও অবসরে চলে গেছেন।'

'ভাবছিলাম, এমন কিছু আছে কি না যেটা আপনি বলতে চান আমাকে, মানে এত বছর আগের ঘটনা হওয়ার পরেও।'

'মানে?'

'মানে এমন কিছু যেটা বহু বছর আগে বলতে পারেননি, কিন্তু এখন বলতে পারেন।'

অস্পষ্ট একটা হাসি খেলে গেল ইয়েকোর ঠোঁটে। নিজের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করলো সে। আগুন ধরিয়ে লম্বা টান দিলো, ধোঁয়াগুলো ছেড়ে দিলো সিলিংয়ের দিকে। 'এখনো সেই একই কথাই বলবো, এত বছর পরেও। আমি কিছুই লুকোচ্ছি না।'

'আচ্ছা? হাসি পেল। কারণ অনেক কিছুই আছে যা আপনার কথার সাথে মেলে না।'

'এখনো সেই কেস নিয়ে পড়ে আছেন আপনি? মানতেই হবে আপনার ধৈর্য পাহাড় সমান,' পেছনের শেলফের দিকে হেলান দিয়ে বললো ইয়েকো। আঙুলের ফাঁকে সিগারেট ধরা। মৃদু গানের আওয়াজ ভেসে আসছে হয়তো কোথাও থেকে।

'যেদিন ঘটনাটা ঘটেছিলো, আপনি বলেছিলেন আপনি, রিও আর মাতসুরা বাড়িতে ছিলেন। সত্য ছিলো ওটা?'

'হ্যাঁ,' অ্যাশট্রেতে সিগারেটের ছাই ফেলতে নিয়ে বললো ইয়েকো। 'আমার তো মনে হয় ওটা বহু আগেই খতিয়ে দেখেছেন আপনি।'

'হুম, তা দেখেছি। কিন্তু তা কেবল মাতসুরার অ্যালিবাইটাকে যাচাই করার জন্য করেছিলাম।'

'মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন আমি মেরেছি তাকে?' নাক দিয়ে ধোঁয়া বের করে বললো সে।

'না, আমার মনে হয় আপনিও ছিলেন তখন বাড়িতে। যা আমি সন্দেহ করছি তা হলো, আপনারা *তিনজন* সেদিন বাড়িতে ছিলেন না। ছিলেন শুধু আপনি আর মাতসুরা।'

'কী বলতে চাচ্ছেন, গোয়েন্দা?'

'আপনার আর মাতসুরার মধ্যে কিছু একটা ছিলো,' গ্লাসের বিয়ারটুকু গলায় ঢেলে দিয়ে বললো সে। ইয়েকো আবার গ্লাসটা ভরতে নিলে তাকে থামিয়ে দিয়ে নিজেই ভরলো সে। 'ওটা ঢাকার আর কোনো মানে নেই এখন। অনেক দিন আগের ঘটনা ওটা। এ নিয়ে কারো মাথাব্যথা নেই আর, শুধু আমি বাদে।'

'তো আপনার কেন এত মাথাব্যথা এটা নিয়ে?'

'আমি শুধু এটা জানতে চাই যে কী হয়েছিলো সেদিন। যেই সময়ে আপনার স্বামী মারা যান, সে সময়ে দোকানে এসেছিলো কেউ। দোকান লক করা দেখতে পায় ঐ কাস্টমার। মাতসুরা বলেছিলো সে পেছনের স্টোর রুমে ছিলো, এবং আপনি আর রিও বসে টিভি দেখছিলেন। কিন্তু সেটা সত্য না, কী বলেন? সত্যটা হলো, আপনিও তখন পেছনের রুমেই ছিলেন, মাতসুরার সাথে এক বিছানায়।'

'হয়তো।'

'এটাকে *হ্যাঁ* বলে ধরে নিচ্ছি আমি।' বিয়ার খেতে নিয়ে একটু হাসলো সাসাগাকি।

ইয়েকো আরো জোরে টান দিলো হাতে থাকা সিগারেটটায়। বাতাসে মিইয়ে যাচ্ছে ধোঁয়াগুলো। সেগুলোর দিকে চেয়ে মনকে বহু বছর পেছনে পাঠিয়ে দিলো সে।

মাতসুরাকে ও কখনোই ভালোবাসেনি। একঘেয়েমি কাটানোর জন্যই জড়িয়েছে শুধু। একসময় ওর মনে হচ্ছিলো যে তার বুঝি আর নারী হয়ে ওঠা হবে না। আর সেই কারণেই মাতসুরা যখন তার কাছাকাছি আসে, তখন না করেনি সে।

'আর আপনার ছেলে কি তখন উপরের তলায় ছিলো?' জিজ্ঞেস করলো সাসাগাকি।

'কী?'

'রিও। আপনি আর মাতসুরা ছিলেন পেছনের রুমে। আর সে উপরের তলায় ছিলো, তাই না? আর সেই কারণেই আপনি উপরে যাওয়ার দরজাটায় তালা মেরেছিলেন, যাতে হুট করে সে দেখে না ফেলে আপনাদের।'

'তালা?' অন্যমনস্ক হয়ে বললো ইয়েকো, এরপরে মাথা দোলালো সে। 'ওহ, হ্যাঁ, উপরে যাওয়ার জন্য দরজায় তালা ছিলো। আসলেই আপনি একজন গোয়েন্দা। বেশ ভালোই স্মৃতিশক্তি আপনার।'

'তো রিও উপরের তলায় ছিলো। কিন্তু মাতসুরার সাথে সম্পর্কের বিষয়টা ঢাকার জন্য আপনি বলেন যে আপনি ছেলের সাথে ছিলেন, ঠিক?'

'আপনার যদি মনে হয় এটাই ঘটেছে, তবে তাই। আমার কী যাবে আসবে এতে?' অসম্পূর্ণ সিগারেটটা বের করে বললো সে। 'আরেক বোতল বিয়ার আনবো?'

'অবশ্যই।'

কয়েকটা বাদামের সাথে নতুন আনা বিয়ারটাও খেলো সাসাগাকি। কয়েক মুহূর্ত বাদে ইয়েকোও যোগ দিলো তার সাথে। এরপর খানিকক্ষণ দুজনেই নীরবে মদ খেতে লাগলো। ইয়েকোর মস্তিষ্ক পেছনের স্মৃতিগুলো হাতড়ে বেড়াচ্ছে যেন। সাসাগাকি এইমাত্র যা বললো ঠিক তেমনটাই হয়েছিলো। সেদিন আসলেই সে আর মাতসুরা সেক্স করার মাঝখানে ছিলো। উপর তলায় ছিলো রিও। আর উপর থেকে নিচে নামার সিঁড়ির মুখে থাকা দরজাটায় তালা মারা ছিলো। মাতসুরাই বলেছে যে পুলিশ জিজ্ঞেস করতে এলে যেন সে বলে যে রিও তাদের সাথেই ছিলো–যাতে তাদের অ্যালিবাই ঠিক থাকে। ও বলেছিলো এই মিথ্যাটা ওদের অনেক কিছু থেকেই বাঁচাবে। দুজনে মিলে ঠিক করে যে তারা বলবে রিও তার মায়ের সাথে বসে টিভি দেখছিলো–বাচ্চাদের একটা সায়েন্স ফিকশন শো। রিওর কাছে একটা

ম্যাগাজিন ছিলো, যেটাতে ঐ শো সম্পর্কে সবকিছু দেওয়া ছিলো। সেগুলো ইয়েকো আগেই পড়ে নেয় যাতে গোয়েন্দারা কিছু জিজ্ঞেস করলে যেন বলতে পারে।

'ভাবছি, মিয়াজাকির কী হবে তাহলে?' আচমকা বলে উঠলো সাসাগাকি।

'সরি? মিয়াজাকি?'

'সুতোমু মিয়াজাকি।'

'ওহ।' হাত দিয়ে লম্বা চুলগুলো একটু আঁচড়ে নিলো ইয়েকো। হাতের মধ্যে কিছু একটা জটের মতো বাজতেই তাকালো সেদিকে, দেখলো একটা সাদা চুল তার মধ্য আঙুলের মাঝে আটকে আছে। ওটাকে ছিঁড়ে মেঝেতে ফেলে দিলো যাতে সাসাগাকি না দেখে। 'ওরা তো তাকে মৃত্যুদণ্ড দেবে, তাই না?'

'এ বিষয়ে কয়েক দিন আগে একটা আর্টিকেল পড়েছি আমি। সেখানে বলা হয়েছে যে ও যা করেছিলো তা করার তিন মাস আগে তার দাদা মারা যায়। মূলত ওটাই নাকি তার ভেঙে পড়ার কারণ ছিলো।'

'আমার মনে হয় না এটা হত্যার মতো কোনো অপরাধের অজুহাত হতে পারে,' আরেকটা সিগারেট ধরাতে নিয়ে বললো ইউকিহো।

১৯৮৮ থেকে ১৯৮৯-এর মাঝামাঝি একজন সিরিয়াল কিলার টোকিও এবং সাইতামা এলাকার আশপাশ থেকে চারজন তরুণীকে অপহরণ করে এবং হত্যা করে। সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে খবরটা। আদালতের ডিফেন্সে পাগল বলে চালানো হয় খুনিকে, কিন্তু ইয়েকো নিশ্চিত ছিলো ওটা বলে শাস্তি এড়াতে পারবে না তারা।

'ইশ, যদি আরো আগে বলতেন আমাকে এই কথাটা,' বিড়বিড় করে বললো সাসাগাকি।

'বলতাম মানে, কী বলতাম?'

'আপনার স্বামীর ঐ বিশেষ ঝোঁকের ব্যাপারে।'

'ওহ।' ইয়েকো হাসার চেষ্টা করলেও পারলো না। বরং চিন্তার ছাপ স্পষ্ট হয়ে পড়লো চেহারায়। *তো এই কারণেই মিয়াজাকির কথা তুলেছে সে?*

'তো এটা জেনে আপনার কী উপকার হলো?' জিজ্ঞেস করলো ইয়েকো।

'উপকার? তদন্তের সময়ে যদি এই বিষয়টা জানতে পারতাম, তাহলে পুরো বিষয়টাই অন্য রকম হতো।'

'আচ্ছা, তাই নাকি?' ধোঁয়া ছেড়ে বললো ইয়েকো। 'তবে তো ব্যাপারটা বেশ বাজে হলো।'

'এমন না যে আপনি কিছু বলতে পারতেন সে সময়।'

'না, আমি পারতাম না।'

'হুঁ,' কপালের উপর হাত রেখে বললো সাসাগাকি। 'আর এই যে এখন এইখানে বসে আছি আমরা, উনিশ বছর পর।'

ইয়েকোর ইচ্ছা করছে এর দ্বারা কী বোঝালো সে তা জিজ্ঞেস করতে, কিন্তু করলো না। গোয়েন্দা যত গভীর কিছুই চিন্তা করুক না কেন, সেগুলো জানতে চায় না ইয়েকো। আবার নীরবতা নেমে এলো তাদের মাঝে। দ্বিতীয় বোতলটার এক-তৃতীয়াংশ ভরা থাকা অবস্থায় উঠে দাঁড়ালো সাসাগাকি।

'আচ্ছা, তবে আজ চলে যাচ্ছি আমি।'

'ধন্যবাদ এই ঠান্ডার মধ্যে আসার জন্য। ভুলে যাবেন না আবার।'

'ভুলবো না,' বিল পে করতে নিয়ে বললো সাসাগাকি। কোটটা নামিয়ে নিয়ে গায়ে চাপালো সে, গলায় পরলো মাফলার। 'ওহ, যদিও একটু আগে হয়ে যায়, তবুও হ্যাপি নিউ ইয়ার।'

'হ্যাপি নিউ ইয়ার,' হেসে বললো ইয়েকো।

পুরোনো আমলের স্লাইডিং দরজাটার হাতলে হাত রাখলো সাসাগাকি, কিন্তু ওটা খোলার আগে একবার ফিরে তাকালো সে। 'সত্যিই কি সেদিন সে উপর তলায় ছিলো?'

'কে?'

'রিও। আসলেই কি সেদিন সে উপরের তলায় ছিলো?'

'কী বলছেন আপনি?'

মাথা ঝাঁকিয়ে হাসলো সাসাগাকি। 'কিছু না। পরের বার বলবো।'

দরজাটা খুলে বেরিয়ে গেল সে। ইয়েকো ফের বসে পড়ার আগে দরজার দিকে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ। ঘাড়ের পেছনে শিরশির করে উঠলো তার, আর এটা কোনো ঠান্ডা বাতাসের জন্য না অবশ্যই। *মনে হচ্ছে আবারো কোথাও যাচ্ছে রিও।* সেদিন মাতসুরার বলা কথাগুলো মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে তার। ঐ সময় ওর শরীরের উপরেই ছিলো লোকটা, ঘর্মাক্ত অবস্থায়।

শব্দটা সে নিজেও শুনেছিলো। ঘরের চালের উপর দিয়ে হাঁটলে যেরকম মড়মড় শব্দ হয় সেরকম। ও জানতো যে রিওর জানালা দিয়ে ছাদ পেরিয়ে বাইরে যাওয়ার অভ্যাস আছে। যদিও এটা নিয়ে রিওকে কখনো কিছু বলেনি সে। কারণ রিও যতই বাড়ির বাইরে থাকতো, ততই মাতসুরার সাথে সময় কাটাতে পারতো সে। সেদিনও বেরিয়ে যায় সে। আবার যখন ফেরে, তখনো শব্দটা টের পায় ইয়েকো।

তো সেদিন বাসায় ছিলো না সে। কিন্তু তাতে কী? গোয়েন্দার কী মনে হয়? কী করতে গেছিলো রিও?

***

দরজার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে সান্তা ক্লজ, সবাইকে কার্ড দিচ্ছে এক এক করে। কেউ একজন ভেতরে ক্রিসমাসের গানটা গাইছে। ক্রিসমাস, নিউ ইয়ার আর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান–সব মিলিয়ে পুরো করিডর যেন লোকে লোকারণ্য। প্রায়

অধিকাংশ কাস্টমারই অল্পবয়সি। *যেন পতঙ্গরা সব ফুলের দিকে ছুটছে*, ভাবলো সাসাগাকি। ইউকিহো শিনোজুকার R&Y দোকানটার ওসাকা শাখার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আজ। টোকিও শপগুলোর মতো না করে এটার জন্য পুরো বিল্ডিংটাই ভাড়া করা হয়েছে এবার। পোশাকের থেকেও বড় কিছু রয়েছে এখানে। বিভিন্ন অ্যাক্সেসরিজ, ব্যাগ আর একটা পুরো ফ্লোরে শুধু জুতো আর জুতো-সবগুলো দামি দামি ব্র্যান্ডের। অবশ্য, এরমধ্যে কোনটার কী পার্থক্য তা বলতে পারে না সাসাগাকি। বর্তমানে জাপানে যে অর্থনৈতিক মন্দা চলছে, এখানে তার সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র দেখতে পাচ্ছে সে।

প্রথম তলায় উঠার পরে যে চলন্ত সিঁড়ি রয়েছে তার পাশেই একটা ক্যাফেতে গত এক ঘন্টা যাবৎ বসে আছে সাসাগাকি। নিচ তলার কর্মকাণ্ড বসে বসে দেখছে। এমনকি রাত নামার পরেও কাস্টমারদের আসা বন্ধ হয়নি। ওকে ক্যাফেতে ঢোকার জন্যেও লাইন ধরতে হয়েছে, আর এখনো দরজার কাছে লেগে আছে লম্বা লাইন। সাসাগাকি দ্বিতীয় কফিটা অর্ডার করলো যাতে ক্যাফের কর্মীরা তার ব্যাপারে কানাঘুষা না শুরু করে দেয়। টেবিলের অপর পাশে বসে আছে এক তরুণ দম্পতি। স্বাভাবিক দৃষ্টিতে দেখলে মনে হবে যে কোনো দম্পতি তাদের দাদার সাথে ঘুরতে বেরিয়েছে।

'কোনো হাঙ্গামা হবে না আজ, হাঁহ?' মৃদু শব্দে বলে উঠলো তরুণ।

মাথা দোলালো সাসাগাকি। তার চোখ পড়ে আছে নিচ তলাতে।

তার সামনে বসা দুজনই ওসাকার হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টের অফিসার।

ঘড়ির দিকে তাকালো সে। কাঙ্ক্ষিত সময় এগিয়ে আসছে।

'এখনো সুযোগ আছে একটা,' বললো সাসাগাকি। কথাটার অর্ধেকটা যেন নিজের কাছেই বললো সে। যদি রিও কিরিহারাকে দেখা যায়, তাহলে দুজন অফিসার গিয়ে তাকে কাস্টডিতে নেবে। অবসরপ্রাপ্ত সাসাগাকি এখানে আছে শুধু দেখিয়ে দেওয়ার জন্য। কোগাই ব্যবস্থা করেছে সবকিছুর। হত্যার দায়ে কিরিহারাকে গ্রেপ্তার করার আদেশ হয়েছে। যেই সময়ে সাসাগাকি সেই ভাঙা টবের মধ্যে কাচের টুকরো দেখেছিলো, সেই সময়েই একটা জিনিস খেলে যায় তার মাথায়। মাতসুরার নিখোঁজ হওয়ার আগে যে রিপোর্টটা করা হয়েছিলো সেটা বেশ ভালো করে পড়েছিলো সে, যার কারণে মনে ছিলো তার বিষয়টা। ওখানে বলা ছিলো যে মাতসুরা প্রায়ই রে-ব্যানস-এর চশমা পরতো, সাথে সবুজ রঙের লেন্স। হয়তো সেই গেম পাইরেসি হওয়ার সময় কোথাও লুকিয়ে পড়েনি সে। হয়তো খুব বাজে কিছু হয়েছে তার সাথে।

সাসাগাকি কোগাকে দিয়ে সেই চশমার টুকরোটার ব্যাপারে খোঁজ লাগায়। জানতে পারে, আসলেই ওটা রে-ব্যানসের চশমা। আর ওটায় থাকা আঙুলের ছাপের সাথে মাতসুরার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে পাওয়া ছাপ একদম মিলে যায়।

ফরেনসিকের মতে, নব্বই শতাংশের উপর সম্ভাবনা রয়েছে যে ওটা মাতসুরার চশমা।

তো কথা হলো, কেন মাতসুরার চশমার টুকরো টবের ভেতর থাকবে? সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যাখ্যাটা হচ্ছে, হয়তো যেই মাটি দিয়ে রেইকো কারাশাওয়া টবে ক্যাকটাস লাগাচ্ছিলেন, সেই মাটিতেই চশমাটা ছিলো। তো প্রশ্ন আসে, সেই মাটি কোথায় পেলেন তিনি?

সম্ভবত তার নিজের বাগানেই।

ওদের একটা সার্চ ওয়ারেন্টের দরকার ছিলো রেইকো কারাশাওয়ার বাগান খুঁড়ে দেখার জন্য। এটা করা কঠিন ছিলো; কারণ অতটুকু প্রমাণে এত বড় পদক্ষেপ নেওয়াটা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যেত, কিন্তু কোগা ঝুঁকি নেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলো। তবে কাজটা সহজেই হয়ে যায় কারণ জায়গাটা রেইকো কারাশাওয়ার মালিকানাধীন ছিলো না আর। আবার এও হতে পারে যে হয়তো বৃদ্ধ গোয়েন্দার দীর্ঘদিনের সাধনার প্রতি অবশেষে সম্মান প্রদর্শন করেছে তার ভাগ্য।

আগের দিন পুরো বাগানটা সার্চ করে তারা এবং একটা জায়গা দেখতে পায় যেখানে কোনো ঘাস জন্মেনি। সেখানেই খোঁড়া শুরু করে প্রথমে। প্রায় দুই ঘন্টা বাদে একটা হাড় খুঁজে পায়। এরপরে বাকিগুলো। কোনো পোশাকের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। ওরা ধরে নিয়েছিলো যে সাত থেকে আট বছর পেরিয়ে গেছে মারা যাওয়ার পর। ওসাকা পুলিশ এরপরে সেগুলো পাঠিয়ে দেয় ফরেনসিকের কাছে যাতে দেহটা শনাক্ত করতে পারে। অনেকগুলো উপায়ই ছিলো তা শনাক্ত করার, কিন্তু ওগুলোতে অনেক সময় লাগতো। আর তারপর আরো একবার ভাগ্যের সহায়তা পায় সে।

লোকটার কড়ে আঙুলের হাড়ে একটা প্লাটিনামের রিং পায় তারা। আর তাতেই সাসাগাকি নিশ্চিত হয়ে যায় যে ওগুলো মাতসুরারই হাড়। ঐ আংটির কথা এতটাই স্পষ্ট মনে ছিলো তার যে মনে হচ্ছিলো এই গতকালই বুঝি দেখেছে ওগুলো। ডান হাতেও অবশ্য একটা প্রমাণ ছিলো: মানুষের কিছু চুল জড়িয়ে ছিলো হাড়ের সাথে। সম্ভবত ধস্তাধস্তির সময় অন্যের মাথা থেকে ছিঁড়ে নিয়েছে। এখন প্রশ্ন দাঁড়ায় যে ওরা কি প্রমাণ করতে পারবে কি না যে ওগুলো রিও কিরিহারার চুল। স্বাভাবিকভাবে চুল কার তা প্রমাণ করার জন্য চুলের রং, উজ্জ্বলতা, কঠোরতা, স্থূলতা, মেডুলারি ইন্ডেক্স, বর্ণবিন্যাস এবং রক্তের গ্রুপ ইত্যাদির প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা করে চেক করতে হয়। কিন্তু এত বছর চুলগুলো মাটির তলায় থাকার কারণে আসলে ওসবের কতটুকু ওগুলোতে রয়েছে তাই চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। কোগা ওটাকে ডিএনএ ল্যাবে পাঠায় যাতে ওটারও একটা বিহিত হয়। ডিএনএ টেস্টিং মূলত নতুন একটা পদ্ধতি, আর গত কয়েক বছরে বেশ সফল হয়েছে ওটা। নতুন একটা পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে যে আগামী চার বছরের মধ্যে

প্রত্যেকটা পুলিশ স্টেশনে এটা দেওয়া হবে, কিন্তু আপাতত শুধু একটা জায়গাতেই আছে।

পনব্রোকারের মৃত্যুর পরে সময়ের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সবকিছুই এখন অন্য রকম, এমনকি পুলিশের তদন্তের পদ্ধতিতেও পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু সমস্যা দাঁড়ায় রিওকে কোথায় খুঁজে পাওয়া যাবে তা নিয়ে। যতই প্রমাণ থাকুক না কেন, যদি তাকে ধরতে না পারে, তাহলে এসবের আর কোনো মানেই থাকে না।

সাসাগাকিই পরামর্শ দেয় যে ইউকিহো শিনোজুকার চারপাশে তাদের একটু নজর রাখতে হবে। *চিংড়ির উপরে নজর রাখো, গোবির দেখা পাবে*, এটাই ছিলো ওর মূলমন্ত্র।

'রিও নিশ্চয়ই ইউকিহোর নতুন দোকানটা উদ্বোধন করার সময় আসবে। ওসাকায় দোকান খোলাটা ওদের জন্য বিশেষ কিছু। আর টোকিওতে ব্যস্ত হয়ে পড়ার কারণে ওসাকায় তেমন একটা আসতে পারেনি ইউকিহো, তাই পুনরায় দেখা হওয়ার একটা সুযোগ রয়েছে ওদের। উদ্বোধনী দিনটাই আমাদের মোক্ষম দিন হবে,' কোগাকে বলেছিলো সাসাগাকি।

বৃদ্ধ গোয়েন্দার কথায় সায় দিয়েছিলো কোগা। যখন থেকেই দোকানটা খোলা হয়েছে, তখন থেকেই কয়েকটা পয়েন্ট থেকে কিছু অফিসার নজর রেখেছে দোকানের উপর। এমনকি সাসাগাকি নিজেও সকাল থেকে দোকানের বিপরীতে থাকা একটা কফি শপে ছিলো। কয়েক ঘণ্টার মতো চেয়ে থেকে পরবর্তীতে সে ভেতরে চলে আসে।

'আপনার মনে হয় কিরিহারা এখনো ইউইচি আকিওশি নামটাই ব্যবহার করছে?' বলে উঠলো সামনে থাকা পুরুষ গোয়েন্দাটা।

'বলা কঠিন। হয়তো নতুন কোনো নাম ব্যবহার করছে সে এখন।'

উত্তর দেওয়ার সময় হঠাৎ অন্য দিকে চিন্তা চলে গেল সাসাগাকির। ভাবছে, কোন ছদ্মনামটা এখন ব্যবহার করতে পারে সে। যখন নামটা প্রথমবার শুনেছিলো, তখনই চেনা চেনা লেগেছিলো তার। কিন্তু এই কয়েক দিন আগেই বিষয়টা বুঝতে পেরেছে বৃদ্ধ গোয়েন্দা; রিও আসলে দুয়ে দুয়ে চার মিলিয়েছে। সাসাগাকি 'আকিওশি' নামটা প্রথম শুনেছিলো তার সেই ইনফরম্যান্ট ফুমিহিকো কিকুচির কাছ থেকে। ইউইচি আকিওশি হলো সেই বাচ্চাটার নাম যে কিনা ফুমিহিকোর চাবির রিংয়ের কথা গোয়েন্দাদের বলে দেয়, যার ফলে সেই ধর্ষণের ঘটনার সাথে ফুমিহিকোর নামটাও জড়িয়ে যায়। বিশ্বাসঘাতক ইউইচি আকিওশি।

তো রিও এই নামটাই বা কেন ব্যবহার করলো? সে হয়তো রিওকেই জিজ্ঞেস করতে পারবে এটা, কিন্তু তার নিজস্ব চিন্তাভাবনা বলছে যে রিও দেখতে চেয়েছিলো একজন বিশ্বাসঘাতকের জীবন আসলে কেমন। আকিওশি নামটা ব্যবহার করাটা ওর কাছে হয়তো নিজেকে নিয়েই উপহাস করার মতো ব্যাপার। অবশ্য, এসব

কিছুই এখন আর ভাবার বিষয় না। সাসাগাকি এখন নিশ্চিত যে কেন রিও ফুমিহিকোকে ফাঁদে ফেলেছিলো। সেই ছবিটা, যেটাতে রিওর মা এবং মাতসুরা ছিলো, সেটা রিওর পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়ায়। যদি সেটা পুলিশের হাতে পড়ে যেত, তখন হয়তো কেসটা আবার পুনরায় খোলা হতো। আর তাতে করে রিওর পক্ষে নতুন অ্যালিবাই দেওয়া কঠিন হয়ে পড়তো। যদি মাতসুরা আর ইয়েকো মিলনরত অবস্থাতেই ছিলো তখন, তার মানে হলো রিও তখন একাই ছিলো। যদিও ঐ সময় একটা ইলিমেন্টারি স্কুলের বাচ্চাকে তার বাবার হত্যাকারী হিসেবে সন্দেহ করা হতো না, তবুও সে চায়নি এই প্রমাণটুকু পুলিশের হাতে পড়ুক। গত রাতে ইয়েকোর সাথে মদ খাওয়ার পরেই পরিষ্কার হয়েছে বিষয়টা। রিও সেদিন একাই ছিলো উপরের তলায়, কিন্তু বাড়িতে ছিলো না। যেভাবে চোররা বিভিন্ন বাড়ির জানালা দিয়ে পালিয়ে যায়, ঠিক তেমন করেই একটা বাচ্চাও বেরিয়ে যেতে পারে। সেদিন রিও-ও ঘরের চাল পেরিয়ে বাড়ির বাইরে চলে যায়।

আর বাইরে গিয়ে সে কী করেছিলো সেদিন?

হঠাৎ দোকান বন্ধ করার একটা ঘোষণা শোনা গেল। মানুষগুলো এবার দরজার দিকে যেতে লাগলো ধীরে ধীরে।

'আজকেও ভাগ্য সহায় হলো না হয়তো,' পুরুষ গোয়েন্দাটা বলে উঠলো। তার পাশের জনের চেহারায়ও হতাশা নেমে এলো যেন। যদি আজকে রিওকে তারা ধরতে না পারে, তবে ইউকিহো শিনোজুকাকে প্রশ্ন করার জন্য ধরে নিয়ে যাবে বলে ঠিক করেছিলো। কিন্তু সাসাগাকি এর বিরুদ্ধে চলে যায়। কারণ ও নিশ্চিত যে ইউকিহোর কাছে কিছুই পাবে না তারা। সে হয়তো তার মোহনীয় ভঙ্গিমায় অবাক হওয়ার মতো করে বলবে, 'কী? আমার মায়ের বাড়ির বাগানে হাড় পাওয়া গেছে? এ আমি বিশ্বাস করি না! এটা সত্যি হতে পারে না!'

আর একবার এটা বলার পরে তাদের হাতে আর কিছুই করার থাকবে না। মাকোতো তাকামিয়ার সাক্ষ্য থেকে ওরা জেনেছে যে সাত বছর আগে এক নতুন বছরের শুরুতে রেইকো কারাশাওয়া ইউকিহোর বাড়িতে বেড়াতে গেছিলেন। ঐ দিনই মারা যায় মাতসুরা। কিন্তু তারপরও ওদের হাতে কোনো প্রমাণ নেই যে ইউকিহো আর রিওর মধ্যে কোনো সংযোগ আছে।

'মি. সাসাগাকি, ওদিকে দেখুন,' নারী গোয়েন্দাটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলে উঠলো আচমকা।

সাসাগাকি তাকাতেই দেখলো ইউকিহো দোকানের মধ্য দিয়ে চলে যাচ্ছে। তার পরনে একটা সাদা ড্রেস আর মুখে মিলিয়ন ডলারের হাসি। ওকে এতটাই সুন্দর দেখাচ্ছে যে প্রত্যেকটা কাস্টমারের চোখ তার উপরেই পড়ে আছে, এমনকি ফ্লোরের কর্মীরা পর্যন্ত তাকিয়ে আছে। যেখানেই যাচ্ছে সেখানেই লোকজন তাকাচ্ছে

ওর দিকে। কেউ কেউ আবার ফিসফিস করে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে, আর কেউ কেউ শুধু তাকিয়েই আছে।

'অবশেষে মহারানির আগমন ঘটলো,' বললো পুরুষ গোয়েন্দাটা।

আর তারপর রানি ইউকিহোর দিকে তাকালো সাসাগাকি। সাথে সাথে একটা চিত্র ফুটে উঠলো মাথায়। বহু বছর আগে সেই অ্যাপার্টমেন্টে যে ছোট্ট মেয়েটার সাথে দেখা হয়েছিলো ওর, সেই মেয়েটার ছবিই যেন দেখতে পেল সে। যে মেয়েটা না কাউকে কাছে ঘেঁষতে দিতো, আর না তো কারো কাছে ঘেঁষতো।

যদি সে আগেই ইওসুকে কিরিহারার ঐ বিশেষ ঝোঁকটা সম্পর্কে জানতো, তবে হয়তো অনেক আগেই বের করে ফেলতে পারতো বিষয়টা।

পাঁচ বছর আগে ও প্রথম ইয়েকোর কাছ থেকে শুনেছে ব্যাপারটা। মহিলা মাতাল হয়ে গেছিলো সেদিন, হয়তো এর জন্যই পুরোটা খুলে বলতে পেরেছিলো সে। 'আমি এখন এটা বলতে পারছি কারণ এখন ও আর আমাদের মাঝে নেই। আমার স্বামী আসলে বিছানায় অতটা ভালো ছিলো না। এমন না যে প্রথম থেকেই এমন ছিলো। না, প্রথম দিকে ভালোই ছিলো, কিন্তু এরপরে ধীরে ধীরে খারাপ হতে শুরু করে পরিস্থিতি। আসলে, সে নতুন কাউকে পেয়ে গেছিলো, ভালো কাউকে। অন্তত অল্পবয়সি কেউ। হ্যাঁ, ছোট মেয়েদের পছন্দ করতো সে। তাদের ছবি কিনতো খুব। যখন মারা গেল, তখন সেগুলো সব ফেলে দিয়েছিলাম আমি। ওগুলো থাকাটা ঠিক মনে হয়নি আমার।'

প্রথমে বৃদ্ধ গোয়েন্দা তেমন একটা গায়ে মাখেনি বিষয়টা। কিন্তু এরপরে যা বলেছিলো ইয়েকো তাতে টনক নড়ে যায় তার। 'মাতসুরার কাছ থেকে একবার একটা কথা শুনেছিলাম। ও বলেছিলো যে আমার স্বামী নাকি মেয়েদেরকে কেনে। যখন তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে এর মানে আসলে কী, ও বলেছিলো যে আমার স্বামী নাকি তাদের সাথে রাত কাটানোর জন্য তাদেরকে কেনে, আর তাও নাকি খুবই অল্পবয়সি বাচ্চাদেরকে। আমি যখন জিজ্ঞেস করলাম যে এই দোকান কোথায় এবং কেন তা বন্ধ করে দেওয়া হয় না, তখন সে হেসে বলেছিলো যে আপনার আরো অনেক কিছু জানা দরকার এসব বিষয়ে। জানেন ও কী বলেছিলো আমাকে? বলেছিলো সেই ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে নাকি তাদের মায়েরাই বিক্রি করে দিতো খাবারের বিনিময়ে।'

তার কথাগুলো সেদিন বজ্রপাতের মতো এসে লাগে সাসাগাকির মাথায়। কিন্তু যখনই স্বাভাবিক হয় সে, তখনই একটা পুরু কুয়াশার চাদর তার চোখের সামনে থেকে সরে যায়। ততক্ষণেও ইয়েকোর বলা শেষ হয়নি। 'জানেন, ওর মাথায় এমনকি বাচ্চা অ্যাডাপ্ট করার চিন্তাও এসেছিলো। কয়েকটা উকিলের কাছেও গেছিলো, বাচ্চা অ্যাডাপ্ট করতে হলে কী কী করতে হয় তা জানতে। যখন এ বিষয়ে আমি জিজ্ঞেস করতে শুরু করলাম, সে আমার উপর খুব রেগে গেল।